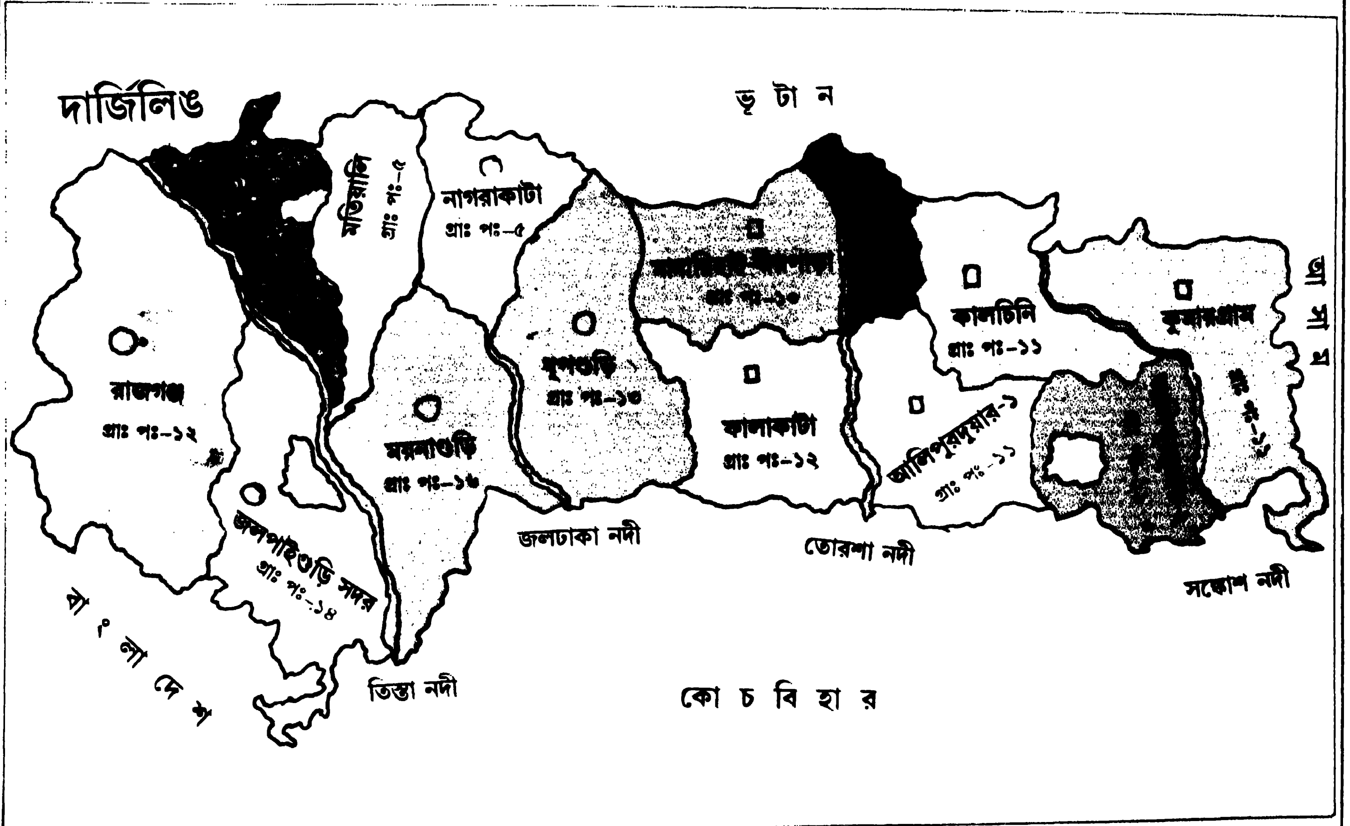
পশ্চিমবঙ্গ

জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা

১৪০৮



তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

পশ্চিমবঙ্গ

বর্ষ ৩৪ সংখ্যা ৪৮, ৪৯, ৫০

৮, ১৫, ২২ জুন ২০০১,

২৫, ৩২ জ্যৈষ্ঠ, ৭ আষাঢ় ১৪০৮

প্রধান সম্পাদক : তারাপদ ঘোষ **সম্পাদক** : অজিত মণ্ডল

সহযোগী সম্পাদক

অনুশীলা দাশগুপ্ত ● মন্দিরা ঘোষাল

স্মরজিৎ প্রামাণিক ● সংগ্রাম গুহ

প্রচ্ছদ নির্মাণ : অজিত মণ্ডল

প্রথম পটচিত্র : টোটোপাড়া

দ্বিতীয় পটচিত্র : জলদাপাড়া অরণ্যে গণ্ডার

চতুর্থ প্রচ্ছদ : উপরে : জলপাইগুড়ির প্রবেশপথ, রাজবাড়ির তোরণ

নীচে : নতুন সাজে মূর্তি বনবাংলো ; ছবি : দ্যুতিমান চন্দ

অঙ্গসজ্জা : প্রতাপ সিংহ তুলসীদাস বসাক রামচন্দ্র পণ্ডিত শ্যামসুন্দর রুদ্র নিতাই গোড়ে জয়দেব পাল

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : জলপাইগুড়ি জেলাপরিষদ

প্রকাশক

তথ্য অধিকর্তা

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

মুদ্রক

বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড

১৬৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট

কলকাতা-৭০০ ০১২

দাম : পঞ্চাশ টাকা

যোগাযোগের ঠিকানা

বিতরণ শাখা

অমরেন্দ্রনাথ সাহা, তথ্য আধিকারিক

৬ কাউন্সিল হাউস স্ট্রিট ● কলকাতা-৭০০ ০০১ ● দূরভাষ : ২৪৩-৬২৯৫

বিষয়সূচি

সম্পাদকীয়

একনজরে জলপাইগুড়ি জেলা

জলপাইগুড়ি জেলার পুরাকীর্তি
আনন্দগোপাল ঘোষ ৯

ঐতিহাসিক উপাদান ও দলিল চিত্রে জলপাইগুড়ি জেলা
সুনীল চক্রবর্তী ১৭

জলপাইগুড়ি জেলার জনজাতি
বিমলেন্দু মজুমদার ২৫

বৈকুণ্ঠপুর থেকে জলপাইগুড়ি
অরুণভূষণ মজুমদার ৩৬

দুটি পাতা একটি কুঁড়ির ইতিহাস : জলপাইগুড়ি জেলা
পরিতোষ দত্ত ৪৫

চা-শিল্প ও শ্রমিক আন্দোলন
মানিক সান্যাল ৬৭

জলপাইগুড়ি জেলায় স্বাধীনতা আন্দোলন
মুকুলেশ সান্যাল ৮৬

স্বাধীনতাপরবর্তী জলপাইগুড়ি জেলার গণআন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
সুভাষ চৌধুরী ৯২

তেভাগা আন্দোলনে জলপাইগুড়ি
জগৎ সাহা ৯৯

জলপাইগুড়ি জেলার সংবাদপত্রের ইতিহাস
পবিত্রভূষণ সরকার ১০৪

জলপাইগুড়ির সাহিত্য : অতীত ও বর্তমান
সুরঞ্জন দত্ত রায় ১১০

জলপাইগুড়ি : উত্তরবঙ্গের লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলন
গৌতম গুহরায় ১১৮

জলপাইগুড়ি জেলার ভাষাবৈচিত্র্য
অর্ণব সেন ১২৬

জলপাইগুড়ির আদিবাসী সমাজ ও সংস্কৃতি
মনোহর তিরকি ১৩৫

উত্তরবঙ্গের সংস্কৃতি : রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির পূজাপার্বণ
গিরিজাশংকর রায় ১৪৩

রাভা সংস্কৃতি ও জীবনধারা
সুশীলকুমার রাভা ১৫৭

ডুয়ার্সের তামাং জনজাতি ও তার সংস্কৃতি
কাজিমান গোলে ১৬৪

মেচ জীবন ও সংস্কৃতি
দ্বারেন্দ্র ঈশ্বরারী ১৬৯

টোটোদের সমাজ ও সংস্কৃতি
ধনীরাম টোটো ১৭২

জলপাইগুড়ি জেলার নেপালি সমাজ ও সংস্কৃতি
কিতাপসিংহ রাই ১৭৫

জলপাইগুড়ি জেলার বর্ণময় লোকসংস্কৃতি নৃত্য ও গীত
সুনীল পাল ১৮১

জলপাইগুড়ি জেলার প্রগতি-সংস্কৃতির ধারা
সুশান্ত নিয়োগী ১৮৮

নাট্য আন্দোলনে জলপাইগুড়ি জেলা
কুমারেশ দেব ১৯৪

জলপাইগুড়ি জেলার খেলাধূলা
অঞ্জন সেনগুপ্ত ২০০

তিস্তাপারের কয়েকজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব
বিজয় দে ২০৬

মেঘের গায়ে জেলখানা : বক্সাদুয়ার
শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ২৪২

মাটির সহস্র বন্ধনে জড়িয়ে জড়িয়ে......
সলিল আচার্য ২৫০

বাণিজ্যিক ঐতিহ্যে জলপাইগুড়ি
চণ্ডীদাস লাহিড়ী ২৬০

নৈঃসর্গিক জলপাইগুড়ির অর্থনৈতিক প্রতিশ্রুতি
ক্ষুদিরাম রাউৎ ২৬৮

জলপাইগুড়ি জেলার শিল্প সম্ভাবনা
সুব্রত গুপ্ত ২৭২

সমবায় আন্দোলনে জলপাইগুড়ি
সত্যজিৎ বসু ২৮২

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও জলপাইগুড়ির উন্নয়ন
দীপ্তি দত্ত ২৮৬

তিস্তা প্রকল্প : জলপাইগুড়ির সেচ সম্ভাবনা ও ভবিষ্যৎ
অলকেশ দাশগুপ্ত ২৯০

জলপাইগুড়ি : নগরায়ণের ধারায় একটি দৃষ্টান্ত
শিবপদ ভৌমিক ২৯৮

জলপাইগুড়ি জেলার পূর্তদপ্তরের চালচিত্র
গোপাল চাকী ৩০৩

জলপাইগুড়ি জেলার স্বাস্থ্য পরিষেবা
পান্থ দাশগুপ্ত ৩০৭

জলপাইগুড়ি জেলার শিক্ষার রূপরেখা
অমর চৌধুরী ৩১৩

নারী শিক্ষা ও নারী আন্দোলন
কল্যাণী দাশগুপ্ত ৩১৯

সাক্ষরতা আন্দোলনে জলপাইগুড়ি
বীরেশ সিকদার ৩২৫

জলপাইগুড়ি জেলার বন ও বন্যপ্রাণী
যোগেশচন্দ্র বর্মণ ৩২৯

পর্যটনে জলপাইগুড়ি জেলা
কৌস্তুভ তরফদার ৩৩৫

রূপময় জলপাইগুড়ি
জগন্নাথ বিশ্বাস ৩৪৪

সম্প্রীতি চেতনায় জলপাইগুড়ি
সুবোধকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ৩৪৮

বিপ্লবতীর্থ বক্সাদুয়ারের আলোকে আজকের সমস্যা ও উত্তরণের পথ
নির্মল দাস ৩৫৫

জলপাইগুড়ি জেলায় পরিবেশ অবক্ষয় ও সাম্প্রতিক বন্যা
সুবীর সরকার ৩৫৯

১৯৬৮ সালের বন্যা—ফিরে দেখা
পবিত্র ভট্টাচার্য ৩৬৪

জলপাইগুড়ি জেলায় বন্যার সমস্যা ও তার প্রতিবিধান
বিকাশকুসুম চৌধুরী ৩৬৯

কালের প্রবাহে জলপাইগুড়ি জেলা : গ্রন্থপঞ্জি
সুবর্ণ দাস ৩৭৩



তিস্তা গঙ্গা উৎসবে লোকশিল্পী ও বিদ্যালয় ছাত্রীদের একতা মিছিল



এখন বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার সময়

হিমালয়ের পাদদেশে পুবপশ্চিমে বিস্তৃত জলপাইগুড়ি জেলা। এর উত্তরে কোথাও দীর্ঘ ধূসর পাহাড়শ্রেণী পাহাড়ি নদনদী খণ্ডিত নিবিড় বনভূমি। প্রাকৃতিক সম্পদের অফুরন্ত ভাণ্ডার এই অঞ্চলে আর্দ্রতার ভাগ বেশি বলে এখানে অসংখ্য প্রজাতির উদ্ভিদ দেখা যায়। তরাই আর ডুয়ার্সের বন্যপ্রাণী সমৃদ্ধ ঘনঅরণ্য, ঢেউখেলানো সবুজ গালিচা চা-বাগান পর্যটনপ্রিয় মানুষকে সহজে আকৃষ্ট করে।

জলপাইগুড়িকে বলা হয় ভারতবর্ষের ক্ষুদ্র সংস্করণ, কেননা এই জেলায় বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মিলিত সহাবস্থান লক্ষ করা যায়। পৃথিবীর অন্যতম বিরল জনগোষ্ঠী টোটোদের বাসও এই জেলায়। স্থানীয় প্রাচীন অধিবাসীদের পাশাপাশি এই জেলার বহিরাগত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ও ধর্মের মানুষ সম্মিলিত শতাধিক বছর ধরে প্রীতি ও সৌহার্দ্যের সঙ্গে বসবাস করছেন। বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন কখনও কখনও মলিনতা ও ক্ষত'র সৃষ্টি করলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সংহতি চিরদিন তাকে পরাভূত করেছে।

দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ছাড়াও কৃষক ও চা-বাগিচার শ্রমিক আন্দোলনে, শিক্ষক ও ছাত্র আন্দোলনে এই জেলা সমগ্র উত্তরবঙ্গ তথা সারা বাংলার প্রবহমান ঐতিহ্যের শরিক। বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও জলপাইগুড়ির অবদান উল্লেখযোগ্য।

সারা পূর্বাঞ্চলে বিচ্ছিন্নতা সামাজিক ব্যাধির রূপ নিয়েছে, এখন এর বিরুদ্ধে সচেতন ও সোচ্চার হওয়ার সময়। প্রতিবেশী জেলার অধিবাসীদের মধ্যে পরস্পর মিত্রতা ও ভাববিনিময়ে রাজ্য সরকার তিস্তা-গঙ্গা উৎসবের মতো সাংস্কৃতিক কর্মসূচি নিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকার ক্ষেত্রেও রাজ্য সরকারের সমঅভিপ্রায়। প্রতিটি জেলার প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য জনজাতি-সংস্কৃতি শিল্প-অর্থনীতি গণআন্দোলন ও সরকারি উন্নয়ন কর্মসূচি রূপায়ণের আলেখ্য তুলে ধরা হয় বিশেষ সংখ্যাগুলিতে।

বর্তমান সংখ্যায় লিখেছেন জেলার প্রবীণ বুদ্ধিজীবী, গবেষক, বিশেষজ্ঞগণ। প্রবন্ধের বিষয় তথ্য ও অভিমত লেখকের সম্পূর্ণ নিজস্ব, সম্পাদকের কোনও দায়িত্ব নেই। অনুসন্ধিৎসু পাঠকের কাছে সংখ্যাটি সমাদৃত হবে আশা করা যায়।

একনজরে জলপাইগুড়ি জেলা

(স্থাপিত : ১ জানুয়ারি ১৮৬৯)

আয়তন—৬২২৭ বর্গ কি.মি.	বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৩১৬০ মিলিমিটার	গড় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩০.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস	গড় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস
জনসংখ্যা (২০০১) সালের আদমশুমারী অনুসারে) মোট—৩৪,০৩,২০৪ জন পুরুষ—১৭,৫৩,২৭৮ (৫১.৮৮%) মহিলা—১৬,৪৯,৯১৬(৪৮.১২%)	তফসিলি জাতি -১০,৩৫,৯৭১ (৩৬.৯৯%) তফসিলি উপজাতি -৫,৮৯,২২৫ (২১.০৪%) গ্রামীণ জনসংখ্যা -২৩,৪২,২৯৬ (৮৩.৬৩%) শহরের জনসংখ্যা -৪,৫৮,২৪৭ (১৬.৩৬%)	**মহকুমা-৩টি** জলপাইগুড়ি সদর -৩৪৪৬.৮১ বর্গ কিঃ মিঃ। জনসংখ্যা-১৬,৭৩,১৬০ আলিপুরদুয়ার-২৫৬৬.৮৫ বর্গ কিঃ মিঃ। জনসংখ্যা-১১,২৭,৩৮৩ ১ এপ্রিল ২০০১ থেকে 'মাল' মহকুমা গঠিত হয়েছে।	**থানা-১৬টি** জলপাইগুড়ি (কোতয়ালী), ভক্তিনগর, রাজগঞ্জ, মাল, মেটেলী, ময়নাগুড়ি, নাগরাকাটা, বানারহাট, ধূপগুড়ি, বীরপাড়া, ফালাকাটা, মাদারিহাট, আলিপুরদুয়ার, জয়গাঁ, কালচিনি কুমারগ্রাম।
পঞ্চায়েত সমিতি-১৩টি সদর মহকুমা রাজগঞ্জ, জলপাইগুড়ি (সদর), ময়নাগুড়ি, মাল, মেটেলী, নাগরাকাটা, ধূপগুড়ি। আলিপুরদুয়ার মহকুমা— আলিপুরদুয়ার-১ আলিপুরদুয়ার-২, মাদারিহাট, কালচিনি, ফালাকাটা, কুমারগ্রাম।	**পৌর প্রতিষ্ঠান-৩টি** জলপাইগুড়ি, মাল, আলিপুরদুয়ার শহর-১২টি।	গ্রাম পঞ্চায়েত-১৪৮টি। গ্রামের সংখ্যা-৫৯৫টি। মৌজার সংখ্যা -৭৭৪টি।	**কৃষি** কৃষিজমির পরিমাণ-২৮,৩৩৯ হেক্টর। কৃষি নির্ভর জনসংখ্যা-৪,০৮,৬০৬
সেচ সেচভুক্ত এলাকা-৩৭৪০৯ হেক্টর। গভীর নলকূপ সংখ্যা-৪৮টি (১২০০ হেক্টর) অগভীর নলকূপ সংখ্যা-৬৭৫২টি (১৩৫০৪ হেক্টর) নদীর জল উত্তোলন সংখ্যা-৮৭টি (২৬১০ হেক্টর)	**চা-বাগিচা** চা-বাগিচার সংখ্যা-১৮১টি চা-বাগিচার এলাকা-১,১৮,৭০১.৬ হেক্টর।	**বন** বনভূমির পরিমাণ-১,৭৩,১০৩ হেক্টর। মোট বনবস্তি-১৭৪টি।	**শিল্প** বড় ও মাঝারি শিল্প-১১টি। নথিভুক্ত ক্ষুদ্রশিল্প-৪৭৩৬টি। চা কারখানা-১৫৩ টি।
বিদ্যুৎ জেলার ১২টি শহর ও ৭৩৬টি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছেছে।	**কর্মে নিয়োগ** রাজ্য সরকারি অফিসে-১৪,৯৭১ জন। কলকারখানায়-২০,৩৭৪ জন। ক্ষুদ্র শিল্পে-৯৪,৯৩৯ জন।	**সাক্ষরতা** সাক্ষরতার হার-(১৯৯১ সালের আদমশুমারী অনুসারে)। মোট-৪৫.০৯%, পুরুষ -৫৬% মহিলা-৩৩.২০%	১৯৯৬ সালের একটি পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে জেলায় সাক্ষরতা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৫% অর্থাৎ মাত্র ৫ বছরে সাক্ষরতার হার বেড়েছে ১০%
বিদ্যালয় প্রাথমিক-১৯১২টি। জুনিয়ার হাই-৬৮টি। হাই-১৩২টি। দ্বাদশ-৬২টি। মাদ্রাসা-৮টি।	**কলেজ** স্নাতক-১৫ টি। কারিগরি-১টি। কারিগরি মহাবিদ্যালয়-১টি।	**শিক্ষা** গ্রন্থাগার-৩৪৮টি। বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র-১২০০টি।	**স্বাস্থ্য** হাসপাতাল-৮টি। রাজ্য হাসপাতাল-১টি। (১০০ শয্যা বিশিষ্ট)। জেলা হাসপাতাল-১টি। (৫৫০ শয্যা বিশিষ্ট।) মহকুমা হাসপাতাল-১টি (১২৫ শয্যা বিশিষ্ট)। গ্রামীণ হাসপাতাল-৬টি। (২৬৫ শয্যা বিশিষ্ট)
স্বাস্থ্য কেন্দ্র প্রাথমিক-৮টি। (৩৭০ শয্যা বিশিষ্ট) উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র-৩৮টি। (২০৬ শয্যা বিশিষ্ট)।	ডাকঘর-২৯৬টি। সমবায় সমিতি-৫০২টি। ব্যাঙ্ক-১৪৫টি।	**প্রধান নদী-৭টি** তিস্তা, জলঢাকা, তোর্সা, কালজানি, রায়ঢাক, সংকোশ, ডায়না।	**পাহাড়** (ক) জয়ন্তী (খ) বক্সা
মন্দির জল্পেশ, বটেশ্বর, জটিলেশ্বর, দেবী চৌধুরানীর মন্দির, শ্রী ভেঙ্কটেশ্বরের মন্দির, প্রভৃতি।	**মসজিদ** পুরাতন মসজিদ, সোনাউল্লার মসজিদ, নবাব বাড়ির মসজিদ, মজিদখানা, প্রভৃতি।	**পর্যটন কেন্দ্র** গরুমারা, চাপরামারি, মূর্তি, চালসা, মালবাজার, জলদাপাড়া(হলং), চিলাপাতা (নল রাজার গড়), জয়ন্তী-মহাকাল, ভুটানঘাট, বক্সাদুর্গ, জয়গাঁ প্রভৃতি।	**লোকসংস্কৃতি** ভাওয়াইয়া, বিষহরা পালা, কুশানগান, নেপালি সম্প্রদায়ের নৃত্যগীত, মেচ, রাভা, আদিবাসী জনগোষ্ঠীর নৃত্যগীত, চোরচূর্ণী পালা, জারিগান ইত্যাদি।

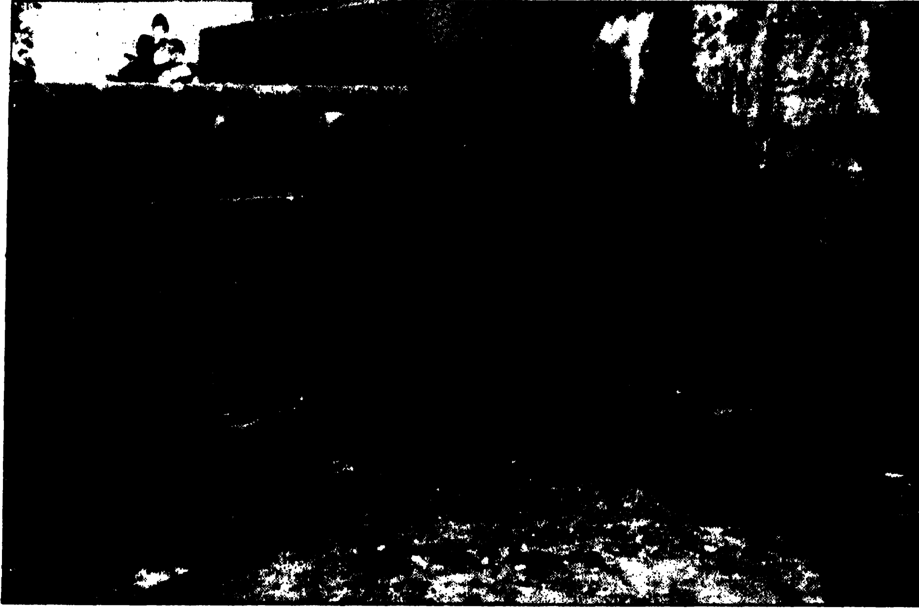


আনন্দগোপাল ঘোষ

জলপাইগুড়ি জেলার পুরাকীর্তি

ভারত সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগের বর্তমান প্রচলিত আইনের সংজ্ঞা অনুসারে একশো বছরের বেশি পুরাতন এমন কোনও ভবন, জলাশয়, গুহা, শৈল ভাস্কর্য, মুদ্রা, প্রস্তর বা ধাতুগাত্রে উৎকীর্ণ লিপি, পুঁথি, প্রাচীন স্তূপ বা ঢিবি, দেবালয় বা উপাসনালয় ইত্যাদি যেগুলির ঐতিহাসিক এবং শিল্পকলাগত মূল্য আছে, সেগুলিকেই পুরাকীর্তি বলে গণ্য করা হয়। গাণিতিক হিসেবে বলা যেতে পারে যে প্রাগৈতিহাসিক সময় থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত সময়কাল। এই সংজ্ঞাকে যথার্থভাবে মেনে চললে দেখা যাবে এ জেলায় পুরাকীর্তির সংখ্যা দার্জিলিং বাদে পশ্চিমবঙ্গের অন্য জেলাগুলির চেয়ে অনেক কম। কেন অনেক কম এই প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে আমাদেরকে একটু ইতিহাসের উজানে যেমন পাড়ি দিতে হবে, তেমনি প্রাকৃতিক-ভৌগোলিক কারণও অনুসন্ধান করতে হবে।

প্রথমে ইতিহাসগত দিকটি পর্যালোচনা করা যাক। এই জনপদ সম্পর্কে একটি বহুল প্রচারিত প্রবাদ চালু আছে। সেটি হলো এই জনপদটি সুদূর অতীতে 'পাণ্ডব বর্জিত দেশ' হিসেবে পরিচিত ছিল। অর্থাৎ পাণ্ডবেরা ভারতবর্ষের অন্যত্র গেলেও এখানে আসেননি। অবশ্য পাণ্ডবরা যে আসেননি তাও ইতিহাসগতভাবে সত্য। জাতীয় অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন পাণ্ডবরা ভুটান সংলগ্ন সীমান্ত দিয়েই প্রাগজ্যোতিষপুর গিয়েছেন। যাই হোক প্রবাদের যদি কোনোও ঐতিহাসিক ভিত্তি থাকে, তাহলে আমরা অসঙ্কোচে বলতে পারি যে পাণ্ডবদের সময়ও এই জনপদের সচল অস্তিত্ব ছিল। অবশ্য সচল অস্তিত্ব থাকলেও সবল অস্তিত্ব যে ছিল না, তা বোধ হয় বলার অপেক্ষা রাখে না। এই জেলায় এখন পর্যন্ত কোনও লিপির সন্ধান পাওয়া যায়নি। এর প্রধান কারণ জলপাইগুড়ি নামীয় জনপদে কোনও সুসংহত রাজশক্তি বা রাজবংশ বসতি স্থাপন করেনি। অতীতে যে সমস্ত সাম্রাজ্য এবং 'কিংডম' (Kingdom) পূর্বোত্তর ভারতে স্থাপিত হয়েছিল, সেখানে জলপাইগুড়ি সব সময়ই প্রান্তীয় বা সীমান্ত অঞ্চল হিসেবে পরিগণিত হতো। স্বাভাবিকভাবেই সাম্রাজ্যের



জটিলেশ্বর শিবমন্দির গাত্রে শিল্প কারুকৃতি

প্রান্তীয় অংশে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভবন বা উপাসনালয় এঁরা স্থাপন করেননি। এই কারণ অবশ্য এখনও ক্রিয়াশীল। সাধারণভাবে প্রচলিত মতবাদ এই যে মন্দির-মঠ-মসজিদ-প্যাগোডা-গির্জা-দীঘি প্রভৃতি স্থাপনের মূলে থাকেন রাজা বা জমিদারগণ। প্রাচীন, মধ্য ও প্রাগাধুনিক যুগেও এই ছিল আমাদের দেশে মন্দির-মসজিদ গড়ার পটভূমিকা। ফলে দেখা যায় প্রতিবেশী কোচবিহারে পুরাকীর্তির নিদর্শন যত মেলে, জলপাইগুড়িতে তত মেলে না। অথচ সৌধ বা ইমারত গড়ার প্রাকৃতিক উপাদানের অভাব ছিল না। বিশেষত পাথরের অভাব তো ছিলই না। কারণ, হিমালয় পাহাড়ের সানুদেশেই এই জনপদ অবস্থিত। তবে মন্দিরের সংখ্যা কম হওয়ার প্রসঙ্গে স্থানীয় ইতিহাসবিদ্‌রা বলেন যে এ জেলায় প্রকৃতি উপাসকের সংখ্যা বেশি ছিল। বিশেষত চা-বাগান প্রতিষ্ঠার পরে প্রকৃতি-উপাসকের সংখ্যা বহুগুণ বেড়ে গিয়েছিল। তাই এঁরা মন্দির স্থাপনের তাগিদ অনুভব করেননি। এবং এই কারণে আজকের ডুয়ার্সেও জনসংখ্যানুপাতে দেবালয়ের সংখ্যা খুবই কম।

এবারে প্রাকৃতিক-ভৌগোলিক কারণের কথায় আসছি। এখানকার বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড জঙ্গলে পরিপূর্ণ থাকার ফলে জনবসতি তেমনভাবে গড়ে উঠতে পারেনি। বিশেষত ইংরেজ শাসনাধীনে আসার পূর্বেও ডুয়ার্স ছিল জনবিরল অঞ্চল। তাছাড়া অতিবর্ষণ এবং স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ার জন্য পুরাকীর্তি জাতীয় নিদর্শনগুলি টিকে থাকতে পারেনি। বৃষ্টি-বর্ষা-বন্যার ধারাবাহিকতা পুরাকীর্তি সম্পদের সংরক্ষণের পক্ষে ক্ষতিকর ছিল। উদাহরণস্বরূপ পুঁথি বা পাণ্ডুলিপির কথা বলতে পারি। প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতার জন্য এ অঞ্চলের পুঁথির সংগ্রহ সবই প্রায় নষ্ট হয়ে গিয়েছে। আর একটি বিষয়ের প্রতি প্রযুক্তিবিদদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সেটি হলো এ অঞ্চলে ইঁট-পাথরের ব্যবহার তুলনামূলকভাবে বিলম্বেই শুরু হয়েছিল। এটি মঙ্গোলয়েড প্রভাবের জন্য কিনা, ভেবে দেখা দরকার। কারণ, আমরা দেখেছি যে মঙ্গোলয়েড অঞ্চলের ইঁট-পাথরের চেয়ে বাঁশের-কাঠের ব্যবহার অনেক বেশি। ভিয়েতনাম থেকে জলপাইগুড়ি অবধি এই বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে বিদ্যমান ছিল একশো বছর পূর্বেও। অবশ্য ব্যতিক্রম জটিলেশ্বর শিবমন্দির। সেখানে পাথরের স্ল্যাব ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।

প্রত্নকীর্তির নিদর্শন কম হওয়ার আরো একটি কারণের কথা তুলেছেন স্থানীয় ইতিহাসবিদ্‌রা। এঁদের অনেকের ধারণা ধর্মান্তরিত কালাপাহাড় এ অঞ্চলের বহু উপাসনালয়কে ধ্বংস করেছেন। কালাপাহাড়ের কামাখ্যা মন্দির ধ্বংসের অপপ্রয়াসের কথা ইতিহাসই সাক্ষ্য দিচ্ছে। কালাপাহাড় কামাখ্যা গিয়েছিলেন এই অঞ্চলের উপর দিয়েই। অতএব এ অনুমান একেবারে যে অমূলক নয়, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। তবে এ প্রসঙ্গে আদি পর্বের ইসলাম অভিযানের প্রশ্নটিও আলোচিত হওয়া দরকার। কারণ, অন্যত্র ইসলাম অভিযানকারীরা বহু পুরা সম্পদ, বিশেষত মূর্তি ধ্বংস করেছেন। এ অঞ্চলে ইসলাম অভিযানকারীদের এই ভূমিকা নিয়ে তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা হওয়া দরকার।



জহিরি-ডাল[illegible] প্রাপ্ত মূর্তি

> বিশেষত ইংরেজ শাসনাধীনে আসার পূর্বেও ডুয়ার্স ছিল জনবিরল অঞ্চল। তাছাড়া অতিবর্ষণ এবং স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ার জন্য পুরাকীর্তি জাতীয় নিদর্শনগুলি টিকে থাকতে পারেনি। বৃষ্টি-বর্ষা-বন্যার ধারাবাহিকতা পুরাকীর্তি সম্পদের সংরক্ষণের পক্ষে ক্ষতিকর ছিল। উদাহরণস্বরূপ পুঁথি বা পাণ্ডুলিপির কথা বলতে পারি। প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতার জন্য এ অঞ্চলের পুঁথির সংগ্রহ সবই প্রায় নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

জেলার পুরাকীর্তির বিবরণ প্রতিস্থাপিত করার পূর্বে ভূখণ্ডের দূর অতীতের ও নিকট অতীতের ইতিহাস সংক্ষেপিতভাবে তুলে ধরার তাগিদ অনুভব করছি। ইতিহাস ছাড়া যেমন পুরাতত্ত্বকে বোঝা যাবে না, তেমনি পুরাতত্ত্ব ছাড়াও ইতিহাস বোঝা যাবে না। একে অপরের পরিপূরক। অন্তত অস্পষ্ট ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে। সেই অস্পষ্ট ইতিহাসের কথাতে আসছি এবার।

পুরাণ স্মৃতি-শ্রুতিগতভাবে এই ভূখণ্ডটি 'কিরাত দেশ'-এর একটি জনপদ। কিরাত জনগোষ্ঠীর নামানুসারেই সম্ভবত এই সুবৃহৎ ভূখণ্ডটি (আজকের পূর্বোত্তর ভারত) 'কিরাত দেশ' নামে পরিচিতি পেয়েছিল। মহাভারতীয় যুগে এই 'কিরাত জন'-দের কথা সর্বপ্রথম জানা যায়। রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডেও কিরাতদের পরিচয় পাওয়া যায়। গবেষকদের অনুমান এই যে কিরাত নামটি আর্যদেরই দেওয়া। ইংরেজরা এদেরকেই Indo-Mongoloid বলেছেন। দুঃখের বিষয় হলো যে বিষয়টি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ হলেও জাতীয় অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ছাড়া বিষয়টি নিয়ে জাতীয় স্তরের আর কোনো গবেষক-পণ্ডিত আলোচনা করেননি। যাই হোক রাজনৈতিক-ইতিহাসগতভাবে এই ভূখণ্ডটির একটি সর্বভারতীয় নাম ছিল। এবং এই নামেই এটি সমধিক পরিচিত ছিল। এটি হলো প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর এবং পরে কামরূপ। এই সর্বভারতীয় নাম ছাড়াও আঞ্চলিক নামেরও প্রচলন ছিল। তন্ত্রসাহিত্যের সূত্রানুযায়ী বর্তমান জলপাইগুড়ি রত্নপীঠের অংশ ছিল।

কেন্দ্রীয় শক্তির পাশাপাশি আঞ্চলিক শক্তির উল্লেখ পাই স্কন্দ পুরাণে। এই পুরাণে রাজা জল্প বা জল্পেশ্বর এবং পৃথুরাজার পরিচয় জানা যায়। প্রথমজন খ্রীষ্টীয় প্রথম কী দ্বিতীয় শতাব্দীর, দ্বিতীয়জন নবম-দশম শতাব্দীর বলে ঐতিহাসিকদের অনুমান। অবশ্য পরবর্তীকালে রচিত 'যোগিনীতন্ত্রে'ও জল্পেশ রাজার উল্লেখ আছে। জল্পেশ রাজা বা জল্পেশ্বর রাজা কিংবদন্তী বা ঐতিহাসিক যাই হোন না কেন, এ ভূখণ্ডের মানুষ রাজা জল্পেশ্বরকে আপনার জন হিসেবে ভাবেন। এই প্রসঙ্গে সতীনাথ ভাদুড়ীর 'গণনায়ক' গল্পের একটি সংলাপের কথা উল্লেখ করতে পারি। একজন রাজবংশী পুরোহিত বলছেন 'বাপ-পিতামর আমল থেকে আমরা রয়েছি বজরগাঁও, পাকিস্তানে চলে গেলেই হল? জল্পেশ্বরের এলাকা মহাকালের রাষ্ট্র, চলে যাবে পাকিস্তানে?'

বজরগাঁও হচ্ছে অবিভক্ত জলপাইগুড়ি জেলার তেঁতুলিয়া থানার একটি গ্রাম। সচেতন পাঠক লক্ষ করবেন মহাকাল শব্দটি। স্থানীয় অধিবাসীরা এই অঞ্চলটিকে বা জল্পেশ্বরের রাজা বা মহাকালের রাজা বলে জানেন। মহাকাল উত্তরবঙ্গ, সিকিম, ভুটান ও নেপালে জাতীয় দেবতা হিসেবে মর্যাদা পেয়ে থাকেন। আমরা সকলেই জানি শিবের আর এক নাম মহাকাল। জলপাইগুড়ি জেলার এখনও একটি চালু প্রবাদ হলো জলপাইগুড়ি তিনটি ঈশ্বরের দেশ—জল্পেশ্বর, জটিলেশ্বর, বটেশ্বর। তবে জল্পেশ্বরকে কামতা রাজ্যের রাজা হিসেবে বর্ণনা করেছেন প্রাচীন মনসা মঙ্গল কাব্যের রচয়িতা কবি মনকর ও দুর্গাবর। এঁরা লিখেছেন :

কামতাহির রাজা বন্দো রাজা জল্পেশ্বর।
একশত মহিষী বন্দো অঠার কুমর ॥



নল রাজার গড়



নলরাজার গড়

অর্থাৎ কামতার রাজা জল্পেশ্বরের একশত মহিষী ও আঠারো কুমারের উল্লেখ আছে। অন্যদিকে ষোড়শ শতকের কোচবিহারে কোচ রাজবংশের উত্থানের সমসময়েই এখানে রায়কত বংশের আবির্ভাব হয়। এবং এই অঞ্চলে বৈকুণ্ঠপুর রাজ্যের পত্তন করেন। অর্থাৎ তন্ত্রসাহিত্যের রত্নপীঠ, জনশ্রুতির জল্পেশ্বর রাজা ষোড়শ শতকে এসে বৈকুণ্ঠপুর রাজা হলো। এই নামে এখনও রাজস্ব বিভাগ এবং বনবিভাগ আছে। কিন্তু এই অঞ্চল কবে জলপাইগুড়ি হলো তা এখনও অনাবিষ্কৃত। জলপাইগুড়ি নয়, তবে Jellypygaurie-র নাম প্রথম পাওয়া যায় ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ১৭৩৩ সালের একটি নথিতে। জলপাইগুড়ি জেলা সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে জলপাইগুড়ি নামীয় প্রশাসনিক অঞ্চলটি রংপুরের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৮৬৯ সালের ১ জানুয়ারি রংপুরের অংশে এবং পশ্চিম ডুয়ার্স নিয়ে আজকের জলপাইগুড়ি জেলার সৃষ্টি। কিন্তু ১৮৬৯ সালের জলপাইগুড়ি জেলার পরিসীমা ১৯৪৭ সালে জেলা বিভাজনের ফলে সঙ্কুচিত হয়েছে। জেলার পাঁচটি বর্ধিষ্ণু থানা, যা পুরাতত্ত্ব সম্পদে সমৃদ্ধ ; তা পাকিস্তানে চলে গিয়েছিল। এগুলি হলো বোদা, পাটগ্রাম, দেবীগঞ্জ, তেঁতুলিয়া ও পচাগড় বা পঞ্চগড়। এই প্রত্নসমৃদ্ধ থানা পঞ্চক এখন বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত। এই খণ্ডিত জলপাইগুড়ি জেলার পুরাকীর্তির একটি খসড়া পরিচায়ন এখানে উপস্থাপন করছি।

জলপাইগুড়ি জেলার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলোর অবস্থান অনুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে অধিকাংশ নিদর্শনই সদর মহকুমাতে অবস্থিত। সদর মহকুমার মধ্যে আবার ময়নাগুড়ি ও সদর থানাতেই বেশি সংখ্যক পুরাকীর্তির নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু কেন ময়নাগুড়ি অঞ্চলে পুরাকীর্তির আধিক্য, সে সম্পর্কে কোনো গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা এখনও গবেষকরা দিতে পারেননি। একটা সম্ভাব্য ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে। সেটি হলো জল্পেশ্বর রাজাকে যদি ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে ইতিহাসবিদ্‌রা গ্রহণ করেন, তাহলে সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। অর্থাৎ রাজা জল্পেশ্বরের রাজধানী বৃহত্তর ময়নাগুড়ির কোনো অঞ্চলে নিশ্চয়ই ছিল; যদিও রাজধানীর কোনো ভগ্নাবশেষ পাওয়া যায়নি। অতএব পুরাতন ধ্বংসস্তূপের উৎখনন ছাড়া এ বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলা অনৈতিহাসিক মন্তব্য হবে। যাই হোক পূর্বেই উল্লেখ করেছি এখানে কোনো শিলালিপি পাওয়া যায়নি। তবে মালবাজার থানার হায় হায় পাথার অঞ্চলে মোগলযুগের একটি মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে বলে সেন্সাস বিশারদ অশোক মিত্র উল্লেখ করেছেন। এছাড়া কয়েক বছর পূর্বে আলিপুরদুয়ারের অদূরে পেস্টারঝাড় অঞ্চলে এক কলস স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু এটি কোন সময়ের মুদ্রা, তা বিস্তৃতভাবে জানা যায়নি।

গড় :

পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন হিসেবে সর্বাগ্রে গড় বা দুর্গের কথাই বলতে হয়। যে দুর্গ বা গড়টি প্রত্নগবেষকদের নিকট অপার বিস্ময় হিসেবে পরিগণিত হয় এখনও, তা হলো নল রাজার গড়। এটি স্থানীয় নাম। আসল নাম নর রাজার গড়। কাগুজে নাম মেন্দাবাড়ির গড়। আর ইংরেজরা বলেন 'চেচা কোটার গড়'. চিলাপাতার বনাঞ্চলে এটি অবস্থিত। প্রত্নগবেষকদের একাংশের অনুমান, এটি কোচবিহারের মহারাজা নরনারায়ণ নির্মাণ করেছিলেন। ইটের প্রাচীর দিয়ে দুর্গটি ঘেরা। দুর্গটি স্থানীয় একটি নদী—বানিয়াদহ দিয়ে ঘেরা। দুর্গটি স্থানীয় একটি নদী—বানিয়াদহ দিয়ে বড় নদীর সঙ্গে যুক্ত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের

জলপাইগুড়ি জেলার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলোর অবস্থান অনুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে অধিকাংশ নিদর্শনই সদর মহকুমাতে অবস্থিত। সদর মহকুমার মধ্যে আবার ময়নাগুড়ি ও সদর থানাতেই বেশি সংখ্যক পুরাকীর্তির নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু কেন ময়নাগুড়ি অঞ্চলে পুরাকীর্তির আধিক্য, সে সম্পর্কে কোনো গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা এখনও গবেষকরা দিতে পারেননি।

অধিকর্তা ও বিশিষ্ট প্রত্নতত্ত্ববিদ পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত এই দুর্গ নিয়ে 'অরণ্য ছায়ার দুর্গে' শিরোনামে একটি তথ্যনির্ভর গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। তবে এটি নরনারায়ণই তৈরি করেছিলেন কিনা, তা নিয়ে সংশয় আছে। এই দুর্গের চত্বরে বড় বড় পাথরের স্ল্যাব পাওয়া গিয়েছে। তবে দুর্গটির যাবতীয় বৈশিষ্ট্য ষোড়শ শতাব্দীর দুর্গের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত। এটির পূর্ণাঙ্গ উৎখনন হলে জেলা তথা এই জনপদের ধূসর ইতিহাসের একটি মিসিং লিংক (Missing link) খুঁজে পাওয়া যাবে বলে স্থানীয় প্রত্নবিদদের ধারণা।

দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য গড়টি সদর মহকুমার চাউলহাটি থানার গড়ালবাড়ি জনপদে অবস্থিত। এটি 'পৃথুরাজার গড়' নামে পরিচিত, আবার 'ভিতর গড়' দুর্গ নামেও পরিচিত। এই গড়ের সিংহভাগই বর্তমান বাংলাদেশের পঞ্চগড় বা পচাগড় (অখণ্ড জলপাইগুড়ি জেলার থানা) জেলার ভিতর অবস্থিত। পাঁচটি গড়ের অস্তিত্ব ছিল বলে এ জনপদের নাম হয়েছিল পঞ্চগড়। ভিতর গড় ছাড়া বোদেশ্বরী গড়, মীরগড় ও হোসেন গড় নামক আরও তিনটি গড়ের চিহ্ন দেখা যায়। কোচবিহারের ইতিহাসপ্রণেতা খান চৌধুরী আমানতউল্লা আহমদ মন্তব্য করেছেন যে কামরূপের রাজা দেবেশ্বরের বংশজাত পৃথু এই গড় নির্মাণ করেছিলেন। ইনি পশ্চিম কামরূপে রাজত্ব করতেন। জলপাইগুড়ির দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত 'ভিতর গড়' এই রাজার রাজধানী ছিল। তবে ডক্টর বুকানন হ্যামিল্টনের মতে এই দুর্গ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে অথবা ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমে তৈরি হয়েছিল। এ দুর্গের সঙ্গে কামতাপুর রাজ্যের দুর্গের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। তবে দুজনের কারো মতই নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। তবে সম্প্রতি এ অঞ্চল থেকে পাল-সেন যুগের কিছু ধাতুর মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। এগুলিকে ভূখণ্ডের প্রাচীনত্বের প্রতীক বলে অনেকে মনে করেন। এছাড়া এখানে প্রচুর ইট পাওয়া গিয়েছে এবং যাচ্ছে। বেশিরভাগ ইটের আয়তন ১০ × ১০ × ২১/২ ইঞ্চি। ইটগুলি বেশ প্রাচীন। এটি যে প্রাক্-মুসলিম পর্বের জনপদ, সে বিষয়ে কোনো বিতর্কের অবকাশ নেই।

এছাড়া আলিপুরদুয়ার মহকুমার শামুকতলা ও বড় চৌকি অঞ্চলেও গড়ের ধ্বংসাবশেষ দেখা দিয়েছে। লোকশ্রুতি এই যে প্রথমটি ইংরেজরা ও দ্বিতীয়টি কোচবিহারের মহারাজা নরনারায়ণ নির্মাণ করেছিলেন।

জেলার ভুটান সীমান্ত লাগোয়া বক্সাদুয়ার জনপদের বক্সা ফোর্ট বা দুর্গটি কাদের তৈরি, তা এখনও জানা যায়নি। অনেকের ধারণা দুর্গটি মোগলরা তৈরি করেছিল। পরে ভুটান এটি দখল করে নিয়েছিল। কিন্তু এই ধারণা সঠিক নয়। বর্তমান প্রবন্ধের লেখক এই দুর্গের কাঠামো বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে এটি ভুটিয়াদেরই তৈরি দুর্গ। মোগল দুর্গের সঙ্গে এই দুর্গের কাঠামোর কোনো মিল নেই। এই দুর্গটিকে সংস্কার করে ইংরেজ সরকার ১৯৩০ সালে এটিকে স্বাধীনতা আন্দোলনদের কারাবাসে পরিণত করেছিলেন। এই দুর্গ-পরিবর্তিত বন্দিশালাকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার জাতীয় স্মারক হিসেবে মর্যাদা দিয়েছেন।

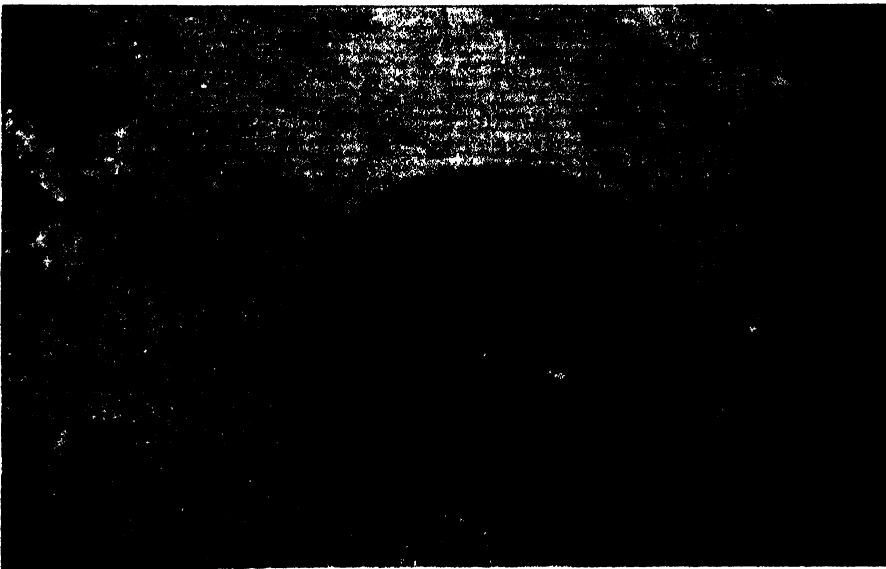
ঢিপি বা ঢিবি :

জেলার বিভিন্ন প্রান্তে বেশ কয়েকটি ঢিবির ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছে। জলপাইগুড়ি শহরের উপকণ্ঠে মোহিতনগরের জোড়া দীঘির কাছে দুটি ঢিবি দেখা যায়। এগুলি পালযুগের বলে অনুমান করা হয়ে থাকে।

বেরুবাড়ি অঞ্চলের বোনাপাড়াতেও ঢিবির সাক্ষাৎ পাওয়া গিয়েছে। দশ দরগাতেও ঢিবি রয়েছে। আসলে এ সব নিয়ে ঐতিহসিক দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো আলোচনাই শুরু হয়নি। ফলে সঠিকভাবে কিছু বলাও কঠিন।

মন্দির :

গ্লেফিয়ারের রংপুর বিবরণীতে এবং গ্রুনিং-এর জলপাইগুড়ি জেলা গেজেটিয়ারে এই জেলার একটিমাত্র মন্দিরের উল্লেখ আছে। সেটি হলো জল্পেশ। আসলে এই গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয়েছিল বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে। তাই অন্য মন্দিরগুলির বিবরণ ওই গ্রন্থদ্বয়ে স্থান পায়নি। যাই হোক জলপাইগুড়ি শহর থেকে প্রায় ১২ মাইল দূরে অবস্থিত উত্তরবঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ শৈব তীর্থস্থান জল্পেশ মহাপীঠ। মন্দিরে যে শিব প্রতিষ্ঠিত তাঁর কোনো মূর্তি নেই, তিনি অনাদি লিঙ্গ। জল্পেশ মন্দির বহু আলোচিত তীর্থস্থান। ভারত সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের মহাঅধিকর্তা এস এস ভাটস থেকে জননেতা লেখক উপেন্দ্রনাথ বর্মণ পর্যন্ত অনেকেই এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রতিষ্ঠাকাল সম্পর্কে নানাতর মত প্রকাশ করেছেন। শেষ সিদ্ধান্ত আজও হয়নি। তবে প্রত্নতত্ত্ববিদ ভাটসের মতই বেশি গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে। তিনি বলেছেন মূল মন্দিরটি দ্বাদশ শতাব্দীতে নির্মিত হয়েছিল। অনেকে মনে করেন যে যোগিনীতন্ত্রের রাজা জল্পেসরই



জল্পেশ মন্দিরের অভ্যন্তরে শিবলিঙ্গ



বটেশ্বর মন্দিরের ভগ্নস্তূপ

এই মন্দিরের আদি প্রতিষ্ঠাতা। তাঁরই নামানুসারে সম্ভবত মন্দিরটির নামকরণ হয়েছিল। অসমীয়া ঐতিহাসিকরা অবশ্য মনে করেন যে ভিতর গড়ের পৃথু রাজারই অপর নাম জল্পেশ্বর এবং মন্দিরটি তিনিই নির্মাণ করেছিলেন। সম্ভবত লক্ষণাবতীর খলজি মালিকের তিব্বত অভিযানের পর এই দেবদেউলটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। পরে কোচবিহারের মহারাজা প্রাণনারায়ণ (১৬৩২—৬৫ খ্রিঃ) বর্তমান জল্পেশ মন্দির পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। মন্দির নির্মাণের জন্য তিনি উত্তর ভারত তথা দিল্লি থেকে মুসলমান স্থপতিদের নিয়ে এসেছিলেন। বর্তমান মন্দিরটির নির্মাণকাজ আরম্ভ হয়েছিল ১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দে। মহারাজা প্রাণনারায়ণের পৌত্র এই মন্দিরের নির্মাণকাজ সমাপ্ত করেছিলেন। এই দ্বিতল মন্দিরটি ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দের ভয়াবহ ভূমিকম্পে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। পরে অবশ্য এটার সংস্কারসাধন করা হয়েছিল।

মন্দিরময় ময়নাগুড়ির দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য মন্দির হলো পূর্বদহের জটিলেশ্বর মন্দির। এই মন্দিরটির আদি অংশের গঠনশৈলী যে কোনো প্রত্নসচেতন ব্যক্তির নিকটই বিশেষ কৌতূহলের বিষয়। কারণ, এ অঞ্চলে ঠিক এই ধাঁচের মন্দির দ্বিতীয়টি নেই। এই মন্দিরের নির্মাণশৈলী হিন্দু মন্দির নির্মাণ শৈলীর চরম উৎকর্ষতা লাভের পূর্বেই তৈরি হয়েছিল বলে কেউ কেউ অনুমান করে থাকেন। মন্দিরের পূর্ব দিকে এক বিশাল দীঘি। পাথরের তৈরি ভগ্ন মন্দিরটি উঁচু ঢিপির উপর প্রতিষ্ঠিত। ভগ্নপ্রায় এই মন্দিরের দেওয়ালভাগে অলংকরণের কিছু নমুনা এখনও বর্তমান। তাদের মধ্যে উল্লেখনীয় হলো নানা ভঙ্গিমায় কয়েকটি নারীমূর্তি, নৃত্যরত গণপতি প্রভৃতি। তবে সংখ্যায় নারীমূর্তিই বেশি। মন্দির সংলগ্ন দীঘি থেকে চতুষ্কোণ (৫১/২ × ৫১/২) একটি বিষ্ণু পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছে। দ্বাদশ শতাব্দীর ওই বিষ্ণুগর্ভে একদিকে পদ্মাসনে আসীন বিষ্ণুমূর্তি, অন্যদিকে বিষ্ণুর দশ অবতারের প্রতিকৃতি বৈষ্ণব ধর্মের গরিমা সোচ্চারিত করছে। সুখের বিষয় ভারত সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগ মন্দিরটিকে পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

জড়দা নদীর পশ্চিমপাড়ের মাধবডাঙার বটেশ্বর মন্দির জেলার স্থাপত্যকলার ক্ষেত্রে এক বিশেষ স্থান দখল করে আছে। বর্তমানে মন্দিরটি শিখর সমেত সম্পূর্ণ ভগ্ন এবং মন্দির সংলগ্ন এলাকাটি একটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকাল সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা না গেলেও মন্দির সংলগ্ন এলাকা থেকে যে সমস্ত ভগ্নাংশ পাওয়া গিয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'অস্তমঞ্জরী'। অস্তমঞ্জরীর গঠনশৈলী বিশ্লেষণ করে কোনো কোনো শিল্প সমালোচক মন্তব্য করেছেন যে বটেশ্বর মন্দির আসমের গুয়াহাটির কামাখ্যা মন্দিরের স্থাপত্যশৈলীর অনুরূপ। যাই হোক বটেশ্বর মন্দিরের মধ্যে অহোম স্থাপত্যরীতির কিছু প্রভাব যে পড়েছিল, তা মেনে নিতেই হয়।

নিউ ময়নাগুড়ি রেলস্টেশনের প্রায় চার মাইল পূর্বে অবস্থিত সোদরখইয়ের মন্দির। ছোট্ট মন্দিরটি পাথরের তৈরি এবং পরিকল্পনায় বটেশ্বর মন্দিরের সঙ্গে খুব মিল আছে। তিনটি মূল অংশ—মণ্ডপ, অন্তরাল ও গর্ভগৃহের সার্থক সমন্বয়ে মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল। বর্তমানে মন্দিরটি ধ্বংসপ্রাপ্ত ও তার সংলগ্ন এলাকাটি ঘন জঙ্গলে ঢাকা পড়ে গিয়েছে। এই সব প্রধান মন্দির ছাড়াও রয়েছে বেঙকান্দির পেটকাটির মন্দির, ধুমবাবার মন্দির প্রভৃতি।

জলপাইগুড়ি শহরের প্রাচীনতম মন্দিরগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো রাজবাড়ির বৈকুণ্ঠনাথ মন্দির। কেউ কেউ মনে করেন যে এটি চতুর্দশ রায়কত সর্বদেব (মৃত্যু ১৮৪৮ খ্রিঃ) নির্মাণ করেছিলেন। ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে মন্দিরটি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। ১৮৯৮ সালে এটি পুনর্নির্মিত হয়েছিল। পাণ্ডাপাড়ার কালীমন্দিরটি কোচবিহারের মহারাজা রূপানারায়ণ (১৬৯৩—১৭১৪) স্থাপন



জল্পেশ শিব মন্দির

করেছিলেন বলে অনেকে অনুমান করে থাকেন। মাষকলাইবাড়ির শ্মশানকালী মন্দির কামরূপ শাসনের আমলেই ছিল বলে অনুমান করেছেন বিশিষ্ট গবেষক ডাঃ চারুচন্দ্র সানাল। যোগমায়া কালীবাড়ি ও দিনবাজার কালীবাড়ি সম্পর্কেও তাঁর মত—এগুলি হল বহুকাল পূর্বের।

শহরের উপকণ্ঠের ধাপগঞ্জের ধাপচণ্ডীর মন্দিরটি হোসেন শাহের আমলের পূর্বেই স্থাপিত হয়েছিল বলে জনশ্রুতি। এই মন্দির ধ্বংস হওয়ার কারণ সম্পর্ক ডাঃ চারুচন্দ্র সানাল তাঁর 'The Rajbanshis of North Bengal' গ্রন্থে লিখেছেন 'It is said that the temple was destroyed by the Mohamedans at the time of Hussain Shah when he invaded Baikunthapur.' বর্তমানের ক্ষুদ্র মন্দিরটি অবশ্য নির্মিত হয়েছিল ১৯৫৫ সালে।

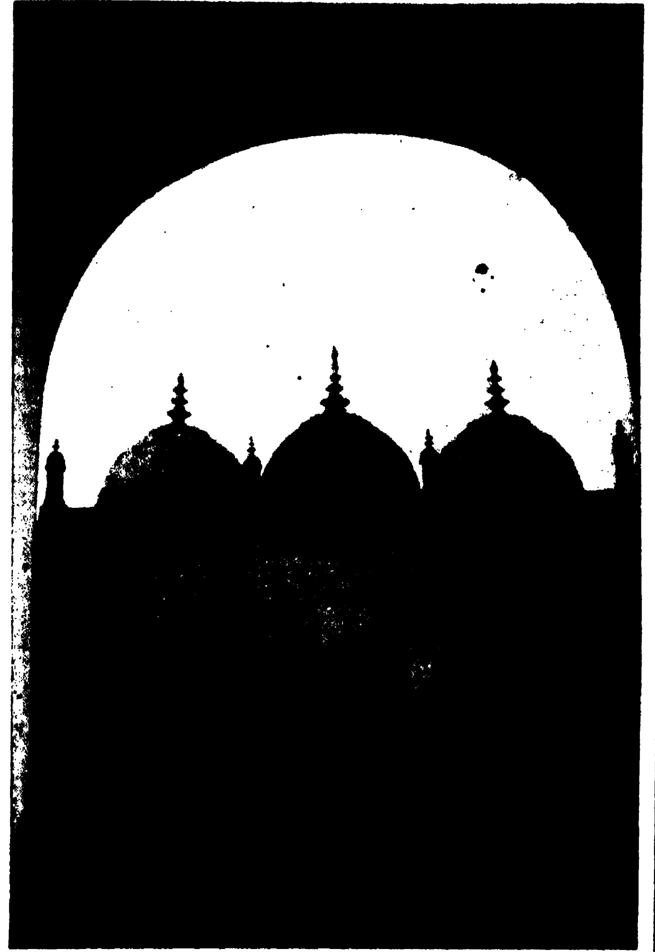
জলপাইগুড়ি শহর থেকে ১৬ মাইল দূরে বেলাকোবা রেল স্টেশনের উপকণ্ঠে ও বৈকুণ্ঠপুর বনাঞ্চলের উপান্তে শিকারপুর চা-বাগান অঞ্চলের প্রসিদ্ধ স্থান সন্ন্যাসীর হাট বা সন্ন্যাসীকাটা। কোনো এক সন্ন্যাসীর নামানুসারেই নাকি এই নাম। এই সন্ন্যাসী ভবানী পাঠক নামেই সমধিক পরিচিত। এই হাটের সামনে বেশ একটু স্থান জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে সন্ন্যাসী ঠাকুরের মন্দির। মন্দিরটি দেখতে অনেকটা প্যাগোডার মতন। আসলে এ অঞ্চলের অধিকাংশ মন্দিরেই প্যাগোডার ছাপ দেখা যাবে। বিশিষ্ট গবেষক ডঃ ইউ এন বিশ্বাস ক্ষেত্রীয় সমীক্ষা করে দেখিয়েছেন যে এ অঞ্চলের অধিকাংশ মন্দিরই প্যাগোডার ধাঁচে তৈরি। তাঁর কারণ হলো এ অঞ্চলের মানুষ এককালে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হয়ে পড়েছিলেন। তাই এ অঞ্চলের মন্দির কারিগরদের অবচেতন মনে বৌদ্ধ প্যাগোডার প্রভাব রয়েছে বলে ডঃ বিশ্বাস মনে করেন। যাই হোক এই মন্দিরটি কে তৈরি করেছিলেন, তা অবশ্য সুস্পষ্ট নয়। তাবে লোক ঐতিহাসিক নির্মলচন্দ্র চৌধুরীর মতটি সর্বাধিক যুক্তিগ্রাহ্য। তিনি বলেছেন 'কিংবদন্তী যাই হোক, প্রথম রায়কত শিষ্য সিংহের আমলে তৈরি মন্দিরটি পরবর্তীকালে স্কট বা হাচিংস সাহেবের অর্থানুকূল্যে পুনর্নির্মিত হয়েছিল, এইটিই যেন স্বাভাবিক বলে মনে হয়।'

মেটেলির কালীমন্দিরের বয়স প্রায় ১৩ বছর। মন্দিরটির শৈল্পিক মূল্য খুব বেশি নেই, কিন্তু মূর্তিটির মূল্য অসাধারণ।

মসজিদ :

জলপাইগুড়ি জেলার সুপ্রাচীন মসজিদ কোনটি তা সঠিকভাবে বলা কঠিন। তবে শহরের ৪ নং ঘুমটির মসজিদটি যে বেশ প্রাচীন তাতে সন্দেহ নেই। জনশ্রুতি এই যে প্রায় ১৫৩ বছর পূর্বে দীনু গোমস্তা নামক একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান এই মসজিদটির সংস্কার করেছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁর জামাতা দানবীর মুন্সী সোনাউল্লা সংস্কারকার্য সমাপ্ত করেছিলেন। এই মসজিদটি 'পুরাতন মসজিদ' নামেই সবিশেষ পরিচিত। মসজিদের পাশে একটি দীঘিও আছে। এ ছাড়া আছে সোনাউল্লার 'মাজার'।

শহরের নবাব বাড়ির মসজিদটিও পুরনো। এই মসজিদের গায়ে প্রোথিত একটি শিলালিপি থেকে জানা যায় যে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে, বাংলা ১২৯২ সালে বা হিজরি ১৩০৩ সালে খান বাহাদুর রহিম বক্স মসজিদটি তৈরি করেছিলেন।



কালু সাহেবের মসজিদ, ৪ নং ঘুমটি — *ছবি : শৌভিক ঘোষ*

জেলা অপর মহকুমা শহর আলিপুরদুয়ার, ফালাকাটা অঞ্চলেও বেশ কিছু প্রাচীন মসজিদের সাক্ষ্য পাওয়া গিয়েছে। আলিপুরদুয়ার জংশন রেল স্টেশনের কাছে একটি প্রাচীন মসজিদের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু এর নির্মাতা কে ছিলেন, তা এখনও সঠিকভাবে জানা যায়নি। আলিপুরদুয়ার শহর থেকে কয়েক মাইল দূরে সলাসলাবাড়ি অঞ্চলে মজিদখানা গ্রামে একটি প্রাচীন মসজিদের কথা স্যান্ডার্স সাহেব তাঁর সেটেলমেন্ট রিপোর্টে লিখে গিয়েছেন। এই স্থানটির নামের সঙ্গে একটি ছড়াও প্রচলিত আছে।

চাঁদ কায়েত ভেলা কায়েত হুজুরেতে থানা।
বেটা নাই পুত্র নাই কান্দে মজিদখানা ॥

ফালাকাটার হাটখোলার নিকট যে মসজিদটি আছে, তা প্রায় দুশো বছরের প্রাচীন বলে অনুমান করা হয়ে থাকে।

গির্জা :

এ জেলার প্রথম গির্জাটি ১৮৮২ সালে জলপাইগুড়ি শহরের রেসকোর্স অঞ্চলে স্থাপিত হয়েছিল। এই গির্জাটিতে শুধুমাত্র ইউরোপীয়রাই উপাসনা করতেন। ভারতীয় খ্রিস্টানদের জন্য ১৮৯৬ সালে শহরে আরও একটি গির্জা স্থাপিত হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে দুটি গির্জাই প্রোটেস্টান্ট খ্রিস্টানদের



ব্যাপটিস্ট চার্চ, রেসকোর্স পাড়া *ছবি : শৌভিক ঘোষ*

জন্য নির্মিত হয়েছিল। তবে দ্বিতীয়টি ভারতীয় খ্রিস্টানদের জন্য হয়েছিল। অন্যদিকে আলিপুরদুয়ারের খ্রিস্টান আদিবাসীদের জন্য উনিশ শতকের একেবারে শেষে রায়ডাক-গদাধর নদের মধ্যবর্তী সাঁওতাল কলোনিতে একটি গির্জা স্থাপিত হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে।

মূর্তি :

জলপাইগুড়ি জেলায় যে প্রাচীন মূর্তিগুলি আবিষ্কৃত হয়েছে, দু-একটি বাদ দিলে দেখা যাবে, সবগুলিই কষ্ঠিপাথরের। কেবল পাহাড়পুর থেকে প্রাপ্ত মনসা মূর্তি ব্রোঞ্জের এবং জল্পেশে প্রাপ্ত গণপতি মূর্তি বেলেপাথরের। এই মূর্তিগুলি অধিকাংশই পাল যুগের নিদর্শন। ভিতরগড় থেকে প্রাপ্ত চণ্ডি, তালমায় প্রাপ্ত নারায়ণ, জয়পুর চা-বাগানের মনসা—এই কয়েকটি মূর্তিকে সেন যুগের নিদর্শন বলে ধরা হয়। কেঙিরপাড়ায় আবিষ্কৃত জাঙ্গুলী মূর্তিটি বৌদ্ধ প্রভাবিত জহিরী গ্রামেও ধাতু নির্মিত অপূর্ব এক মূর্তি সংগ্রহের কথা জানা গিয়েছে।

জেলার বিভিন্ন অংশে আরো অনেক মন্দির ও মসজিদ—ঐতিহাসিক নিদর্শন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। তবে সেগুলি সম্পর্কে লিখিত ইতিহাসের অভাবের জন্যই আলোচনা করা থেকে বিরত থাকলাম।

সূত্র নির্দেশ

১। জলপাইগুড়ি জেলা শতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ—সম্পাদনা, ডঃ রেবতীমোহন লাহিড়ী।

২। উত্তরবঙ্গের পুরাকীর্তি—সম্পাদনা ; বিশ্বনাথ দাস।

৩। মধুপর্ণী জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা—সংখ্যা সম্পাদক, ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ, সম্পাদক, অজিতেশ ভট্টাচার্য।

৪। পশ্চিমবঙ্গের পুরাকীর্তি—রামরঞ্জন দাস।

৫। দেব দেউলের দেশ জলপাইগুড়ি—বীরেন্দ্রপ্রসাদ বসু।

৬। উত্তরবঙ্গ—চোমং লামা (বিমল ঘোষ)

৭। বাঙলাদেশের প্রত্নসম্পদ—আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া।

৮। কিরাতভূমি, জলপাইগুড়ি জেলা ১২৫ বর্ষ।
বিশেষ জেলা সংকলন—সম্পাদনা, অরবিন্দ কর।

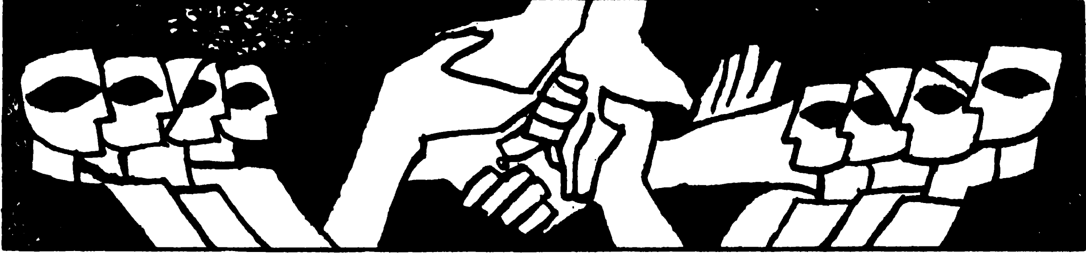
৯। জলপাইগুড়ি জেলার প্রত্নকীর্তি—খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, দেশ, ৩৯ বছর, ১০ সংখ্যা।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : ডঃ গিরিজাশংকর রায়, প্রদীপ বাগচি, পার্বতীপ্রসাদ চোংদার, ডঃ ইছামুদ্দিন সরকার, বৈশালী সরকার, ভবেশচন্দ্র বর্মণ।

❑ ইতিহাসের অধ্যাপক, গবেষক ও প্রাবন্ধিক



বৈকুণ্ঠপুররাজ সর্বদেব নির্মিত দেড়শত বছরের প্রাচীন শিবমন্দির

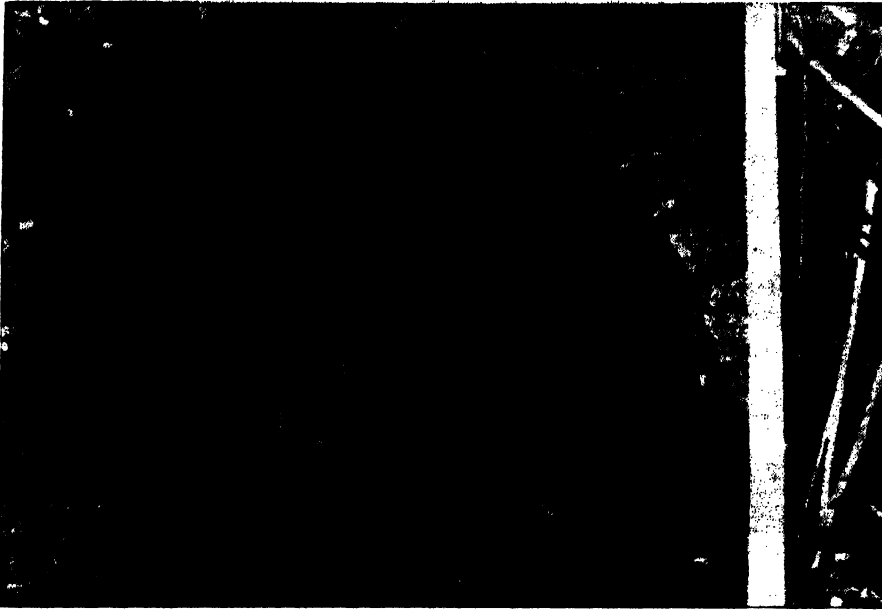


সুনীল চক্রবর্তী

ঐতিহাসিক উপাদান ও দলিল চিত্রে জলপাইগুড়ি জেলা

পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলির মধ্যে জলপাইগুড়ির একটা প্রকৃতিগত বিশিষ্টতা রয়েছে। চির সবুজের দেশ এই জেলা। পাহাড়-নদী-বন আর দিগন্ত বিস্তার সমতলে এর রয়েছে বৈচিত্র্যের সমারোহ। পাহাড় মালভূমি এখানে মিশেছে হিমালয়ের পদতলে। শ্বাপদসঙ্কুল ভয়াল অরণ্যে রয়েছে বন্যপ্রাণীর একচ্ছত্র অধিকার। এর বনবনী বুনোফুল আর চিত্রিত অর্কিডের মদির গন্ধে মাদকতা সৃষ্টি করে। সরীসৃপের নিঃশব্দ চলাফেরা পাখির ডাক আর ঝিঁঝিঁপোকার সুরেলা আওয়াজ এর অরণ্য স্তব্ধতাকে আরও তীব্র ও অপার্থিব করে রাখে। শীতে শীর্ণ মৃত পাথুরে কঙ্কাল আর বর্ষায় বেগবতী-প্রলয়ংকরী এর পাহাড়ী ঝোরা আর নদীগুলি। একদিকে হিমেল হাওয়ার হাড় কাঁপানো শৈত্য প্রবাহ— অন্যদিকে ঝঞ্ঝা বৃষ্টিমুখর উষ্ণ আর্দ্র বর্ষা—এই দুই ঋতুর এখানে চক্রাকার আবর্তন। একদা নানা আধি-ব্যাধিতে এর পরিবেশ ছিল জর্জর। জীবন এখানে সহজ প্রতিষ্ঠা পায়নি। নিরন্তর প্রতিকূল পরিমণ্ডলে বেঁচে থাকার জন্য মানুষকে সংগ্রাম করতে হয়েছে। শতাব্দীর পড় শতাব্দী ধরে উর্বরা সমতল আর বন কেটে বসতির আসায় ঘটেছে নানা বর্ণগোষ্ঠীর মানুষের অবিরাম আগমন আর রক্তের মিশ্রণ। রক্তকৌলীন্যের গর্ব এখানে কারও নেই। মহাভারতীয় যুগ থেকে বৃহৎ ভারতীয় সংস্কৃতির স্রোতে নামে গোত্রে এরা এক হয়ে মিশে গেছে। এ মিলন প্রক্রিয়া আজও অব্যাহত।

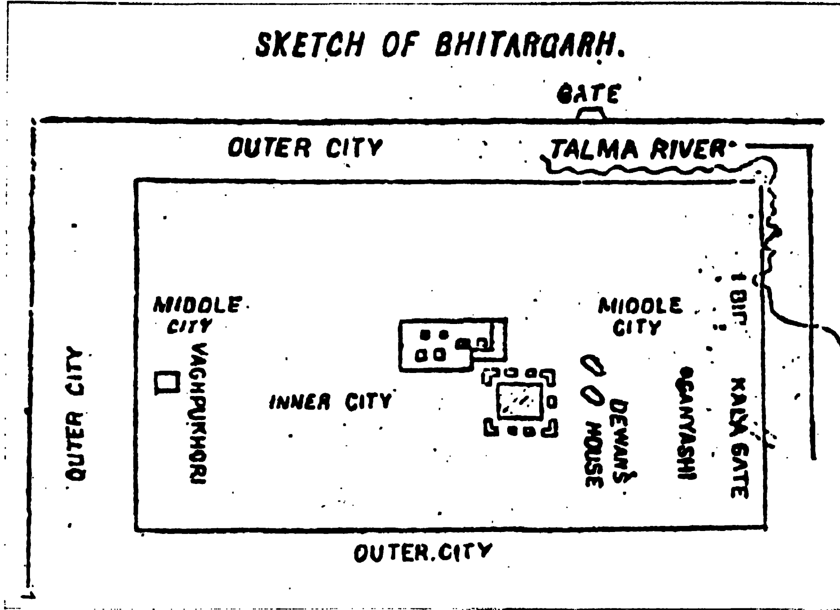
এ জনপদের দূরঅতীতের ইতিহাস আজও অকথিত। প্রলয়ংকরী ঝঞ্ঝা ও বন্যায় নদীপথের পরিবর্তনে প্রজন্মের পর প্রজন্মের সভ্যতা সম্পদকালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। এর অতীত বিবরণ অজানা। একালের একটি বিবরণ অতীতকে তাৎপর্যময় করতে পারে। ১৮১০-এ ফ্রান্সিস বুচানন হ্যামিলটন তার অ্যাকাউন্ট অব দি ডিস্ট্রিক্ট অব রংপুর-এর বিবরণে এমনই একটা ঘটনার কথা লিখতে যেয়ে বলেছেন বাংলা ১১৯৪, তার ১৮০৯-এর বিবরণ লেখার ২০ বৎসর আগে



লনরাজার গড়

তিস্তার প্লাবনের সঙ্গে প্রবল ঝড়ের মহাপ্রলয় তিস্তার গতিপথের পরিবর্তন ঘটিয়েছিল যা তার হিসাবে এই জনপদের অর্ধাংশ মানুষ ও পশুকে নিশ্চিহ্ন করেছিল। এই ঘটনার প্রেক্ষাপটে ডঃ চারুচন্দ্র সান্যাল তাঁর তিস্তা-করতোয়ার রূপরেখা প্রবন্ধে ৬৩০ খ্রিঃ চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং, ১৫৫০-এ বইবস ও ভিনেল দুই ফরাসি ভ্রমণকারী, ১৬৬০-এ জার্মানির ডেনব্রুক, ১৬৬৬ টেভর্নিয়ের বিবরণ, ১৭৭২ সনে বোল্ট-এর তৈরি মানচিত্র, ১৭৭৯ সনে রেনেলের তৈরি মানচিত্র এবং ১৭৭০-৭৯ ফারমিনজার বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট রেকর্ড প্রথম খণ্ডে বর্ণিত তিস্তার গতিপথ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন ১৭৮৭-র পূর্বে তিস্তা ও করতোয়া পাহাড়ের উপর এক নদী ছিল। একসঙ্গে গঙ্গা হয়ে সমুদ্রে পড়ত। ডঃ সান্যাল লিখছেন যে ১৭৮৭ সনে বুকানন কথিত প্লাবনের সঙ্গে সম্ভবত বিরাট ভূমিকম্পও হয়েছিল অথবা পাহাড়ে ভয়াবহ ধস নেমেছিল যার ফলে শিবকের উত্তরে ও দক্ষিণে অনেক পরিবর্তন ঘটে। বর্তমান সেবকের কাছে তিস্তা রেলব্রিজের সংলগ্ন দক্ষিণে চুমুকডাঙ্গী মৌজার জমি সমতল—তারপরই মাটি হঠাৎ উঁচু হয়ে বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলকে স্থান দিয়েছে। ফলে শিবকের নীচে পাহাড় উঁচু হল—তিস্তা পূর্বদিকে ঢলে পড়ল—গঙ্গার পথ বদলে তিস্তার মূল গতিপথ ব্রহ্মপুত্রে মিশল। এত বিরাট ঘটনার মানবিক বিপর্যয় কী হতে পারে এ প্রজন্মের মানুষ ১৯৫০ এবং সর্বশেষে জলপাইগুড়িতে ১৯৬৮-র মহাপ্লাবনের ধ্বংস ক্ষমতা থেকে অনুমান করতে পারেন। হান্টার তার ১৮৭৬-এ স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাকাউন্ট অব রংপুর গ্রন্থেও তিস্তার বারবার গতি পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করেছেন। হয়ত এইসব কারণেই একদা বৈকুণ্ঠপুর রায়কত রাজ বংশধর ধর্মদেব রায়কত (১৭০৯-২৪) বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলের অভ্যন্তরে স্থাপিত নিরাপদ দুর্ভেদ্য রাজধানীকে নিরাপত্তাবিহীন জলপাইগুড়ি সমতলে সরিয়ে আনার কথা ভেবেছিলেন। প্লাবন আর নদীপথের পরিবর্তনে জেলার প্রাচীন ইতিহাস বারবার ধারাবাহিকতা হারিয়েছে। কোন ঐশ্বর্যশালী রাজারা ছিলেন তা অজানিত হয়েছে। ইতিহাসের শূন্যস্থান পূরণের জন্য মৃত্তিকা গর্ভে প্রোথিত রয়েছে নানা গুপ্ত পাল যুগের পাথুরে মূর্তি আর রাজ্যপাটের ধ্বংসাবশেষ। কোথাও পুকুর খুঁড়ে বেরিয়েছে নানা মূর্তি যা স্থান পেয়েছে নানা মিউজিয়ামে। কোথাও আবিষ্কৃত হয়েছে দুর্গ অথবা রাজ্যপাট। চিলাপাতার গভীর অরণ্যে আবিষ্কৃত হয়েছে গড়মেন্দাবাড়ী বা কিংবদন্তীর নলবাজার দুর্গের স্মৃতিচিহ্ন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এর সঙ্গে গুপ্তযুগের সাদৃশ্য পেয়েছেন। রক্ষণাবেক্ষণের অসুবিধার জন্য এর খননকার্য বন্ধ। জলপাইগুড়ি শহর থেকে আট-দশ মাইল দূরত্বে রাজগঞ্জের কাছে জহুরি তালমায় রয়েছে ভিতরগড় যা লোকশ্রুতিতে পৃথুরাজার গড়। এর বৃহৎ অংশ বর্তমানে বাংলা দেশের বোদা অঞ্চলে। এখানে পাওয়া গেছে নানা ধাতুমূর্তি যার মধ্যে পালযুগের বৌদ্ধ মূর্তি রয়েছে। হাজার বছর আগে চর্যাপদীয় যুগের তন্ত্র ও সহজিয়া সাধনার সঙ্গে জড়িত রানী ময়নামতীর কিংবদন্তীযুক্ত ময়নাগুড়ি নামের সঙ্গে। এই অঞ্চলে ছড়িয়ে রয়েছে নানা ইতিহাসের উপাদান। কালিকাপুরাণ যোগিনী তন্ত্রে উল্লেখিত জল্পেশ মন্দির অব্যাহত খ্যাতি নিয়ে এখনও রয়েছে। কিন্তু হারিয়ে গেছেন রাজা জল্প যার নামের সঙ্গে যুক্ত জলপেশ্বর শিব। কোনও অজানা সুদূর অতীতে মহাকাশ থেকে নিপতিত মৃত্তিকাগর্ভে প্রোথিত এক উল্কাপিণ্ড বলে অনেকে মনে করেন একে। এ অঞ্চলে প্রাচীনতর মন্দির বটেশ্বর ধ্বংসের মধ্যেও ভারতীয় সভ্যতার নানাযুগের নিদর্শন নিয়ে গবেষকদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। এ অঞ্চলে রয়েছে সোদরখাই-এর মন্দির। ময়নাগুড়ি থেকে ধূপগুড়ির পথে গুচ্ছলডাঙ্গার পূর্বদহর মন্দির জটিলেশ্বর পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন হিসাবে মন্দিরটি বর্তমানে সংরক্ষিত। কেউ কেউ একে গুপ্তযুগের বলে মনে করেছেন। অন্তত হাজার বছর আগেও সংলগ্ন বৃহৎ দিঘি থেকে প্রাপ্ত মূর্তির ভিত্তিতে এর ব্যবহার ছিল। ওড়িশার মন্দির ধাঁচে বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডে নির্মিত এই মন্দির ইতিহাসের নানা প্রশ্ন হাজির করতে পারে। এ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড এ অঞ্চলে লভ্য নয়। কোনও সমৃদ্ধ জনপদ ও ঐশ্বর্যবান রাজা বিহার অথবা ওড়িশা থেকে জলপথ বা স্থলপথে একে আনয়নের ব্যয় ও ব্যবস্থা করেছে। অথচ এই ভগ্নমন্দির ও মূর্তিগুলি যা প্রমাণ করে তা বর্তমানের অনগ্রসর উত্তরবঙ্গ নয়—একদা ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনযুগের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে সমৃদ্ধময় এক জনপদের অস্তিত্ব। যার অস্তিত্ব ছিল গুপ্ত পাল বা ভাস্করবর্মণ শশাঙ্ক অথবা দনুজমর্দনের যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অতীতের কোনও মানুষেরা এ জনপদকে একদা সমৃদ্ধির ছোঁয়া দিয়েছিল ইতিহাসের সেই অনালোকিত দিককে আলোকিত করবার দায় আজ অনেক বেশি। অতীতের একাত্মতার ইতিহাস বর্তমান ও ভবিষ্যতের সংহতি স্বাভাবিক ও সুনিশ্চিত করে। ১৯১১ সনে জলপাইগুড়ির প্রথম গেজেটিয়ারে পুরাকীর্তির যে দুটি উদাহরণ রেখেছেন তার একটি জল্পেশ অন্যটি ভিতরগড়।

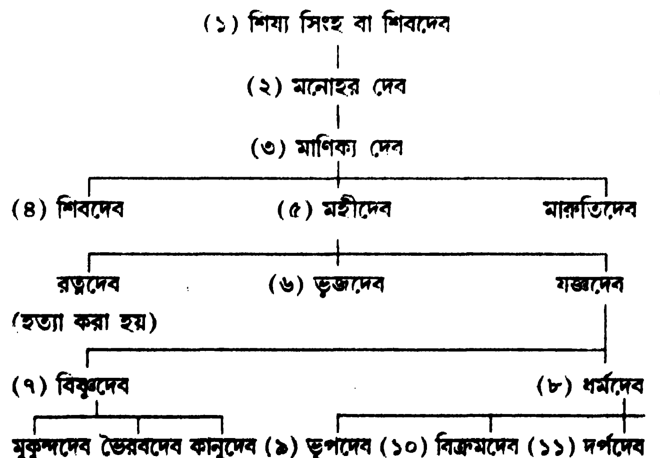
ডঃ বুকানন হ্যামিলটনের বিবরণ উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি ভিতরগড়ের স্কেচম্যাপ ২৮ পৃঃ মুদ্রিত করেছেন। স্কেচম্যাপটি এখানে দেওয়া হল :



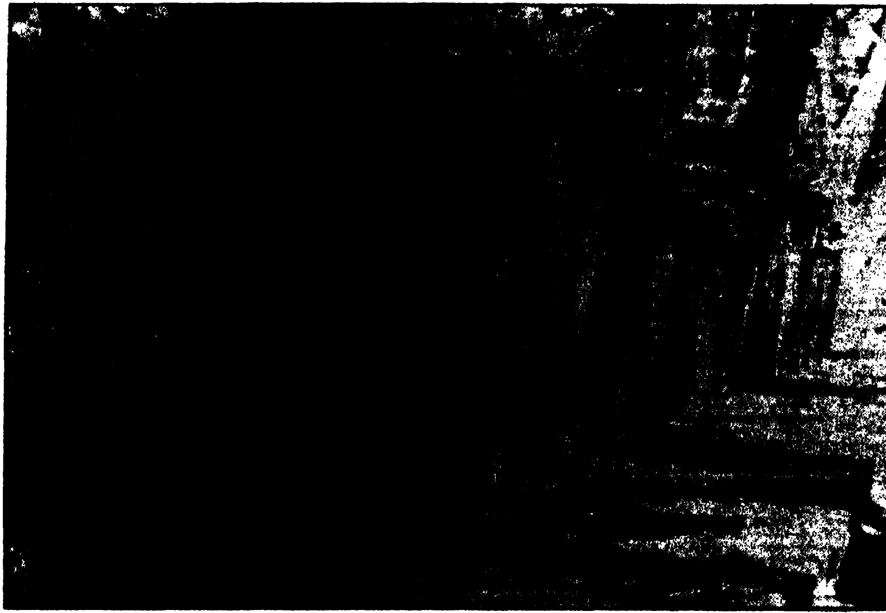
ভিতরগড়ের স্কেচ ম্যাপ

এ জনপদের যে ইতিহাসের ধারাবাহিকতা রয়েছে তার কালপরিমাণ ৫০০ বছর। পঞ্চদশ শতাব্দীতে এক খেন রাজা নীলধ্বজ কামরূপ থেকে করতোয়ার নদীপর্যন্ত বিশাল রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। তিনি কামতেশ্বর উপাধি নেন এবং কোচবিহারের অদূরে কামতাপুরে রাজধানী করেন। দেবী কামতেশ্বরী ছিলেন তাঁদের বংশের আরাধ্যা। তাঁর পুত্র নীলাম্বর বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। কিন্তু তাঁর আমলেই বাংলার সুলতান হোসেন শাহর হাতে খেন রাজত্বের অবসান ঘটে। একদা খেন রাজত্বের স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে তিস্তা তীরবর্তী শহরের পূর্বপ্রান্তে একটি অঞ্চল খেনপাড়া নামে পরিচিত ছিল। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে এঁরা সেন উপাধি ব্যবহার করতে থাকায় বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই মিশে গেছেন। খেনদের পতন কোচদের উত্থান সম্ভব করেছিল। কোচ প্রধান হাজোর এক দৌহিত্র বিশ্বসিংহ যোড়শ শতকে কোচ রাজবংশের পত্তন করেন। খেন বংশের গৌরব অনুসরণ করে তিনিও কামতেশ্বর উপাধি নেন। তাঁর ভ্রাতা শিশুসিংহ রায়কত পদবি নিয়ে তিস্তার পশ্চিম পাড়ে রাজবংশের দ্বিতীয় ধারার পত্তন করেন। কোচবিহার রাজবংশের শ্রেষ্ঠ রাজা নরনারায়ণ। তিনি নারায়ণী মুদ্রা চালু করেন। তাঁর ভ্রাতা শুক্লধ্বজ দক্ষ সেনাপতি হিসাবে আসামের বিস্তৃত অঞ্চল এই রাজত্বের আওতায় আনেন। তিনিই লোকশ্রুতি চিলা রায় নামে খ্যাত। কুশল গেরিলা রণনীতিতে দীর্ঘদিন তিনি মোগল আক্রমণ প্রতিহত করেছিলেন। এঁদের পর কোচ রাজবংশ গৃহবিবাদে দ্বিধাবিভক্ত হয়। ঔরঙ্গজেবের আমলেই মোগলেরা রঙপুরসহ কোচ রাজত্বের বড় অংশ দখল করে নেয়। কোচ রাজ্য সংকুচিত হয়। কোচ রাজ্যের দুর্বলতায় বৈকুণ্ঠপুরের রাজারা সাময়িক শক্তিমান হলেও মোগল শাসনের সঙ্গে তাঁরা সদ্ভাব রেখেছিলেন। এই বংশের জলপাইগুড়ির রাজপরিবারের জগদীন্দ্রদেব রায়কত ১৮৮৩ খ্রিঃ রায়কত বংশ ও তাঁহাদের রাজ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নামে একটি গ্রন্থ লিখেছিল। ১৯৮২ সনে ইতিহাস গবেষক নির্মলচন্দ্র চৌধুরী এর দ্বিতীয় সংস্করণ সম্পাদনা করেন। এর মধ্যে বৈকুণ্ঠপুরের রায়কতদের একটি বংশতালিকা রয়েছে—যার অনেকের সঙ্গে জলপাইগুড়ির শিক্ষা ও সংস্কৃতির গভীর যোগসূত্র রয়েছে। বংশতালিকা নীচে দেওয়া হল :

বৈকুণ্ঠপুর রায়কতগণের বংশতালিকা



জলপাইগুড়ির আধুনিক ইতিহাস ইংরেজ শাসনের সঙ্গে যুক্ত। ১৭৬৫ দিল্লির মোগল সম্রাট শাহআলমের কাছ থেকে বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা খাজনা জমা দেবার শর্তে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা-বিহার-ওড়িশার দেওয়ানি গ্রহণের পর ব্যবসা ও রাজস্ব আদায়ের স্বার্থে কোম্পানির নজর এদিকে আসে। এ অঞ্চল তখন কোনওরকম শাসন নিয়ন্ত্রিত নয়। নেপাল, ভুটান অরাজকতার সুযোগ নিয়ে তিস্তার পূর্বে ও পশ্চিমের সমতলে অধিকারের সীমানা প্রসারিত করছিল।



লনরাজার গড়

জয়পুর রাজের কুলবধূ হিসাবে। বাংলা তথা ভারতের সঙ্গে আত্মিক মিলনের এমন দৃষ্টান্ত মহাভারতীয় যুগে ইন্দ্রপ্রস্থের কুলবধূরূপে চিত্রাঙ্গদা উলুপীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। জলপাইগুড়ি রায়কত রাজবংশের ধারাও একই। কেশবচন্দ্র সেনের ভ্রাতা যষ্ঠীচরণের কন্যা সরলতার বিয়ে হয়েছিল জগদীন্দ্রদেব রায়কতের সঙ্গে যাঁর নামে নামাঙ্কিত হয়েছে জলপাইগুড়ির সাম্প্রতিক গৌরব কলাকেন্দ্র। এধারা অব্যাহত ছিল রাজত্বের শেষদিন পর্যন্ত। রাজা প্রসন্নদেব রায়কত রানী অশ্রুমতীর কন্যা প্রতিভার বিয়ে হয়েছিল বাংলার বিশিষ্ট বনেদী পরিবারের সন্তান মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর ভ্রাতার সঙ্গে। বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্যে এই একাত্মীকরণের তাৎপর্য আজ আরও গভীরভাবে অনুভব প্রয়োজন।

এই তালিকায় দর্পদেবের আমলে জলপাইগুড়ি রাজদুর্গ ইংরেজ দখল নেয়। তাঁর সন্ন্যাসী সৈন্য সামান্য লড়াই করে অরণ্যে আত্মগোপন করে। ইংরেজের অধীনে জমিদার হিসাবে জলপাইগুড়ি বর্তমান রাজবাড়িতে রাজ্যপাট গড়ে তোলেন তাঁর ছেলে জয়ন্তদেব। শিব-দুর্গা-কালী কুলদেবতাদের মন্দির নির্মিত হয়। জয়ন্তদেবের ছেলে সর্বদেবের আমলে (১৮০৯-১৮৪৮) রাজবাড়ির বৃহৎ দিঘি কাটানো হয়। একাজের দায়িত্ব ছিলেন দিনাজপুরের ঠিকাদার জীয়ন গোমস্তা। ১৮৩৬ সন পর্যন্ত মোগল আমলের টাকা, কোচবিহারের নারায়ণীমুদ্রা এবং কড়িবিনিময় মাধ্যম হিসাবে চালু ছিল। ১৮৩৬ ওই সব মুদ্রা বাতিল হয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মুদ্রা চালু হয়। রাজারা ৩২,০০০ টাকা খাজনার বত্রিশ হাজারী জমিদার হলেন। সর্বদেবের পর রাজত্ব করেন ফণীন্দ্রদেব। তাঁর নামে নামাঙ্কিত ফণীন্দ্রদেব বিদ্যালয় শহরের প্রাচীনতম বনেদী হাইস্কুল। ফণীন্দ্রদেবের পর ক্ষমতায় বসেন প্রসন্নদেব—যাঁর নামে এখানকার মহিলা মহাবিদ্যালয়। এরই জ্ঞাতিভ্রাতা জগদিন্দ্রদেব—যাঁর নামে নামাঙ্কিত জলপাইগুড়ি কলাকেন্দ্র। ১৯৫৫ সনে জমিদারি বিলোপ আইনে রায়কত রাজত্বেরও অবসান ঘটে।

কোচবিহার-জলপাইগুড়ির কোচ রাজবংশের সঙ্গে এ জনপদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির যোগ অচ্ছেদ্য। কোচ রাজবংশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ভিত্তিভূমি ছিল গৌর কাশী। বিশ্বসিংহ বিয়ে করেছিলেন গৌর দেশীয় কন্যা। ইংরেজ ভ্রমণকারী র‍্যালফ ফিচ রাজা নরনারায়ণের সময়কালে হিন্দু সংস্কৃতির উত্থান লক্ষ করেছিলেন। এই রাজবংশ বাংলা গদ্যের প্রথম ব্যবহারকারী। এই ধারা উনিশ-বিশ শতকেও অব্যাহত ছিল। রেনেসাঁস আলোকিত বাংলার নবজাগরণের অন্যতম নায়ক কেশবচন্দ্র সেনের কন্যা সুনীতিদেবীর বিয়ে হয়েছিল রাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণের সঙ্গে। দ্বিতীয় মেয়ে সাবিত্রীর বিয়ে হয়েছিল ভ্রাতা কুমার গজেন্দ্র নারায়ণের। সুনীতি দেবীর কন্যা গিয়েছেন

জলপাইগুড়ির আধুনিক ইতিহাস ইংরেজ শাসনের সঙ্গে যুক্ত। ১৭৬৫ দিল্লির মোগল সম্রাট শাহআলমের কাছ থেকে বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা খাজনা জমা দেবার শর্তে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা-বিহার-ওড়িশার দেওয়ানি গ্রহণের পর ব্যবসা ও রাজস্ব আদায়ের স্বার্থে কোম্পানির নজর এদিকে আসে। এ অঞ্চল তখন কোনওরকম শাসন নিয়ন্ত্রিত নয়। নেপাল, ভুটান অরাজকতার সুযোগ নিয়ে তিস্তার পূর্বে ও পশ্চিমের সমতলে অধিকারের সীমানা প্রসারিত করছিল। এ সেই যুগ বা ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে বিয়োগান্তক ঘটনার সঙ্গে জড়িত। যে চিত্র বাঙ্ময় হয়ে রয়েছে বঙ্কিমের আনন্দমঠে। নানাস্থান থেকে জঙ্গলাকীর্ণ এই আত্মগোপনের আদর্শ স্থানে এসেছিল ফকির ও সন্ন্যাসী সৈন্যরা। এই সূত্রেই জনচিত্ত জয়ী বঙ্কিমের উপন্যাস দেবী চৌধুরাণীর আখ্যায়িকা। দেবী চৌধুরাণী আর ভবানী পাঠক এই জনপদের কিংবদন্তী ও বিশ্বাসের সঙ্গে নানাস্থান নামে বিজড়িত। রাজাদের সঙ্গে বিদ্রোহী সন্ন্যাসীদের যোগও ছিল। ফলে ইংরেজ কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠায় সৈন্যবাহিনীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। ইংরেজ রাজত্বের সঙ্গে জলপাইগুড়ির সম্ভবত প্রথম যোগসূত্রতার পরিচয় বর্ণিত হয়েছে পি এম ডেক্রেসকে লেখা ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট-এর রিপোর্টে। তিনি জানাচ্ছেন যে ৩ ফেব্রুয়ারি ১৭৭৩ বেলা দুইটায় বৈকুণ্ঠপুরের দুর্গ ও রাজধানী তিনি দখল নিয়েছেন। [At two in the afternoon I made a second March, and took possession in the name of Hon'ble Company of Jellpye Gaurie, the fortrefs and capital of the Bycunpore Country which the Rajah in the hight of his consternation evacuated.] এখানে জলপাইগুড়ি ও বৈকুণ্ঠপুর ইংরেজি বানান লক্ষণীয়। এই রিপোর্টে স্টুয়ার্ট সে যুগের জলপাইগুড়ির একটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ দিয়েছেন—তা হল বৈকুণ্ঠপুর দেশটির চাষ-আবাদ খুব উন্নত এবং তাঁর দেখা অভিজ্ঞতায় অঞ্চলটি

সমৃদ্ধতম। [The Byeunpore country is in a very high state of cultivation and appears to be our of the richest I have beheld.] ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল রায়কতরাজ দর্পদেব রায়কতের আমলে।

বৈকুণ্ঠপুরের রায়কত রাজেরা দুর্ভেদ্য অরণ্য অঞ্চল থেকে রাজধানী সরিয়ে জলপাইগুড়ির আদিগন্ত সমতল ক্ষেত্রের মধ্যে যে রাজ্যপাট রাজধানী স্থাপন করেছিলেন শতাব্দীর প্রথম ভাগে তার নিরাপত্তা দেবার শক্তি রাজার ছিল না। কিন্তু রাজ্যের রাজধানী হিসাবে জলপাইগুড়ির স্থান গৌরব বিজেতার কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল হয়ত—তিস্তার পূর্ব তীরে আরও প্রায় এক শতাব্দী ১৭৭৪-এর চুক্তি থেকে ১৮৬৫ পর্যন্ত ভুটানের সঙ্গে ইংরেজ শাসকদের সংঘাতে তিস্তাকে মধ্যে রেখে এর পশ্চিমপাড়ের জলপাইগুড়ি নিরাপত্তাজনিত কারণে উপযুক্ত মনে হওয়ায় এখানেই শুরুতে সামরিক ছাউনি পরবর্তীতে জেলা সদর ও বিভাগীয় কার্যালয় এবং এই জলপাইগুড়ি নামেই সমগ্র জেলা নামাঙ্কিত হয়েছিল। জেলা গঠনের প্রক্রিয়াও চলেছে দীর্ঘদিন। ১১ নভেম্বর ১৮৬৫ ইংরেজ ভুটান যুদ্ধে ভুটানের পরাজয় ও সিঞ্চুলা চুক্তি অনুযায়ী ডুয়ার্স অঞ্চলে ইংরেজ অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। সঙ্কোশ নদীকে মধ্যে রেখে পূর্ব ও পশ্চিম ডুয়ার্স-এর ভাগ করা হয়। সঙ্কোশ ও তিস্তার মধ্যবর্তী অংশ পশ্চিম ডুয়ার্স এলাকা নির্ধারিত হয় এর সদরকেন্দ্র হয় ময়নাগুড়ি। তোর্ষা ও সঙ্কোশ নদীর মধ্যবর্তী অংশ নিয়ে গঠিত হয় বক্সা তহশিল যার শাসনকেন্দ্র হয় আলিপুরদুয়ার। ডালিমকোর্ট তহশিল গঠিত হয় পার্বত্য অঞ্চল নিয়ে। ১৮৬১ সনে পশ্চিম ডুয়ার্স পৃথক জেলা হয় এবং একজন ডেপুটি কমিশনারের হাতে যায়। ১৮৬৭ সনে ডালিমকোট তহশিল দার্জিলিং-এর সঙ্গে যুক্ত হয়। ১৮৬৯ সনের ৮ ডিসেম্বর গেজেট নোটিফিকেশন অনুযায়ী নতুন জলপাইগুড়ি জেলার পত্তন হয়। পূর্ব ডুয়ার্স আগেই আসাম গোয়ালপাড়ার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। পশ্চিম ডুয়ার্স জেলা ও জলপাইগুড়ি সাবডিভিশনকে যুক্ত করে জলপাইগুড়ি জেলা গঠিত হল। জেলা শাসনকেন্দ্র ময়নাগুড়ি থেকে জলপাইগুড়িতে স্থানান্তরিত হল। সে সময় তিস্তা ও জলঢাকা নদীর মধ্যবর্তী অংশ এবং সদর সাবডিভিশনসহ গঠিত হয় সদর জলপাইগুড়ি আর বক্সা সাবডিভিশনসহ গঠিত হয় ফালাকাটা সাবডিভিশন। এর প্রধান শাসনকেন্দ্র বক্সা থেকে ফালাকাটায় স্থানান্তরিত হয়। ১৮৭৪ সনের আইনে পশ্চিম ডুয়ার্স বিশেষ তালিকাভুক্ত জেলা হয়। এর প্রধান শাসক ডেপুটি কমিশনার। কোচবিহার ও দার্জিলিং-এর জেলাশাসকও ডেপুটি কমিশনার নামেই ছিলেন। ১৯১৯-এর আইনে ডুয়ার্সকে পশ্চাৎপদ অঞ্চল হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল। গভর্নর জেনারেলকে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল যাতে আইনসভার কোনও আইন এই ধরনের নন-রেগুলেটেড এলাকায় কার্যকরী না হয়। ১৯৫০ সনে এই রেগুলেটেড-এ নন-রেগুলেটেড বিভাজন নীতি বাতিল হয়ে যায়। বর্তমানে জেলার শাসনকেন্দ্র জলপাইগুড়ি। ১৮৭৫ সনে রাজশাহী ডিভিশনের শাসনকেন্দ্র হয়েছিল জলপাইগুড়ি। বর্তমানে উত্তরবঙ্গের ছয়টি জেলার বিভাগীয় কেন্দ্রও জলপাইগুড়ি।

ইংরেজ দখলে আসার পর থেকে এই অঞ্চলের বিশদ পরিসংখ্যান ও সামাজিক অবস্থা নির্ণয়ে নানা কাজ শুরু হয়েছিল। ১৮১০ ডঃ ফ্রান্সিস বুকানন হ্যামিলটন তার সার্ভে রিপোর্ট অ্যাকাউন্ট অব দি ডিস্ট্রিক্ট অব রংপুর প্রকাশ করেন। এর মধ্যে তৎকালীন রংপুরের শাসনতান্ত্রিক ইউনিট হিসাবে জলপাইগুড়ির সামাজিক আর্থিক ও ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যগুলি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও অভিজ্ঞতার নিরিখে বর্ণিত হয়েছে। বুকাননের রিপোর্ট-এর প্রাসঙ্গিক অংশের উদ্ধৃতি বর্তমানে গেজেটিয়ারগুলির অংশবিশেষে। ১৮৯৫ সনে প্রকাশিত হয় সানডার্সের সার্ভে অ্যান্ড সেটেলমেন্ট অব ওয়েস্টার্ন ডুয়ার্স, ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের জন এফ গ্রুনিং ১৯১১ সনে জলপাইগুড়ির প্রথম পূর্ণাঙ্গ গেজেটিয়ার রচনা করেন। ১৯১১ সনে এলাহাবাদের পাওনিয়ার প্রেস থেকে ইস্টার্ন বেঙ্গল অ্যান্ড আসাম ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার সিরিজে জলপাইগুড়ি গেজেটিয়ার প্রকাশিত হয়। ১৮৯৫-এ প্রকাশিত সান্ডার্স রিপোর্টের প্রভূত সহায়তা তিনি এতে নিয়েছেন বলে জানিয়েছেন। ঐতিহাসিক মূল্যে এই গেজেটিয়ার আজও গুরুত্বপূর্ণ। ইনডেক্সসহ ১৫৭ পাতার এই তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থে ১৫টি অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে জলপাইগুড়ির (১) ভূ-প্রকৃতি, (২) ইতিহাস, (৩) জনবিন্যাস, (৪) জনস্বাস্থ্য, (৫) কৃষিব্যবস্থা, (৬) বনাঞ্চল, (৭) প্রাকৃতিক দুর্বিপাক, (৮) ভূমিরাজস্ব, (৯) মজুরি ও দ্রব্যমূল্য, (১০) জীবিকা উৎপাদন ব্যবস্থা ও ব্যবসা বাণিজ্য, (১১) যোগাযোগ ব্যবস্থা, (১২) সাধারণ প্রশাসন, (১৩) স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, (১৪) শিক্ষা, (১৫) স্থানপরিচয় গেজেটিয়ার।

বিশ শতকের গোড়ায় জলপাইগুড়ি কেমন ছিল এই গ্রন্থ তার একটা তথ্যচিত্র। প্রাচীন থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত এই জনপদের বিবর্তনের ধারা গ্রুনিং-এর চোখে সজীব হয়ে উঠেছে। জলপাইগুড়ির গবেষকদের কাছে এনসাইক্লোপেডিয়া তুল্য গ্রন্থ অশোক মিত্র সম্পাদিত সেনসাস ১৯৫১—ডিস্ট্রিক্ট হ্যান্ডবুক জলপাইগুড়ি। তৎকালীন সুপারিনটেনডেন্ট অব সেনসাস ও জয়েন্ট ডেভেলপমেন্ট কমিশনার অব ওয়েস্ট বেঙ্গল অশোক মিত্র আই সি এস মহাশয় এই কোষগ্রন্থ সদৃশ গ্রন্থে গ্রুনিং, মিলিগানস, হান্টার, বুকানন সান্ডার্স প্রমুখ বহুজনের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছেন তাঁর গ্রন্থ ভূমিকায়। এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত করেছেন ১৮১০-এ বুকাননের অ্যাকাউন্ট অব রংপুর, ১৮৯৫-এ প্রকাশিত সান্ডার্সের সেটেলমেন্ট রিপোর্ট অন দা সোশ্যাল লাইফ অ্যান্ড রিলিজিয়ান অব দি পিপল অব জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্ট ও সান্ডার্সের অন্যান্য রিপোর্ট। স্যার জোসেফ ডালটন হুকারের হিমালয়ান জার্নালের জলপাইগুড়ি বিবরণ। ১৮৪৯ সনের ৩ মার্চ থেকে ১৪ মার্চ তিনি তাঁর যাত্রাপথে জলপাইগুড়ি এসে রাজাদের অতিথি হয়েছিলেন। সময়টা ছিল দোল উৎসবের। জলপাইগুড়িকে তাঁর তিস্তার ধারা গ্রাম বলে মনে হয়েছিল। তিনি লিখছেন 'on the second day we arrived at Jeelpigoree [বানান লক্ষ্যণীয়], a large straggling village near the banks of the Teesta, a goodway south of the forest ; here we were detained for several days, waiting for elephants with which to proceed northwards. চারপাশে মানুষজন গাছপালা যা দেখেছেন বর্ণনা করেছেন। উৎসবের সময় রাজদরবার

ও লোকজনের আচার-আচরণ বর্ণনা করেছেন। এ বর্ণনায় তাঁর বিরক্তিও ফুটে উঠেছে কোথাও। অষ্টম দিনে তাঁর অরণ্য পথে যাত্রার জন্য হাতি পাওয়া গেলে তিনি তিস্তার পশ্চিমতীরে রংধামালী হয়ে উত্তরে যাত্রা করেছিলেন। রংধামালী [Rangamally] থেকে দশমাইল উত্তরে বৈকুণ্ঠপুরের তিনদিক গভীর বনে ঘেরা পুরনো রাজধানীর উপর দিয়েই ছিল যাত্রাপথ। এ জনপদ তাঁর চোখে শোচনীয় অবস্থায় [miserable country] বলে মনে হয়েছিল। হস্তিপৃষ্ঠে আরূঢ় হয়ে তাঁর যাত্রাপথের বর্ণনা দেড়শ বছর আগের জলপাইগুড়ির এক কৌতূহলকর চিত্র।



রাজবাড়ির তোরণ *ছবি : শৌভিক ঘোষ*

জলপাইগুড়ির গবেষকদের কাছে এনসাইক্লোপেডিয়া তুল্য গ্রন্থ অশোক মিত্র আই সি এস সম্পাদিত সেনসাস ১৯৫১ ডিস্ট্রিক্ট হ্যান্ডবুক জলপাইগুড়ি। তৎকালীন সুপারিনটেনডেন্ট অব সেনসাস নানা জেলার ১৯৫১-র হ্যান্ডবুকগুলি কোষ গ্রন্থের আকারেই সন্নিবেশিত করেছিলেন। শ্রীমিত্র এই ডিস্ট্রিক্ট হ্যান্ডবুকে প্রাকস্বাধীনতা যুগের ইংরেজদের জলপাইগুড়ি সংক্রান্ত যাবতীয় রিপোর্টের প্রাসঙ্গিক অংশ সংযোজিত করায় এর মূল্য অসাধারণ—কারণ মূল রিপোর্ট ও গ্রন্থাদি আজ সাধারণ গবেষকদের কাছে দুর্লভ। তিনি এই গ্রন্থে প্রধান যে তথ্যগ্রন্থাদির প্রাসঙ্গিক অংশ সংযোজিত করেছেন তার মধ্যে রয়েছে ১৮১০-এর বুকাননের অ্যাকাউন্ট অব রঙপুর ১৯৮৫-তে প্রকাশিত সান্ডার্স-এর সার্ভে অ্যান্ড সেটেলমেন্ট অব দি ওয়েস্টার্ন ডুয়ার্স ; এছাড়াও সান্ডার্স-এর চা-বাগিচার ইতিহাসের উপর বিশেষ নিবন্ধ এবং জলপাইগুড়ির সমস্ত জনজাতি সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ তথ্য। এছাড়াও শ্রীমিত্রের নিজস্ব নিবন্ধ গবেষকদের কাছে মূল্যবান হয়ে রয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধে লেখক এঁদের সকলের কাছেই ঋণ স্বীকার করছেন।

বিদেশি শাসকের চোখে জলপাইগুড়ি জনপদ ও তার মানুষের মূল্যায়নে বিভিন্নতা রয়েছে। ডালটন হুকারের চোখে জিলপিগোরীর রাজ্য ১৮৪৯-এ যতই মিজারেবল কান্ট্রি—হতভাগ্য দেশবলে মনে হোক—১৯০১-তে ছয় দশক পর গ্রুনিং জানাচ্ছেন ভারতের খুব কম জেলাই আছে যা পশ্চিম ডুয়ার্স জেলার মতো এত দ্রুত উন্নত হয়েছে। উত্তরাংশে পাহাড়ের পাদদেশে তিস্তা আর তোর্সার মধ্যবর্তী অংশ নদী ও সংরক্ষিত বনাঞ্চল বাদ দিলে সমৃদ্ধ চা-বাগিচায় আচ্ছাদিত হয়েছে। তোর্সার পূর্বে বনাঞ্চল বাদে সংকোষ নদী পর্যন্ত এই চা-বাগিচা বিস্তৃত। চা-বাগিচা বলয়ের দক্ষিণে তোর্সা নদীর উভয় পাড়ে জঙ্গল প্রায় অপসারিত। বনের পাশে নদীর ধারে ধান, পাট, তামাক, সরষের চাষ-আবাদ আর ভরা ফসলে জমি আচ্ছাদিত। সর্বত্র সম্পন্ন চাষীর অস্তিত্ব দেখা যাবে—আর সমৃদ্ধির ক্রমবর্ধমান পরিচয় মিলবে নতুন টিনে চাল দেওয়া বাড়িঘরের মধ্যে।

বনাঞ্চল ধ্বংসের চিত্রও তিনি দিয়েছেন। লিখছেন—তোর্সার পরপারে সংরক্ষিত বনাঞ্চলে শাল শিশু দর্শনীয়। কিন্তু জেলার এই দূরতম অংশের চাষ-আবাদ এত দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে যে অরণ্যও দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে। কবির দৃষ্টিতে তিনি এ জেলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখেছেন। এ বর্ণনা তাঁর ভাষাতেই—"The scenary near the hills, particularly where the Tista, Jaldhaka, Raidhak and Sankos river debouch into the plains is very fine ; west of the Torsa the wooded hills of Bhutan with Kinchinjanga in the background form a splendit picture, though the view changes further east where reserved forest intervene between the cultivated land and the hills, these forest are not without a beauty of their own. No better idea of the forests in Duars can be obtained than on the road between Buxa Road Station and Santrabari where the climb up to Buxa. Cantonment begins. Fine sal trees abound and further north when the orchids are in bloom in March and April the forests are very beautiful."—তিস্তা জলঢাকা, রায়ঢাক এবং সংকোষ নদী যেখানে সমতলে মিলেছে তা অপূর্ব ; কাঞ্চনজঙ্ঘাকে পশ্চাৎপটে রেখে তোর্সার পশ্চিমে অরণ্যময় ভুটান পাহাড় অপূর্ব চিত্র রচনা করেছে। যদিও এ দৃশ্য পূর্বে আরও এগিয়ে গেলে যেখানে সংরক্ষিত অরণ্য ফসল ভরা খেত এবং পাহাড়কে আড়াল করছে। কিন্তু বনানীরও এক নিজস্ব সৌন্দর্য্য বর্তমান। আদিম অরণ্যের এমন ধারণা ডুয়ার্সে আর পাওয়া যাবে না—যা বক্সা রোড স্টেশন এবং

সান্তাবাড়ী যেখান থেকে বক্সা সেনানিবাসের রাস্তা উপরে উঠে গেছে। চারদিকে আরও উত্তরে সুন্দর শালতরুর সমারোহে যখন মার্চ-এপ্রিলে অরণ্যে অর্কিড-এর ফুলে ভরে যায় অরণ্য তখন হয়ে উঠে সৌন্দর্যে মায়াময়।

এ জনপদের প্রকৃতি ও মানুষকে গ্রুনিং দেখেছেন একজন বিদেশির নতুনের সন্ধানে আবিষ্কারকের দৃষ্টি নিয়ে। ফলে গ্রন্থটি ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের বিদেশি শাসকের পেশাদারি দৃষ্টি নয়। জলপাইগুড়ি জেলা ইতিহাসে গ্রুনিং তাঁর গ্রন্থে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। শতাব্দী পরে আজও যার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা রয়েছে তিনি অনুভব করবেন বক্সা রোডের বনানী কী মায়াঞ্জন নিয়ে পর্যটককে হাতছানি দিয়ে চলেছে। বিগত এক শতাব্দী মানুষের লোভের শিকার হয়ে অনেক অরণ্য উৎসাদিত হয়েছে। তবুও যতটুকু টিকে আছে তার ভিতরে গ্রুনিং-এর দেখা এই অরণ্য, চা-বাগিচা, চাষ ক্ষেতের সমারোহ—ইকোট্যুরিজম-এর অনন্ত সম্ভাবনার দুয়ার উন্মুক্ত করতে পারে। বক্সা ব্যাঘ্রপ্রকল্পসহ এ অঞ্চল আজ নূতন গুরুত্ব পেয়েছে। শতবর্ষ আগে গ্রুনিং এ জেলায় দ্রুত উন্নয়নের গতি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এ নতুন শতাব্দীতে একমাত্র অরণ্যবেষ্টিত এই ভূমিখণ্ডে বিশ্বের মানুষকে পর্যটনে আমন্ত্রণ জানিয়ে এ জেলার সম্পদ সৌভাগ্যকে আরও দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে। গ্রুনিং-এর এমন বহু মায়াময় সৌন্দর্য্য বর্ণনা পর্যটক আমন্ত্রণের বাঙ্ময় ভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে।

আর একজন সিভিল সার্ভিসের মানুষ গ্রুনিং-এর অনেক আগে (১২৮৯-৯০) খ্রি. ১৮৮২-তে ভালবাসা ও স্বপ্নমাখা দৃষ্টিতে জলপাইগুড়িকে দেখেছিলেন। তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বঙ্কিম। তিস্তা আর বৈকুণ্ঠপুর অরণ্য ঘিরে হান্টারের স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাকাউন্ট অব বেঙ্গল-এর রংপুর অধ্যায় থেকে ভবানী পাঠক, দেবী চৌধুরাণীর নামগুলি ঘিরে এ অঞ্চলে যে মিথ তাকেই আশ্রয় করে লিখেছিলেন দেবী চৌধুরাণী উপন্যাস। ইজারাদার দেবীসিংহের অত্যাচার ও তার বিরুদ্ধে প্রজা বিদ্রোহের ঐতিহাসিক কাহিনী কোম্পানি শাসনের শুরু অষ্টাদশ শতকের ছয় ও সাতের দশকের জলপাইগুড়ি-রংপুর দিনাজপুর অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এই উপন্যাসের পটভূমিতে রয়েছে। সঙ্গে রয়েছে ভবানী পাঠককে ঘিরে বৈকুণ্ঠপুর রাজত্বের শেষ দিনগুলিতে সন্ন্যাসী সৈনিকদের বিদ্রোহ কাহিনী—ইংরেজ যাঁদের ডাকাত অভিধায় আখ্যায়িত করেছে। এই উপন্যাসের তৃতীয় পরিচ্ছেদের প্রথম অংশটুকু আজও ভাষা ও ভাবের কাব্যময় ছন্দে তিস্তার একটি বাস্তব বাঙ্ময় চিত্র। "বর্ষাকাল। রাত্রি জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্না এমন বড় উজ্জ্বল নয়, বড় মধুর, একটু অন্ধকার মাখা—পৃথিবীর স্বপ্নময় আবরণের মতো। ত্রিস্রোতা নদী বর্ষাকালের জলপ্লাবনে কূলে কূলে পরিপূর্ণ। চন্দ্রের কিরণ সেই তীব্রগতি নদীজলের স্রোতের উপর—স্রোতে, আবর্তে, কদাচিৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গে জ্বলিতেছে। ......অন্ধকারে গাছের ফুল, ফল, পাতা বাহিয়া তীব্র স্রোত চলিতেছে......আধারে আধারে সে বিশাল জলধারা সমুদ্রানুসন্ধানে পক্ষিণীর বেগে ছুটিয়াছে। কূলে কূলে অসংখ্য কলকল শব্দ। আবর্তের ঘোর গর্জন, প্রতিহত স্রোতের তেমনই গর্জন; সর্বশুদ্ধ একটা গম্ভীর গগনব্যাপী শব্দ উঠিতেছে।" তিস্তার এ চিত্র একান্ত বাস্তব অথচ কাব্যময়। শতাব্দী পরেও বঙ্কিমের এ তিস্তা সন্ধানী ও পর্যটকের কাছে বাস্তব ও স্বপ্নময়ই মনে হবে। বঙ্কিম ত্রিস্রোতাকে বাঙালির হৃদয়ে কাব্যময় করেছেন। মনীষী বঙ্কিম দেশপ্রেমের উদ্‌গাতা হিসাবে বাঙলা ও বাঙালির ইতিহাস খুঁজেছেন। এ ইতিহাস অনুসন্ধান করার একটা বড় প্রাপ্য ১২৮৯ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা বঙ্গদর্শনে "বাঙ্গলার ইতিহাসের ভগ্নাংশ কামরূপ-রঙ্গপুর" প্রবন্ধ।

১৮৬৯ সনের ৮ ডিসেম্বর গেজেট নোটিফিকেশন অনুযায়ী নতুন জলপাইগুড়ি জেলার পত্তন হয়। পূর্ব ডুয়ার্স আগেই আসাম গোয়ালপাড়ার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। পশ্চিম ডুয়ার্স জেলা ও জলপাইগুড়ি সাবডিভিশনকে যুক্ত করে জলপাইগুড়ি জেলা গঠিত হল। জেলা শাসনকেন্দ্র ময়নাগুড়ি থেকে জলপাইগুড়িতে স্থানান্তরিত হল। সে সময় তিস্তা ও জলঢাকা নদীর মধ্যবর্তী অংশ এবং সদর সাবডিভিশনসহ গঠিত হয় সদর জলপাইগুড়ি আর বক্সা সাবডিভিশনসহ গঠিত হয় ফালাকাটা সাবডিভিশন। এর প্রধান শাসনকেন্দ্র বক্সা থেকে ফালাকাটায় স্থানান্তরিত হয়।

বর্তমানে বঙ্কিমচন্দ্রের "বিবিধ প্রবন্ধ" গ্রন্থে সংযোজিত। রঙ্গপুরের অংশ হিসাবে জলপাইগুড়ি জেলা জনপদেরও ইতিহাসের এক অন্বেষণ। কামরূপ রঙ্গপুরের বিভিন্ন রাজাদের যে বিবরণ কোচবিহারে কোচরাজাদের উত্থানের পূর্ব ইতিহাস। খেনরাজা নীলাম্বরের কামতাপুর রাজ্য বিস্তার ও তাঁর পত্তন কাহিনী। জলপাইগুড়ির অতীত আগ্রহী পাঠক বঙ্কিমের এই প্রবন্ধে লোককথার হবু রাজা গবুমন্ত্রীকেও এখানে খুঁজে পাবেন। বাংলার উত্তরের এই বৃহৎ জনপদ সম্পর্কে বঙ্কিমের অনুসন্ধিৎসা এই প্রবন্ধে প্রকাশ পেয়েছে। জলপাইগুড়ির ইতিহাসের প্রেক্ষাপট অনুসন্ধানে বঙ্কিমের এই লেখা সরসতায় বর্ণিত হলেও পাঠকের কাছে মূল্যবান মনে হবে। সরকারি স্তরে সর্বশেষ গেজেটিয়ার জলপাইগুড়ি প্রকাশের কাজ হয়েছে ১৯৮১ সনে। বরুণ দে মহাশয়কে অনারারি স্টেট এডিটর করে ৮১-র সেনসাসের ভিত্তিতে ৫১ সনের ডিস্ট্রিক্ট হ্যান্ডবুকগুলিকে

সময়োপযোগী করবার উদ্দেশ্যে এই গেজেটিয়ার প্রকাশ। "ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার জলপাইগুড়ি ১৯৮১"-র লেখকেরা হলেন অবনীমোহন কুশারী, বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য, বিমলরঞ্জন চক্রবর্তী, বরুণ দে, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, প্রণবরঞ্জন রায়, শঙ্করানন্দ মুখার্জি, সত্যনারায়ণ সেনগুপ্ত। এই গ্রন্থের অন্যতম আকর্ষণ কেবল তৎকালীন তথ্যই নয়—আকর্ষণীয় স্থানের বর্ণনায় নতুন গড়ে ওঠা শহরগুলির বিবরণ এবং ২৩টি ইতিহাসগত-ভাবে মূল্যবান আলোকচিত্রর সংযোজন যা পূর্ববর্তী গেজেটিয়ারগুলিতে ছিল না। ফলে ৮১-র গেজেটিয়ার অনেক আকর্ষণীয় হয়েছিল।

জলপাইগুড়ি জেলার বৈচিত্র্যময় দিক নিয়ে যে সব সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ হয়েছে তার মধ্যে স্থায়ী মূল্য দাবি করতে পারে ডঃ চারুচন্দ্র সান্যাল, কুমুদিনীকান্ত চক্রবর্তী, প্রীতিনিধান রায় ও ডঃ রেবতীমোহন লাহিড়ী সম্পাদিত "জলপাইগুড়ি জেলা শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ ১৮৬৯-১৯৬৮" জলপাইগুড়ি সম্পর্কে সমকালীন যুগের বিদগ্ধ অভিজ্ঞ ও ইতিহাস গবেষক ব্যক্তিদের লেখা এখানে রয়েছে। ডঃ রেবতীমোহন লাহিড়ীর জলপাইগুড়ি জেলার ইতিহাস প্রবন্ধটি স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি গ্রন্থের মর্যাদা দাবি করতে পারে। ডঃ অরুণভূষণ মজুমদার "উনবিংশ শতাব্দীর বৈকুণ্ঠপুর" সম্পর্কে নির্মোহ ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে নূতন করে আলোকপাত ঘটিয়েছে। ডঃ চারুচন্দ্র সান্যাল লিখেছেন তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ শহরের একশ বৎসরের ইতিহাস আর তিস্তা-করতোয়ার রূপরেখা। জল্পেশ মন্দির নিয়ে ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক পটভূমিতে আলোচনা রয়েছে—উপেন্দ্রনাথ বর্মণ ও নির্মলচন্দ্র চৌধুরির। এই লেখাগুলির স্থায়ী মূল্য থাকবে। দ্বিতীয় সংকলন গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৯৮৭ অজিতেশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত মধুপর্ণী পত্রিকা উত্তরবঙ্গের জেলাগুলি সম্পর্কে বাংলাভাষায় গেজেটিয়ারধর্মী সংখ্যা প্রকাশ করে জনসাধারণের প্রভূত উপকার করেছেন। এর মধ্যে "বিশেষ জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা ১৩৯৪" সম্পাদনা করেছেন ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ। বিশিষ্ট গবেষক লেখকদের নিয়ে অধিকাংশ প্রবন্ধে বহু নতুন তথ্যের সংযোজন এই গেজেটিয়ারধর্মী সংকলনে আছে। এই জাতীয় আর একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন জলপাইগুড়ির ১২৫ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে কিরাতভূমি পত্রিকার উদ্যোক্তারা। সব মিলিয়ে এই সংকলন গ্রন্থগুলি জলপাইগুড়ির ইতিহাস ও প্রাসঙ্গিক তথ্যের জন্য বাংলাভাষী মানুষের কাছে মূল্যবান স্মারক। প্রবন্ধ লেখক, স্কুল ছাত্র ও সাধারণ মানুষের জন্য জেলা পরিচিতি জলপাইগুড়ি ১৯৮২-তে গেজেটিয়ার মডেলে পুস্তিকা লিখেছিলেন। ভবিষ্যতে ধাবমান জগৎ ও সংসারে অতীত ইতিহাসও থেমে থাকতে পারে না। নিয়ত তাকে সময়ের সঙ্গে সাম্প্রতিক করে তুলতে হয়। নইলে তথ্যের বিভ্রান্তি ঘটে। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নতুন সংস্করণ অথবা বৎসরান্তে পরিশিষ্ট সংযোজন অত্যাবশ্যক। তথ্য প্রযুক্তির বিস্ফোরণের যুগেও আমরা পরিসংখ্যানগত দিক থেকে পশ্চাৎপদ থাকি। সর্বশেষ তথ্যভিত্তিক গ্রন্থাদি সমাজ উন্নয়নের শর্ত। জলপাইগুড়ির অতীত ও বর্তমানের মেলবন্ধন তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশে সার্থক হোক।

❑ অধ্যাপক ও প্রাবন্ধিক



দেবী চৌধুরাণীর মন্দির — *ছবি : শৌভিক ঘোষ*



বিমলেন্দু মজুমদার

জলপাইগুড়ি জেলার জনজাতি

জলপাইগুড়ি জেলার বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থান, প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জৈব বৈচিত্র্য এই জেলাকে প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন জাতি জনজাতির সাগরসঙ্গমে পরিণত করেছে। কখনও স্বেচ্ছায়, আবার কখনও শাসকশ্রেণীর নির্দেশে এই জেলায় এক-একটি বিশেষ জনগোষ্ঠী এসে বসতি বিস্তার করেছেন, তারপর এক সময় তাঁরা চলে গেছে অন্য কোনও এলাকায় নতুন মাটির সন্ধানে। তাঁদের জায়গায় এসে বসতি বিস্তার করেছেন নতুন কোনও জনগোষ্ঠী। এভাবে আসা-যাওয়ার পালায় প্রাক্-আধুনিক পর্বের অবসানের পর যাঁরা স্থায়ীভাবে এই জেলার ভৌগোলিক এলাকায় থেকে গেলেন এবং নতুন করে যাঁরা এসে বসতি বিস্তার করলেন, তাঁদের সকলকে নিয়েই গড়ে উঠেছে আজকের জলপাইগুড়ি জেলার জনজাতি জনগোষ্ঠী।

বর্তমানে ভারতের প্রায় সবকটি ধর্মসম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করেন এই জেলায়। তাঁরা ব্যবহার করেন ১৪১টিরও বেশি ভাষা-উপভাষা। জেলার জন্মলগ্ন থেকেই এসব বিচিত্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রতিবেশী হিসেবে একটা একটা সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্তর্গোষ্ঠীর সম্পর্ক (Inter community relation) গড়ে উঠেছে। কিন্তু ধর্ম, সংস্কৃতি ও ভাষাগত এতো ভিন্নতা সত্ত্বেও জেলার জন্মলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত (১৮৬৯—২০০১) জেলার কোনও এলাকায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অভাব ঘটেনি। এটাই এই জেলার ঐতিহ্য। আর এই ঐতিহ্যের ধারাকে অনুসরণ করেই এই জেলার বিশেষ প্রাকৃতিক পরিবেশ, জীবিকার উৎস ও জীবিকাভঙ্গি (Occupational Pattern) অনুসারে গড়ে উঠেছে বিশেষ বিশেষ জনজাতির বসতি এলাকা (Habitation)।

প্রব্রজন কাল (Period of migration) অনুসারী বসতি বিস্তারের দিক থেকে জলপাইগুড়ি জেলার জনজাতিগোষ্ঠীকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায় :—(ক) অধুনালুপ্ত জনজাতি (খ) স্থানীয় জনজাতি ও (গ) বহিরাগত জনজাতি।

সারণি-১ : জলপাইগুড়ি জনজাতি

(ক) অধুনালুপ্ত জনজাতি	(খ) স্থানীয় জনজাতি	(গ) বহিরাগত জনজাতি	মন্তব্য
মঙ্গোলয়েড জনগোষ্ঠী	মঙ্গোলয়েড জনগোষ্ঠী	অস্ট্রিক/দ্রাবিড় জনগোষ্ঠী	
ডোয়য়া, তড়ু, খোনিয়া, পানিকোচ, কিচক** জল্দা* প্রভৃতি	ভূটিয়া (শেরপা, ডুকপা, টোটো, কাগাতে, ইউলমো, তিব্বতি), মেচ (বোড়ো), রাভা, লেপ্‌চা, গারো, মগ, লু, চাক্‌মা, হাজং, লিম্বু• প্রভৃতি।	ওঁরাও, মুণ্ডা, সাঁওতাল, লোধা (খেড়িয়া/খড়িয়া), অসুর কোরা/কোড়া, মাহালি, নাগেশিয়া, মালপাহাড়িয়া, পারহাইয়া, শবর, হো, বীরহড়, ভূমিজ লোহারা প্রভৃতি।	*জল্দা = সমাজচ্যুত একটি বিশেষ সম্প্রদায়। **অননুসূচিত জনজাতি। • বর্তমানে ভুটানে বসবাসকারী একটি জনগোষ্ঠী।

উৎস : (i) List of Scheduled Tribes ; West Bengal, Census—1981.

(ii) Brochure containing the list of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and guidelines for verification of claims for issuing Scheduled Caste and Scheduled Tribe certificates. First Edin., Govt. of India, 1984 (Rept. 1988).

১৮৬৪-৬৫ সালে ভারত-ভুটান যুদ্ধে ভুটানের পরাজয়ের পর 'সিনচুলা চুক্তি' অনুসারে বর্তমান ডুয়ার্স এলাকায় ব্রিটিশ শাসন সম্প্রসারিত হয়। তারপর রংপুর জেলার জলপাইগুড়ি মহকুমাকে ডুয়ার্সের সঙ্গে যুক্ত করে ১৮৬৯ সালের ১ জানুয়ারি গঠিত হয় জলপাইগুড়ি জেলা। ব্রিটিশ শাসন সম্প্রসারিত হওয়ার পর জেলার ডুয়ার্স অঞ্চলকে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' এলাকার বাইরে 'নন্-রেগুলেটেড' এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করে রাখা হয় এবং জেলার শাসনভার অর্পণ করা হয় একজন 'জেলা সমাহর্তা'র (Deputy Commissioner) ওপর।

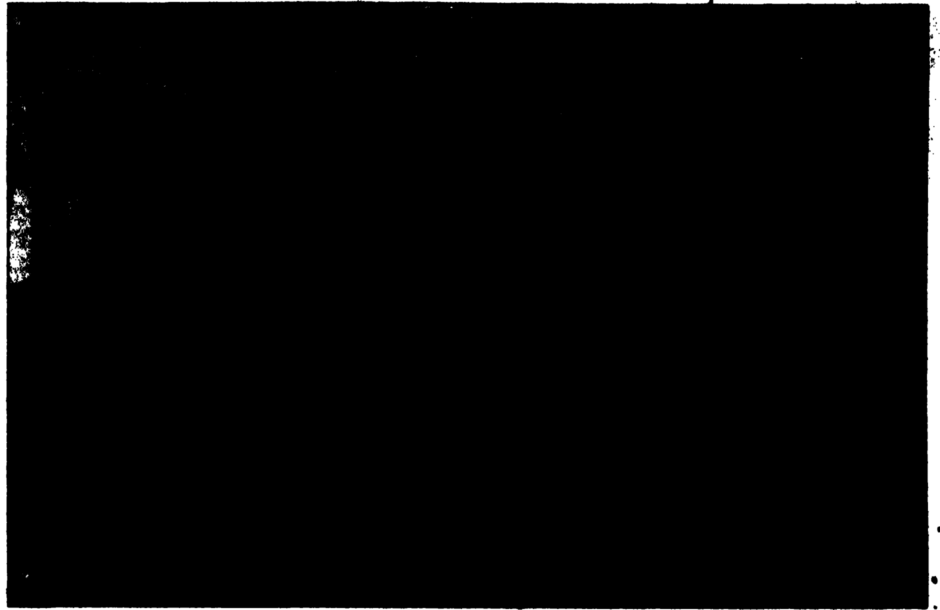
এই এলাকায় ব্রিটিশ শাসন সম্প্রসারণের আগে জেলার অধিকাংশ অঞ্চলই ছিল হিংস্র শ্বাপদসঙ্কুল গভীর অরণ্যে ঢাকা। জলবায়ু অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। ডুয়ার্স অঞ্চলে কালাজ্বর, ম্যালেরিয়া ও মারাত্মক ব্ল্যাক ওয়াটার ফিভারের প্রকোপ ছিল খুব বেশি। শুধু তাই নয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, নদীর গতিপথ পরিবর্তন এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা ছিল এই অঞ্চলে জনবসতি বিস্তারের অন্যতম অন্তরায়।

জেলার পার্বত্য অঞ্চল ও বনভূমিতে ওই প্রতিকূল পরিবেশে বসবাস করতেন ভুটিয়া ও তাঁদের সহযোগী ডোয়য়া, টোটো, ডুক্‌পা, প্রভৃতি জনজাতি। আর জেলায় আন্দোলিত উচ্চভূমি এবং দক্ষিণের সমতলের বনাঞ্চলে বসবাস করতো, মেচ (বোড়ো), রাভা, গারো, টোটো, তড়ু, ডোয়য়া, পানিকোচ খোনিয়া, লেপ্‌চা, জল্‌দা প্রভৃতি জনজাতির মানুষ। এসব জনজাতির অধিকাংশই ছিল ক্ষেত্রান্তরী চাষে (shifting cultivation) অভ্যস্ত স্থানান্তরী (Migratory) জনজাতি। এঁরা ছিলেন তখনো আদিম জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত প্রকৃতি-নির্ভর। খাদ্য উৎপাদনের তুলনায় শিকার, মাছ ধরা এবং খাদ্য সংগ্রহ, বনজ সংগ্রহ (Gleeling) করাই ছিল তাঁদের মুখ্য জীবিকা। তাঁদের জীবিকার প্রধান উৎস ছিল বনভূমি। জাতি-সঙ্গতিগত বৈচিত্র্যের দিক থেকে এঁদের সংখ্যা বেশি হলেও এঁদের মিলিত জনসংখ্যার তুলনায় প্রাক্-ব্রিটিশযুগে অরণ্য ও প্রাকৃতিক সম্পদ ছিল অফুরন্ত। এঁদের জীবনযাত্রার মান ছিল একান্ত সেকেলে, চাহিদা ছিল ন্যূনতম। মাছ ধরা, শিকার, বনজ সংগ্রহ (Gleeling) এবং ঝুম চাষ ছিল তাঁরদের জীবিকার ব্যাপ্তি। তাঁদের উৎপাদনের উপকরণ ও প্রকৌশল এত সেকেলে (Sidentry) যে তাতে শুধুমাত্র জীবনধারণের উপযোগী (Subsistance) খাদ্য সংগ্রহ বা উৎপাদন করতে সক্ষম ছিলেন। তাঁদের উদ্বৃত্ত উৎপাদনের পরিমাণ ছিল নগণ্য। তবে জনসংখ্যার তুলনায় বনজ সংগ্রহের পরিমাণ বেশি ছিল পর্যাপ্ত; কিন্তু ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ বন্য জন্তুর আক্রমণ প্রতিরোধ করা বা আত্মরক্ষার মতো হাতিয়ার তাঁদের ছিল না। লোকবলও ছিল খুব কম।



রাভাদের বিবাহ আচার অনুষ্ঠান — *স্থান : পূর্বপালবাড়ি*

তখনকার দিনে এসব জনজাতি-গ্রামের সমগ্র ভৌগোলিক এলাকার প্রাকৃতিক উপাদানের সাহায্যেই চিহ্নিত হত এবং তা ওই বিশেষ জনজাতি গোষ্ঠীর যৌথ সম্পত্তি (Community property) হিসেবে পরিগণিত হত। তাঁদের গ্রামগুলিকে সাধারণত একটিমাত্র



টোটোপাড়ায় আদিবাসী কল্যাণকেন্দ্র ও গ্রন্থাগার

জনজাতি গোষ্ঠী (Mono-ethnic Village) বসবাস করতেন। প্রাক্-ব্রিটিশযুগে এই অঞ্চলে ভূমিব্যবস্থার থেকে 'মহলবাড়ি ব্যবস্থায়' (Regulation of 1822) মতো এক ধরনের ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। এক-একটা জনগোষ্ঠীর নামে সাধারণত এক-একটা গ্রাম পত্তন করা হত। এলাকাটি নথিভুক্ত করা হত ওই বিশেষ জনগোষ্ঠীর গোষ্ঠীপ্রধান (Tribal Chief) বা ধর্মীয় প্রধানের (Religion Head) নামে। ওই জনজাতির প্রতিটি পরিবারের প্রধানের নামে মাথাপিছু কর বা দা-খাজনা (Capitation Tax) আদায় করে প্রতি বছর তা সরকারি আমলার হাতে তুলে দেয়ার দায়িত্ব থাকতো গ্রামপ্রধানের ওপর। তিনি তাঁর জনগোষ্ঠী এবং সরকারেরর মধ্যে প্রধান সংযোগকারী (Liaison) হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন। এসব গ্রামে বসবাসকারী প্রজাদের প্রতি বছর কোনও এক সময়ে সরকারি কাজে বেগার শ্রমদান (free labour) করতে হতো। আবার বছরের মধ্যে নির্দিষ্ট কয়েকদিন ধর্মীয় প্রধান এবং গ্রামপ্রধানের কোনও কাজের বেগার শ্রমদান করতে হত।

এধরনের জনজাতি-গ্রামে ধর্মীয় প্রধান (Religious Head) এবং অধর্মীয় প্রধানের (Secular Head) অধীনে দ্বি-স্তর গ্রামশাসন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল (Two tier Village organisation)। গ্রামের ধর্মীয় ও সামাজিক সব সমস্যার সমাধান করতো। বর্তমান গ্রাম পঞ্চায়েতের তুলনায় এধরনের গ্রাম সংগঠনের ক্ষমতা ছিল অনেক বেশি এবং শাসনের শেকড় প্রোথিত ছিল পরিবার ও সমাজের অনেক গভীরে। এ ধরনের জনজাতি-মানসিকতায় জমি বা জঙ্গল কোনওভাবে বিক্রয়যোগ্য সম্পত্তি হিসেবে পরিগণিত হত না। তা ছিল ধরিত্রীর সম্পদ। সে কারণেই নতুন কোনও স্থানে গ্রাম পত্তনের পর সেখানকার জমি ও সকলপ্রকার প্রাকৃতিক সম্পদ, গ্রামে বসবাসকারী প্রতিটি পরিবারেরর যৌথ সম্পত্তি হিসেবে চিহ্নিত হত। এমন কি উৎপাদন এবং বণ্টনের ক্ষেত্রে যৌথ শ্রমের ব্যবহার শ্রম বিনিময়ের (Reciprocal exchange of labour) মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হত। ব্রিটিশ শাসন প্রবর্তিত হওয়ার পর এ ধরনের গ্রামপত্তন ব্যবস্থার বিলোপ ঘটে। সম্ভবত বর্তমান টোটোপাড়ায় 'টোটো' জনজাতির গ্রাম এ ধরনের ভূমিব্যবস্থায় সর্বশেষ নিদর্শন।

লেপ্‌চা এবং ড্রুকপা (ডুকপা) ছাড়া এই ভৌগোলিক অঞ্চলে বসবাসকারী আর সব জনজাতিই ছিলেন সর্বপ্রাণবাদে (Animism) বিশ্বাসী। বক্সা অঞ্চলের ড্রুকপা জনজাতি তিব্বতি বৌদ্ধধর্মের কারমা-পা শাখার মতাবলম্বী। তবে বৌদ্ধসূত্রে দীক্ষিত হলেও এসব জনজাতি এখনও মন থেকে তাঁদের আদি-সর্বপ্রাণবাদী ধর্মীয় ধারাকে মুছে ফেলতে পারেননি। এখনও তাঁরা বৌদ্ধধর্মের পাশাপাশি প্রাচীন ধর্ম বিশ্বাস অনুসারী লৌকিক দেব-দেবতার পূজা-পার্বণ ও প্রায়শ্চিত্ত করে থাকেন। এঁরা সকলেই উত্তর বাংলার অন্যান্য জনজাতির নিজ নিজ নৃ-গোষ্ঠীগত পরিচয় বহনকারী পোশাক নিজেরাই প্রস্তুত করতেন। এই রীতিকে অনুসরণ করে এই ভৌগোলিক অঞ্চলে তুলোর চাষ, রং প্রস্তুত এবং লৌকিক বয়নশিল্পের বিকাশ ঘটেছিল। এখন সেই ধারা লুপ্তপ্রায়।

এই অঞ্চলে বসবাসকারী প্রতিটি জনজাতির নিজস্ব 'ভাষা' ছিল। কিন্তু দু-একটি ছাড়া অধিকাংশ জনজাতির কোনও লিপি ছিল না। এসব জনজাতি নিজস্ব ভাষায় রচনা করেছেন তাঁদের লোক-সংস্কৃতির সমৃদ্ধ উপাদান—গান, মন্ত্র, লোককথা, প্রবাদ প্রবচন। এসব জনজাতি আন্তঃগোষ্ঠী (Intra-tribal) যোগাযোগের ক্ষেত্রে নিজ নিজ মাতৃভাষা ব্যবহার করলেও আন্তঃগোষ্ঠী যোগাযোগের (Inter-community communication) ক্ষেত্রে প্রতিবেশী জনজাতি ভাষার ব্যবহারে আগ্রহী ছিলেন। তবে এ ধরনের যোগাযোগের ক্ষেত্রে তাঁরা অসম অঞ্চলের মতো যোগাযোগের সাধারণ ভাষা (Lingua-franca) হিসেবে আঞ্চলিক বাংলা ভাষাই অনিখুঁতভাবে ব্যবহার করতেন। এসব জনজাতি তাঁদের বিশেষ উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী একদিকে যেমন নিজ নিজ গ্রামেই 'বলদিয়াদের' কাছে বিক্রি করতেন, তেমনি স্বল্প দৈর্ঘ্যের বাণিজ্যিক পরিক্রমায়ও বের হতেন। ডোয়য়া, ড্রুকপা, টোটো, তভুদের মতো ভুটান পাহাড়ের ভূটিয়ারাও প্রবল শীতের দিনগুলিতে সমতলের মেলায় (যেমন জল্পেশ মেলা/রাসমেলা) বা হাটেবাজারে নেমে আসতেন তাঁদের বাণিজ্য পণ্য নিয়ে। স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই মাথায় থাকত লম্বা বেণী। টোটোরাও তখন ভূমিয়াদের মতো চুল না কেটে লম্বা বেণী রাখতেন (লেখকের নিজের চোখে দেখা)। ফলে এসব জনজাতির মধ্যে অনেকেই একাধিক ভাষা বিশেষ করে আঞ্চলিক বাংলা ভাষা রপ্ত করতেন তাঁদের রাজনৈতিক-বাণিজ্যিক প্রয়োজনের তাগিদেই।



জেলা পরিষদের উদ্যোগে টোটোদের মধ্যে বণ্টিত কম জ্বালানির চুল্লি — *ছবি : সলিল আচার্য*

অধুনালুপ্ত বিভিন্ন জনজাতিগোষ্ঠী ছাড়া বর্তমানে যেসব জনজাতি জলপাইগুড়ি জেলায় বসবাস করেন, প্রাকৃতিক সম্পদ, জীবিকার উৎস এবং জীবিকাভঙ্গির দিক থেকে তাঁদের বসবাসের এলাকাকে চার ভাগে চিহ্নিত করা যায়—(১) উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল (২) অরণ্যবলয় (৩) চা-বলয়, ও (৪) কৃষিবলয়।

১। উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলের জনজাতি

জলপাইগুড়ি জেলার পার্বত্য অঞ্চলে প্রাক্-ব্রিটিশ যুগে যেসব জনজাতি বসবাস করতেন, তাঁদের বেশির ভাগই ছিলেন ভুটানের শাসকসূত্রে আগত জনজাতি। ভুটিয়াদের এই এলাকা ছেড়ে যাওয়ার সময় এসব জনজাতি ভুটানে আশ্রয় নিয়েছেন, প্রাক্-ব্রিটিশ যুগে বর্তমান জলপাইগুড়ি জেলার ভৌগোলিক এলাকায় সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল না বললে চলে। সমতল এলাকায় দু-চারটি 'মাল্লি' বা সড়ক (যেমন—রংধামাল্লি ভাঙামাল্লি, ঘোয়োমালি প্রভৃতি। মাল্লি—সড়ক বা উঁচু মাটির বাঁধ : ভোট শব্দ) থাকলেও দুর্গম এলাকাগুলির সঙ্গে কোনও সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল না। অন্যদিকে এ জেলার নদীগুলি খরস্রোতা এবং অনাব্য। কিন্তু শীতে শীর্ণ এই নদীগুলিই শুখা মরসুমে যাতায়াতের পথে পরিণত হত। তখন রসদ ও বাণিজ্যিক পণ্য পরিবহনে ব্যবহার করা হত ঘোড়া, খচ্চর ও বলদ (এখনও ভুটানের দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে পণ্য পরিবহনের ব্যবহার করা হয় 'আফ্‌সু ঘোড়া' এবং খচ্চর)।

প্রাক্-ব্রিটিশযুগে জনজাতি গ্রামগুলিতে কোচবিহার, রংপুর, দিনাজপুর, পূর্ণিয়া প্রভৃতি এলাকা থেকে পণ্য পরিবহনের জন্য যানবাহনের পরিবর্তে বলদের পিঠে বোঝা চাপিয়ে 'বণিজে'র (বণিকের) দল বিনিময় বাণিজ্য চালাতেন। বলা বাহুল্য এ ধরনের একমুখী বাণিজ্যিক ব্যবস্থায় (Lenier trade systems) ধূর্ত বলদিয়ারাই (বণিকেরাই) লাভবান হতেন। এ ধরনের সীমাবদ্ধ একমুখী বাণিজ্যিক প্রক্রিয়ার পাশাপাশি ভুটানের বণিকরাও বিভিন্ন 'দুয়ারের' মধ্যে দিয়ে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে বাণিজ্য করতেন। এছাড়া ভুটানের 'জিনকাফ' (Zincaff) রাজ রাজপুরুষ এবং ধর্মীয় লামাদের পরিক্রমার কাজেও প্রশাসনিক প্রয়োজনে দ্রুত রসদ ও পণ্যসামগ্রী পরিবহনে নিয়োগ করা হত দক্ষ শ্রমসক্ষম 'ভারবাহী' (Porter)। সে সময় এ ধরনের ভারবহনের জন্য ভুটান প্রশাসনের পক্ষ থেকে পাহাড় ও সমতলের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানগুলিতে (Strategic point) টোটো, ডোয়য়া, ডুক্‌পা, জলদা প্রভৃতি জনজাতি এবং 'দোভাষিয়া' সম্প্রদায়ের বসতি স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। টোটো জনজাতির মতো এঁদের কোনও কোনও জনজাতি তাঁদের বাণিজ্যিক পরিক্রমায় বিনিময় ও বিক্রয়যোগ্য পণ্য হিসেবে লেনদেন করতেন বনৌষধি, লাক্ষা, মুর্ঘিলতা, চিরতা, ছুরপি, পশম, কমলালেবু, চাময় ইত্যাদি।

এই অঞ্চলে ভোট শাসনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ডোয়য়া, ডুক্‌পা, সোনিয়া, তন্ডু, টোটো (বর্তমান টোটোপাড়ার টোটোরা ডুলকায় থেকে যান) প্রভৃতি জনজাতির অধিকাংশই ভুটানে চলে গিয়েছেন অথবা স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে মিশে গিয়েছেন। 'জল্‌দা' এবং 'মাল-জলদা' সম্প্রদায় অবশ্য তারপরও থেকে যান। হলাপাড়ার কাছে 'জলদাপাড়া' গ্রামের জলদা সম্প্রদায় পঞ্চাশের দশকেও সম্ভবত সেখানে ছিলেন। [প্রাক্তন মন্ত্রী ননী ভট্টাচার্য জলদাদের গ্রামে গিয়ে তাঁদের দেখেছেন এবং তাঁদের ঘরে চা ও ভুট্টা খেয়েছেন বলে বর্তমান লেখককে জানান। তবে কয়েকজন জলদা বর্তমানে নিজেদের পরিচয় গোপন করে অন্য একটি সম্প্রদায়ের (জলদাপাড়া অভয়ারণ্যের পাশেই) গ্রামে বসবাস করছেন বলে লেখক জানতে পেয়েছেন।] আলিপুরদুয়ারের কাছে 'ভল্‌কা' পরগনার জল্‌দাদের দুটো জোতও ছিল বলে সাত্তার সাহেব তাঁর প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন।

এসব জনজাতির মধ্যে টোটো, ডোয়য়া, ডুক্‌পা ছাড়া এখন জেলায় এই গোষ্ঠীর আর কোনও জনজাতি দেখা যায় না। এঁদের ক্ষুদ্র জনসংখ্যা, আদিম প্রকৌশল ও সেকেলে মানসিকতার জন্য এসব জনজাতি দীর্ঘদিন উত্তরবঙ্গে বসবাস করলেও আলোচ্য ভৌগোলিক অঞ্চলে কোনও 'ভৌম সাংস্কৃতিক দৃশ্যপটের' (Geo-Cultural landscape) ছাপ রেখে যেতে পারেননি। কিন্তু এই অঞ্চলের চা- বাগান ও গ্রাম নামে, স্থান নামে, নদী বা বনভূমির নামকরণে তাঁরা তাঁদের সাংস্কৃতিক অস্তিত্বের ছাপ রেখে গিয়েছেন। আর তাঁদের প্রতিবেশী লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে রেখে গিয়েছেন তাঁদের চিয়ারত সংস্কৃতির প্রবহমান ধারা, যা এখনও এগিয়ে চলেছে।

ছিলেন ভুটান সরকারের 'জাপো' (Zapo) বা দাসপ্রজা। তাঁরা সরকার নির্দিষ্ট গ্রামে বসবাস করতেন এবং প্রশাসনের প্রয়োজনে বেগার শ্রমদানে বাধ্য থাকতেন বা ভারবাহী হিসেবে পণ্যদ্রব্য ও রসদ ইত্যাদি এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পৌঁছে দিতে বাধ্য থাকতেন। ভুটান প্রশাসন ও ভুটানের বণিকদের প্রয়োজনে জলপাইগুড়ি জেলার পার্বত্য অঞ্চলে বিভিন্ন জনজাতি বসতি স্থাপন করেন। এই অঞ্চলে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসন সম্প্রসারিত হওয়ার পর একমাত্র বর্তমান টোটোপাড়া ছাড়া আর সব পার্বত্য অঞ্চলের পরিবর্তন ঘটে। অধিকাংশ এলাকা থেকেই জনজাতির মানুষরা উৎখাত হয়ে যান, তাঁদের পরিত্যক্ত খাসভূমিতে পত্তন করা হয় চা-বাগান অথবা স্বাভাবিক নিয়মে তা বনভূমিতে পরিণত হয় (যেমন-তন্ডু, গোনিয়া, ডয়ামায়া, চেংমারি, জলদাপাড়া ইত্যাদি)। এঁদের নিঃশব্দ অভিগমনের পর এই অঞ্চলে থেকে গেলেন টোটো এবং ড্রুকপা সম্প্রদায়। পরবর্তীকালে নেপাল থেকে আগত বিভিন্ন জনজাতির মানুষ (অন্যান্য সম্প্রদায়ের নেপালিও) এসব পার্বত্য অঞ্চলে হয় চা-শ্রমিক হিসেবে, তা না হলে সাধারণ সাবেক পদ্ধতি অনুসরণকারী চাষী বা অন্য পেশা গ্রহণ করে এই অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসতি বিস্তার করেন।

নেপাল থেকে আগত অভিবাসী জনজাতির মানুষেরা নিজ নিজ ভাষাকে প্রায় অস্বীকার করে নেপালি ভাষাকে তাঁদের শিক্ষার বাহন হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছেন। কোনও কোনও বিচ্ছিন্ন এলাকায় তাঁরা হিন্দি ভাষায় মাধ্যমে পড়াশুনো করছেন (সুযোগ থাকলেও বাংলা ভাষার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেননি)। তবে এটাও ঠিক যে তাঁদের সামনে খ্রিস্টান মিশনারিরা হিন্দি ভাষা-সংস্কৃতির সুযোগ যেভাবে তুলে ধরেছিল, সেভাবে বাংলা ভাষা শেখার সুযোগ তুলে ধরা হয়নি। এর ফলে এসব জনজাতির মানুষদের সঙ্গে সাংস্কৃতিক সংহতির প্রক্রিয়া বিশেষভাবে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। অন্যদিকে টোটোপাড়া এবং বক্সা এলাকায় বসবাসকারীর ড্রুকপা (ডুকপা) এবং টোটোপাড়ায় বসবাসকারী টোটোদের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের প্রয়োজনে বাংলা ভাষায় প্রচলন ঘটায় এঁরা যেমন উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ পাচ্ছেন, তেমনি বাংলা ভাষা-সংস্কৃতির সঙ্গে এঁদের একটা সম্পর্কও গড়ে উঠেছে। পার্বত্য অঞ্চল ছাড়া বর্তমানে জলপাইগুড়ি সমতল অঞ্চলে এসব জনজাতির মানুষদের আর দেখা যায় না, তবে আর্থ-সামাজিক দিক থেকে উন্নয়নের কাজে গত দু-দশকে রাজ্য সরকার বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করায় এঁদের জীবনে গতি সঞ্চার হয়েছে।

২। অরণ্যবলয়ে বসবাসকারী জনজাতি

জলপাইগুড়ি জেলার স্থানীয় জনজাতি বা আদি জনজাতির প্রায় সকলেই এক সময় বনভূমি এলাকায় বসবাস করতেন এবং ক্ষেত্রান্তরী ঝুম চাষ ও স্থানান্তরী বসতি স্থাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। কিন্তু এই অঞ্চলে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসন প্রসারিত হওয়ার পর সামগ্রিকভাবে জনসংস্থান চিত্রের একটা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে যায়। ব্রিটিশের সর্বগ্রাসী ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা এই অঞ্চলের পাহাড়, সমতল, বনভূমি ও জলাভূমি, নদীনালা সমস্ত ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর জাঁকিয়ে বসল। প্রকৃতির সব উপাদানের মধ্যেই তারা আয়ের (Revenue) উৎস খুঁজতে লাগল। ফলে এই অঞ্চলের সাবেক বা আদি জনজাতির মানুষেরা (মেচ, বোড়ো, গারো, রাভা, পানি-কোচ, ধিমাল প্রভৃতি) তাঁদের চারপাশের প্রকৃতির বাস্তুতন্ত্রগুলির (Eco-system) ওপর সহজাত অধিকার হারালেন। এই অঞ্চলে বসবাসকারী অধিকাংশ জনজাতি উত্তরমুখী (ভুটান-ডায়নাপারি, হাউড়িখা প্রভৃতি এলাকা) এবং পূর্বমুখী প্রব্রজনের (Northward and Eastward migration) শরিক হলেন। তাঁদের মধ্যে যাঁরা থেকে গেলেন, তাঁদেরই সামান্য একটা অংশ বনবিভাগের চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক হিসেবে স্থান পেলেন। পরিণামে এঁদের জীবিকা-ভঙ্গির একটা আকস্মিক পরিবর্তন ঘটাল। ঝুমচাষী থেকে এঁরা পরিবর্তিত হলেন 'টঙ্গিয়া-চাষী'তে। সাবেক স্থানান্তরী জীবন ছেড়ে স্থান পেলেন সরকার নির্দিষ্ট বনবস্তিতে—খাঁচায় বন্দী পাখির মতো।

আসলে নতুন গড়ে ওঠা বনবিভাগের প্রতিদিনের কাজের জন্য তখন শ্রমিক প্রয়োজন। কিন্তু এই জনবিরল বনাঞ্চলে শ্রমিক পাওয়া কঠিন। এই সমস্যা সমাধানের জন্য ১৮৯৪ সালে গৃহীত হল টঙ্গিয়া আইন। এই আইন অনুসারে টঙ্গিয়া শ্রমিক হিসেবে বহু জনজাতির মানুষ স্থান পেলেন বনবস্তিতে। এসব লোকালয় বিচ্ছিন্ন বনবস্তিতে তাঁরা পেলেন বাসগৃহ, নির্দিষ্ট সংখ্যক পশুপালনের এবং নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিচাষের অধিকার। তাছাড়া নতুন করে গাছের চারা লাগানোর আগে এবং পরে দুই সারির মাঝখানের জমিতে তাঁরা নানা ধরনের ফসলচাষের অধিকার পেলেন। এভাবে জেলার বনাঞ্চলে গড়ে উঠল মোট ৭৮টি বনবস্তি। বসবাসের দিক থেকে, জাতিগত জনসংস্থাপনের দিক থেকে এসব জনজাতিকে দু ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন (১) স্থানীয় জনজাতি এবং (২) অভিবাসী জনজাতি। মেচ, রাভা, গারো প্রভৃতি জনজাতি উত্তরবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা। এঁরা এখানকার আদি বা স্থানীয় জনজাতি। আবার চা-বাগান পত্তনের সময় এবং পরে চা-বাগানের মতো বনাঞ্চলেও এসে উপস্থিত হলেন ছোটনাগপুর অঞ্চল থেকে মুণ্ডা, ওঁরাও, হো, কোরা, সাঁওতাল

টোটোপাড়া এবং বক্সা এলাকায় বসবাসকারীর ড্রুকপা (ডুকপা) এবং টোটোপাড়ায় বসবাসকারী টোটোদের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের প্রয়োজনে বাংলা ভাষায় প্রচলন ঘটায় এঁরা যেমন উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ পাচ্ছেন, তেমনি বাংলা ভাষা-সংস্কৃতির সঙ্গে এঁদের একটা সম্পর্কও গড়ে উঠেছে।

প্রভৃতি জনজাতি এবং নেপাল থেকে এলেন রাই, লিম্বু, শেরপা, প্রভৃতি জনজাতি। এঁরাও চা-শ্রমিকদের মতো সকলেই চুক্তিবদ্ধ বনশ্রমিক হিসেবে বসবাসের অনুমতি পেলেন। তবে টঙ্গিয়া প্রথা অনুসারে বনবস্তি পত্তনের প্রথমপর্বে স্থানীয় জনজাতিগোষ্ঠীকেই বিশেষ প্রাধান্য প্রদান করা হয়েছিল, সেটা তাঁদের প্রতি কোনও প্রকার দাক্ষিণ্য দেখানোর জন্য নয়। কারণ, সে সময় দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলায় চা-বাগান পত্তনের জন্য যে বিপুল পরিমাণ শ্রমিকের প্রয়োজন, তা যে পদ্ধতিতে ছোটনাগপুর সাঁওতাল পরগনা প্রভৃতি অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করা হত, বনবিভাগের মতো সরকারি সংস্থার পক্ষে তা সম্ভব ছিল না। পরবর্তীকালে চা-বাগানে শ্রমিকের-চাহিদা মিটে যাওয়ার পর এবং মেয়াদি শ্রমিকদের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর স্থানীয় মেচ, রাভা জনজাতির পাশাপাশি ওঁরাও, মুণ্ডা, কোরা প্রভৃতি জনজাতির মানুষও বনবস্তিতে এসে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক হিসেবে (এঁদের কোনও কোনও গোষ্ঠী সরাসরি নিজ নিজ জন্মগ্রাম থেকেও এসেছিলেন) বসবাস শুরু করেন। তবে টঙ্গিয়া প্রথা অনুযায়ী গ্রাম পত্তনের প্রথম পর্বে অনাবাসী জনজাতির সংখ্যা কম হলেও বনবস্তিগুলিতে জনজাতির মানুষেরা ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। ১৯১৬-১৭ সালের বনবিভাগের এক 'কর্ম প্রকল্প' (Working Plan) থেকে দেখা যায় যে জলপাইগুড়ি জেলায় বনাঞ্চলের মোট ৫৬৭ ঘর বাসিন্দাদের মধ্যে রাভা, মেচ্ (বোড়ো), ওঁরাও, মুণ্ডা প্রভৃতি জনজাতি পরিবারের সংখ্যা ছিল ৪৮৬। এসব জনজাতির মানুষ যখন প্রথম বনবস্তিতে বসতি স্থাপন করেন, তখন ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ প্রশাসনের শোষণ ও শাসনের মাত্রা কেমন ছিল তা স্বাধীনতার ৫৩ বছর পরে পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে বসে অনুভব করা যাবে না। মূল সমাজ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে দুর্গম বনাঞ্চলে বসবাস করার ফলে বনবিভাগের কর্তারা তাঁদের সঙ্গে প্রায় দাসসুলভ ব্যবহার করত। সেই সময় চুক্তি অনুসারে বনশ্রমিকদের প্রতিটি পরিবার তিন প্রকার জমিতে স্থায়ীভাবে চাষ করার সুযোগ পেতেন। এছাড়া নতুন তৈরি বনাঞ্চলে (New Plantation) চারাগাছের দুসারির মাঝখানেও নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে চাষ করার সুযোগ পেতেন। চাষের জন্য একজোড়া বলদ এবং দুধের জোগানের জন্য (যা প্রায়শই তাঁদের সন্তানদের ভাগ জুটত না) দু-একটা গরু রাখার অধিকার পেতেন। পরিবর্তে তাঁদের প্রায় বিনা পারিশ্রমিকে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হত। সে সময় একপ্রকার পুরোনো আবাদের (Old Plantation) বা একমাইল জঙ্গলের রাস্তা পরিষ্কার করলে দলগতভাবে তাঁদের মজুরি দেওয়া হত মাত্র পাঁচ টাকা। অন্যান্য জনগোষ্ঠীর তুলনায় তখনকার দিনে আরও বেশি পিছিয়ে থাকায় বনবস্তিতে বসবাসকারী জনজাতিগোষ্ঠীর মানুষেরা অনেক বেশি বঞ্চনা ও শোষণের শিকার হতেন।

সারণি-২

উত্তরবঙ্গের বনবস্তি ও বনবস্তির (নিবন্ধীকৃত) জনসংখ্যা (১৯৯৯-২০০০)

জেলা ও বনবিভাগ	বনবস্তির সংখ্যা	নিবন্ধীকৃত পরিবারের সংখ্যা	মোট জনসংখ্যা	তফসিলি জাতি/ জনজাতি	বনবস্তির মোট এলাকা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
(ক) জলপাইগুড়ি জেলা					
(১) জলপাইগুড়ি বনবিভাগ	২০	৪১৯	৫০৩৪	৩৭৭৮	৮০৭.২৫ হে.
(২) জলপাইগুড়ি বন্যপ্রাণী বিভাগ-দুই	০৬	১৮২	২৩৯৬	২১৫২	২১৯.২৫ হে.
(৩) বক্সা বনবিভাগ	৩৭	৯৫৯	১৫৮২৯	৮৭৪৫	১৫৮৮.১৭ হে.
(৪) কোচবিহার বনবিভাগ	১৫	১৫৫	৫৪৯৫	৫৪৯৫	৬৮৩.০০ হে.
জেলায় মোট	৭৮	১৭১৫	২৮৭৫৪	২০১৭০	৩২৯৭.৬৯ হে.
(খ) দার্জিলিং জেলা					
(১) কার্শিয়াং বনবিভাগ	২৭	৩৮০	৫২১০	৩১০১	১৭৯.৫৪ হে.
(২) কালিম্পং বনবিভাগ	৩৩	৭৬৬	৬৯৮১	২৭১৮	৭৫৮.২৯ হে.
(৩) দার্জিলিং বনবিভাগ	৩৬	৩৪৭	৫৫৪৮	৩২৪৯	১৬১.৬৬ হে.
জেলায় মোট	৯৬	১৪৯৩	১৭৭৩৯	৯০৬৮	১০৯৯.৩৯ হে.
(ক) + (খ) মোট	১৭৪	৩২০৮	৪৬৪৯৩	২৯১৭৮	৪৩৯৭.০৮ হে

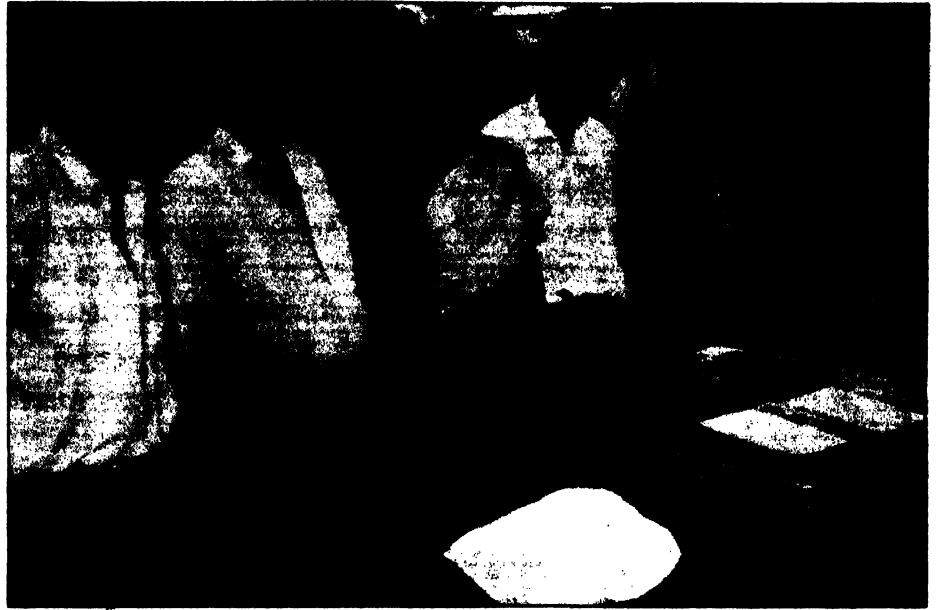
উৎস : Divisional Forest Office.

Forest Village Development Division, Jalpaiguri.

ওপরের সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে যে জলপাইগুড়ি জেলায় ৭৮টি বনবস্তিতে নিবন্ধীকৃত বনশ্রমিক (Registered Forest Villagers) এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যকে নিয়ে মোট জনসংখ্যা ২৮৭৫৪। তুলনায় বনবস্তির এলাকা খুবই কম। অন্যদিকে বনবস্তির

মোট জনসংখ্যার মধ্যে ২০১৭০ জন (জলপাইগুড়ি জেলায়) তফসিলি জাতি ও জনজাতির মানুষ। বলা বাহুল্য এই জনসংখ্যার ৮০% শতাংশই জনজাতির মানুষ। নিরক্ষরতা এবং বহির্জগত সম্পর্কে ব্যাপক অজ্ঞতার জন্য এসব জনজাতির বনশ্রমিকরা বিভিন্ন সময় শোষণ-বঞ্চনার শিকার হয়েছেন।

১৯৪০-৪১ সালের বনবিভাগের প্রতিবেদনে দেখা যায় যে সে সময় উত্তরবঙ্গের অধিকাংশ বনবস্তির বনশ্রমিকদের পরিবারপ্রতি বার্ষিক আয় ছিল স্থানীয় খেতমজুর বা দিনমজুরদের তুলনায় এমন কি চা-শ্রমিকদের তুলনায়ও অনেক বেশি। কিন্তু একই প্রতিবেদনে শুধুমাত্র বক্সা বনাঞ্চলের বনশ্রমিকদের আর্থিক অবস্থার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে—"it was found that since the taccavi advance had been stopped, the villagers invariably fell into the clutches of usurious money-lenders. In spite of their good income from paddy, jute, cotton and mustard grown in their fields and in their taungyas and of the good wages they earned from various works in the forest, the economic condition of the forest villagers was miserable." (Annual progress-report on Forest Administration in the Presidency of Bengal for the year 1940-41 : 56 :)



জেলা পরিষদের উদ্যোগে রাজ্যের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ কম জ্বালানির রন্ধনের চুল্লি ব্যবহার প্রদর্শন করছেন টোটো উপজাতিদের মধ্যে

এই প্রতিবেদন থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে বনশ্রমিকদের স্বার্থ কত অরক্ষিত ছিল। অনেক বেশি অর্থ উপার্জন করেও তাঁরা সুদখোর মহাজনদের অপকৌশলের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হতেন।

ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসন অবসানের পরও প্রথম তিন দশক সরকারি ঔদাসীন্যে বনবস্তিবাসীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার কোনও উন্নতি ঘটেনি। বনবস্তিগুলিতে ব্যাপক অনুপ্রবেশসহ নানা সমস্যায় তাঁদের প্রকৃত আয় বরং আরও কমে যায়। বিশেষ করে ১৯৫১ সালের ভারত-নেপাল চুক্তি সম্পাদনের পরিপ্রেক্ষিতে নেপাল থেকে বহু সংখ্যক ভূমিসন্ধানী মানুষ ভারতে আসেন। এসব অনাবাসী মানুষেরা তাঁদের নৃগোষ্ঠীগত অভ্যাস অনুসারে উত্তরবঙ্গের পাহাড় ও পাহাড়তলি অঞ্চলে অবস্থিত বনবস্তিগুলিতে অবাধে বসতি বিস্তার করেন। অন্যদিকে সচেতনতার অভাব এবং আধুনিক চিকিৎসা পরিষেবার কোনও সুযোগ না থাকায় নিবন্ধীকৃত বনশ্রমিকদের পারিবারিক জনসংখ্যাও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। এভাবে বনবস্তিগুলিতে পোষণক্ষমতার (carrying capacity) তুলনায় জনসংখ্যার চাপ অত্যধিক পরিমাণে বেড়ে যায়। কোনও কোনও বনবস্তিকে অনিবন্ধীকৃত (Non-registered) বা অনাবাসী বনবস্তিবাসীর সংখ্যা নিবন্ধীকৃত (Registered) বনশ্রমিকদের সংখ্যাকেও ছাড়িয়ে যায়। এর ফলে একদিকে যেমন বনবস্তির চিহ্নিত এলাকার বাইরেও চাষবাস পশুপালনের এলাকা সম্প্রসারিত হল, অন্যদিকে নিবন্ধীকৃত বনশ্রমিকদের অন্যতম জীবিকার উৎস অকাঠ বনজদ্রব্য সংগ্রহের (Gleening) ক্ষেত্রসহ জীবিকার অন্যান্য ক্ষেত্রেও ভাগীদারের সংখ্যা বেড়ে গেল। ফলে বনবস্তিবাসীর অর্থনৈতিক কর্মতৎপরতায় ক্ষেত্রে সুস্থতার পরিবর্তে নানা ধরনের সংকট (Hazards) দেখা দিল। আঘাত নেমে এল বন ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে (Ecological balance)।

স্বাধীনতা-পরবর্তী প্রায় তিন দশকেরও বেশি সময়ের অবহেলার অবসান ঘটিয়ে বর্তমান সরকার (বামফ্রন্ট সরকার) বনবস্তিবাসীর আর্থ-সামাজিক অবস্থায় অবস্থা ও পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য গঠন করে 'বনবস্তি উন্নয়ন বিভাগ' (Forest Village Development Division)। এই বিভাগ স্থাপন করার পর 'যৌথ বন পরিচালন কমিটি, (Joint Forest Management Committee), 'পরিবেশ উন্নয়ন কমিটি' (Eco-Development Committee) প্রভৃতি সংগঠন তৈরি করে এবং নানা ধরনের উন্নয়ন প্রকল্প রচনা করে বনবস্তিগুলির অর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রয়াস নিয়েছেন। তাছাড়া উত্তরবঙ্গের বনবস্তিগুলিকে বর্তমানে পঞ্চায়েতের আওতায় আনার ফলে সাধারণ গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারীর জনজাতির মানুষদের মতো, বনবস্তিতে বসবাসকারী জনজাতির মানুষদেরও আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানের নানা সুযোগ এনেছেন। আশা করা যাচ্ছে কিছুদিনের মধ্যে এই জেলায় বনবস্তিবাসী বনশ্রমিক এবং তাঁদের পরিজনদের জীবনে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সুযোগ আসবে।

৩। চা-বলয়

১৮৭৪ সালে জলপাইগুড়ি জেলার ডুয়ার্স অঞ্চলে চা-বাগান পত্তনের সূত্রপাত ঘটে (প্রথম চা বাগান অধুনা লুপ্ত 'গজলডোবা চা-বাগান')। সেই সূত্রে জনবিরল এই অঞ্চলে প্রথম দিকে দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চলের মতো নেপাল থেকে শ্রমিক নিয়ে আসা হয়। তাঁদের সাহায্যে বনজঙ্গল হাসিল করে বন্য জানোয়ার তাড়িয়ে চা-বাগান পত্তনের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু তা ফলপ্রসূ হয়নি। কারণ তরাই ও

ছোটনাগপুরের বনাঞ্চল থেকে চা-বাগান পত্তনের জন্য যে মানুষগুলি তখনকার ডুয়ার্সের অরণ্য অঞ্চলে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন তাঁরা হচ্ছেন—ওঁরাও, মুণ্ডা, সাঁওতাল, খেড়িয়া/খাড়িয়া (লোধা), অসুর মাহালি, ভূমিজ, কোরা/কোড়া, নাগোশিয়া, শবর, মালপাহাড়িয়া, পারহাইয়া, হো, বীরহড় প্রভৃতি জনজাতির মানুষ। সেই থেকে তাঁরা এবং তাঁদের বংশধররা এই অঞ্চলেই স্থায়ীভাবে থেকে গেলেন।

ডুয়ার্সের উষ্ণ, আর্দ্র, বৃষ্টিবহুল, সেঁতসেঁতে, অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় নেপালি শ্রমিকদের বাঁচিয়ে রাখাটাই সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। এই আবহাওয়া তাঁদের প্রাত্যহিক কাজের অগ্রগতির পক্ষেও অনুকূল ছিল না। তখন এই অঞ্চলের চা-কররা অসমের মতো সাওঁতালপরগনা, ছোটনাগপুর, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি এলাকা থেকে অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় জনজাতির মানুষদের শ্রমিক হিসেবে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করে। এসব জনজাতির মানুষেরা বিশেষ এগ্রিমেন্ট বা চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করে (টিপ সই দিয়ে) চা-বাগানে শ্রমিকের কাজ করতে এসেছিলেন। তাই তাঁদের বলা হত 'গিরমিটিয়া' (এগ্রিমেন্ট > গ্রিমেন্ট > গিরমেন্টয়া > গিরমিটিয়া)। এভাবে ছোটনাগপুরের বনাঞ্চল থেকে চা-বাগান পত্তনের জন্য যে মানুষগুলি তখনকার ডুয়ার্সের অরণ্য অঞ্চলে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন তাঁরা হচ্ছেন—ওঁরাও, মুণ্ডা, সাঁওতাল, খেড়িয়া/খাড়িয়া (লোধা), অসুর মাহালি, ভূমিজ, কোরা/কোড়া, নাগোশিয়া, শবর, মালপাহাড়িয়া, পারহাইয়া, হো, বীরহড় প্রভৃতি জনজাতির মানুষ। সেই থেকে তাঁরা এবং তাঁদের বংশধররা এই অঞ্চলেই স্থায়ীভাবে থেকে গেলেন। অন্যদিকে জেলার হিমালয় সংলগ্ন এলাকার কোনও কোনও চা-বাগানে নেপালি শ্রমিকরাও থেকে গেলেন। এঁদের অধিকাংশই তপসিলি জাতি/জনজাতির মানুষ।

এভাবে যেসব জনজাতির মানুষ চা-বাগানে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন, তাঁদের জীবন ছিল প্রায় ক্রীতদাসের মতো। এঁদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা যেমন ছিল না, তেমনি সামাজিক স্বাধীনতাও চা-করদের হস্তক্ষেপে প্রতিনিয়ত বিঘ্নিত হয়েছিল। তখনকার দিনে এক-একটি বিশেষ জনজাতি চা-বাগানের নির্দিষ্ট কোনও শ্রমিক লাইনে (শ্রমিকদের জন্য নির্মিত কুঁড়েঘরে) বসবাস করতেন। চা-বাগানের মালিক পক্ষের নির্দেশ অনুযায়ী নিজ নিজ সর্দারের হুকুম পালন করাই ছিল তাঁদের কর্তব্য। সমবেত ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান নাচ, গান ইত্যাদি নিজ নিজ জনগোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। জাতপাতের বিচারের বেড়াজালে তাঁরা এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায় থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন। এমন কি অন্য জনগোষ্ঠীর ছোঁয়া জলপান করাও ছিল কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। প্রতিটি জনগোষ্ঠীর পোশাক-আশাক, অলংকার সবই ছিল প্রথা অনুযায়ী এবং সেকেলে। তবে সম্ভবত একই ধরনের জীবনসংগ্রামের শরিক হওয়ায় তাঁদের মধ্য সাম্প্রদায়িক মনোভাব কোনওদিনই দেখা দেয়নি। বরং বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে সংহতির মনোভাব ব্রিটিশের বিভেদ নীতিকে অতিক্রম করে একটা সংগ্রামী সমতলে একত্রিত হতে সাহায্য করেছিল। ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে এসব জনজাতির মানুষের মূলত প্রকৃতিবাদী (Animist)। সেই সঙ্গে প্রতিবেশী হিন্দুধর্ম থেকেও লৌকিক উপাদান গ্রহণ করেছেন। হিন্দুরাও এঁদের অনেক লৌকিক দেবদেবীকে আপন করে নিয়েছেন। তাঁদের নাচ, গান, পুজো-পার্বণ প্রায় সব কৃষি ও শিকারকেন্দ্রিক। কিন্তু চা-বাগানে আসার পর প্রথমদিকে শিকারের সুযোগ থাকলেও, কৃষিকাজের তেমন কোনও সুযোগ না থাকায়, তাঁদের কৃষিকেন্দ্রিক উৎসবগুলি বাস্তবে তাৎপর্যহীন হয়ে পড়ে। ফলে ফাগুয়া, দশেরা, জিতিয়া, করম, সোহোরাই ইত্যাদি কয়েকটি বিশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠান ছাড়া আর সব অনুষ্ঠানই তাঁদের স্মৃতিতে ঘোলাটে হয়ে গিয়েছে।

চা-বাগান কর্তৃপক্ষের কঠোর শাসনে এসব দ্রাবিড়, অস্ট্রিক জনজাতির জীবন হয়ে পড়েছিল অনেকাংশে যান্ত্রিক। চা-বাগান এলাকার বাইরে এমন কি চা-বাগানের বাঙালি কর্মচারীদের

সঙ্গেও তাঁদের অবাধ মেলামেশার ক্ষেত্রে বাধা ছিল। সাপ্তাহিক হাট ছাড়া (যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চা-বাগানেই অবস্থিত ছিল) অন্য কোনও উপলক্ষে চা-বাগানের বাইরে যাওয়া নিষেধ ছিল। আসলে বাইরের জগৎ থেকে তাঁদের বিচ্ছিন্ন করে রেখে শোষণ করাই ছিল চা-করদের উদ্দেশ্য। তাঁদের দারিদ্রকে জিইয়ে রাখার জন্য মদ্যপানে উৎসাহ দেওয়া হত। জেলার অন্যান্য শ্রমিকদের তুলনায় তাঁদের মজুরি ছিল নগণ্য। ১৮৮৩ সালে একজন চটকল মজুরের মাসিক আয় ছিল যেখানে ১৩ টাকা ১২ আনা (১৩.৭৫), সেখানে ডুয়ার্সের একজন চা-শ্রমিকের মাসিক আয় ছিল মাত্র ৩ টাকা। ফলে হতদরিদ্র এই মানুষগুলোর জীবন ছিল দুর্বিষহ। চা-বাগানে উন্নত বাসগৃহ, পানীয় জল বা চিকিৎসা পরিষেবার কোনও উল্লেখযোগ্য আয়োজন ছিল না। ফলে রোগ-ব্যাধি ছিল তাঁদের নিত্যসঙ্গী। আর এ ধরনের রোগব্যাধি থেকে পরিত্রাণের জন্য তাঁদের নির্ভর করতে হত লোকচিকিৎসা বা কুসংস্কারাচ্ছন্ন 'জানগুরু'র ওপর। এ ধরনের ঘটনায় 'ডাইন' বা 'ডাইনি' চিহ্নিত করে হত্যার ঘটনাও বিরল ছিল না।

দুঃখের বিষয় ব্রিটিশ চা-করদের কঠোর শাসনের অবরোধ, চা-বাগান অঞ্চলে আশ্রয় স্থাপনের সুযোগ না থাকা এবং দেশীয় চা-করদের স্বাভাবিক প্রতিরোধ ও আন্দোলনের সূচিমুখ কৃষিবলয়ের দিকে কৌশলে ঘুরিয়ে রাখা প্রভৃতি কারণে ১৯৪৬-৪৭-এর আগে চা-বাগানে কোনও ধরনের প্রগতিশীল শ্রমিক সংগঠন (Trade Union) গড়ে ওঠেনি। ১৯৪৬-৪৭ সালে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় কৃষি-বলয়ে ব্যাপকভাবে 'তেভাগা' আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলনে জোতদার-জমিদারদের বিরুদ্ধে স্থানীয় রাজবংশী সম্প্রদায় সহ অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে কৃষিবলয়ের ও চা-বাগানে বসবাসকারী জনজাতির মানুষরাও এক বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে। 'তেভাগা আন্দোলনে' অংশগ্রহণ করে দুদফায় পুলিশের গুলিতে জলপাইগুড়ি জেলাতেই অন্তত ১২ জন জনজাতির কৃষক ও শ্রমিক শহিদের মৃত্যুবরণ করেন। তাঁদের এই বীরত্বপূর্ণ আত্মবলিদানের মধ্যে দিয়েই দোমোহনীয় (Bengal Duars Railway) রেলের শ্রমিকদের মাধ্যমে ডুয়ার্সের জনজাতি বা শ্রমিকদের প্রগতিশীল শ্রমিক আন্দোলনের সেতু রচিত হয়। তারপর গঠিত হয় তরাই ও ডুয়ার্সে চা-শ্রমিকদের মধ্যে বামপন্থী শ্রমিক সংগঠন।

এই সময় থেকে শ্রমিক সংগঠনের নেতৃত্বে চা-শ্রমিকদের জীবনে পরিবর্তনের জোয়ার আসে। দাবি জানানো হয় চা-শ্রমিকদের জন্য নতুনহারে মজুরি, আবাসন, পানীয় জল ও চিকিৎসা পরিষেবার। এরই পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত হয় কেন্দ্রীয় সরকারের 'বাগিচা শ্রমিক আইন' (Plantation Labour Act, 1951) এবং ১৯৫৬ সালে পশ্চিমবঙ্গে বিধিবদ্ধ করা হয় 'বাগিচা শ্রমিক আইনের ধারা' (Plantations Labour Rules)। এর ফলে চা শ্রমিকরা পাকা বাসগৃহ, বিশুদ্ধ পানীয় জল, জ্বালানি, চিকিৎসা পরিষেবা, প্রসূতি ভাতা এবং আট ঘণ্টা কাজের অধিকার লাভ করেন।

চা-বাগানের মালিকরা আজও ওই আইনের বিধিবদ্ধ ধারা অনুসারে চা-শ্রমিকদের জন্য উল্লিখিত সব ব্যবস্থা না করলেও অধিকাংশ চা-বাগানের মালিকরা নিজেদের স্বার্থেই পাকাবাড়ি তৈরি করার কাজ শুরু করে। এর ফলে শ্রমিকদের পূর্ববর্তী 'একক জনজাতি বস্তি ব্যবস্থা'র (Mono-ethinic Labour Lines) পরিবর্তন ঘটল। পাকা শ্রমিক আবাসগুলি পরিণত হল 'বিভিন্ন জনজাতি শ্রমিকের বস্তি'তে (Multi-ethinic Labour Lines)। এই ঘটনা তাঁদের সামাজিক জীবনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করল। তাঁরা তাঁদের জাতপাতের সংকীর্ণ গণ্ডি থেকে বেরিয়ে এলেন এবং সামগ্রিকভাবে শ্রমিক ঐক্য আরও সুদৃঢ় হল। গোষ্ঠীচেতনা থেকে শ্রেণীচেতনা বা সমষ্টি-চেতনার উত্তরণ ঘটল। এর পেছনে অবশ্যই বামপন্থী শ্রমিক আন্দোলনের অনুশাসন সামগ্রিকভাবে ক্রিয়াশীল ছিল, যা আজ তাঁদের চেতনা এবং চাহিদার মানকে উন্নত করেছে।

চা-বাগান অঞ্চলে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় ভাষা। এই জেলার (এবং উত্তরবঙ্গে) বসবাসকারী ৩১টি জনজাতির প্রত্যেকেই নিজ নিজ ভাষা, সংস্কৃতিকে বহন করে চলেছিলেন। অন্যদিকে তাঁদের নিজ নিজ মাতৃভাষার পাশাপাশি আন্তর্গোষ্ঠী যোগাযোগের স্বার্থে



রাভা জনজাতির রুস্তক পূজায় 'চকত' সেবন অনুষ্ঠান

সারণি-৩
উত্তরবঙ্গের নথিভুক্ত (Registered) চা-বাগান ও শ্রমিক সংখ্যা (১৯৯১)

এলাকার নাম	চা বাগানের সংখ্যা	আবাদি এলাকা	বাৎসরিক মোট উৎপাদন (হাজার কেজি)	শ্রমিক
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
দার্জিলিং	১০২	২০০৮৫	১৬২১৪	৪৭৬৩৭
তরাই (ক)	৮২	১৩৭৮৩	২৫০৫৯	৪০৫৩৯
ডুয়ার্স (খ)	১৬৩	৬৮০৫৪	১১৭৮৯৩	১৬৪৯৪৪

(ক) পশ্চিম দিনাজপুর, (খ) কোচবিহার সহ। [বর্তমানে আরও বহু নতুন চা-বাগান গড়ে উঠেছে, তা এই তালিকায় দেখানো হয়নি।]

উৎস : Tea Statistics, 1990-91, Tea Board, Calcutta

ছোটনাগপুর অঞ্চলে সৃষ্টি হয়েছিল সর্বজনগৃহীত একটি ভাষা। তার নাম 'সাদরি'। বাংলা, ওড়িয়া, ভোজপুরী ও জনজাতি শব্দের মিশ্রণে গঠিত আর্য-মূল এই ভাষা ডুয়ার্সে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। দ্রাবিড়, অস্ট্রিক দুটি জনগোষ্ঠীর মানুষই এই 'সাদরি'কে মাতৃভাষার মতো নিবিড়ভাবে গ্রহণ করেছেন। অনেক জনজাতির মানুষ এখন আর সাদরি ছাড়া অন্য কোনও ভাষা জানেন না। এই ভাষায় দেড়শো বছরেরও বেশি সময় ধরে তাঁরা রচনা করেছেন লোকসংস্কৃতির নানা সাহিত্যিক উপাদান, এমনকি মারণ-উচাটন, ঝাড়ফুঁকের মন্ত্রও। বর্তমানে ওই ভাষায় তাঁরা আধুনিক ছোটগল্প, নাটক এমনকি টেলিভিশনের উপযোগী কয়েকটি চলচ্চিত্রও নির্মাণ করেছেন (সাঁঝ-বিহান, পেয়ারকে ডহর ইত্যাদি)। অথচ এই ভাষা যা বাংলাভাষার খুবই কাছের ভাষা, সেই ভাষা বা বাংলা ভাষার পরিবর্তে ব্রিটিশ শাসকশ্রেণী এই অঞ্চলে চা-শ্রমিকদের সন্তানদের জন্য হিন্দি মাধ্যমে শিক্ষার প্রচলন করেন। আজও সেই নীতিই অপরিবর্তিত রয়েছে। এর ফলে রাজ্যের ভাষা সংস্কৃতির অংশে তাঁদের দূরত্ব বাড়ছে। শুধু তা-ই নয় হিন্দি মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার এবং চাকরির সুযোগ স্থানীয়ভাবে না হওয়ার তাঁদের আর্থ-সাংস্কৃতিক বিস্তারের ক্ষেত্রও সীমিত হয়ে পড়ায় এ বিষয়ে সচেতন প্রয়াস প্রয়োজন।

৪। কৃষিবলয়ের জনজাতি

জলপাইগুড়ি জেলার কৃষিবলয়ে প্রাচীনকাল থেকে মেচ (বোড়ো), রাভা, গারো প্রভৃতি জনজাতি বসবাস করছেন। এই অঞ্চলের সব গ্রামই সাধারণ রেভিনিউ ভিলেজের (Revenue Village) অন্তর্গত। চা-বলয়ে এসব জনজাতি কিছু কিছু এলাকায় যেমন একক জনজাতির গ্রামে বসবাস করেন, তেমনি অন্যান্য স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে মিশ্র জনগোষ্ঠীর গ্রামে বসবাস করেন। পরবর্তীকালে ১৮৬৯-এ জেলা গঠনের পর এই জেলার জনবিরল অবস্থার কথা চিন্তা করে সাঁওতাল পরগনা অঞ্চল থেকে কিছু জনজাতির মানুষকে এনে এখানে স্থায়ী বসতি বিস্তারের সুযোগ করে দেওয়া হয়। অন্যদিকে ১৮৭৪ সালে চা-বাগান পত্তনের সূত্রে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক হিসাবে যেসব জনজাতি উত্তরবঙ্গে এসেছিলেন, তাঁদের একটা অংশ চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর চা-বাগানের পার্শ্ববর্তী কৃষিবলয়ে জমিজমা কিনে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। আর দেশ বিভাগের পর ওপার বাংলা থেকেও গারো, হাজং, ম্রু, মগ, সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওঁরাও, মালপাহাড়িয়া প্রভৃতি জনজাতির মানুষ জলপাইগুড়ি জেলায় এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।

দীর্ঘকালসীমায় তিনটি পর্যায়ে বসতি স্থাপন করলেও এঁদের সকলেরই প্রধান জীবিকা কৃষি। তবে স্থায়ী গ্রামজীবনে অন্যান্য প্রতিবেশীদের সঙ্গে বসবাস করায় এঁদের কৃষিকাজের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন এসেছে। চিরাচরিত খাদ্যশস্য উৎপাদনের পাশাপাশি এঁরা মরসুমি শাক-সব্জির চাষ, পাট ইত্যাদি অর্থকরী ফসলের চাষে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন। অর্থাৎ গ্রামে অন্যান্য কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের তুলনায় এঁরা খুব বেশি পিছিয়ে নেই। বামফ্রন্ট সরকারের বর্গা অপোরেশনের ফলে সাধারণ ভূমিহীন চাষীদের মতো জনজাতি ভাগচাষীদের জীবনে অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব এসেছে। এসেছে একটা নিশ্চয়তাবোধ। ফলে এক্ষেত্রে তাঁরা এগিয়ে চলেছেন।

জেলার কৃষিবলয়ে বসবাসকারী জনজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে তিনটি ধর্মসংস্কৃতির ধারা প্রবাহিত। এঁদের অধিকাংশই তাঁদের সাবেক লৌকিক ধারায় প্রকৃতিবাদী (Animist)। এঁদের একটি অংশ খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছেন, তবে চা-বাগানে বসবাসকারী জনজাতিদের মতো, সংখ্যায় তাঁরা বেশি নন। এছাড়া রয়েছেন একদল জনজাতি যাঁরা বৌদ্ধধর্ম অবলম্বী (মগ, চাকমা প্রভৃতি)। এঁদের মধ্যে যাঁরা প্রকৃতি পূজারি এবং বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ ধর্মাচরণের পাশাপাশি প্রতিবেশী বিভিন্ন লৌকিক দেবদেবতার পূজা করে থাকেন। এঁরা নিজেদের দেবতা ছাড়া হিন্দুদের কালীপূজা, দুর্গাপূজা, সরস্বতী পূজা, শিবপূজা প্রভৃতি পূজায় অংশগ্রহণ করে থাকেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে জলপাইগুড়ি জেলায় সব সম্প্রদায়ের মধ্যেই ধর্মীয় গোঁড়ামি নেই বললেই চলে। ফলে এখানে বিভিন্ন লৌকিক পূজা-পার্বণে মুসলমান সম্প্রদায়কে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়। এমন 'মাসাং' নামক দেবতার (অপদেবতা?) পূজায় ওঝা বা মাহাতের (পূজারি) কাজে মুসলিম ধর্মাবলম্বীকেও অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়। অতীতে তিস্তা নদীর তীরে মান্ডাভারি গ্রামে মনসাপূজার সময় একটি মুসলিম পরিবারের সদস্যরা বংশানুক্রমে মনসার ভাসান ও মন্ত্রপাঠ করতেন। তিস্তা ভাঙনে গ্রামটি নদীগর্ভে চলে যায়, তারপর ওই পরিবার অন্যও কোথাও চলে যায়।

জেলার কৃষিবলয়ে বসবাসকারী বিভিন্ন জনজাতি বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণ করছেন এবং বাংলাকে তাঁদের দ্বিতীয় মাতৃভাষা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। আবার গ্রামপঞ্চায়েতের কাজকর্মে বাংলাভাষার ব্যাপক ব্যবহার বৃদ্ধির ফলে কৃষিবলয়ে অবস্থিত এসব জনজাতির মধ্যে বাংলা শেখার আগ্রহও বৃদ্ধি পেয়েছে। চা-বাগানে বসবাসকারী জনজাতির মানুষের তুলনায় কৃষিবলয়ে বসবাসকারী বিভিন্ন জনজাতির গোষ্ঠী শিক্ষাসংস্কৃতির ক্ষেত্রে বাংলাকে গ্রহণ করে দ্রুত উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছেন। জেলায় বিভিন্ন জনজাতির মধ্যে মেচ (বোড়ো) সম্প্রদায় একদিকে যেমন নিজেদের চিরায়ত গোষ্ঠীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল, অপর দিকে তেমনি রাজ্যের প্রচলিত শিক্ষাসংস্কৃতির



রাভাদের মহাকাল পূজা শেষে প্রসাদ (চকত) সেবনের অনুষ্ঠান

সঙ্গে অভিযোজনের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। অন্যান্যদের তুলনায় তাঁদের মধ্যে শিক্ষিতের হারও বেশি। জেলার কৃষিবলয়ে ও চা-বলয়ে বসবাসকরী ওঁরাও, মুণ্ডা, সাঁওতাল, মেচ জনজাতি জনপ্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে গ্রাম স্তর থেকে জাতীয় স্তর পর্যন্ত বিভিন্ন পদে অবস্থান করে যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করে চলেছেন। বিভিন্ন সরকারি দপ্তরেও এঁরা অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করে চলেছেন।

সামগ্রিকভাবে বলা চলে জেলায় চা-বলয় ও কৃষিবলয়ের তুলনায় যোগাযোগ-বিচ্ছিন্ন পার্বত্য অঞ্চল এবং অরণ্যবলয়ের জনজাতির মানুষেরা এখানও পিছিয়ে রয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতা-পরবর্তী তিন দশকে উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল ও বনবস্তিগুলি সম্পর্কে বনবিভাগের 'কর্মপ্রকল্পগুলির' কিছুটা উল্লেখ থাকলেও, উন্নয়নের কাজ তো দূরের কথা, উন্নয়নের কোনও বার্তাই তাঁদের কাছে পৌঁছায়নি। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর বনবস্তি এবং উত্তরের দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হয়। সম্প্রতি চা-বাগান ও বনবস্তিগুলিকে পঞ্চায়েতে আনা হয়েছে। তার আগে এসব বনবস্তিতে এবং চা-বাগানে বসবাসকারী জনজাতির মানুষেরা অনগ্রসর সম্প্রদায়ের কল্যাণ দপ্তরের, কল্যাণমূলক কর্মসূচির সুযোগ গ্রহণ করতে পারতেন না। তারপর থেকে একদিকে 'অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগ' অন্যদিকে 'বনবিভাগ' এই দুই অঞ্চলে বসবাসকারী জনজাতির মানুষদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ব্যাপক কর্মপরিকল্পনা রচনা করেছেন। ইতিমধ্যে বনবিভাগের পক্ষ থেকে বেশ কিছু কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। জনজাতির মহিলাদের আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করে তোলার জন্য গৃহীত ও রূপায়িত হয়েছে নানা উন্নয়ন প্রকল্প। এ বছর উত্তরবঙ্গের ছটি জেলার উন্নয়নের জন্য একটা পৃথক উন্নয়ন পর্ষদ গঠন করা হয়। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে 'উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদ' ও সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের নানা ধরনের কর্মসূচি রূপায়ণের ফলে জেলার জনজাতির মানুষেরা সমাজের ও দেশের অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মতো দেশের 'আর্থ-সামাজিক' উন্নয়নের ধারায় মূলস্রোতের সঙ্গে যৌথ পদক্ষেপের মাধ্যমে এগিয়ে যেতে পারবেন।

গ্রন্থপঞ্জি

১। Hunter, W.W.—A Statistical Account of Bengal, 1877 (Rpt. 1984).

২। Sunder, D.H.E.—Survey and Settlement on the Western Duars, In the Jalpaiguri District, Cal. 1895.

৩। O'Mally, L.S.S—Bengal District Gazetters, Darjeeling, 1907, Rpt. 1989.

৪। Dutta Gupta, J.—Census of India, Vol. XVI, West Bengal & Sikkim, Part-V, A(II), Table of Scheduled Tribes, 1967.

৫। Census of India, Series-22 (1971).
Census of India, 1981, Series-23.

৬। Das & Saha—Special Series-22, Cultural Research Institute, Calcutta-1989.

৭। De, B. Edt—West Bengal District Gazetters, Jalpaiguri, 1961.

৮। Majumdar, B.—The Totos, (Cultural and Economic Transformation) Academic Enterprise, Calcutta, 1998.

৯। Centenary Souvenir of the Duars Branch Indian Tea Association (1878—1978).

১০। চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার—"ভারতের ভাষা ও ভাষা সমস্যা", লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা, বিশ্বভারতী ১৯৪৯।

১১। বিশ্বাস, অচিন্ত্য ও চক্রবর্তী, সব্যসাচী—'প্রসঙ্গ জনজাতি', বিশ্বকোষ পরিষদ, কলকাতা ১৯৯৫।

১২। মজুমদার, বিমলেন্দু—'আদিবাসী প্রতিবেশী', কলকাতা, ১৯৯৭ (২য় সংস্করণ)।

১৩। সান্যাল, চারুচন্দ্র—জলপাইগুড়ি জেলা শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ (১৮৬৯—১৯৬৯) ও অন্যান্য (সম্পাদনা)।

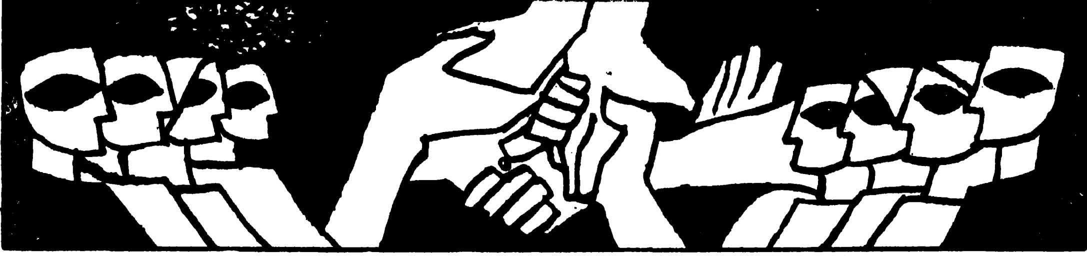
১৪। নাগরিক মঞ্চ—বিপন্ন পরিবেশ, নাগরিক মঞ্চ, কলকাতা, ২০০০।

১৫। চক্রবর্তী, চন্দনকুমার ও প্রধান, সুধী—লোকশ্রুতি-৯, কলকাতা (চা-বাগিচা শ্রমিক, লোকসংস্কৃতি বিশেষ সংখ্যা) ১৯৯২।

১৬। ভট্টাচার্য, মালিনী (সম্পাদনা)—'উত্তরবঙ্গের জনজাতি : আর্থ-সামাজিক রূপান্তর'।
মজুমদার বিমলেন্দু, 'সুধীপ্রধান স্মারকগ্রন্থ', ১৯৯৯ লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র।

'বন বস্তি বিভাগের' বিভাগীয় অধিকারী দিলীপ সেন এবং জেলা পরিষদের কর্মচারী মানিক সেন বিভিন্ন তথ্য ও বই দিয়ে সহায়তা করায় তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

লেখক ❑ শিক্ষক গবেষক ও সাংবাদিক

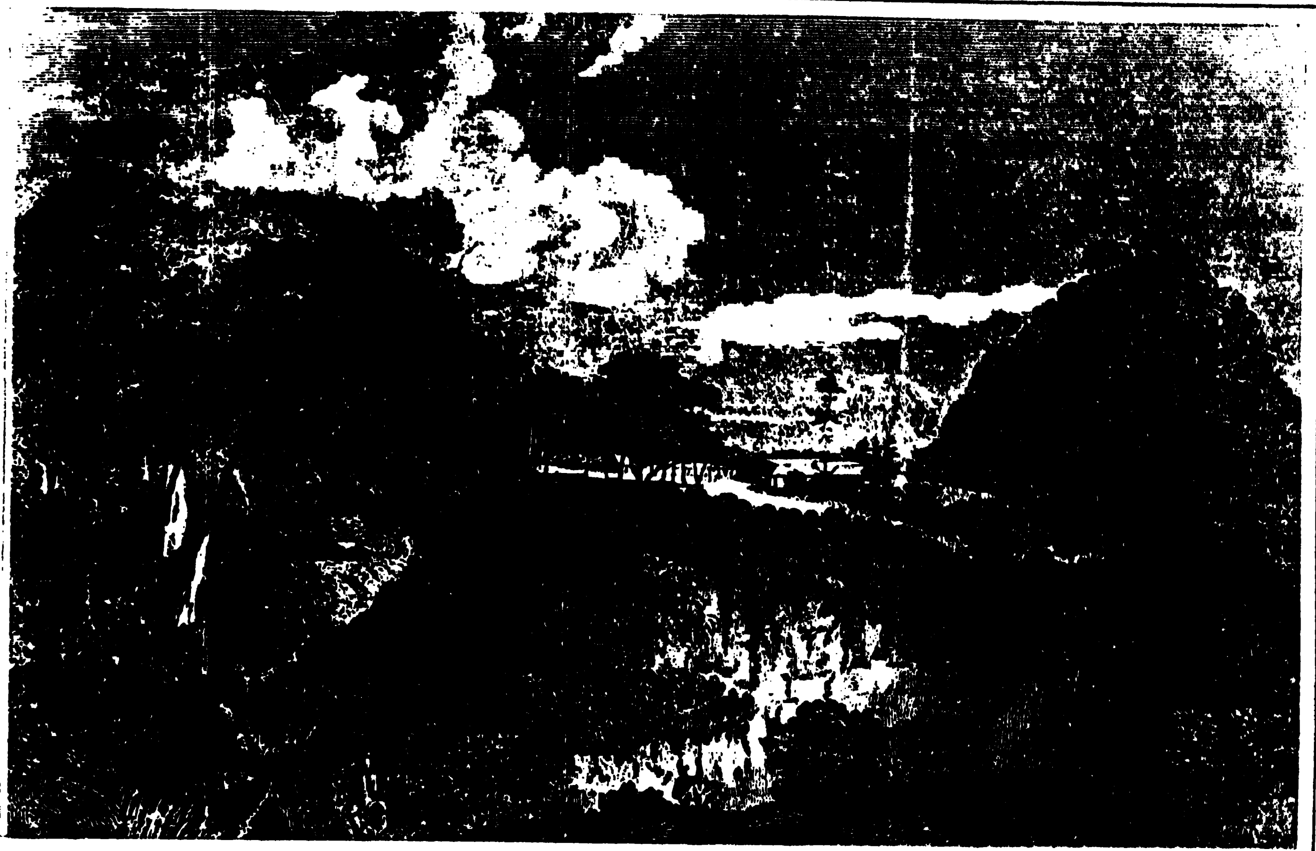


অরুণভূষণ মজুমদার

বৈকুণ্ঠপুর থেকে জলপাইগুড়ি

জলপাইগুড়ির পুরনো ইতিহাস খুঁজতে গেলে রংপুর প্রসঙ্গ অনিবার্যভাবে এসে পড়ে। কি নৃতত্ত্ব, কি ভাষা-সংস্কৃতি, কি ধ্যান-ধারণা—যেদিক থেকেই আলোচনা করা যাক, দেখা যাবে উভয় উভয়ের অত্যন্ত নিকট। ভৌগোলিক দিক থেকে জলপাইগুড়িও প্রতিবেশী কোচবিহারের মতো রংপুরের বিস্তৃতি মাত্র। দেখলে মনে হবে সমতল রংপুর উত্তরে বিস্তৃত হয়ে হিমালয়ের সানুদেশে পৌঁছে থমকে দাঁড়িয়েছে। হিমালয়ের সান্নিধ্যে জলবায়ু ও পরিবেশের একটু তারতম্য ঘটা স্বাভাবিক। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৭৩ পর্যন্ত মেজর রেনেলের জরীপ ও পর্যবেক্ষণ থেকে বোঝা যায় যে ২৬$^{১}/_{২}$ ডিগ্রি উত্তর অক্ষরেখা থেকেই মোটামুটি শাল খয়েরের জঙ্গল শুরু হয়ে গভীর অরণ্যে মিশে গেছে, এবং ওই অরণ্যের ঊর্ধ্বে হিমালয়। জলপাইগুড়ির অধিকাংশ ভূভাগও ওই অক্ষ-বলয়ের মধ্যে।

হিমালয়ের গা বেয়ে নেমেছে ছোট বড় অনেক নদী, যাদের বেশির ভাগ শীতকালে জলাভাবে শীর্ণ হয়ে যায়, আবার বর্ষার নতুন জলে পূর্ণ হয়ে ওঠে। ছোট নদীগুলি সমতলের দিকে অগ্রসর হতে গিয়ে কোন বড় নদীতে মেশে এবং পৃথক অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে। আবার দেখা যায় যে বড় নদীটির উপধারা হয়ে নতুন নাম নিয়ে ছোট নদী চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। রেনেলের মানচিত্রে এ বিষয়ের সমর্থন পাওয়া যাবে। এমনিভাবেই মহানন্দা নদী পাহাড় থেকে নেমে জলপাইগুড়ির পশ্চিম সীমানা ছুঁয়ে আরও পশ্চিমে বাঁক নিয়েছে। করতোয়া নদী নিজের স্বাতন্ত্র্য নিয়ে জলপাইগুড়ির মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছিল ; কিন্তু রংপুরে প্রবেশ করার পর বিপুলা তিস্তার সঙ্গে মিশে গেল। তিস্তা তখন পর্যন্ত দক্ষিণগামী। রংপুরের পশ্চিম অংশ অতিক্রম করে আরও দক্ষিণে ছুটে যাবার প্রবণতা তার হঠাৎ গতিপথ বদল করে পূর্বদিকে ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে মিলিত হবার নেশা হয়েছিল ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে তিস্তার মূলস্রোত



ভুটানে বক্সাদুয়ার প্রবেশপথ : ১৭৮৪ খ্রী. ডেভিস অঙ্কিত স্কেচ

পূর্বদিকে চলে গেলেও করতোয়া আগের মতোই দক্ষিণপূর্বে বাঁক নিয়ে পূর্ব দিনাজপুরের সীমানা চিহ্নিত করে প্রবাহিত হতে লাগল।

প্রধানত শাল-খয়ের গাছের জঙ্গল পরিষ্কার করে এখানকার মানুষের চাষ-বাস শুরু হয়েছিল। লোকসংখ্যা যত বেড়েছে জঙ্গলের কাছ থেকে ততো বেশি মাটি ছিনিয়ে নিয়ে চাষের যোগ্য করার চেষ্টা হয়েছে। মূল অরণ্য থেকে বিচ্ছিন্ন গাছপালা মানুষের আক্রমণ থেকে কোনক্রমে রক্ষা পেয়ে থেকে যায় জঙ্গলবাড়ী নামে ; কোথাও বা কেবল তার স্মৃতি থাকে মানুষের মনে। ধীরে ধীরে গাঁ-গঞ্জ-হাট গড়ে ওঠে ইতস্তত। নানা দিকের মানুষের চলাচলে আপনা থেকে বহু পথও তৈরি হয়ে যায়। হাট-গঞ্জ ওই পথগুলির সঙ্গম স্থানের মতো। কোনো কোনো পথ উত্তরের পাহাড়ি এলাকা থেকে রওয়ানা হয়ে নদীর প্রবাহ পথ ধরে গভীর অরণ্য অতিক্রম করে উন্মুক্ত এলাকার হাট-গঞ্জ ছুঁয়ে রংপুরে এসে পড়ে, রংপুর ছাড়িয়ে আরও দক্ষিণে এগিয়ে যায়। কোনো কোনো পথ আরও পূর্বদিকে অসম থেকে এসে রংপুরের পশ্চিম সীমানায় তিস্তা করতোয়া পেরিয়ে দিনাজপুরের দিকে গেছে ; কোথাও বা একটু উত্তরে বাঁক নিয়ে পূর্ণিয়ার দিকে। এ অঞ্চলের নদী ও মানুষ উভয়ই একটি চলমান জীবনস্রোত, কিন্তু তার গতি শান্ত এবং মন্থর।

তিব্বতি-ধর্মী-বড়ো জনগোষ্ঠীর মেচ, খেন, কোচ, রাভা প্রভৃতি নানা উপদল ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা থেকে শুরু করে পাহাড়ের সানুদেশে, অরণ্যসংকুল এলাকায় এবং কোচবিহার থেকে রংপুর দিনাজপুর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। এই লোকবসতির সময় কাল সঠিক করে বলা যাবে না। তবে নদী, জায়গা, গাছের নামের মধ্যে এখনও আদিমতার গন্ধ কোথাও কোথাও পাওয়া যায়। সময়ের প্রলেপে অবশ্য প্রাচীন ধ্যান-ধারণার বহু পরিবর্তন ঘটেছে। তার একটি কারণ অস্ট্রিক-দ্রাবিড় আর্য সংস্কারের মিলিত উপাদানে গঠিত ভারতীয় সভ্যতা এবং সেই সঙ্গে সংস্কৃত ভাষা আনুমানিক খ্রিস্ট পূর্ব দশম শতকেই এই অঞ্চলে পৌঁছেছিল। শাসক শ্রেণী এই সভ্যতা সাদরে গ্রহণ করে। তারপর যত সময় যেতে লাগল উত্তর বিহার থেকে মাগধী প্রাকৃত এবং পরে মাগধী-অপভ্রংশ উত্তর বাংলায় এবং ব্রহ্মপুত্র নদীর উপত্যকায় ধীরে ধীরে নিজের স্থান করে নিতে আরম্ভ করে। জনসাধারণের মধ্যে শুদ্ধ বড়ো ভাষা বেঁচে থাকলেও অন্তত খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে কামরূপ অধীশ্বর ভাস্কর বর্মণের রাজ্যের সর্বত্র পুরাতন বাংলা এবং পুরাতন আসামি ভাষা একটি সাধারণ ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে প্রচলিত ছিল, যেমন বিশেষ আদৃত ছিল সংস্কৃত ভাষা। সম্ভবত কামরূপী অব্দ এবং বঙ্গাব্দ তাঁর সময়েই একীকৃত হয়েছিল।

রাজনৈতিক রূপরেখা সম্পর্কে মনে হয় উত্তর বাংলার ইতিহাস বিশ্রুত পুণ্ড্রবর্ধনের উত্তরপ্রান্তসীমার অরণ্যাকীর্ণ জলপাইগুড়ি অনজ্ঞাত ছিল। যদিও ভাস্কর বর্মণের নিধনপুর দানপত্র অনুযায়ী কামরূপের রাজ্যসীমা খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে তাঁর পিতামহের আমলে তিস্তা করতোয়া অতিক্রম করে পূর্ণিয়ায় কোশী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল বলা হয়ে থাকে, তবু নিশ্চিত প্রমাণ অভাবে ঐ দানক্ষেত্র পূর্ণিয়ায় কোশীর তীরবর্তী ছিল কিনা সে বিষয়ে কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেন। চন্দ্রপুরীতে অবস্থিত ওই দানক্ষেত্র রংপুরে কোথাও ছিল হয়তো।

কামরূপের সীমানা পশ্চিমে বিস্তৃত হবার প্রয়োজনও ছিল। কারণ, কামরূপ থেকে উত্তর ভারতের মূল ঘটনাস্রোতের সঙ্গে যোগ রাখতে হলে পশ্চিমে পুণ্ড্রবর্ধন পেরিয়ে গঙ্গা নদী পর্যন্ত পৌঁছানো দরকার ছিল উত্তর এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের মধ্যে তৎকালীন প্রধান যোগসূত্র গঙ্গা রক্ষা করছিল। পরবর্তীকালেও তাই পুণ্ড্রবর্ধন ও বিহারের উত্তরাঞ্চলে কামরূপের রাজনৈতিক অধিকার স্থাপন করবার চেষ্টা বারংবার হয়েছে। যেমন—সপ্তম শতাব্দীতে ভাস্কর বর্মণের সময়ে, অষ্টম শতাব্দীতে হর্ষবর্ধনের সময়ে, কিম্বা নবম শতকে হর্দুর বর্মণ এবং তাঁর ছেলে বনর্মালের সময়ে।

কিন্তু কামরূপের স্বাধীন অস্তিত্ব বা রাজ্যসীমা বিস্তারের বড় বাধা ছিল গৌড়। তবু—নবম শতক থেকে সেন আমলের শেষ পর্যন্ত কামরূপ নানা বিপর্যয় সত্ত্বেও ব্রহ্মপুত্র থেকে তিস্তা করতোয়ার অন্তর্বর্তী ভূখণ্ড অধিকার করে থাকে। ত্রয়োদশের প্রথম দিকে গৌড়ে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন হল এবং নবাগত তুর্কী শক্তি কামরূপের স্বাতন্ত্র্য বিনষ্ট করতে উদ্যত হল। কিন্তু বখতিয়ার খলজির সমকালীন কামরূপ রাজ পৃথুর সময় থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীতে খেন রাজবংশ বিনষ্ট হওয়া পর্যন্ত কামরূপ গৌড়ের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছিল। গৌড়ীয় শক্তিকে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করবার সুযোগ দেবার পূর্বে রাজ্যের পশ্চিম সীমান্তে তার সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য কামরূপ তিস্তা-করতোয়ার সীমান্ত অঞ্চলকে সুদৃঢ় করবার প্রয়োজন অনুভব করে। কামরূপের রাজনৈতিক ভারকেন্দ্র পূর্ব থেকে পশ্চিমে সরে যাচ্ছিল। পৃথু নিজেই পথ দেখালেন এবং তিস্তা করতোয়ার মধ্যবর্তী অঞ্চলে গড়-বেষ্টিত দুর্গ ও প্রাসাদ নির্মাণ করে শত্রুর অপেক্ষা করেন। ভিতরগড়ের ধ্বংসাবশেষ আজও পৃথু রাজার স্মৃতি বহন করে আছে। পরবর্তী কালের খেন রাজবংশ পৃথুর পথ নিয়েছিলেন। কামরূপের পূর্বাংশের চেয়ে পশ্চিম অংশের গুরুত্ব খেনদের কাছেও স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছিল। অবশ্য, গৌড় খেনদের তিনপুরুষের বেশি রাজত্ব করবার সুযোগ দেয়নি। পঞ্চদশ শতকের প্রান্তে পৌঁছে যেন রাজ্য ভেঙে পড়ল কিন্তু এই তিনপুরুষের রাজত্বকালেই কামরূপ কামতাপুরের পশ্চিম সীমানা মোটামুটি স্থির হয়ে গিয়েছিল। খরস্রোতা তিস্তা-করতোয়া সে সময়ে প্রাকৃতিক সীমারেখা হিসাবে রাজ্যের পশ্চিম দিকটি কিছুটা রক্ষা করত। এই কারণেই ষোড়শ শতকের সূচনায় বড়ো গোষ্ঠীর আর একটি শাখা একই সীমানা-ঘেরা কোচবিহার রাজ্যটি সৃষ্টি করে, যার মধ্যে কামরূপ-কামতাপুর অন্তর্ভুক্ত ছিল। আবুল ফজলের অভিমত থেকে আমরা জানি যে ষোড়শ শতকের সত্তরের দশকে যখন কোচবিহার ক্ষমতা এবং গৌরবের শিখরে তখন উত্তরে ভোটান এবং উত্তর-পশ্চিমে ত্রিহুত পর্যন্ত কোচ রাজ্যসীমা বিস্তৃত হয়েছিল।

কোচ রাজ্যের সৌভাগ্যের মুখ্য সূচক বিশ্বসিংহের ভাই শিবসিংহ (শিশু সিংহ) কোচবিহারের প্রধান রাজপুরুষ হিসাবে গণ্য হতেন। রাজ্যের পশ্চিম প্রান্তীয় বিভাগ রক্ষা করবার দায়িত্ব তাঁর উপরে ছিল। তাঁর বংশধরেরা কোচ রাজাদের মতো 'নারায়ণ' পদবী গ্রহণ করেননি। নিজেদের পরিচয় রইল "দেব রায়কত" পদবীতে। মিথিলার রাজাদের একটি পদবী ছিল "নারায়ণ"। মিথিলার ধ্যান-ধারণা, আচার-অনুষ্ঠান ও ভাষা সাহিত্যের প্রভাব ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিকে ইতিহাসের খেন পর্ব থেকেই করতোয়া-তিস্তার পূর্বভাগে ছড়িয়ে দিয়েছিল। কোচবিহার রাজ্য পরম শ্রদ্ধায় তাকে গ্রহণ করে। কিন্তু স্বাধীন রাজা নন বলেই দেব রায়কত নারায়ণ পদবী নিলেন না। নিজের একটু স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলবার জন্য কোচবিহার রাজ্যের পশ্চিম অংশে বসতি স্থাপন করলেন। বসতি বৈকুণ্ঠপুর নামে অভিহিত হল। এই বৈকুণ্ঠপুরই উত্তরকালের জলপাইগুড়ি জেলার প্রাণবিন্দু। ঘটনাটি শিশুসিংহের ছেলে মনোহরের সময় ঘটেছিল বলে অনুমান করা যেতে পারে। কারণ রাজ্যস্থাপন, রাজ্যবিস্তার এবং শাসনকার্যে শিশুসিংহকে বিশ্বসিংহের পাশে থাকতে হত। বিশ্বসিংহের উত্তরাধিকারি নরনারায়ণের সময়ে কামরূপ-কামতাপুরে মহাপুরুষীয় বৈষ্ণব ধর্ম বা এক-শরণ ধর্ম প্রচলিত হলে কোচবিহারেও তার প্রভাব পড়ল। উত্তর-পূর্ব ভারতে শৈবধর্মের সঙ্গে বৈষ্ণব ধারাটিও সংযুক্ত হল। বৈকুণ্ঠপুর নামটি নির্বাচনের পিছনে এই প্রভাব কাজ করেছে হয়তো।

আজকের জলপাইগুড়ি শহরের উত্তরে রংধামালি ছাড়িয়ে আরও দশ মাইল উত্তরে বৈকুণ্ঠপুরের রাজপাট ছিল। উত্তরে ভূটান, পূর্বে তিস্তা, পশ্চিমে অরণ্য এবং মহানন্দা নদী। মহানন্দার ওপার থেকে সুবিস্তৃত বন্য তরাই অঞ্চলের নির্দয় জলবায়ু দেব রায়কতের নিরাপত্তা রক্ষা করত। দক্ষিণভাগে কোচবিহারের এলাকা অবারিত হলেও প্রাকৃতিক ও নৈসর্গিক কারণে রাজ্যপাট সাধারণ শত্রুর কাছে দুর্গম ছিল। বৈকুণ্ঠপুরের এলাকা কোচ রাজারা মূল রাজ্য থেকে ভাগ করে সীমানা বেটে দিয়েছিলেন এমন কোনো প্রমাণ নেই। একই বংশের দুটি শাখা পরস্পরের সুদিন-দুর্দিনের সঙ্গে যুক্ত ছিল বহু দিন। সপ্তদশ শতকের শেষার্ধ থেকে যখন গৃহবিবাদে প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে মুঘলের আক্রমণে কোচ রাজশক্তি খণ্ডিত, দুর্বল এবং রাজ্য সংকুচিত তখন থেকেই কোচবিহার রাজসভায় দেব রায়কতের পূর্বের ভূমিকা নিষ্প্রয়োজনীয় হয়ে উঠতে থাকে। ধীরে ধীরে বৈকুণ্ঠপুর কোচবিহার থেকে পৃথকও হয়ে গেল এবং নিজের পৃথক অস্তিত্ব নিয়ে চলতে লাগল। কোচবিহারের পশ্চিম সীমান্ত রক্ষার দায়িত্বও ফুরিয়েছিল। মহানন্দা ছাড়িয়ে ত্রিহুত অবধি ভূভাগ আর চোখে চোখে রাখবার দরকার পড়েনি। দুর্ভাগ্য জর্জরিত কোচবিহারের নিজেরই সুদূর সীমান্ত সম্পর্কে কোনো আগ্রহ দেখা যায়নি, কিম্বা পূর্ব গৌরব উদ্ধারের শক্তিও হয়নি। সুতরাং দেব রায়কতও মহানন্দা নদীকে বৈকুণ্ঠপুরের পশ্চিম প্রাকৃতিক সীমারেখা হিসাবে পেয়ে নিশ্চিন্ত রইলেন। ইতিমধ্যে সিকিম হিমালয় থেকে সমতলে বাহু বিস্তার করে মহানন্দা থেকে মেচি নদী পর্যন্ত এলাকা নিজের অধিকারভুক্ত করে নিয়েছিল। নির্লজ্জ আগ্রাসী মনের পরিচয় সিকিম দেয়নি। এইটুকুই বৈকুণ্ঠপুরের স্বস্তি ; কেন যে সিকিম মহানন্দা পেরিয়ে বৈকুণ্ঠপুরে আসেনি সে কথা জানবার আগ্রহ পর্যন্ত বৈকুণ্ঠপুরের ছিল না।

এমন নিশ্চিন্তভাবে বৈকুণ্ঠপুরের দিন কেটে যাবে, এ আশা করা অন্যায় ছিল না। কারণ, ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরই মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত নড়ে গিয়েছিল। পূর্বের মতো অটল প্রতিজ্ঞা নিয়ে মুঘল সৈন্য এই সাম্রাজ্যকে বাঁচাবার জন্য এ প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত ছুটে বেড়াবে না—এ সত্য স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। উপরন্তু সুবা বাংলার শাসক মুর্শিদকুলি খাঁ অকারণ যুদ্ধবিগ্রহ করে অর্থ অপচয়ের

কোনো যুক্তি খুঁজে পাননি। রায়কত ধর্মদেব চারদিকের অবস্থা দেখে উৎসাহিত হয়ে রাজ্যপাট উন্মুক্ত এলাকা জলপাইগুড়িতে তুলে নিয়ে এলেন।

ঘোড়াঘাট—সেই হল কাল। বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মতো নবাব সুজা খাঁর আমলে রংপুরের নায়েব ফৌজদার সৌলত জঙ্গ ১৭৩৬-৩৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কোচবিহারের পরেই বৈকুণ্ঠপুরের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তখন রায়কত ভূপদেব লোকান্তরিত এবং রায়কত বিক্রমদেব তাঁর স্থলাভিষিক্ত। সৌলত জঙ্গ বৈকুণ্ঠপুর জয় করে বিক্রমদেব এবং তাঁর ছোট ভাই দর্পদেবকে বন্দী করে নিয়ে গেলেন রংপুরে। ইতিপূর্বে বৈকুণ্ঠপুর স্বেচ্ছায় কোচবিহার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল ; এখন অনিচ্ছা সত্ত্বেও রংপুরের অধীনে একটি পরগনায় পরিণত হল। রাজস্ব সংক্রান্ত পরিভাষায় পরগনা শব্দটি এতকাল এই অঞ্চলে অজানা ছিল। দেব রায়কত সুবা বাংলার অন্যান্য পরগনার মতো বৈকুণ্ঠপুর পরগনার জমিদার মাত্র রইলেন।

পরগনা বৈকুণ্ঠপুরের আয়তন ছিল ৩৮০ বর্গমাইল। এর মধ্যে ১৫৯ বর্গমাইল অরণ্য অবশিষ্ট ২২২ বর্গমাইল মাত্র চাষের যোগ্য। এই হিসাব ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পক্ষ থেকে বুকানন হ্যামিলটন উনবিংশ শতকের গোড়ায় করেছিলেন। ইতিপূর্বে পরগনার আয়তনের কোনো তথ্য জানা ছিল না। এমনকি রাজস্বের বন্দোবস্তী-জমা রংপুরের অন্তর্ভুক্ত হবার সময় কত ছিল জানা না গেলেও ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দের কাগজপত্র থেকে একটা ধারণা পাওয়া যায় মাত্র। এই জমার পরিমাণ ছিল ৩০,৬৫১ টাকা।

১৭৪০ খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রায় দশ বছর নবাব আলিবর্দি খাঁ মারাঠা এবং আফগান শক্তির সঙ্গে বোঝাপড়ায় বিব্রত ছিলেন তখন থেকে রংপুরের প্রতি মুর্শিদাবাদের মনোযোগ কমে আসতে থাকে। আলিবর্দির জীবনের শেষ কয়েকটি বছর দুশ্চিন্তা আর উদ্বেগে পূর্ণ ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর সুবা বাংলার ভবিষ্যৎ নিয়েও অস্বস্তি ছিল। পলাশির যুদ্ধের প্রাক্কালে অস্বস্তি বহু গুণ বেড়ে যায়। রংপুরের ফৌজদার কাশিম আলি এই পরিস্থিতিতে বৈকুণ্ঠপুরে একবার যাবার প্রয়োজন বোধ করলেন। রায়কত বিক্রমদেব এবং তাঁর ছোট ভাই দর্পদেব রংপুরে অন্তরীণ অবস্থায় দিন কাটাচ্ছিলেন। তাঁদের দুজনের দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে বৈকুণ্ঠপুরে অনিয়ম চলছিল। দীর্ঘ সতেরো বছর পর দুভাইকে মুক্তি দিয়ে কাশিম আলি সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন বৈকুণ্ঠপুরে। বিক্রমদেবকে রায়কত পদে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করে ফিরে গেলেন। তাঁর আশা ছিল, বৈকুণ্ঠপুর থেকে সুদীর্ঘ নির্বাসনের অভিজ্ঞতা দেব রায়কতকে বুঝে চলবার দায়িত্ব-বোধ এনে দেবে। কিন্তু পরিস্থিতি আরও খারাপ হল।

১৭৫৮ খ্রিস্টাব্দে বিক্রমদেব রায়কতের মৃত্যু হলে দর্পদেব রায়কত হলেন। দর্পদেব ভেবেছিলেন যে বাংলার রাজনৈতিক বিপ্লবের সুযোগ নিয়ে বৈকুণ্ঠপুরের আগের স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনতে পারবেন। কিন্তু তিনি বুঝতে পারেননি যে বাংলার নবাবকে সম্পূর্ণ করায়ত্ত করে, দিল্লীশ্বরের কাছ থেকে বাংলার দেওয়ানীর সনদ পেয়ে ইংরেজ কোনো জমিদারকেই আর স্বাধীনভাবে চলতে দেবে না। দর্পদেব রংপুরের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক একেবারে ছিন্ন করলেন না, বছরে একবার কিছু রাজস্ব জমা দিয়ে আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক বজায় রেখে চলতে লাগলেন।

ইতিমধ্যে কোচবিহার রাজপরিবারের ঘরোয়া বিবাদে ভূটান হস্তক্ষেপ করতে আরম্ভ করে। ফলে বিবাদ মিটে না গিয়ে আরও জটিল হয়ে উঠল। কোচবিহারের রাজপরিবারের বিবাদ যখন তুঙ্গে, মধ্যস্থতা করতে গিয়ে ভূটানের রাজপ্রতিনিধি কোচবিহারের গুরুতর রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেবার সাহস অর্জন করে। তখন থেকে পাহাড়ের সানুদেশে অরণ্য এলাকা থেকে সমতল পর্যন্ত কিছু জায়গা কোচবিহারের কাছ থেকে পত্তন নিয়ে ক্রমে অবশিষ্ট অংশ ভূটান জবরদখল করতে শুরু করে। এই ভূভাগই দুয়ার বলে পরিচিত। দুয়ার পূর্বদিকে সঙ্কোশ নদী থেকে পশ্চিমে তিস্তার অন্তর্বর্তী ভূভাগ। আয়তন প্রায় ১৮৬৩ বর্গমাইল। প্রধান নদীগুলির গতিপ্রবাহ ধরে পাহাড় থেকে সমতলে যাতায়াতের পথ করে দিতে এই ভূভাগ সাহায্য করেছিল বলে লোকে তাকে দুয়ারের সঙ্গে তুলনা করত।

ভূটানের চরম ঔদ্ধত্য প্রকাশ পেলো তখন, যখন গায়ের জোরে কোচবিহারের রাজা এবং দেওয়ানকে বন্দী করে ভূটানীরা নিজেদের পাহাড়ে চলে গেল ; যাবার আগে তাদেরই মনোনীত কোচ রাজবংশের এক ছেলেকে রাজ-সিংহাসনে বসিয়ে দিল। এই গোলমালের সুযোগে বৈকুণ্ঠপুরের দর্পদেব রায়কত ভূটানের সঙ্গে আপোষে কোচবিহারের কিছু কিছু অংশ, বিশেষত তিস্তার পূর্বপারের জায়গা-জমি হস্তগত করতে চেয়েছিলেন। ভূটান-বৈকুণ্ঠপুরের চক্রান্তে ভীত হয়ে কোচবিহার ইংরেজের আশ্রিত করদমিত্র হতে স্বীকার করল। ওয়ারেন হেস্টিংস কোচবিহারকে ভূটানের কবল থেকে উদ্ধার করবার দায়িত্ব নিলেন। সে অন্য কাহিনী।

স্বতন্ত্র রাজ্যের সঙ্গে কোম্পানির কোনো অধীন জমিদারের অশুভ আঁতাত ইংরেজের কাছে স্পর্ধাজনক মনে হয়েছিল। তাছাড়া কিছু কাল আগে থেকেই বৈকুণ্ঠপুরের দেব রায়কত স্বাধীনভাবে ইংরেজের সঙ্গেও আচরণ করতে আরম্ভ করেছিলেন। সেজন্য ভূটানের সঙ্গে যুদ্ধ শেষ না হতেই ইংরেজ বাহিনীকে দর্পদেবের বিরুদ্ধে পাঠানো হল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শক্তির প্রমাণ দেবার জন্য। রংপুর সীমান্তে ও পূর্ণিয়ায় সন্ন্যাসীদলের বে-আইনি সমাবেশ ও লুঠতরাজ সমকালীন ঘটনা। দর্পদেব এইরকম একটি সন্ন্যাসীদলকে আশ্রয় দিয়েছিলেন তাঁর সৈন্য-সামন্তের অভাব পূরণের জন্য। ইংরেজের চোখে এটিও দর্পদেবের আর একটি অপরাধ।

ইংরেজ সৈন্যদলের সঙ্গে অল্পস্থায়ী একটি সংঘর্ষের পরই দর্পদেবের যুদ্ধ-স্পৃহা নিবে যায়, এবং তিনি জলপাইগুড়ি ছেড়ে দিয়ে আত্মগোপন করলেন। ভাড়াটে সন্ন্যাসী-সৈন্যরা প্রাণ নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেল। ভূটানের দিক থেকেও বৈকুণ্ঠপুরকে সাহায্য করবার কোনো প্রশ্ন ছিল না। জলপাইগুড়ি দুর্গ ইংরেজের হাতে এলো। এ দুর্গটি কোথায় ছিল আজ আর বলা যাবে না। যুদ্ধের ফলশ্রুতি এই যে দর্পদেবের দর্প চিরকালের মতো চূর্ণ হয়ে গেল। এক বছর পর দর্পদেবের উকিল হয়ে জনৈক কিংকর বক্সী ওয়ারেন হেস্টিংসের কাছে আত্মসমর্পণের আবেদন পেশ করে আরও বেশি রাজস্ব দেবার শর্তে রায়কত পদে দর্পদেবের পুনর্বহালের প্রার্থনা জানালেন। ইংরেজের আপত্তি হয়নি। বৈকুণ্ঠপুরের নতিস্বীকার ইংরেজের কাছে বড় প্রশ্ন ছিল, কিংকর বক্সীর আবেদনে তার সদুত্তর

পাওয়া গেল। এই সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক প্রকাশ পেলো। রাজস্ব সংক্রান্ত কাগজে পরগনা হিসাবে বৈকুণ্ঠপুরের পুরনো নামটি রয়ে গেল ; কিন্তু সাধারণভাবে উল্লেখ করার সময়ে জলপাইগুড়ি নামের ব্যবহার আরম্ভ হল, ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দের ৩ ফেব্রুয়ারি দর্পদেবের বিরুদ্ধে অভিযানের বিষয় রাজমহলে মিলনার ডেকার্সকে জানাবার সময়ে ক্যাপ্টেন রবার্ট স্টুয়ার্ট "জুল্পিগোরি" থেকে চিঠি লিখেছিলেন। জল্পিগোরি আর জলপাইগুড়ি সমার্থক, উচ্চারণে যে পার্থক্যই থাকুক।

বৈকুণ্ঠপুরের দেব রায়কতকে নিয়ে ইংরেজের সমস্যা আপাতত মিটলেও বৈকুণ্ঠপুর বা জলপাইগুড়ির জন্য নতুন দুর্ভাবনা এলো। এর জন্য দায়ী জলপাইগুড়ির ভৌগোলিক অবস্থান এবং সমকালীন কিছু ঘটনা। ওয়ারেন হেস্টিংস কার্যভার গ্রহণ করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সদর দপ্তর কলকাতায় সাজিয়ে যখন রাজস্ব আদায়ের এবং প্রশাসনিক সুব্যবস্থার একটি ছক ভাবছিলেন, তখন দিনাজপুর, পূর্ণিয়া এবং রংপুর সীমানায় শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার সমস্যায় পড়লেন। বৈকুণ্ঠপুর পরগনার অর্থাৎ রংপুরের পশ্চিম সীমানা দিয়ে গিয়েছে মহানন্দা নদী। মহানন্দা থেকে আরও পশ্চিমে মেচি নদী পর্যন্ত বিস্তৃত তরাই অঞ্চল যা সাধারণত পূর্ব মোরঙ্গ নামে পরিচিত, কার্যত সিকিমের অধিকারে থাকলেও গিরি সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী এবং ফকিরের ভেকধারী বহু লোকের আস্তানা ছিল। সিকিমের দুর্বল প্রশাসনের পক্ষে এদের কিছু বলবার সাহস ছিল না। বরং নির্ঝঞ্ঝাটে থাকবার জন্য প্রশাসন এদের যথেষ্ট জায়গা-জমি দিয়ে খুশি রেখেছিল। এই সব মানুষের মধ্যে কেউ কেউ প্রকৃত সন্ন্যাসী বা ফকির নিশ্চয়ই ছিল। তবে অধিকাংশের চরিত্র সন্ন্যাসীর বা ফকিরের ছিল না। পূর্ণিয়া, দিনাজপুর, রংপুরের সীমান্তবর্তী গ্রামের মানুষ এদের সমীহ করত, অবস্থাপন্নেরা ভয় করত। এরা সবাই যোদ্ধা, এক-একজন নেতার অধীনে এক-একটি যোদ্ধৃদল। কোম্পানির এলাকায় লুঠতরাজ করে বর্ষা সমাগমে পূর্ব মোরঙ্গের আস্তানায় ফিরে যেতো। আবার অনেকে পারিশ্রমিক নিয়ে রাজা-জমিদারের সৈন্যের কাজও করত। ভূটানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি লক্ষ করেছিল যে কোচবিহার, ভুটান, এমনকি বৈকুণ্ঠপুরের ভাড়া-করা সন্ন্যাসী সৈনিক ছিল। তিনটি জেলার সীমান্ত নির্বাচন করে নেবার মধ্যে এই সব লোকের বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। সিকিমের এলাকা থেকে কোম্পানির এলাকায় দৌরাত্ম্য চালিয়ে যাওয়া সুবিধাজনক ছিল। এদের পূর্ব পরিচয় কি, কোথা থেকে সংঘবদ্ধ হয়ে এত লোক মোরঙ্গে উপস্থিত হল, এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উপর এদের এত বৈরীভাব কেন তার সদুত্তর সুস্পষ্ট নয়।

অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং সীমান্তের নিরাপত্তার উপযুক্ত ব্যবস্থা ইংরেজ তখনও করে উঠতে পারেনি। ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে রংপুরের ফৌজদার জয়নাল আবেদিন রেজা খাঁকে জানিয়েছিলেন যে শান্তিরক্ষার জন্য রংপুরে একজন কোতোয়াল রয়েছেন, কিন্তু দুমাইলের বাইরে দৃষ্টি দেবার তাঁর উপায় ছিল না। এ বছরেই রেজা খাঁ ওয়ারেন হেস্টিংসকে চিঠিতে যে তথ্য জানালেন তাতে রংপুরের প্রশাসনিক অসহায়তার কথা ভেবে বিস্মিত হতে হয়। ফৌজদারের হাতে কুড়ি-পঁচিশের বেশি লোক নেই, অথচ তাঁকে ২৬৭৯ বর্গমাইল সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। জমিদার এবং তালুকদারদের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া কোনো ব্যবস্থা কার্যকরী হতে



পারে না। কিন্তু বাস্তবে জমিদারেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে চোর-ডাকাতকে আশ্রয় দিয়ে থাকেন।

রেজা খাঁ অতিরঞ্জিত করে কিছু বলেননি। রাজা-জমিদারের কাছ থেকে সহযোগিতার আশ্বাস তখনও পাওয়া যায়নি। এই অবস্থায় কোম্পানির সৈন্য ব্যবহার করা ছাড়া ওয়ারেন হেস্টিংসের সামনে অন্য উপায় ছিল না। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দৃঢ়তা এবং শক্তির কাছে সন্ন্যাসী ফকিরের উৎপাত ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে এলো ঠিকই ; কিন্তু বৈকুণ্ঠপুরের পশ্চিম সীমান্ত নতুন আর এক দুর্ভাবনা বহন করে আনল।

সুবা বাংলায় ইংরেজের প্রভু হবার প্রায় সমকালীন ঘটনা রাজা পৃথ্বীনারায়ণ শা'র নেতৃত্বে নেপালের নব উন্মেষ। নিজের ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করে দক্ষিণে সমতলে নামবার ঝোঁক এসেছিল নেপালের মধ্যে। সন্ন্যাসীদল সম্পর্কে ওয়ারেন হেস্টিংসের স্পর্শকাতরতার বিষয় জানতে পেরে পৃথ্বীনারায়ণ পশ্চিম মোরঙ্গ দখল করবার বাসনা হেস্টিংসকে জানিয়েছিলেন। যুক্তিও দিয়েছিলেন এই বলে যে মোরঙ্গ নেপালের শাসনে থাকলে সন্ন্যাসীরা কোম্পানির তল্লাটে গিয়ে অত্যাচার করবার পথ পাবে না। সন্ন্যাসীদের জব্দ করবার অজুহাতে মোরঙ্গে নেপালের অধিকার বিস্তার ওয়ারেন হেস্টিংসের পছন্দ হয়নি। সে কথা পৃথ্বী নারায়ণকে তিনি খোলাখুলি জানিয়েও দিয়েছিলেন। কিন্তু ভূটান-কোচবিহার দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ার দরুন নেপালের গতিবিধির উপরে লক্ষ রাখা সম্ভব হল না। ইত্যবসরে পশ্চিম মোরঙ্গ দখল করে নেপাল পূর্ব মোরঙ্গ সিকিমের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবার সুযোগ অন্বেষণ করতে থাকে। পূর্ব মোরঙ্গের আভ্যন্তরীণ স্থায়ী বিশৃঙ্খলা এই ঈপ্সিত সুযোগ নেপালকে এনে দিয়েছিল। ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ইংরেজ উপলব্ধি করল যে নেপালের পূর্ব দিকের সীমানা মেচি অতিক্রম করে মহানন্দা পর্যন্ত কেবল বিস্তৃত হয়নি, মহানন্দা পার হয়ে মাঝে মাঝেই হানাদারেরা বৈকুণ্ঠপুরের সীমানায় কিম্বা তার দক্ষিণে বোদা, ভজনপুর প্রভৃতি এলাকায় হানা দিচ্ছে। তাদের নায়ক একজন নেপালি সৈন্যদলের জমাদার, নাম গঙ্গারাম থাপা ওই হানাদার দলের মধ্যে গঙ্গারামের নিজের লোক ছাড়াও মোরঙ্গে বসবাসকারী বেপরোয়া উচ্ছৃঙ্খল লোকেরাও ছিল লুঠতরাজ করা যাদের জীবিকা প্রায় ছয় বছর এই অবস্থা চলেছিল।

শেষ পর্যন্ত গঙ্গারামের বিরুদ্ধে কোম্পানির অভিযান এবং নেপালের কাছে প্রতিবাদলিপি পাঠাবার পর নেপাল ইংরেজের ক্ষোভের গুরুত্ব বুঝতে পারে। ভবিষ্যতে এমন পরিস্থিতি আর হবে না—এই মর্মে নেপাল আশ্বাস দিলে সীমান্ত শান্ত হল আপাতত। তখন ওয়ারেন হেস্টিংস ভারত ছেড়ে চলে গিয়েছেন। আসলে ১৭৮৬-৮৭ খ্রিস্টাব্দে নেপাল এবং তিব্বতের মধ্যে বিরোধ দানা বেঁধে উঠেছিল। সেজন্য নেপাল পিছনে ক্ষুব্ধ ইংরেজকে রেখে তিব্বতকে আক্রমণ করতে সাহসী হয়নি।

রংপুরের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের বিপদের আশঙ্কা ওয়ারেন হেস্টিংসের যথেষ্ট ছিল। এবং এক সময়ে তিনি নেপালের মনোভাব জানবার জন্য তাঁর বিশেষ প্রতিনিধি হিসাবে ফক্স ক্রফট্‌কে নেপালে পাঠাবেন স্থিরও করেছিলেন। সীমান্ত রক্ষা তাঁর কাছে সীমান্ত বিস্তারের চেয়েও বেশি মূল্যবান ছিল। কিন্তু, সে সময় তিনি পাননি। ভূটানের সঙ্গে যুদ্ধ চলাকালীন তিনি ভূটানের সঙ্গে কেমন করে শান্তি এবং মিত্রতা স্থাপন করবেন তাঁর জন্য ব্যস্ত হয়েছিলেন। তার একমাত্র কারণ, লন্ডন থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃপক্ষ ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দের ৭ জানুয়ারি সুবা বাংলার উত্তরের দেশগুলিতে ইংলন্ডের শিল্প-সামগ্রীর বাজার খুঁজবার জন্য কলকাতায় নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন।

কোচবিহারকে রক্ষা করতে গিয়ে ভূটানের সঙ্গে ইংরেজের যে যুদ্ধ হয়, সে যুদ্ধে পরাজিত হয় ভূটান। ভূটানের পক্ষ হয়ে তিব্বতের তাশি লামা ওয়ারেন হেস্টিংসের কাছে বিরোধ মিটিয়ে ফেলবার অনুরোধ জানান। ওয়ারেন হেস্টিংস এই অনুরোধ একটি শুভ ইঙ্গিত বলে ভেবেছিলেন। লন্ডনের কর্তৃপক্ষের আশা অনুযায়ী সুবা বাংলার উত্তরে ইংরেজের ব্যবসার নতুন দিগন্ত খুলে গেল মনে করে ওয়ারেন হেস্টিংস পরাজিত শত্রুর সঙ্গে সৌহার্দ্যের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। তিব্বতে যেতে গেলে ভূটানের মধ্য দিয়ে যাওয়া ছাড়া অন্য উপায় তখন ছিল না। সিকিম বা নেপালের মধ্য দিয়ে যাবার কোনো প্রশ্ন ওঠে না।

অনেক পরে অবশ্য ইংরেজ বুঝতে পারে যে ইংরেজকে তিব্বত আর নিজের দেশে ডেকে আনতে চায় না। চীনও তিব্বতে অন্য কোনো বিদেশি শক্তিকে দেখতে রাজি ছিল না বলে যে যুক্তি তিব্বত বারংবার দিয়েছে সেটি তিব্বতের একটি ছলমাত্র। তিব্বতে বিদেশি শক্তির উপস্থিতি চীনকে আহ্বান করে আনবে মাত্র যা তিব্বতেরও পছন্দ নয়। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে চীনের ঠিকানায় তিব্বতের থাকা প্রয়োজন হলেও, চীনের খবরদারি তিব্বতের অভিপ্রেত ছিল না। ভূটানও আন্তরিকভাবে চায়নি যে তিব্বতীর ব্যবসায়ে ইংরেজ তার প্রতিদ্বন্দ্বী হোক। ভূটানের ব্যবসায়ী বলতে ভূটানের প্রধান রাজপুরুষেরা যারা ভূটানের ভাগ্য-নিয়ন্তা। সুতরাং ব্যবসা-স্বার্থ রাজনৈতিক স্বার্থের সঙ্গে মেশানো ছিল। ওয়ারেন হেস্টিংস কিম্বা তাঁর স্থলাভিষিক্ত পরবর্তী শাসকেরা এই প্রকৃত অবস্থা তখনি বুঝে উঠতে পারেননি।

হিমালয়ে ব্যবসার মোহ এমনই গভীরভাবে ইংরেজের বিচার বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল যে যুদ্ধ-শেষে ভূটান মিত্রতার দাবিতে যতবার কিছু সুযোগ-সুবিধা প্রার্থনা করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দ্বারস্থ হয়েছিল, কোম্পানি ভূটানকে শূন্য হাতে ফিরিয়ে দিতে পারেনি। ভূটান ১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংসের কাছে তিস্তার পূর্বে ক্রান্তি, জল্পেশ এলাকা এবং বৈকুণ্ঠপুরের মধ্যস্থলে ১৫ বর্গমাইল আমবাড়ী-ফালাকাটা তালুক চেয়ে বসল। দিনাজপুরের প্রাদেশিক রাজস্ব পরিষদের প্রধান হেয়ারউড ওয়ারেন হেস্টিংসে কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে এই অভিমত জানালেন যে, জল্পেশ বা ফালাকাটার উপরে বৈকুণ্ঠপুরের অধিকার নাকচ করে ভূটানের অধিকার স্থাপনকে মেনে নেওয়া যায় না। কিন্তু ওয়ারেন হেস্টিংসের কাছে ভূটানের মিত্রতার চেয়ে জল্পেশ বা আমবাড়ী-ফালাকাটার মূল্য বেশি ছিল না। সেজন্য রংপুরের কালেক্টরের কাছে নির্দেশ গেল যেন ভূটানের আকাঙ্ক্ষিত জায়গাগুলি ভূটানকে দখল দেওয়া হয় এবং ভূটানের সঙ্গে সন্ধির বছর, অর্থাৎ ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে দেব রায়কত ওই এলাকাগুলি

থেকে যে রাজস্ব তুলেছেন তা থেকে যেন ভূটানের প্রাপ্য বুঝিয়ে দেওয়া হয়।

এত করেও হিমালয়ে কোম্পানির বাণিজ্যের কোনো সুরাহা হল না। জর্জ বোগল, ডাঃ আলেকজান্ডার হ্যামিলটন, কিম্বা ক্যাপ্টেন স্যামুয়েল টার্নার, ওয়ারেন হেস্টিংসের উৎসাহে পর পর তিব্বতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেও তিব্বতের সদরে পৌঁছুতে পারেননি। তিব্বত এবং ভূটান সম্পর্কে প্রাকৃতিক গঠন, ভূ-প্রভাব, আকরিক সম্পদ এবং ব্যবসা ছাড়া অন্যান্য তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। ব্যবসার সুযোগ-সুবিধার আশ্বাস তিব্বত বা ভূটান দেয়নি। ওয়ারেন হেস্টিংসের আশা পূর্ণ হয়নি। এমনিভাবে অষ্টাদশ শতাব্দী শেষ হল। সুদূর দিগন্তের মতো তিব্বতের দিকে শুধু চেয়ে থাকা ছাড়া ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আর কিছু করবার রইল না। কেবল স্বীকৃত ব্যাধিতে বাধ্য হয়ে সহ্য করবার মতো মাঝে মাঝেই ভূটানের নতুন নতুন আব্দার কোম্পানিকে শুনতে হতে লাগল। ক্রান্তি, জল্পেশ প্রভৃতি যে জায়গাগুলি ভূটান ইদানীং পেয়েছিল তারও অতিরিক্ত কিছু জমিতে গায়ের জোরে দখল বসাতে লাগল। বৈকুণ্ঠপুর নালিশ জানিয়েও প্রতিকার পেলো না। ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে লর্ড কর্নওয়ালিসের নির্দেশে মার্শার ও শোভে তদন্তে এসে কিছু করবার নেই দেখে ফিরে গেলেন।

ভূটানের দৌরাত্ম্য সহ্য করবার আর একটি কারণ লক্ষ করা যায়। নেপাল তিব্বতকে আক্রমণ করতে গিয়ে টের পেয়েছিল তিব্বতকে রক্ষা করবার জন্য চীন সসৈন্যে হিমালয়ে প্রবেশ করতে পারে। ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে চীনের কাছে পরাজয় মেনে নেপাল সন্ধি করে। যুদ্ধের সময়ে নেপাল ইংরেজের কাছে সাহায্য চেয়েছিল ; আর তিব্বত অনুরোধ করেছিল ইংরেজকে নিরপেক্ষ থাকতে। কর্নওয়ালিস নিরপেক্ষ রইলেন, কারণ চীনের সঙ্গে অলৌকিক বিরোধে জড়িয়ে পড়ার ইচ্ছা ছিল না। ফলে, একদিকে নেপালের সঙ্গে ইংরেজের আর সম্প্রীতি রইল না, অন্যদিকে তিব্বতে চীনের প্রভুত্ব প্রকট হওয়াতে তিব্বত সম্পর্কে ইংরেজের উৎসাহে আপাতত ভাঁটা পড়ল।

ইংরেজের সঙ্গে নেপালের সম্প্রীতির অভাব উনবিংশ শতকের গোড়া থেকে ক্রমশ বেড়ে উঠতে থাকে। নেপালের আগ্রাসী মনোভাব ভারতবর্ষে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একাধিপত্য বিস্তারের পরিপন্থী বলে ইংরেজ মনে করতে আরম্ভ করে। ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে শেষ পর্যন্ত এ কথাটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, উভয় শক্তির মধ্যে চরম বোঝাপড়া অনিবার্য। চীনের সঙ্গে নেপালের সাম্প্রতিক হৃদ্যতাও ইংরেজকে রীতিমত শঙ্কিত করে তুলেছিল। সেজন্য হিমালয়ে অবস্থিত বাকি দুটি রাজ্য—সিকিম এবং ভূটানের সঙ্গে ইংরেজ ঘনিষ্ঠ হবার জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠে। ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দের মার্চে ইংরেজ শক্তির কাছে পরাভূত নেপাল ইংরেজের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করল ; পরের বছর ফেব্রুয়ারিতে তেঁতুলিয়াতে সিকিমের সঙ্গেও ইংরেজের মিত্রতা-চুক্তি সম্পাদিত হল। মেচি-মহানন্দার অন্তর্বর্তীপূর্ব মোরঙ্গ, যা নেপাল বিগত শতকে সিকিমের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল, ইংরেজ সিকিমের হাতে প্রত্যর্পণ করে। ইংরেজ আশা করেছিল, কৃতজ্ঞ সিকিম হিমালয়ে ইংরেজের প্রয়োজনে সাহায্য করবে। অবশ্য, হিমালয়ে চীনের সঙ্গে ইংরেজের তেমন কোনো বিরূপ সম্পর্ক সৃষ্টি হলে সিকিম কতটুকু সাহায্য ইংরেজকে দিতে পারবে সে বিষয়ে ইংরেজেরও কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল না। তবু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কূটনৈতিক সীমান্ত হিমালয়ে বিস্তৃত হতে পারল, ইংরেজের আপাততঃ এইটুকু লাভ। তিব্বতে অবস্থানকারী চীনা সৈন্যদলের প্রধান ইংরেজের বিরুদ্ধে নেপালের কুৎসা রটনা করা বা অপপ্রচার করা বিশ্বাস করেননি—এই মর্মে ইংরেজকে লিখে জানালেও ইংরেজ আশ্বস্ত হয়নি। হিমালয়ে ব্যবসার সম্ভাবনার পরিবর্তে হিমালয়ের দিক থেকে বাংলার উত্তর সীমান্তে নতুন বিপদের আশঙ্কা ইংরেজের মনে বার বার হানা দিতে লাগল। সীমান্তের সুরক্ষা ইংরেজের কাছে বড় হয়ে দেখা দিল। উত্তরবাংলার এই সীমান্তকে মুঘলেরা মূল্য দেয়নি, ইংরেজ তা পারল না।

ভূটানকে এত কিছু দিয়েও ইংরেজের লাভ হয়নি শেষ পর্যন্ত। উনবিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশক থেকে ইংরেজ বেশ বিব্রত হয়ে ওঠে। ভূটানের অস্থির রাজনীতি, দুর্বল রাজতন্ত্র, প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের স্বাধীন কার্যকলাপ ও পারস্পরিক দ্বন্দ্ব আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলাকে নস্যাৎ করে দিয়েছিল, এবং তার প্রভাব সমতলে ভূটানের অধিকারভুক্ত এলাকার প্রতিবেশী অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়েছিল। স্বার্থ-দ্বন্দ্বে জয়ী হয়ে যদি কেউ সিংহাসনে বসল পরক্ষণেই তাকে টেনে নামাবার জন্য ষড়যন্ত্র, সংঘর্ষ শুরু হয়ে যেতো। এই পরিস্থিতিতে দুরভিসন্ধিপরায়ণ ব্যক্তিরা পাহাড় থেকে নেমে কখনো আসামে ইংরেজ সীমান্তে, কখনো কোচবিহারে, কখনো রংপুরের প্রান্তে চুরি ডাকাতি করে ফিরে যেতে লাগল। ইংরেজের অভিজ্ঞতা ছিল যে ভূটানে প্রতিবাদ লিপি পাঠিয়েও কোনো লাভ হয় না। প্রাদেশিক শাসনকর্তার মারফতে পাঠানো এই লিপি আদৌ গন্তব্যস্থানে পৌঁছুত না। প্রাদেশিক শাসনকর্তা বা সীমান্তের রাজপুরুষেরা যা হোক একটা জবাব দিয়ে দিতেন, এবং সে জবাবে ইংরেজের প্রশ্নের সদুত্তর থাকত না। এমনকি ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবরে ক্যাপ্টেন পেম্বারটনকে ভূটানে পাঠিয়েও কোনো লাভ হল না। ভূটানে দায়িত্বশীল এমন একজনকে পেম্বারটন পেলেন না যার সঙ্গে আলোচনা করে বিরোধের মীমাংসা কিছু করা যায়। তখন থেকে আসামের দুয়ারগুলির উপরে ভূটানের অধিকার অর্থের বিনিময়ে কিনে নেবার সংকল্প ইংরেজের মনে এলো।

কেবল আসাম-সীমান্ত নয়, রংপুর-বৈকুণ্ঠপুর সীমান্তও একই সঙ্গে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। পশ্চিম দুয়ারে নাজিরহাটের ভূটানের তহশীলদার হরগোবিন্দ কাঠাম গোপালগঞ্জ, ময়নাগুড়ি, চ্যাংমারি, ভোট হাট প্রভৃতি তালুক পিতা হরিদাসের আমল থেকে লাখেরাজ সম্পত্তি হিসাবে ভোগ-দখল করতেন। ইদানীংকালে ভূটান ওই সম্পত্তির খাজনা চাইবার পর থেকে বিরোধের সূত্রপাত। ভূটানের ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে হরগোবিন্দ ইংরেজের অধীন জমিদার হয়ে রাজস্ব দেবার প্রস্তাবও করেন। উত্তরপূর্ব সীমান্ত অঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত ইংরেজ রাজপুরুষ মেজর জেঙ্কিনস রাজিও হয়েছিলেন। তার কারণ আসাম দুয়ারের দরুন প্রাপ্য রাজকর কোনো বছরে নিয়মিত পাওয়া যেতো না বলেই ওই করের বিনিময়ে হরগোবিন্দের প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছিল। কিন্তু গভর্নর জেনারেল অকল্যান্ড তখন পেম্বারটনের

ভূটান যাত্রার বিষয়টি চিন্তা করছিলেন। সুতরাং পাছে ভূটান বিরূপ হয়ে যায় এই ভেবে হরগোবিন্দকে সাহায্য করবার প্রস্তাব বাতিল করে দিলেন। অবশ্য, লন্ডনের কর্তৃপক্ষ জেঙ্কিনসের মতেই মত দিয়েছিলেন। তবে তাঁদের অভিমত ভাবতে পৌঁছুবার আগেই পেম্বারটন ভূটানে রওয়ানা হয়ে যান।

হরগোবিন্দকে অবশ্য অত সহজে ঝেড়ে ফেলা গেল না। হরগোবিন্দ ভূটানের এক প্রাক্তন রাজার সঙ্গে যোগ দিয়ে রাজনৈতিক গোলযোগের সুযোগে নিজের স্বার্থ উদ্ধার করতে চাইলেন। বর্তমান রাজা তখন বৈকুণ্ঠপুরের রায়কত পরিবারের দুর্গাদেবকে হরগোবিন্দের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেন। দুর্গাদেব বোধ হয় রায়কত সর্বদেশের বহু সন্তানের অন্যতম। ভূটানের কাছ থেকে আমবাড়ী-ফালাকাটার ইজারা নিয়ে দুর্গাদেব ভূটানের নিজের লোক হবার চেষ্টা করেছিলেন।

পরগনা বৈকুণ্ঠপুরের আয়তন ছিল ৩৮০ বর্গমাইল। এর মধ্যে ১৫৯ বর্গমাইল অরণ্য অবশিষ্ট ২২২ বর্গমাইল মাত্র চাষের যোগ্য। এই হিসাব ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পক্ষ থেকে বুকানন হ্যামিলটন উনবিংশ শতকের গোড়ায় করেছিলেন। ইতিপূর্বে পরগনার আয়তনের কোনো তথ্য জানা ছিল না। এমনকি রাজস্বের বন্দোবস্তী-জমা রংপুরের অন্তর্ভুক্ত হবার সময় কত ছিল জানা না গেলেও ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দের কাগজপত্র থেকে একটা ধারণা পাওয়া যায় মাত্র। এই জমার পরিমাণ ছিল ৩০.৬৫১ টাকা।

ভূটানের বিদ্রোহী কাঠাম হরগোবিন্দকে জব্দ করতে পারলে তিস্তার পূর্বদিকের এলাকায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন বলে আশা ছিল। ফলে তিস্তা থেকে জলঢাকা নদীর অন্তর্বর্তী এলাকা যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হল। দুর্গাদেব ইংরেজের প্রজা। বৈকুণ্ঠপুর থেকে লোকজন, রসদ অনায়াসে জোগাড় করে দুয়ারে গিয়ে হরগোবিন্দকে আক্রমণ করতে পারতেন ; কিন্তু হরগোবিন্দের পক্ষে প্রতি-আক্রমণ করতে হলে বৈকুণ্ঠপুরে ইংরেজ সীমানায় প্রবেশ করতে হত, যা সম্ভব ছিল না। তবু হিন্দুস্তানী সৈন্যের জোরে হরগোবিন্দ লড়াই চালিয়ে যান ; শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে হরগোবিন্দকে কাবু করতে না পেরে দুর্গাদেব ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দে আততায়ী দিয়ে কাঠামকে হত্যা করান। ভূটানের রাজা খুশি হয়ে ক্রান্তি, গোপালগঞ্জ, ময়নাগুড়ি, চ্যাংমারি তালুকগুলি দুর্গাদেবকে বন্দোবস্ত করে দিলেন।

ইংরেজকে এবার হস্তক্ষেপ করতেই হল। রায়কত সর্বদেবের সমর্থন ছাড়া দুর্গাদেবের পক্ষে ভূটানের অভ্যন্তরীণ গোলযোগে জড়িয়ে পড়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু দর্পদেব রায়কতের আচরণের পুনরাবৃত্তি ইংরেজ বরদাস্ত করতে পারল না। দুর্গাদেবকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দেওয়া হল যে রংপুরের ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি না নিয়ে ভূটানের কোনো এলাকায় তিনি যেতে পারবেন না। বছরে ৮ শত টাকা রাজস্ব দেবার শর্তে দুর্গাদেবের পরিবর্তে ভূটানের কাছ থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আমবাড়ী-ফালাকাটার ইজারা গ্রহণ করল সর্বোপরি, অন্যায়ভাবে একটি বিদেশি রাজ্যের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হবার অপরাধে রায়কত সর্বদেবকে রংপুরে তিন বছর অন্তরীণ জীবন কাটাতে হল। হরগোবিন্দের উত্তরাধিকারী রংপুরের পাট গ্রামে বাস করতে চলে যান, এবং রংপুরের ম্যাজিস্ট্রেট ৩ হাজার টাকার ব্যক্তিগত মুচলেকা লিখিয়ে নিয়ে পাটগ্রামে থাকবার অনুমতি দিলেন।

এবার বৈকুণ্ঠপুর থেকে জলপাইগুড়ি পরিক্রমার শেষ পর্ব সুরু হল। সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে দুয়ারগুলি দখল করে নেবার সংকল্পের সঙ্গে সঙ্গে চীন, তিব্বত এবং নেপালের অবগতির জন্য ইংরেজের সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা এবং প্রয়োগ সীমা সম্পর্কে ওই দেশগুলিকে জানিয়ে দেওয়া হল। কেবল দুয়ারগুলি দখল করে নেওয়া ছাড়া ইংরেজের যে অন্য কোনো অভিসন্ধি ছিল না সেকথা হিমালয়ের রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার দিক বিবেচনা করে জানাবার প্রয়োজনও ছিল।

১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর থেকে সংঘর্ষ এবং শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত ঠিক একটি বছর লাগল। দুয়ারগুলির বন্য পরিবেশে যুদ্ধ করতে গিয়ে ইংরেজ উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে দুয়ার অতিক্রম করে ভূটানের পার্বত্য উপত্যকায় সসৈন্যে গিয়ে উপস্থিত হওয়া এবং তাকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করা সম্ভব নয়। সৌভাগ্যক্রমে ভূটানের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি ইংরেজের সঙ্গে বিবাদ মিটিয়ে ফেলতে সুযোগ করে দেয় ; ইংরেজেরও মুখ রক্ষা হল।

বাংলার উত্তর সীমানার নিরাপত্তার প্রশ্নটি এখন প্রাধান্য পেলো। দুয়ারগুলি ইংরেজের অধিকারে ভূটান ছেড়ে দিল। পশ্চিম দুয়ারগুলির প্রকৃত অধিকারী কোচবিহারের কথা ইংরেজ একবারও ভেবে দেখল না। এমন কি উত্তর-পূর্ব সীমান্তের প্রাক্তন ইংরেজ রাজপুরুষ জেঙ্কিনসের অনুরোধও নিষ্ফল হল। কারণ ভূটান সিকিম সীমান্তে ইংরেজ পূর্ণাবয়ব জেলা তৈরি করে হিমালয়ের রাজনীতির গতি-প্রকৃতির উপর লক্ষ রাখতে চেয়েছিল। দুয়ার অঞ্চলের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা তখনও স্পষ্ট হয়নি। ১৮৬০ বর্গমাইল এই এলাকা থেকে ১৮৬৬-৬৭ খ্রিস্টাব্দে রাজস্ব মাত্র ১ লক্ষ ৩ হাজারের একটু বেশি টাকা ইংরেজ পেয়েছিল। কিন্তু ভূটান স্বীকার করেছিল যে তার দিক থেকে অতীত দিনের মতো ইংরেজ অধিকারের মধ্যে ভূটানীরা গিয়ে আর উপদ্রব করবে না। যদি করে, দুয়ার হারাবার দরুন ভূটানের আর্থিক ক্ষতি বিবেচনা করে ইংরেজ প্রতি বছর জানুয়ারি মাসে যে অর্থ ভূটানকে সাহায্য হিসাবে দেবে তার আংশিক বা সবটুকুই ইংরেজ বন্ধ রাখতে পারবে। এই অর্থ-সাহায্য সন্ধির বছর থেকে ধাপে ধাপে ২৫ হাজার, ৩৫ হাজার, ৪৫ হাজার পর্যন্ত বাড়িয়ে

চতুর্থ বছর থেকে ৫০ হাজার টাকা করা স্থির হল। এই অর্থ-সাহায্যের বিনিময়ে ইংরেজ শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হল। তবে, ইংরেজ তার মৌল চরিত্র বিসর্জন দেয়নি। হিমালয়ে ইংরেজের ব্যবসার আশু কোনো সম্ভাবনা নেই, একথা জানা সত্ত্বেও ভূটানের সঙ্গে চুক্তিপত্র সম্পাদনের সময়ে উভয়ের মধ্যে অবাধ বাণিজ্য চালু করবার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল ; উদ্দেশ্য, হিমালয়ে বাণিজ্যের পথ যদি কোনোদিন উন্মুক্ত হয় ভূটান প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না ভূটান মেনে নিয়েছিল। রাজনৈতিক অনিয়ম মুক্ত এবং মিত্রভাবাপন্ন ভূটানকে প্রতিবেশী হিসাবে পাবার ইচ্ছা ইংরেজের অনেকদিনের। সে ইচ্ছাপূরণের ইঙ্গিত পেয়ে ইংরেজ উৎসাহিত হল। বাকি রইল ভূটানের কবলমুক্ত দুয়ার এলাকা সুসংবদ্ধ করা। তার প্রয়োজনে পশ্চিম দুয়ারগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা হল,—তিস্তা নদী থেকে তোর্সা নদীর অন্তর্বর্তী এলাকা প্রথম ও সদর বলে চিহ্নিত হল। ময়নাগুড়ি হল সদর দপ্তর। দ্বিতীয় ভাগ তোর্সা এবং সঙ্কোশ নদীর অন্তর্বর্তী, দপ্তর রইল আলিপুরে। এবং তৃতীয় ভাগ পাহাড়ের উপরের অঞ্চল যা ডালি কোট নামে পরিচিত হল। শাসক হিসাবে নিযুক্ত হয়ে এলেন ইংরেজ রাজপুরুষ ডেপুটি কমিশনার নাম নিয়ে। ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দের ১ জানুয়ারি ডালিং কোটকে দার্জিলিং-এর সঙ্গে যুক্ত করা হল। সেই সঙ্গে রংপুরের তেঁতুলিয়া মহকুমা, যার অন্তর্ভুক্ত ছিল বোদা, সন্ন্যাসীকাটা এবং ফকিরগঞ্জ পুলিশ এলাকা, পশ্চিম দুয়ারের ডেপুটি কমিশনারের দায়িত্বে রাখা হল। কেবল রাজস্ব বিষয়টি রংপুরের অধীনে রইল। অবশেষে ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দের ১ জানুয়ারি তেঁতুলিয়া মহকুমার সম্পূর্ণ দায়িত্ব ডেপুটি কমিশনারকে দেওয়া হল, যার ফলে পুরাতন বৈকুণ্ঠপুর পরগনা তিস্তা-সঙ্কোশের মধ্যবর্তী দুয়ার অঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত হল এবং জলপাইগুড়ি নামে নতুন একটি জেলা বাংলার মানচিত্রে স্থান পেয়েছে। তখন থেকে ডেপুটি কমিশনার জলপাইগুড়ি শহরে সদর দপ্তর স্থাপন করলেন।

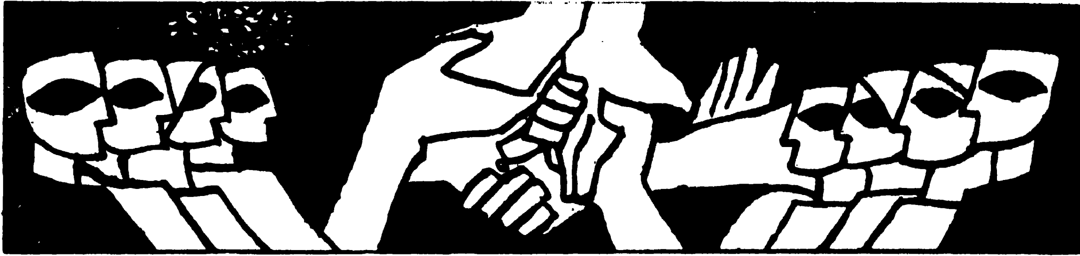
লেখক ❑ শিক্ষাবিদ, ইতিহাসের অধ্যাপক, গবেষক ও প্রাবন্ধিক

সৌজন্যে—মধুপর্ণী বিশেষ জলপাইগুড়ি জেলাসংখ্যা (১৩৯৪)



ডুয়ার্সের অরণ্য

ছবি : বিশ্বজিৎ মণ্ডল



পরিতোষ দত্ত

দুটি পাতা একটি কুঁড়ির ইতিহাস জলপাইগুড়ি জেলা

জলপাইগুড়ি বলতেই মানুষ ধরে নেয় চা, কাঠ, নদী, বন্যা, অজস্র ও বিচিত্র পাখি, জঙ্গল, জানোয়ার। জেলাটি তো নিতান্তই নবীন। কিন্তু জেলার দিকে নজর ছিল ইংরেজদের। পামবারটন সাহেব গত শতকের ত্রিশ দশকে ভোটান যাবার পথে পাহাড় থেকে দীর্ঘ বিস্তীর্ণ ঘাসযুক্ত জঙ্গল দেখে লুব্ধ চোখে তাকিয়ে ভাবছিলেন— আহা, এমন জমি পেলে তো চা-আবাদের জন্য ভাবতে হয় না। ওই শতকের ষাট দশকে ডুয়ার্স অঞ্চল ভোটান সরকার থেকে ব্রিটিশরা নিয়ে নেয়। ইতিপূর্বে অসমে চা-আবাদ বেশ রমরমা হয়েছে। সেখান থেকে চলে এসেছে দার্জিলিং এলাকায় ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে। দার্জিলিঙের চা-কর Dr Brougham প্রথম নজর দেন নতুন ডুয়ার্স এলাকায়। ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে গাজোলডোবা এলাকায় প্রথম চা-বাগান স্থাপন করার চেষ্টা হয়। প্রথম ম্যানেজারের নাম Richard Houghton। সে সময় ডুয়ার্সকে বলা হত—This was a land only for saints or the satans. শয়তান বা সাধুর দেশ হচ্ছে ডুয়ার্স। এ বিষয়ে ব্রিটিশদের বক্তব্য আরও তির্যক :

The British in India at that time were not unduly worried about either saints or satans. Although the Duars was a most unhealthy district, in which malaria and black-water fever were rife, climatically there was much to recommend it as a tea-growing area.

ব্রিটিশরা শয়তান বা সাধু বিষয়ে একেবারেই চিন্তান্বিত ছিল না। ডুয়ার্স ছিল ম্যালেরিয়া আর ব্ল্যাক-ওয়াটার রোগের ডিপো কিন্তু আবহাওয়া ছিল চায়ের অনুকূল।

এবার গাজোলডোবা বন্যায় প্রতি বছর মার খায়। ওটা সাহেবরা ছেড়ে দিয়ে পাহাড়ের দিকে উঠতে থাকে। গ্রুনিং সাহেবের গেজেটিয়ার অনুসারে আমরা জ্ঞাত হই পরের উদ্যোগ :

Fulbari was the next place to be planted and was opened by late Pillans who gave his name to the market called Pillanshat and was owned by Col. Money. Bagrakote followed, opened out by late Mr. North and owned by Mr. S. Gerswell.

পিলানস্ সাহেব ফুলবাড়ি খুললেন, বাজার বসালেন তাঁর নামে। বিখ্যাত চা-ব্রোকার W. S. Gerswell সাহেব মিঃ নর্থকে দিয়ে খোলালেন বাগরাকোট। বস্তুত চা-আবাদের সঙ্গে সঙ্গে এলাকা জুড়ে বসতির সঙ্গে শুরু হয় নতুন সব বন্দর এবং পুরাতন জেলার একটা গণ্ডগ্রাম জলপাইগুড়ি হয় সদর দপ্তর। ১৮৭৬ সনে মোট ছয়টি গ্রান্ট দেওয়া হয়, বাগানগুলির নাম :

ফুলবাড়ি
গাজোলডোবা
বাগরাকোট
ডালিমকোট
রাঙ্গাতি

১৮৭৭ সনে এই জেলার প্রথম ভারতীয় একটি জমির গ্রান্ট পান। ভারতীয়র নাম মুন্সি রহিম বক্স। পরের বছর আর একজন ভারতীয় যুক্ত হন—নাম বাবু বিহারীলাল গঙ্গোপাধ্যায়, কাষ্ঠব্যবসায়ী। তিনিই প্রথম এ শহরের বাবুপাড়ার পত্তন ঘটান। বাগান দুটির নাম জলঢাকা আর আলতাডাঙ্গা।

১৮৭৭ সালে গ্রান্ট হয় নিম্নলিখিত বাগানগুলির জন্য :

বেতবাড়ি
বামনডাঙ্গা
এল্লেনবাড়ি
ডামডিম
কুমলাই, ওয়ানাবাড়ি

১৮৭৮ সালে কলাবাড়ি গ্রান্ট দেওয়া হয়। এই বাগান পরে চলে যায় বিখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ নীলরতন সরকার ও শ্রীমতী সরোজিনী রায়ের নামে। অনেক পরে তা আসে তারিণীপ্রসাদ রায়ের কাছে। বর্তমানে তা বিক্রি হয়ে গেছে।

১৮৭৮ সনে শুরু হয়:

গুডহোপ
রানিচেরা
মানাবাড়ি
বালাবাড়ি
আলতাডাঙ্গা (বিহারীলাল গঙ্গোপাধ্যায়)
মানিহোপ (ফুলবাড়ি)
চায়েল ও পাতাবাড়ি
(লিস বিড়ার)

১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দ জলপাইগুড়ির ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। সে সময় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্রের পিতা ভগবানচন্দ্র বসু। তাঁর উৎসাহে মোগলকাটা চা বাগানের পত্তন হয়, কোম্পানির নাম জলপাইগুড়ি টি কোং লিঃ।

১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানির পত্তন হলেও গ্রান্ট পায় ৯-৩-১৮৮১ তারিখে। ২ জুনে প্রথম সাধারণ সভা হয়। প্রথম ডিরেক্টর ছিলেন :

শ্রীনাথ চক্রবর্তী
জয়চন্দ্র সান্যাল
গোপালচন্দ্র ঘোষ
মহিমাচন্দ্র ঘোষ
যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী।

প্রথম সেক্রেটারি ও সভাপতি ছিলেন জয়চন্দ্র সান্যাল। কিন্তু সাধারণ সভায় সম্পাদক নিযুক্ত হন উমানাথ চক্রবর্তী, মাসিক মাহিনা ২০ টাকা প্রথম ম্যানেজারের মাহিনা ছিল ৫০-৭৫ টাকা, প্রথম সুপারিনটেন্ডেন্ট মিঃ লুকাস পেতেন মাসে ১৫০ টাকা। এর পূর্বে যে ভারতীয় বাগান খোলেন তিনি হলেন মণিরাম দত্ত বরুয়া। তাঁকে ইংরেজরা ফাঁসিতে ঝুলিয়ে ঠিক মহারাজ নন্দকুমারের মতো হত্যা করে। সেটা ১৮৫৭ সনে, বাগান করেন দুটি তার দশ বছর পূর্বে। জয়েন্ট স্টক কোম্পানি প্রথম কাছাড়ে বাঙালিরাই করেন।

১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে পাই নীচের নামগুলি :

রূপনী
সুনগাছি (১ ও ২)
বামনডাঙ্গা (এক্সটেনশন)
ওয়াশাবাড়ি (ঐ)
মানাবাড়ি (ঐ)
বালাবাড়ি (ঐ)
নাগরাকাটা
এল্লেনবাড়ি (২) (ঐ)
বাগরাকোট (৭) (ঐ)

আমরা লক্ষ করছি তিস্তার পাড় ছেড়ে চা বাগান ডামডিম মাল হয়ে ভোটানের কোলে নাগরাকাটায় পৌঁছে গেছে ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে।

১৮৮০ সাল ছিল স্তিমিত। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে হ'ল :

হায়হায়পাথার
ওদলাবাড়ি
বাইতাগুল
ন্যাওড়ানুদী

১৮৮২ সালে চ্যাংমারী এলাকায় হয় ক্যারন চা বাগান।

১৮৮২ সনে ভারতীয় উদ্যোগে তৈরি হয় নর্দার্ন বেঙ্গল টি করপোরেশন—বাগানের নাম নিদাম।

১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে আবার ভারতীয়রা উদ্যোগ নেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত চালসা টি কোং-এর কাছে বিক্রি করে দেয়—ইয়ংটং ও চিলৌনি গ্রান্ট। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে তৈরি হয় :

ইয়ংটং
চিলৌনি
নাগাইসুরী

ইঙ্গো
জুড়ান্তি
মূর্তি
আইভিল
কিলকট
নিদীম
মেটেলি
চালসা
সানড্রি
আলসটন (নিদীম টি কোং)
ব্যাঙ্কস (ঐ)
সায়লী (ঐ)
মিনগ্লাস

এই সময় ডানকান ব্রাদার্স চা-ব্যবসায় আসে এবং মিনগ্লাস, হোপ (১৮৮৫) জিতি ও চিলৌনি (১৮৮৬) বাগানের পত্তন হয়।

১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে পেস্কার সাহেবের স্ত্রী বিবি রহিমননেছা মাল-নদী বাগান খোলেন মাত্র ৩২৯ একর নিয়ে। এ বছর পেস্কার সাহেব ও বিহারীলালেরা খোলেন গুরজাং ঘোড়া। এ বছর জন্ম নেয় :

ভগতপুর
লুকসান
ঘাটিয়া
তণ্ডু

১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে হলদিবাড়ি টি কোম্পানির বাগানের উদ্যোগ শুরু হয়।

১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে মিঃ ওয়াল্টার ডানকান ভারতে আসেন এবং চিলৌনি বাগান দেখে ভীষণ মুগ্ধ হন এবং কোম্পানির যা শেয়ার পাওয়া সম্ভব ছিল তা কিনে নেন। ডানকান আজ গোয়েঙ্কাদের একটি নামী ও দামি সংস্থা। একসময় ডুয়ার্সে এরাই ছিল একচ্ছত্র সম্রাট। পরে ডানকান থেকে গুডরিক গ্রাফ বেরিয়ে আলাদা কোম্পানি তৈরি করে এবং মূলত এরা স্টারলিং বা ইংল্যান্ডে স্থাপিত কোম্পানি হিসেবে পরিচিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও ডানকানের অবস্থান চা-শিল্পে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে আবার হিন্দু-মুসলিম যৌথ উদ্যোগে তৈরি হয় আনজুমান টি কোম্পানি। এখানে ছিলেন জয়চন্দ্র সান্যাল, গোপালচন্দ্র ঘোষ, যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী, শ্রীনাথ রায়, মুন্সী আবদুল হামিদ। মুজনাই ও মাকরাপাড়া এ দুটি চা বাগান সে সময় যথেষ্ট নামী ছিল।

১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে ডানকান গ্রাফ ক্যারন, নাগাইসুরী ও লঙ্কাপাড়া স্থাপন করে। হলদিবাড়ি, চেংমারি, গ্রাসমোর ও সাঁওগাঁও চা বাগানও এ সনে শুরু হয়। সাঁওগাঁও বাগানটির বর্তমান নাম সোনালী টি এস্টেট।

১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে শুরু হয় গয়েরকাটা, তেলীপাড়া, হান্টাপাড়া এবং আনজুমান টি কোং-এর সুজনাই ডিভিশন। পরের বছর মাকড়াপাড়া চা বাগান তৈরি হতে থাকে। ইতিমধ্যে মুন্সী রহিম বক্স সাহেব জলঢাকা বাগানের জন্য আরো ১১৫ একর জমি সংগ্রহ করেন।



দুর্গম অঞ্চলে চা-পাতা তোলার কাজে বানর বাহিনী (১৮১২ সালের সচিত্র উদাহরণ) সূত্র : A History of the Tea Trade, By P. J. Banvard)

চামুর্চি টি কোং লিঃ ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত হয়। এটা মুন্সী রহিম বক্স সাহেবের উদ্যোগে।

ইতিমধ্যে সোনার সন্ধানে আরও নতুন উদ্যোগ শুরু হয়। এলেন আমলা সদরপুরের সাহারা। তাঁরা ১৮৯২ সনে করেন তোতাপাড়া চা-বাগানের শুরু। বাদাপানি ও লঙ্কাপাড়া চা-বাগানের শুরু এই বছর। লঙ্কাপাড়া শব্দটি এসেছে টোটোদের কাছ থেকে, অর্থ গণ্ডার। বস্তুত তার নীচে জলদাপাড়ায় গণ্ডার এখন আশ্রয় নিয়েছে।

১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে নিউ ল্যান্ডস, একেবারে পূর্বে অবস্থিত, চুনাভাটি, হরতালগুড়ি, ডুড়ুমারী, গানদ্রাপাড়া বাগান শুরু হয়।

১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে কাঠালগুড়ি চা কোম্পানি তৈরি হয়। ভারপ্রাপ্ত হন শ্রীনাথ রায় ও গোপালচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের জামাতা তরুণ উকিল তারিণীপ্রসাদ রায়। তারিণীপ্রসাদ বিবাহ করেন গোপালচন্দ্র ঘোষের কন্যা কাদম্বিনী দেবীকে। অপর কন্যার নাম সৌদামিনী দেবী। দুই কন্যার নামেই দুটি চা-বাগান খোলা হয়। গোপালচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের পুত্র যোগেশচন্দ্র ঘোষ বিবাহ করেন সুভাষিণী দেবীকে। পরে ঘোষ পরিবার তাঁদের একটি বাগানের নাম পরিবর্তন করে রাখেন সুভাষিণী চা-বাগান।

একই বছরে শুরু হয় নাকাটি, রাঙ্গামাটি, চুয়াপাড়া, তোর্ষা, জয়ন্তী, বানারহাট, কারবালা। চুয়াপাড়া, তেলীপাড়া ও হান্টাপাড়াকে আরো বাড়ানো হয়।

১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে মুন্সী রহিম বক্স সাহেব খোলেন স্বনামে রহিমা বাজ এবং চুনিয়াঝোড়া চা-বাগান। ডানকান ব্রাদার্স খুলেছিল

কুমারগ্রাম, ফাঁসখাওয়া, জয়ন্তী, পূর্বদিকে হলদিবাড়ী ও বড়োদিঘি চা বাগানের উন্নতি ঘটতে থাকে। এলো হাসিমারা টি কোং। বক্সাডুয়ার টি কোং কালচিনি বাগান খুলল। বীরপাড়া চা-বাগানও হয় এই সময়।

১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে ডানকান ব্রাদার্স স্থাপন করে গড়গেণ্ডা। নিদিম টি কোং শুরু করে দলগাঁও, দলমণি এবং দলসিংপাড়া লক্ষ্মীপাড়া চা-বাগানও এই সময় তৈরি হয়।

১৮৯৮ খ্রি. আর একটি মুখ বাংলার এই অঞ্চলে দেখা গেল। ইনি পেস্কার রহিম বক্স সাহেবের জামাতা মৌলভী মুসারফ হোসেন। শ্রীনাথ রায় বিবি নুরজান সহ এঁরা আটিয়াবাড়ী চা-বাগানের গ্রান্ট পান। বিন্নাগুড়ি ও লঙ্কাপাড়া বাগিচার কাজ শুরু হয় এই বছর।

১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে এল ম্যাকলয়েড অ্যান্ড কোং—দুটি গ্রান্ট নিয়ে ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে ভাতখাওয়া খোলে—পরের বছর রাজাভাত।

১৯০০ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত হয় আটিয়াবাড়ি ও দেবপাড়া। ১৯০৭ সনে ধুমচিপাড়া চা-বাগান শুরু হয়। রামঝোড়া চা কোম্পানি এই বছর শুরু হয় কিন্তু জমি নিয়ে লড়াই বাধে ইংরেজ চা-করদের সঙ্গে। গোপালচন্দ্র ঘোষ, জামাতা তারিণীপ্রসাদ রায়, শশীকুমার নিয়োগী, ওয়ালিয়র রহমান, মুসারফ হোসেন এই কোম্পানির গোড়াপত্তন করেন। প্রথম ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হন গোপালচন্দ্র ঘোষ।

এই কোম্পানি নিয়ে একটা ঘটনার কথা বোধহয় বলা যায়। যোগেশচন্দ্রের মার নাম দক্ষিণাকালী দেবী। গোপালচন্দ্র ঘোষ মারা যান ১৯১৯ সনে। মা হঠাৎ আবদার করলেন পুত্রের কাছে রামঝোড়া টি কোম্পানির বিশ হাজার টাকার শেয়ার তাঁর চাই। যোগেশচন্দ্র চলে এলেন পুরী বেড়াতে। ওদিকে মাও কম যান না। লোক ছুটল পুরীতে। পুত্র মায়ের আবদার মেনে নিলেন। সে আমলে এঁরা সোনার অলঙ্কার থেকে চা-বাগানের মূল্য দিতেন বেশি, তাই স্বামীর কথায় গহনা বন্ধক দেবার জন্য এতটুকু বিচলিত হতেন না। বীরেনচন্দ্র ঘোষ লিখেছিলেন—আমাদের পূর্বপুরুষেরা দরিদ্র ছিলেন বটে কিন্তু ছিলেন অসম সাহসী। বস্তুত জলপাইগুড়ির সৌভাগ্য যে এই ছোট্ট শহর এতগুলি সাহসী মানুষ হিন্দু-মুসলিম পেয়েছিল।

১৯১০ সনে ডিমা চা-বাগান, নবাব সাহেবরা খোলেন ডায়না চা-বাগান। এ সময় আলিপুরদুয়ারের বাঙালিরা খোলেন তুরতুরী চা-বাগান।

যে সব স্থানে চা-বাগান হতে থাকে তা ছিল প্রায় জনমানবশূন্য। জল ছিল না ধারেকাছে; নাম ছিল নিপানিয়া বা পানি বা জল নেই যেখানে।

জে এফ গ্রুনিং সাহেব এ জেলার চা-বাগানের কিছু পরিসংখ্যান দেন।

বছর	বাগানের সংখ্যা	মোট জমি একরে	মোট চা উৎপাদন (পাউন্ডে)
১৮৭৬	১৩	৮১৮	২৯,৫২০
১৮৮১	৫৫	৬২৩০	১০,২৭,১১৬
১৮৯২	১৮২	৩৮৫৮৩	১৮,২৭৮,৬২৮
১৯০১	২৩৫	৭৬৪০৩	৩১,০৮৭,৫৩৭
১৯০৭	১৮০	৮১৩৩৮	৪৫,১৯৬,৮৯৪

বাগান কমার কারণ বহু বাগান একে অপরের সঙ্গে যুক্ত হতে থাকে এবং কিছু বাগান উঠেও যায়। কিছু বাগান জলের অভাবে বন্ধ হয়ে যায় যেমন কাঠালবাড়ি ১, হরতালগুড়ি ১। চুনাভাটিতে কুয়োর জল পাওয়া যেত ৬৫ ফুটে। নিউ ডুয়ার্সে ৬৫ ফুটে, বানারহাটে ৭০ ফুটে, আবার এই বাগানের আর একটি স্থানে মাত্র ২৫ ফুটে জল পেয়েছে। গেনড্রাপাড়ায় ৭৩ ফুটে, এই বাগানের দু মাইলের মধ্যে মাত্র ১৫ ফুটে জল পাওয়া গেল। দলগাঁও বাগানে ২০ ফুটে, পলাশবাড়ি চা-বাগানে ৫০-৭০ ফুটে জল মিলতো। মজার একটা বিবরণ পাওয়া গেছে পানি রহস্যে। কিছু ঝর্ণার জল দেখা গেলেও, চারপাশের চুনামাটি তাকে নিঃশেষ করে দিত—এবার ওই জল পাওয়া গেল ৭-১১ মাইল দূরে। জলঢাকা নদীর নাম হয়েছিল এই রকম একটা ঝর্ণার হঠাৎ অদৃশ্য হওয়া থেকে—তাই জল ঢাকা নাম। মেচ-ভুটানী নাম দি-চু। দুটিই নদীর অর্থ বহন করে।

জলপাইগুড়ি শহরে চা-বাগানের বিষয়ে নিম্নলিখিত বিবরণী একটা আবেশ এনে দেয়। লক্ষ করার মতো ঘটনা মূলধন বেড়েছে প্রায় ৭ গুণ—এসব কোম্পানিগুলির লাভ থেকে দেওয়া নতুন শেয়ার।

মূলধন স্থাপনের সময়	বর্তমান মূলধন	কোম্পানির নাম	যে বছরে স্থাপিত হয়	মোট একর	১৯২৪ সনে চা-আবাদের পরিমাণ একরে
৫০,০০০	৭,০০,০০০	জলপাইগুড়ি টি কোং	১৮৭৯	১৪৯৫	৫৬০
১,০০,০০০	৪,০০,০০০	নর্দার্ন বেঙ্গল	১৮৮২	৮৯৮	৫২০
৮৫,৪০০	৮,৪১,৬০০	গুরজাং ঝোড়া	১৮৮২	৮০০	৬১২
২,২৫,০০০	৬,৭৫,০০০	আনজুমান	১৮৮৯	৪০২৬	১১১২
৫০,০০০	৫,০০,০০০	চামুর্চি	১৮৯১	২১৯০	৮৭৭
৭৫,০০০	৭,৮৭,৫০০	কাঠালগুড়ি	১৮৯৫	২৩২৫	৭৭৮
৭৫,০০০	৫,০০,০০০	চুনিয়াঝোড়া	১৮৯৬	১৮৩৪	৫১২
৭৫,০০০	৫,২৫,০০০	আটিয়াবাড়ি	১৯০০	১৮২৩	১০৩৪
১,৩০,০০০	৮,৯৭,০০০	রামঝোড়া	১৯০৭	১৫২২	৮৫৮
১,৩৫,২০০	১০,৮১,৬০০	দেবপাড়া	১৯০৯	১৫০০	৯০০
১,২৪,২০০	৪,৯৬,৮০০	ডায়না	১৯১০	১২৫০	৬৯০
১১,২৪,৮০০	৭৪,০৪,৫০০			১৯৬৬৩	৮৪৫৩

১৯১৪ সনে ইংরেজ সরকার জোত-ল্যান্ড চা বাগানের কাজে ব্যবহারের বিরুদ্ধে আইন করলে ভারতীয় চা-করেরা চলে যান অসমে। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে তিনটি বাগান গৌরনিতাই, মনমোহিনীপুর আর করনেশন খোলে। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে হালমারী ও নিউ আসাম খোলা হয় অসমে।

প্রথম মহাযুদ্ধে এসব উদ্যোগে ভাটা পড়ে। ১৯১৭ সনে মেরী ভিউ চা-বাগান তরাইতে, রাজা প্রসন্নদেব রায়কতের বৈকুণ্ঠপুর এলাকায় চা-বাগান খোলার অনুমোদন দেয়। ইতিপূর্বে ডেঙ্গুয়াঝাড় চা-বাগান মাত্র এ এলাকায় ছিল। ১৯১৭ সনে হয় সরস্বতীপুর,

১৯১৮ সনে জয়পুর। করলা ভেলী। রাজা প্রসন্নদেব জমির পরিবর্তে রাখেন শেয়ার। রাজা প্রসন্নদেব খুললেন নিজের উদ্যোগে শিকারপুর আর ভাণ্ডারপুর। সে সময় শিকারপুর ছিল সবথেকে বড়ো বাগান। ধওলাঝোড়ায় চা লাগানো হয় ১৯১৩ সনে। ৫০০ একরে, বাঁচে মাত্র ২০০ একর।

এ সময় খয়েরবাড়ি টি কোং স্থাপিত হয়। প্রথম তা যেখানে হবার কথা ছিল তা ছিল খয়েরবাড়ি মৌজা-মাদারীহাট এলাকায়। খয়ের গাছ এলাকার জমি চায়ের উপযুক্ত হয় না কারণ তা আলকেলিযুক্ত। পরে উদ্যোক্তারা ৩৫ মাইল দূরে নিমতি-দোমহনী এলাকায় তা স্থাপন করেন। উদ্যোক্তারা ছিলেন পূর্ণচন্দ্র রায়, রাজেন্দ্রকুমার নিয়োগী, গঙ্গানাথ বাগচী, শশীকুমার ব্যানার্জী, তারিণীপ্রসাদ রায়।

১৯১৩ সনে মুসারফ হোসেন খোলেন হোসেনাবাজ, কর্মকার পরিবার ঢেকলাপাড়া, পলাশবাড়ি—শশী ব্যানার্জী, বিহাবাড়ি—ওয়ালিয়র রহমান, রাধারানী—নদীয়ার পালচৌধুরী, আলিপুরদুয়ারের উকিলরা মিলে খোলেন পাইটকাপাড়া। ১৯১৬ কোহিনূর চা-বাগান খোলা হয়।

১৯১৭ সনে গোপালচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে জামাতা তারিণীপ্রসাদ রায়ের গুরুতর মতবিরোধ হয়। তারিণীপ্রসাদ গোপালচন্দ্র ঘোষকে টক্কর দেবার জন্য খোলেন তৎকালীন বাঙালিদের মধ্যে সব থেকে বড়ো চা-বাগান মথুরা।

১৯২১ সনে স্থাপিত হয় মরাঘাট ও হান্টাপাড়া। রেড ব্যাঙ্ক হয় এই সময়। জলাভাবে বাগানটি প্রথম থেকে আক্রান্ত ছিল বটে কিন্তু পরে বাগানটির গুড় উৎপাদন ডুয়ার্সে প্রথম দলে স্থান পায়।

এই সময় জোত-ল্যান্ডের উপর চা-বাগান খোলার নিষেধাজ্ঞা উঠে যায়। ভারতীয় চা-করেরা ১৯২৪ সনে তরাই এলাকায় খোলেন বিজয়নগর, যোগেশচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে। ১৯২৬ সনে মালহাটি বা বর্তমানের যোগেশচন্দ্র। এ সময় টি ব্রোকার জে থমাস যোগেশচন্দ্রের মূলধন যোগায়।

১৯২৪ সনে জলপাইগুড়ির আনন্দপুর খোলেন আনন্দচন্দ্র রাহুত।

আসরে নামলেন লাটু মিএগ্রা নবাব সাহেবের ভাই মোকলেছর রহমান। ১৯২৫ সনে বাতাবাড়ি, ১৯২৭ সনে নিপুছাপুর। ১৯২৫ সনে যাদবপুর খোলেন যাদবচন্দ্রের পুত্র মাখনলাল চক্রবর্তী। খোলেন তারিণীপ্রসাদ তাঁর সহকর্মী জয়গোবিন্দ গুহ ও পূর্ণচন্দ্র রায়ের সঙ্গে মধু চা-বাগান। হাসিমারা খোলে তাদের বাড়তি জমিতে সাতালী। ১৯২৯ সনে হল রহিমপুর চা-বাগান, খোলেন পেস্কার রহিম বক্স সাহেবের অপর জামাতা বিখ্যাত খান বাহাদুর এম. এল. রহমান সাহেব।

সৌদামিনী চা-বাগান খোলার ইতিহাস তো এক উপন্যাস। সাহেবরা বাঙালিদের জমি কিনতে দেবে না। এবার হাতি কেনার অছিলায় গেলেন যোগেশচন্দ্রের পুত্র বীরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, জগৎবন্ধু সরকার ও কবিরাজ সতীশচন্দ্র লাহিড়ী, পূর্ণচন্দ্র দাস। মেচ জোতদারদের কাছ থেকে তাঁরা জমি কেনেন। রাত কাটান এক নেপালির ছোট্ট দোকানে। মামলা করে হাসিমারার মি. এন. জি. ওয়েব—জিতলেন ঘোষরা। সৌদামিনী চায়ের আকাশে পূর্ণচন্দ্রের মতো স্থান পেল।

মধু চা-বাগানের পূর্বকথা যথেষ্ট করুণ। জয়গোবিন্দ গুহ মহাশয়ের পুত্র তরুণ চিকিৎসক মধু হঠাৎ মারা গেলে কর্মবীর জয়গোবিন্দ একেবারে বসে পড়েন। তারিণীপ্রসাদ এসে বললেন, আমি চাই মধু জীবিত হোক—ওর নামে বাগান খুলছি। তুমিই হবে তার কর্ণধার। পুত্রশোক ভোলার জন্য কোনও শাস্ত্রীয় বাণী নয়, দিলেন কর্মের বাণী। এই ছিল সে আমলের ওই গরিব কিন্তু অসম-সাহসী মানুষগুলির চরিত্র। এঁরা হার মানা শেখেননি।

এই সময় দলসিংপাড়া চা বাগানের এক ভূতপূর্ব কর্মচারী জহুরীবাবু ওই বাগানের কাছাকাছি জোতে গোপীমোহন চা-বাগান খুলেছিলেন।

১৯৩০ সন এসে গেল। International Tea Agreement-এ চায়ের আবাদ বাড়ানো যাবে না চুক্তি হলে চা-বাগান খোলার উদ্যোগ স্থগিত হয়। ইতিমধ্যে বিশ্বব্যাপী ভয়ঙ্কর মন্দা নেমে আসে। যোগেশচন্দ্র ভাগ্যকূলের জমিদারদের কাছে দেনাগ্রস্ত হন। এগিয়ে আসেন স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জী। বহু চা-বাগান তাঁর অর্থে ঘুরে দাঁড়ায়। স্যার রাজেনকে আনেন তারিণীপ্রসাদ রায়ের প্রিয়তম ভাগ্নে অন্নদাচরণ সেন মহাশয়। অন্নদাচরণ ছিলেন তারিণীপ্রসাদের স্ত্রীর অত্যন্ত প্রিয়জন। অন্নদাচরণ ছাড়া তিনি কিছু করতেন না, তারিণীপ্রসাদের দ্বিতীয় পুত্র এন. পি. রায়ের ভাবী স্ত্রীকে দেখতে যান অন্নদাচরণ। তাঁর কথাতেই ওই বিবাহ হয়। বস্তুত রায়বাড়ির বড় ছেলের সম্মান ছিল অন্নদাচরণের—তিনিই ছিলেন 'বড়দা'। অন্নদাচরণের পিতার কাছে মানুষ হন তারিণীপ্রসাদ। তাঁর নাম কৃষ্ণসুন্দর সেন। কোচবিহারে ওকালতি করতেন। তাঁর ফিটনে ঘোড়ার সংখ্যা রাজার থেকে বেশি থাকায় যে সমস্যা হয় তা মামলায় গড়ায় এবং রাজার বিচারপতিরা রাজার পক্ষে রায় দিলে স্বাধীনচেতা কৃষ্ণসুন্দর কোচবিহার ত্যাগ করে বেনারস চলে যান। তিনিই জলপাইগুড়ি পৌরসভাকে অর্থদান করে পানীয় জলের ব্যবস্থা করেন। কৃষ্ণসুন্দর জলপাইগুড়ি এলে তারিণী প্রসাদ তাঁকে আহার বাবদ যা দিতেন তার মূল্য ধরে সব অর্থ দিয়ে যেতেন। অন্নদাচরণ আমায় কথায় কথায় কখনও সখনও তাঁর তেজস্বী পিতার কথা, তাঁর শৃঙ্খলার কথা বলতেন।

রাত্রে আহারের পূর্বে ওই বাড়িতে ঘণ্টা বাজত—সবাই সময়ে এলেও অন্নদাচরণের বিলম্বে বসার অভ্যাস ছিল। কৃষ্ণসুন্দর তা দেখে কয়েকবার বলে একদিন খেতে দেওয়াই বন্ধ করে দেন। বৃদ্ধ বয়সে অন্নদাচরণ এসব বলতে গিয়ে হেসে ফেলতেন। এঁরই পুত্র সি.পি.আই(এম) দলের নেতা প্রাক্তন পৌরসভাপতি অসুদা বা অসিত সেন। মেজাজে তিনি পিতামহ কৃষ্ণসুন্দর বা পিতা অন্নদাচরণের সুযোগ্য পুত্র।

বহুকাল পরে রেড ব্যাঙ্কের মালিক ধীরেন্দ্রনাথ ভৌমিক সুরেন্দ্রনগর চা-বাগান করেন। পরে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য যে জমি পান তাতে করেন ধরণীপুর চা বাগান। বলা বাহুল্য উদ্বাস্তুরা কিন্তু ওই বাগানে স্থান পায়নি। কংগ্রেসী রাজত্বে ধীরেন্দ্রনাথ একজন দাপুটে মানুষ ছিলেন। তিনি খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের সহায়তায় প্রফুল্লচন্দ্র সেনের দাক্ষিণ্যে এটা পান। পরে কংগ্রেসী নেতারা এইসব বাগানে সদলবলে যেতেন। মায় আর্যনাট্য সমাজ নাটক নিয়েও



'বোস্টন টি পার্টি' (১৬ ডিসেম্বর, ১৭৬৭)

বদল হচ্ছে প্রতি বছর। তারিণীপ্রসাদের বিশাল বাগান মথুরা আজ বৃহৎ গোষ্ঠীর কাছে চলে গেছে। কাঠালগুড়ি তাঁর প্রথম চা-বাগান—যেখানে তিনি ডিরেক্টর হন সেটাও চলে গেছে।

জলপাইগুড়ির বাঙালিদের বাগান অর্থ পেত ট্রেনিং ব্যাঙ্ক থেকে। প্রায় প্রতিটি বাগানের দেনা ছিল। হঠাৎ এই ব্যাঙ্ক লাটে উঠল। ব্যাঙ্কের পরিচালকবর্গ জলপাইগুড়ি ছাড়েন। আমানতকারীদের জমা টাকায় নামমাত্র মূল্যে বাগানগুলি কিনে পুরো টাকা হিসেবে ব্যাঙ্কে দিয়ে ঋণ শোধ করে সব চা-বাগান। সাধারণ মানুষের টাকা তিস্তা-করলার জলে ভেসে গেল, বজরায় বা ভাউলিয়া-নৌকোয় পাড়ি দিলেন চা-করেরা। দুটি পাতা একটি কুঁড়ির ইতিহাসে এই ভয়ানক ষড়যন্ত্রের নায়কেরা পরবর্তীকালে চা-কর হিসেবে ইতিহাসে স্থান পেয়েছেন। ধনতন্ত্রের এই হল নিয়ম। একূল ভেঙে ওকূল গড়ে চলছে আজো। একে একে বাগান চলে যাচ্ছে। গোপালচন্দ্র তারিণীপ্রসাদ যোগেশচন্দ্রের সাজানো বাগান শুকিয়ে যাচ্ছে। বীরেন্দ্রচন্দ্র তা দেখে যাননি কিন্তু বুঝেছিলেন আসছে। চুপি চুপি আসছে।

যেত। প্রাতঃকালে ভ্রমণের পর নেতা-নেত্রীদের ক্ষুধার উদ্রেক হলে খেতে আসেন। আভা মাইতি ডিম খেতে চান। আর্যনাট্য সমাজের বেহালাবাদক ভোলবাবু অম্লান বদনে বলেন, মুরগি এখনও ডিম পাড়েনিকো। শুনে যুবক আমরা ভোলদাকে বললাম, বিপ্লব শুরু হয়ে গেল।

দীর্ঘকাল চা-বাগান খোলা বন্ধ থাকে। ১৯৭৪ সনের পর বাজার আবার তেজী হয়। এবার নেমে পড়েন গ্রামে গ্রামে চা খুলতে বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত ব্যবসায়ী থেকে সাধারণ মানুষ। গ্রামেগঞ্জে খালি চা-চা-চা। আবার ২০০০ সনে গভীর সঙ্কট দেখা দিয়েছে। চা-বাগানগুলির অবস্থা শতকরা ৮৫% একেবারে কাহিল—গ্রামের অবস্থাও তাই। এ সঙ্কট মনোপলি ক্রেতাদের এক গভীর চাল। ত্রিশ দশকের সঙ্কটে বহু পরিবার শেষ হয়ে যায়। পরের সঙ্কটগুলিতে বাগানগুলি হাতছাড়া হতে থাকে। ১৯৫০ সনের পর যে সঙ্কট আসে তাতে বহু স্টারলিং বাগান বিক্রি হয়। এরা মূলত 'কমন টি' তৈরি করে। সাধারণ মানের এই চায়ের দাম ছিল অত্যন্ত কম, ২০০০ সনে তা আবার নতুন করে দেখা দিয়েছে। ফলে হাত বদল হল কাঠালগুড়ি, মথুরা, কলাবাড়ি। পূর্বে ব্যাঙ্কের চাপে গিয়েছিল রামঝোড়া, কমলা, চাঁদমণি ইত্যাদি। একে একে নিভিছে দেউটি।

প্রবন্ধের নাম জেলা পরিষদ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। বস্তুত চা খালি দুটি পাতা, একটি কুঁড়ির হলে চা উৎপাদন শতকরা ৪০ ভাগ কমে যেত। চা আসে তিন পাতা থেকে চার পাতা থেকে। ফলে মানের দিক থেকে তা হয় নিম্নমুখী। তবে সাহিত্যিকরা দুটি পাতা একটি কুঁড়ি বলতেই পছন্দ করেন। চা-বাগান শুধু কাব্য নয়, বিজ্ঞানও বটে। বিজ্ঞানের অবহেলায় দেশীয় বাগানগুলি খাবি খাচ্ছে। হাত

এবার কৃতজ্ঞতা জানানো দরকার। বীরেন্দ্রচন্দ্র মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে "The Development of Tea Industry in the District of Jalpaiguri 1869-1968" কিতাব প্রকাশ করেন ১/৭/১৯৭০ তারিখে। আমার এই প্রবন্ধ সেই কিতাবের ফসলমাত্র। বীরেন্দ্রচন্দ্র এক যোগ্য চা-কর ছিলেন। তাঁর ছিল স্টেনোগ্রাফার। বহু চিঠি তিনি প্রতিদিন লিখতেন বিভিন্ন মানুষের কাছে। আমায় তিনি 'আপনি' বলতেন—কেন জানি না। আমি চায়ের আবিষ্কারক যে রবার্ট ব্রুস নয়, ট্রাইবাল নেতা বোস বিসা গাম তা লিখি এবং প্রবন্ধটি বীরেন্দ্রচন্দ্রকেও পাঠাই। তৎক্ষণাৎ তা পড়ে আমায় ইংরেজিতে এক পত্রে 'সাবাস' জানান। পরে আমার আত্মীয় বিভূতিভূষণ ঘোষকেও সে কথা বলে অভিনন্দন জানাতে বলেন। সত্যেন্দ্রপ্রসাদ (খেঁদাদা) ও বীরেন্দ্রচন্দ্র দুজন দুই ধরনের ছিলেন। ভাষণ লেখা বীরেন্দ্রচন্দ্রর, অন্যান্য কাজ খেঁদাদার। খেঁদাদা সহাস্যে ভাষণ লেখার বিষয় আসলেই বলতেন—ওসব বীরেন দেখবে। আমাকে বল কী করতে হবে?

মনে পড়ে ডানকান ব্রাদার্সে চাকরি পেলে ত্রৈলোক্যনাথ মৌলিক বলেন, ইংরেজদের গোলামি করবি, তবে আমরা বাগান খুললাম কেন? চাপরাশি খুলসিং দাস পেতেন মাইনে মাসে ৪২ টাকা, আমার ছিল দু টাকা কম। মাসে ৪০ টাকা।

মনে আসে কামিনীকান্ত রাহুত আর ফণীভূষণ গুহ মহাশয়দের কথা। এঁরা আমায় চা-বাগান বিষয়ে উৎসাহী করেন, কাজ বিষয়ে নির্দেশ দেন। ভবকিঙ্কর ব্যানার্জী মহাশয় বলতেন, আমি ৫ ফুট × ৫ ফুটে চা-গাছ লাগাবো। যুক্তি দিতেন নানা প্রকারের। রায়বাহাদুর বিপুলেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী প্রশ্ন করতেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কী করে উঠতে পারে? এই মানুষটি জেলার সব রাস্তা বিষয়ে ওয়াকিবহাল

ছিলেন, কোথায় কোন গাছ বিশাল তাও জানতেন। কল্লা নদী বাঙ্গালরা করলা, মাসকালীবাড়ি করলে মাসকলাই ভাল বলে দুঃখ করতেন রায় বাহাদুর। আবার সন্দেশ খাওয়াতেন। খাওয়াতেন অন্নদাচরণ, আবার খাবো, ভালবাসা ইত্যাদি ছাঁচের সন্দেশ।

১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে চার্লস ব্রুস এক রিপোর্ট পাঠান হর্টিকালচারাল সোসাইটির কাছে। তা শেষ করেন Should what I have written on this new and interesting subject be of any benefit to the Country and the community at large, and help a little to impel the tea forward to enrich our own dominions, and pull down the haughty pride of China, I shall feel myself richly repaid for all the perils and danger and fatigues, that I have undergone in the cause of British India Tea.

ব্রুসের আশা ব্যর্থ হয়নি। এর আগে East India Company-র নিযুক্ত Tea Committee রিপোর্ট দেয় ১/২/১৮৩৪ তারিখে।

We are perfectly confident that the Tea Plant (in Upper Asam) which has been brought to light, will be found capable under proper management, of being cultivated with complete success for economical purposes, and that consequently the object of our labours may before long be fully realized.

একই আদর্শে পেস্কার রহিম বক্স, গোপালচন্দ্র, তারিণীপ্রসাদ বিশ্বাসী ছিলেন। এঁরা গণ্ডগ্রাম জলপাইগুড়িকে করলেন চায়ের শহর। গ্রামগঞ্জে স্থান পেল চা, গ্রামের মানুষও কিনলেন চা কোম্পানির শেয়ার। তেমনি চাষীর জমি চায়ে চলে যাচ্ছে সেজন্য জগদিন্দ্রদেব রায়কত স্থির করেছিলেন শেয়ার নেবেন না এবং সব চা কোম্পানির শেয়ার বেচে দেন।

সে আমলের চা বাগানের বাঙালি হিন্দু-মুসলিম ম্যানেজাররাও কম যেতেন না। এক ম্যানেজার বলে দিলেন, But, if এসব শব্দ তিস্তার ওপারেই থাক। প্রমোটার চা-করদের পুত্রদের দেখে প্রবীণ ম্যানেজাররা বলতেন, বাঘের ব্যাটা বাগডামা।

আমার সৌভাগ্য হয়েছে তারিণীপ্রসাদ, নবাব সাহেব, মকলেচ্ছর রহমান, সুরেশ্বর সান্যাল, ত্রৈলোক্যনাথ মৌলিক সহ বহু প্রবীণ চা-করদের সঙ্গে প্রারম্ভিক কাজ করা বা কোনও কারণে দেখা করা। আজ তা পরম সৌভাগ্য বিবেচনা করি।

আমার এ প্রবন্ধ আমি নিবেদন করলাম ওইসব গরিব কিন্তু অসম সাহসী মানুষদের অম্লান স্মৃতির উদ্দেশে।

মনে ভাসে জনমত কাগজের সম্পাদক জ্যোতিশচন্দ্র সান্যালের তির্যক কবিতা।

নোয়াখালি করি খালি
আসি জলপাই
বিবির আঁচল ধরি
চিয়াপানি খাই

উত্তেজিত নবাব সাহেব সান্যালের কাছে এসে হাঁকলেন (প্রতিদিনই তিনি একবার আসতেন সেখানে), জ্যুতিশ এটা জনমত না জনমূত্র। সহাস্যে সম্পাদক প্রশ্ন করলেন, ছিটা লেগেছে নাকি?

নবাব সাহেবের রাগের কারণ তিনি পেস্কার রহিম বক্স সাহেবের কন্যাকে বিবাহ করে শহরে স্থায়ী হন। অবশ্য রাগ অনুরাগে পরিণত হতেও তেমন সময় নেয়নি।

মোগলকাটা, নিদাম ইত্যাদির লভ্যাংশ হত বিশাল। জনমত পত্রিকা সদুঃখে লিখল—না চা-বাবুদের জন্য মাছ কেনা যাবে না।

সেই চা-বাগান খুলতে গিয়ে সর্বহারা হন বহু মানুষ—যেমন ত্রিপুরাসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কদমতলার জমি-বাড়ি নিলাম হয় এবং সরকাররা তা কিনে নেন। এখানেই একটি অংশ কদমতলা দুর্গা পূজা কমিটি কিনেছে—সেখানেই বরাবর পুজো হয়ে আসছে।

যোগেশচন্দ্র কৃষ্ণভক্ত, কীর্তন গাইতেন, খোল বাজাতেন। তিনি ভাবলেন আমরা যদি চা পান করতে পারি ঠাকুর খাবেন না কেন। চালু করলেন বছরের প্রথম চা যাবে ঠাকুরের প্রসাদের জন্য। আজও যোগেশচন্দ্রর পৌত্ররা তা চালিয়ে আসছেন।

নবাব সাহেবের ছিল বৃক্ষ রোপণের উৎসাহ। সব বাগানে মেহগনি গাছ লাগান। সে গাছ অর্থ এনেছিল কিন্তু ততদিনে নবাব সাহেবের বাগান সব হাত বদল হয়ে যায়। মাত্র নকশালবাড়ি চা-বাগান আজও ওই পরিবারের হাতে রয়েছে।

নবাব-বাড়ির দালান-বাগান, পুকুর সব ছিল আকর্ষণীয়। বস্তুত মানুষটি বাঁচার মতো বেঁচেছিলেন। শেষ পর্যন্ত কলকাতায় দেহত্যাগ করেন।

চা তো খালি পাতা নয় এতে আছে শ্রমিকরা যাদের লাল রক্তে চায়ের রংও লাল। তাদের কথা বলবেন অন্যরা। তবু প্রশ্ন থাকবে চা তুমি কার?

গজলডোবার কিছু ইতিহাস

শ্রীযুক্তা রেবা রাহুতের লেখা "জলপাইগুড়ির রাহুত পরিবার' প্রবন্ধে গাজলডোবা বিষয়ে কিছু তথ্য চাই। পূর্বেই লিখেছি—গজল ডোবায় ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে এ জেলার প্রথম চা-বাগানের পত্তন হয়।

কৈলাসচন্দ্র রাহুত ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে ওদলাবাড়ি চা কোম্পানির কাছ থেকে গজলডোবা চা-বাগান কিনেছিলেন। বারবার তিস্তার বন্যায় বাগানটি ভাঙলে কৈলাসচন্দ্র বাগানটি দি ফ্রেন্ডস টি কোং লিমিটেড কোম্পানিকে কয়েকটি শর্তসাপেক্ষে বিক্রি করেন। ক্রয়মূল্য দিতে না পারায় মামলায় জিতে রাহুত বাড়ি ওই বাগান ফিরে পান।

আমরা যতদূর জানি পরে ওই পরিবারের কামিনীকান্ত রাহুত বাগানটির মালিকানা পান এবং তাঁরই নিজস্ব অবদানে সম্পূর্ণ বাগান গড়ে ওঠে। গজলডোবার নাম পরিবর্তিত হয়ে দাঁড়ায় কৈলাসপুর চা-বাগান।

কামিনীদা আমার জানা ও দেখা একজন চমৎকার ও দক্ষ চা-কর ছিলেন। কৈলাসপুর গড়ার সময় তিনি তাঁর সমস্ত অভিজ্ঞতা সেখানে প্রয়োগ করেন। যৌবনে তাঁর আহ্বানে ওই বাগান দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।

এই হারিয়ে যাওয়া ইতিহাসটি প্রবন্ধে যুক্ত করলাম।

লেখক ❑ বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ও লেখক।

পরিশিষ্ট

DATEWISE ISSUES OF TEA LEASES & RENEWALS THEREOF WITH NOTES ABOUT FIRST TRANSFERS

Extract from Lease-holders Register dated 1-5-1878—1-4-33

Sl. No.	Name of Proprietor	Name of Grant	Area ac.	Date of Lease	Transferred to
1.	Latchand Westfield Barantee	Fulbari	502.00	1-4-75	North Sylhet Tea Co.
2.	Dr. J. P. Brougham	Gazalduba	996.00	16-2-76	
3.	W. F. Westfield	Dalinkote 2nd	509.00	3-4-76	North Sylhet Tea Co.
4.	B. W. Money	Gandhabheel	795.00	26-5-76	Phul Tea Co.
5.	J. F. Fasting	Rangatee	504.00	1-10-76	Sylhet Tea Co.
6.	Kerr Tarrach & Co.	Bagrakote 2nd	320.00	5-10-76	
7.	H. Fisscher	—	493.00	21-10-76	Sylhet Tea Co.
8.	Mrs. Mackenzie	Bagrakote 3rd	59.00	8-1-77	
9.	R. Macdonald	Baintbaree Grant	676.00	Jan. 1877	
9.	(a) Mrs. Mackenzie	Bagrakote 4th	101.00	8-1-77	
10.	Col. Edward Money (Kalagatty)	—	500.00	20-1-77	Leesh River
11.	-do-	—	500.00	-do-	Phoolbari 5-7-79
12.	W. S. Creswell	Bamandanga	645.00	30-1-77	Dooars Tea Co. Ltd. 30-11-78
13.	J. Windram	Ellenbaree 1st Gr.	253.00	July, 1877	Ellenbaree Tea Co.
14.	Munshi Rahim Bux	Jaldhaka Grant	728.00	17-8-77	
15.	W. C. Hubert	Dam Dim Grant	799.00	20-9-77	Dr. Busteed Dam Dim T. E. 23-10-78
16.	E. G. Harrison	Washabaree 3rd Gr.	447.00	3-10-77	
17.	I. M. Luff	Dalinkote 1st	785.80	5-10-77	
18.	J. R. Clarke	Kumlai Grant	781.00	27-10-77	
19.	Johnston Smith	Sisubari 1st Gr.	800.00	26-1-78	
20.	C. Vanrenen	Sisubari 2nd Gr.	800.00	1-2-78	Good Hope Tea Co. Ltd.
21.	I. Johnston on behalf of Land Mortgage Bank	Kalabari Gr.	800.00	9-3-78	Amalgamated Tea Ltd. and then to Dr. Nilratan Sarkar and Sarojini Roy.
222.	J. S. Taylor	Ranicherra 1st Gr.	770.00	16-3-78	
23.	Aurthor Pallisor	Manabaree 1st Gr.	395.00	28-5-78	
24.	Chael Tea Asson.	Chael Grant	400.00	4-7-78	Mr. Shillingford
25.	C. H. Pillans	Money Hope Gr.	402.00	5-7-78	Leash River Tea Co. Ltd.
26.	C. H. Pillans	Patebaree Grant	401.00	5-7-78	Leash River Tea Co. Ltd.
27.	T. Carritt	Washabarree 2nd	507.00	3-9-78	Washabarree T. E.
28.	E. Morisson through J. B. Dubius	Balabaree 2nd	392.00	5-9-78	
29.	Mr. J. V. Burgh Father of Late R. J. Burgh	Burgh's Grant in Taluk Dam Dim	400.00	10-9-78	North Sylhet 7-8-89
30.	Babu Kalimohan Roy and Durga Bati Sen	Altadanga T. E.	310.00	19-9-78	Biharilal Ganguly
31.	C. J. Mackenjie	Bagrakote 3rd Gr.	279.00	17-10-78	Bagrakote Tea Co. Ltd.

Sl. No.	Name of Proprietor	Name of Grant	Area ac.	Date of Lease.	Transferred to
32.	R. D. Stewart	Rupnee Grant	355.00	1-3-79	
33.	G. Kennedy & A. B. Inglis & E.C. Inglis	Balabari 1st Gr.	396.00	14.3.79	
34.	Miss. M. F. Brougham	Soongachi 1st Gr.	655.00	29-7-79	
35.	Francis Edward Monford	Nagrakata Gr.	600.00	24-9-79	Dooars Tea Co. Ltd.
36.	J. Mackilickan	Bamandanga	800.00	18-10-79	-do-
37.	C. F. Pouder	Ellenbarree 2nd Gr.	193.00	5-11-79	Ellenbarree T. E.
38.	E. G. Harrison	Washabarree 1st	374.00	5-11-79	Washabaree Tea Co. Ltd.
39.	Kerr Terrach	Bagrakote 7th Gr.	566.00	10-11-79	Western Dooars Tea Co. Ltd.
40.	J. E. Churls	Manabaree Gr.	798.00	29-12-79	Dr. P. Brougham
41.	Capt. C. J. Thomas	Soongachi 2nd Gr.	553.00	29-12-79	
42.	Miss. T. H. Cave	Ranicherra 2nd Gr.	459.00	3-6-80	J. S. Taylor
43.	R. R. Sanders	Bamandanga Gr.	800.00	3-6-80	Dooars Tea Co. 20-12-78
44.	Niman Hyslop	Manabaree 2nd Gr.	50.00	8-9-80	Manabaree Tea Asson.
45.	C. F. Pouder	Ellenbarree 3rd Gr.	376.00	13-11-80	Washabaree Co. dt. 16-2-81 and Ellenbarree 9-6-85
46.	Neoranuddy Tea Co.	Upper Neora Grant	306.00	1-2-81	North Sylhet Co. 6-8-87
47.	Jalpaiguri Tea Co. Ltd.	Mogalkata	741.00	9-3-1881	
48.	W. K. Darby	Hahaipatha 1st Gr.	370.00	25-4-81	
49.	R. Haughton	Oodlabari 1st Gr.	11.00	1-6-81	
50.	Bytag[illegible]oc Tea Co. Ltd.	Bytagooc Gr.	763.00	7-7-81	North Sylhet 6-8-87
51.	Mrs. Hore and Mr. North	Bagrakote 8th Gr.	366.00	7-7-81	Bagrakote
52.	W. S. Cresswell	Khairkotta	27.00	8-8-1881	
53.	Oodlabari	Oodlabari 1st Gr.	327.00	31.12.81	Adele Bougham
54.	Neoranuddy Tea. Co. Ltd.	Neoranuddy 2nd Gr.	44.00	1881-82	North Sylhet 6.8.87
55.	Bibi Meherunnessa and Bibi Golabjan	Muinai Grant in Chengmari	777.82	1-8-82	J. Anderson 8-11-88 Caron Tea Co. 11-1-89
56.	B. H. Garew	Borrau's Grant in Dam Dim	799.00	30-12-82	North Sylhet 6-8-87
57.	J. F. Fastings	—	25.00	30-12-82	Relinquished
58.	R. R. Morton	Toonbaree 1st Gr.	180.65	4-10-83	
59.	C. H. Shillingford	Rani Grant in Taluk Chulsa	397.86	13-3-84	Nagaisurre Tea Co. Ltd. 10-12-88
60.	C. R. Shillingford	Ingo Grant	351.00	13.3.84	Ingo Tea Co. Ltd. 6-7-86
61.	G. W. Shillingford	Nagaisuree Grant	692.20	13-3-84	Nagaisuree Co. 10-12-88
62.	Ingo Tea Association	Ingo Grant in Taluk Chulsa	835.04	15-3-84	Chalouni Tea Co. 11-11-87
63.	R. H. Morton	Toonbarree 2nd Gr. in Rangamatee	310.91	15-3-84	
64.	W. R. Darby	Hahaipatha 2nd Gr.	122.50	24-3-84	
65.	W. Bisset	Jurantee 2nd Gr. in Chulsa	917.60	31-3-84	Jurantee Tea Asson. 16-1-85
66.	R. L. Upton	Youngtong 2nd Gr. in Chulsa	950.09	31-3-84	Chulsa Tea Co. 17-7-90
67.	H. A. Adkins	Youngtong 3rd Gr. in Chulsa	962.50	31-3-84	-do-

Sl. No.	Name of Proprietor	Name of Grant	Area ac.	Date of Lease.	Transferred to
68.	J. Thompson	Youngtong 1st Gr.	433.25	31-3-84	-do-
69.	A. Wilson	Murtee 1st Gr. in Chulsa	784.23	31-3-84	Metelli Tea Co. 1-5-86
70.	M/s. J. S. Taylor, H. H. Sutherland and A. B. Inglis	Ranicherra 3rd. Gr. in Dam Dim	61.60	31-3-84	
71.	Babu Chandra Kr. Das	Youngtong 4th Gr. in Chulsa	807.29	2-5-84	Chulsa Tea Co. 17-7-90
72.	Prasanna Kr. Das	Chalauni Gr. in Chulsa	747.50	14-5-84	Chaluni Co. 20-2-85
73.	Biharilal Ganguly, Mohim Ch. Chakravorty and Jagat Ch. Roy		758.34	19-5-84	Relinquished
74.	J. S. Dauglas	Aibheel 4th Gr. in Chulsa	554.13	26-5-84	Sir Benjamin Simpson, M. D. K. C. S. E. and G. S. Paterson, Sept. 1890
75.	Majar C. H. Thomas	Aibheel 2nd Gr. in Chulsa	229.80	26-5-84	Dr. J. P. Baugham 27-8-89
76.	Miss. M. J. Braugham	Aibheel 3rd Gr. in Chulsa	156.10	26-5-84	Sir Benjamin etc. Sept. 1890
77.	R. Haughton	Aibheel 1st Gr. in Chulsa	891.30	26-5-84	-do-
78.	Kilcott Tea Asson.	Kilcott 2nd Gr. Chulsa	469.20	4-6-84	Kilcott Co. 30-8-89
79.	-do-	Kilcott 1st Gr. in Chulsa	498.45	4-6-84	-do-
80.	Kilcott Tea Asson.	Kilcott 3rd Gr.	685.32	4-6-84	-do-
81.	Nedeem Tea Co. Ltd.	Nedeem Grant in Rungamattee	194.93	23-6-84	
82.	J. J. Kiswick	Murtee 1st Gr. in Chulsa	1127.34	28-6-84	Metalli Tea Co. 1-5-86
83.	J. Kiswick	Metelli Gr. in Chulsa	636.20	28-6-84	Metelli Tea Co. 26-1-85
84.	E. C. L. Shillingford for Chulsa Asson.	Chulsa 1st Gr.	673.68	28-6-84	Chulsa Tea Co. 26-9-88
85.	Jurantee Tea Asson.	Jurantee 1st Gr.	633.27	28-6-84	Jurantee Tea Co. 26-9-88
86.	Mr. W. C. Aldam	Sundree in Rungamattee	821.65	28-6-84	North Sylhet Co. 18-3-85
87.	Nedeem Tea Co. Ltd.	Alston Grant in Rungamattee	772.84	28-6-84	
88.	-do-	Bank's Grant in Rungamattee	316.65	2-7-84	
89.	-do-	Sylee Grant in Rungamatee	528.29	2-7-83	
90.	Meenglass Tea Asson.	Meenglass 1st Gr. in Rungamatee	635.96	22-7-84	
91.	-do-	Meenglass 2nd in Rungamattee	650.98	22-7-84	
92.	-do-	-do- 3rd in -do-	643.87	22-7-84	
93.	A. A. Wallick	Chengli in Chulsa	260.10	22-7-84	
94.	Ganga and Jamuna Sanyasini, Widow of Kharamunda Sanyasi	Bhuttabaree in Dam Dim	183.90	6-9-84	Baladeo Das and Deokaran Das Mahesree on 16-9-85
95.	Mrs. T. J. Hore and Mr. W. M. North	Bagrakote 9th in Phulbari	162.13	13-10-84	Bargrakote Tea Co. 26-1-85

Sl. No.	Name of Proprietor	Name of Grant	Area ac.	Date of Lease.	Transferred to
96.	Rungamattee Tea Co. Ltd.	Ranikhola 2nd in Rungamattee	571.83	13-10-84	North Sylhet 18-3-85
97.	Chulsa Tea Asson.	Chulsa 2nd in Chulsa	755.29	13-10-84	Chulsa Tea Co. 26-9-88
98.	Mr. Marx Mengene	Satkhaya 1st in Chulsa	441.77	13-10-84	Satkhaya Tea Asson. 25-4-85
99.	Satkhaya Tea Asson.	Satkhaya 2nd in Chulsa	564.68	13-10-84	
100.	Western Dooars Tea Co. Ltd.	Satkhaya 3rd in Chulsa	616.69	13-10-84	Satkhaya Tea Asson. 25-4-85
101.	Baitguri Tea Ltd.	Baitguri 1st in Dam Dim	733.18	27-1-85	
102.	Zuranty Tea Asson.	Zuranty 3rd in Chulsa	272.35	18-3-85	Zuranty Tea Co. 26-9-88
103.	M/s. Muir and R. Williamson	Dalinkot 3rd in Dam Dim	480.78	18-3-85	North Sylhet Co. 6-8-87
104.	W. S. Creswell	Rangakotte in Rangamattee	626.41	18-3-85	North Sylhet Co. 25-9-87
105.	R. H. Carew	Chengmari in Chulsa	874.16	23-3-85	Dooars Tea Co. 12-7-88
106.	D. K. Carew	Kurti in Chulsa	653.00	23-3-85	-do-
107.	W. R. H. Carew	Mahabarie in Chulsa	756.35	23-3-85	Resumed
108.	Phul Tea Asson.	Phulbari 2nd in Phulbari	247.39	24-3-85	Phulbari Tea Co. 17-3-91
109.	North Sylhet Tea Co. Ltd.	Rikhola in Rungamattee	661.69	31-3-85	
110.	Dr. J. C. Nicholson	Nakhati 1st Taluk Bataigool	461.61	25-4-85	North Sylhet Co. 25-9-85
111.	-do-	Nakhati 2nd in -do-	360.46	25-4-85	-do-
112.	F. R. Hulbert	Baitguri 2nd in Dam Dim	786.22	25-4-85	Baitguri Tea Co. 1-10-85
113.	J. L. Sillingford	Deopani in Chulsa	573.98	5-5-85	Nagaisuree 10-12-88
114.	J. Binning	Kurtee in Chulsa	780.85	5-5-85	-do-
115.	Dr. J. A. Macllanghtin	Indong in Chulsa	585.00	3-6-85	Dooars Tea Co. 12-7-88
116.	D. Clarke	Chupaguri 2nd in Nagrakata	801.26	16-10-85	Nedeem Tea Co. 16-8-92
117.	North Sylhet Tea Co.	Springfield Gr. in Rungamattee	700.99	6-3-86	
118.	V. L. Reez	Sukanbaree in Nagrakata	776.45	6-3-86	Dooars Tea Co. 27-8-98
119.	Bagrakote	Bagrakote 1st Gr.	441.93	13-3-86	
120.	W. M. North	Tamaijhora Gr.	1094.69	13-3-86	Baitguri Tea Co. 29-12-88
121.	R. D. Macgregor	Hope	660.61	23-3-86	Hope Tea Co. Ltd. 15-7-86
122.	The Dooars Tea Co. Ltd.	Tondoo 2nd	9.51	23-3-86	
123.	Dooars Tea Co. Ltd.	Tondoo 3rd	68.92	23-3-86	
124.	J. King	Jitee 3rd in Nagrakata	700.00	10-4-86	Hope Tea Co. Ltd. 31-12-88
125.	Miss. A. Johnston	Jitee 4th in Nagrakata	303.29	10-4-86	R. D. Macgregor 31-12-87
126.	Bibi Rahimannessa	Malnuddy in Rungamattee	328.79	10-5-86	

Sl. No.	Name of Proprietor	Name of Grant	Area ac.	Date of Lease.	Transferred to
127.	—	Rungatee Grant in Nagrakata	785.03	19-5-86	Chapaguri Tea Co. 13-7-87 (Nedeem-16-8-92)
128.	Gurgungjhora Tea Co.	Gurgunj in Rungamattee	799.34	21-5-86	
129.	S. Hutching	Rungatee in Doodoomari	204.36	26-5-86	Dr. Nilratan Sarkar and Sarojini Roy 17-1-99
130.	North Bengal Tea Corpn. Ltd.	Needam in Rungamati	738.00	14-6-86	
131.	H. Hohston (Jr.)	Jitee 1st Gr. in Nagrakata	843.20	19-6-86	Walter Duncan and William Duncan (Hope Tea Co. 31-12-87)
132.	J. Johnston (Sr.)	Jitee 2nd in Nagrakata	851.79	19-6-86	Walter Duncan and William Duncan
133.	Dooars Tea Co. Ltd.	Nagrakata	2457.43	28-6-86	
134.	-do-	Gatia 1st	916.62	1-7-86	
135.	-do-	Gatia 2nd	739.05	1-7-86	
136.	-do-	Gatia 3rd	537.45	1-7-86	
137.	-do-	Gatia 4th	853.18	1-7-86	
138.	R. L. Alston and J. Steel	Bhogatpur 1st	919.78	23-7-86	R. L. Alson 3-9-92 (Dooars Tea. Co. 20-6-93)
139.	M/s. R. L. Alston and J. Steel	Bhogatpur 2nd Gr. in Nagrakata	862.72	23-7-86	-do-
140.	-do-	-do- 4th	851.16	23-7-86	-do-
141.	John Steel	Looksan 1st	775.57	23-7-86	John Steel and H. Steel, H. J. Watson and T. H. Watson 31-1-90
142.	A. Backimham	Chapaguri 1st in Nagrakata	905.08	26-7-86	Chapaguri Tea Co. 13-7-87 (Nedeem 16-8-93)
143.	G. G. Mackay	Forest Hill in Nagrakata	953.80	26-7-86	Chapaguri Co. 13-7-87 (Nedeem 16-8-92)
144.	F. H. Day	Looksan 2nd in Nagrakata	804.82	9-11-86	M/s. J. Steel and Ors 31-1-90
145.	J. S. T. Cruden	Looksan 3rd in Nagrakata	811.45	9-11-86	J. Steel 17-7-89
146.	W. L. Alston	Bhagatpur 3rd in Nagrakata	735.97	9-11-86	R. L. Alston and J. Steel 27-9-88 (Dooars Tea Co. 26-6-93)
147.	Benode Behari Dutta	Bhagatpur 5th in Nagrakata	601.72	9-11-86	R. L. Alston and J. Steel 29-12-88 (Dooars Tea Co. 20-6-93)
148.	Tondoo Tea Co. Ltd.	Tondoo 1st Gr.	677.00	31-3-87	Dooars Tea Co. Ltd. 23-3-86
149.	W. K. Darby	Hahaipatha 2nd in Rungapani	356.29	22-8-87	
150.	North Sylhet Tea Co.	Nakhati 3rd	51.00	1-9-87	
151.	—	Glencoe	1076.71	7-9-87	New Glencee Tea 6-11-88

Sl. No.	Name of Proprietor	Name of Grant	Area ac.	Date of Lease.	Transferred to
152.	Hewitt of Kurseong	Patharjhora 3rd in Rangamattee	847.36	31-12-87	Patharjhora T. A.
153.	South by & E. Hewitt	Patharjhora 1st in Rangamattee	651.16	13-12-87	-do-
154.	G. A. Kunbone	Patharjhora 2nd	542.06	31-12-87	Patharjhora T. A.
155.	Munshi Rahim Baksh	Kujih Grant in Chengmari	468.47	16-4-88	R. D. Macgregor 8-1-88 (Caron Tea Co. 11-1-89)
156.	J. S. Muller	Tallyho in Chapaguri	863.87	26-4-88	Huldibari Tea Asson. 17-7-89
157.	J. G. Palmer	Bhagatpur 6th in Nagrakata	173.17	25-5-88	R. L. Alston and J. Steel 29-12-88 (Dooars Tea Co. Ltd. 20-6-93)
158.	R. L. Alston and Octavious Steel & Co.	Chengmari	4675.48	4-5-89	Chengmari Tea Co. 20-8-94
159.	Thomas Handerson	Jitee in Nagrakata	905.42	8-5-88	
160.	Huldabari Tea Asson.	Hulubulu in Chapaguri	911.76	2-8-89	
161.	-do-	Huldibari	1001.40	2-8-89	
162	Meenglass T. A.	Jungi in Rungamattee	58.36	20-8-89	
163.	H. J. Coming	.........in Chulsa	726.74	13-9-89	Struck off the Register
164.	J. F. Verner	Grassmore in Nagrakata	803.33	13-9-89	Dooars Tea Co. 2-4-92
165.	J. H. Delord				Relinquishes
166.	North Sylhet Tea Co.				Entered through mistake
167.	Bagrakote Tea Co.	Saugaon in Phulbari	1168.02	17-9-89	
168.	Henry N. Gladstone	Telipara in Banarhat	2173.67	15-3-90	Single Tea Co. 18-6-96
169.	Jalpaiguri Tea Co.	Naldongpara	819.67	15-3-90	
170.	Northern Bengal Tea Corpon.	Lingrone in Rungamattee	81.96	13-3-90	
171.	A Tocher	Angersakha	758.97	13-5-90	Gairkata 15-10-90
172.	J. Martin	Hindupara in Banarhat	718.06	23-5-90	-do-
173.	H. C. Tinkerton	Telipara 2nd in Banarhat	734.23	13-6-90	Singlo Tea Co. 18-6-96
174.	Anjuman Tea Co.	Mujnai in Khayerkotta	1767.54	28-8-90	
175.	-do-	Makrapara in Ghorabanda	2261.85	3-2-91	
176.	R. L. Alston and Octavius Steel & Co.	Chengmari Blocks 4 & 5	1400.21	30-3-91	Chengmari Tea Co. 20-8-93
177.	Schoine Kilburn & Co.	Huntupara in Khayrekotta	5038.86	11-9-91	Huntupara Tea Co. 9-6-97
178.	Munshi Rahim Baksh	Jaldhaka 2nd in Jhaltagram	115.20	14-9-91	
179.	Krishna Tea Co.	Bundapani in Churabhandar	6461.85	30-3-92	Single Tea Co. 18-6-96
180.	M/s. J. S. Hiskson P. A. Simpson	Lankapara in Lakshipur	654.06	31-3-92	Lankapara Tea Co. 1896.97
181.	Dooars Tea Co. Ltd.	Bhagatpur 7th in Nagrakata	1406.60	31-3-92	
182.	Chamurchi Tea Co. Ltd.	Chamurchi 1st to 3rd	2187.10	1-4-92	
183.	Nadia Tea Co. Ltd.	Totopara in Chapaguri	854.06	14-4-92	

Sl. No.	Name of Proprietor	Name of Grant	Area ac.	Date of Lease.	Transferred to
184.	Gairkata Tea Co. Ltd.	Gairkata 1st & 2nd in Sakoajhora	1403.60	29-4-92	
185.	Land Mortgage Bank of India Ltd.	Rungatee Taluk in Dudomari	230.13	9-5-92	The Amalgamated Tea Estate-1897-98 Dr. Nilratan Sarkar and Sarojini Roy 9-1-99
186.	-do-	Rungatee 2nd Taluk	136.58	9-5-92	-do-
187.	R. A. Shillingford	Chunabhati 1st	925.96	22-1-94	
188.	Altaganga Tea Co. Ltd.	Altadanga 2nd	190.30	29-1-94	
189.	S. J. Shillingford	Hartalguri 2nd	783.20	31-1-94	
190.	G. Temple	Hartalguri IV	787.10	31-1-94	
191.	J. D. Nimmo	New Lands 2	798.24	22-9-94	Assam Dooars Tea Co. Ltd. 18-6-96
192.	R. D. Macgregor	New Lands 1	808.62	22-9-94	-do-
193.	A. Tocher	New Lands III	795.11	-do-	-do-
194.	John Wilson	Doodoomari 3rd and Galupara	694.10	2-10-94	-do-
195.	Thomas Mcmorran	—	749.63	-do-	-do-
196.	Mr. Hugh Grant	Gandrapara 1st	999.18	-do-	-do-
197.	North Sylhet Tea Co.	Nakhati 2nd	195.40	23-3-95	Consolidated 18-9-97
198.	British Dooars Tea Co.	Chuapara No. 1	2112.89	1-4-94	Imperial Tea Co. 14-6-98
199.	-do-	Chuapara No. 3	2035.45	1-4-95	-do-
200.	-do-	Chuapara No. 4	2927.91	11-4-95	-do-
201.	Central Dooars Tea Co.	Rungamattee	2796.63	11-4-95	-do-
202.	British Dooars Tea Co.	Chuapara No. 1	1991.92	11-4-95	-do-
203.	Jaigaon Tea Co. Ltd.	Torsa T. E.	3251.56	19-4-95	Nedeem Tea Co. Ltd. 27.8.98
204.	F. A. Shillingford	Kathalguri 2nd	769.89	27-5-95	
205.	M. H. Shillingford	Hartalguri 3rd	802.13	27-5-95	New Dooars Tea Co. 24-8-98
206.	—	Telipara 1st	772.86	17-6-95	Singlo Tea Co.
207.	S. J. Shillingford	Chapaguri 2nd	623.93	17-9-95	Banarhat Tea Co. 27-8-98
208.	W. C. Aldam	Chapaguri 1st	739.13	17-9-95	Banarhat Tea Co. 27-8-98
209.	W. T. Carter	Chapguri 3rd	919.04	17-9-95	-do- 27-8-98
210.	Miss A. C. Shillingford	Banarhat	645.46	17-9-95	-do- -do-
211.	A. W. Guise	Karbala 1st	805.28	24-10-95	-do- -do-
212.	A. W. C. Chaplin	Karbala 2nd	914.26	28-12-95	-do- -do-
213.	Munshi Zamurddin	Jointee Block No. 17	400.60	31-12-95	Bibi Meherunnessa 1896—97
214.	Munshi Rahim Baksh	Jayantee Block No. 16	1487.00	31-12-95	
215.	Kanthalguri Tea Co. Ltd.	Chunabhati 2nd Reti 1st Kathalguri 1st	2303.73	31-12-95	
216.	G. W. Williams	Huldibari Jhar 1st	828.16	27-3-96	Assam Dooars Tea Co. Ltd. 1896—97
217.	W. Duncan	Huldibari Jhar 2nd	816.79	31-3-96	-do-
218.	A. W. Morgan	Huldibari Jhar 3rd	860.69	31-3-96	-do-
219.	T. Henderson	Huldibari Jhar 4th	809.69	31-3-96	-do-
220.	Harilal Gupta, Munshi Mohammad Ali	Chunia Jhora	697.48	9-4-96	Chunia Jhora Tea Co. Ltd. 1896—97

Sl. No.	Name of Proprietor	Name of Grant	Area ac.	Date of Lease.	Transferred to
221.	C. L. Johnston	Barodighi	792.42	21-5-96	
222.	W. L. Bell Irving	Tilabari	458.30	21-5-96	
223.	F. G. Steward	Durlah	312.20	21-5-96	
224.	J. G. Thomson	Guabari	222.28	21-5-96	
225.	Jayantee Tea Co. Ltd.	Jayanti Block No. 9	1508.90	21-5-96	Imperial Tea Co. Ltd. 24-2-98
226.	Jayanti Tea Co. Ltd.	Jayanti Block No. 13	1486.20	21-5-96	-do-
227.	Mrs. C. R. Temple	Palashbari 2nd	770.44	1-6-96	
228.	T. G. Mackay	Jayanti Block No. 14	1529.05	10-7-96	
229.	Duncan Bros. & Co.	Jayantee Block No. 12	1605.21	28-7-96	Phaskowa Tea Co. 1896—97
230.	Hasimara Tea Co. Ltd.	Mr. I. W. Barkar's Grant	788.10	11-8-96	
231.	Hasimara Tea Co. Ltd.	Mr. C. D. Mathew's Grant	812.00	11-8-96	
232.	Hasimara Tea Co. Ltd.	T. A. E. Lamb's block	833.00	11-8-96	
233.	-do-	H. G. L. Panchand's Grant	731.10	11-8-96	
234.	Hasimara Tea Co. Ltd.	Mr. R. R. Waller's Grant	821.60	11-8-96	
235.	-do-	Mr. W. J. Lloyds Grant	457.40	11-8-96	
236.	Hasimara Tea Co.	Mr. C. C. Gulliland's Grant	485.20	11-8-96	
237.	Buxa Duars Tea Co. Ltd.	Kalchini	1888.90	16-9-96	
238.	Munshi Ahmed Ali & Harilal Gupta	Jayantee Block 18	287.58	9-19-96	Chuniajhora Tea Co. 1896—97
239.	Rash Mohan Chanda & Munshi Makram Ali	Janti Block 19	808.90	9-10-96	-do-
240.	G. G. Cumming	Birpiti 1st	466.70	12-11-96	Birpara Tea Co. Ltd.
241.	R. Davidson	Birpiti 2nd in Taluk Ghorabanda	803.00	12-11-96	-do-
242.	H. Grant	Birpiti 3rd in Taluk Ghorabanda	672.50	12-11-96	-do- 1897-98
243.	J. Wilson	Gopaljhora 1st in Taluk Ghorabanda	772.93	12-11-96	-do-
244.	W. Finlay	Gopaljhora 2nd in Taluk Ghorabanda	742.00	12-11-96	-do-
245.	R. S. Speers	Ghorabanda in Taluk Ghorabanda	595.90	12-11-96	-do-
246.	J. Murray	Singatihora in Taluk Ghorabanda	843.80	12-11-96	-do-
247.	C. B. Critchton	Gbranda 2nd in Taluk Dumchi Chapaguri	861.00	12-11-96	Relinquished
248.	J. Bimming	Nipania in Taluk Dumchi Chapaguri	843.00	12-11-96	-do-
249.	W. H. Miles	Matkijhora 1st	669.90	30-1-97	
250.	D. S. Macintosh	Matkijhora 2nd Santipara 1st	996.10	30-1-97	
251.	Duncan Bros. & Co.	Dalgaon No. 3	1454.00	18-1-97	Birpara Tea Co. 10-10-98
252.	Anjuman Tea Co. Ltd.	Makrapara 2nd	95.70	18-1-97	
253.	W. A. Wheeler	Lakhipara 2nd	761.10	30-1-97	

Sl. No.	Name of Proprietor	Name of Grant	Area ac.	Date of Lease.	Transferred to
254.	E. A. Woodhouse	Palashbari 1st	820.30	30-1-97	
255.	J. J. Mackay	Riti 2nd	735.40	30-1-97	
256.	W. E. Hitch	Syamjhora	606.80	2-2-97	
257.	R. Murray	Surti 1st	911.20	2-2-97	Relinguished
258.	J. J. Sinclair	Surti 2nd	994.30	2-2-97	-do-
259.	G. A. Stewart	Surti 3rd	937.90	2-2-97	-do-
260.	G. C. Hodgson	Ramjhora	820.60	2-2-97	-do-
261.	G. W. Lees	Bitri	608.40	2-2-97	-do-
262.	Buxa Duars Tea Co.	Kalchini 2nd	2158.10	2-2-97	
263.	-do-	Kalchini 3rd	1214.70	2-2-97	
264.	-do-	Kalchini 4th	488.60	2-2-97	
265.	J. K. Clarke	Jayntee Block No. 11	811.20	3-2-97	Relinquished
266.	J. Mackillican	Nangdalapara 1st and 2nd	1422.97	30-1-97	
267.	F. T. Verner	Dalgaon No. 1	1505.50	31-8-97	Imperial Tea Co. Ltd. 24-2-98
268.	T. A. Simpson	Block No. 49 & 50 Sahijhora and Bagjhora	1442.86	28-9-97	Relinquished 9'
269.	J. M. Simpson	Block No. 39 & 47 Malangijhora and Khagrabari 2nd	1476.50	28-9-97	Relinquished 9-4-1901
270.	J. S. Hawkins	Naktijhora 1st	502.60	28-9-97	-do-
271.	J. R. Ferries	—	517.85	17-11-97	Assam Dooars Tea Co. Ltd. 1899-1900
272.	Baintbari Tea Co. Ltd.	Dalgaon	1498.90	6/17-11-97	Nedeem Tea Co. 4-7-99
273.	R. A. Simpson	Malangijhora 2nd	762.10	28-11-97	Relinquished 9-4-61
274.	S. N. Smilee	Dalmani	716.99	7-12-97	Nedeem Tea Co.
275.	F. G. Clark	Dalsinghpara	753.00	15-12-97	
276.	F. H. Day	Dalsinghpara 2nd	786.90	15-12-97	
277.	G. Henderson	Dalsinghpara 3rd	782.05	-do-	
278.	J. S. Fraser	Dalsinghpara 4th	791.40	-do-	
279.	A. H. Abrott	Dalsinghpara 5th	795.17	-do-	
280.	Bhutan Dooars Tea Co. Ltd.	Bhutan Duars 1st	1007.00	-do-	
281.	Bhutan Duars Tea Co. Ltd.	Bhutan Duars 2nd	1022.00	-do-	
282.	-do-	-do- 3rd	992.40	-do-	
283.	-do-	-do- 4th	1400.15	-do-	
284.	-do-	-do- 5th	1002.90	-do-	
285.	G. F. Playpaer	Raidak Syndicate	1182.95	15-12-97	
286.	R. L. Traller	Raidak T. E.	1209.20	28-12-97	
287.	Chunabhatty	Hartalguri 1st	757.30	29-12-97	Relinquished
288.	-do-	Kathalbari 1st	823.11	-do-	-do-
289.	J. Mackilican	Binnaguri 2nd	1816.90	11-3-98	
290.	C. E. Vialls	Debpara	761.96	31-3-98	
291.	A. R. Mackintosh	Santipara 2nd and Nakujhora 2nd	1316.90	29-4-98	
292.	D. S. Mackintosh	Binnaguri 1st	3576.20	-do-	
293.	Lankapara Tea Co. Ltd.	Lankapara 2nd	2019.80	21-5-98	
294.	Moulavi Musaraff Hossain	Atiabari 1st	800.10	2-6-98	
295.	Bibi Nurjan	Atiabari 2nd	791.40	2-6-98	
296.	Srinath Roy	Atiabaria 3rd	212.25	2-6-98	
297.	Phaskowa Tea Co. Ltd.	Kalikola	801.90	17.10.98	

Sl. No.	Name of Proprietor	Name of Grant	Area ac.	Date of Lease.	Transferred to
298.	Laljadinessa Bibi	Zemirabad	698.60	6-12-98	Relinquished
299.	C. A. Mackay	Lakhipara 1st	758.50	30-1-99	
300.	Shillingford	Galupara 1st	846.35	30-1-99	
301.	Norman Augustin McLeod	Mr. N. A. Mcleod's Gr.	1468.25	4-9-99	
302.	C. C. Mcleod	Mr. C. C. McLeod's Gr.	1486.00	-do-	
303.	Normal McLeod	Mr. M. Mcleod's Gr.	1484.50	-do-	
304.	J. Schmidt	Mr. J. Schmidt's Gr.	1498.10	4-9-99	
305.	Assam Dooars Tea Co. Ltd.	Parnell's block	47.30	30-9-99	
306.	Consolidated Tea & Lands Co. Ltd.	Sundri 2nd	46.80	31-1-1900	Struck off
307.	Assam Duars Tea Co. Ltd.	Gandapara	3236.12	1-4-1900	
308.	Singlo Tea Co. Ltd.	Telipara I	747.96	1-4-1900	
309.	Imperial Tea Co. Ltd.	Chuapara (Amalg.)	8124.10	-do-	
310.	-do-	Rungamati T. E.	3686.38	-do-	
311.	Sarnamayee Gupta	Dalsingpara 6th	167.30	28-4-1900	
312.	-do-	-do- 7th	793.00	-do-	
313.	Gopal Ch. Ghose	Rangati 2nd	139.53	31-5-1900	
314.	Consolidated Tea & Lands Co. Ltd.	Neora Nuddy I	501.59	1-4-1901	
315.	-do-	Kranti	558.11	-do-	
316.	-do-	Rangti	519.26	-do-	
317.	Katalguri Tea Co. Ltd.	Katalguri	2166.81	-do-	
318.	Chuniajhora Tea Co. Ltd.	Chuniajhora	983.52	-do-	
319.	Sarugaon T. E.	Sarugaon	1834.16	-do-	
320.	Dooars Tea Co. Ltd.	Nagrakata 2nd	105.00	8-2-1902	
321.	Northern Duars Tea Co. Ltd.	Dim Dima	4385.35	1-4-1902	
322.	Nedeem Tea Co. Ltd.	Bainthari	625.72	-do-	
323.	C. L. Johnston	Baradighi T. E.	811.65	-do-	
324.	Empire of India & Ceylon Tea Co. Ltd.	Sisubari I	766.55	-do-	
325.	Hasimara Tea Co. Ltd.	Hasimara	4968.44	-do-	
326.	Phaskawa Tea Co. Ltd.	Phaskawa (Amalgamated)	2418.83	-do-	
327.	Fulbari Tea Co. Ltd.	Gandabheel	770.46		
328.	J. G. Thomson	Gubari	22.82	-do-	
328(a).	Chuniajhora Tea Co. Ltd.	Chuniajhora 3	820.80	-do-	
329.	Buxa Duars Tea Co. Ltd.	Kalchini	5808.22	1-4-1902	
330.	Imperial Tea Co. Ltd.	Jayanti Hatipotha Dhoala Grant	3008.57	-do-	
331.	F. G. Stwert	Dhoala Grant	311.78	-do-	
332.	Consolidated Tea & Lands Co. Ltd.	Sundri 2nd	29.25	27-2-1903	
333.	Needeem Tea Co. Ltd.	Dalgaon	1500.95	1-4-1903	
334.	Ellenbarrie Tea Co. Ltd.	Ellenbarrie	257.90	-do-	
335.	Empire of India & Ceylon Tea Co. Ltd.	Tashati	1477.77	-do-	
336.	Needeem Tea Co. Ltd.	Dalmoni	716.52	-do-	
337.	Raidak Tea Synd. Ltd.	Bhutan Duars 4	1380.10	1-4-1903	
338.	-do-	Bhutan Duars 3	1024.20	-do-	Amalgamated with No. 367
339.	-do-	Raidak Syndicate	1179.66	-do-	-do-
340.	-do-	Raidak	1207.51	-do-	-do-

Sl. No.	Name of Proprietor	Name of Grant	Area ac.	Date of Lease.	Transferred to
341.	Munshi Rahim Buksh	Jaldhaka I	728.95	-do-	
342.	Bibi Faizunnessa Khatun Bibi Rahimanessa Khatun	Altadanga	309.33	-do-	
343.	Needeem Tea Co. Ltd.	Dalsingpara	4866.04	-do-	
344.	Dr. Nilratan Sircar & Sorojini Roy	Kalabari	804.74	-do-	
345.	W. O. Bell Irwin	Tillabari	458.53	-do-	
346.	M/s. G. H. Southerland & Joana Taylor Flower	Chael	388.30	-do-	
347.	-do-	Ranicherra I	772.80	-do-	
348.	Bhatkhawa Tea Co. Ltd.	Bhatkhawa	2946.17	-do-	
349.	Consolidated Tea & Lands Co. Ltd.	Kumlai	781.45	-do-	
350.	G. E. William	Bhatkawa 1st	1489.10	28-11-1903	
351.	H. S. Ashton	Bhatkawa 2nd	1468.25	-do-	
352.	Assam Duars Tea Co. Ltd.	Emerabad	681.63	25-3-1904	
353.	Imperial Tea Co. Ltd.	Washabari 2	357.70	1-4-04	
354.	Leash River Tea Co. Ltd.	Patibari	398.16	-do-	
355.	-do-	Moneyhope	391.12	-do	
356.	G. Kennedy, T. C. Ingles, David Click Shank, Jessee Annee Ingles & Robert William Ingles	Balabari I	383.52	-do-	
357.	-do-	Balabari 2	417.46	-do-	
358.	-do-	Rupai	336.43	-do-	
359.	Consolidated Tea & Lands Co. Ltd.	Dalimkote 1	717.90	-do-	
360.	Atiabari Tea Co. Ltd.	Atiabari	1823.83	-do-	
361.	Empire of India & Ceylon Tea Co. Ltd.	Sisubari 2	794.09	-do-	
362.	Manabari Tea Co. Ltd.	Manabari 3	769.20	1-4-05	
363.	Consolidated Tea & Lands Co. Ltd.	Sungachi	1515.08	1-4-05	
364.	Ellenbarrie Tea Co. Ltd.	Ellenbarrie 2	186.76	1-4-05	
365.	Imperial Tea Co. Ltd.	Washabari 1	446.13	-do-	
366.	Bagrakote Tea Co. Ltd.	Bagrakote 5	549.65	-do-	
367.	Rydak Tea Syndicate Ltd.	Amalgamated renewed lease of Rydak Tea Syndicate	6867.20	-do-	
368.	Hantupara Tea Co. Ltd.	Bitri	597.95	25-9-05	
369.	Jalpaiguri Tea Co. Ltd.	Mogalkata	768.48	1-4-06	
370.	Ellenbarrie Tea Co. Ltd.	Ellenbarrie	2392.52	-do-	
371.	Gopal Ch. Ghose	Rungati 2	140.33	-do-	
372.	Duars Tea Co. Ltd.	Nagrakata 2	117.60	-do-	
373.	Consolidated Tea & Lands Co. Ltd.	Bataigole	768.06	-do-	
374.	-do-	Upper Neora 2	407.74	-do-	
375.	Assam Duars Tea Co. Ltd.	Amalgamated renewed Lease of Haldibarijhor 1	3026.41	-do-	
376.	Consolidated Tea & Lands Co. Ltd.	Dalimkote 2	592.55	-do-	

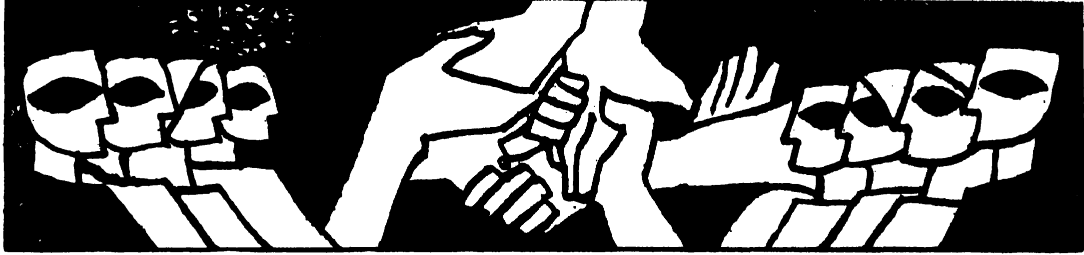
Sl. No.	Name of Proprietor	Name of Grant	Area ac.	Date of Lease.	Transferred to
377.	The Duars Tea Co. Ltd.	Tondoo I	538.19	1-4-07	
378.	The Oodlabari Tea Co. Ltd.	Oodlabari	588.57	-do-	
379.	The Empire of India & Ceylon Tea co. Ltd.	Hahaipatha I	508.05	-do-	
380.	The Consolidated Tea & Lands Co. Ltd.	Neorannddy 2	44.32	-do-	
381.	The Bagrakote Tea Co. Ltd.	Bagrakote 3	396.87	-do-	
382.	Manabari Tea Co. Ltd.	Manabari	418.52	-do-	
383.	The Consolidated Tea & Lands Co. Ltd.	Sundri 2	30.92	1-4-08	
384.	New Dooars Tea Ltd.	Palasbar 1st	820.00	27-7-08	
385.	Ambari Tea Co. Ltd.	Ambari	1623.00	20-8-08	
386.	Dima Tea Co. Ltd.	Dima	2999.99	1-4-09	
387.	Nedeem Tea Co. Ltd.	Dalmore	1495.00	29-5-09	
388.	Jay Chandra Sanyal	Ramihora	1494.00	3-8-09	
389.	Nedeem Tea Co. Ltd.	Dalmore 2nd	4075.74	1-12-09	
390.	Chalsa Tea Co. Ltd.	Chalsa 3	88.24	1-4-10	
391.	Dooars Tea Co. Ltd.	Bamandanga 2nd	102.84	21-7-10	
392.	The Alipurduar Tea Co. Ltd.	Turturi T. E.	1502.66	1-10-10	
393.	Chalsa Tea Co. Ltd.	Satkhawa IV.	290.71	1-4-11	
394.	Debpara Tea Co. Ltd.	Debpara	1300.17	1-4-11	
395.	Consolidated Tea & Lands Co. Ltd.	Dam Dim 2nd	58.25	15-5-11	
396.	Diana Tea Co. Ltd.	Diana	1050.10	13-12-11	
397.	Chalsa Tea Co. Ltd. (Conversion of the portion Jote No. 1223).	Satkhawa V	94.78	1-4-1912	
398.	Consolidated Tea & Lands Co. Ltd.	Dam Dim II	58.16	-do-	
399.	Assam Dooars Tea Co. Ltd.	Lakhipara	649.37	6-7-12	
400.	Joges Chandra Ghose	Gopalpur	1249.45	27-2-13	
401.	Mv. Mussaraf Hossain & Bibi Faizunessa Khatun	Hossainabad	639.03	2-5-13	
402.	Jaybirpara Tea Co. Ltd.	Jaybirpara	968.80	8-5-13	
403.	Dheklapara Tea Co. Ltd.	Dheklapara	796.78	9-5-13	
404.	Charles Bearpark on behalf of Imperial Tea Co. Ltd.	Hasimara 1st	152.70	17-5-13	
405.	-do-	-do- 2nd	67.19	-do-	
406.	Khayerbari Tea Co. Ltd.	Nimtijhora	1143.38	17-5-13	
407.	Palasbari Tea Co.	Palasbari	1045.86	4-6-13	
408.	Mv. Walliar Rahman & Bibi Manija Khatun	Rbeabari	1168.39	4-6-13	
409.	Jhotish Ch. Paul	Radbarani	626.57	20-12-13	
410.	The Dooars Union Tea Co. Ltd.	Patkapara T. E.	899.04	27-7-15	
411.	Bengal Dooars National Tea Co. Ltd.	Dhowlajhora T. E.	1493.95	5-8-15	
412.	Dheklapara Tea Co. Ltd.	Dheklapara Tea Grant 2nd	208.10	26-8-15	
413.	Dheklapara Tea Co. Ltd.	Dheklapara Tea Grant III	223.87	26-8-15	
414.	Duars Tea Co. Ltd.	Bamandanga II	102.98	1-4-16	

Sl. No.	Name of Proprietor	Name of Grant	Area ac.	Date of Lease.	Transferred to
415.	Kohinoor Tea Co. Ltd.	Kohinoor T. E.	829.43	26-8-15	
416.	Chulsa Tea Co. Ltd.	Satkhaya Grant VI	45.05	4-5-17	
417.	Palasbari Tea Co. Ltd.	Palasbari	1045.77	1-4-18	
418.	Rangpur Tea Asson. Ltd.	Majerdabari T. E.	736.90	1-4-21	
419.	Hasimara Tea Co. Ltd.	Satali	1267.64	2-12-21	
420.	—	—	—	—	
421.	Consolidated Tea & Lands Co. Ltd.	Upper Neora 1	286.58	1-4-1921	
422.	Assam Duars Tea Co. Ltd.	Lakhipara	637.91	-do-	
423.	Mv. Mussaraff Hossain & Bibi Faizunessa Khatun	Hossainabad	639.38	-do-	
424.	Meenglas Tea Co. Ltd.	Patharjhora	2140.18	-do-	
425.	Hantupara Tea Co. Ltd.	Bitri	595.50	-do-	
426.	Bengal Duarsa National Tea Co. Ltd.	Dhawlajhora	1484.50	-do-	
427.	Gopalpur Tea Co. Ltd.	Gopalpur	1249.80	-do-	
428.	Khayerbari Tea Co. Ltd.	Nimtijhora	1123.94	-do-	
429.	Imperial Tea Co. Ltd.	Jayanti (Hatipotha) 2nd	567.14	-do-	
430.	Consolidated Tea & Lands Co. Ltd.	Barron	738.37	-do-	
431.	Nedeem Tea Co. Ltd.	Dalmore	5660.05	-do-	
432.	Ramjhora Tea Co. Ltd.	Ramjhora	1496.69	-do-	
433.	Ambari Tea Co. Ltd.	Ambari	1747.97	-do-	
434.	Moraghat Tea Co. Ltd.	Moraghat	1663.70	-do-	
435.	Ranicherra Tea Co. Ltd.	Ranicherra 2 & 3	550.37	1-4-1932	
436.	Babu Jyotish Ch. Paul Choudhury	Radharani	710.99	-do-	
437.	Alipurduar Tea Co. Ltd.	Turturi	1513.20	-do-	
438.	Rangpur Tea Asson. Ltd.	Majerdabari 2	320.27	-do-	
439.	Diana Tea Co. Ltd.	Diana	1174.79	-do-	
440.	The Red Bank Tea Co. Ltd.	Red Bank	180.82	-do-	
441.	Nangdala Tea Co. Ltd.	Nangdala	3305.17	1-4-1923	
442.	Hope Tea Co. Ltd.	Hope	1802.79	1-4-1924	
443.	Hope Tea Co. Ltd.	Jiti	2607.53	1-4-1924	
444.	Aevill Tea Co. Ltd.	Aevill	1721.78	-do-	
445.	Kilcot Tea Co. Ltd.	Kilcot	1613.66	-do-	
446.	Nedeem Tea Co. Ltd.	Luksan	2318.22	-do-	
447.	Engo Tea Co. Ltd.	Engo	399.84	-do-	
448.	Chalsa Tea Co. Ltd.	Chalsa	1472.52	-do-	
449.	-do-	Satkhya	1925.01	-do-	
450.	New Duars Tea. Co. Ltd.	Haritalguri 3	842.35	-do-	
451.	Consolidated Tea & Lands Co. Ltd.	Nakhati	1228.72	-do-	
452.	Bagrakote Tea Co. Ltd.	Baintguri	2641.36	-do-	
453.	R. H. A. Morton	Tunbari	695.08	-do-	
454.	The Duars Tea Co. Ltd.	Indong	2139.45	1-4-24	
455.	Dheklapara Tea Co. Ltd.	Dheklapara	1256.59	-do-	(Amalgamated with No. 348)
456.	Mlv. Walior Rahman & Bibi Monija Khatun	Rheabari	1330.87	-do-	
457.	Jaybirpara Tea Co. Ltd.	Jaybirpara	1030.31	-do-	
458.	Chalsa Tea Co. Ltd.	Zuranti	1843.84	-do-	

Sl. No.	Name of Proprietor	Name of Grant	Area ac.	Date of Lease.	Transferred to
459.	Gairkata Tea Co. Ltd.	Gairkata	2941.96	-do-	
460.	Hope Tea Co. Ltd.	Chalauni T. E.	1924.79	-do-	
461.	Nagaisuri Tea Co. Ltd.	Nagaisuri	2382.49	-do-	
462.	Haldibari Tea Associated Ltd.	Haldibari	2793.03	1-4-24	
463.	Imperial Tea Co. Ltd.	New Glencoe	1433.47	-do-	
464.	Bagrakote Tea Co. Ltd.	Saongaon	1184.61	-do-	
465.	Leesh River Tea Co. Ltd.	Fulbari II	2497.72	-do-	
466.	Meenglas Tea Co. Ltd.	Meenglas	1689.49	-do-	
467.	Needeem Tea Co. Ltd.	Naya Sylee	2005.26	-do-	
468.	Carron Tea Co. Ltd.	Carron	1437.03	-do-	
469.	Empire of India & Ceylon Tea Co. Ltd.	Hahaipatha 2	1075.61	-do-	
470.	Meenglass Tea Co. Ltd.	Dalimkote	981.05	-do-	
471.	Chalsa Tea Co. Ltd.	Youngtong	1244.03	-do-	
472.	-do-	Samsing	1863.20	-do-	
473.	Bagrakote Tea Co. Ltd.	Bagrakote I	397.87	-do-	
474.	Cachar and Duars Tea Co. Ltd.	Matelli	2594.41	-do-	
475.	Gopalpur Tea Co. Ltd.	Gopalpur	1479.64	-do-	(Revised Lease for 27 years.)
476.	Singlo Tea Co. Ltd.	Telepara	3022.35	-do-	
477.	Gurjungjhora Tea Co. Ltd.	Gurjungjhora	816.09	-do-	
478.	Rahimia Lands & Tea Co. Ltd.	Mal Nuddy	329.24	-do-	
479.	-do-	Jaldhaka	119.00	-do-	
480.	Ethelbaric Tea Co. Ltd.	Ethelbaric	782.70	1-4-24	
481.	Northern Bengal Tea Corpn.	Needeem T. E.	889.88	-do-	
482.	Bullabaric Tea Co. Ltd.	Chyti	199.39	1-4-25	
483.	Needeem Tea Co. Ltd.	Sylee	1879.86	-do-	
484.	The Duars Union Tea Co. Ltd.	Patkapara	916.75	-do-	
485.	Consolidated Tea & Lands Co. Ltd.	Barrons IV	477.10	-do-	
486.	The Jalpaiguri Tea Co. Ltd.	Naldangapara	734.10	1-4-25	
487.	Eastern Tea Co. Ltd.	Kalabari II	221.09	-do-	
488.	Kohinoor Tea Co. Ltd.	Kohinoor	1862.96	-do-	
489.	Duars Tea Co. Ltd.	Tondoo II & III	70.68	-do-	
490.	-do-	Nagrakata	2326.04	-do-	
491.	-do-	Hilla	1527.21	-do-	
492.	-do-	Gatia	2139.89	-do-	
493.	-do-	Grasmore	2561.01	-do-	
494.	-do-	Bhagatpur	3433.94	-do-	
495.	-do-	Kurti	1953.85	-do-	
496.	Anjuman Tea Co. Ltd.	Mujnai	1811.99	1-4-26	
497.	Saroda Tea Co. Ltd.	Kamsinggram	8.31	-do-	
498.	Needeem Tea Co. Ltd.	Chengmari	6275.95	-do-	
499.	Anjuman Tea Co. Ltd.	Makrapara	2863.73	-do-	
500.	Kohinoor Tea Co. Ltd.	Kohinoor	1862.96	-do-	
501.	The Batabari Tea Co. Ltd.	Batabari	841.54	-do-	
502.	The Jadavpur Tea Co. Ltd.	Jadavpur	451.90	-do-	
503.	Consolidated Tea & Lands Co. Ltd.	Rungamati	3515.89	1-4-27	
504.	Joges Ch. Ghose	Malhati	1207.27	-do-	

Sl. No.	Name of Proprietor	Name of Grant	Area ac.	Date of Lease.	Transferred to
505.	Nalini Kanta Rahut & Ors.	Anandapur T. E.	614.73	-do-	(Amalgamated with the No. 525)
506.	Sreenathpur Tea Co. Ltd.	Sreenathpur	789.25	-do-	
507.	Hasimara Tea Co. Ltd.	Satali	1271.65	1-4-28	
508.	Needeem Tea Co. Ltd.	Toorsa	3310.73	-do-	
509.	Duars Union Tea Co. Ltd.	Patkapara T. E.	1202.27	-do-	
510.	Jogesh Ch. Ghose	Kadambini	1774.97	-do-	
511.	Chamurchi Tea Co. Ltd.	Chamurchi	2212.95	-do-	
512.	Eastern Tea Co. Ltd.	Kalabari III	222.49	-do-	
513.	Hantupara Tea Co. Ltd.	Dumchipara	1948.79	-do-	
514.	-do-	Hantupara	3039.61	-do-	
515.	Bibi Rahimanessa Khatun & Begum Faizunnessa Khatun	Altadanga II	207.25	1-4-39	
516.	Diabari Tea Co. Ltd.	Madhu	1055.28	-do-	
517.	Dheklapara Tea Co. Ltd.	Dheklapara	1408.52	1-4-29	
518.	Luxmikanta Tea Co. Ltd.	Luxmikanta	903.14	1-4-29	
519.	Bibi Rahimanessa Khatun	Rahimpur	619.33	-do-	
520.	Singlo Tea Co. Ltd.	Bundapani	5817.25	1-4-30	
521.	-do-	Telipara	713.32	-do-	
522.	Bijaynagar Tea Co. Ltd.	Soudamini T. E.	1286.56	-do-	
523.	Katalguri Tea Co. Ltd.	Katalguri	2392.07	1-4-31	(This is an interim lease. Revised lease issued vide Order Date 12-2-35)
524.	Nepuchapur Tea Co. Ltd.	Nepuchapur	834.49	1-4-1933	
525.	Nalini Kanta Rahut & Ors.*	Anandapur	902.42	-do-	
526.	Annada Charan Sen & Ors. Directors, Eastern Tea Co. Ltd.	Kalabari I	804.60	-do-	





মানিক সান্যাল

চা-শিল্প ও শ্রমিক আন্দোলন

খ্রিস্ট জন্মের বহুপূর্ব থেকে যা ছিল সীমান্ত চীনের আদিবাসীদের পানীয়, ব্রিটিশ শাসনের আগে যা ছিল সীমান্ত অসমের সিংফো উপজাতিদের প্রিয় পানীয় 'পাইন-আপ' তাই আজ আমাদের প্রাত্যহিকের উষ্ণ আমেজমাখা 'চা'। গত দেড় শতকের বাণিজ্য ছোঁয়ায় চা এক বিরাট পরিবর্তন আনে উত্তর-পূর্ব ভারতসহ দেশের বেশ কিছু অংশে। বিশেষ করে আমাদের জলপাইগুড়ি ও সংলগ্ন দার্জিলিঙে। মাত্র একশো পঁচিশ বছর এই জেলার সঙ্গে চায়ের সংযোগ। এই সময়কালে গোটা অর্থব্যবস্থা, সমাজজীবন, জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক বিবর্তনে প্রবলভাবে উপস্থিত এই উষ্ণ পানীয়টি। চায়ের পাশাপাশি এসেছে চা-শিল্প, তার শ্রমিক। বিস্তীর্ণ চা-গালিচার সবুজ নান্দনিক রূপ বা সকালের চায়ের কাপের উষ্ণতার পেছনে যে দীর্ঘ ইতিহাস, হাজার হাজার শ্রমিকের অশ্রুগাথা রয়েছে তার অনুরণন মাটিতে কান পাতলে আজও শোনা যাবে। মাটিতে কান পেতে এই ইতিহাসকে জানার জন্য আমাদের ফিরতে হবে গত শতকের মধ্যভাগে, যখন চীনের একচেটিয়া চা-বাজারে ভাগ বসাতে ব্রিটিশরা চেষ্টা করছে তাদের অন্যান্য উপনিবেশে চা-চাষের।

ভারতে চায়ের শুরু অসমে, তবে ব্রিটিশরা একে তাদের আবিষ্কার বললেও চা-পান করা অসমের সিংফো, খামতিদের পুরনো অভ্যাস। চা তাদের কাছে ছিল 'পাইন আপ'।

মহাচীনের আফিম যুদ্ধের পরবর্তীতে চা-বাণিজ্য বিষয়ে চীনের উপর নির্ভরশীল থাকা সম্ভব হচ্ছিল না ব্রিটিশ বেনিয়াদের। এর জন্য তারা বিকল্পের খোঁজ শুরু করে দিয়েছিল। তবে বাংলার মাটিতে প্রথম চা-গাছের বীজ রোপণ করা হয় ১৭৭৪-এ, কলকাতার বোটানিক্যাল গার্ডেনে এ সময় আমদানিকৃত চা-বীজ রোপণ করান লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস, বাকি বীজ পাঠিয়ে দেওয়া হয় ভুটানের ব্রিটিশদূত জর্জ বোগেলের কাছে। এ সময়ই লর্ড কিউ (Kew)-এর রয়েল বোটানিক্যাল গার্ডেনের ডাইরেক্টর জোসেভ ব্যাকসকে উপনিবেশগুলোতে বাণিজ্যমুখী নতুন চাষের সম্ভাবনা নিয়ে রিপোর্ট দিতে বলা হয়। তিনি চায়ের উপর গুরুত্ব দেন।



চা-পাতা সংগ্রহরত শ্রমজীবী তরুণী

ব্যাকসের প্রস্তাবে উদ্বুদ্ধ কর্নেল রবার্ট কিড (Kyd) শিবপুরে তাঁর ব্যক্তিগত বাগানেও চায়ের গাছ লাগান। কর্নেল ১৮১৫-তে কোম্পানিকে লেখা চিঠিতে অসমের উপজাতিদের চা-পানের অভ্যাসের উল্লেখও করেন। তবে রবার্ট ব্রুস নামের একজন স্কট প্রথম এই চা ঝোপ লক্ষ করেন অসম সীমান্তে। ব্রুস ১৮২৩-এ মণিরাম দত্ত বড়ুয়া নামক এক শ্রদ্ধেয় অসমিয়ার সঙ্গে মিলিত হন। মণিরামই রুসবে সিংফোদের প্রধান বিসা গ্যামের সঙ্গে পরিচিত করান। এদের মাধ্যমে ব্রুস চা-বীজ ও গাছ সংগ্রহ করেন। এভাবেই ভারতীয় চা-বাগানে ভারতীয় চা-বীজ রোপিত হওয়ার প্রেক্ষাপট তৈরি হয়। রবার্ট মারা যাওয়ার পর (১৮২৪) তাঁর ভাই আলেকজান্ডার ব্রুস এই প্রচেষ্টাকে বাস্তব রূপ দেন। বিসা গ্যামের মারফত চা-বীজ সংগ্রহ করে তিনি বিভিন্ন জায়গায় পাঠান। ইতিহাসের মিথ্যাচার ও করুণ পরিণতিতে আমরা দেখি চার্লস ব্রুসকে ভারতীয় চায়ের জনক বলা হলো আর বিসা গ্যামের মৃত্যু হলো জোড়হাট জেলের ভেতর। মণিরাম দেওয়ান ছিলেন একজন দেশপ্রেমী। ১৮৫৭-র বিদ্রোহের পর তাঁকেও ফাঁসি দেয় ব্রিটিশরা।

বাস্তবিক, ১৮৩৩-এ ব্যবসায়িক ভিত্তিতে চা-চাষ শুরু হয় ভারতে। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের উদ্যোগে ১৮৩৯-এ প্রথম ভারতীয় চা-কোম্পানি চালু হলো, বেঙ্গল টি কোম্পানি। ওই বছরই লন্ডনে শুরু হলো অসম কোম্পানি। বাংলায় ব্যবসায়িক ভিত্তিতে চায়ের বাগান তৈরির শুরু দার্জিলিং থেকে। ১৮৩৫-এ সিকিমের রাজা দার্জিলিঙে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে দেয় বন্ধুত্বের প্রতিদান হিসাবে। ১৮৫০-এ দার্জিলিং জেলা গঠিত হয়। প্রথম ডেপুটি কমিশনার অর্থার ডি ক্যাম্পবেল তাঁর ৭০০ ফুট উঁচু বাগানে চা-গাছ লাগিয়ে ছিলেন। এটি ছিল মূলত চাইনিজ ভ্যারাইটি, ক্যাম্পবেল সাহেব কফিবাগানও করেন। তবে দার্জিলিঙে চা-বাগানের সূচনা ১৮৫৪-তে। খুব অল্পসময়, ১৮৭৪-এর মধ্যে দার্জিলিঙে তৈরি হয়ে যায় ২৪টি কোম্পানি, ১৭টি অ্যাসোসিয়েশন, ৭০টি নিজস্ব মালিকানা, ৬টি বন্ধকী মালিকানা। এরপর এখানে জমির টান পড়ায় ব্রিটিশ চা-করেরা নিচে নেমে আসে। ১৮৫৬-তে আলুবাড়িতে প্রথম চা-চাষের ১৮ বছর পর ১৮৭৪-এ ব্রুহাম গজলডোবায় প্রথম চা-বাগান আরম্ভ করেন। এটাই ডুয়ার্স বা জলপাইগুড়ির প্রথম চা-বাগান।

ডুয়ার্স বা প্রবেশপথ। তিব্বত ও ভুটানের 'প্রবেশপথ' ৭টির সংবলিত এলাকাই ডুয়ার্স বলে পরিচিত। সপ্তদশ শতকে পশ্চিম ডুয়ার্সের অধিকরণ ভুটানের দখলে চলে যায়। এই ডুয়ার্স সম্পর্কে প্রথমদিকে ব্রিটিশরা খুব একটা আগ্রহী ছিলেন না। এর কারণ ভুটান বিপদসঙ্কুল অরণ্য, কিন্তু পরবর্তীতে এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে। ১৮৩১-এ হজমন জানান যে এখানে চা তৈরি করলে আরও রপ্তানির সুযোগ বাড়বে। এই লক্ষ্যে ১৮৬৪-তে স্যার জন লরেন্সের নেতৃত্বে ইংরেজরা ভুটানের হাত থেকে জমিটি উদ্ধার করে। এরপরই ডুয়ার্সে চা-বাগানের পত্তন শুরু হয়। অসমের ৩৫ বছর পর ডুয়ার্সে চা-বাগানের সূচনা, ১৮৭৪-এ। ইতিমধ্যে দার্জিলিং চায়ের বাজারে সিংহ বিক্রমে বিরাজ করছে। ডুয়ার্সেও চা-বাগান করার সুবিধা করে দিলো ব্রিটিশ সরকার 'ওয়েস্ট ল্যান্ড অ্যাক্ট' পাস করে। এই আইনে জঙ্গলের পতিত জমিতে একমাত্র চা-বাগান করা যাবে এবং এক্ষেত্রে ভূমিরাষ্ট্রও লাগবে না। এর মধ্য দিয়ে বিনামূল্যে জমি তুলে দেওয়া হলো নব্য চা-করদের হাতে। ১৮৭৫-এ ফুলবাড়ি, ১৮৭৬-এ ডালিমকোট, বাগরাকোট, ১৮৭৭-এ কুমলাই, ডামডিম, ওয়াশারবাড়ি, মানাবাড়ি, ১৮৭৮-এ মাণিহোপ, ১৮৭৫-এর থেকে ১৯০০, এই ২৫ বছরে ১৭০টি চা-বাগান পত্তন হয় এই অঞ্চলে। এর পাশাপাশি ১৮৭৪-এ চা-বাণিজ্য ও এখানের 'সোনার খনি' বনজ সম্পদের জন্য চলে আসে রেলওয়ে। প্রথমে নর্দার্ন বেঙ্গল স্টেট রেলওয়ে, পরবর্তীতে ১৮৯৬-এ বেঙ্গল ডুয়ার্স রেলওয়ে বা বি ডি আর। প্রথমে ব্রিটিশরা চা-বাগানে একচ্ছত্র থাকলেও ১৮৭৮-এ জলপাইগুড়িতে রহিম বক্স প্রথম ভারতীয় হিসাবে জলঢাকায় চা-বাগান শুরু করেন। এরপরই বিহারীলাল গাঙ্গুলি আলটাগঙ্গায় চা-বাগান করেন।

১৮৭৯-তে জলপাইগুড়ির প্রতিষ্ঠিত কয়েকজন মিলে তৈরি করেন জয়েন্ট স্টক কোম্পানি। জয়চন্দ্র সান্যাল, যাদব চক্রবর্তী, গোপাল ঘোষ, মদনমোহন ভৌমিক প্রমুখের উদ্যোগে এই কোম্পানি মোগলকাটা চা-বাগান পত্তন করে। এরপরই রহিম বক্স ও বিহারীলাল মিলে তৈরি করেন গুরজংবেনাড়া চা কোম্পানি। পরবর্তীতে দুই কোম্পানি মিলে তৈরি হয় আজুমান চা কোম্পানি। ইংরেজের সঙ্গে ভারতীয়রাও এভাবে চা ব্যবসায় নেমে পড়েন, বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়ি পরে চা-বাগান। এই বাগানে স্বাভাবিকভাবেই প্রয়োজন হয় শ্রমিকের।



চা-পাতা সংগ্রহ করে কারখানার পথে

অসমের ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রাথমিকভাবে সেখানকার আদিবাসী সিঙ্গফো, কার্দরি প্রভৃতিদের দিয়ে শ্রমিকের কাজ করানো হয়েছে। কিন্তু এদের উপর নানা কারণে ব্রিটিশরা আর ভরসা রাখেনি। এই দিকে, দার্জিলিং, তরাইসহ জলপাইগুড়ি জেলায় যদিও কখনওই স্থানীয় মানুষ, রাভা, মেচ, রাজবংশীদের এই শিল্পে যুক্ত করেনি তারা। দার্জিলিঙে প্রথমদিকে নেপালিদের এবং তরাই অঞ্চলে এদের সঙ্গে ছোটনাগপুর (বিহার), ওড়িশার কেওনঝড় প্রভৃতি জায়গা থেকে আনা শ্রমিকদের নিযুক্ত করা হয়। স্থানীয় জনজীবন থেকে চা-শিল্পের এই বিশাল সংখ্যক শ্রমিকদের বিচ্ছিন্ন রাখা শোষণকে কায়েম রাখার স্বার্থে প্রয়োজন এটা চা-করেরা বুঝেছিলো। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত এইভাবে শ্রমিকদের পৃথক ব-দ্বীপ-এর আধিবাসী করে রাখার প্রচেষ্টা লক্ষ করি। ১৮৬০ সাল থেকেই বিহার, ওড়িশা থেকে শ্রমিকদের নানা প্রলোভনে দেখিয়ে আনা শুরু হয়। মাদ্রাজ, ওড়িশা, রাঁচি, সিংভূম থেকে উৎকোচ, প্রলোভন ও ষড়যন্ত্রের শিকার এই সব আদিবাসীদের 'কমিশন এজেন্ট' বা 'আড়কাঠিরা' নিয়ে এসে ফেলেছিলো সবুজ গালিচার এই কংস কারাগারে।

১৮২৩-এ ছোটনাগপুরে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বা জমিদারি প্রথা চালু হওয়ার ফলে জমিদারি শোষণে স্থানীয় আদিবাসীরা ভূমিহীন কৃষিশ্রমিকে পরিণত হয়। এই নিষ্পেষণের সুযোগ নেয় আড়কাঠিরা। ডিস্ট্রিক্ট লেবার অ্যাসোসিয়েশনের হিসাবে দেখা যায় ১৯১৮/১৯১৯-এ অনুমোদিত সর্দার ছিলো ৪৫,১৯২ জন, তাদের সংগৃহীত 'কুলি' শ্রমিক সংখ্যা ১,৭২,০৯৬। এর দশ বছর পরে ১৯২৮/২৯-তে অনুমোদিত সর্দার সংখ্যা ৩৫,৭৬১, সে বছর আনা শ্রমিক সংখ্যা ৬০,০২৩। এদের সংগ্রহ করা হতো সবচেয়ে পশ্চাদপদ ও অজ্ঞ মানুষদের মধ্য থেকে, আড়কাঠিরা এদের সঙ্গে ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করত না। এই সব হতভাগাদের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে প্রতারণা ও মিথ্যার জালে জড়িয়ে ফেলে আড়কাঠিরা, যার থেকে কোনদিনই পরিত্রাণ পাওয়া যেত না। চুক্তিনামায় এদের স্বাক্ষর নেওয়া হতো যার মর্মার্থ এরা জানতো না। ১৮৮২-র 'ইনল্যান্ড এমিগ্রেশন অ্যাক্ট' অনুসারে শ্রমিকদের নাম রেজিস্ট্রি করার আগে তারা চুক্তিপত্রের শর্তাবলী সম্পর্কে জ্ঞাত কিনা তা যাচাই করে নেওয়া সরকারি কর্মীর দায়িত্ব ছিলো। কিন্তু খুব সামান্য ক্ষেত্রেই তা পালিত হতো। ১৮৭৪-এ দুই জেলা মিলিয়ে মোট ১২৫টা বাগানে মোট শ্রমিক ছিলো ১৪,০০০। ১৯১১-তে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১,৫৯,৬০৬। এদের মধ্যে ওঁরাও ৫৫ হাজার, মুণ্ডা ১৭ হাজার, সাঁওতাল ১১ হাজার এবং নেপালি ১৯ হাজার।

শতাব্দীজুড়ে বহমান এই ইতিহাস প্রতিবাদহীন থাকেনি। ১৮৫৮-তে অসমের চা-শ্রমিকদের একাংশ সিপাহি বিদ্রোহের সমর্থন করলে তাদের নেতা মধুরাম ঘোষের ৭ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। পরবর্তীকালে মণিরাম দেওয়ান স্থানীয় আদিবাসীদের কাজে নিযুক্ত করার দাবিতে আন্দোলন করলে তাঁকেও ফাঁসি দেওয়া হয়। মণিরাম দেওয়ান প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের (সিপাহি বিদ্রোহের) অংশীদার ছিলেন। তবে ডুয়ার্স বা জলপাইগুড়ির চা-শ্রমিক আন্দোলনের এই প্রাথমিক পর্বকে সংকলিত করার বিষয়ে সঠিক ও আন্তরিক গবেষণার অভাবে অনেক সংগ্রামই আজও ইতিহাসের ধূসর অধ্যায়ে চাপা পড়ে আছে। এ সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা চা-শ্রমিকদের যন্ত্রণা নিয়ে 'ভারত সভার' খোঁজখবর নেওয়া। চা-শ্রমিকদের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনে যে ক্রীতদাসের মতো জীবনযাপন করতে হতো তার বর্ণনা তুলে আনেন 'ভারত সভার' প্রতিনিধি দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি। অসম ও সংলগ্ন চা-বাগানগুলো জুড়ে গিয়ে ১৮৮৬-তে 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় শ্রীগাঙ্গুলি কিছু সংবাদভাষা বা প্রবন্ধ লেখেন। শ্রমিকদের নিয়োগ পর্ব থেকেই যে বঞ্চনার ও শোষণের অধ্যায় শুরু হতো, চিকিৎসাহীন অর্ধভুক্ত সেই ছিন্নমূল আদিবাসীদের উপর কি ধরনের বর্বরতা চালাতো 'সভা' ব্রিটিশরা তা পাঠ করে আজও শিহরিত হতে হয়। বিচারের নামে চলতো প্রহসন, এই সব বিচারের কিছু নমুনাও সঞ্জীবনীর মধ্য দিয়ে বাংলার মানুষ সেদিন জেনেছিলো। অবদমনের এই চেহারা আজও রয়েছে তবে ভিন্ন চেহারায়।

১৮৯৫-এর সান্ডার্সের রিপোর্টে আমরা দেখতে পাই শ্রমিকদের প্রতিবাদমুখর মানবিকতার উল্লেখ। তিনি "কুলি'রাই পরিস্থিতির

নিয়ন্ত্রক" হয়ে উঠেছে বলে উল্লেখ করেন। ১৯১১-র গ্রুনিং-এর রিপোর্টে উল্লেখ দেখি অতিরিক্ত কাজের বোঝা চাপালে শ্রমিকদের ধর্মঘটে যাওয়ার ঘটনার। এই সময় মালিকরা তৈরি করে 'লেবার কোড'। সংগঠিত শ্রমিক প্রতিবাদকে আটকাতে সংগঠিত মালিকের প্রতিরক্ষা কবজ এই 'লেবার কোড'। এ দিয়ে শ্রমিকচেতনাকে রুদ্ধ করার চেষ্টা হয়। ১৯০৬-তেই দেখা যায় চালের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে চালের মজুতের বিরুদ্ধে আন্দোলনের নামে চালসা, ডামডিম। 'নর্থ বেঙ্গল মাউন্টেন রাইফেল্‌স্'-এর মাধ্যমে দমন-পীড়নের মধ্য দিয়ে একে শুদ্ধ করা হয়। এরপরই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা

অসমের ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রাথমিকভাবে সেখানকার আদিবাসী সিঙ্গফো, কাদরি প্রভৃতিদের দিয়ে শ্রমিকের কাজ করানো হয়েছে। কিন্তু এদের উপর নানা কারণে ব্রিটিশরা আর ভরসা রাখেনি। এই দিকে, দার্জিলিং, তরাইসহ জলপাইগুড়ি জেলায় যদিও কখনওই স্থানীয় মানুষ, রাভা, মেচ, রাজবংশীদের এই শিল্পে যুক্ত করেনি তারা। দার্জিলিঙে প্রথমদিকে নেপালিদের এবং তরাই অঞ্চলে এদের সঙ্গে ছোটনাগপুর (বিহার), ওড়িশার কেওনঝড় প্রভৃতি জায়গা থেকে আনা শ্রমিকদের নিযুক্ত করা হয়। স্থানীয় জনজীবন থেকে চা-শিল্পের এই বিশাল সংখ্যক শ্রমিকদের বিচ্ছিন্ন রাখা শোষণকে কায়েম রাখার স্বার্থে প্রয়োজন এটা চা-করেরা বুঝেছিলো।

ব্রিটিশ-বিরোধী ওঁরাও আন্দোলন। ১৯১৬ থেকে এই 'টানা ভগৎ' আন্দোলনের ফলে শ্রমিকদের, বিশেষত ওঁরাও শ্রমিকদের মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন ওঠে। এই আন্দোলন প্রত্যক্ষভাবে ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে রূপ নেয়। জার্মানদের সহায়তায় ব্রিটিশদের হারানোর স্বপ্নও তাদের এসময়ের গানে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। ব্রিটিশ রাজশক্তি কড়া হাতে একে দমন করে। 'জেলায় এঁরাই প্রথম গণ-আলোড়নে অংশগ্রহণের অপরাধের দরুন রাজরোষের শিকার হন।' (রণজিৎ দাশগুপ্ত) প্রক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন জায়গায় সাহেব ম্যানেজারদের উপর বিভিন্ন দাবিতে চা-শ্রমিকদের দাবি আন্দোলনের চাপ সৃষ্টির ঘটনা ঘটে এ সময়। তাদের জীবন ও জীবন সংগ্রামের আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হতে থাকে এ সময় থেকেই। এখানে একটি অবধারিত জিজ্ঞাসা উঠে আসে—কোনো স্থানীয় মানুষকে চা-শিল্পের শ্রমিক হিসাবে যুক্ত না করার বিষয়টি। অসমের ক্ষেত্রে স্থানীয় মানুষদের সংযুক্তির দাবি তুলেছিলেন মণিরাম দেওয়ান। কিন্তু সুচতুর ইংরেজরা এ ব্যাপারে কঠোর ছিলো। তারা জানতো স্থানীয় মানুষদের নিয়ে তারা ওই সবুজ কারাগার রাখতে পারবে না, স্থানীয় মানুষকে ধারাবাহিক উৎপীড়ন সম্ভব নয়, প্রতিবাদ সংগঠিত চেহারা নিয়ে ছড়িয়ে পড়তে পারে, নিমেষে তা ধ্বংস করবে তাদের বাণিজ্য ক্ষেত্রকে। তাই তারা ভিটেমাটিহীন ছিন্নমূলদের এনে পশুর মতো রাখতো। এমন কি ভারতীয় চা-করেরা এসেও পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন ঘটায়নি। মধ্যবিত্ত বাঙ্গালি থেকে যাঁরা চা-শিল্পের সঙ্গে যুক্ত হন তাঁরা ভিন্নধর্মী চিন্তা করলেও, ক্রমশ চল্‌তি পথেই হাঁটেন।

এ সময় চা-শ্রমিকদের কড়া বেষ্টনীর ভেতর রাখা হতো, বাইরের মানুষ বাগান কর্তৃপক্ষের রক্তচক্ষুকে আড়াল করে এদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগও পেতেন না। শ্রমিকদের বিচ্ছিন্ন রাখতে ব্রিটিশ ও ভারতীয় মালিকের ভূমিকা একই রকম ছিলো। এই অঞ্চলের চা- বাগানগুলোর বেশির ভাগই ছিলো ব্রিটিশদের হাতে। ১৯৪০-এর ১৫৪টি বাগানের মধ্যে ১০০টিই ছিলো ইউরোপীয়দের হাতে। মালিকপক্ষ ও তাদের অস্তিত্ব রক্ষার্থে ছিলো সংগঠিত। ১৮৭৮-এ ইউরোপীয় চা-করেরা তৈরি করে ডুয়ার্স প্ল্যান্টার্স অ্যাসোঃ (ডি পি এ)। ১৯১৮-তে ভারতীয় চা-করদের আই টি পি এ তৈরি হয়। সংহত মালিক পক্ষেরে বিপরীত শ্রমিকদেরও সংহতি তৈরি হয়। ১৯২০-তে শ্রমিক ইউনিয়ন তৈরি হয়। এখানে উল্লেখ্য, ১৯২১-এ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জলপাইগুড়ি জেলা কমিটি তৈরি হলেও এই পর্বে চা-শ্রমিকদের কাছে জাতীয়তাবাদী বার্তা নিয়ে যাওয়ার কোনো প্রচেষ্টা ছিলো না। দুটো কারণ ছিলো এর, চা শ্রমিকদের যেভাবে বিচ্ছিন্ন দ্বীপান্তরবাসীর মতো রাখা হতো সেখানে বাইরের কারও সংযোগ কঠিন ছিলো। দ্বিতীয়ত, জলপাইগুড়ি শহরের কংগ্রেস নেতৃত্বের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিলো চা-বাগিচা মালিকদের সঙ্গে। এ বিষয়ে রণজিৎ দাশগুপ্তর অভিমত হলো—"চা-শ্রমিকদের ক্ষেত্রে আন্দোলনের লাগাম টেনে রাখার জন্য ভারতীয় তথা বাঙ্গালি চা-করদের ভূমিকার তারিফ করে ১৯২১-এর জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত ডুয়ার্স প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সভায়, চেয়ারম্যান বলেছিলেন 'জলপাইগুড়ি শহর ও জেলা—এই দুই জায়গাতেই আমাদের ভারতীয় বন্ধুদের নীরব প্রভাব শান্তি বজায় রাখতে খুবই সাহায্য করেছে এবং তাদের (অর্থাৎ ভারতীয় চা-করদের) কাছে আমরা গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।'

তবে চা-শ্রমিকদের ক্ষেত্রে এ আন্দোলনের স্ফুলিঙ্গ ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছিল। এই সময় বাগান সংলগ্ন হাটগুলো হয়ে ওঠে যোগাযোগের একমাত্র সেতু। এখানেই হাটের দিন শ্রমিকরা পূর্বনির্ধারিত স্থানে আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে মিলিত হতো। কিন্তু বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ ছিলো না, ফলে বাইরের খবর এদের কাছে পৌঁছাত না। এসময় কিছু 'সন্ত্রাসবাদী' চা-বাগানে আশ্রয় নেয়, কিন্তু বাগানের 'বাবু'রা এদের ধরিয়ে দিতে সচেষ্ট হয়। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে এই শ্রমিক শ্রেণীকে বিচ্ছিন্ন রাখার কারণ খুঁজে পাওয়া যায় ১৯২৯-এ বাংলা সরকারের চিফ সেক্রেটারিকে লেখা রাজশাহির বিভাগীয় কমিশনারের একটি চিঠির ভেতরে—"The Congress Leader and every Indian of means in Jalpaiguri area deeply involved in the Tea Industry and the last thing they derive is any trouble which would heet the dividends. Possibly they would not mind creating trouble in British owned gardens but would be afraid of it spreading to Indian gardens."

এই স্থিতাবস্থা যদিও ধীরে ধীরে কাটতে থাকে। এর দুই দশক পরে ১৯৪৫-এর সেপ্টেম্বর দলগাঁ চা-বাগানে এবং নভেম্বরে রাঙ্গামাটি চা-বাগানে শ্রমিকদের যৌথ প্রতিবাদে নামার ঘটনা ঘটেছিলো। ১৯৩৯-এর ৬ ফেব্রুয়ারি জলপাইগুড়ি জেলা কমিউনিস্ট পার্টির ৩ সদস্যের সংগঠনী কমিটি গঠিত হয়।

এর আগের বছর ১৯৩৮-এ বেঙ্গল ডুয়ার্স রেলওয়ের হেড কোয়ার্টারে দোমহনীতে রেল রোড ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এর সম্পাদক হন বীরেন দাশগুপ্ত। এই রেলপথের বেশির ভাগ পথ গিয়েছিলো চা-বাগানের মধ্য দিয়ে। এই রেল-শ্রমিকদের সঙ্গে ধীরে ধীরে চা-শ্রমিকদের সম্পর্ক এক নতুন বাতাবরণ তৈরি করে। ২য় বিশ্বযুদ্ধের পর এটাই 'অনুঘটকের' কাজ করে। মালবাজারকে কেন্দ্র করে রেলশ্রমিক সংগঠনের বিষয়ে সক্রিয় ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির দেবপ্রসাদ ঘোষ (পটলবাবু)। তখন চা-শ্রমিকদের সঙ্গে বাইরের মানুষদের যোগাযোগ দুষ্কর ছিলো, গ্যাংম্যানদের কোয়ার্টার থেকে পটলবাবু ও অন্যান্য নেতৃত্ব চা শ্রমিকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। এই সময় হায় হায় পাতা চা-বাগানের মাঠে এক বিশাল সমাবেশ হয়। শ্রমিক-কৃষকের এই সমাবেশে বক্তৃতা দেন ভবানী সেন। এই ঘটনা এক বিশাল প্রভাব ফেলে যায়। ফলশ্রুতিতে ১৯৪৬-এর আগস্ট মাসে ৩০টি চা-বাগানের শ্রমিক প্রতিনিধি নিয়ে মালবাজারে এক সম্মেলন হয়। এখানের থেকে গঠিত হয় জেলা চা-বাগান ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, সভাপতি নির্বাচিত হন রতনলাল ব্রাহ্মণ, সম্পাদক দেবপ্রসাদ ঘোষ। এই সময় পাতাইপাতা, লক্ষ্মীপাড়া, বাগরাকোট, ডায়না, ডেঙ্গুয়ামার ইত্যাদি বাগানে শ্রমিক ইউনিয়ন গঠিত হয়। জেলা চা-বাগান মজদুর ইউনিয়ন থেকে এ সময় শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি, পে-স্কেল চালু, বোনাস, বাগিচা কানুন, প্রসূতি ভাতা, সস্তা রেটে রেশন প্রভৃতি দাবি সংবলিত এক স্মারকলিপি তৎকালীন বাংলার লেবার কমিশনারকে দেওয়া হয়। এর পরপরই তেভাগার কৃষক আন্দোলন, এই অঞ্চলে এক ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত তৈরি হয় এই আন্দোলনে ঘিরে। রেল-শ্রমিক চা-শ্রমিকরা কৃষকের পাশে দাঁড়ান, যা ওদের উন্মোচিত চেতনার পরিচয় দেয়। এ সময় ধীরে ধীরে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ বিস্ফোরণের নানা ঘটনা ঘটতে শুরু করে বিভিন্ন বাগানে। লক্ষ্মীপাড়া চা-বাগানে শ্রমিকরা অতিরিক্ত কাজের ঠিকার জন্য বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। এ সময় বাগান কর্তৃপক্ষ ও পুলিশের যৌথ সন্ত্রাস শুরু হয়। আক্রান্ত ও গ্রেপ্তার হন অনিল গুপ্ত, শচীন দাশগুপ্ত, পরিমল মিত্ররা। এ সময় ধীরে ধীরে সংগঠিত চা-শ্রমিকেরা জঙ্গি আন্দোলন গড়ে তুলতে থাকে। এই ব্যাপক শ্রমিক বিক্ষোভকে সামলাতে আতঙ্কিত দুই চা মালিক সংগঠনই কংগ্রেসকে পাশে চায়। ২৫ আগস্ট '৪৭-এ ডি পি এ এবং আই টি পি-এ'র সঙ্গে জেলার কংগ্রেস নেতৃত্বের এক বৈঠক হয়। বৈঠকে শ্রমিক আন্দোলনকে রুখতে যৌথ প্রয়াসের চুক্তি হয়। (Annual Report 1947 ITPA). কিন্তু মানুষ একবার মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে শিখলে আর হামাগুড়ি দেয় না। ১৯৪৮-এ গ্রাসমোড় চা-বাগানে শ্রমিকরা তাদের দাবিদাওয়ার সমর্থনে লাগাতার ধর্মঘটে শামিল হয়। ১১ দিন এই ধর্মঘট চলে। এ ঘটনা বাংলাদেশে প্রথম। নাগরাকাটা থানার সব চা-বাগানে এদের ধর্মঘটের সমর্থনে ১ দিনের প্রতীকী ধর্মঘট পালিত হয়। উল্লেখ্য, এ সময় জেলা চা ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন বলতে দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি উভয় জেলার মিলিত সংগঠনকে বোঝাতো।



চা-পাতা থেকে প্রস্তুত চা, কারখানার অভ্যন্তর

ইতিমধ্যে অল ইন্ডিয়া প্ল্যান্টেশন লেবার ফেডারেশন গড়ে ওঠে। শিলিগুড়ি শহরে এর প্রতিষ্ঠার সময় সভাপতি হন রতনলাল ব্রাহ্মণ। সম্পাদক হন সতোন মজুমদার। সহ-সভাপতি সুবোধ সেন, সুশীল চ্যাটার্জি, অচিন্ত্য ভট্টাচার্য। সত্যেন মজুমদারের দেওয়া ওই সময়ের সার্কুলার থেকে জানা যায়, সেখানে সমস্ত চা-বাগিচা শ্রমিককে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ। শ্রমিকদের চেতনাকে উন্নত করতে প্রয়োজন তাদের ঐক্যবদ্ধতার। বিভিন্ন চা-বাগানের শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ ও একত্রিত করে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অধিকার আদায়ের আয়ুধ তৈরি এর প্রাথমিক লক্ষ্য ছিলো।

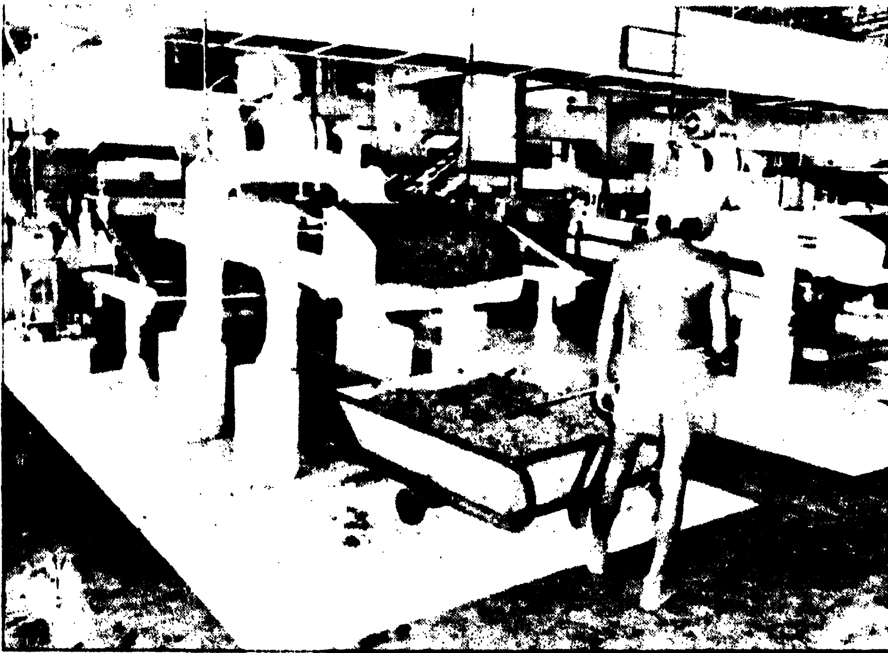
চায়ের উৎপাদনের উপর ব্রিটিশ পুঁজির একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ ছিলো এ সময়। বিপণনও সম্পূর্ণভাবে এরাই নিয়ন্ত্রণ করতো। লিপটন, ব্রুকবন্ডের মতো কোম্পানিগুলোর বাজারে আসা না আসার উপর চায়ের দাম নির্ভর করতো। ১৯৫৪ পর্যন্ত ভারতীয় চা-শিল্পে বিনিয়োগকৃত অর্থ মোট ১১৩.০৬ কোটি টাকার মধ্যে ৪০.৫১ কোটি ছিলো ভারতীয় পুঁজি। এর ৭২.৫৫ কোটি ছিলো অভারতীয় পুঁজি। প্ল্যান্টেশন এনকোয়ারি কমিশনার লক্ষ করে যে ২৪৭টি চা-কোম্পানি ১৯৩৯ থেকে ১৯৫৩-র মধ্যে তাদের সম্পত্তিকে দ্বিগুণ বৃদ্ধি করতে সমর্থ হয়। এর বেশির ভাগের বৃদ্ধি ১৯৪৬-এর পরে। কিন্তু চা-শিল্পে মুনাফার এই বিস্ফোরক বৃদ্ধি চা-শ্রমিকদের ঘাম অশ্রু যন্ত্রণার লাঘব ঘটাতে পারেনি। রেগে কমিটির রিপোর্ট থেকে দেখা যাচ্ছে যে এ

সময় তিন বছর করে চুক্তিতে নিযুক্ত শ্রমিকদের মাসিক আয় ছিলো ৭ থেকে ৮ টাকা। ১৯৫০-৫২-তে 'ন্যূনতম মজুরি আইন' প্রবর্তিত হওয়ার পর চা-শিল্পে শ্রমিক ছাঁটাই হয় ব্যাপকভাবে। ১৯৫০-এ যেখানে গোটা দেশে বাগিচা-শ্রমিক ছিলো ১০ লক্ষ ২৩ হাজার, সেখানে ১৯৫৫-তে তা ৯ লক্ষ ৩৮ হাজারে দাঁড়ায়। পশ্চিমবঙ্গে ৩ লক্ষ ২৯ হাজার থেকে ২ লক্ষ ৪২ হাজারে কমে আসে। যেখানে আমাদের এখানে চায়ের বাগানের আয়তন বৃদ্ধি হয় ১৯৬৬৪৪ একর থেকে ২০২৩৭১ একরে।

এ সময় চা-শ্রমিকদের বেতন যা ন্যূনতমভাবে জীবনধারণের পক্ষেও ভীষণভাবে অপ্রতুল। কেনিয়া, শ্রীলঙ্কার মতো অন্য উপনিবেশের বাগিচা-শ্রমিকদের তুলনায় এদেশের, বিশেষত বাংলার দুই জেলার চা-শ্রমিকদের অনেক কম মজুরি দেওয়া হতো। ১৩৫৯-এর হিসাবে দেখা যায় একদিনে ডুয়ার্সের শ্রমিকরা পাচ্ছেন ১.৮৪ টাকা। যা তৎকালীন সস্তা শ্রমিকের দেশ রোডেশিয়া, কেনিয়ার থেকেও অনেক কম। সরকারি হিসাবেই দেখা যায় ১৯৫৩-তেও কৃষিশ্রমিকদের থেকে কম মজুরি পাচ্ছেন চা-শ্রমিকরা। ন্যূনতম মজুরি আইন পাস হওয়ার পর যদিও বেশ কয়েকবার মজুরির সংস্কার হয়। ১৯৫১, ১৯৫৫, ১৯৫৯ একজন পুরুষ শ্রমিকের মজুরি ১/৩/—থেকে ১/১১/৬ হয়ে—২/-তে দাঁড়ায়। মজুরি নিয়ে শ্রমিকদের আন্দোলনকে শামিল করে প্ল্যান্টেশন লেবার ফেডারেশন। এদের আন্দোলনেরই ফলশ্রুতি ১৯৪৮-এর ন্যূনতম মজুরি আইন।

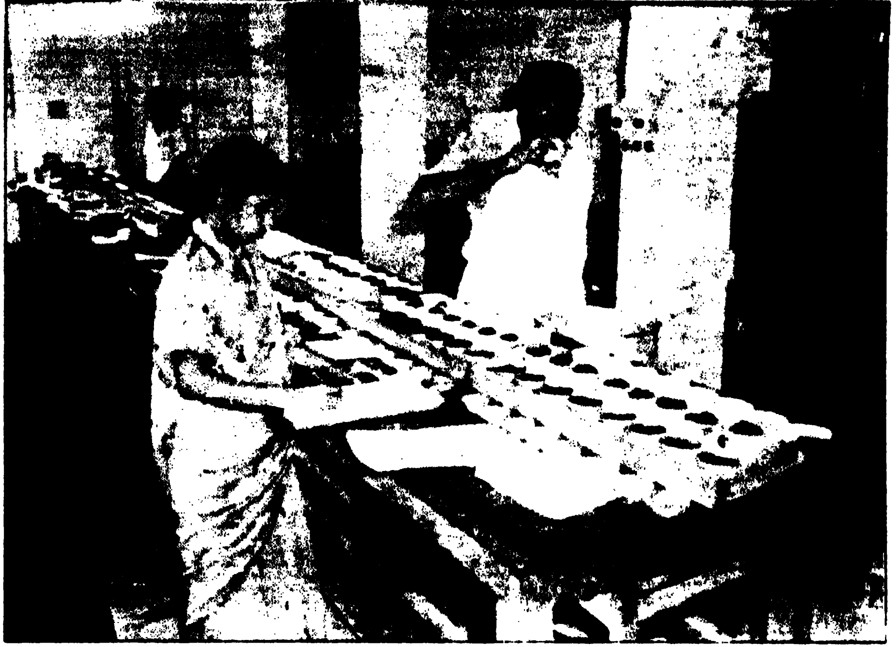
এই আইনবলে তৈরি হয় 'মিনিমাম ওয়েজেস কমিটি'। রাজ্য সরকারের প্রতিনিধি, মালিক ও শ্রমিক সমানুপাতিক প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত হয় এই কমিটি। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯০০-এর ২৪ মার্চ চা-বাগিচা ক্ষেত্রের শ্রমিকদের বিষয়টির জন্য অবসরপ্রাপ্ত আই সি এস এস এন মোদকের নেতৃত্বে একটি কমিটি তৈরি করে। এই মোদক কমিটির সুপারিশ মোতবেক ১৯৫১-র ৫ সেপ্টেম্বর রাজ্য সরকার ন্যূনতম চা-বাগিচা শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করে। ২০ ডিসেম্বর '৫১ থেকে এটি কার্যকর হওয়ার কথা ছিলো। ন্যূনতম মজুরি নিয়ে এছাড়াও পরবর্তীতে তৈরি হয় 'চোরে কমিটি'। শ্রমিকদের খাদ্য, তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার সঙ্গে ন্যূনতম খাদ্য চাহিদা বিষয়ে নিয়ে বিস্তারিত অবস্থা জানার জন্য তৈরি হয় 'হালদার তদন্ত রিপোর্ট', 'দেশপাণ্ডে রিপোর্ট' প্রভৃতি। শ্রমিকের স্বাভাবিক মানুষের মতো জীবনধারণের জন্য আবশ্যিক খাবার ও আনুষঙ্গিক চাহিদা পূরণের দাবিতে সংগঠিত আন্দোলনের চাপে ধীরে ধীরে অর্জিত হতে থাকে অধিকার। ডুয়ার্স ও তরাইয়ের চা শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি এ সময়ই ১ টাকা তিন আনা করা হয়। উল্লেখ্য, চল্লিশের মাঝামাঝি পর্যন্ত শ্রমিকদের বেতন ছিলো চার আনা মাত্র।

১৯৫১-তেই শুরু হয় বিশ্বব্যাপী মন্দা। এর সুযোগ নিয়ে চা-বাগান মালিকরা শ্রমিকের উপর নামিয়ে আনে বঞ্চনার খড়্গ। দেড় লক্ষের উপর স্থায়ী শ্রমিককে বিভিন্ন বাগানে ছাঁটাই করা হয়। বাগান থেকে বের করে এদের নিজ নিজ জেলায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বাগানের বিধিবদ্ধ রেশনও বন্ধ করে দেওয়া হয়। এদিকে ১৯৫১-তেই আইন সভায় পাস হয় বাগিচা শ্রমিক আইন। এই আইনে শ্রমিকের স্বাস্থ্য, পানীয় জল, শৌচাগার, ক্যান্টিন, ক্রেশ, শ্রমিকের সন্তান-সন্ততির শিক্ষার ব্যবস্থা, বাসস্থানের ব্যবস্থার দায়িত্ব মালিকের আবশ্যিক দায়িত্ব হিসাবে বর্তায়। শ্রমিকের এইসব অধিকার আইনের ধর্মে সুরক্ষিত করা হলেও মালিকপক্ষ পূর্ববৎ নিস্পৃহ থাকে। ১৯৫১-তে ওয়েস্ট বেঙ্গল প্ল্যান্টেশন লেবার রুলসে এইসব অধিকারকে আরও সুনির্দিষ্ট করা হয়। চা-শ্রমিক আন্দোলন এই পর্যায় পর্যন্ত লালঝাণ্ডার একক নিয়ন্ত্রণে ছিলো, সমস্ত শ্রমিক একটি পতাকার নিচেই সংঘবদ্ধ ছিলেন। প্রয়াত দেবেন সরকারের নেতৃত্বে ষাটের দশকেই আই এন টি ইউ সি-র ইউনিয়ন খোলা হয়। কিন্তু পরবর্তীতে শ্রীসরকারের সঙ্গে ইনটাক নেতৃত্বের অন্য অংশের বিরোধের ফলে তিনি বেরিয়ে এসে তৈরি করেন ওয়েস্ট বেঙ্গল চা-শ্রমিক ইউনিয়ন। ওদিকে জেলার পূর্বদিক, আলিপুরদুয়ারে আর এস পি প্রভাবিত শ্রমিক সংগঠন চা-বাগিচা শ্রমিকদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। এ সময় বাগান অনুযায়ী পৃথক পৃথক দাবিপত্র দেওয়া হতো। 'একতা' নামে সাদ্রী ভাষায় একটি পত্রিকাও প্রকাশিত হয়। ১৯৫৩-তে চা-শ্রমিক ইউনিয়ন তিনদিনের এক ধর্মঘটের ডাক দেয় বিভিন্ন দাবিকে সামনে রেখে। ১৭ আগস্ট থেকে ১৯ আগস্ট পর্যন্ত ওই ধর্মঘটে ব্যাপক সাফল্য আসে। এরই পরবর্তীতে ১৯৫৪-র মার্চে ইউনিয়নের পক্ষ থেকে আবার একটি দাবিপত্রে মজুরি ও বোনাসের দাবি জানানো হয়। ৬০ দিনের বেতনকে বোনাস হিসাবে দাবি করা হয়। এ বছর ২৪ জুন কলকাতায় সরকারের মধ্যস্থতায় বৈঠক হয়। ১৯৫৪-র ১২ জুলাই থেকে দাবি আদায়ে লাগাতার ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছিলো। এই বৈঠকে মালিকপক্ষ পিছু হটে। কিছু দাবি মেনে নেয়, ধর্মঘট মুলতবি রাখা হয়।



কারখানার অভ্যন্তর, চা প্রস্তুত প্রণালী

শ্রমিকশ্রেণীর উপর একের পর এক আক্রমণ আসতে থাকে এ সময় থেকেই। জেলা চা শ্রমিক-ইউনিয়ন জন্মলগ্ন থেকেই শ্রমিক ঐক্যের যে আহ্বান দিয়েছিলো তা আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। এই শ্রমিক সংহতির মূলমন্ত্রকে সামনে রেখে বিরল এক উদাহরণ তৈরি হয় উত্তরবঙ্গের চা-বাগিচায়। ১৯৬৫-তে গঠিত হয় 'কো-অর্ডিনেশন কমিটি অব্ টি প্ল্যান্টেশন ওয়ার্কার্স'। শ্রমিকদের সভ্যভাবে বাঁচবার জন্য কর্মসংস্থানের দাবিকে সামনে রেখে কো-অর্ডিনেশন স্মারকপত্র দেয় মালিকপক্ষকে। ডাক দেওয়া হয় লাগাতার ধর্মঘটের। 'এক্ষেত্রে মজুরির দাবি নয়, মূল দাবি ছিলো বাগিচা কানুনলব্ধ অধিকারের সুপ্রতিষ্ঠা।



টেস্টার চা পান করে চা-এর উৎকর্ষতা ও মান নির্ণয় করছেন

এই লাগাতার ধর্মঘট যদিও ৬ দিনের বেশি চলেনি তবে সরকার ও চা মালিকদের এই আন্দোলন জোর ধাক্কা দেয়। কংগ্রেসি সরকারের তদানীন্তন শ্রমমন্ত্রী আবদুস সাত্তার এই বিরোধ মীমাংসায় তৈরি করেন এক সদস্যের কমিটি। ১৯৬৮-তে ওই 'কাদের নাওয়াজ' কমিটি তার রিপোর্ট পেশ করে। সেক্ষেত্রে জমির পরিমাণ অনুপাতে শ্রমিক সংখ্যা নির্ধারণ করে দেওয়া সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দিলেও চা-মালিকপক্ষ এই কাদের নাওয়াজ কমিটির সুপারিশ মানতে নারাজ থাকে। এর ফলে 'কো-অর্ডিনেশন কমিটি'র মঞ্চ থেকেই পুনরায় আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়। কর্মসংস্থান ও রিপোর্টের অন্যান্য জরুরি বিষয়গুলোকে সামনে রেখে ১৯৬৯-তে পুনরায় চা-শ্রমিকরা ধর্মঘটে শামিল হয়। কাদের নাওয়াজ কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের দাবিতে আহূত এই ধর্মঘট গোটা বাংলার শ্রমিক আন্দোলনে একটা 'ল্যান্ডমার্ক' হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। ১৭ দিন ধরে স্তব্ধ হয়ে যায় চা-শিল্প। মালিকপক্ষ পিছু হটতে বাধ্য হয়। তৎকালীন যুক্তফ্রন্ট সরকারের শ্রমমন্ত্রী কৃষ্ণপদ ঘোষের উদ্যোগে সমাধানসূত্র বের হয়। অনিচ্ছুক মালিকদের হাত থেকে শ্রমিকরা ছিনিয়ে আনে ৯০০০ নতুন নিযুক্তি। এছাড়াও ১৯৬৯-এর ১ জানুয়ারিতে ন্যূনতম শ্রমিক সংখ্যার সীমা ধরা হয়। অর্থাৎ এদিনের শ্রমিক সংখ্যাকে বাগানের ন্যূনতম শ্রমিক সংখ্যা হিসাবে রাখতে মালিক বাধ্য। ফলে ইচ্ছেমত শ্রমিক ছাঁটাই করা থেকে তাদের পিছু হটতে হয়। এছাড়াও ঠিক হয় কোনো বাগানে শূন্যস্থান পূরণের সময় সেই শ্রমিকের পরিবার থেকেই নিযুক্তি হবে। রাজনৈতিক ঝঞ্ঝাময় এ সময়ই এই বিষয়ে শিলিগুড়িতে কৃষ্ণপদ ঘোষের সঙ্গে শ্রমিক নেতৃত্বের বৈঠক হয়। শ্রমমন্ত্রীর প্রস্তাবমতো ন্যূনতম মজুরি ১ টাকা বৃদ্ধির দাবিকে যুক্ত করা হয়। পরে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে ২৫ পয়সা বৃদ্ধি করে মালিকপক্ষ। ১৯৬৯-এর আন্দোলন সার্বিকভাবেই তাই উজ্জ্বল বর্তিকা। সত্তরের আধাফ্যাসিবাদী সন্ত্রাসের মধ্যেও চা-শ্রমিকদের যৌথ আন্দোলন চলতে থাকে। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের পাশাপাশি বিভিন্ন রাজনৈতিক আক্রমণে আরও দৃঢ় হয়ে ওঠে শ্রমিক সংহতি। ১৯৭৫-এ ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে সংগঠিত আন্দোলনের চাপে আবার ৩৭ পয়সা মজুরি বৃদ্ধি হয়। সত্তরের দশকে লালঝাণ্ডার নিচে থাকা শ্রমিকদের উপর মালিকপক্ষের প্ররোচনায় শহিদ হন অনেক শ্রমিক নেতা। কাঠালগুড়ির কোটে সুভা, সীতারাম ওঁরাও থেকে গ্রামারি চা-বাগানের ম্যুনয়াল হোড়ো পর্যন্ত এ এক দীর্ঘ রক্তক্ষরণের ইতিহাস। ১৯৭৩-এ পৃথকভাবে তৈরি হয় চা-বাগান মজদুর ইউনিয়ন, জলপাইগুড়ি উকিলপাড়ার পার্টি অফিসে এই সংগঠনের সৃষ্টিলগ্নের আগে সংগঠনের সভাপতি ছিলেন মনোরঞ্জন রায়, সহ-সভাপতি সুবোধ সেন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পরিমল মিত্র। নতুন সংগঠনের সভাপতি হলেন সুবোধ সেন, সাধারণ সম্পাদক পরিমল মিত্র এবং যুগ্ম সম্পাদক লেখক মানিক সান্যাল। এর পরপরই জরুরি অবস্থা জারি হয়। নেতৃত্ব আত্মগোপনে বাধ্য হয়। এই পটভূমিকাতেই ১৯৭৬-এ ইন্দিরা গান্ধীর সরকার শ্রমিকের বোনাসের অধিকারের মূলে কুঠারাঘাত করে। 'বিধিবদ্ধ বোনাস'— বিলম্বিত হাজিরা হিসাবে যা গৃহীত হয়েছিলো অর্ডিন্যান্স জারি করে, তা বাতিল করে ব্যালান্সশিট প্রদত্ত হিসাবের লভ্যাংশ অনুযায়ী বোনাস চালু করে। এর প্রতিবাদে তীব্র ক্ষোভে ফেটে পড়ে শ্রমিকেরা। কলাবাড়ি, কাঠালগুড়ি, চামুর্চি, দেবপাড়ায় এর প্রতিবাদে শ্রমিক ধর্মঘট হয়, কিন্তু সংহতির দুর্বলতায় এই আন্দোলন সমস্ত বাগানে ছড়িয়ে যায়নি। ১৯৭৬-এর শেষে বহু বাগানে আন্দোলনের পটভূমিকা তৈরি হয়। ইতিপূর্বে ১৯৭৪-এ মালবাজারে সি আই টি ইউর প্রাদেশিক সম্মেলন হয়। জ্যোতি বসুর ওই জনসভায় গোটা মালবাজার, মেটেলি, নাগরাকাটার শ্রমিক বিপুল সংখ্যায় সমবেত হন। এর পরবর্তীতে ১৯৭৮-এ বীরপাড়ায় চা-বাগান মজদুর ইউনিয়নের সম্মেলনেও উপস্থিত ছিলেন জ্যোতি বসু। এর আগের বছর থেকেই 'নয়া গুনতি' বা নতুন নিযুক্তির দাবিতে এবং বেতন ও বোনাসের দাবিতে আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৭৭-এর পরিবর্তিত পটভূমিকায় মালিকপক্ষ বাধ্য হয় ৭০০০ নতুন নিযুক্তি এবং ২০% শতাংশ বোনাস দিতে। কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্বতন বোনাস অধ্যাদেশকে তুচ্ছ করেই শ্রমিকরা বোনাস আদায় করে নেয় এ সময়।

১৯৮০-তে আবার পূর্বের অবস্থানে চা মালিকেরা ফিরে আসেন। সরকারি অধ্যাদেশ অনুযায়ী বোনাসের লক্ষ্যে তারা একত্রিত হয়।



চা প্যাকিং হয়ে সরবরাহের পথে

বাতি, রাস্তাঘাটে বিপর্যয়, চিকিৎসা-বাবস্থা ভেঙে পড়েছে। ক্ষোভ পুঞ্জিভূত যন্ত্রণা এই সব প্রত্যন্ত ও বিচ্ছিন্ন মানুষেরা মেনে নিতে পারছিল না। সমস্ত চা-শ্রমিক সংগঠনের যৌথ মঞ্চ কো-অর্ডিনেশন কমিটি থেকে মালিক শ্রেণীর আইন নির্ধারিত দায়বদ্ধতা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রসারিত করার দাবিতে ব্যাপক আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়। ১৯৯৯-এর ১২ জুলাই থেকে ১০ দিনের ধর্মঘট পালিত হয়। ২৭৬টি চা-বাগানের তিন লক্ষাধিক শ্রমিক এই ধর্মঘটে অংশ নেয়, যা এক ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত। বড় বড় শ্রমিক সমাবেশ, বৃষ্টির প্রচণ্ড জলধারাকে উপেক্ষা করে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মধ্যেও এই শ্রমিকেরা মিছিলকে থামতে দেয়নি, বাগান থেকে বাগানে, শহরে-গ্রামে ছড়িয়ে গেছে সংগ্রামের রক্তরেণু। অবশেষে শ্রমিকদের জয় হলো। সরকারের উদ্যোগে এক ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে অবিলম্বে ১০ হাজার শ্রমিক নিয়োগে মালিকপক্ষ সম্মত হয়। গ্রুপ হাসপাতাল সহ তালিকাবদ্ধ ওষুধ সরবরাহের ব্যাপারেও তারা স্বীকৃত হয়। শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে এই সাফল্য এক ভবিষ্যৎ দিশা।

এ সময় শ্রমিক সংগঠন কৌশল পরিবর্তন করে বড় বড় 'হাউস' বা মালিকপক্ষকে বিচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে আলাদা আলাদা করে ছোট ও মাঝারি বাগানগুলোর সঙ্গে বোনাস চুক্তি করতে থাকে। এর ফলে বিচ্ছিন্ন বড় হাউসগুলোও অবশেষে ২০% শতাংশ হারে বোনাসেই রাজি হয়। এরপর থেকে বাগানে 'গ্রুপ' বা গোষ্ঠিগত বোনাসের দাবি ওঠে। আশির দশকে বেতন বৃদ্ধির আন্দোলনেও সাফল্য আসে বেশ কয়েক ধাপে। ১৯৮৪-তে আবার শ্রমিকরা নতুন নিযুক্তির দাবিতে আন্দোলনে নামলে ১০ হাজার শ্রমিকের স্থায়ীকরণ হয়। এর পরবর্তীতে শ্রমিক-কর্মচারীদের দীর্ঘ আন্দোলন এবং রাজ্য সরকারের দৃঢ় মানসিকতার ফলে চা-বাগানের শ্রমিকদের বাসগৃহ ও রাস্তায় বিদ্যুৎ সংযোগের দাবি মেনে নেওয়া হয়। ১৯৯১-এর ৩১ মার্চ এ সম্পর্কে একটি সুনির্দিষ্ট ত্রিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু শ্রমিকদের এক তিক্ত অভিজ্ঞতা হয় মালিকদের আচরণ সম্পর্কে। বাগিচা শ্রমিক আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে, সম্পাদিত চুক্তি পালনের দায়বদ্ধতাকে অস্বীকার করে শ্রমিকদের প্রতি বঞ্চনা চালু রাখা হয়। এরপর এক ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে গত ১৯৯৯-তে। সাড়ে তিন লক্ষ বাগিচা শ্রমিক একসঙ্গে বাগিচা আইন ও সম্পাদিত চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিতে ধর্মঘটে নামে। এর আগেও ১৯৯৩-তে শ্রমিকরা ধর্মঘটের প্রস্তুতি নিয়েছিলো। শ্রমিক সংগঠনগুলোর দাবি ছিলো টি প্ল্যান্টেশন লেবার অ্যাক্ট '৫১-র পরবর্তীতে সম্পাদিত চুক্তিসমূহের বাস্তবায়ন, যা দুষ্ট মালিক সংগঠনগুলোও অস্বীকার করতে পারে না। ১৯৭৭-এর পরবর্তীতে যে নতুন বাতাবরণ তৈরি হয়েছে, চা-চাষের জমি বেড়েছে, নতুন প্রযুক্তি প্রক্রিয়া যুক্ত হয়েছে, হেক্টর অনুযায়ী 'প্ল্যান্টেশন' নতুন চেহারা নিয়েছে। কিন্তু এই অনুপাতে নতুন নিযুক্তি হয়নি। অস্থায়ী শ্রমিক দিয়ে তারা মুনাফা লুটে যাচ্ছিল। শ্রমিকরা আশা করে ছিলো ১৯৯৩-তে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী মালিকপক্ষ নয়া নিযুক্তিসহ বিভিন্ন দাবির প্রতি আন্তরিক থাকবেন। কিন্তু সে সময় সরকার গঠিত ত্রিপাক্ষিক কমিটিও শেষ পর্যন্ত শ্রমিকদের আশ্বস্ত করতে পারেনি। নেই বিশুদ্ধ পানীয় জল, সাধারণ শৌচাগার, ঘরের

চা-বাগানের মজুরির ১৮৪০ সাল থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত বর্ণনা :

(ক) অসমে প্রথম চা-বাগানে শুরু হয়—১৮৪০ সালে। কিন্তু চায়ের সঠিকভাবে উৎপাদন আরম্ভ হয়—১৮৫৩ সালে। আবার অসম ও কাছার এবং সিলেটে চায়ের বাগান প্রথমদিকে আরম্ভ হয়েছিল। এই সময়কালে একজন পুরুষ চা-শ্রমিক মাসিক বেতন পেতো ২.৫০ পয়সা। নারী শ্রমিক কিংবা অপ্রাপ্ত বয়স্ক শ্রমিক কত পেতো তার কোনও উল্লেখ নাই। ওটা বহাল থাকে ১৮৬০ সাল পর্যন্ত। এ সময় প্রতি মাসে ১ মণ চাল পেতো শ্রমিকগণ। তার দাম হিসেবে ঐ মজুরী থেকে ১ টাকা কেটে নেওয়া হত। অন্য কোনও Ration হত না।

(খ) ১৮৬০—১৮৬৮ পর্যন্ত মজদুর পেতো পুরুষ—৫.০০

নারী—৪.০০

অপ্রাপ্ত শ্রমিক—৩.০০

এই সময়কালে চাল, ডাল, নুন, তেল ও কাপড় দেওয়া হত ন্যায্য দরে। কত দামে দেওয়া হলো কোনো উল্লেখ করা নেই। তবে তাদের পারিশ্রমিক থেকে সে টাকা কেটে নেওয়া হত। এই সময়কালে দার্জিলিং পাহাড়েও চায়ের চাষ আরম্ভ হয়। একই হারে বেতন পেতো।

এ সময় চা-বাগানের শ্রমিকদের 'কুলি' বলা হত। ১৮৩৩ সালে Labour Enquiry Committee কুলি কথার পরিবর্তে 'শ্রমিক' (The word 'Colic' is now Cavinbrol brogatry and been replaced in office documents, but out in common parlance, by 'Labour'. It is used in the box).

বছর	শ্রমিকদের শ্রেণী বিভাগ	মূল হাজিরা		অতিরিক্ত কাজের জন্য		মোট দৈনিক আয়			
১৯৩৯ :	পুরুষ	৪ আনা	+	৪ আনা	=	৮ আনা			রেগে কমিটি রিপোর্ট
	নারী	৩ আনা	+	৩ আনা	=	৬ আনা			
	অপ্রাপ্ত বয়স্ক	২ আনা	+	২ আনা	=	৪ আনা			
						যোগ		দৈনিক ভাতা	
১৯৪১ :	পুরুষ	৪ আনা	+	৪ আনা	=	৮ আনা	+	০ আনা ৬ পয়সা	রেগে কমিটি রিপোর্ট
	নারী	৩ আনা	+	৩ আনা	=	৬ আনা	+	০ আনা ৬ পয়সা	
	অপ্রাপ্ত বয়স্ক	২ আনা	+	২ আনা	=	৪ আনা	+	০ আনা ৩ পয়সা	
১৯৪৪ :	পুরুষ	৪ আনা	+	৪ আনা	=	৮ আনা	+	১ আনা ০ পয়সা	রেগে কমিটি রিপোর্ট
	নারী	৩ আনা	+	৩ আনা	=	৬ আনা	+	১ আনা ০ পয়সা	
	অপ্রাপ্ত বয়স্ক	২ আনা	+	২ আনা	=	৪ আনা	+	০ আনা ৬ পয়সা	
১৯৪৫ :	পুরুষ	৬ আনা	+	৬ আনা	=	১২ আনা			ITPA Circular No. 96/48 dt. 26.10.46
	নারী	৫ আনা	+	৫ আনা	=	১০ আনা			
	অপ্রাপ্ত বয়স্ক	৩ আনা	+	৩ আনা	=	৬ আনা			
								দৈনিক ভাতা	
১৯৪৭ :	পুরুষ	৬ আনা	+	৬ আনা	=	১২ আনা	+	২ আনা	
	নারী	৫ আনা	+	৫ আনা	=	১০ আনা	+	২ আনা	
	অপ্রাপ্ত বয়স্ক	৩ আনা	+	৩ আনা	=	৬ আনা	+	১ আনা	
১৯৪৮ :	পুরুষ	৬ আনা	+	৬ আনা	=	১২ আনা	+	৫ আনা ৬ পয়সা	
	নারী	৫ আনা	+	৫ আনা	=	১০ আনা	+	৫ আনা ৬ পয়সা	
	অপ্রাপ্ত বয়স্ক	৩ আনা	+	৩ আনা	=	৬ আনা	+	৩ আনা ০ পয়সা	

বছর	শ্রমিকদের শ্রেণী বিভাগ	মূল মজুরি	অতিরিক্তদের মজুরি	সর্বমোট দৈনিক হাজিরাঃ		যোগ দৈনিক ভাতা		মিমি
১৯৫১ :	পুরুষ	৬-০ আনা	৬-০ আনা	১২ আনা	+	৭ আনা ০		
	নারী	৫-০ আনা	৫-০ আনা	১০ আনা	+	৭ আনা ০		
	অপ্রাপ্ত বয়স্ক	৩-০ আনা	৩-০ আনা	৬ আনা	+	৪ আনা ০		
								মিমি
১৯৫৩ :	পুরুষ	৬-০ আনা	৬-০ আনা	১২ আনা	+	৭ আনা ০	+	২ আনা ৬ পঃ
ফেব্রুয়ারি	নারী	৫-০ আনা	৫-০ আনা	১০ আনা	+	৭ আনা ০	+	২ আনা ৬ পঃ
	অপ্রাপ্ত বয়স্ক	৩-০ আনা	৩-০ আনা	৬ আনা	+	৪ আনা ০	+	১ আনা ৩ পঃ
৫০০ একরের নিচে চা-বাগানগুলির জন্যে :								
	পুরুষ	৬-০ আনা	৬-০ আনা	১২ আনা	+	৭ আনা	+	২ আনা ০
	নারী	৫-০ আনা	৫-০ আনা	১০ আনা	+	৭ আনা	+	২ আনা ০
১৯৫৩ :	পুরুষ	৬-০ আনা	৬-০ আনা	১২ আনা	+	৭ আনা	+	৫ আনা ৬ পঃ
মাসের ১৫	নারী	৫-০ আনা	৫-০ আনা	১০ আনা	+	৭ আনা	+	২ আনা ৬ পঃ
অক্টোবর থেকে ৫০০ একরের উপরের চা-বাগানগুলির জন্যে	অপ্রাপ্ত বয়স্ক	৩-০ আনা	৩-০ আনা	৬ আনা	+	৪ আনা	+	১ আনা ৯ পঃ
১৯৫৫ :	পুরুষ	৬-০ আনা	৬-০ আনা	১২ আনা	+	৭ আনা	+	৫ আনা ৬ পঃ
জানুয়ারি	নারী	৫-০ আনা	৫-০ আনা	১০ আনা	+	৭ আনা	+	৫ আনা ৬ পঃ
থেকে	অপ্রাপ্ত বয়স্ক	৩-০ আনা	৩-০ আনা	৬ আনা	+	৪ আনা	+	৩ আনা ৬ পঃ

বছর	শ্রমিকদের শ্রেণী বিভাগ	মূল মজুরি	অতিরিক্তদের মজুরি	দৈনিক ভাতা	মি.মি.	অতিরিক্ত হাজিরা বৃদ্ধি	সর্বমোট ক্যাশ আয়
১৯৫১ সালের	পুরুষ	০-৬২ পঃ	০-৬২ পঃ	০-৬০পঃ	—	—	১ টাঃ ৮৪ পঃ
আগস্ট মাস	নারী	০-৫৬ পঃ	০-৫৬ পঃ	০-৬০ পঃ	—	—	১ টাঃ ৭২ পঃ
থেকে	অপ্রাপ্ত বয়স্ক	০-৩৫ পঃ	০-৩৪ পঃ	০-৩১ পঃ	—	—	১ টাঃ ০০ পঃ

(এই সময়কালে ১৫/০০ প্রতি মণ চাল ও আটা দেওয়া আরম্ভ হয়)

১৯৬২	পুরুষ	০-৬২ পঃ	০-৬২ পঃ	০-৬০ পঃ	—	০-০৮ পঃ	১ টাঃ ৯২ পঃ
২৭ আগস্ট	নারী	০-৫৬ পঃ	০-৫৬ পঃ	০-৬০ পঃ	—	০-০৭ পঃ	১ টাঃ ৭৯ পঃ
থেকে	অপ্রাপ্ত বয়স্ক	০-৩৫ পঃ	০-৩৪ পঃ	০-৩১ পঃ	—	০-০৪ পঃ	১ টাঃ ০৪ পঃ
১৯৬৪	পুরুষ	০-৬২ পঃ	০-৬২ পঃ	০-৬০ পঃ	—	(০-০৮ পঃ + ৬০ পঃ)	১ টাঃ ৯৮ পঃ
১০ জুন	নারী	০-৫৬ পঃ	০-৫৬ পঃ	০-৬০ পঃ	--	(০-০৭ পঃ + ০৫ পঃ)	১ টাঃ ৮৪ পঃ
থেকে	অপ্রাপ্ত বয়স্ক	০-৩৫ পঃ	০-৩৪ পঃ	০-৩১ পঃ	—	(০-০৪ পঃ + ০৩ পঃ)	১ টাঃ ০৭ পঃ
১৯৬৬	পুরুষ	২-১৩ পঃ	সর্বমোট দৈনিক হাজিরা				
১ এপ্রিল	নারী	১-৯৬ পঃ	"				
থেকে	অপ্রাপ্ত বয়স্ক	১-১৫ পঃ	"				
১৯৬৮	পুরুষ	২-১৩ পঃ	যোগ ভি.ডি.ও.	০-১২ পঃ	সর্বমোট	২.২৫ পঃ	
১ এপ্রিল	নারী	১-৯৬ পঃ	যোগ ভি.ডি.ও.	০-১২ পঃ	সর্বমোট	২.০৮ পঃ	
থেকে	অপ্রাপ্ত বয়স্ক	১-১৫ পঃ	যোগ ভি.ডি.ও.	০-০৬ পঃ	সর্বমোট	১.২১ পঃ	

(৪০ টাকা ১৯ পয়সা দাম হিসেবে প্রতি কুইন্টাল চাল ও আটা দেওয়া হয়)



আদিবাসী নৃত্য উৎসব

জলপাইগুড়ি জেলার ১৮৮৪ সন থেকে ১৯৬৮ সন পর্যন্ত চা-বাগানের প্রতিষ্ঠার তালিকা

ক্রমিক নং	চা-বাগানের নাম	প্রতিষ্ঠার বছর	সর্বপ্রথম কোম্পানি বা পাট্টাধীন প্রথম কোম্পানির নাম
১.	গজলডোবা	১৮৮৪-৮৫	Mr. H. P. Brongham এবং Howghton.
২.	ফুলবাড়ি	১৮৮৬	Mr. Pillam
৩.	বাগরাকোট		Col. Money
৪.	রাঙাতি		Mr. North
৫.	গান্ধাভিল		Mr. Cresswell & Co. (Mr. W. S. Cresswell)
৬.	ডালিংকোট (প্রথমে ডালিমকোটের নাম সরকারি নথিপত্রে ডালিংকোট উল্লেখ করা ছিল।)		উপরোক্ত ব্যক্তিদের নামে এবং কোম্পানির প্রথমে পাট্টা প্রদান করা হয়
৭.	জলঢাকা	১৮৮৭	রহিম বক্সের নামে দীর্ঘস্থায়ী পাট্টা প্রদান করা হয়
৮.	বেতবাড়ি	১৮৮৭	
৯.	বামনডাঙ্গা	১৮৮৭	
১০.	তলেনবাড়ি	১৮৮৭	
১১.	ডামডিম	১৮৮৭	
১২.	কমলাই	১৮৮৭	
১৩.	ওয়সাবাড়ি	১৮৮৭	(এই ৬টি চা-বাগান ৫ বছরের পাট্টায় মিঃ শিলিংফোর্ড) (Mr. Sillingfrord. Mr. Sillingfrowd a Co. অনেকগুলি চা-বাগান জলপাইগুড়ি জেলাতে আরম্ভ করে।)
১৪.	কানাবাড়ি	১৮৭৮	প্রথমে Mr. Johnson নামে Land Mortgage Bank ৯.৩.১৮৭৮ সালে লিজ নেওয়া হয়। কিন্তু কলাবাড়ির ৮০০ একর জমি ডাঃ নীলরতন সরকার ও সরোজিনীকে এর পাট্টা প্রদান করা হয়। পরে এটা হস্তান্তরিত হয়।
১৫.	গুতহোবা		
১৬.	রানীচেরা		
১৭.	মানিহোবা (স্কুলবাড়ী)		
১৮.	মানাবাড়ি		
১৯.	মল্লাবাড়ি		
২০.	আলতাডাঙ্গা		
২১.	চেল		
২২.	পাটাবাড়ি (পরে পাতিবাড়ি নামে পরিচিত)		এই সকল ৮টি চা-বাগানের আবার আলতাডাঙ্গা কালীমোহন রায় ও দুর্গাবতী দীর্ঘমেয়াদি পাট্টার ৩১০ একর জমি পুনরায় বিহারীলাল গাঙ্গুলিকে হস্তান্তরিত করা হয়।
২৩.	মোগলকাটা (Magul Kata)	১৯৮৯	প্রথম বাঙালি চা-কোম্পানি—"জলপাইগুড়ি চা-কোম্পানি" পত্তন দেওয়া হয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল, এই সময় কালে জলপাইগুড়ি জেলার (বৃটিশ ভারতের) প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক জগদীশ বসুর পিতা ভগবানচন্দ্র বসু ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে ছিলেন। তিনি বাঙালিদের চা-বাগান করার বিষয়ে যথেষ্ট সহযোগিতা করতেন।
২৪.	রুপনি	১৮৭৯	জলপাইগুড়ি চা-কোম্পানির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় ২ জুন, ১৮৭৯ সালে। চেয়ারম্যান—জয়চন্দ্র সান্যাল।
২৫.	সোনগাছি	১৮৭৯	প্রথম সভায় উপস্থিত ছিলেন শ্রী মহিমচন্দ্র ঘোষ, শ্রী গোপালচন্দ্র ঘোষ, শ্রী জয়চন্দ্র সান্যাল, শ্রী কেশবচন্দ্র ঘটক, শ্রী রামচন্দ্র সেন, শ্রী হরিশচন্দ্র অধিকারী, শ্রী যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী, শ্রী মদনমোহন ভৌমিক ও মুনিস আসিরুদ্দিন মোহাম্মদ।
২৬.	নাগরাকাটা		

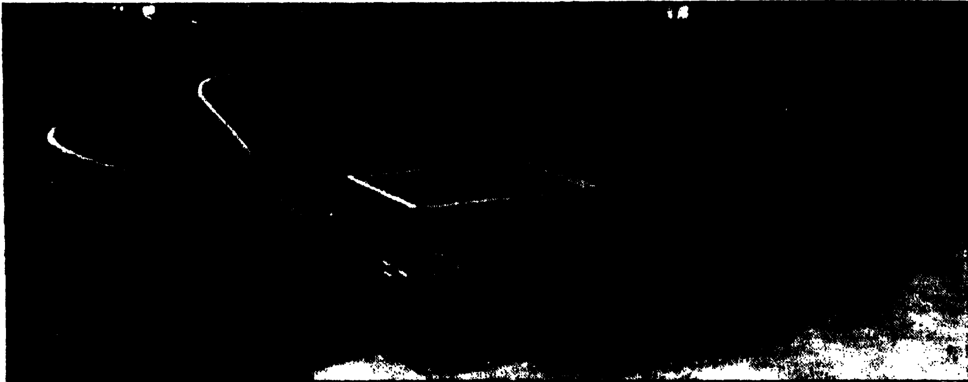
ক্রমিক নং	চা-বাগানের নাম	প্রতিষ্ঠার বছর	সর্বপ্রথম কোম্পানি বা পাট্টাধীন প্রথম কোম্পানির নাম
			প্রথম বোর্ড অব ডাইরেক্টর : শ্রী শ্রীনাথ চক্রবর্তী, শ্রী জয়চন্দ্র সান্যাল, শ্রী গোপালচন্দ্র ঘোষ, শ্রী মহিমচন্দ্র ঘোষ ও শ্রী যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী। এই চা-বাগানগুলির মধ্যে (১) রূপলি, (২) সোনগাছি ১নং, ২নং, (৩) বামনডাঙ্গা, (৪) ওয়াসাবাড়ী (extra), (৫) মালাবাড়ী (extra), (৬) বাংলাবাড়ী (extra), (৭) এলেনবাড়ী, (৮) বাগরাকোট (extration). এই কোম্পানীর প্রথম সুপারিশ টেনভোগ্য, মাইনে পেতেন-১৫০/০০ টাকা এবং তার নাম ছিল মি. লুকাস।
২৭.	হাতাই পোতা (হাতিপোতা)	১৯৮০	
	(হাতাইপাতা)	১৯৮১	
২৮.	ওড়শাবাড়ি	১৯৮১	
২৯.	নেওরানদী	১৯৮১	
৩০.	বাটাইগোল	১৯৮১	
৩১.	নিদাম	১৮৮২-৮৩	
৩২.	ক্যারন	১৮৮২-৮৩	
৩৩.	টুনবাড়ি	১৮৮২-৮৩	
৩৪.	ইয়ংটং	১৯৮৪	বাবুচন্দ্র কান্ত দাস ও প্রসন্ন কুমার দাসকে প্রথম এই চা-বাগানের দীর্ঘস্থায়ী পাট্টা দেওয়া হয়। পরবর্তীতে চা-বাগান গড়ে তোলায় সমর্থ হন এবং বিহারীলাল গাঙ্গুলি, মহিম রায় ও যাদবচন্দ্র রায়কে ৭৫৮ একর নথি প্রদান করা হয়।
৩৫.	চালোনি	১৯৮৪	
৩৬.	ইনডং	১৯৮৪	
৩৭.	ইংগু	১৮৮৪	
৩৮.	জুরনিত	১৮৮৪	
৩৯.	মূর্তি	১৮৮৪	নর্থ সিলেট টি কোঃ এই সমস্ত চা-বাগানে কাজকর্ম শুরু করলেও মূলত শিলিংফোর্ড (Sillingford family)—চা-বাগানের উন্নয়নের স্বার্থে এগিয়ে আসেন এবং নিদাম চা কোঃ, আধাতীন চা কোম্পানি মেটেনি চা কোম্পানি এসব চা-বাগানে কাজ আরম্ভ করে।
৪০.	আইভিল	১৮৮৪-৮৫	
৪১.	কিলকোট	১৮৮৪-৮৫	
৪২.	নিদিম	১৮৮৪-৮৫	নিদিম টি কোম্পানি লিমিটেড
৪৩.	মেটেলি	১৮৮৪-৮৫	Mcleod & Co. Ltd.
৪৪.	চালশা	১৮৮৪-৮৫	ডানকান এণ্ড কোম্পানী
৪৫.	সুন্তি (সুন্দরী)	১৮৮৪-৮৫	
৪৬.	অলস্টেন	১৮৮৪-৮৫	
৪৭.	ব্যাঙ্কম্	১৮৮৪-৮৫	
			সাইলি ও ব্যাঙ্কম নিদিম টি কোম্পানী লিমিটেড
৪৮.	সাইলি	১৮৮৪-৮৫	
৪৯.	চেংলি	১৮৮৪-৮৫	
৫০.	মিশগ্লাস	১৮৮৪-৮৫	
৫১.	ভুট্টাবাড়ি	১৮৮৪-৮৫	Cuncan Brothers এই চা-বাগানের আগ্রহ প্রকাশ করে এবং মাল, মেটেলির বিভিন্ন চা-বাগান আরম্ভ করে।

ক্রমিক নং	চা-বাগানের নাম	প্রতিষ্ঠার বছর	সর্বপ্রথম কোম্পানি বা পাট্টাধীন প্রথম কোম্পানির নাম
৫২.	রানী খোলা (রানীচোর)	১৯৮৪-৮৫	Ranicheorra Tea Co. Ltd. Managed by M/s. Mcleod & Co. Ltd.
৫৩.	সাতখাইয়া	১৮৮৫ ১৮৮৬	
৫৪.	রাংগাকোট (বাগ্‌রাকোট)	১৮৮৬	ডানকান এণ্ড কোম্পানি
৫৫.	বেতগুড়ি	১৮৮৬	
৫৬.	চেংমারি	১৮৮৬	বিবি রহিমননেছা স্বামী মুনিম রহিম বক্স
৫৭.	কুর্তি	১৮৮৬	
৫৮.	মাকাটি	১৮৮৬	
৫৯.	চুপাগুড়ি (চলপাগুড়ি)	১৮৮৫-৮৬	
৬০.	রাঙ্গামালি (ডাঙ্গুয়াঝার)	১৮৮৫-৮৬	
৬১.	প্রিংফিল্ড	১৮৮৫-৮৬	ডুয়ার্স টি কোঃ লিমিটেড
৬২.	সুকানিবাড়ি	১৮৮৫-৮৬	ডুয়ার্স টি কোঃ লিমিটেড
৬৩.	হোপ	১৮৮৫-৮৬	Mac Gregor
৬৪.	তন্ত্র	১৮৮৫-৮৬	
৬৫.	জিতি	১৮৮৫-৮৬	
৬৬.	মালনদী	১৮৮৫-৮৬	বিবি রহিমানেছা স্বামী রহিম বক্স
৬৭.	রাঙ্গাতি (রাংগেট)	১৮৮৫-৮৬	নিদিমা টি কোম্পানি লিমিটেড
৬৮.	গুরজন ঝোরা	১৮৮৫-৮৬	গুরজন ঝোড়া টি কোম্পানি লিমিটেড
৬৯.	নাগরাকাটা	১৮৮৫-৮৬	
৭০.	ঘাটিয়া	১৮৮৫-৮৬	যদিও প্রথমে বাবু বিনোদবিহারী দত্ত দীর্ঘস্থায়ী পাট্টা পান, কিন্তু পরবর্তীকালে ডুয়ার্স টি কোম্পানি লিমিটেডে হস্তান্তরিত হয়।
৭১.	ভগতপুর	১৮৮৫-৮৬	
৭২.	লুকমান	১৮৮৫-৮৬	
৭৩.	ফরেস্টহিল (নিদাম)	১৮৮৫-৮৬	নিদাম টি কোম্পানি
৭৪.	চালোনি	১৮৮৫-৮৬	
৭৫.	গ্লেনকোং	১৮৮৭	
৭৬.	পাথরঝোরা	১৮৮৭	ডানকান সেঞ্চুরি কোম্পানি
৭৭.	বুজি (কোন)	.১৮৮৭	
৭৮.	মোদিবাড়ি	১৮৮৭	
৭৯.	চৌমারি (নতুন অংশ)	১৮৮৯	
৮০.	গ্রাসমোর	১৮৮৯	
৮১.	সাউগাও (বাগরাকোট)		ডানকান সেঞ্চুরি
৮২.	টেলি (তেলিপাড়া)	১৮৯০	
৮৩.	গয়েরকাটা (আংগার শাখা)	১৮৯০	
৮৪.	মুজগাই	১৮৯০	আঞ্জুমান টি কোম্পানি লিমিটেড
৮৫.	মাকরাপাড়া	১৮৯১	আঞ্জুমান টি কোম্পানি লিমিটেড
৮৬.	হান্টুপাড়া	১৮৯১	ডানকান এণ্ড সেঞ্চুরি কোম্পানি
৮৭.	বান্দাপানি	১৮৯২	আঞ্জুমান টি কোম্পানি লিমিটেড
৮৮.	লংতাপাড়া		ডানকান এণ্ড সেঞ্চুরি কোম্পানি
৮৯.	চামুর্চি		চামুর্চি টি কোম্পানি লিমিটেড (১৮৯১)
৯০.	তোপাড়া (তোতাপাড়া)		আমলা মদরপুরের সাহা কোম্পানি

ক্রমিক নং	চা-বাগানের নাম	প্রতিষ্ঠার বছর	সর্বপ্রথম কোম্পানি বা পাট্টাধীন প্রথম কোম্পানির নাম
৯১.	বেতালগুড়ি (১)	১৮৯৪	
৯২.	চুনাভাটি	১৮৯৪	
৯৩.	বেতালগুড়ি (২)	১৮৯৪	
৯৪.	নিউল্যান্ডস	১৮৯৪	আমাম ডুয়ার্স কোম্পানি লিমিটেড
৯৫.	ডুডুমারি		
৯৬.	গ্যান্দ্রাপাড়া	১৮৯৪	ডানকান ও ফিনলে কোম্পানি
৯৭.	চুয়াপাড়া		
৯৮.	নাগাটি (নাখাটি)		
৯৯.	রাঙ্গামাটি		
১০০.	তোর্ষা		নিদিম টি কোম্পানি লিমিটেড
১০১.	কাঠালগুড়ি	১৮৯৫	কাঠাল টি কোম্পানি লিমিটড (১৮১৫)
১০২.	বানারহাট	১৮৯৫	
১০৩.	কারবালা	১৮৯৫	অ্যাস্তুইল
১০৬.	জয়ন্তী	১৮৯৫	
১০৭.	মোদিবাড়ি	১৮৯৬	অসম ডুয়ার্স টি কোম্পানি লিমিটেড
১০৮.	চুনিয়াঝোরা	১৮৯৬	চুনিয়াঝোরা টি কোম্পানি লিমিটেড
১০৯.	রডদিঘি	১৮৯৬	সার ডিন হ্যান্ডারসন লিমিটেড
১১০.	দুরল্লা ও গুয়াবাড়ী	১৮৯৬	দীর্ঘমিয়াদি (মেয়াদি) পাট্টা পেলেও পরে বাতিল করা হয়।
১১১.	পলামবাড়ী (১নং)	১৮৯৬	পরে নিউ ডুয়ার্সের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়
১১২.	হাসিমারা (৭নং)	১৮৯৬	
১১৩.	কালচিনী	১৮৯৬	
১১৪.	রহিমাবাদ	১৮৯৬	মুন্সি রহিম বক্স
১১৫.	বীরবাড়া, কিরবিটি ও অন্যান্য	১৮৯৬	ডানকান
১১৬.	গ্যারগাণ্ডা	১৮৯৭	
১১৭.	পুরুতিঝোড়া	১৮৯৭	
১১৮.	মাটিজঝোড়া	১৮৯৭	
১১৯.	লক্ষ্মীপাড়া	১৮৯৭	ডানকান সেঞ্চুরি
১২০.	রোড } পরবর্তীকালে গয়ের কাটা	১৮৯৭	পরে এই চা-বাগানের কোনও অস্তিত্ব ছিল না বলেই মনে হয়।
১২১.	শ্যামঝোড়া	১৮৯৭	গিলিনডার্স আরহানট অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড (Gillinders Arhunt & Co. Ltd.)
১২২.	কালচিনি	১৮৯৭	
১২৩.	দলগাও	১৮৯৭	ডানকান এণ্ড সেঞ্চুরি ফ্যামিল্রল
১২৪.	দলমণি	১৮৯৭	নিদিম টি কোম্পানি
১২৫.	দলসিংপাড়া	১৮৯৭	
১২৬.	ভুটান ডুয়ার্স	১৮৯৭	
১২৭.	রায়ডাক	১৮৯৭	জারডিন অ্যাণ্ড হেন্ডারসন
১২৮.	বিন্নাগুড়ি	১৮৯৮	
১২৯.	দেবপাড়া	১৮৯৮	দেবপাড়া টি কোম্পানি লিমিটেড
১৩০.	লংকাপাড়া	১৮৯৮	

ক্রমিক নং	চা-বাগানের নাম	প্রতিষ্ঠার বছর	সর্বপ্রথম কোম্পানি বা পাট্টাধীন প্রথম কোম্পানির নাম
১৩১.	আহাবাড়ি (আমবাড়ি)	১৮৯৮	সাহা এবং কোম্পানি
১৩২.	ফাসখোয়া (কালীখোলা)	১৮৯৮	
১৩৩.	গাল্লুপাড়া (গাড়ুপাড়া)	১৮৯৮	
১৩৪.	গানন্দ্রাপাড়া (Gandrapara)	১৮৯৮	
১৩৫.	রাঙাবাড়ি	১৮৯৮	সেন্ট্রাল ডুয়ার্স টি কোম্পানি
১৩৬.	দলসিংপাড়া	১৮৯৮	সেন্ট্রাল ডুয়ার্স টি কোম্পানি
১৩৭.	রাঙ্গামাটি ২নং	১৯০১-১৯০২	
১৩৮.	নাগরাকাটা	১৯০১-১৯০২	
১৩৯.	বড়দিঘি ২নং (টিলাবাড়ী)	১৯০১-১৯০২	জারডিন হেন্ডারসন কোম্পানি
১৪০.	বেতগুড়ি	১৯০১-১৯০২	নিদিম টি কোম্পানি
১৪১.	ডিমডিমা	১৯০১-১৯০২	
১৪২.	বেতগুড়ি	১৯০১-১৯০২	
১৪৩.	গুরজন ঝোরা	১৯০১-১৯০২	
১৪৪.	কালচিনি	১৯০১-১৯০২	
১৪৫.	হাতিপোতা	১৯০১-১৯০২	
১৪৬.	ধোয়ালা	১৯০১-১৯০২	
১৪৭.	তামাটি	১৯০১-১৯০২	
১৪৮.	দলমনি	১৯০১-১৯০২	
১৪৯.	ভাতখাওয়া	১৯০১-১৯০২	M/s. Bhath Kawa Tea Co. Ltd. Managed by Macleod & Co. Ltd.
১৫০.	কুমলাই		
১৫১.	এমারায়াল	১৯০৪	অসম ডুয়ার্স টি কোম্পানি লিমিটেড
১৫২.	রূপাই	১৯০৪	
১৫৩.	আটিয়াবাড়ি	১৯০৪	
১৫৪.	বাটাইগোল	১৯০৬	
১৫৫.	ধূমচিপাড়া	১৯০৭	
১৫৬.	দলসোর	১৯০৭	
১৫৭.	রামঝোরা	১৯০৭	
১৫৮.	তুরতুরি	১৯১০	Macleod & Co. Ltd.
১৫৯.	রাজাভাত ২নং	১৯১০	
১৬০.	ডামডিম ২নং	১৯১১	
১৬১.	দেবপাড়া	১৯১১	
১৬২.	ডায়না	১৯১১	
১৬৩.	লক্ষ্মীপাড়া	১৯১২	ডানকান অ্যান্ড কোম্পানি
১৬৪.	গোয়ালপুর	১৯১৩	
১৬৫.	লুসেনাবাদ	১৯১৩	
১৬৬.	জয়বীরপাড়া	১৯১৩	
১৬৭.	চেকসাপাড়া	১৯১৩	
১৬৮.	নিমতিঝোরা	১৯১৩	
১৬৯.	পলাশবাড়ি	১৯১৩	
১৭০.	রিয়াবাড়ি	১৯১৩	
১৭১.	রাধারানী	১৯১৩	

ক্রমিক নং	চা-বাগানের নাম	প্রতিষ্ঠার বছর	সর্বপ্রথম কোম্পানি বা পাট্টাধীন প্রথম কোম্পানির নাম
১৭২.	পাটকাপাড়া	১৯১৫	
১৭৩.	ধওল্লাঝোরা	১৯১৫	
১৭৪.	কোহিনুর		
১৭৫.	সরস্বতী	১৯১৭	
১৭৬.	শানিভেলি (জয়পুর)	১৯১৮	
১৭৭.	মাঝের ডাব্‌রি	১৯১৯	
১৭৮.	সাতালি	১৯১৯	
১৭৯.	মথুরা (সারদা)	১৯১৯	
১৮০.	বিটরি (হাম্‌টাপাড়া)	১৯১৯	
১৮১.	ব্যরণ	১৯১৯	
১৮২.	মরাঘাট	১৯১৯	Maraglet Tea (Nagdola Tea Co & Ltd.)
১৮৩.	রেড ব্যাঙ্ক	১৯১৯	
১৮৪.	নাংচোলা	১৯২৩	
১৮৫.	এথেনবাড়ি	১৯২৪	
১৮৬.	হরতালগুড়ি	১৯২৪	
১৮৭.	বাতাবাড়ি	১৯২৬	
১৮৮.	যাদবপুর	১৯২৬	
১৮৯.	মালহাটি	১৯২৭	
১৯০.	শ্রীনাথপুর	১৯২৭	
১৯১.	আনন্দপুর	১৯২৭	
১৯২.	কাদম্বিনী	১৯২৮	
১৯৩.	মধু	১৯২৯	
১৯৪.	লক্ষ্মীকান্ত	১৯২৯	
১৯৫.	রহিমপুর-২	১৯২৯	
১৯৬.	সৌদামিনী	১৯৩০	
১৯৭.	গোপীমোহন	১৯৩০	
১৯৮.	নেপুচাপুর	১৯৩৩	
১৯৯.	সুরেন্দ্রনগর	১৯৬৮	ধীরেন্দ্রলাল ভৌমিক
২০০.	ধরণীপুর	১৯৬৮	



জলপাইগুড়িতে বেতশিল্প : বেতের তৈরি ব্যবহার্য সামগ্রী

১৮৭৯ সালে—১০টি চা-বাগানের জন্যে জমি লিজ দেওয়া হয়। এই দশটি চা-বাগানের পরিচালকবৃন্দ বাঙালি। নামকরণ করা হয়—'জলপাইগুড়ি টি কোম্পানি লিমিটেড'

চেয়ারম্যান জয়চন্দ্র সান্যাল

উপস্থিত সদস্যদের নাম : মহিমচন্দ্র ঘোষ
গোপালচন্দ্র ঘোষ
জয়চন্দ্র সান্যাল
কেশবচন্দ্র ঘটক
রামচন্দ্র সেন
হরিশচন্দ্র অধিকারী
যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী
মদনমোহন ভৌমিক
মুনিম আমিরুদ্দন মোহম্মদ

প্রথম যান্মাসিক বোড; অব ডিরেক্টরদের সভা হয় ১৩.৭.৭৯ তারিখে।

প্রথম পরিচালকবৃন্দের নাম : শ্রীনাথ চক্রবর্তী
জয়চন্দ্র সান্যাল
গোপালচন্দ্র ঘোষ
মহিমচন্দ্র ঘোষ
যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী

সর্বমোট ৫ (পাঁচ) জন ছিলেন চা-বাগান নিখোঁজ ৯টি চা-বাগানের পরিচালক : এদের দীর্ঘমেয়াদি চা-বাগান করার পাট্টাও দেওয়া হয় ১৮৭৯ সালে। বাগানগুলির নাম :

(১) রূপনি (খুবসম্ভবত রূপনি চা-বাগান)
(২) সোনগাছি ১ ও ২
(৩) বামনডাঙ্গা অতিরিক্ত পরবর্তী ব্যাপ্তিসহ
(৪) ওয়াসাবাড়ি ১ + ২ ঐ
(৫) মানাবাড়ি ১ + ২ ঐ
(৬) নাগরাকাটা
(৭) বালাবাড়ি পরবর্তীকালের অতিরিক্ত ব্যাক্তিসহ
(৮) এলেনবাড়ি (II) ঐ
(৯) বাগরাকোট (VII) ঐ

এই সর্বপ্রথম ৩০ (ত্রিশ) বছরের দীর্ঘ চা-বাগানের প্রথম দেওয়া ১৯৭৬ সালে। ১৯৮১ সালে মোট ১০টি দীর্ঘস্থায়ী মেয়াদী চা-বাগানের পাট্টা প্রদান করা হয়। হাতাই পোতা (হাতিপোতা), ওদলাবাড়ি, বাটাই গেল এবং নেওরাবাদী চা-বাগানের মর্যাদা পায়।

১৮৮২ সালে দু'জন ভারতীয় মহিলা—বিবি মেহেন্দুনেছা এবং বিবি গুলাবজান চেংমারি তালুকে ৭৭৭.৪২ একর জমির পাট্টা মঞ্জুর হয়। পরবর্তী নানা কারণে সেই দীর্ঘস্থায়ী / দীর্ঘমেয়াদি পাট্টা বাতিল করে ১৮৮৮ সালে মি. জে এন্ডারসন পাট্টা যাদের ইতিমধ্যে ক্যারম (Carram) চা-বাগানে দীর্ঘমেয়াদি পাট্টা প্রদান করা হয়েছিল।

১৮৮৩ সাল

১৮৮৩ সাল চা-বাগান করার প্রশ্নে গতিশীলতা খানিক শান্ত হলও 'টুগাড়ি' চা-বাগান আরম্ভ হয়। দু'জন বাঙালি বাবু চন্দ্রকান্ত দাস ও বাবু প্রসন্নকুমার দাস ইংটং ও চালোনি চা-বাগান আরম্ভ করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁদের চা-বাগানের অভিজ্ঞতা না থাকায় চালসা চা-বাগান কোম্পানি লিমিটেডের নিকট হস্তান্তর করেন।

	বিহারীলাল গাঙ্গুলি, মহিমচন্দ্র রায় ও জগৎচন্দ্র রায় ৭৫৮ একর চাষের জমি পেয়েও শেষ পর্যন্ত ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। ইতি মিস্টার শিলিংফোর্ড ও তাঁর পরিবারবর্গ মাল, চালসা ও নাগরাকাটা চা-শিল্প গড়ে তোলার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। অনেকগুলি চা-বাগানের জন্যে দীর্ঘমেয়াদি পাট্টা সংগ্রহ করেন। নিদিম টি কোম্পানি, আইভিল টি কোম্পানি লিমিটেড, মেটেলি টি কোম্পানি লিমিটেড ধীরে ধীরে এলাকা বাড়াতে থাকে। ইতিমধ্যে নর্থ সিলেট টি কোম্পানি লিমিটেড অনেকগুলো চা-বাগান করার আয়োজন করে, শেষ পর্যন্ত হস্তান্তর করতে বাধ্য হয়। নিচের চা-বাগানগুলি ১৮৮৪ সালে স্থায়িত্ব লাভ করে। (১) ইয়ংটং (২) চালোনি (৩) নাগাইশুড়ি (৪) ইংগু (৫) সুরন্তি (৬) আইভিল (৭) কিলফোট (৮) নিদিম (৯) মেটেলি (১০) অলস্টোন (নিদিম টি কোম্পানি লিমিটেড) (১১) আনড্রি সেঞ্চুরি, (১২) ব্যাঙ্ক (১৩) আইলি } (নিদিম টি কোম্পানি লিমিটেড) (১৪) মীনগ্লাস (মিনগ্লাস) এই সময় চা-বাগানের উদ্যোগে ডানকান কোম্পানি (ব্রাদার্স)-এর আবির্ভাব এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। মিনগ্লাস, হোপ, দিতি এবং চালোনিতে চা-বাগান আরম্ভ হয়ে গেছে। রোপণের কাজ প্রায় সমাপ্ত হয়ে যায়।
১৮৮৫ সাল	এই সময়ে মোট ১৬টি চা-বাগান করার সরকারিভাবে দীর্ঘমেয়াদি জমির ব্যবস্থা পেলেও মাত্র নিম্নোক্ত ৭ (সাত) চা-বাগানে রোপণের এবং অন্যান্য কাজ আরম্ভ হয়। এই বাগান সাতটির নাম হলো : (১) বেতাগুড়ি (২) রাঙ্গাকোট (বাগ্‌রাকোট) (৩) চেংমারি (৪) নাখাটি (৫) কুর্তি (৬) ইনডং (৭) চাপাগুড়ি (নিদিম টি কোম্পানি লিমিটেড)
১৮৮৬ সাল	১৮৮৬ সালে জীতি ও চিনোনি ছাড়াও অনেকগুলো চা-বাগান আরম্ভ হয়। বিবি রহিমেনেছার (মুন্সি রহিম বক্সের স্ত্রী) মালনদী নামক চা-বাগানের কাজ ৩২৯ একর জমির উপর দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলে। এই বছর মেসার্স নর্দার্ন বেঙ্গল টি করপোরেশনের পক্ষে স্থায়ী এবং দীর্ঘমেয়াদি পাট্টা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। গুরজনঝোরা চা-বাগান ৭৯৯.৩৪ একরের দীর্ঘমেয়াদি জমির পাট্টা পেয়ে যায়। রাঙ্গার্ড, ফরেস্ট হিল,

নাগরাকাটা, স্প্রিংফিল্ড, সুকানবস্তি, হোপ, ভরতপুর, লুকশান, ঘাটিয়া ও টন্ডু চা-বাগানের কাজ এই বছর (১৯৮৬) আরম্ভ হয়ে যায়।

১৮৮৭ সালে পাথরঝোরা, ও গ্লানকো চা-বাগানের কাজ শুরু হয়ে যায়।

১৮৮৮-৮৯ সালে রহিম বক্সের চা-বাগানের অগ্রগতি সবারই নজর কেড়ে নেয়। তাঁর চা-শিল্প গড়ার কাজ সবারই প্রশংসা কুড়িয়ে নেয়া—চা-শিল্প গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। চেংমারি তালুকে ৪৬৮ একর জমিতে চা-বাগান করার অনুমোদন লাভ করেন।

এই উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো ডানকান গ্রুপ চা-বাগানে ব্যবসায়িক 'ভিত' প্রতিষ্ঠা করে নেয়। ডুয়ার্সে বহু দেশি-বিদেশি কোম্পানি চায়ের উদ্যোগে অংশ নেয়। এদের মধ্যে মিস্টার ফিসারের নাম উল্লেখযোগ্য। চায়ে বিদেশিদের পুঁজি বিনিয়োগ করার প্রবণতা উল্লেখযোগ্য। মিস্টার ওয়ান্টার ডানকান বিলেত থেকে চায়ের কর্মকাণ্ড যাচাই করতে ভারতে আসেন এবং ডানকান গ্রুপের কাজ দ্রুতগতিতে বাড়তে থাকে।

এই সময়কাল : ভারতীয়দের নিকট বিশেষত বাঙালি চা-উদ্যোগীদের পক্ষেও স্বর্ণযুগ বলা চলে। কেননা—এই সময়কালে বিশ্ববিখ্যাত বাঙালি বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বোসের পিতা প্রয়াত ভগবানচন্দ্র বোস জলপাইগুড়ি জেলার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে চা-চাকরিতে যোগদান করেন। জলপাইগুড়ি জেলায় ভারতীয়দের চা-বাগান করার ক্ষেত্রে তাঁর প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ সহযোগিতার ভূমিকা অনস্বীকার্য।

আমাদের এই ব্যক্তির প্রতি যে শ্রদ্ধা ও মর্যাদা দেওয়া উচিত ছিল, যে কারণেই হোক তা থিতিয়ে পড়ে। কিন্তু তার সহযোগী মনোভাব এবং ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করা গেছে—ভারতীয়দের ঐক্যবদ্ধ করে চা-শিল্প গড়ে তোলার উদ্দেশ্য থেকেই। এই ব্যক্তির জলপাইগুড়ি জেলায় অবস্থান কর্মসূচি কর্মকাণ্ডকে ইংরেজদের কর্মচারী হিসেবে দেখা উচিত নয়। ইংরেজ শাসকদের ভ্রূকুটি ও রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে ভারতীয়দের জন্যে তিনি যোগ্য ভূমিকা পালন করে গেছেন।

লেখক ❑ শ্রমিক আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক ও গণ-আন্দোলনের নেতা।



চা-বীজ ও অধিক ফলনের লক্ষ্যে ছেঁটে দেওয়া চা-গাছ (PRUNNING)

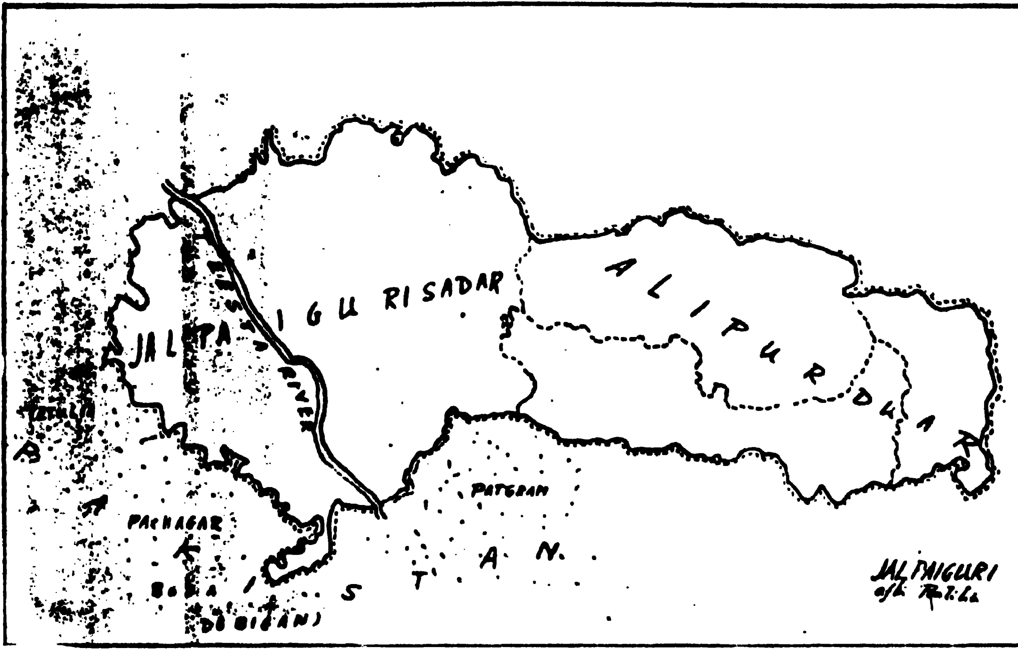


মুকুলেশ সান্যাল

জলপাইগুড়ি জেলায় স্বাধীনতা আন্দোলন

জাতীয় পর্যায়ে স্বাধীনতা আন্দোলন নিয়ে বিদ্যায়তনিক গবেষক-পণ্ডিতরা অসংখ্য গ্রন্থ, প্রবন্ধ, নিবন্ধ প্রকাশ করলেও জেলা পর্যায়ে এই বিষয় নিয়ে তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু লেখা হয়নি। কলকাতা সন্নিহিত জেলাগুলি নিয়ে অবশ্য কিছু কিছু লেখা প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু দূর মফস্বল জেলা বিশেষত যে সব জেলা দেশ বিভাজনের সময় বিভাজিত হয়েছে ; সেই সব জেলা নিয়ে মুদ্রিত লেখার সংখ্যা আঙুলে গোনা যাবে। পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশের প্রান্তিক জেলা জলপাইগুড়ি সম্পর্কেও একথা বললে বোধ হয় অত্যুক্তি করা হবে না। কিছু স্মৃতিচারণাধর্মী লেখা, কিছু স্বাধীনতা আন্দোলকদের লেখা এবং কিছু অপেশাধারী লেখকদের লেখা ছাড়া এ বিষয়ে ইংরেজি বা বাংলাভাষায় প্রকাশিত লেখা নেই বললেই বোধ হয় যথার্থ বলা হবে। জেলার স্বাধীনতা আন্দোলন নিয়ে ব্যাপক চর্চা না হওয়ার একটি কারণ সম্ভবত দেশ বিভাজন ও এই জেলার বিভাজন। এই চাপিয়ে দেওয়া ঘটনার জন্য স্বাধীনতা সৈনিকরা কেউই মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলেন না। যাই হোক এভাবে আলোচনার অভ্যন্তরে প্রবেশ করা যাক।

স্বাধীনতা আন্দোলন বিষয়ক আলোচনার সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো যে কবে থেকে এই আন্দোলন শুরু হয়েছিল, তা নিয়ে ইতিহাসবেত্তাদের মধ্যে তীব্র মতবিরোধ রয়েছে। তাছাড়া একে স্বাধীনতা আন্দোলন, না সংগ্রাম বলব, তা নিয়েও বিতর্ক রয়েছে পণ্ডিত সমাজের মধ্যে। এই সব বিতর্ক ছাড়াও স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস রচনার একটি বড় অসুবিধা হলো আন্দোলকদের একটি অংশ এখনও জীবিত রয়েছেন অথবা আন্দোলকদের পরিবার এখনও রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। এরূপ ক্ষেত্রে পক্ষপাতহীন ইতিহাস রচনা করা কখনও কখনও সম্পূর্ণাঙ্গভাবে সম্ভব হয় না। সর্বোপরি সাড়ে আট লক্ষ লোকের (১৯৪২ সালের জনগণনা অনুযায়ী) জেলার স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস সাড়ে আট পৃষ্ঠায়



জলপাইগুড়ি মানচিত্র

শেষ করা কি সম্ভব? স্বাভাবিকভাবেই জেলার সকল স্বাধীনতা সংগ্রামীর এবং শহিদের পরিচয় প্রদান করা সম্ভব হবে না। একজন দীন স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসেবে এই অবস্থা মেনে নিতে আমার খুবই কষ্ট হচ্ছে। তবু কর্তব্যের খাতিরে আমাকে একাজ করতে হচ্ছে। তাই আমি দেশমাতৃকার সেইসব সুসন্তানের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে আলোচনা শুরু করছি।

ইংরেজবিরোধী আন্দোলন বা ঔপনিবেশিক-বিরোধী আন্দোলন বা জাতীয় বা স্বাধীনতা আন্দোলন বা সংগ্রাম যাই বলি না কেন, তা ভারতবর্ষের সর্বত্র একই সময়ে যেমন শুরু হয়নি তেমনি জেলাগুলিতেও। চট্টগ্রাম, বরিশাল, মেদিনীপুর বা কলকাতা-ঢাকাতে যেভাবে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল, জলপাইগুড়িতে তা পড়েনি। কারণ তার ভৌগোলিক অবস্থান, জনবিন্যাস ও মনন কাঠামো এবং প্রশাসনিক বিন্যাস ছিল একটু স্বতন্ত্র। যেমন জেলাটির একটি অংশ ছিল Non-Regulation প্রথার আওতায়। আর একটি অংশ ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আওতায়। স্বাভাবিক কারণেই আন্দোলন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এলাকাতেই বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ ছিল। জেলার জনবিন্যাসের বৈচিত্র্যও লক্ষণীয়। যেমন চা-বাগানের বহিরাগত আদিবাসী শ্রমিক, শহরের বহিরাগত পেশাদারি শ্রেণী (উকিল-মোক্তার-ডাক্তার-শিক্ষক-প্রশিক্ষক), স্থানীয় রাজবংশী ক্ষত্রিয়, মেচ, রাভা, কোচ প্রভৃতি জনগোষ্ঠীসমূহ।

ইংরেজ কোম্পানির শাসনের সূচনা পর্ব থেকেই এ অঞ্চলে বিদ্রোহ-অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ ঘটতে শুরু করেছিল। সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহ ও রংপুর কৃষক বিদ্রোহের ছোঁয়া লেগেছিল এই জেলাতেও। কারণ, এ সময় এ জেলার একটি অংশ রংপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের ইংরেজ শাসন-বিরোধী আনন্দমঠ ও দেবী চৌধুরানী উপন্যাসদ্বয়ে এ অঞ্চলের জনপদ ও ব্যক্তিত্ব স্থান পেয়েছে। সিপাহি বিদ্রোহ পর্বে এখানকার মিলিটারি ক্যান্টনমেন্টে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল বলে সমসময়ের তথ্য থেকে জানা যায়।

আধুনিক কালের রাজনৈতিক আন্দোলনের সূত্রপাত জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর থেকে শুরু হয়েছিল বলে ইতিহাসবিদ্‌রা অভিমত ব্যক্ত করেছেন। অবশ্য জেলা পর্যায়ে এর সূত্রপাত ঘটেছিল পৌরসভা প্রতিষ্ঠার পরে। যদিও পৌরসভার মনোনীত চেয়ারম্যানই দীর্ঘদিন কাজ করেছেন। তবুও আধুনিক রাজনীতির হাতেখড়ি পৌর রাজনীতির মাধ্যমেই মফস্বল শহরে বিস্তৃত হয়েছিল বলে গবেষকদের ধারণা। জলপাইগুড়িতেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। জলপাইগুড়িতে আধুনিক সভাসমিতি প্রথম স্থাপিত হয়েছিল ১৮৮৩ সালে। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির প্রতিষ্ঠিত এই সমিতির শাখা জলপাইগুড়িতেও ছিল। এর পরেই নাম করতে হয় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের। এই জেলায় কংগ্রেসের শাখা ১৯২০ সালে স্থাপিত হয়েছিল। এই শাখার সভাপতি ছিলেন রাজা জগদীন্দ্রদেব রায়কত এবং সম্পাদক ছিলেন বিশিষ্ট ব্যবহারজীবী জ্যোতিষচন্দ্র সান্যাল। তবে কংগ্রেসের একটি সার্কেল জলপাইগুড়িতে ১৮৯১ সালেই স্থাপিত হয়েছিল বলে মধুপর্নী পত্রিকার জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যার 'সংখ্যা-সম্পাদক' ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ 'সংখ্যা সম্পাদকের নিবেদন' অংশের লেখায় উল্লেখ করেছেন। এই সার্কেলের সেক্রেটারি ছিলেন বাবু উমাপতি রায়। এটি অবশ্য জেলা শাখা ছিল না।

যাই হোক এই সূত্রেই এই শহর থেকে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে প্রতিনিধি হিসেবে কেউ কেউ উপস্থিত হয়েছেন বিভিন্ন সময়ে।

ইংরেজ শাসন-বিরোধী আন্দোলনের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটেছিল বঙ্গ-ভঙ্গের সময়। জলপাইগুড়ি শহরে দিনবাজারে বিলাতি কাপড় পোড়ানোর চেষ্টা হয়েছিল। পুলিশ লাঠি চালিয়েছিল। দুর্গাদাস চক্রবর্তী, আদ্যনাথ মিশ্র এবং অন্নদা বিশ্বাস ধরা পড়লেন। দুসপ্তাহ কারাবাস হলো। চণ্ডীদাস চক্রবর্তী, প্রিয়নাথ গোস্বামী ছিলেন অপেক্ষাকৃত কমবয়সী ; তাঁদের পুলিশ ধরতে পারেনি। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার সময় তাঁদেরকে জেল-গেটে সংবর্ধনা জানাতে যোগেশচন্দ্র ঘোষ তরুণদের নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন।

এই পর্বের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো উকিল দুর্গাচরণ সান্যাল কর্তৃক হিলি স্টেশনে দুই ইংরেজের জখম হওয়া। এর ফলে তাঁর জেল হলো। সে সময়ের দেশীয় সংবাদপত্র এ ব্যাপার নিয়ে হইচই ফেলে দিয়েছিল। এই বছরেই আর্যনাট্য সমাজ অঙ্গনে জাতীয়

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শশীকুমার নিয়োগী, জয়চন্দ্র সান্যাল, মাধব সান্যাল, ঈশানচন্দ্র দাশগুপ্ত, তারিণীপ্রসাদ রায়, তারাপ্রসাদ বিশ্বাস, সুরেশ্বর সান্যাল, শশীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ মৌলিক, অন্নদাচরণ সেন প্রমুখ ব্যক্তির উদ্যোগে ব্রিটিশ শিক্ষা ব্যবস্থাকে সেদিন চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল। জাতীয় বিদ্যালয় উদ্বোধন করেছিলেন রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ও বিনয় সরকার। বঙ্কুবিহারী পাল, জ্যোতিষচন্দ্র সান্যাল, জ্যোতিরিন্দ্র সিংহ, পঞ্চানন চক্রবর্তী, চুনীলাল প্রামাণিক ও মাখনলাল ভৌমিক এই বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন সত্যেন বিশ্বাস, কুমুদিনীকান্ত চক্রবর্তী, তারানাথ ঘটক, মহেন্দ্র ঘটক, জয়চন্দ্র চক্রবর্তী, সতীশ ঘোষ, মোহনলাল রায়, পূর্ণ বাগদি, অবিনাশ সান্যাল, প্রফুল্ল সান্যাল, প্রাণতোষ সান্যাল, পঞ্চানন নিয়োগী, সতীশ বসু, হরেন ভৌমিক, সুরেশ মৈত্র, বীরেন মুখার্জি ও রমেশ মুখার্জি প্রমুখ। এছাড়া বিলেতি বস্ত্রের বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে শিল্প সমিতি পাড়ায় কাপড়ের কল তৈরি হয়েছিল। যজ্ঞেশ্বর সান্যাল জাপান থেকে কাপড় বয়ন শিখে এসেছিলেন। স্বদেশি ভাণ্ডার—যুবক ভাণ্ডার খোলা হয়েছিল। কিশোরী মৌলিক, অক্ষয় মৌলিক, মাখন ভৌমিক, শরৎ সেন, জিতেন রায় এই দোকান চালাতেন।

দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য অন্য একটি ধারাও ক্রমশ রূপ পেতে শুরু করেছিল। এই ধারাটি হলো সশস্ত্র বিপ্লবী ধারা। জলপাইগুড়িতেও এই ধারা বিস্তৃত হতে শুরু করেছিল। বিভিন্ন গুপ্ত সমিতি এই ধারার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। জলপাইগুড়িতে নর্থবেঙ্গল গ্রুপের শাখা স্থাপিত হয়েছিল। এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন পঞ্চানন নিয়োগী, সতীশ ঘোষ, পূর্ণদাস মোক্তার, অন্নদা বিশ্বাস, মহেন্দ্র সরকার, দুর্গাদাস চক্রবর্তী, জীবন রায়, বীরেন দত্তগুপ্ত, উপেন রায়, শচীন মজুমদার, সীতানাথ প্রামাণিক, যোগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, মাধব সান্যাল, অন্নদাচরণ সেন, যোগেশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ। নিদাসও মোগলকাটা চা-বাগান অফিস থেকে বন্দুক চুরি গেল। ভুটান রাজ্যের সীমান্তে গিয়ে এঁরা কুচকাওয়াজ শিখতেন, কিন্তু কোনো সমিতিই বেশিদিন টেকেনি।

এই সময়ের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো ১৯১১ সালে কলকাতা হাইকোর্টের ভিতরে সি আই ডি-র ডেপুটি সুপারিনটেন্ডেন্ট সামসুল হককে হত্যা করেছিলেন জলপাইগুড়ির বিপ্লবী কিশোর বীরেন দত্তগুপ্ত। বিচারে তাঁর ফাঁসির হুকুম হলো। শহিদের মৃত্যুবরণ করলেন তিনি। বলা যেতে পারে বীরেন দত্তগুপ্তই জলপাইগুড়ির প্রথম শহিদ।

১৯২০ সালে সারা দেশের সঙ্গে জলপাইগুড়িতেও অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়েছিল। এই আন্দোলনের সূত্রে জলপাইগুড়িতে ১৯২০ সালে জাতীয় কংগ্রেসের জেলা শাখা গড়ে উঠেছিল। এই শাখার সভাপতি দিনেশ, জগদিন্দ্রদেব রায়কত এবং সেক্রেটারি ছিলেন বিশিষ্ট ব্যবহারজীবী জ্যোতিষচন্দ্র সান্যাল। জেলা কংগ্রেসকে জনমুখী এবং জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে জনমত গড়ার উদ্দেশ্যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ১৯২০ সালের নভেম্বর মাসে জলপাইগুড়ি এসেছিলেন। রায়কতপাড়ার রায়কত-বাড়ির বিস্তীর্ণ মাঠে হাজার হাজার নরনারীর উপস্থিতিতে দেশবন্ধু আবেগদীপ্ত ভাষণ দেন। দেশবন্ধুর বক্তৃতা শুনে গণেশ সান্যাল মহাশয় আইন ব্যবসায়ে ইস্তফা দিলেন। জগদীন্দ্রদেব রায়কত 'অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটের' পদে ইস্তফা দিলেন। তরুণ খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এই সময়েই সার্বক্ষণিক কংগ্রেসকর্মী হিসেবে স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। তরুণ চিকিৎসক ডাঃ চারুচন্দ্র সান্যাল গবেষণার কাজ ছেড়ে কংগ্রেসের আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এই সময়ে বহু তরুণ অসহযোগ আন্দোলন সংগঠনের দায়িত্ব নেন। এঁরা হলেন যোগেশ দত্ত, সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, সুরেশচন্দ্র মৈত্র, সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রমুখ। এছাড়া বীরেন দত্ত, হিরণ্যকান্তি বসু ও অধীরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় স্কুল ছেড়ে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন।

ইংরেজ শাসন-বিরোধী আন্দোলনের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটেছিল বঙ্গ-ভঙ্গের সময়। জলপাইগুড়ি শহরে দিনবাজারে বিলাতি কাপড় পোড়ানোর চেষ্টা হয়েছিল। পুলিশ লাঠি চালিয়েছিল। দুর্গাদাস চক্রবর্তী, আদ্যনাথ মিশ্র এবং অন্নদা বিশ্বাস ধরা পড়লেন। দুসপ্তাহ কারাবাস হলো।

জেলার সর্বত্র কমবেশি অসহযোগ আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। বোদা থানার মন্মথ দত্ত, ভোলা মজুমদার, দেবানন্দ রায়, শিবকান্ত রায়, তেঁতুলিয়ার নিত্যানন্দ দাস, পার্থগ্রামের কেশব দত্ত, রথেরহাট—বগঝাঙ্গির তারিণী বসুনীয়া, আলিপুরদুয়ারের রসিক গাঙ্গুলি প্রমুখ নিজ নিজ এলাকায় আন্দোলন পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের কথা হলো আলিপুরদুয়ার মহকুমার প্রান্তীয় জনপদ কুমারগ্রামদুয়ারে অসহযোগ আন্দোলন গণআন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করেছিল। উত্তরবঙ্গের অন্য কোনো জেলার গ্রামীণ জনপদে অসহযোগ আন্দোলন এরূপ তীব্র হয়নি। যাই হোক কংগ্রেস অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনার জন্য ১৯২১ সালের মধ্যেই জেলার প্রতিটি থানায় কংগ্রেসের শাখা কমিটি খুলেছিলেন। এই সূত্রেই কুমারগ্রামদুয়ারেও শাখা অফিস স্থাপিত হয়েছিল। কংগ্রেস এখানে খাজনা বন্ধ আন্দোলনের ডাক দিয়েছিল। এই খাজনা বন্ধ আন্দোলন হাটবন্ধ আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়েছিল কুলকুলির হাটে। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মঘা দেওয়ানী। এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সে সময় যে গান রচিত হয়েছিল তার অংশবিশেষ তুলে দিচ্ছি :

'ভাত দিস্, পানি দিস্, খাজনা দিস্ না।
জান দিস্, পান দিস্, ট্যাকসো দিস্ না,
ইংরেজের খাজনা দিস্ না।
বিলাইতি কাপড়া পড়াশুনা
হাটবন্ধ কুলকুলি
বন্দেমাতরম হামার বুলি।'

পুলিশ আন্দোলনের হোতা, মঘা দেওয়ানী সহ ৫২ জনকে গ্রেপ্তার করে আলিপুরদুয়ারে নিয়ে এসেছিল। আলিপুরদুয়ারে যেদিন তাঁদের বিচারের কথা সেদিন কয়েক হাজার লোক আলিপুরদুয়ার আদালত চত্বর ঘিরে ফেলেছিলেন। হাকিম অবস্থার গুরুত্ব বুঝে মঘা দেওয়ানীকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। পরে অবশ্য আন্দোলনের অন্য কর্মিবৃন্দ—চন্দ্রদ্বীপ সিংহ, ভবা দাস, কালীপ্রসন্ন দাস, নিলবর দাস, অবিনাশ দাস, লাট সিং বড়ুয়া, বুধবারু দাস, মদন সিং বড়ুয়া প্রমুখের বিচারে ছয় মাস করে কারাদণ্ড হয়েছিল।

১৯২২ সালে বগুড়া-রাজশাহীর বন্যাতে আর্তদের সেবার জন্য আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে সেবা সমিতি গঠিত হয়। তরুণ সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে স্বেচ্ছাসেবক দল অক্লান্ত পরিশ্রম করেন বন্যাত্রাণে। জলপাইগুড়ি থেকে মাখন সান্যাল, নীরেন বাগচি, নগেন সান্যাল, অবনী গোস্বামী, যতীন রায় স্বেচ্ছাসেবকের কাজে গিয়েছিলেন আক্কেলপুর ক্যাম্পে। নেতৃত্বে ছিলেন যোগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ও চারুচন্দ্র সান্যাল।

১৯২২ সালে কংগ্রেসের গয়া অধিবেশনে কংগ্রেসের মধ্যে No-changer এবং Pro-changer গোষ্ঠীর উদ্ভব হয় এবং স্বরাজ্য দলের প্রকাশ ঘটে। দেশবন্ধু Pro-changer গোষ্ঠীর নেতা হিসেবে আবার জলপাইগুড়িতে এলেন। দেশবন্ধু প্রীতিনিধান রায়ের বাড়িতে এলেন। বর্ধন প্রাঙ্গণে সভা করলেন। কিন্তু একমাত্র সভাপতি জ্যোতিষচন্দ্র সান্যাল ছাড়া দেশবন্ধুর বড় সমর্থক কেউ ছিলেন না। সবাই No-changer গোষ্ঠীতে ছিলেন।

১৯২৫ সালে গান্ধীজি জলপাইগুড়ি এলেন। সঙ্গে ছিলেন মহাদেব দেশাই, সতীশ দাশগুপ্ত ও প্রফুল্ল ঘোষ। বর্তমানের



রাজাসরকার প্রতিষ্ঠিত বক্সা স্মারক

জে ওয়াই এম এ ময়দানে গান্ধীজি সভা করলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে কর্তব্য সম্বন্ধে ছাত্রদের কাছে বক্তব্য রাখলেন, চরকা কাটার উপর জোর দিলেন।

১৯২৬—২৮ সালে কংগ্রেসি আন্দোলনে সাময়িকভাবে ভাটা পড়েছিল। কিন্তু সক্রিয় ছিল অনুশীলন দল। এ সময় বিভিন্ন ব্যায়ামাগারের মধ্য দিয়ে যুবকদের সক্রিয় করার প্রচেষ্টা নেন স্বদেশ দে, দীনদয়াল সরকার, শরৎ দাস প্রমুখ। ১৯২৮ সালে জলপাইগুড়িতে আর্যনাট্য সমাজ ভবনে যুব সম্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি ছিলেন দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। ১৯২৯ সালে বসেছিল জেলা ছাত্র সম্মেলন। অধ্যাপক অতুলচন্দ্র সেন সভাপতি এবং চারুচন্দ্র সান্যাল অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন। শহরের আপামর মানুষ এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন।

১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনের জোয়ার এলো। গ্রাম-গঞ্জ-বন্দর-নগরের মানুষ জোট বেঁধে গর্জে উঠলো— 'ইংরেজের আইন মানি না'। এ সময়ে বিজয়া দশমীর দিন প্রতিমা নিরঞ্জনের সময় নৌকা থেকে স্লোগান উঠলো 'বিলিতি জিনিস বয়কট কর,' 'অস্পৃশ্যতা দূর কর', 'মাদক দ্রব্য বর্জন কর'। পুলিশ আক্রমণ করে বসল। রাজদ্রোহের অপরাধে গ্রেপ্তার করা হল বীরেন দত্ত, অদিতি চক্রবর্তী, চারুচন্দ্র সান্যাল, শশধর কর, শচীন দত্ত, স্বপ্রকাশ দত্ত, চুনীলাল বসু, ভূপতি চন্দ, যতীন রায়, অনিল বাগদি, বিজয় হোড়, রজত গুহঠাকুরতা প্রমুখ যুবক ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের। এছাড়া লবণ আইন ভাঙার জন্য জেলা থেকে পাঁচজন সত্যাগ্রহী মেদিনীপুর গিয়েছিলেন। এঁরা হলেন বীরেন বসু, প্রমথ দাস, রবি দাস প্রমুখ।

১৯৩২ সালে জেলাতে ব্যাপকভাবে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়েছিল। এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে অসংখ্য যুবক ছাত্র কংগ্রেসকর্মী কারাবরণ করেছিলেন। এঁরা হলেন ভবরঞ্জন গাঙ্গুলি, খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, সতীশচন্দ্র লাহিড়ী, যোগেশ দত্ত, নীরেন বাগদি, ভবানী চক্রবর্তী, অঘোর সরকার, নৃপেন মৌলিক, নীরেন সান্যাল, শচীন দাশগুপ্ত, শংকর সান্যাল, বরেন ভৌমিক, নরেন ভৌমিক, অখিলেশ সান্যাল, দেবানন্দ রায়, শিবকান্ত রায় প্রমুখ। আর্যগ্রামের বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা কেশব দত্ত গ্রেপ্তার হলেন। তাঁর সাত বছর কারাদণ্ড হলো। মহিলা কর্মী অরুণা দাশগুপ্ত গ্রেপ্তার হলেন। ধূপগুড়ি থেকে যজ্ঞেশ্বর রায়, বিরল রায়, টুনিয়া রায়, রমাকান্ত রায়, হরিচরণ রায় গ্রেপ্তার হলেন। টুনিয়া রায়ের উপর পুলিশ বর্বর নির্যাতন চালিয়েছিল। ফালাকাটাতে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন নলিনী পাকড়াশী। যিনি 'ডুয়ার্স গান্ধী' বা নলিনী ঠাকুর নামে পরিচিত ছিলেন। গান্ধী-আরউইন চুক্তির পর কেশব দত্ত ও বীরেন দত্ত ছাড়া সবাইকে ছেড়ে দিয়েছিল পুলিশ। ছাড়া পেয়ে কর্মীরা গ্রাম সংগঠনের কাজে নিয়োজিত হলেন। চারুচন্দ্র সান্যালের উদ্যোগে 'সংসার চলবে কেন', 'তোমাদের কাছে' প্রভৃতি পুস্তিকা ও প্রচারপত্র নিয়ে রবীন্দ্রনাথ সিকদারের মতন কর্মীরা প্রচার সভা শুরু করেছিলেন গ্রামে-গঞ্জে। এছাড়া বেশ কিছু যুবক জেলে থাকাকালেই মার্কসবাদের দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন। অন্যদিকে

শহরের মহিলাদের একটি অংশও বিপ্লববাদের কাজে জড়িয়ে পড়েছিলেন। মহেন্দ্রবালা দেবী, বীণা চৌধুরী, সরযূ সরকার, বীণা ভৌমিক প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। নেতৃত্বে ছিলেন সুভাষিণী ঘোষ। সেদিনের দামাল ছেলেদের কাছে সুভাষিণী ঘোষের নেতৃত্ব ও তাঁর মাতৃস্নেহ পরম আশ্রয় ছিল।

এই পর্বের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো জেলার সীমান্ত অঞ্চলের ভুটান পাহাড়ের পরিত্যক্ত বক্সা ফোর্টকে সংস্কার করে বন্দিনিবাসে পরিণত করা। সাধারণ ছেলে স্থানাভাবে ইংরেজ সরকার আইন অমান্য আন্দোলকদের রাখার জন্য বক্সা ফোর্টকে বন্দিনিবাসে রূপান্তরিত করেছিলেন। এই বন্দিনিবাসে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের স্বাধীনতা সৈনিকরা বন্দী ছিলেন। শীর্ষস্থানীয় বন্দীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মহারাজা ত্রৈলোক্যমোহন চক্রবর্তী, প্রতুল গাঙ্গুলি, অরুণ গুহ, ভূপতি মজুমদার, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, অমলেন্দু দাশগুপ্ত, হেমচন্দ্র ঘোষ, মেজর সত্য গুপ্ত, ভবেশ নন্দী, ভূপেন্দ্র কিশোর, রক্ষিত রায় প্রমুখ। স্থানীয় ঐতিহাসিকদের একাংশের ধারণা এইসব বন্দীদের প্রভাবে এ জেলায় স্বাধীনতা আন্দোলন তীব্র হয়েছিল।

১৯৩৯ সাল স্মরণীয় বছর। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস বসেছিল জলপাইগুড়িতে। অধিবেশনের জন্য অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন ডাঃ চারুচন্দ্র সান্যাল এবং সাধারণ সম্পাদক যোগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। এই সম্মেলন বিপুল উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল জেলাবাসীর মধ্যে। কারণ, এরূপ সম্মেলন এ জেলায় এটিই প্রথম ছিল। এই সম্মেলনে বিভিন্ন গ্রাম থেকে হাজার হাজার কৃষক যোগ দিয়েছিলেন। এই সম্মেলনে সুভাষচন্দ্র বসু ও তাঁর অগ্রজ শরৎচন্দ্র বসু উপস্থিত ছিলেন। সুভাষচন্দ্র তাঁর ভাষণে মুক্তি আন্দোলনের পথ নির্দেশের কথা বলেছিলেন। 'ইংরেজ ভারত ছাড়ো'—এই ঐতিহাসিক প্রস্তাব স্লোগান উচ্চারিত হয়েছিল জলপাইগুড়ি অধিবেশন থেকেই। তা ছাড়া ব্রিটিশকে চরমপত্র দেওয়ার ঐতিহাসিক প্রস্তাবও গৃহীত হয়েছিল এই অধিবেশনেই।

এই বছরেই জলপাইগুড়িতে বীরেন দত্তের নেতৃত্বে কম্যুনিস্ট পার্টির যোগাযোগকমিটির সৃষ্টি হয়েছিল। কমিটিতে ছিলেন—শচীন দাশগুপ্ত, গুরুদাস রায়, নরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, পরিমল মিত্র, চুনীলাল বসু, মাধব দত্ত প্রমুখ। যুবকদের মধ্যে এই সময়ে কম্যুনিস্ট পার্টির প্রতি আকর্ষণ বেড়ে গিয়েছিল। মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্র-নার্সদের মধ্যে এর প্রভাব পড়ে। অবনী তলাপাত্র, সুধীন মৈত্র গ্রেপ্তার হন। কৃষক আন্দোলনও ছড়িয়ে পড়েছিল। তরুণেরা তাঁদের জীবনের শ্রেষ্ঠ মুহূর্তগুলোকে ব্যয় করে সংগঠনের কাজ করেছেন। হর ঘোষ, অনিল মুখার্জি, বীরেন পাল, গোবিন্দ কুণ্ডু, চারু মজুমদার, মনোরঞ্জন দাশগুপ্তরা কৃষকদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার প্রসারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। মহিলাকর্মীরাও যোগ দিয়েছেন। বিভা দত্ত, কল্যাণী চন্দ, কল্পনা নিয়োগী, লীলা সেন, আশা রায়চৌধুরী, অমিয়া নন্দী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁরা ছাড়াও সুখময় দাশগুপ্ত, আব্দুস সামাদ, নারায়ণ বিশ্বাস, নারায়ণ ভট্টাচার্য, নিখিল রায়চৌধুরী, অনিমেষ রায়, মানময় দাশগুপ্ত, কানু দাশগুপ্ত, অরুণ সেন, পরেশ মিত্র, স্বদেশ সান্যাল, দিলীপ ঘোষ, কান্তি নিয়োগী, জলি সরকার, রামপ্রসাদ রায়চৌধুরী, আব্দুল হুদা সে সময় কম্যুনিস্ট পার্টির উজ্জ্বল ও ত্যাগী কর্মী হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন।

১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ শুরু হলো। সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতাদের ষড়যন্ত্রে কংগ্রেস ছেড়ে ফরওয়ার্ড ব্লক তৈরি করলেন। ১৯৪২ সালে ভারত ছাড়ো আন্দোলন শুরু হলো। এর প্রভাব জলপাইগুড়ি শহরেও পড়েছিল। পুলিশ খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, শশধর কর, সতীশচন্দ্র লাহিড়ী, চারুচন্দ্র সান্যাল, শচীন লাহিড়ী প্রমুখ প্রায় তিনশত কর্মীকে গ্রেপ্তার করলেন। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড, মিউনিসিপালিটি থেকে আন্দোলনের সমর্থনে চারুচন্দ্র সান্যাল, অবনী ধর গুহনিয়োগী, সফিকুল ইসলাম, প্রীতিনিধান রায়, শ্রীনাথ হোড় পদত্যাগ করলেন। ৯ আগস্টের বিশাল মিছিলের পুরো ভাগে পতাকা হাতে তারা ব্যানার্জি ও উমা দাশগুপ্ত অংশ নিয়েছিলেন। জগন্নাথ বাগচি, মোহিত সান্যাল, পীযূশ ব্যানার্জি, অমলেশ সান্যাল, রবি চৌধুরী, দেবব্রত মজুমদার, বিধান সিংহ, অনিল রায়, বাদল সরকার, রবীন ঝম্পটি, মনোরঞ্জন গুহ, নির্মলেন্দু সান্যাল, রথীন রায়, রমাপদ ব্যানার্জি, হারাধন চন্দ, কুমারকৃষ্ণ ব্যানার্জি, অনিল রাহুত, মুকুলেশ সান্যাল, অনিল গুহনিয়োগী প্রমুখ তরুণরা ছিলেন সক্রিয় কর্মী।

জলপাইগুড়িতে বীরেন দত্তের নেতৃত্বে কম্যুনিস্ট পার্টির যোগাযোগকমিটির সৃষ্টি হয়েছিল। কমিটিতে ছিলেন—শচীন দাশগুপ্ত, গুরুদাস রায়, নরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, পরিমল মিত্র, চূনীলাল বসু, মাধব দত্ত প্রমুখ। যুবকদের মধ্যে এই সময়ে কম্যুনিস্ট পার্টির প্রতি আকর্ষণ বেড়ে গিয়েছিল। মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্র-নার্সদের মধ্যে এর প্রভাব পড়ে।

ভারত ছাড়ো আন্দোলন গণ-আন্দোলনের রূপ নিয়েছিল জেলার প্রান্তীয় থানা কুমারগ্রামদুয়ার অঞ্চলে। অবশ্য এই আন্দোলন সেখানে সংগঠিত হয়েছিল অনেক পরে ২৬ সেপ্টেম্বরে। আলিপুরদুয়ার মহকুমার কংগ্রেস কমিটি এই দিনটিকেই আন্দোলন শুরু করার জন্য নির্দিষ্ট করেছিলো। কুমারগ্রাম থানার কংগ্রেস কমিটির দায়িত্বে ছিলেন সুনীল সরকার। সুনীলবাবুর নেতৃত্বে এক বিশাল জনতা মশাল জ্বালিয়ে কুমারগ্রামদুয়ার থানা ঘেরাও করেছিলেন। মিছিল থেকে স্লোগান উঠেছিল 'করব, নয় মরব', 'ইংরেজ ভারত ছাড়ো', 'ব্রিটিশ সরকার ধ্বংস হোক'। তীর, ধনুক, বল্লম, লাঠি সঙ্গে এনেছিলেন



[illegible] সান্যাল

তাঁরা। মিছিলের সর্বাগ্রে ছিলেন সুনীল সরকার, পেছনে ছিলেন একনিষ্ঠ অনুগামীরা—রমানাথ ঠাকুর, দেবেন দাস, ললিত রায়, সুবীত রায়, পোহাতু রায়, সাধু দত্ত, মতিলাল রায়, যোগেন বাসানিয়া প্রমুখ। আন্দোলকদের মধ্যে ৬৫ বছরের বৃদ্ধ পোহাতু দাস পুলিশের রাইফেলের সামনে বুক পেতে দিয়ে বলেছিলেন 'করেন ক্যানেগুলি', মুই দেখিস ইংরাজের কয়টা গুলি আছে, বন্দুক কেন ছোঁড়েন না? কুমারগ্রামদুয়ার থানা কয়েক ঘণ্টার জন্য আন্দোলকদের হাতে চলে গিয়েছিল। এবং দারোগাবাবু কার্যত আত্মসমর্পণই করেছিলেন আন্দোলকদের নিকটে। কয়েক ঘণ্টা পরে অবশ্য আলিপুরদুয়ারের পুলিশ কুমারগ্রামদুয়ার চা-বাগান অভিযান করে থানার দখল নিয়েছিল। আন্দোলকদের পঞ্চাশজনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দিয়েছিল। বিচারে এঁদের ১৫ দিন থেকে ৬ মাস পর্যন্ত জেল হয়েছিল।

১৯৪২ সালে জলপাইগুড়ি শহরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার অধিবেশন বসেছিল। নলিনীরঞ্জন ঘোষ এই সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি এবং কুমুদিনীকান্ত চক্রবর্তী সম্পাদক ছিলেন। ডঃ মুঞ্জে এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ১৯৪০ সালে এই জেলায় হিন্দু মহাসভার শাখা স্থাপিত হয়েছিল। হিন্দু মহাসভার চেয়ে মুসলিম লিগের শাখা ছিল শক্তিশালী। নবাব মোশারফ হোসেন ছিলেন এর পৃষ্ঠপোষক; 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' আওয়াজ তুলে এরা বিভেদমূলক কাজ করতো। মুসলিম ন্যাশানাল গার্ড বা আনছার বাহিনী সাম্প্রদায়িকতামূলক কাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিল।

১৯৪২ সাল থেকে এই জেলার স্বাধীনতাকামী মানুষ, বিশেষতঃ যুবকেরা অনেকেই সুভাষচন্দ্র বসুর অনুগামী ছিলেন। এঁরা জলপাইগুড়িতে ফরওয়ার্ড ব্লকের শাখা স্থাপন করেছিলেন। এই শাখার সভাপতি ছিলেন সতীশচন্দ্র লাহিড়ী এবং সম্পাদক ছিলেন শচীন্দ্রনাথ লাহিড়ী। জেল থেকে বেরিয়ে শশধর কর হলেন ফরওয়ার্ড ব্লকের সভাপতি, সুশীল বসু হলেন সম্পাদক। আজাদ হিন্দ বাহিনীর বীরত্বের কথা তখন মানুষের মুখে মুখে। গ্রাম-গঞ্জের মানুষ নেতাজির লড়াইয়ের কাহিনীতে উদ্বুদ্ধ হলেন। শহরে আজাদ হিন্দ পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হলো। ফরওয়ার্ড ব্লকের যুবক-ছাত্ররাই এ সময় গ্রাম-শহরের রাজনীতি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করতেন।

১৯৪৬ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধল। দাঙ্গার বিরুদ্ধে ফরওয়ার্ড ব্লক পাড়ায় পাড়ায় শান্তিসেনা গড়ে তুলেছিল। এছাড়া আজাদ হিন্দ বাহিনীর বিচারের বিরুদ্ধে প্রবল জনমত গড়ে তুলেছিল শহরে ও গ্রামে। সে সময়ের ফরওয়ার্ড ব্লক কর্মীরা হলেন নলিনীকান্ত চক্রবর্তী, নির্মল বসু, শচীন লাহিড়ী, অজিত চক্রবর্তী, প্রভাত বসু, মণি নাগ, রথীন রায়, অমরেন্দ্র কুণ্ডু, মুকুলেশ সান্যাল, রমাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহিত সানাল, বাদল সমাজদার, মানস সান্যাল, অরুণ সান্যাল, রঞ্জিত বসু, মিলু দত্ত, প্রতিভা চক্রবর্তী, রেবা সানাল, দীপ্তি রায়, গীতা গুহ, উমা দাশগুপ্ত, প্রবোধ সরকার, নগেন সরকার, কুমুদ ঘোষ, সাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাত দাশগুপ্ত, জগদীশ দাশগুপ্ত ও নিরঞ্জন দত্ত প্রমুখ।

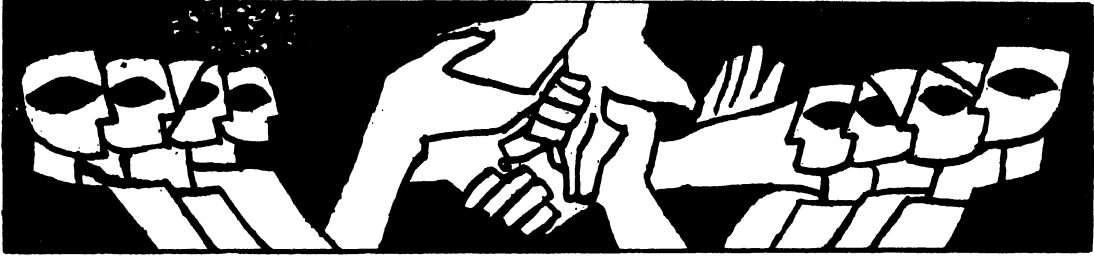
এর পরের ইতিহাস জেলা বিভাজনের ইতিহাস। স্বাধীনতা ও বিভাজন একই সঙ্গে এলো। জেলার পাঁচটি থানা—বোদা, দেবীগঞ্জ, পচাগড়, পার্থগ্রাম, তেঁতুলিয়া পাকিস্তানে গেল র‍্যাডক্লিফের কলমের খোঁচায়। মুক্তির উদগ্র বাসনাকে নিজেদের মনে লালিত করে যাঁরা এতদিন মুক্তিসংগ্রামে অংশ নিয়ে নির্যাতিত হয়েছেন, এবার তাঁরাই আওয়াজ তুললেন, 'খণ্ডিত স্বাধীনতা মানি না', 'ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়'। স্বাধীনতা আন্দোলনের বীর সৈনিক বোদার ধোদো মহম্মদ নেতাজির ছবি বুকে ঝুলিয়ে প্রচার করে বললেন--অন্যায়ের সঙ্গে আপস করা পাপ। আওয়াজ তুললেন 'বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক', 'জয় হিন্দ'। এই সময়ে খবর পাওয়া গেল মুসলিম লিগের আনসার বাহিনী চিরদিনের জন্য ধোদো মহম্মদের কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। হায় স্বাধীনতা! হায় রাজনীতি! হায় ইতিহাস! হায় দেশপ্রেম!

তথ্য সূত্রাবলী

১। বিভাগীয় কমিশনার অফিসের রেকর্ডস্, জলপাইগুড়ি
২। জেলখানার রেকর্ডস্, জলপাইগুড়ি
৩। জনমত, ত্রিস্রোতা পত্রিকার (১৯২৯-১৯৪৭) প্রাসঙ্গিক সংখ্যাগুলি
৪। মধুপর্ণী জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা, ১৯৩৪—সংখ্যা-সম্পাদক—আনন্দগোপাল ঘোষ সম্পাদক—অজিতেশ ভট্টাচার্য, বালুরঘাট।
৫। জলপাইগুড়ি জেলা শতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ, ১৮৬৯-১৯৬৮, সম্পাদক—ডঃ রেবতীমোহন লাহিড়ী এবং অন্যান্য।
৬। ভারত ছাড়ো আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে উত্তরবঙ্গ—সংকলক—আনন্দগোপাল ঘোষ, ইতিহাস বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯২।
৭। জলপাইগুড়ি শহরে প্রগতি আন্দোলন গড়ে ওঠার একদশক (১৯৩৬—১৯৪৬)—আনন্দগোপাল ঘোষ, গৌরশিখা পত্রিকা—সম্পাদক অনাথ দত্ত।
৮। স্বাধীনতা সংগ্রামে রাজবংশী সম্প্রদায়—নির্মলচন্দ্র চৌধুরী।

কৃতজ্ঞতা : ডঃ রেবতীমোহন লাহিড়ী, বীরেন দত্ত, ডাঃ শচীন দাশগুপ্ত

লেখক ❑ কবি, সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক।



সুভাষ চৌধুরী

স্বাধীনতাপরবর্তী জলপাইগুড়ি জেলার গণআন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস



১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর সারাদেশের ন্যায় জলপাইগুড়ি জেলাতেও যে আন্দোলন ওঠে তাকে দুটো ভাগে বিভক্ত করা যায়। এক হল ১৯৪৭ থেকে ৭৬ এবং দ্বিতীয় পর্যায় হল ৭৭ থেকে ২০০০। মাঝে ১৯৬৭ এবং ৬৯-এ সামান্য কিছুদিনের স্বতন্ত্র ইতিহাস আছে। যাই হোক ১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর আন্দোলনের ধারা ও চরিত্র পরিবর্তিত হয়। দেশ স্বাধীন হবার পর দেশের শাসনভার ন্যস্ত হয় জাতীয় কংগ্রেসের হাতে। সুতরাং সারা দেশের সঙ্গে জলপাইগুড়ি জেলাতেও ১৯৭৭ সালের পূর্ব পর্যন্ত যেসব আন্দোলন গড়ে ওঠে, সেগুলি মূলত কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে। আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিল বামপন্থী দলসমূহ। কোনও কোনও সময়ে কোনও কোনও বিষয়ে আন্দোলনে কংগ্রেস দলও একটা স্তর পর্যন্ত অংশগ্রহণ করেছে। বিশেষ করে স্বাধীনতার পর ১৯৫৭ সালে বাংলা-বিহার সংযুক্তিকরণের বিরুদ্ধে যে গণ-সংগ্রাম গড়ে ওঠে এবং যার ফলে সে প্রস্তাব রোধ করা সম্ভব হয়, জলপাইগুড়ি জেলাতেও তাতে সর্বদলীয় অংশগ্রহণ ছিল। উদ্বাস্তু আন্দোলনে বিশিষ্ট ভূমিকায় ছিল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এবং পরবর্তীতে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে যত আন্দোলন হয়েছে তার জন্য মূল্য দিতে হয়েছে প্রচুর। অনেক সময় আন্দোলনের প্রতিশ্রুত বিষয় পালন না করার জন্য আন্দোলন করতে হয়েছে, কিন্তু ১৯৭৭ সাল থেকে বামফ্রন্ট সরকারের ঘোষিত নীতি অনুযায়ী আন্দোলন ছাড়া আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষক যে সমস্ত দাবি পূর্ণ করতে পেরেছে, সেগুলি প্রশংসনীয়। ১৯৫৯ সালে জলপাইগুড়ি জেলার খাদ্য আন্দোলন ছিল ঐতিহাসিক।

চা-শ্রমিক আন্দোলন : জলপাইগুড়ি জেলার প্রধান শিল্প বলতে বোঝায় চা-শিল্প। এই চা-শিল্পের মালিকেরা অধিকাংশ আবার শাসক শ্রেণীর, সুতরাং এই আন্দোলনও শাসক কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। আন্দোলনের নেতৃত্বকারী দল হল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, পরবর্তীতে ভারতের কমিউনিস্ট

পার্টি (মার্কসবাদী) এবং আর এস পি দলের নেতৃত্বে সংগঠিত হয়েছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠনও এই সমস্ত আন্দোলনে একটা স্তর পর্যন্ত অংশগ্রহণ করেছে বটে। সাধারণত চা-শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি, আবাসন, পানীয় জল, রেশন, বিদ্যুৎ, শিক্ষা, চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে দুর্বার আন্দোলন গড়ে উঠেছে। এই সমস্ত আন্দোলনে নেতৃত্বকারীদের মধ্যে ছিলেন রতনলাল ব্রাহ্মণ, সুবোধ সেন, পরিমল মিত্র, লাল শুকরা ওঁরাও, শুম্নাইত রাও, বিমল দাশগুপ্ত, বাবুলাল গোপ, বীর সেন কুজুর, মানিক সান্যাল, আশু সরকার, মন্টু বসু, জগৎ সাহা, সুধন রাহা, দেবপ্রসাদ ঘোষ এবং আর এস পি-র বেস্টারউইচ ও ননী ভট্টাচার্য।

চা-শিল্প থেকে কোটি কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রার্জন এবং মালিকদের বিলাস-ব্যসনের প্রাচুর্য সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও যে শ্রমিকের রক্তে মালিকদের শরীরের রক্ত বৃদ্ধি সে কথা মনে না রেখে শ্রমিকদের ন্যায্য প্রাপ্য, জীবন-যাত্রার মানোন্নয়ন প্রভৃতিতে তাদের দারুণ অনীহা। তার ফলে শ্রমিকদের মধ্যে বিক্ষোভ দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। সেই বিক্ষোভ যে কোনও কোনও সময় ভুলপথে পরিচালিত হয়নি, তা নয়। আর শ্রমিকদের সেই স্বাভাবিক বিক্ষোভকে সঠিক পথে পরিচালিত করতেই বামপন্থী নেতৃত্বের আন্দোলন। আন্দোলনের চাপে অনমনীয় মনোভাবসম্পন্ন মালিক পক্ষ পিছু হটে মীমাংসার টেবিলে বসতে বাধ্য হলেও প্রতিশ্রুত বিষয় পূরণ না করার ফলে পুনরায় আন্দোলন করতে হয়। প্রায় সব বাগানে একই চিত্র। তার মধ্যেও আবার কম-বেশি আছে। জলপাইগুড়ি জেলার প্রায় দেড়শো চা-বাগানে দুলক্ষ শ্রমিক কর্মরত। মাল, মেটেলি-নাগরাকাটা, বানারহাট, বীরপাড়া, কালচিনি, মাদারিহাট, হাসিমারা প্রভৃতি অঞ্চলে সাধারণত জলপাইগুড়ি জেলার চা-বাগান, জলপাইগুড়ি শহরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ডেঙ্গুয়াকার, বাইপুর, ডাণ্ডিগুড়ি, করলাভ্যালি, শিকারপুর প্রভৃতি অঞ্চলেও বেশ কিছু চা-বাগান অবস্থিত। এই চা-বাগানগুলিতে যাঁরা নেতৃত্বে ছিলেন এবং আছেন তাঁরা হলেন শচীন দাশগুপ্ত, সুধাময় দাশগুপ্ত, লক্ষ্মণ ভুঁইয়া ও সাধন চক্রবর্তী। এছাড়া জলপাইগুড়ি জেলার চা-বাগান শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত তাঁরা হলেন দেবেন সরকার, বাদল সরকার, চিত্ত দে, ঘনশ্যাম ঝা প্রমুখ নেতা—এঁরা সবাই পূর্বতন সোশালিস্ট এবং পরবর্তীতে জনতা পার্টির।

> **জলপাইগুড়ি জেলার প্রধান শিল্প বলতে বোঝায় চা-শিল্প। এই চা-শিল্পের মালিকেরা অধিকাংশ আবার শাসক শ্রেণীর, সুতরাং এই আন্দোলনও শাসক কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। আন্দোলনের নেতৃত্বকারী দল হল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, পরবর্তীতে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) এবং আর এস পি দলের নেতৃত্বে সংগঠিত হয়েছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠনও এই সমস্ত আন্দোলনে একটা স্তর পর্যন্ত অংশগ্রহণ করেছে বটে।**

জলপাইগুড়ি জেলার চা-বাগান শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে বানারহাট অঞ্চলে রেড ব্যাঙ্ক গ্রুপের রেড ব্যাঙ্ক, ধরণীপুর ও সুরেন্দ্রনগরের আন্দোলনের স্মৃতি বড়ই করুণ, বড়ই মর্মস্পর্শী। এই বাগানে পানীয় জল, বাসস্থান প্রভৃতি নিয়ে অন্যান্য বাগানের সঙ্গে আন্দোলন পূর্বেও হয়েছে ; কিন্তু পুরানো মালিকের পরিবর্তে নতুন মালিক আগমনের ফলে, মালিকের অনমনীয় মনোভাব ও অদূরদর্শিতার ফলে আন্দোলনের মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিশেষ করে ১৯৯১ সালের ১৫ জুন কংগ্রেস (আই)-এর আক্রমণে সি আই টি ইউ-এর যে ১৩ জন শ্রমিক নৃশংসভাবে নিহত হন সেটা জলপাইগুড়ি জেলা চা-বাগান আন্দোলনের ইতিহাসে এক কলঙ্কিত অধ্যায়। ১৫ জুনের এই হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে শুধু জলপাইগুড়ি জেলা নয়—সারা পশ্চিমবঙ্গ তথা সমগ্র ভারতের শ্রমিকশ্রেণী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। সর্বত্র এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে সভা, মিছিল, তহবিল সংগ্রহ প্রভৃতি হয়েছে, ধিক্কার ধ্বনিতে সোচ্চার হয়েছে। জলপাইগুড়ি শহর থেকে শ্রমিক-কৃষক, শিক্ষক-ছাত্র-যুব-মহিলা সবাই নিহতদের পরিবারবর্গের সঙ্গে দেখা করেছে, সাধ্যানুযায়ী দান করেছে। ১৬ জুন নিহত ১৫টি শ্রমিকের শবদেহ নিয়ে ট্রাকে করে যে মিছিল হয়েছে, তাতে জলপাইগুড়ির মানুষ পথের পাশে দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য দেখে একদিকে যেমন বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে যুগপৎ তেমনই শহিদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছে। এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে জেলার সর্বত্র স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মঘট পালিত হয়েছে। ঘটনার দু'দিন বাদে ১৭ জুন বামফ্রন্টের ডাকে সারা জলপাইগুড়ি জেলাতে বনধ পালিত হয়েছে।

১৮ জুন রেড ব্যাঙ্ক চা-বাগান সেন্ট্রাল লাইনের হাসপাতাল মাঠে এক স্মরণসভা হয়। এই মাঠের নামকরণ করা হয় শহিদ বাগ। ২০ জুন হয় সিটুর উদ্যোগে আয়োজিত সহস্র সহস্র শ্রমিকের উপস্থিতিতে এক স্মরণসভা। এই সভায় সারা ভারত চা-বাগিচা শ্রমিক ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দের মধ্যে যাঁরা উপস্থিত হয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তাঁরা হলেন বিমলা রনদিভে, আনন্দ পাঠক, অজিত সরকার, সুধন রাহা, মন্টু বল, দীনেশ ডাকুয়া ও অন্যান্য নেতা। রাজ্য নেতৃত্বের মধ্যে ২০ জুনের সভায় উপস্থিত ছিলেন পতিতপাবন পাঠক, নেপালদেব ভট্টাচার্য, শান্তশ্রী চ্যাটার্জি, সুভাষ চক্রবর্তী, হারাধন রায়, কালী ঘোষ, নিশা রায়, দীপক দাশগুপ্ত, সুনীল বসুরায়, আবুল বাসার, সুখেন্দু বিশ্বাস, সুভাষ বসু, রঞ্জিত কুণ্ডু প্রমুখ নেতা। এই সভা থেকে কালী ঘোষ জেলা চা-বাগান মজদুর ইউনিয়নের যুগ্ম সম্পাদক বাবুলাল গোপের হাতে ৫০ হাজার টাকা, কোলিয়ারি মজদুর ইউনিয়নের পক্ষে ৫ হাজার এবং এ বি পি টি-এর পক্ষ থেকে

২ হাজার টাকা তুলে দেওয়া হয়। ১৩টি জীবনের পরিবর্তে এ টাকা হয়তো নগণ্য, তবু এর দ্বারা পারস্পরিক একাত্মবোধ ও সহমর্মিতা এটাও সামান্য নয়।

এই নারকীয় হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে জলপাইগুড়ি জেলার ছাত্র-যুব সমাজও গর্জে উঠেছিল। ডি ওয়াই এফ আই এবং এস এফ আই-এর ডাকে উত্তরবঙ্গ জমায়েত ছিল এক ঐতিহ্যবাহী ও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। ছাত্র-যুবদের ডাকে হাজার হাজার মানুষের ভিড়ে বানারহাট রেড ব্যাঙ্ক শহিদবাগে তিলধারণের স্থান ছিল না। এই সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন ডি ওয়াই এফ আই-এর তদানীন্তন জেলা সম্পাদক ননী মুখুটি। বক্তব্য রাখেন মানব মুখার্জি, মইনুল হাসান, তুলসী ভট্টরাই, শিবেন পৈত, নাজিমুদ্দিন ও বিধায়ক চৈতন মুণ্ডা। ২৫ জুন বানারহাটে শ্রমিক হত্যার প্রতিবাদে ছাত্র-যুবদের প্রতিজ্ঞা ছিল যেকোনও মূল্যে সন্ত্রাস দমন করতে হবে। মোট কথা স্বাধীনতালাভের পর জলপাইগুড়ি জেলাতে শ্রমিক-কৃষক-শিক্ষক-কর্মচারী-ছাত্র-যুব মহিলাদের যে সমস্ত গণ-আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে তার মধ্যে বানারহাটের রেড ব্যাঙ্কে ১৩ জন শ্রমিক হত্যার প্রতিবাদে শ্রমজীবী-মেহনতি মানুষের সমবেত আন্দোলন প্রমাণ করেছিল যে আপদকালে সন্ত্রাসবাদীরা মানুষকে ঘরে আবদ্ধ করে রাখতে পারে না। সন্ত্রাসবাদ কখনও শেষ কথা বলে না—জনগণই শেষ কথা বলে। এ নজিরের হিসাব নেই। সন্ত্রাসবাদীদের এ সমস্ত ঘটনা থেকে যথেষ্ট শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ আছে। কিন্তু ধনগর্বে মত্ত মালিকপক্ষ যেন সহজে কোনও শিক্ষা গ্রহণ করতে চায় না। তাই দুহাজার সালেও পুনরায় দু-দুবার শ্রমিকদের প্রতি মালিক পক্ষের প্রতিশ্রুত ন্যায্য দাবি আদায়ের জন্য ধর্মঘট করতে হয়েছে। পরিশেষে মালিক পক্ষকে অনেক দাবি মেনে নিতে বাধ্য করা গেছে। এখনও অনেক দাবি অপূর্ণ। তার জন্য অবশ্যই সংগ্রাম করতে হবে। দ্বিতীয় বারের ধর্মঘট চলে প্রায় এক মাস কাল। সপরিবারে অনাহারের সম্মুখীন শ্রমিকদের মুখে গ্রাস তুলে ধরার জন্য জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন গণ-সংগঠন তাঁদের সাধ্যমতো প্রতি মাসে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন ; কিন্তু এভাবে আর কতকাল চলবে? সারা ভারতে যে ভাবে একে একে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা তুলে দেওয়া, বিভিন্ন শিল্প বহুজাতিক সংস্থার হাতে বিকিয়ে দেওয়া, রুগ্ন শিল্প ধ্বংস করা এবং আরও শিল্প ধ্বংস করা হচ্ছে, দিন দিন লক্ষ লক্ষ বেকার সংখ্যা বৃদ্ধি করছে, তার ছোঁয়া থেকে জলপাইগুড়ির চা-শিল্প রক্ষা পাবে বলে মনে হচ্ছে না। বছরে ১ কোটি বেকারের কাজের প্রতিশ্রুতি আর দেশের ৫ কোটি বেকারের সঙ্গে জলপাইগুড়ি জেলারও লক্ষ লক্ষ বেকার যুবক-যুবতী সংশ্লিষ্ট, ভাবাবেগে না চলে সমস্ত বেকার যুবকদের ভাবতে হবে। শুধু বেকারি দিবস পালন এবং সব বেকারের কাজের দাবির সঙ্গে বিষয়গুলি আরও গভীরভাবে ছাত্র-যুবদের ভাবতে হবে।

জলপাইগুড়ি জেলার চা-বাগান আন্দোলনের ইতিহাস দীর্ঘতর। সেই আন্দোলনের ইতিবৃত্ত প্রদান করা এখানে আলোচ্য নয়, কারণ আমার পরিধি সীমিত।

১৯৭৭ সালের পূর্বে একজন চা-শ্রমিকের মজুরি ছিল ৪ টাকা ৩০ পয়সা। ১৯৭৭ সালের পর আলোচনা আন্দোলন বৈঠকের



মাধ্যমে সেটা বেড়ে হয়েছে ৩৯টা। এটাও যথেষ্ট নয়—শ্রমিকদের অন্যান্য ন্যায্য প্রাপ্য এখনও অনাদায়ী। বামফ্রন্ট সরকারের শিল্পনীতি হল 'শিল্পে শান্তি' নীতি এবং কথায় কথায় ধর্মঘট নয়। মালিকেরা যেন সেই সুযোগ গ্রহণ করছে। তাছাড়া যে সমস্ত চা-বাগান রুগ্ন বলে ঘোষিত হচ্ছে এবং ক্লোজ-আপ হচ্ছে, সেগুলিও শ্রমিকদের জন্য নয়—মালিকদের অপকর্মের ফলেই হচ্ছে। তবুও বামফ্রন্ট সরকারের অবস্থানের ফলে মালিকপক্ষ বোনাসের দাবিতে এবং অন্যান্য বিষয়ে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে বসতে এবং অনেক দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়। কিন্তু যে বিষয় বামফ্রন্ট সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত সেগুলি সংগঠনের সঙ্গে বসে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তি হচ্ছে। তার জন্য কর্মবিরতি অবস্থান ধর্মঘট করতে হচ্ছে না। তা সত্ত্বেও যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিবিধ বিষয় যেমন শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিমাতৃসুলভ আচরণের ফলে 'উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে' পড়ছে। সাংবিধানিক বাধার কথা আর ক'জনে বোঝে? তাছাড়া অনবরত প্রচার মাধ্যম যেভাবে অপপ্রচার এবং বিকৃত প্রচার করে চলেছে তাতে বিভ্রান্তি আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিরক্ষর ব্যক্তিরাও ভুল শিক্ষা পাচ্ছে। যার ফলে মূল শত্রু আড়াল পাচ্ছে। সরকারের গণমুখী কার্যকলাপ যেন তলিয়ে যাচ্ছে। প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রামের ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য। এর হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্যও গণ-আন্দোলন গড়ে তোলার আবশ্যকতা আছে। অন্যথায় প্রকৃত ফল লাভ হবে না। স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী সময়ে প্রচার মাধ্যমের এই ভূমিকা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতিটি আন্দোলন সংগ্রামের ক্ষেত্রেই এই বাধা।

কৃষক আন্দোলন : জলপাইগুড়ি জেলার স্বাধীনতা লাভের পর কৃষক আন্দোলন উল্লেখযোগ্য। স্বাধীনতা লাভের প্রাক্-মুহূর্তে জলপাইগুড়ি জেলার তেভাগা আন্দোলন ছিল সারা বঙ্গের মধ্যে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। স্বাধীনতা লাভের পরও তার জের চলতে থাকে। বর্গাদার উচ্ছেদের বিরুদ্ধে, ফসলের ন্যায্য অধিকার ও ন্যায্যমূল্যের দাবিতে, পাটের ন্যায্যমূল্য প্রভৃতি বিষয় নিয়ে এই দাবিগুলি গড়ে ওঠে। জলপাইগুড়ি জেলাতে কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত ছিলেন তাঁরা হলেন মাধব দত্ত, সুরেশ দে, মনোরঞ্জন দাশগুপ্ত, শচীন দাশগুপ্ত, চারু মজুমদার, নরেশ চক্রবর্তী, গোবিন্দ কুণ্ডু, হরপ্রসাদ ঘোষ, বীরেন্দ্রনাথ পাল, ধরণী বর্মণ, দীননাথ রায়, উদয় রায়, মহেশ রায়, রাধামোহন বর্মণ, নৃপেন দাশ, নৃপেন মিত্র, পরেশ মিত্র, জীবন দত্ত, সুধন রাহা, প্রাণেশ পাল, মৃণাল সরকার, দিগেন খাসনবিশ, নগেন দেব, বনমালী রায়, সুভাষ সরকার, মানিক সান্যাল প্রমুখ। কৃষক আন্দোলনকে তিনভাগে বিভক্ত করা আবশ্যক। এক হল স্বাধীনতা লাভের পূর্বে তেভাগা আন্দোলন, পরবর্তীতে আন্দোলন এবং ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠার পর বর্গা অপারেশন, যার ফলে জলপাইগুড়ি জেলার কৃষকেরাও উপকৃত হয়েছে সমভাবে। পাটের ন্যায্য মূল্যের দাবিতে জেলা কৃষকসভার নেতৃত্বে জলপাইগুড়ি শহরে মাঝে মাঝেই বিরাট বিরাট মিছিল এসেছে জেলা শাসকের কাছে। মেমোরেন্ডাম ও ডেপুটেশন দেওয়া

> **জলপাইগুড়ি জেলার স্বাধীনতা লাভের পর কৃষক আন্দোলন উল্লেখযোগ্য। স্বাধীনতা লাভের প্রাক্-মুহূর্তে জলপাইগুড়ি জেলার তেভাগা আন্দোলন ছিল সারা বঙ্গের মধ্যে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। স্বাধীনতা লাভের পরও তার জের চলতে থাকে। বর্গাদার উচ্ছেদের বিরুদ্ধে, ফসলের ন্যায্য অধিকার ও ন্যায্যমূল্যের দাবিতে, পাটের ন্যায্যমূল্য প্রভৃতি বিষয় নিয়ে এই দাবিগুলি গড়ে ওঠে।**

হয়েছে। এফ সি আই সময়মতো পাটের বাজারে পাট ক্রয় করতে অবতীর্ণ হয় না, ফলে পাইকারদের হয় পোয়াবারো। কৃষকেরা ন্যূনতম মূল্যে পাট বিক্রয় করতে বাধ্য হয়। কৃষকসভার আন্দোলনের পর এফ সি আই কখনও কখনও পাট ক্রয় করতে বাধ্য হলেও কুইন্টালপ্রতি দাবি অনুযায়ী মূল্য দেয় না। প্রতি বছর এ সমস্যা দেখা দেয়। কৃষকরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থেকে যায়। এফ সি আই কেন্দ্রীয় সংস্থা হবার ফলে রাজ্য সরকারের করার কিছু থাকে না। তবে একথা বলা চলে যে বর্গা অপারেশনের ফলে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে, ফসলের ন্যায্যভাগের দাবিতে আন্দোলন গড়তে না হলেও ফসলের ন্যায্য দাবির যে সমস্ত আন্দোলন হয়েছে তার মধ্যে পাট অন্যতম। জলপাইগুড়ি জেলার কৃষকসভা এ ব্যাপারে অগ্রণী ছিল এবং আছে। তাই মাঝে মাঝেই কৃষক সমাবেশ, মিছিল, মেমোরেন্ডাম, স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচি বহাল আছে। এর ফলে সামান্য হলেও কৃষকরা কিছু সুবিধা পায়। তবে যতদিন পর্যন্ত না চটের থলে ব্যবহার বাধ্যতামূলক হচ্ছে এবং প্রতি বছর এফ সি আই পাটের বাজারে মরসুমের সময় কুইন্টালপ্রতি প্রাপ্য দাম দিচ্ছে তত দিন এ সমস্যা থেকে যাবে। সে আন্দোলনও জলপাইগুড়ি জেলাতে মাঝে মাঝেই হয়।

শিক্ষা আন্দোলন : স্বাধীনতা-উত্তর কালে জলপাইগুড়ি জেলাতে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি ও নিখিল বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির নেতৃত্ব এক গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার স্বাক্ষর রেখেছে। নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির নেতৃত্বে শিক্ষার দাবি—জাতীয় দাবি—এ দাবি মানতে হবে বলে সারা পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে জলপাইগুড়ি জেলার আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে। দেশ স্বাধীন হবার পরও ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থার ধারা চলতে থাকে এবং শিক্ষক সমাজ থাকে অবহেলিত। নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি কখনও তাদের আন্দোলন শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী বেতন-ভাতা বৃদ্ধির মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে শিক্ষক-শিক্ষা, ছাত্র-অভিভাবকদের দাবির মধ্যে পরিব্যাপ্ত করতে পেরেছিল, সেই কারণে সত্যিই শিক্ষকদের দাবি জাতীয় দাবির পর্যায়ে পর্যবসিত হতে পেরেছিল।

দীর্ঘদিন ধরে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ন্যায্য দাবি পূরণের প্রচেষ্টায় ব্রতী ছিলেন, কিন্তু কুম্ভকর্ণের ঘুম কি ভাঙে? শুনতে হয়েছে শুধু অভয়বাণী আর ফাঁকা সহানুভূতির কথা। সাধ আছে মধ্যে নেই, বুনো রামনাথের তেঁতুলপাতার ঝোল খেয়ে শিক্ষকতা করার উপদেশামৃত। কিন্তু 'মুখের কথায় চিঁড়ে ভেজে না—তার জন্য চাই জল। অতএব সত্যপ্রিয় রায়ের নেতৃত্বে সারা পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষক সমাজ গর্জে ওঠে। ১৯৫৪ সালের আন্দোলন তার প্রত্যক্ষ নিদর্শন। জলপাইগুড়ি জেলাতেও সেই আন্দোলনের ছোঁয়া লেগেছিল। নেতৃত্বে ছিলেন সুহৃদ সেন, সুরেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, মহেন্দ্রকুমার মৈত্র, অসিতানন্দ ভট্টাচার্য, সত্যসাধন বাগচী, সুধীরকুমার চক্রবর্তী, তারা ব্যানার্জি। ১৯৫৪ সালের আন্দোলনের ফলে এক নতুন বেতনক্রম চালু করা হয় ; কিন্তু পরবর্তীতে প্রতিশ্রুতি পালন না করায় সমিতি পুনরায় আন্দোলন অবতীর্ণ হতে বাধ্য হয়। ১৯৫৬ সালে জলপাইগুড়ি সমিতির বিংশতিতম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক মনোজ বসু। এই সম্মেলন থেকে সমিতি দাবি পূরণের জন্য দুর্বার গণ-আন্দোলন গড়ে তোলার প্রস্তাব গ্রহণ করে। সরকার কোনও দাবি না মানায় শিক্ষক সমাজ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ১৯৫৮ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৫ দিনের জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে এবং জেলায় জেলায় অনশন ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। জলপাইগুড়ি জেলা শহরের মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে সেই অনশন কর্মসূচি পালিত হয়। এই কর্মসূচিতে যাঁরা অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁরা হলেন তারা ব্যানার্জি, কল্যাণ দাশগুপ্ত, যতীন্দ্রলাল সিংহ, সরোজ ভৌমিক ও সুবোধ মিত্র। এই অনশন ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে

পথসভা পদযাত্রার মাধ্যমে আন্দোলনকে জনগণের মধ্যে নেওয়া সম্ভব হয়েছে। বিমাশিল্প বে-রাষ্ট্রীয়করণের বিরুদ্ধে লাগাতার যে আন্দোলন হয়েছে তার ফলে বিদেশি বহুজাতিক সংস্থাকে অনুপ্রবেশের সুযোগ দিলেও বে-রাষ্ট্রীয়করণ সম্ভব হয়নি। বিভাগীয় বিমাসমিতি আগাগোড়াই শক্তিশালী। প্রয়াত কুমুদ ঘোষ একজন প্রথম শ্রেণীর নেতৃত্ব। তারপর সুহৃদ দত্ত, সুধীর ধর, অনিল নিয়োগী, সুভাষ মুখার্জি, রামকৃষ্ণ তরফদার, সুখেন বিশ্বাস এবং বর্তমানে নেতৃত্বের মধ্যে রতন সান্যাল, অসীম নন্দী, ধ্রুব ব্যানার্জি, সৈকত চৌধুরী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এঁরা অতীতের আন্দোলনের ঐতিহ্য ধরে রাখতে তৎপর। উপদেষ্টা হিসাবে এখনও সুহৃদ দত্ত, সুধীর ধর, রামকৃষ্ণ তরফদার প্রমুখ প্রবীণ নেতৃত্ব তৎপর।

স্বাধীনতা লাভের পর জলপাইগুড়িতে বিগত ৫৪ বছরে যে সমস্ত গণ-আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে তার পূর্ণ বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। সামগ্রিকভাবে জলপাইগুড়ি জেলা উন্নয়নে বামফ্রন্ট সরকারের ভূমিকা যেমন আছে তেমনই আছে জেলার শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষক-ছাত্র-যুব-মহিলাদের ভূমিকা। জলপাইগুড়ি জেলাতে জেলা পরিষদে উন্নয়নমুখী কার্যকলাপ প্রশংসনীয়। সেচব্যবস্থা, রাস্তাঘাট, পানীয় জল, যোগাযোগ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন, যার মধ্যে স্পোর্টস কমপ্লেক্স ও আর্ট কমপ্লেক্স গড়ার আন্দোলন, সার্কিট বেঞ্চ স্থাপনের জন্য আন্দোলন উল্লেখযোগ্য। এছাড়া সাক্ষরতা আন্দোলনেও জলপাইগুড়ি জেলার একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। কিউবার সাহায্য, বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য অর্থ ও রক্ত সংগ্রহে জেলার ভূমিকা গৌরবোজ্জ্বল। বিভিন্ন গণ সংগঠন বিশেষ করে এ বি টি এ এক্ষেত্রে সারা পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ স্থানাধিকারী ছিল। ছাত্র-যুবদের রক্তদান কর্মসূচিও সারা জেলায় সাড়া ফেলেছে।।

একটি কথা উল্লেখ না করলে এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের রূপরেখাও অসম্পূর্ণ থাকবে। সেটি হল স্বাধীনতা লাভের পর শাসক দল হিসাবে কংগ্রেস দল প্রশাসনিক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট কতিপয় ব্যক্তিত্বের জলপাইগুড়ি জেলার উন্নয়ন, শিক্ষা সংস্কৃতি-ক্রীড়া, চিকিৎসাক্ষেত্রে কাজকর্ম জেলার বিভিন্ন স্তরের গণ-আন্দোলনের পরিপূরক হিসাবেই কাজ করেছে। তাঁরা হলেন ডাঃ চারুচন্দ্র সান্যাল, ডাঃ অবনী ধর গুহ নিয়োগী, ডাঃ ধীরাজমোহন সেন, রবীন্দ্রনাথ সিকদার, সতীশচন্দ্র লাহিড়ী, উপেন্দ্রনাথ বর্মণ, বাণী অশ্রুমতী দেবী, সত্যেন্দ্রপ্রসাদ রায়, বীরেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ, কামিনী রাহুত।

উপসংহারে বলা যায়, স্বাধীনতা লাভের পরেও এ জেলা গণ-আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক গৌরবময় ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। বিভিন্ন জাতি, সম্প্রদায়, ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে ঐক্য-সম্প্রীতি দীর্ঘকালের। জেলার মানুষ শান্তিপ্রিয়, কিন্তু দুঃখ, অনুতাপ এবং আশঙ্কার কথা হল বেশ কিছুদিন থেকে শান্ত এই জেলাকে অশান্ত করতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট করতে ভেতরে-বাইরে এক দুষ্টচক্র সক্রিয়। জেলার সর্বস্তরের শান্তিপ্রিয় প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক মানুষের একান্ত কর্তব্য হল এই ঐক্যবিরোধী শক্তি যাতে পশ্চাৎপদ হতে বাধ্য হয় তার জন্য সোচ্চার হওয়া ও যথাসাধ্য লাগাতার দুর্বার গণ-আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। অন্যথায় ভবিষ্যৎ ইতিহাস আমাদের ক্ষমা করবে না।

লেখক ❑ শিক্ষক, সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক



আলিপুর দুয়ারে বিশ্ব পরিবেশ দিবসের মিছিল ছবি : অমল দত্ত



জগৎ সাহা

তেভাগা আন্দোলনে জলপাইগুড়ি

জলপাইগুড়ি জেলার তেভাগা আন্দোলন সম্পর্কে কিছু বলতে হলে আমাদের ফিরে যেতে হবে অবিভক্ত বাংলাদেশে অর্থাৎ ১৯৪৭ সনের ১৫ আগস্টের পূর্বের জেলাতে। এরই সঙ্গে চলে আসে পরাধীন ভারত দেশটার স্বাধীন হহয়ার আগের ১৯০ বছর ১ মাস ২২ দিন ধরে যারা বাংলার রক্ত মোক্ষণ করেছিল, সেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের নিষ্ঠুর ইতিহাস পর্যালোচনার। ব্রিটিশ ভারত দেশটার দখল নেওয়ার মুহূর্তকাল থেকেই বাংলায় দুর্ভিক্ষের বিভীষিকা মারাত্মক রূপ নেয়। সেই সময় বাংলাদেশের পথেপ্রান্তরে কয়েক লক্ষ মানুষ মৃত্যুর মিছিলে মিশে যায়। গর্জে ওঠে ইংরেজবিরোধী রণধ্বনি। সন্ন্যাসী ও ফকিররা বাংলার উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ইংরেজদের আশ্রয়পুষ্ট জমিদার ও তাঁবেদারদের বিরুদ্ধে এক দুঃসাহসিক লড়াই আরম্ভ করে। যে এলাকার মাটিতে সন্ন্যাসী-ফকিরদের রক্ত ঝরে, সেই এলাকার মাটিতেই আবার গড়ে ওঠে তেভাগার আন্দোলনের ঝড়। তেভাগা আন্দোলনের প্রাক্‌কালে বাংলার মাটিতে ঘটে যায় পঞ্চাশের মন্বন্তর। ত্রিশ লক্ষ বুভুক্ষু মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। গ্রামের পর গ্রামে, গঞ্জের পর গঞ্জে ক্ষুধার তাড়নায় মারা যায় খেতমজুর, ভাগচাষী, কামার, কুমোর, ছুতোর, জেলে এবং লক্ষ লক্ষ খেটেখাওয়া মানুষ। ঐতিহাসিক উপাদানের ক্ষেত্রে সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহে প্রচুর সাযুজ্য পরিলক্ষিত হয়। গণ-আন্দোলনের ভিতও ধীরে ধীরে পোক্ত হতে থাকে। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে তার ভিত প্রসারিত হতে থাকে।

এক সমৃদ্ধ ঐতিহাসিক উপাদানের উপর দাঁড়িয়েই তেভাগা আন্দোলন সংগঠিত হয়। তেভাগা আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে আমাদের একটুখানি ফিরে যেতে হয় দেবী চৌধুরানীর যুগেও। ইতিহাসের পাতা ওলটালে অনেক সমৃদ্ধ তত্ত্ব আমাদের চোখের সামনের কালো পর্দাটাকে উন্মোচন করবে। দেবী চৌধুরানীর যুগে ভবানী পাঠক এক প্রবাদপুরুষ। তিনি অত্যাচারী জমিদার ও ইংরেজদের বিরুদ্ধে



তেভাগা আন্দোলনে কৃষকদের নিজস্ব খামার শিল্পী : চিত্ত হোড়

লড়াই করতে গিয়ে প্রাণত্যাগ করেন। এ সম্পর্কে এ এন চন্দ্রের লেখা The Sannyashi Rebellion গ্রন্থের কয়েকটি কথা উল্লেখ না করে পারলাম না। In June 1787, the merchants again reported to Lieutanant Brennan, commanding a detachment at Silberis, that Pathak was 'within ten coss of Govindgunge in Rangur district with fifty Burkandazes.' The lieutanant despached a Havilder with twenty four Sepoys in search of Pathak. They, however, surprised him in his local and in a close fight. Pathak and his chiefman, a Pathan, offered desperate resistance during which Pathak and his lieutanant were killed and the Party routed. Some of his followers were killed, some fled away and some were captured and brought to the Criminal Court for trial. Thus ended the life of Bhawani Pathak who, for the sake of his country and people, accepted martyrdom in the every first revolution against the British rulers in India." এই বিদ্রোহের কোনও ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত নেতৃত্ব ছিল না কিন্তু এই বিদ্রোহের প্রকোপ সমস্ত বাংলা ও বিহারে ব্যাপৃত হয়েছিল, সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহকেই প্রথম ইংরেজবিরোধী বিদ্রোহ বলা যায়।

ইংরেজ শাসিত বাংলাদেশে জোতদার-জমিদারের বিরুদ্ধে তেভাগা আন্দোলন সংগঠিত হয়। এই আন্দোলনের সময়কাল ১৯৪৫, ১৯৪৬ এবং ১৯৪৭-কেই সমধিক গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। এই আন্দোলন সংগঠিত হয় অবিভক্ত বাংলার দশটি জেলায়—মোট কমবেশি ৪১টি স্থানে। আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিল অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির নিয়ন্ত্রিত কৃষকসভার সংগঠন। আন্দোলনের দাবিগুলি ছিল—(১) উৎপন্ন ফসলের তিন ভাগের দুই ভাগ ভাগচাষী (আধিয়ার) কৃষকদের দিতে হবে, (২) ভাগচাষীদের তাদের আবাদীকৃত জমির উপরে দখলস্বত্ব দিতে হবে, (৩) জমির মালিক অর্থাৎ জোতদার কিংবা জমিদারের খোলানে ধান অথবা কোনও প্রকার ফসল তোলা যাবে না এবং সমস্ত ফসলই ভাগচাষীদের খোলানে তুলতে হবে। (৪) প্রতিটি ফসল ভাগের ক্ষেত্রে ভাগচাষীদের রসিদ দিতে হবে। (৫) হরেক রকম আদায় ভাগচাষীদের কাছ থেকে নেওয়া চলবে না। (৬) আবাদযোগ্য যে কোনও পতিত জমিতে ভাগচাষীদের ফসল করবার জন্য অধিকার দিতে হবে। (৭) ভাগচাষীদের জমি থেকে ইচ্ছানুসারে উচ্ছেদ বন্ধ করতে হবে।

মূলত এই সাতটি দাবির ভিত্তিতেই বাংলার দশটি জেলায় ভাগচাষী কৃষক ও গ্রামের খেটেখাওয়া মানুষের বিশাল একটি অংশ তেভাগা আন্দোলনের বিশাল আওয়াজ তোলেন। পঞ্চাশের মন্বন্তরের পর বুভুক্ষু ও ক্ষুধার্ত মানুষের মধ্যে জাতি, ধর্ম ও ভাষা ভুলে এক ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ভারতের উপনিবেশবাদীদের বিরুদ্ধে গড়ে তোলেন। সেই সঙ্গে ইংরেজ প্রভুদের সন্তুষ্ট করতে গিয়ে যারা দেশের গরিব মানুষদের তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে প্রবঞ্চিত করত তাদের বিরুদ্ধেও ধীরে ধীরে কৃষকসভার নেতৃত্বে কৃষকগণ ঐক্যবদ্ধ হতে আরম্ভ করে। জাতপাতের প্রশ্ন নিয়ে যখন গোটা ভারতবর্ষ উত্তাল, সমগ্র দেশের বিভিন্ন এলাকায় জাতপাতের প্রশ্নে রক্তের হোলি চলছে, ঠিক সেই মুহূর্তে দরিদ্র মানুষের মেলবন্ধনের রাজনীতি শুধুমাত্র ইংরেজ শাসকদেরই ঘাবড়ে দেয়নি; ঘাবড়ে দিয়েছিল জাতীয় আন্দোলনের বড় বড় নেতাদেরও। এই বাস্তবধর্মী কৃষক আন্দোলন গোটা স্বাধীনতা আন্দোলনে একটা বিশাল অধ্যায় জুড়ে রয়েছে। এই আন্দোলনের বড় অংশীদার অবিভক্ত জলপাইগুড়ি জেলার তেভাগা আন্দোলন সম্পর্কে আমরা অনেক মূল্যবান দলিল আলোচনার জন্য পেয়েছি, সামগ্রিকভাবে তার আলোচনা স্বল্প পরিসরে করা সম্ভব নয়। একটা বাস্তবমুখী চিত্র রাখবার চেষ্টা করছি।

অবিভক্ত বাংলার জলপাইগুড়ি জেলার পচাগড়, দেবীগঞ্জ, তেতুলিয়া এবং পাটগ্রাম মোট ৬৭২ বর্গ মাইল এলাকা ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্টের পর এই জেলা থেকে কেটে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। ফলে জেলা কৃষক আন্দোলনের সম্পর্কে লিখতে এই এলাকাগুলির কথা অবশ্য আসবেই। এই এলাকার অন্তর্গত বোদা, পাঁচপীর, ময়নাদিঘি প্রভৃতি এলাকায় অনেকগুলি ছোটবড় হাট ছিল। এই হাটগুলিতে জোতদার, জমিদারদের খাজনা ও তোলা আদায়ের অত্যাচার বাড়ে। এই সময় ১০২৮ টি ক্ষেত্রে অবৈধভাবে খাজনা বাড়ানো হয়। এই অত্যাচারী জোতদার-জমিদারের বিরুদ্ধে গ্রামের নিপীড়িত কৃষক ভাগচাষী এবং খেটেখাওয়া মানুষদের সংগঠিত করবার জন্য দায়িত্ব নেন মাধব দত্ত, গুরুদাস রায়, নরেশ চক্রবর্তী, শচীন দাশগুপ্ত এবং আরও অনেকে। এরা কৃষকদের সংগঠিত করে লাল ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে মিছিল করত এবং শ্লোগান ছিল 'লাঙ্গল যার জমি তার' ও গাণ্ডী তোলা বন্ধ কর; অন্যায় আদায় বন্ধ কর। এই আন্দোলনের জোয়ার গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। এই সময়ে জলপাইগুড়ি জেলার মোট আবাদযোগ্য জমি ছিল ১৩,৩৬৯৮০ একর। তন্মধ্যে আবাদ করা হত ৭৪৫৬০০ একর অর্থাৎ ৫৫.৭ ভাগ জমিতে মাত্র। আধিয়ার কৃষক, ভূমিহীন কৃষক এবং ছোট কৃষক মিলে মোট ১১০৯৫৮টি পরিবারের বাস ছিল।

ইতিমধ্যে জলপাইগুড়ির জগদীন্দ্র নগরে ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯ সালে কংগ্রেসের সম্মেলন উপলক্ষে হাজার হাজার কৃষক লাল ঝাণ্ডা নিয়ে মিছিলে সামিল হয় এবং এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করবার জন্য দাবি জানাতে থাকে। সম্মেলনে অন্যতম বক্তা ছিলেন সুভাষ বসু। স্থানীয় প্রগতিশীল ও বামপন্থী চিন্তাধারাসমৃদ্ধ নেতাদের সহযোগিতায় প্রতিনিধি ফি ছাড়াই কৃষকগণ সম্মেলনে প্রবেশ করার অনুমোদন পায়। এই ঘটনা কৃষক আন্দোলনকে উদ্দীপিত করে।

'গান্ডী' আদায় বন্ধের মধ্য দিয়ে কৃষক আন্দোলনের জয়যাত্রা শুরু হল। ইতিমধ্যে রংপুর ও দিনাজপুরের কৃষক আন্দোলনও জলপাইগুড়ির কৃষক আন্দোলন থেকে প্রেরণা লাভ করে। গ্রাম থেকে রাধামোহন বর্মণ, ইন্দ্রমোহন বর্মণ, উমেশ রায়, উদয় বর্মণ, বিদ্যাধর বর্মণ কৃষকসভার ঝাণ্ডার নিচে ঐক্যবদ্ধ হলেন। শহর থেকে এলেন ছাত্রফ্রন্টের অবনী তলাপাত্র, সত্যেন মজুমদার (পানু), গোবিন্দ কুণ্ডু আরও অনেকে। মহিলাদের মধ্যে শিখা নন্দী, কল্যাণী দাশগুপ্ত, অমিয়া নন্দী, কল্পনা নিয়োগী এঁদেরও আমরা কৃষক আন্দোলনের পাশে দেখতে পাই। এ ছাড়াও দেখতে পাই চারু মজমুদার, মনোরঞ্জন দাশগুপ্ত ও পরিমল মিত্রকে। এই সময়ে অর্থাৎ ১৯৩৯ সালে ১৮ জুলাই ময়দানদিঘিতে প্রথম জলপাইগুড়ি জেলার কৃষকসভার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সদর, বোদা, পচাগড় ও দেবীগঞ্জ থানার প্রায় সব ইউনিয়নগুলিতে কৃষকসভার সমিতি গঠন হয়। এই সম্মেলনে কৃষকসভার পক্ষে বক্তব্য রাখেন আব্দুল্লা রসুল ও বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়। জলপাইগুড়ি জেলার কৃষকেরা গান্ডী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আত্মবিশ্বাসে নিজেদের আন্দোলনের ভিত সুদৃঢ় করে। ২৫০০ সুশিক্ষিত ও সুদক্ষ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী তৈরি করে। এরা ভুল্লা নদীর তীরে কালির মেলায় জমিদারদের অন্যায় আদায়ের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলেন। 'কালির থেলাস কালা আইন চলবে না, অতিরিক্ত কোনও কর আদায় করা চলবে না।' শেষ পর্যন্ত জমিদার ও পুলিসের জুলুম থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে ভুল্লা নদীর এপারে জলপাইগুড়ি জেলার সীমানার মধ্যে কৃষকসভার নেতৃত্বে মেলা বসানো হয়। এই কালির মেলায় কৃষকসভা এক ঐতিহাসিক সাফল্য লাভ করে।

কৃষকসভার 'জোতদার জমিদার প্রথা ধ্বংস হোক' এই শ্লোগান তার সঙ্গে 'গান্ডী নাই ও তেভাগা করতে হবে' এই সমস্ত শ্লোগান জলপাইগুড়ি জেলার প্রত্যন্ত এলাকা পর্যন্ত আলোড়ন সৃষ্টি করে। কৃষক আন্দোলনকে প্রতিরোধ করবার জন্য বর্ধিষ্ণু জোতদার-জমিদার সেই সঙ্গে জলপাইগুড়ি জেলার নবাব মোশারফ হোসেনের নেতৃত্বে ক্ষত্রিয় সমিতি গড়ে ওঠে। প্রসঙ্গত বলে নেওয়াই ভাল এই সময়টা গোটা জলপাইগুড়ি জেলার উপর দিয়ে বিভিন্ন আন্দোলনের ঝড় বয়ে যায়। ১৯৪০ থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত গোটা জলপাইগুড়ি জেলার চা-বাগানগুলিতে শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন গড়ে তোলবার জন্য তোড়জোড় শুরু হয়। মালড়ও মেটেলি এলাকায় চা-বাগানে ঠিকা প্রথা উচ্ছেদ, মজুরি বৃদ্ধি, চিকিৎসা ও বাসস্থানের ব্যবস্থা ও শ্রমিকদের কাজে স্থায়ীকরণ এটাই ছিল মূল শ্লোগান। এ আন্দোলন পরিচালিত হয় কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে। কৃষক আন্দোলন থেমে যায়নি। যদিও সাম্প্রদায়িকতার বিদ্বেষ কৃষক আন্দোলনের উপর চাপ সৃষ্টি করবার চেষ্টা করেছিল ; কিন্তু কৃষক আন্দোলন তার স্বতঃস্ফূর্ততা নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছিল। এই আন্দোলনের মাঝখানে একজন রমণী যার ভূমিকা কৃষক আন্দোলনকে সমৃদ্ধ করে তাকে সবাই 'বুড়িমা' বলে ডাকতেন। ইতিমধ্যে কৃষক এবং শ্রমিকের আন্দোলন এক ঐতিহাসিক রূপ নেয়। দোমহনীতে রেল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত হন দেবপ্রসাদ ঘোষ (পোটল ঘোষ), পরিমল মিত্র, যদুনাথ সিং, পরিচ্ছন মিস্ত্রি, অপরেশ রায়, হীরালাল, রেবতীমোহন বসু, রামচরিত মিস্ত্রি, ইন্দু দাশগুপ্ত, বারীন বিশ্বাস, রামেশ্বর সিং, শিবেশ্বর আচার্য, মোহিত বাগচী প্রমুখ। প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হয় যে পরবর্তীকালে জ্যোতি বসু এই ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

রেল শ্রমিক ও ইউনিয়নের নেতা ও কর্মীগণ, চা-বাগানের শ্রমিক ও নেতাগণ কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। রেলের পয়েন্টস্‌ম্যান ও গ্যাংম্যানগণ চা-শ্রমিকদের সঙ্গে সর্বদা যোগাযোগ রাখতেন। ফলে শ্রমিক-কৃষকের মৈত্রী নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি করতে সাহায্য করে। ১৯৪৬ সালের ৬ ডিসেম্বর আসাম-বেঙ্গল রেল ইউনিয়নের চতুর্থ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় আসামের লামডিং শহরে। এই চতুর্থ সম্মেলনে তেভাগা আন্দোলন সম্পর্কে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবে বলা হয় যে 'বাংলা ও আসামের কৃষকেরা ফসলের ন্যায্য অংশ পাওয়ার জন্য যে তেভাগা আন্দোলন শুরু করেছেন, এই

১৯৪৬ সালের ৬ ডিসেম্বর আসাম-বেঙ্গল রেল ইউনিয়নের চতুর্থ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় আসামের লামডিং শহরে। এই চতুর্থ সম্মেলনে তেভাগা আন্দোলন সম্পর্কে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবে বলা হয় যে 'বাংলা ও আসামের কৃষকেরা ফসলের ন্যায্য অংশ পাওয়ার জন্য যে তেভাগা আন্দোলন শুরু করেছেন, এই সম্মেলন তাহার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছে। সম্মেলন মনে করে যে, যে সমস্ত বৃহৎ জমির মালিকেরা ফসল উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে যাদের কোনও সক্রিয় অংশ নাই তাহারা ফসলের এক-তৃতীয়াংশের বেশি ফসল পাওয়ার অধিকারী নন, এই দাবির অনুকূলে আইন পাশ করবার জন্য এই সম্মেলন বাংলা সরকারের প্রতি আবেদন জানাচ্ছে।'

সম্মেলন তাহার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছে। সম্মেলন মনে করে যে, যে সমস্ত বৃহৎ জমির মালিকেরা ফসল উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে যাদের কোনও সক্রিয় অংশ নাই তাহারা ফসলের এক-তৃতীয়াংশের বেশি ফসল পাওয়ার অধিকারী নন, এই দাবির অনুকূলে আইন পাশ করবার জন্য এই সম্মেলন বাংলা সরকারের প্রতি আবেদন জানাচ্ছে।'

কৃষকসভা ১৯৪৫ সাল থেকেই জলপাইগুড়ি জেলার তেভাগা আন্দোলনকে পরিচালিত করে। ১৯৪৬ সালে আমলাহার নামক স্থানে তেভাগা করা হয় হরেন বর্মণের জমিতে। এর পরে ময়দানদিঘিতে মংলু মোহাম্মদ ও কাবাত মোহাম্মদের জমিতেও তেভাগা হয়। এই আন্দোলনে জোতদারগণ বন্দুক ব্যবহার করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়। এই আন্দোলনের গতি ও প্রক্রিয়া জানবার জন্য প্রাদেশিক কৃষকনেতা কৃষ্ণবিনোদ রায়কে জলপাইগুড়িতে পাঠানো হয়। এর পর তেভাগা আন্দোলন শুরু হয় দেবীগঞ্জে সুরেন রায়ের বাড়িতে। এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন মাধব দত্ত ও বিদ্যাধর রায়। দেবীগঞ্জের তেভাগা আন্দোলনে 'বুড়িমা'র ভূমিকা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। তার নেতৃত্বে



রাতের গোপন সভায় তেভাগা আন্দোলনের নেতাদের সমাবেশ — *শিল্পী : চিত্ত হোড়*

সাতশত মহিলার একটি বাহিনী তৈরি হয়। তাকে বলা হত গাইন বাহিনী। এই দেবীগঞ্জ থানার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন মনোরঞ্জন দাশগুপ্ত, নরেশ চক্রবর্তী ডাঃ শচীন দাশগুপ্ত ও আরও অনেকে।

এই সময় গোটা বাংলাব্যাপী চলছিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। কলকাতা ও নোয়াখালিতে ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গায় হাজারও মানুষের রক্তে ভিজে ওঠে বাংলার মাটি। তারই সামনে দাঁড়িয়ে মিলিত হয় গরিব হিন্দু মুসলমান ও খেটেখাওয়া মানুষেরা তাদেরই রক্তে বোনা ধানের অধিকারকে রক্ষা করতে। এক অনন্য চিত্র যার মূল্যায়ন আজও সঠিকভাবে করা সম্ভব হয়নি। ইতিমধ্যে ডুয়ার্সে তেভাগা আন্দোলনের আগুন ছড়িয়ে পড়ে। পোটল ঘোষ, যদুনাথ সিং, বুধন উরাও, ফাগুরাম উরাও, জগন্নাথ উরাও, লালশুকরা উরাও, সোমা গাঙ্গুলী (সমর গাঙ্গুলী) এবং রেল ও চা-শ্রমিকের নেতৃবর্গ তেভাগার দাবির ভিত্তিতে হ্যান্ডবিল বিলি এবং মিটিং-মিছিল শুরু করে গ্রামের গরিব মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে। হাজার হাজার কৃষক তাদের সঙ্গে রেল শ্রমিক ও চা-শ্রমিক ঐক্যের সেতুবন্ধনে ডুয়ার্সের বিভিন্ন এলাকায় তেভাগা আন্দোলন শুরু করেন মালবাজার, মঙ্গলবাড়ি, ওদলাবাড়ি, নেওরা-মাঝিয়ালী, তোসমলা, সুলকাপাড়া, সাউগা, কলাগাইতি ও সরুগাঁও নামক প্রভৃতি এলাকায়। ইতিমধ্যে ডুয়ার্সের বিভিন্ন এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করে সভাসমিতি নিষিদ্ধ করে দেয় ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী। দোমহনীতে ১৪৪ ধারা অমান্য করে ১ মার্চ '৪৭ জ্যোতি বসুর সভা হয়। দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে আধিয়ার কৃষক, গরিব খেতমজুর, চা-শ্রমিক ও রেল শ্রমিকগণ ঐক্যবদ্ধভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েন মেটেলী থানার অন্তর্গত নেওরা-মাঝিয়ালী গ্রামের ভোদলো দেউনিয়ার (আতাহারউদ্দিন) খোলানে। এই দিন জোতদার ধান তেভাগা করবার জন্য প্রতারণার আশ্রয় নেয় ও জোতদার তার বাড়িতে আগে থেকেই পুলিশ এনে লুকিয়ে রাখে এবং এই ধানের ভাগ নিতে গেলে তাদের উপর নির্বিচারে গুলি চালায় এর ফলে ৫ জন কৃষক ও শ্রমিক শহিদের মৃত্যুবরণ করেন। ১৯৪৭ সনের ৪ এপ্রিল মেটেলী থানার মঙ্গলবাড়ির গয়ানাথ দাসের খোলানে ধান ভাগের ঘটনা জলপাইগুড়ি জেলার কৃষক আন্দোলনের ইতিহাসকে কৃষক-শ্রমিক রক্তে রঞ্জিত করা হয়। সে এক মর্মন্তুদ এবং করুণ কাহিনী। মেটেলী থানার নেওরামাঝিয়ালীর নিকটবর্তী খড়িয়ার বন্দরের বালগোবিন্দের মাঠে কৃষক-শ্রমিকগণ নিজেদের লড়াইয়ের শিবির তৈরি করেন। এই মাঠের নাম দিয়েছিল পলাশীর ময়দান। নামকরণ



তেভাগা আন্দোলনে কৃষক মিছিল

করেন হপনা মাঝি, এরই সঙ্গে গাওয়া হয় চারণ কবি লালশুকরার গান। লালশুকরার সাথে তার কাকার মেয়ে পোকো উড়াইন গান গেয়ে কৃষক-শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করত। গয়ানাথ দাসের খোলানে শহিদের মৃত্যু বরণ করেন ১০ জন। তা ছাড়া গুরুতর আহত হন ১২ জন। এই আহত ও নিহতদের মধ্যে একটি ৮ বৎসরের বালকও ছিল। আহতদের এবং নিহতদের রেলের শ্রমিকদের সাহায্যে জলপাইগুড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। উল্লেখ থাকে যে গয়ানাথ দাসের আধিয়ারদের মধ্যে শুধু রাজবংশীই ছিলেন না সাঁওতাল ও নেপালিও ছিলেন। এ বিষয়ে পরিতোষ দত্তের জলপাইগুড়ি জেলার 'তেভাগার বৈশিষ্ট্য' নামক প্রবন্ধে সে কাহিনী উল্লেখ করা আছে তার আর পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। তবে একথা বলতেই হয় যে যাদের রক্তের বিনিময়ে ভাগচাষীর আইন খাস ও বেনামী জমির অধিকার পশ্চিমবাংলার মানুষ ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্টের পর অর্জন করেছেন তাদের বীরত্ব, ত্যাগ এবং নিষ্ঠার প্রতি আজকের সমাজের খেটেখাওয়া শ্রমিক-কৃষকের কাছে পাথেয় হয়ে থাকবে। তাদের অসমাপ্ত কাজ এখনও বাকি রয়েছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের তাঁবেদারগণ লক্ষ কোটি কণ্ঠের আওয়াজ রুদ্ধ করে দিতে চায়। অর্জিত অধিকারকে কেড়ে নেওয়ার জন্য জলপাইগুড়িসহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় আরম্ভ করেছে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন। কেড়ে নিতে চায় ওরা মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার যে অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণ দিলেন শত শত মানুষ সে অধিকারকে কোনমতেই ছিনিয়ে নিতে পারবে না। এখন চাই শহিদদের শেষ কাজ অর্জিত অধিকারকে সুরক্ষা করা।

১৯৯৭ সালের তেভাগার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে চালশায় একটি শহিদ স্তম্ভ স্থাপন করা হয়। এই শহিদ স্তম্ভটির উদ্বোধন করেন পশ্চিমবাংলার অনন্য ব্যক্তিত্ব শ্রীবিনয়কৃষ্ণ চৌধুরি।

মেটেলী থানার তেভাগা আন্দোলন জোতদার ও ব্রিটিশ শাসকদের গুলিতে নিহত শহিদ শ্রমিক ও কৃষকদের নামের তালিকা :

"তাং ১ মার্চ ও ৪ এপ্রিল ১৮৪৭ সাল।

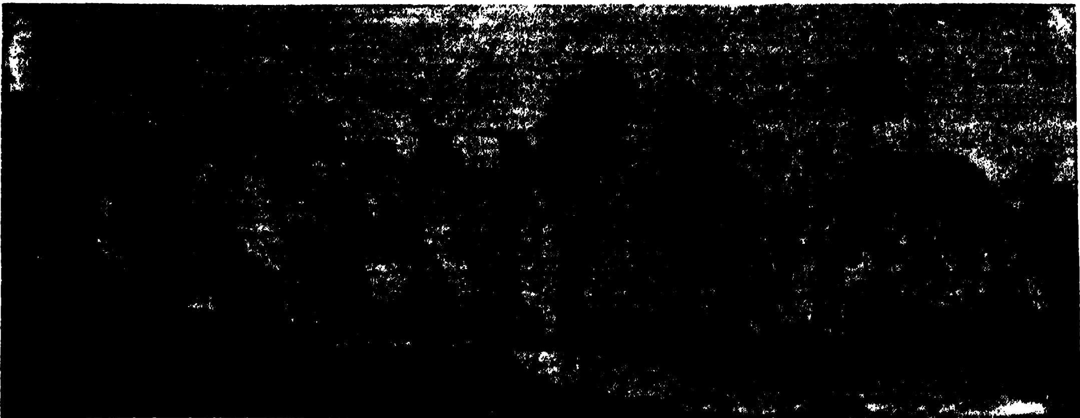
১।	কমরেড হপনা মাঝি	—	চা-শ্রমিক
২।	কমরেড সরবরু মোহাম্মদ	—	কৃষক
৩।	কমরেড বুধু খেড়িয়া	—	চা-শ্রমিক
৪।	কমরেড কৃষ্ণ উরাও	—	ঐ
৫।	কমরেড রামু মুণ্ডা	—	ঐ
৬।	কমরেড বিরশা উরাও	—	কৃষক
৭।	কমরেড জিতু কুমহার	—	চা-শ্রমিক
৮।	কমরেড বেচপা খেড়িয়া	—	ঐ
৯।	কমরেড লছমণ সিং	—	রেল শ্রমিক
১০।	কমরেড শহরাই মুণ্ডা	—	কৃষক
১১।	কমরেড লোধরা বুড়া	—	চা-শ্রমিক
১২।	কমরেড করমী উরাত্তনী	—	কৃষক রমণী
১৩।	কমরেড বুধনী উরাত্তনী	—	ঐ
১৪।	কমরেড স্বর্ণময়ী উরাত্তনী	—	ঐ
১৫।	কমরেড এতোয়ারী উরাত্তনী	—	ঐ

১৯৪৭ সনের ১৫ আগস্টের পর জলপাইগুড়ির চেহারা ক্ষীণকায় হয়ে পড়ে অর্থাৎ ৬৭২ বর্গ মাইল এলাকা পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। স্বাধীন ভারত পঙ্গু সন্তান নিয়ে দেশ শাসনের ক্ষমতা পায়। এটা ক্ষমতা হস্তান্তরের নামান্তর মাত্র। অবিভক্ত বাংলার বিধানসভায় জ্যোতি বসু তেভাগা আন্দোলনের নিহত শহিদদের জন্য শোক প্রস্তাব এবং জোতদার ও জমিদারদের নৃশংস অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রস্তাব উত্থাপন করলে কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের রাজনৈতিক দল এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে। কিন্তু তেভাগা আন্দোলনের রাজনৈতিক অভিমুখ ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠীর বুঝতে এতটুকু অসুবিধা হয়নি। তাই লন্ডনে কমনস্‌সভায় সেই সময়কার প্রধানমন্ত্রী এটলি বলতে বাধ্য হন যে, 'যদি আমরা এ বিষয়ে এখনই খুব সজাগ ও সতর্ক না হই, তবে পরিণাম যতটা খারাপ হবে বলে আশঙ্কা করা যায়, বাস্তবে তার চেয়ে বেশি খারাপ হতে পারে। ভারতকে শুধু যে গৃহযুদ্ধের মধ্যেই ছেড়ে দিয়ে আসা হবে তা নয়, বস্তুত ভারতকে একনায়কতা প্রতিষ্ঠায় সমৃদ্ধত রাজনৈতিক আন্দোলনের গ্রাসের মধ্যে সঁপে দিয়ে আসা হবে।'[১]

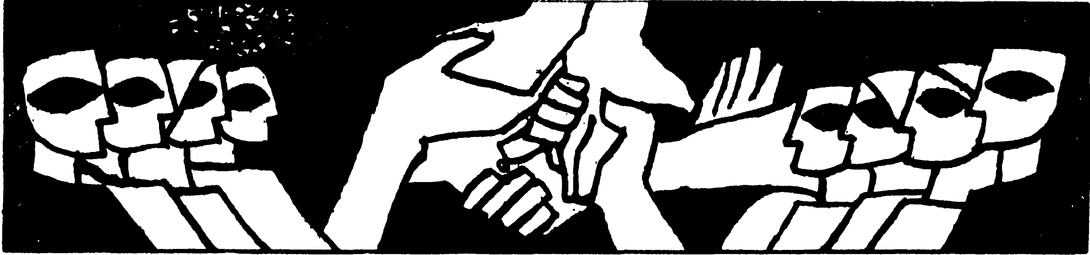
উপরোক্ত ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর কমনসসভার বক্তব্য অত্যন্ত রাজনৈতিক পরিপক্বতার ইঙ্গিত বহন করে। তেভাগা আন্দোলন শুধুমাত্র বাংলাই নয় সমগ্র ভারতবর্ষের নিপীড়িত কৃষকসমাজের কাছে কৃষক আন্দোলনের এক নতুন দিগন্ত খুলে দেয়। তাই তেভাগার আন্দোলন আজও স্মরণীয়।

লেখক ❑ কৃষক আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক ও প্রাবন্ধিক।

১। এই উদ্ধৃতি 'Mission with Mount-Batten গ্রন্থ থেকে গৃহীত।



কৃষক মিছিল



পবিত্রভূষণ সরকার

জলপাইগুড়ি জেলার সংবাদপত্রের ইতিহাস

নদ-নদী, বন, পাহাড় ঘেরা অরণ্যসংকুল এই জলপাইগুড়ি জেলায় স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে এবং স্বাধীনতা-উত্তর পর্যায়ে পত্রপত্রিকার সংখ্যা কম ছিল না। পশ্চিমবঙ্গের ১৮টি জেলার মধ্যে পত্রপত্রিকার আন্দোলন ও সমারোহে এবং বিষয়-বৈচিত্র্যে এই জেলা এক গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করে এসেছে বরাবর। এই জেলায় স্বাধীনতা আন্দোলন, গণ-আন্দোলন ও সাহিত্য বিকাশে এসব পত্রপত্রিকার অবদান চিরস্মরণীয়। অগুন্তি সংবাদপত্র এই জেলা থেকে এক সময় প্রকাশিত হয়েছে, যার কিছু এখনও টিকে আছে। কালের গহ্বরে অনেকে হারিয়ে গেছে। আবার অনেক নতুন পত্রিকার জন্ম হয়েছে। এখন এই জেলায় পত্রপত্রিকার সংখ্যা অনেক। অনেকগুলোর মানও খুব উন্নত হয়েছে। অবশ্য বহু পত্রিকা কয়েকটি মাত্র সংখ্যা প্রকাশিত হয়ে পরিচালনাগত ত্রুটির জন্যে অকালে হারিয়ে গেছে। তবুও সেসব প্রকাশিত পত্রিকার অবদান কম নয়। নতুন চেতনার বিকাশ, সত্য উদ্‌ঘাটন, সাহিত্যবিকাশ ও লেখক তৈরির জন্য এগুলো এককালে হাতিয়ার ছিল, এখনও আছে। নানা বাধাবিঘ্ন, অর্থকরী অসুবিধার মধ্যেও এখনও এই জেলায় কিছু পত্রিকাপ্রেমী পত্রিকা বের করেন, তাদের সে প্রচেষ্টা থেমে নেই।

বিভিন্ন নথি অনুযায়ী এবং অনুসন্ধান করে যতদূর জানা যায় এ জেলার প্রথম প্রকাশিত সংবাদপত্র ছিল 'ত্রিস্রোতা'। এটি ছিল প্রথমে মাসিক পত্রিকা। আইনজীবী শশীকুমার নিয়োগীর সম্পাদনায় এবং ভুজঙ্গধর চৌধুরীর সহযোগিতায় এটি জলপাইগুড়ি শহর থেকে প্রকাশিত হত। প্রকাশকাল ১৯০০ খ্রিস্টাব্দ। এই পত্রিকার লক্ষ্য ছিল সমাজজীবনে পারস্পরিক ঐক্য গড়ে তোলা এবং নানা সমাজ কল্যাণকর কাজে মানুষকে উৎসাহ প্রদান করা। মাত্র পাঁচ বছরের মতো সময় এই পত্রিকাটি স্বীয় অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। শশীকুমার নিয়োগীর মৃত্যুর পর পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে তৎকালীন জলপাইগুড়ি শহরের



নূতন ও পুরাতন সংবাদপত্রের প্রদর্শনী

আইনজীবী জ্যোতিষচন্দ্র সান্যাল সাপ্তাহিক 'জনমত' বের করেন। 'জনমত' প্রথম সংখ্যার প্রকাশনার তারিখ ছিল ১৯২৪ সালের ১৪ই জানুয়ারি। মূল্য ছিল প্রতি সংখ্যা নগদ দুই পয়সা মাত্র। প্রথম সংখ্যার বিষয়সূচীতে ছিল : (১) নির্বাচন প্রসঙ্গ (২) সম্পাদকীয় (৩) সংরক্ষণ নীতি (৪) কংগ্রেস অভিভাষণ (৫) দেশ-বিদেশের কথা (৬) বাটোয়ারীপত্র ও মায়ের কথা (৭) মোসলেম জগৎ (৮) স্থানীয় সংবাদ। 'জনমত'-এর গ্রাহক হবার জন্য লাগত শহরে—বাৎসরিক দেড় টাকা। ষান্মাসিক—বারো আনা। শহরের বাইরে বাৎসরিক দুই টাকা। ষান্মাসিক—একটাকা চার আনা। জ্যোতিষ সান্যালের মৃত্যুর পর পর্যায়ক্রমে 'জনমত'—এর সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ মৌলিক, কুমুদিনীকান্ত চক্রবর্তী, ডাঃ চারুচন্দ্র সান্যাল। বর্তমানে মুকুলেশ সান্যাল এই পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্বে আছেন এবং পত্রিকাটি এখনও নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছে।

আইনজীবী জ্যোতিষচন্দ্র সান্যাল 'জনমত' পত্রিকার সম্পাদনার পাশাপাশি একটি ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন। পত্রিকাটির নাম 'BARENDRA'। 'বরেন্দ্র' এতদ-অঞ্চলের সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে। পত্রিকাটি সপ্তাহের প্রতি বৃহস্পতিবার প্রকাশিত হত। 'বরেন্দ্র' ১৯২৫ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রিকার গ্রাহকমূল্য ছিল নিম্নরূপ :

Annual subscription

DAK-edition	Rs 4/	Single Copy	Nine pies.
Town-edition	Rs 3/	Back number	two annas.

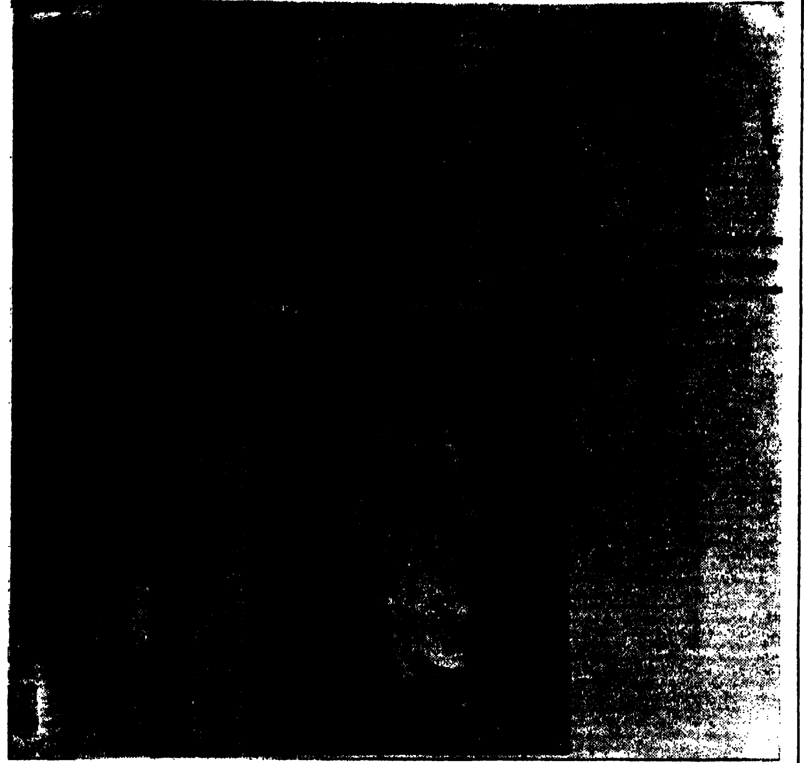
ইংরেজ শাসক ও স্থানীয় চা বাগানের শিল্পপতিগণ এই পত্রিকার সংবাদ, সম্পাদকীয় পরিবেশনের উপর বিরাগভাজন হয়েছিল বলে জানা যায়। ফলে 'বরেন্দ্র' অল্পদিনের মধ্যেই বন্ধ হয়ে যায়।

দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর ১৯২৬ সালে আইনজীবী সুরেশচন্দ্র পালের সম্পাদনায় 'ত্রিস্রোতা' আবার প্রকাশিত হয়। এটি মাসিক থেকে সাপ্তাহিকে পরিবর্তিত হয়। তখন পত্রিকার গভঃ রেজিস্ট্রেশন নম্বর ছিল REG NO. C 1380. 'জনমত' পত্রিকার উপর যেমন লেখা থাকত 'মানুষ আমরা নহি ত মেষ' তেমনই 'ত্রিস্রোতা'র সম্পাদকীয়-র উপরে লেখা থাকত 'আবার তোরা মানুষ হ'। এছাড়া 'ত্রিস্রোতা'-র পরিবর্তিত সংখ্যায় লেখা থাকত 'শশিকুমার নিয়োগী প্রতিষ্ঠিত।'

কংগ্রেস নেতা খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের সম্পাদনায় এবং ভবরঞ্জন গাঙ্গুলির সহযোগিতায় ১৯২৮ সালে 'মুক্তিবাণী' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা জলপাইগুড়ি সদর থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। এই পত্রিকাটিতে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কিত খবরাখবর প্রচারিত হত। এই পত্রিকায় ইংরেজদের বিরুদ্ধে সম্পাদকীয় থাকত। ফলে 'মুক্তিবাণী' ইংরেজদের বিষ নজরে পড়ে। ইংরেজ সরকার ১৯৩১ সালে খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ও ভবরঞ্জন গাঙ্গুলিকে গ্রেপ্তার করে এবং পত্রিকাটি বন্ধ করে দেয়। 'মুক্তিবাণী' পত্রিকার প্রথম বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় লেখা থাকত : সাপ্তাহিক পত্রিকা—নগদ মূল্য দুই পয়সা। সম্পাদক খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। ওই পৃষ্ঠার মাঝে মতিলাল নেহরুর ছবি এবং মতিলাল নেহরুকে পত্রিকার সভাপতি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল। প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত

হয়েছিল জলপাইগুড়ি থেকে ২০ শে ডিসেম্বর, ১৯২৮, বৃহস্পতিবার, বাংলা ৫ই পৌষ, ১৩৩৫।

পরবর্তীতে সদরের বিশিষ্ট আইনজীবী প্রীতিনিধান রায় 'দেশবন্ধু' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। এর আয়ু ছিল একবছর। ভবরঞ্জন গাঙ্গুলি 'আহ্বান' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করতেন। 'আহ্বান' ছিল জলপাইগুড়ি চা কর্মচারী সমিতির মুখপত্র। এর মাঝে কাজী আবদুল খালেকের সম্পাদনায় সাপ্তাহিক 'নিশান' বের হয়েছিল। এই পত্রিকাগুলো বেশিদিন চলেনি। 'ডানপিটেদের সমাচার' বের করেন ডাঃ স্মরজিৎ বাগচি। এটি ডানপিটেদের আসরের মুখপত্র। ১৯৫৮ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়।



খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত [illegible]

একসময় সাপ্তাহিক 'আমাদের কথা' জলপাইগুড়ি শহরের একটি নাম করা পত্রিকা ছিল। ১৯৪৮ সালে এটি প্রফুল্লকুমার ত্রিপাঠী সম্পাদনা করতেন। পরবর্তীতে 'আমাদের কথা' পাক্ষিক হিসেবে প্রকাশিত হতে থাকে। সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন নিরঞ্জন দত্ত। নিরঞ্জনবাবুর মৃত্যুর পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে আছে। ১৯৫০ সালে বীরেন্দ্রপ্রসাদ বসু বের করেন পাক্ষিক 'সীমান্তিক'। ১৯৬৮ সালে সীমান্তিকের সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন দেবাশিস ঘোষ। দেবাশিস ঘোষের সুন্দর সম্পাদনায় 'সীমান্তিক' সমগ্র জেলায় সুনাম অর্জন করে। বর্তমানে 'সীমান্তিক'-এর প্রকাশনা বন্ধ হয়ে আছে। ১৯৫২ সালে কংগ্রেস নেতা রবীন্দ্রনাথ সিকদার সাপ্তাহিক 'বার্তা' বের করতেন। পত্রিকাটি বর্তমানে সম্পাদনা করছেন বীরেন্দ্রনাথ বসু। ১৯৫৭ সালে মাসিক সংবাদপত্র 'উত্তরপথ' ডঃ রেবতীমোহন লাহিড়ীর সম্পাদনায় এবং কিরণ রায়ের আর্থিক সহযোগিতায় বের হত। পত্রিকাটি মাত্র এক বৎসর চলে। এখানে উল্লেখ্য জলপাইগুড়ি শহর থেকে এক সময় 'নিরপেক্ষ' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হত। এটি সম্পাদনা করতেন দেবব্রত মজুমদার। এই পত্রিকাটিও বেশীদিন টেকেনি। জলপাইগুড়ি শহর থেকে 'উত্তরদর্পণ' নামে একটি পাক্ষিক সংবাদপত্র সত্তর দশকে কিছুদিন প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন কালীপদ চক্রবর্তী, পরবর্তীতে নির্মল চৌধুরী। 'উত্তরদর্পণ' স্থানীয় সংবাদ পরিবেশনে ও সাহিত্যবিকাশে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল। বর্তমানে পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ হয়ে আছে। সত্তর দশকের শেষার্ধে প্রকাশিত পাক্ষিক 'সৌরশিখা' আজও স্বকীয় মহিমায় উজ্জ্বল। 'সৌরশিখা' সম্পাদনা করেন অনাথ দত্ত। শিশির মুখোপাধ্যায় সম্পাদনা করেন 'সাহিত্যভারতী'। কল্যাণ দে সম্পাদিত 'জলপাইগুড়ি' পাক্ষিক সংবাদ সাহিত্য পত্রিকাটি একসময় জলপাইগুড়িতে সংবাদ পরিবেশনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল। ১৯৮৬ সাল থেকে ইভা ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় সাপ্তাহিক 'সাক্ষাৎকার' জলপাইগুড়ি শহর থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। ১৯৭৫ সাল থেকে অশোককুমার বসুর সম্পাদনায় সাপ্তাহিক 'সহযোগী' জলপাইগুড়ি শহরের পুরাতন পুলিশ লাইন থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। বর্তমানে 'সহযোগী' সন্তোষকুমার বসু এডুকেশনাল ট্রাস্ট-এর মুখপত্র। সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে 'সহযোগী' এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। ষাটের দশকের শেষে ইংরেজি পত্রিকা 'দি জলপাইগুড়ি টাইমস্'-এর কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। সম্পাদক ছিলেন বীরেন্দ্রপ্রসাদ বসু। রেনেডি ঘোষের সম্পাদনায় ১৯৭১ সালে 'হিমালয়' নামে একটি দৈনিক

আইনজীবী জ্যোতিচন্দ্র সান্যাল সাপ্তাহিক 'জনমত' বের করেন। 'জনমত' প্রথম সংখ্যার প্রকাশনার তারিখ ছিল ১৯২৪ সালের ১৪ই জানুয়ারি। মূল্য ছিল প্রতি সংখ্যা নগদ দুই পয়সা মাত্র। প্রথম সংখ্যার বিষয়সূচীতে ছিল : (১) নির্বাচন প্রসঙ্গ (২) সম্পাদকীয় (৩) সংরক্ষণ নীতি (৪) কংগ্রেস অভিভাষণ (৫) দেশ-বিদেশের কথা (৬) বাটোয়ারীপত্র ও মায়ের কথা (৭) মোসলেম জগৎ (৮) স্থানীয় সংবাদ। 'জনমত'-এর গ্রাহক হবার জন্য লাগত শহরে—বাৎসরিক দেড় টাকা।

জনমত

জলপাইগুড়ী

সম্পাদক—শ্রীজ্যোতিশচন্দ্র সান্যাল।

বিষয় সূচী।

জনমতের গ্রাহক হইবার রেট।

জ্যোতিশচন্দ্র সান্যাল সম্পাদিত 'জনমত'

পত্রিকা বের হয়েছিল বলে জানা যায়। তবে পত্রিকাটি স্থায়ী হয়নি এবং তেমন প্রচারিত হয়নি। মনমোহন রায়ের 'জল্পেশ' এবং অরুণাংশু ভৌমিকের 'উদ্ভিদ' পাক্ষিক সংবাদ সাহিত্য হিসেবে একসময় সাড়া জাগিয়েছিল। ধূপগুড়ি থেকে প্রকাশিত তপন চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদিত 'লাল নক্ষত্র' সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময়ে ধূপগুড়িসহ সমগ্র জলপাইগুড়ি জেলায় আলোড়ন তুলেছিল। সংবাদ পরিবেশনের বলিষ্ঠতা ও নির্ভীকতা এই পত্রিকাটির ছিল এক নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। তপন চট্টোপাধ্যায়ের অকাল প্রয়াণে বর্তমানে 'লাল নক্ষত্র' বন্ধ হয়ে আছে। সম্প্রতি জলপাইগুড়ি শহর থেকে 'উত্তরের হাওয়া' এবং 'তিস্তাপারের কথা' নামে দুটি পাক্ষিক সংবাদ সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে।

জলপাইগুড়ি সদর মহকুমা থেকে কিছু নির্ভেজাল সাহিত্য পত্রিকা বের হত। ময়নাগুড়ি থেকে পাবক, হাতুড়ি ও উত্তর সৈকত একসময় বের হত। সাহিত্য বিকাশে এদের অবদান চিরস্মরণীয়। এছাড়া উত্তরদেশ, জলার্ক, সম্ভবকাল, সুরধ্বনি পোহাতি, পাগলা-ঘোড়া, বার্নিক, অজানা সাহিত্য, অন্যবার্তা ও ধূপগুড়ির 'শব্দ'। উল্লেখযোগ্য চালু সাহিত্য পত্রিকাগুলোর মধ্যে 'কিরাতভূমি', সেতু, মৌপল, দ্যোতনা, মেধা, একবিংশ শতাব্দী উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে 'কিরাতভূমি'-র আলাদা স্বাতন্ত্র্য আছে। এসব ক্ষুদ্র সাহিত্য পত্রিকা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ এ প্রবন্ধে নেই, তাই শুধুমাত্র নামোল্লেখ করেই ক্ষান্ত হলাম।

উত্তরের সীমান্তে এখনও পাখি গান গায়, এখনও ঝরনারা উত্তাল বেগে ছুটে চলে দক্ষিণে, আর পাহাড় আর অরণ্য ছুঁয়ে বয়ে যায় এখানেও কালজানি, ডিমা, গরম, নোনাই, সঙ্কোশ, রায়ডাক আর শীলতোর্ষা। দুটি পাতা একটি কুঁড়ির কিংবা কৃষ্ণচূড়া ও রাধাচূড়ার ফুলের দেশ এই আলিপুরদুয়ারে এখনও সাহিত্যপ্রেমী ও পত্রিকা প্রেমী কিছু মানুষেরা পত্রিকার মেলা বসায়। জলপাইগুড়ি জেলার আলিপুরদুয়ার মহকুমা ক্ষুদ্র সংবাদপত্রের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য নাম।

আলিপুরদুয়ার শহরে আইনজীবী বিজয়গোপাল ঘোষ ১৯২৬ সালে 'হিমালয়' নামে বাংলা সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রিকা বের করেন। ওই একই বছরে তিনি 'দি বেঙ্গল টাইম্‌স' ইংরেজি পাক্ষিক পত্রিকাও প্রকাশ করেছিলেন। কয়েক বছর প্রকাশের পর দুটি পত্রিকাই বন্ধ হয়ে যায়। এরপর ১৯২৮ সালে বিজয়গোপাল ঘোষ 'দুয়ারবাসী' নামে একটি বাংলা মাসিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। সেটির প্রকাশনাও দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। পরাধীন ভারতবর্ষে বিজয়গোপাল ঘোষের পত্রিকা প্রকাশের এই নির্ভীকতা আজও আমাদের মনে প্রেরণা জোগায়। সে সময় অনিল গঙ্গোপাধ্যায়ের সংবাদভিত্তিক হাতে লেখা দেয়াল পত্রিকা 'দুয়ার লাঠি'-র অবদানও কম নয়। কারণ 'দুয়ার লাঠি'তে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সংবাদ নিয়মিত প্রকাশিত হত। আলিপুরদুয়ার চৌপথির উন্মুক্ত পরিবেশে এই 'দুয়ার

আলিপুরদুয়ার শহরে আইনজীবী বিজয়গোপাল ঘোষ ১৯২৬ সালে 'হিমালয়' নামে বাংলা সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রিকা বের করেন। ওই একই বছরে তিনি 'দি বেঙ্গল টাইম্‌স' ইংরেজি পাক্ষিক পত্রিকাও প্রকাশ করেছিলেন। কয়েক বছর প্রকাশের পর দুটি পত্রিকাই বন্ধ হয়ে যায়। এরপর ১৯২৮ সালে বিজয়গোপাল ঘোষ 'দুয়ারবাসী' নামে একটি বাংলা মাসিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। সেটির প্রকাশনাও দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। পরাধীন ভারতবর্ষে বিজয়গোপাল ঘোষের পত্রিকা প্রকাশের এই নির্ভীকতা আজও আমাদের মনে প্রেরণা জোগায়।

লাঠি' সে সময় এতদ্‌অঞ্চলে স্বাধীনতা আন্দোলনকারীদের মনে উৎসাহ জোগাত। দীর্ঘদিন পর ১৯৪৮ সালে আমেদ হোসেন ও সুনীল কুমার ভৌমিকের সম্পাদনায় 'সীমান্ত' সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। এরপর ১৯৫১ সালে নগেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'উত্তরবঙ্গ' এবং সুরেন্দ্রপ্রসাদ লাহিড়ী সম্পাদিত পাক্ষিক 'মহাকাল' প্রকাশিত হয়। ১৯৫৩ সালে নীলকান্ত মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় সাপ্তাহিক 'চাবুক' বের হয়। 'চাবুক' পত্রিকায় সে সময় বেশ কিছু বিতর্কিত সংবাদ পরিবেশিত হয়, ফলে অল্পদিনের মধ্যে পত্রিকাটি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। কিন্তু 'চাবুক' এক বছরের বেশি চলেনি। দীর্ঘ ২৮ বছর পর ১৯৫৬ সালে বিজয়গোপাল ঘোষ 'ডুয়ার্সবার্তা' নামে আর একটি সংবাদপত্র বের করেন। এই মহকুমায় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পত্রিকা সাপ্তাহিক 'দাবী'। ১৯৫৭ সালে প্রথম প্রকাশ পায়। পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় লেখা থাকে প্রগতিশীল নির্ভীক সাপ্তাহিক। প্রকাশের পর 'দাবী' এখনও একটানা প্রকাশিত হয়ে চলেছে। সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে আজও এ পত্রিকাটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। আজ সাপ্তাহিক 'দাবী' সচল, স্বকীয় রাজনৈতিক আদর্শে অবিচল। এর প্রথম সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন দিপালী গুহ, সুনীল চক্রবর্তী ও জগন্নাথ বিশ্বাস। পরবর্তীতে দিব্যেন্দু (রাণা) সেন এর সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। 'দাবী'-র শারদ সংখ্যাগুলো সাহিত্য বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বিশেষত প্রবন্ধ সাহিত্য সৃষ্টিতে 'দাবী'-র শারদ সংখ্যাগুলো গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৫৮ সালে তৎকালীন বিধায়ক পীযূষকান্তি মুখোপাধ্যায় 'চলাচল' নামে পাক্ষিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। ১৯৬৬ সালে সুধীররঞ্জন ঘোষের সম্পাদিত সাড়া জাগানো আর একটি পাক্ষিক 'যাত্রিক'। এই সংবাদপত্রটি জনমানসে গভীর রেখাপাত করেছিল। ১৯৬৮ সালে স্বল্প সময়ের জন্য শিক্ষক বঙ্কিম মাহাতো 'এই শতক'-এর নামে একটি পাক্ষিক সংবাদপত্র বের করেন। দু/তিনটি সংখ্যার পর 'এই শতক'-এর অবলুপ্তি ঘটে। ১৯৭৪ সালে সংবাদ সাহিত্য মাসিক হিসেবে 'আলোক' প্রকাশিত হয়। এর কয়েকটি মাত্র সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল এবং সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন রমেন দে ও বিনয় চক্রবর্তী। এর মাঝে জীবানন্দ খাঁ-র সম্পাদনায় ১৯৭১ সালে হিন্দি মাসিক সংবাদপত্র 'দাবী' বের হয়েছিল। তবে এটির প্রকাশনা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ১৯৭৩-এ সুধীরকুমার বিশ্বাসের পাক্ষিক 'নিরপেক্ষ' এবং শক্তি ঘোষ-এর দৈনিক 'জনপথ' একটি সংখ্যা বের হয়েই স্তব্ধ হয়ে যায়। পরে শক্তি ঘোষ ১৯৭৪ সালে ইংরেজি পাক্ষিক হিমালয়ান পোস্ট (পরিবর্তিত নাম মাউন্টেন ডেসপ্যাচ) বের করেন। পবিত্রভূষণ সরকারের সম্পাদনায় ১৯৭৫ সালে পাক্ষিক সংবাদ ও সাহিত্য 'মাটিরছোঁয়া' প্রকাশিত হয়। 'মাটিরছোঁয়া'-র সংবাদ চয়নে ও সম্পাদকীয় পরিবেশনে এক স্বতন্ত্র অনুভূতির স্বাদ পাওয়া যায়। 'মাটিরছোঁয়া'-র সাহিত্যমূলক বিশেষ সংখ্যাগুলো এক দলিল হিসেবে স্বীকৃত। বিশেষত মাটির ছোঁয়া-র প্রবন্ধ সংখ্যা, রবীন্দ্রসংখ্যা, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সংখ্যা, শুভেন্দু সরকার সংখ্যা, সুরজিৎ বসু সংখ্যা, গল্প সংখ্যা, জীবনানন্দ দাশ সংখ্যা এবং সর্বোপরি 'আলিপুরদুয়ার সংখ্যা' এক যুগান্তকারী ঘটনা।

১৯৭৭-এ সমীর চক্রবর্তীর 'স্থানীয় সংবাদ' একটি/দুটি সংখ্যা বের হয়েই বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৭৮ সালে শক্তি ঘোষ-এর সাপ্তাহিক 'পরমাণু'-র সংবাদ আলিপুরদুয়ারের জনমানসে আলোড়ন তুলেছিল। এর মাঝে ১৯৮০ সালে অভয় দে-র 'রাণার'-এর সংবাদভিত্তিক কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ১৯৮১ সালে আলিপুরদুয়ার মহকুমার অন্তর্গত বারোবিশা থেকে শান্তনু লাহিড়ীর পাক্ষিক সংবাদ সাহিত্য 'সীমান্তবার্তা, পরে সাপ্তাহিক ভল্‌কা সমাচার সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে বারোবিশা ও কুমারগ্রাম অঞ্চলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

সুরেশচন্দ্র পাল সম্পাদিত 'ত্রিস্রোতা'

BARENDRA
JALPAIGURI
—1925—

A weekly news paper published every Thursday of the week.

Jyotish Chandra Sanyal—Editor-in-chief.

Vol. I { The 15th October 1925. } Thursday.

Annual Subscription :— Dak-edition ... ... Rs 4/- Town-edition ... ... Rs 3/-

Single Copy nine pies. Back number two annas.

'Sarbajaraline' Is a Wonderful Specific for Malaria and Other Fevers and Enlargement of Liver and Spleen. Sarbajaraline has given relief to hundreds-thousands-Millions !! Why don't you try and get Permanent Relief ?? Sold everywhere.

Regd. Trade Mark.



'Goitreline' Sure Cure for Goitre. Tried by Millions with Success.

Sole Agent—Druggist's Hall. Jalpaiguri.

Managing Proprietor—Dr. S. C. Gupta, L.M.P. ; M.H.S. (Govt. Medallist.)

জ্যোতিশচন্দ্র সান্যাল সম্পাদিত 'বরেন্দ্র' ১৯২৫

১৯৮৪ সালে কৃষ্ণপ্রিয় ভট্টাচার্য ও শুভাশিস ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় পাক্ষিক 'বক্‌সা বাজার' পরে 'তিস্তাপক্ষ' প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকাটি স্থানীয় সংস্কৃতি ও কৃষ্টিমূলক সংবাদ পরিবেশনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল। বর্তমানে 'তিস্তাপক্ষ' এর প্রকাশনা বন্ধ হয়ে আছে। ১৯৮৭ সালে পাক্ষিক 'ডুয়ার্স প্রান্ত'-র কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। এটির সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন বিকাশ গুহ ও বিমল ভট্টাচার্য। ১৯৮৮ সালে কামাখ্যাগুড়ি থেকে সুজিতকুমার পাল ও দীপক বিশ্বাসের যৌথ সম্পাদনায় 'কুমারগ্রাম সমাচার' প্রকাশিত হয়। ১৯৮৮ সালে বোড়ো ভাষার একমাত্র পাক্ষিক সংবাদপত্র ছিল নিকোডিমাস হাজারীর ফংছে রাও। এই আলিপুরদুয়ার শহর থেকে 'ভুবন সরকার' সম্পাদিত সংবাদ সাহিত্য মাসিক 'ফলক'-এর কথাও বলতে হয়। বর্তমানে এগুলো বন্ধ হয়ে আছে। মহকুমার অন্তর্গত কামাখ্যাগুড়ি থেকে ১৯৯৭ সাল থেকে দেবাশিস ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় পাক্ষিক সংবাদ সাহিত্য 'লোকমানস' প্রকাশিত হচ্ছে। অল্পদিনের মধ্যে 'লোকমানস' এই এলাকার রাজনৈতিক সচেতন ব্যক্তিদের নজর কেড়েছে: রামেশ্বর রায় সম্পাদিত মাসিক 'জনজীবন' সংবাদ ও সাহিত্য পত্রিকার জগতে দারুণ সাড়া জাগিয়েছে। অন্তত রচনা সম্ভারের দিক দিয়ে 'জনজীবন' এর ১৯৯১-এর পূজা সংখ্যা এবং ১৯৯৯-এর দশমবর্ষ পূর্তিসংখ্যা সংগ্রহ করে রাখার মতো। ১৯৮৯ সালে রমেন দে সম্পাদিত পাক্ষিক সংবাদ পত্রিকা 'ডুয়ার্স সমাচার' এখনও অনিয়মিত হলেও প্রকাশিত হচ্ছে। 'ডুয়ার্স সমাচার' এর উল্লেখযোগ্য সংখ্যা বক্‌সা সংখ্যা। ১৯৮৭ সালে প্রকাশিত শুভেন্দু রায়ের পাক্ষিক 'খবরালোক'-এর বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যা বের হয়েছিল। এখন এর প্রকাশনা বন্ধ হয়ে আছে। ১৯৯৩ সালে সংবাদমাসিক প্রদীপ ঘোষ-এর 'পুবের চোখ' কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েই স্তব্ধ হয়ে যায়।

এছাড়া আলিপুরদুয়ার মহকুমার নির্ভেজাল কিছু সাহিত্য পত্রিকার শুধু নাম উল্লেখ করছি। প্রবন্ধের বিষয়সূচি অনুযায়ী এগুলোর বিশদ আলোচনা করা সম্ভব হল না :

ঐকতান, প্রান্তিক, নতুন সীমান্ত, কাঞ্চনজঙ্ঘা, উত্তরের হাওয়া, শপথ, তরাইয়ের কল্লোল, বনমহল, খেলামেলা, সমুদ্র, বিনিদ্র, উৎস, শতক, দোলনা, বনভূমি, অন্বিষ্ট, সময়, ডুয়ার্সের চোখ, ফতোয়া, পাদদেশ, দ্রোহ, ব্রততী, দ্বান্দ্বিক, হুতোমপেঁচা, কালশুদ্ধি, আনন্দ ইত্যাদি অসংখ্য ক্ষুদ্র পত্রিকা। এগুলোর প্রকাশনা বর্তমানে বন্ধ হয়ে আছে। বর্তমানে নোনাই, তল্লাসী, দৃশ্যমুখ, বোধিবৃক্ষ, উৎসভূমি, মিছিল, তৃণভূমি, আজকের কবিতা, দিশা, সময়গুরু, স্পন্দন, অন্যবাক, হরিণ, মঞ্জরী, সাহারাপত্র, প্রয়াস, শিলালিপি অনিয়মিত হলেও মাঝেমধ্যে প্রকাশিত হচ্ছে। এর মধ্যে সনৎ চট্টোপাধ্যায়ের 'উন্মেষ' নিয়মিত মাসিক সাহিত্য পত্রিকা। এছাড়া এককালে মহকুমা থেকে প্রকাশিত কালজানী, দিশারী, সোচ্চার যন্ত্রণা, বিস্ফোরণ, উত্তরা নামে কিছু মিনি পত্রিকা কালের গহ্বরে হারিয়ে গেছে।

জলপাইগুড়ি জেলার দুটি মহকুমা। একটি সদর এবং অপরটি আলিপুরদুয়ার। জলপাইগুড়ি চা শিল্পপতিদের বনেদী শহর। তাই সেখান থেকে শুরুতে পত্রপত্রিকার সমারোহ লক্ষণীয়। একদা বনজঙ্গলে ভরা উদ্বাস্তু শহর আলিপুরদুয়ার স্বাধীনতা পূর্ববর্তী এবং স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে পত্রপত্রিকার মানচিত্রে স্বতন্ত্র জায়গা করে নেয়। সদর মহকুমার এবং আলিপুরদুয়ার মহকুমার বিস্তীর্ণ এলাকায় প্রতিনিয়ত নতুন নতুন পত্রিকার সৃষ্টি হচ্ছে। এর মধ্যে কিছু অকালে মৃত্যুবরণ করছে আবার কিছু ধুঁকতে ধুঁকতে নিজের অস্তিত্বকে বজায় রেখেছে। আমরা আশাবাদী। এইসব পত্রপত্রিকার মধ্য দিয়ে জনগণের মধ্যে ঐক্য, সংহতি নিশ্চয়ই আরও মজবুত হবে। পত্র-পত্রিকার মধ্য দিয়ে এই জলপাইগুড়ি জেলায় এক সুস্থ নান্দনিক চেতনার বিকাশ ঘটুক—এ আশাই কামনা করি।

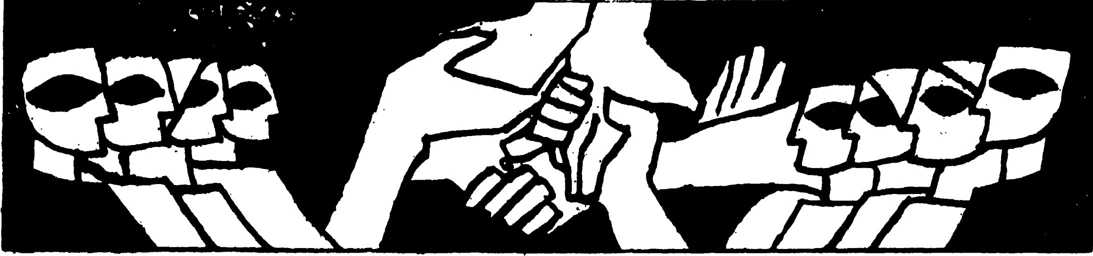
সূত্র

'মাটিরছোঁয়া'—আলিপুরদুয়ার সংখ্যা, ১৯৯৫।

জলপাইগুড়ি জেলা শতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ, ১৯৭০।

কিরাতভূমি—জলপাইগুড়ি জেলা ১২৫ বর্ষ পূর্তি সংখ্যা, অনিল গঙ্গোপাধ্যায়।

লেখক □ সাংবাদিক, কবি ও প্রাবন্ধিক



সুরঞ্জন দত্ত রায়

জলপাইগুড়ির সাহিত্য : অতীত ও বর্তমান

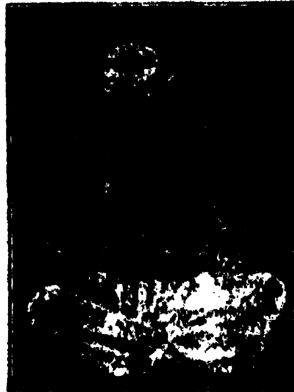
ধারণভাবে বলা যায়, কোনো জেলার সুপ্রাচীন অতীতকালের সাহিত্যচর্চার ইতিহাস তুলে ধরা খুবই কঠিন। যেখানে একটা জেলার সৃষ্টিই হয়েছে উনিশ শতকের মাঝামাঝি (১৮৬৯) সময় থেকে। কলকাতাকে কেন্দ্র করে তার অনেক আগে থেকেই বাংলার নবজাগরণ যুগের সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। এ জেলা তখন অন্ধকার থেকে আলোকে আসছে মাত্র। আর এক কথা, কোচবিহার রাজদরবারকে কেন্দ্র করে বহু প্রাচীন কাল থেকেই সাহিত্যচর্চার মূল্যবান ঐতিহ্যের সৃষ্টি হয়। বলা হয়েছে যে, বাংলা ও অসমের মধ্যবর্তী কোচবিহার রাজদরবার একসময় বাংলা সাহিত্যচর্চার ফসল ফলিয়েছে। রাজারা শুধু এ দরবারে বিদ্যা ও সাহিত্যচর্চার দরবারই বসাননি, নিজেরাও মূল্যবান গ্রন্থ লিখেছেন। মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ তো প্রবাদ-প্রতিম। জলপাইগুড়ির রাজবংশকে কেন্দ্র করে তেমন কোনো সাহিত্যিক প্রয়াস দেখা যায় না। চা বাগান সূত্রে যাঁরা এখানে আসেন এবং জেলা শাসনের ক্ষেত্রে মূল্যবান ভূমিকা রচনা করেন, তখনকার আদিবাসী মানুষদের কথা বাদ দিলে, তাঁরাই প্রধানত সীমিত সাহিত্য প্রয়াসের সৃষ্টি করেন। ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার পূর্বে লিখিত সাহিত্যরচনার প্রচেষ্টা এখানে দেখাই দেয়নি। এখানকার জীবনযাত্রাও ছিল কঠোর। নানা হিংস্র জীবজন্তুর অধিষ্ঠান ও জলা-জংলার পরিবেশে বসবাসকারী আদি জনগোষ্ঠীর মানুষদের মধ্যে মৌখিক সাহিত্য (Oral Literature) নিশ্চয়ই ছিল। লিখিত সাহিত্যের সৃষ্টি ঘটে অনেক বিলম্বে। ক্রমে এই সময় শ্বেতাঙ্গ চা-করদের সঙ্গে সংগ্রামে নির্ভীক স্বদেশী চা-করগণ নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার কাজে সচেতন ভূমিকা গ্রহণ করেন। এই সময় যাঁরা সময়োচিত প্রয়োজনে ও দায়িত্ববোধে কিছু কিছু সংবাদ ও সাময়িক পত্রিকা পরিচালনা করেন, তাঁদের মাধ্যমেই প্রাথমিকভাবে সাহিত্যচিন্তার প্রকাশ ঘটে। প্রচলিত অর্থে তাঁদের সাহিত্যিক বলা যাবে না, কিন্তু প্রথম এই দীপশিখা-প্রজ্বলনের গৌরব তাঁদেরকেই দিতে হয়।

জনমত

জলপাইগুড়ি

বৃহস্পতিবার, ১৭ই আশ্বিন ১৩৪১ : ৪ঠা অক্টোবর ১৯৩৪।

সম্পাদকী।



স্বর্গীয় শশিকুমার নিয়োগী।

শারদীয় জনপথ

সুদূর অতীতে উঁকি দিয়ে দেখছি। জলপাইগুড়িতে কিছু কিছু সাময়িক পত্র পত্রিকার সৃষ্টি হয়েছিল। বিখ্যাত বাঙালি মনীষী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত বাংলা সাময়িক পত্র (দ্বিতীয় খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ) গ্রন্থে এ সম্পর্কে কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। সেখানে দেখা যায়, ১৩০৩ সালের আশ্বিন মাসে প্রকাশিত "ভিক্ষুক" নামক পত্রিকার কথা। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন সারদাকান্ত মৈত্র। ইংরেজি ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে এটি প্রকাশিত হয়। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে (বাংলা ১৩০৭) আশ্বিন মাসে প্রকাশিত হয় ত্রিস্রোতা। শশিকুমার নিয়োগী ও কবি ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরীর সম্পাদনায়। পরে এটি সাপ্তাহিকে পরিণত হয় (১৩৫২ সালের অগ্রহায়ণ) এবং সম্পাদক ছিলেন সুরেশচন্দ্র পাল। ত্রিস্রোতার মতো একালের এক বিখ্যাত পত্রিকা জনমত। বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী জ্যোতিষচন্দ্র সান্যাল ছিলেন এর সম্পাদক। তিনি শুধু সম্পাদক ছিলেন না, ছিলেন সাহিত্যিকও। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের ১৪ জানুয়ারি তারিখে প্রকাশিত এই পত্রিকাটিকে কেন্দ্র করে সাহিত্যসৃষ্টিরও বিকাশ ঘটে। সেকালে অনেকেই এতে লিখেছেন, এবং জ্যোতিষচন্দ্র সান্যালের বহু গল্প ইত্যাদি এতে প্রকাশিত হয়। যদিও দেশাত্মবোধ ও জাতীয়চেতনা ছিল এর প্রধান সুর। এই সময় নিম্নলিখিত পত্রিকাগুলির নাম উল্লেখযোগ্য— (ক) মুক্তিবাণী (১৯২৮), সম্পাদক খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত (খ) ভারতবাসী (১৯২৯),—রবীন্দ্রমোহন রায় কর্তৃক সম্পাদিত। (গ) নওজোয়ান (১৯২৯), নাসিরউদ্দীন আহমেদ কর্তৃক সম্পাদিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা, (ঘ) নিশান, মহম্মদ আব্দুল খালেক কর্তৃক সম্পাদিত সাপ্তাহিক (১৯৩১), (ঙ) শিখা, তারিণী ভট্টাচার্য সম্পাদিত। (১৯৩১), (চ) দেশবন্ধু (১৯৩৭), প্রীতি নিধান রায় সম্পাদিত। (ছ) আমাদের কথা (১৯৪৮), প্রফুল্লকুমার ত্রিপাঠী সম্পাদিত। এগুলি মূলত সংবাদ নির্ভর পত্রিকা হলেও সাময়িক পত্রিকার প্রয়োজনও মেটাতো। প্রীতিনিধান রায় ছিলেন রবীন্দ্রপ্রেমী সংবেদনশীল পুরুষও।

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই যে মননশীল পুরুষটির কথা সর্বাগ্রে উল্লেখ করতে হয়, তিনি পুরাতন বাংলার এক অসাধারণ পুরুষ। প্রথমে কানপুরে, পরে জলপাইগুড়ি আদালতে তিনি ছিলেন দক্ষ আইনজীবী। ভাবতে অবাক লাগে, ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের "বাঙ্গালীর ইতিহাস" নামক গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার আগেই দুর্গাচরণ সান্যাল লিখেছিলেন, "বাংলার সামাজিক ইতিহাস" নামক অমূল্য ও অসাধারণ গ্রন্থ। সেকালের বাংলার মনীষী রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এই গ্রন্থের ভূমিকা লেখেন। আচার্য প্রমথ বিশী, মুস্তাফা সিরাজ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ অনেকেই এই গ্রন্থের কাছে নিজেদের ঋণ স্বীকার করেন। এই জলপাইগুড়িতে বসেই তিনি সাহিত্যচর্চা করেন। পারস্য ভাষায় লেখেন প্রণয়কাব্য "পারস্যকাব্য"।

১৯০০ খ্রিস্টাব্দেই ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী এ শহরে বসে কবিতা লিখে সারা বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এখানকার সুসন্তান খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত শুধু রাজনীতিক ছিলেন না, তিনি ছিলেন খুবই সংস্কৃতিমনস্ক ব্যক্তি। দেশপ্রেম ও জাতীয় আন্দোলনের সুরকে ভাষা দেবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি যে সাহিত্য প্রতিভারও ধারক ছিলেন, তার প্রমাণ তাঁর লেখা "আর্যসভ্যতার সন্ধানে।" এ জেলারই এক মহারাজা জগদিন্দ্রদেব রায়কত লিখে গিয়েছিলেন "রায়কতবংশ ও তাঁদের রাজ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। এ ছাড়াও লিখেছেন জল্পেশ মন্দিরের

ইতিবৃত্ত। পত্রিকার সঙ্গে সম্পাদনাসূত্রেই এসেছিলেন জ্যোতিষচন্দ্র সান্যাল। এক বিচিত্রকর্মা মানুষ ছিলেন তিনি। ব্যক্তি জীবনে আইনজীবী এই পুরুষটি অর্ন্তধর্মে ছিলেন বিদ্রোহী, স্বাধীনতা সংগ্রামের বলিষ্ঠ যোদ্ধা, আবার তাঁরই হাত জনমত পত্রিকা সম্পাদনার সঙ্গে সঙ্গে অনন্য সাহিত্য-সম্পদ ফলিয়েছে। বাংলার মানুষ নানা সম্প্রদায়ের জীবন তাঁর ছোটোগল্পেও আত্মপ্রকাশ করেছে। Little Jim in Wonder নামে ইংরাজিতেও বই আছে। এ জেলার বিশিষ্ট চা-কর কামিনীকান্ত রাহুত নাটক এবং অভিনয়ের সঙ্গেই বেশি করে জড়িত ছিলেন, মানিক নামে একটি নাটক তিনি রচনা করেন ও আর্যনাট্যে অভিনীত হয়। উপেন্দ্রনাথ বর্মণ ছিলেন এজেলার এক বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ। তিনি বহু বিষয়ে বই লিখেছেন, তিরোধানের পূর্বে তিনি তাঁর আত্মজীবনী লিখে গিয়েছেন। এতে আছে অমূল্য সমাজচিত্র ও মান জীবনের ছবি। এ শহরে ফণীন্দ্রদেব উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কলিঙ্গনাথ ঘোষ লিখে গিয়েছেন "স্বামীজীর শক্তিমন্ত্র সেবাধর্ম ও স্বদেশপ্রেম" গ্রন্থটি। জলপাইগুড়ি আদালতের মোক্তার গোপাল মজুমদার লিখেছিলেন দুটি গ্রন্থ—প্রবন্ধলহরী এবং দার্জিলিং ভ্রমণ। এখানে বসেই বিখ্যাত প্রধানশিক্ষক তরণীমোহন চক্রবর্তী লিখেছেন পৌরাণিক নাটক ভগীরথ, যা আর্যনাট্যে অভিনীত হয়। জলপাইগুড়ির আর এক সুসন্তান সত্যেন্দ্রনাথ মৌলিক লিখিত স্মৃতির অন্তরালে গ্রন্থটি সবিশেষ মূল্যবান। একদা উত্তরপ্রদেশের সন্তান ভাগীরাম প্রসাদ মদের ব্যবসাসূত্রে এসেছিলেন এ দেশে। তাঁরা এখানকারই মানুষ হয়ে যান। তাঁর ছেলে বাংলা শিখে তুলসী দাসের হিন্দি রামায়ণ বাংলায় অনুবাদ করে দিল্লির নরসিংদাস পুরস্কার লাভ করেন। এ শহরে বসেই কবি সঞ্জীব বাগচী তাঁর অসংখ্য কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। বিশিষ্ট চা-কর বীরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ লিখিত বিশ্বপর্যটন গ্রন্থটির কথাও এই প্রসঙ্গে মনে আসে। অধ্যাপক ডঃ রেবতীমোহন লাহিড়ী ও ডক্টর অরুণভূষণ মজুমদারও ইতিহাস বিষয়ে বহু অমূল্য প্রবন্ধ লিখেছেন। আশা দেবী এ কালের বিখ্যাত শিশু সাহিত্যিক জলপাইগুড়িরই কন্যা ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্ত্রী। মঞ্জুলিকা দাশ নামে আর এক কন্যা পরবর্তীতে কলকাতায় সুনাম অর্জন করেন কবি হিসাবে। তিনি অকালে প্রয়াত হয়েছেন। এই সময় এখানে সাহিত্যপ্রাণ শিক্ষক সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (শাস্ত্রী) মহাশয় মূল্যবান প্রবন্ধ রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। এই সময় থেকে বহু সুসন্তান জলপাইগুড়ি জেলার সাহিত্য সচেতনা গড়ে তোলার সহায়ক হন। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে এ শহরে আগত সদর বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সুনীতিবালা চন্দ, অরুণা দাশগুপ্তা প্রমুখ বিভিন্ন সময়ে সাময়িকীর পৃষ্ঠার পশ্চাতে সাহিত্যচেতনার প্রত্যক্ষ প্রেরণাদাত্রী ছিলেন।

দেশভাগ ও স্বাধীনতালাভের পর থেকে এ শহরে সাহিত্যচিন্তা যেসব সাময়িক পত্রিকাকে ঘিরে দেখা দেয় তার মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় চালসাদুয়ার থেকে প্রকাশিত "নবাগত" সাহিত্য পত্রিকার। পরবর্তীকালে যিনি আনন্দবাজার পত্রিকার আনন্দলোকের পাতার পরিচালক রূপে "সূত্রধার" নামে পরিচিত হন, এবং কলকাতাকেন্দ্রিক নব্যযাত্রা-আন্দোলনের প্রধান ধারক "যাত্রাবন্ধু" নামে দেখা দেন, সেই প্রবোধবন্ধু অধিকারী পূববাংলার টাঙ্গাইল থেকে এসে চালসায় বাস করার কালে "নবাগত" পত্রিকার সূচনা ঘটান। জলপাইগুড়ির কিলকট বান্দনের এক গৃহবধূ শৈলবালা বিশ্বাসের সহযোগিতায় পরবর্তীতে জলপাইগুড়ি বিশ্বাসভিলা থেকে এটি ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত হয়। জনমত পত্রিকার ২৭ বৈশাখ, ১৩৫৫ সংখ্যার একটি বিজ্ঞাপনদৃষ্টে বলা যায়—"ডুয়ার্সের একমাত্র ও নতুনদের নিজস্ব প্রগতিশীল মাসিকপত্র। সাহিত্য ক্ষেত্রে যাঁরা নবাগত তাঁদের সকল সমস্যা সমাধানই নবাগতের ব্রত ও আদর্শ।" এই সময় ঢাকা থেকে এসে এই পত্রিকায় যোগ দেন কবি বেণু দত্ত রায়। গয়েরকাটার সুসন্তান ও কলকাতার সীমান্ত পত্রিকা গোষ্ঠীর কবি নন্দদুলাল সরকার, বীরেন্দ্র প্রসাদ বসু, অসিত ঘোষ প্রমুখও এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত থাকায় পত্রিকাটি বিশেষ গুরুত্বলাভ করে। বীরেন্দ্র প্রসাদ গল্প, ছড়া ও প্রবন্ধ লেখায় সিদ্ধহস্ত।

এই সময় পত্রিকার সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে। হুঁশিয়ার (১৯৪৯), আহ্বান (১৯৫১), উত্তরপথ (১৯৫৬), চিত্রা (১৯৫৭) ছাড়াও এই সময় উত্তরবঙ্গ পত্রিকার আত্মপ্রকাশ ঘটে। রেবতী লাহিড়ীর সম্পাদনায় উত্তর পথের প্রথম সংখ্যায় বেশ কয়েকটি ভালো লেখা পাওয়া যায়। চা শিল্পপতি বীরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ তাঁর বিদেশ ভ্রমণের প্রথম কিস্তি "দুয়ার থেকে অদূরে" লিখেছিলেন এখানে।

পঞ্চাশের দশক থেকে ষাটের দশকের মধ্যে জলপাইগুড়িতে সাহিত্য প্রয়াসের অসাধারণ উৎকর্ষ দেখা দেয়। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ইতিপূর্বেই আনন্দচন্দ্র কলেজ প্রতিষ্ঠা-সূত্রে বিশিষ্ট অধ্যাপকদের আগমনের ফলে এই চেতনার ব্যাপক প্রকাশ ঘটার সুযোগ দেখা দেয়। ডঃ চারুচন্দ্র সান্যালের সম্পাদনায় জনমত পত্রিকাকে কেন্দ্র করে চিন্তাশীল লেখক গোষ্ঠী তো ছিলই, তাছাড়া অধ্যাপক ও বিশিষ্ট সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখদের প্রত্যক্ষ প্রেরণা সক্রিয় ছিল। এই সময় থেকে নানা পত্রপত্রিকার মাধ্যমে সাহিত্যচিন্তার স্রোত বইতে শুরু করে। দেবেশ রায় সম্পাদিত উত্তরবাংলা, উত্তরদেশ, সুরজিৎ দাশগুপ্ত ও বনবিহারী দত্তের জলার্ক, দেবব্রত মজুমদারের স্পষ্টকথা ও নিরপেক্ষ দেবেশ রায় ও সুরজিত দাশগুপ্তের উত্তরাশা,

ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের "বাঙ্গালীর ইতিহাস" নামক গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার আগেই দুর্গাচরণ সান্যাল লিখেছিলেন, "বাংলার সামাজিক ইতিহাস" নামক অমূল্য ও অসাধারণ গ্রন্থ। সেকালের বাংলার মনীষী রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এই গ্রন্থের ভূমিকা লেখেন। আচার্য প্রমথ বিশী, মুস্তাফা সিরাজ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ অনেকেই এই গ্রন্থের কাছে নিজেদের ঋণ স্বীকার করেন। এই জলপাইগুড়িতে বসেই তিনি সাহিত্যচর্চা করেন। পারস্য ভাষায় লেখেন প্রণয়কাব্য "পারস্যকাব্য"।

পঞ্চাশের দশক থেকে ষাটের দশকের মধ্যে জলপাইগুড়িতে সাহিত্য প্রয়াসের অসাধারণ উৎকর্ষ দেখা দেয়। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ইতিপূর্বেই আনন্দচন্দ্র কলেজ প্রতিষ্ঠা-সূত্রে বিশিষ্ট অধ্যাপকদের আগমনের ফলে এই চেতনার ব্যাপক প্রকাশ ঘটার সুযোগ দেখা দেয়। ডঃ চারুচন্দ্র সান্যালের সম্পাদনায় জনমত পত্রিকাকে কেন্দ্র করে চিন্তাশীল লেখক গোষ্ঠী তো ছিলই, তাছাড়া অধ্যাপক ও বিশিষ্ট সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখদের প্রত্যক্ষ প্রেরণা সক্রিয় ছিল।

কল্যাণ শিকদারের "আবর্তন", অর্ণব সেনের "নিষ্ঠ", মলয় বসুর "পঞ্চধারা" অপূর্ণা গুহের "দিশারী", তুষার বন্দোপাধ্যায় ও কল্যাণ শিকদারের "উত্তরের হাওয়া", ভবেন দত্তের "পদ্মরাগ", অজিতকুমার বকসী ও বরেন রায়ের "উত্তর মেঘ", নির্মলেন্দু গৌতম ও বরেন রায়ের "সমাবেশ", হরিমোহন বর্মণের "উত্তরবঙ্গ" প্রভৃতি পত্রিকাগুলি জলপাইগুড়ি শহরে সাহিত্য আন্দোলনের পথ প্রদর্শক হয়। ১৯৫৮-তে ডাঃ সরোজিত বাগচীর 'ডানপিটেদের সমাচার" নামক পত্রিকাটি শিশু ও কিশোর সাহিত্যের প্রেরণা ঘটায়। সুধীরকুমার বিশ্বাসের উত্তরবঙ্গ পত্রিকাটি এই সময় জলপাইগুড়ি থেকে প্রকাশিত হয়ে বহু প্রতিশ্রুতি সম্পন্ন লেখকদের সহায়তা করে। কবি ও ছড়াকার সঞ্জীবকুমার বাগচীর রচনাগুলি এই কলেজেই বেশি প্রকাশিত হয়।

দেবাশিস ঘোষের সীমান্তিক (১৯৬৮) প্রথমে মাসিক ও পরে পাক্ষিকরূপে দেখা দেয়। একে কেন্দ্র করে একদল লেখকের সাহিত্য প্রয়াস ঘটে। ছয়ের দশকে কল্যাণ শিকদারের সম্পাদনায় শহর থেকে প্রকাশিত হয় জলপাইগুড়ি। পরে এর সম্পাদক থাকেন জিতেন গুহ, কল্যাণ দে প্রমুখ। ১৯৭১-এ বীরেন্দ্রপ্রসাদ বসুর সান্ধ্যবার্তাও সংবাদনির্ভর পত্রিকা। অসংখ্য পত্র-পত্রিকার প্রকাশ ও অকালমৃত্যুর এক দীর্ঘতালিকা দিয়েছেন ডঃ রণজিতকুমার মিত্র মধুপর্ণীর জলপাইগুড়ি সংখ্যায়। সে সকল পত্রিকাগুলির প্রায় প্রত্যেকটিকে কেন্দ্র করেই সাহিত্যসাধনার প্রয়াস ঘটেছে। সম্ভবকাল, ঈক্ষণ, সামুদ্রিক, অর্ঘ্য পত্রিকাগুলির অকালমৃত্যুর পরে এখানে সাহিত্য প্রয়াসকে জাগিয়ে রাখার আন্তরিক প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে বিজয় দের পাগলা ঘোড়া, সমর চক্রবর্তীর ক্রুসেড, সুশান্ত নিয়োগীর যুদ্ধযাত্রা, ভাস্কর উদয় ঘোষ ও শশাঙ্কশেখর পালের শব্দমন্ত্র, দিলীপ সাহার বৃষ্টি, তমাল দে-র অতন্দ্রিলা, রমেন্দ্র রায়ের অঙ্কুর, জীবনকৃষ্ণ রায়ের 'অজানা সাহিত্যবাসর, মনোমোহন রায়ের জল্পেশ, দেবাশিস বিশ্বাসের হ্রেষা, এই নতুনদের মধ্যে কবি শুভ্র চট্টোপাধ্যায় ও নীলাদ্রি বাগচীর কথা অবশ্য উল্লেখ্য। গৌতম গুহ রায় ও শক্তিব্রত মজুমদারের দোতনা, অনুপ কুণ্ডুর হিং টিং ছট, অরুণাংশু ভৌমিকের দেশকাল সুধীর রায় অশোক দাশগুপ্ত তপনরশ্মি মিত্র ও নারায়ণ দাস সম্পাদিত উত্তরদেশ প্রভৃতি পত্রিকাগুলি এখানকার সাহিত্য প্রয়াসের নিদর্শন। অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে অরবিন্দ কর-সম্পাদিত উত্তরসরণী ও কিরাতভূমি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে একদল আধুনিক লেখকের আবির্ভাব ঘটেছে। গল্পকার ডাঃ বিজয় রায় তাঁর রম্যকথা একবিংশ শতাব্দী ও আধুনিক কবিতার মধ্যে সাহিত্য চর্চা চালিয়ে যাচ্ছেন। অরবিন্দ কর ও বিজয় রায়ের প্রধান পরিচয় গল্পকার রূপে। কবি ভাস্বতী রায়চৌধুরীর পত্রিকা অহংকার অনিয়মিত হলেও বিশিষ্ট রুচির পরিচয় দেয়। সন্তোষ চক্রবর্তীর মানসী পত্রিকাকে কেন্দ্র করে একদল সাহিত্যিক গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটেছে, আবার কবি গোপাল মণ্ডল এর কাগজ উত্তরের হাওয়াও সে ধারাটি বজায় রেখেছে। এছাড়াও প্রায়ই নানা নতুন পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। এ আলোচনায় এখানেই থামা ভালো। তবে বিস্তৃতভাবে দেখানো গেল এ-জন্যে যে, পত্রিকাগুলিকে কেন্দ্র করেই সাহিত্যচর্চা প্রসারিত হয়েছে। লোকসংস্কৃতি বিষয়ে তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো পত্রিকা এ শহর থেকে প্রকাশিত না হলেও পার্বতীচরণ চোংদার একজন বিশিষ্ট লেখক।

জলপাইগুড়ির লেখালিখিতে প্রেরণা জাগিয়েছিলেন এখানকার আনন্দচন্দ্র কলেজের বাংলার অধ্যাপক ও বিশিষ্ট কথাশিল্পী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। পরবর্তীতে অধ্যাপক ডঃ জীবেন্দ্র সিংহ রায়, ডঃ ভবানীগোপাল সান্যাল প্রমুখের ভূমিকা অসাধারণ। এ জেলার অনন্য প্রবন্ধ লেখক বোধহয় ডঃ ভবানী গোপাল সান্যাল। একসময় প্রবাসী ও মডার্ন রিভ্যুতে লিখেছেন এবং পঞ্চাশটির উপর প্রবন্ধ গ্রন্থ আছে। এঁদের দ্বারাই প্রভাবিত হয়ে পরবর্তী লেখকরূপে আত্মপ্রকাশ করেন অনেকেই। দেবপ্রসাদ চক্রবর্তী, অসিতকুমার ঘোষ, পুষ্পেন সরকার, মুকুলেশ সান্যাল প্রমুখ এ কলেজেরই সন্তান। এ কলেজেরই ছাত্র দিনেশচন্দ্র রায় পরবর্তীতে বিখ্যাত "সোনাপদ্মা" নামক উপন্যাস ও বহু ভালো ছোটগল্প লিখে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁর ঐরাবতের মৃত্যু গল্পটি ইংরেজিতে অনূদিত হয়ে বিদেশেও প্রশংসিত হয়। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপনিবেশ এখানে থাকতেই লেখা শুরু হয়েছিল, স্বর্ণসীতা উপন্যাসটিও এখানকার। অনেক শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প এখানে বসেই লেখা। নীহাররঞ্জন সেনগুপ্তের বহু ছোটগল্প প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত হত। প্রসিদ্ধ ছোটগল্প লেখক ও ঔপন্যাসিক ভূপেন্দ্রমোহন সরকার সেকালের শনিবারের চিঠি পত্রিকায় লিখতেন। তাঁর ঐতিহাসিক নাটক, "অনেক স্বর্গ" এবং "জমি শিকড় আকাশ" উপন্যাস, "বাণী ও ভস্ম" ছোটগল্পের প্রশংসা করেন সজনীকান্ত দাস ও তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়। এ শহরে দেশভাগের পর চাকরি সূত্রে কিছুকালের জন্য ছিলেন যুবনাশ্ব (মণীশ ঘটক)। এ শহরের বুকে বসেই আনন্দচন্দ্র কলেজের অধ্যাপক অমিতাভ দাশগুপ্ত অসংখ্য কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাঁর "মৃত শিশুদের জন্য টফি", "মধ্যরাত্রি হতে" আর "সাতমাইল" ছাড়াও "মাংসের প্রতিমা" নামে উপন্যাস এখানে থাকাকালীনই প্রকাশিত হয়।

শিশুসাহিত্যে রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত কবি মোহিত ঘোষের বাড়িতে ছিল সাহিত্য চর্চার প্রতিষ্ঠান বন্ধুদলের আড্ডা। প্রগতি শিল্পী চক্র,

মিলনায়তনের অনুষ্ঠান হত নানা স্থানে। ১৯৪৭-এর আগেই ঢাকায় বাসকালে লিখতে শুরু করে দেশভাগের পর বেণু দত্তরায় আসেন এখানে। তাঁর কবিতা গল্প প্রবন্ধ রম্যরচনা উপন্যাস এইসময় থেকেই ছাপা হয়েছে বাংলার সমস্ত কাগজে। এ শহরের আর এক প্রাণকেন্দ্র ছিলেন সুরজিত বসু। কবিতা ছোটগল্প, নাটক, উপন্যাস ও অনুবাদকর্মে বিস্ময়কর খ্যাতি লাভ করেন। প্রকাশিত গ্রন্থ তিনটি ছাড়াও পত্রিকায় প্রকাশিত আকারে তিনটি উপন্যাস আছে তাঁর। বেণু দত্তরায়ের দশটি কাব্যগ্রন্থ এ যাবৎ প্রকাশিত। সুরজিত দাশগুপ্ত জলপাইগুড়ির সন্তান হলেও ছাত্রজীবন থেকেই প্রবাসী। তাঁর রচনাগুলির কোলেকোলেটি জলপাইগুড়ি নিয়েই লেখা, তবে প্রবন্ধ লেখকরূপেই আজ কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত। সমীর রক্ষিত ও এ-শহরেরই মানুষ, কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত। রণজিৎ দাশগুপ্ত-ও জলপাইগুড়িরই সন্তান। কলকাতায় অধ্যাপক ছিলেন। জলপাইগুড়ির সমাজ ও অর্থনীতি বিষয়ে কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছেন। বহু প্রবন্ধের লেখক মন্ত্রী নির্মল বসুও সম্প্রতি প্রয়াত। ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক জলপাইগুড়ির লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্য বিষয়ে বহু বই লিখেছেন। প্রয়াত মলয় বসু প্রবন্ধ ও গল্প লিখেছেন দুহাতে। জলপাইগুড়িতে পড়তে আসা সূত্রে অর্ণব সেনও পরে এ শহরের মানুষ হয়ে গিয়েছেন। তাঁর দুটি উপন্যাসের নাম—"অন্ধকারের সিঁড়ি", "সমুদ্র নেই দ্বীপ"। গল্প লেখক রূপে আনন্দবাজারে "নতুন মা" গল্প নিয়ে আত্মপ্রকাশ। বহু বিদেশি কবিতার অনুবাদক ও প্রাবন্ধিক।

এ শহরেরই ছাত্র ও অধ্যাপক, পরবর্তীকালে গবেষক দেবেশ রায় আজ বাংলা সাহিত্যের একটি প্রধান নাম। কলেজের ছাত্র থাকা কালেই দেবেশ রায়ের "হাড়কাটা" গল্পটি দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে বাংলা ছোটগল্পের ধারায় এক প্রধান শিল্পী। "তিস্তাপারের বৃত্তান্ত" তাঁকে এনে দিয়েছে একাডেমি পুরস্কার। আরও অনেক উপন্যাসের লেখক সমরেশ মজুমদারও তেমনি আজকের বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত নাম। জলপাইগুড়ির ছেলে। প্রথমে ময়নাগুড়ির পাবক পত্রিকার সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। পরে ছোটগল্প রচয়িতা ও ঔপন্যাসিকরূপে তিনিও একাডেমি পুরস্কার পেয়েছেন। জলপাইগুড়ির পটভূমি তাঁর রচনায় বারবার দেখা দেয়। জলপাইগুড়িতে বসেই একদা সুখ্যাত কার্তিক লাহিড়ী আজ বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট নাম। লেখক জীবন সরকারও তাঁর ছোটগল্পগুলির জন্যে বিখ্যাত। অশোক বসু দেশ পত্রিকায় আত্মপ্রকাশ করে অসংখ্য ছোটগল্প লিখে চলেছেন। গল্পকার রণজিৎ মিত্রও লিখছেন। আর একজন বিখ্যাত গল্পকার জ্যোৎস্নেন্দু চক্রবর্তী দীর্ঘকাল ধরে লিখছেন। তাঁর লেখা নস্ট্যালজিক। বহু গ্রন্থের লেখক। গল্পলেখিকা সুজাতা রবাবি প্রচুর গল্প লিখছেন, লিখছেন তপতী বাগচীও। প্রবন্ধ রচনার দিক থেকে বিচার করলে এ জেলার প্রধান প্রাবন্ধিক ও মনস্বী লেখক রূপে মনে আসবে প্রথমেই ডঃ চারুচন্দ্র সান্যালকে। এ জেলার লোকায়ত জীবন নির্ভর সংস্কৃতির উপরে বহু মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছেন তিনি। তাঁর Rajbansis' of North Bengal, Meches and the Totos প্রভৃতি গ্রন্থ ছাড়াও নৃতাত্ত্বিক ও ভাষাতাত্ত্বিক বহু পুস্তকের রচয়িতা। তিনি রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক। লেখকজীবনে ভবরঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায় ও ভুবনেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের নামও বিশেষ স্মরণীয়। জেলার রবীন্দ্রনাথ শিকদার, দেবেন্দ্রমোহন সরকার, ডক্টর ভবেশচন্দ্র



জীবন সরকারের উপন্যাস নৌকাযাত্রা

চৌধুরী প্রমুখ উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লেখক। ভবেশ চৌধুরী তো একাধিক আন্তর্জাতিক সম্মান পেয়েছেন। এখানে থাকতেই ডঃ কার্তিক লাহিড়ী অনেক মূল্যবান প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধ লেখকদের মধ্যে অবশ্যই অনেকে আছেন। নির্মল বসুর নাম আগেই করেছি, লোকায়ত সংস্কৃতি ও মূল্যবান সাহিত্যের অসংখ্য মূল্যবান প্রবন্ধ লিখে গিয়েছেন নির্মলকুমার চৌধুরী। ডঃ বিমলেন্দু মজুমদারও টোটোদের উপরে মূল্যবান সামাজিক গবেষণা করে সারা বাংলার গুণীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে Asiatic Society-র সদস্য হয়েছেন। পরিতোষ দত্ত, মুকুলেশ সান্যাল দু'জনেই বিখ্যাত প্রবন্ধ লেখক। তবে লোকজীবন সম্পর্কে লেখেন "প্রথম জীবন" ও "দ্বিতীয়জন" মূলত দার্শনিক ও কবি মনের অধিকারী। অন্যান্য প্রবন্ধ লেখক ডঃ চণ্ডীদাস লাহিড়ী, অশোক দাশগুপ্ত, শিবপদ ভৌমিক, সুস্মিতা ভৌমিক (কুণ্ডু), পাখী ঘটক, পরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, অরুণকুমার, শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সুবীর রায়, সৌরভ ঘটক, রণজিৎ মিত্র, দেবব্রত ঘটক, সুভাষ চৌধুরী প্রমুখে নাম উল্লেখযোগ্য। সুভাষ চৌধুরী মূলত ঔপন্যাসিক হলেও রাজনৈতিক প্রবন্ধের দিকেই তাঁর বেশি ঝোঁক, অন্যেরা নানা বিষয়েই প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধ লেখকরূপে বর্তমানে ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ খুবই সুপরিচিত। তবে ইতিহাস বিষয়েই তাঁর পাণ্ডিত্য, তিনি সাহিত্যের লোক নন, তবে সংস্কৃতি চর্চা বিষয়েও তাঁর আকর্ষণ আছে।

ডঃ মলয় বসু ও ডঃ বিমান সরকারও প্রাবন্ধিক রূপে সুনাম অর্জন করেছেন। অরুণকুমারও প্রাবন্ধিকরূপে বিখ্যাত।

জলপাইগুড়ি শহরকেন্দ্রিক সাহিত্য আন্দোলনে, এ কথা উল্লেখ করা দরকার যে, কবিরাই এতে মুখ্যস্থান অধিকার করেছেন। সাহিত্য চর্চায় কবিপত্রের ভূমিকাই প্রধান। এ শহরের প্রসিদ্ধ কবি তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌতম গুহ রায়, সমর রায়চৌধুরী, বিজয় দে, সুশান্ত নিয়োগী, দেবাশিস কুণ্ডু, শুভ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্যামল সিংহ, নীলাদ্রি বাগচী, শোভন চক্রবর্তী প্রমুখ এক্ষেত্রে প্রধান। দ্যোতনা, তিস্তাপত্র প্রভৃতির মূল্য এ ক্ষেত্রে অস্বীকার করা যায় না। লিটল ম্যাগাজিনই এর প্রাণ। ভাস্কর ঘোষ শশাংক পালের আবির্ভাবও লিটল ম্যাগাজিন সূত্রেই। এখানকার বনবিহারী দত্তের জলার্ক পত্রিকায় লিখতেন বিখ্যাত লেখক সন্তোষকুমার ঘোষ, মুজতবা আলী, সঞ্জয় ভট্টাচার্য জীবনানন্দ দাস, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ লেখকেরা। এতে প্রকাশিত হয় কবি জীবনানন্দের একগুচ্ছ পত্র। এ রকম আর একটি পত্রিকা ছিল বঙ্কুবিহারী দত্ত ও অর্ণব সেন সম্পাদিত কনিষ্ঠ পত্রিকা, যার লেখক ছিলেন অন্নদাশঙ্কর রায়, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, জীবেন্দ্র সিংহ রায় প্রমুখ। এ রকম লিটল ম্যাগাজিন মফস্বলে অল্পই দেখা যায়।

ময়নাগুড়ি শহরে ১৯৫২তে কবি সতী সেনগুপ্তের পাবক পত্রিকাকে কেন্দ্র করে সাহিত্যের জোয়ার দেখা দেয়। এ কাগজে প্রকাশক হিসেবে যুক্ত ছিলেন এ কালের বিখ্যাত কথাশিল্পী সমরেশ মজুমদার। এ পত্রিকার পাশাপাশি নাম করতে হয় কবি প্রিয়কুসুম চক্রবর্তীর উত্তর সৈকত নামে পত্রিকা। দিলীপ ফণীর হাতুড়িকে কেন্দ্র করেও নতুন প্রয়াস জেগেছিল। পোঁহাতি ছিল রাজবংশীদের বিভাষায় বিখ্যাত কাগজ। এই ময়নাগুড়ির কাছে দৌমোহনী থেকে আলতারাফ, অনামীসম্ভব, পতিতা, সূর্য প্রভৃতি পত্রিকা।

শহরে সাহিত্য সৃষ্টির ঢেউ নিয়ে আসেন এ শহরের শিক্ষিত পরিশীলিত নির্মলেন্দু বিষ্ণু, যিনি ছিলেন কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের বন্ধু। সন্তোষ ভদ্রের সঙ্গে যৌথ সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল ঐকতান পত্রিকা। সেটিই প্রথম সাহিত্য আন্দোলনের শুরু। ১৯৫৪ সাল সেটি। এখানে শক্তির কবিতা ছিল। ১৯২৬-এ এই শহর থেকে বিজয় গোপাল ঘোষের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় "হিমালয়" নামক পত্রিকা। কাঞ্চনজঙ্ঘা নামক পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় ১৯৬২-তে।

আলিপুরদুয়ার মহকুমার বীরপাড়া এইসময় সাহিত্যচর্চার প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে কবি তুষার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত "বনভূমি" পত্রিকা। জলপাইগুড়ি জেলার নতুন লেখকদের প্রাণকেন্দ্র হয়ে ওঠে এ পত্রিকা। শুধু এখানকার নয়, সারা বাংলার কবিরাই এই পত্রিকায় লিখতেন। তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনেক কবিতার বই প্রকাশিত হয়—ঢেউ ওঠে মেকঙে পদ্মায়, অললই ঝললই মাঁদারের ফুল, হাত বাড়ালেই সিংহাসন। এই সময়কার একজন কবি শিশির রায় নাথের নাম ছড়িয়ে পড়েছিল। স্থানীয়রা অনেকেই লিখতেন। বীরপাড়া থেকে সাহিত্যসৃষ্টির প্রয়াসে যুক্ত হন বীরেন রায়। তাঁর পত্রিকায় অনেকেই লেখেন। আবার অর্ণব সেন ও রমেন বসুর পত্রিকা "নতুন সীমান্ত"কে কেন্দ্র করেও সাহিত্যের জোয়ার দেখা দেয়। ছয়ের দশকের কবি রাণা সরকার মাদারীহাট থেকে পাহাড়তলী পত্রিকা বার করেন। কবি রাণা সরকারের কবিতা তখন কলকাতার কাগজেও প্রকাশ হতে শুরু করে। এই পত্রিকায় নানা প্রবন্ধও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ডুয়ার্স থেকে এ সময় একটির পর একটি পত্রিকার সৃষ্টি হতে শুরু করে ও অনেক কবি সাহিত্যিকেরা লিখতে শুরু করেন। বীরেন রায় সম্পাদিত পত্রিকাটিতে লোকজীবন সম্পর্কে নানা মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশ করেছে। উত্তর বাংলার লোকায়ত সমাজের নানা পূজা পার্বণ অনুষ্ঠানাদির বিষয়েও লেখা হয়। কামাখ্যাগুড়ি থেকে অনার্য ও একলব্য পত্রিকাও সাহিত্যচর্চায় একটি নাম। এ জেলার সাহিত্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটি বিশালভূমিকা গ্রহণ করেছে ধূপগুড়ি। সাহিত্যচর্চা ও পত্র পত্রিকা প্রকাশ, নাটক আন্দোলন, ভালো ছাপাখানার প্রতিষ্ঠা বিভিন্নক্ষেত্রে তার ঐতিহ্য স্বীকার করতে হয়। এখানকার কবিরাই প্রধানত সাহিত্যধারার নিয়ামক। জীবন সরকার, পুণ্যশ্লোক দাশগুপ্ত, অনামন দাশগুপ্ত, চিত্রভানু সরকার ইত্যাদির উদ্যোগে আধুনিকতার বাহন হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে শব্দ, পাহাড়তলী, শালবনী, সৌধ, বুদ্ধদেব, গদ্যদিনের অহঙ্কার প্রভৃতি সাহিত্য পত্রিকা। নিখিল বসু ও পুণ্যশ্লোক দাশগুপ্ত প্রমুখ দীর্ঘদিন ধরে কাব্যচর্চা করছেন। পুণ্যশ্লোকের অনেকগুলি কবিতাগ্রন্থ আছে, এবং তার নাম উত্তরবাংলার বাইরেও প্রতিষ্ঠিত। অসাধারণ প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছিলেন অনামন দাশগুপ্ত; তাঁর কবিতা সংকলনের অধিকাংশ কবিতা পড়েই প্রয়াত কবির জন্য আক্ষেপ জাগে। তপন চট্টোপাধ্যায় ও নিখিল বসুর উদ্যোগে লালনক্ষত্র পত্রিকার মাধ্যমে চিন্তা ভাবনা ও মননের একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। লালনক্ষত্রে শারদ সংখ্যাগুলি সারা বাংলাতেই সংগ্রহ ও সংরক্ষণের বিষয় হয়েছে। ধূপগুড়ির তরুণ লেখকেরা মাঝে মাঝেই নতুন পত্রিকা প্রকাশ করে বাংলা সাহিত্যে চমক দেন। এ বার প্রকাশিত "তিস্তাতোর্ষা"। ভালো কাগজ। এ কাগজের পক্ষ থেকে বইও প্রকাশ করা হচ্ছে। সম্প্রতি চা অঞ্চল গয়েরকাটা থেকে বেরিয়েছে, ব্রজ গোস্বামী সম্পাদিত "সংহতি" চা নির্ভর সমাজ সংস্কৃতির পরিচয় নিয়ে। চিত্রভানু সরকারও এ শহরেরই কবি। জীবন সরকার কেবল পত্রিকা পরিচালনার ক্ষেত্রে নয় নিজেও এই অঞ্চলের একজন শক্তিমান গল্প লেখক। তাঁর কাঙ্ক্ষিত, সেজানের দিনরাত্রি, চালি, নৌকাযাত্রা গল্প এবং উপন্যাস—নদীর নামে নাম, বামনহাটি প্যাসেঞ্জার উল্লেখযোগ্য।

এবার আলিপুরদুয়ার শহর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সাহিত্যসৃষ্টির কথা। বীরপাড়া, মাদারীহাট, ধূপগুড়ির কথা তো আগেই বলেছি, ফালাকাটায় বসে লিখছেন শক্তিমান লেখক গল্পকার অমরেন্দ্র

চৌধুরী। নাটকের সঙ্গে আছেন বিনায়ক দেব। কোরাস নাট্যসংস্থাকে কেন্দ্র করে তাঁর সাহিত্যচক্র। জটেশ্বরে আছেন নাট্যকার অজিত দে। পানবাড়ি অঞ্চলের "অ্যাংরিম্যান"-এর লেখক সঞ্জয় দাসের কথা মনে পড়ে। কালচিনি অঞ্চল থেকে সাহিত্য সৃষ্টির প্রশংসনীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছেন কবি ও ছড়াকার সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায়। নিয়মিতভাবে তিনি উন্মেষ পত্রিকা বার করে চলেছেন। চা বাগান কেন্দ্রিক সাহিত্যে তিনি উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। গল্প ও রম্যরচনা লিখেছেন অজস্র। সাদরীভাষায় তাঁর একাঙ্কনাটক রৌরেমন। তাঁর কাব্যগ্রন্থ ডুয়ার্স আমার অরণ্য আমার। কালচিনির অন্যান্য কবিদের মধ্যে, নবারুণ ভট্টাচার্য, শক্তি চক্রবর্তী, মানবেন্দ্র প্রসাদ চক্রবর্তী বিখ্যাত। জটেশ্বরে আছেন নাট্যকার অজিত দে। কামাখ্যাগুড়ি থেকে লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্য চর্চায় নিবেদিত সুনীল পাল সাহিত্য আন্দোলনের এক প্রধান ব্যক্তিত্ব। লোকায়ত জীবনের এত সংবাদ তাঁর প্রবন্ধে, এ জীবনের রসের আস্বাদন নানা ছড়া শিল্প সঙ্গীতে তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন। এখান থেকে অসাধারণ পরিশ্রমী ও মননশীল গদ্যরচয়িতা হিসেবে নাম করেছেন কৃষ্ণপ্রিয় ভট্টাচার্য। দেবাশিস পাল ও কৃষ্ণপ্রিয় প্রমুখেরা একযোগে বার করেছিলেন "একলব্য" ও "অনার্য" নামে পত্রিকা। বাঙালি বাজনায় কবি গোলাম কিবরিয়া, বীরেন রায় প্রমুখ বিখ্যাত। এঁরা প্রবন্ধও লিখেছেন। এই শহর আলিপুরদুয়ারের সন্নিহিত দলসিং পাড়ায় চা বাগানের ম্যানেজার রূপে থেকে সাহিত্য সাধনা চালিয়ে গেছেন বিখ্যাত বীরেশ্বর বসু। তাঁর বিখ্যাত বই "চা মাটি ও মানুষ" কলকাতার বড় কাগজে প্রকাশিত হয়।

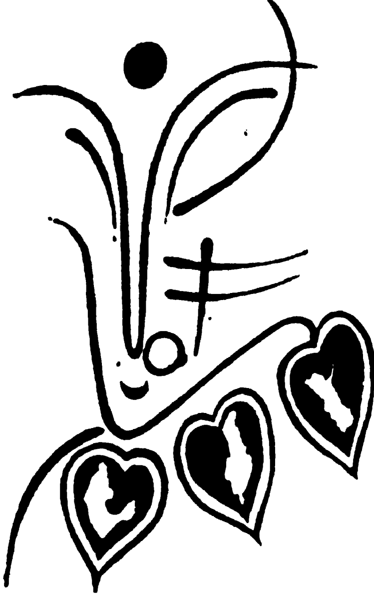
আলিপুরদুয়ার শহরকে কেন্দ্র করে অতীতে যাঁরা লিখতে শুরু করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে কানাইবল্লভ গোস্বামীর নাম সর্বাগ্রে মনে পড়ে। তিনি ছিলেন নামী লেখক সন্তোষকুমার ঘোষের বন্ধু এবং চা বাগানের উপরে রচিত তাঁর উপন্যাসটি খুবই সুনাম পেয়েছিল। এ শহরে ছিলেন অশ্বিনীকুমার সেন। অসংখ্য প্রবন্ধ তিনি লিখেছেন একসময়। শহরে সাহিত্য সৃষ্টির ঢেউ নিয়ে আসেন এ শহরের শিক্ষিত পরিশীলিত নির্মলেন্দু বিষ্ণু, যিনি ছিলেন কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের বন্ধু। সন্তোষ ভদ্রের সঙ্গে যৌথ সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল ঐকতান পত্রিকা। সেটিই প্রথম সাহিত্য আন্দোলনের শুরু। ১৯৫৪ সাল সেটি। এখানে শক্তির কবিতা ছিল। ১৯২৬-এ এই শহর থেকে বিজয় গোপাল ঘোষের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় "হিমালয়" নামক পত্রিকা। কাঞ্চনজঙ্ঘা নামক পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় ১৯৬২-তে। গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ থাকত এতে। সম্পাদনা করেছেন একযোগে বিমলেন্দু দাস, সুরঞ্জন দত্ত রায়, অনিল গঙ্গোপাধ্যায়, তরুণ ভট্টাচার্য ছিলেন সম্পাদক। বিমলেন্দু দাম ও সুরঞ্জন দত্ত রায়-এর গল্প এবং অনিল গঙ্গোপাধ্যায়ের চা বাগানের উপরে রম্যরচনা এখানে প্রকাশিত হয়। এখানে বসেই অনিল গঙ্গোপাধ্যায় লেখেন তাঁর বিখ্যাত বই "ডুয়ার্স প্রাঙ্গণ থেকে।" পরে আরও কয়েকটি বই প্রকাশিত হয়। কবি জগন্নাথ বিশ্বাস এ শহরের প্রতিষ্ঠিত এবং প্রধান কবি। অনুবাদ রচয়িতা হিসেবেও তাঁর খ্যাতি। জিম্ করবেটের মানুষখেকো বাঘ তার প্রমাণ। "ঝিলম ও অন্যান্য কবিতা" এবং "স্মরণের বেলাভূমি" তাঁর কাব্যগ্রন্থ।

সমীর চক্রবর্তী দীর্ঘদিন কবিতা রচনা করেছেন। তুষারের সঙ্গে তাঁর "হাঙরের ঢেউ আগুনের সেঁক" ছিল যুগ্ম প্রকাশনা গ্রন্থ। চৌদিকে পায়ের শব্দ (১৯৭৭), "শিলালেখ কিংবা ঝড়", "স্টেডিয়াম নেই, হাততালি নেই" (১৯৮৩), হল কাব্যনাট্যগ্রন্থগুলির নাম। কাব্যগ্রন্থ "হলুদ ঘাসের অমনিবাস" "শীত ও ক্ষুদার গল্প", "হেঁটে যাচ্ছে আত্মাবাহক" ইত্যাদি ছাড়াও চা বৃত্তান্ত নামে বিখ্যাত গবেষণাগ্রন্থ। অন্যান্য কবিদের মধ্যে বিমল ভট্টাচার্য, কমলেশ রাহা রায়, বেণু সরকার, তপন ঘোষ কিশোর পাইন, রমাপ্রসাদ নাগ, নির্মলেন্দু বিষ্ণু, বিমলেন্দু বিষ্ণু, নিলয় মিত্র, উত্তম চৌধুরী, শ্রীপদ দাস, অমল ভট্টাচার্য, হারাধন পাল, অভয় দে, ত্রিদিব চক্রবর্তী, খোকন সরকার, দিবাকর ভট্টাচার্য, বিকাশ সেন, মধুমতী চক্রবর্তী, দেবাশিস বাগচী, নন্দদুলাল মজুমদার, রণজিত দত্ত, পবিত্র ভূষণ সরকার, শঙ্কর আইন, দেবীপ্রসাদ চৌধুরী, অনল চক্রবর্তী, সঞ্চিতা দাস, উজ্জ্বলা দাস, গণেশ দেবনাথ, অনুপ দত্ত প্রমুখের সাহিত্য সাধনা বর্ণময়। এঁদের মধ্যে উল্লেখ না করলেও তিনজন নারী কবির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। করবী ধরের "যৌবন" এ শহরের মহিলা কবি রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ। শিপ্রা সেন ধর এরই মধ্যে প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন। বহুস্থানে তাঁর কবিতা প্রকাশিত হয়। পত্রিকা সম্পাদিকাও বটে। কলকাতার মহাদিগন্ত থেকে তাঁর বই বেরিয়েছে। মধুমিতা চক্রবর্তীও কবিতা লিখতেন। কবিতার ফোল্ডার প্রকাশ করতেন।

এ শহরের কবিদের মধ্যে দিবাকর ভট্টাচার্যেরও একটি স্বতন্ত্র স্থান আছে। "সময়" ও "দ্রোহ" পত্রিকার এই সম্পাদকের কথা, উপকথা ও অনুভূতি এবং "খাকি বাতাসের কবিতা" দুটি উল্লেখ্য কবিতাগ্রন্থ। এ শহর থেকে লিখেই মনোজ রাউত অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। অনেক বই তাঁর—"নাম বিনিয়ে ইনাম", "দ্বিতীয় যুবতী", "অসুখীর শরীর", "বোধের সন্ততি" ও "পাপ" ইত্যাদি। কমলেশ রায় ও উত্তম চৌধুরীর কবিতা শুধু জেলায় নয়, বাইরেও প্রকাশিত হয়ে চলেছে। উত্তম চৌধুরী আবার শিল্পীও। মাটির ছোঁয়া পত্রিকার সম্পাদক পবিত্র ভূষণ সরকার গদ্য-পদ্য-নাটকে উভচর লেখক। আলিপুরদুয়ার শহরে কবির সংখ্যা অগণ্য। কবির শহর বলা চলে একে। তনুময় সরকার তরুণ কবিদের অন্যতম। পত্রিকাও সম্পাদনা করে থাকেন। রামেশ্বর রায়ের পত্রিকা আছে। তরুণ কবিদের মধ্যে তিনিও প্রতিষ্ঠিত। গল্পকারের সংখ্যা কম হলেও উল্লেখযোগ্য। জ্যোৎস্নেন্দু চক্রবর্তীর মতো গল্পকার এখানে বসেই সিদ্ধিলাভ করেছেন। তাঁর অসংখ্য ছোট গল্প প্রতিসময় প্রকাশিত হয়। নিজস্ব কয়েকটি গ্রন্থও আছে। সুধাংশু কর্মকার ছিলেন উল্লেখযোগ্য গল্পকার ও নোনাই পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতাদের একজন। বিমল ভট্টাচার্যের "বাঘ" এক উল্লেখযোগ্য ছোটগল্প। এখানে তবু উল্লেখ না করে পারছি না, একসময় বাংলা ছোটগল্পে অর্ণব সেনের ছিল নিজস্ব ভূমিকা। অনেক গল্প প্রকাশিত হয়েছে। বেণু দত্ত রায়ের গল্পও অনেক প্রকাশিত হয়েছে। গল্প লিখে "বাংলার বাতায়ন" পুরস্কার পেয়েছিলেন। জ্যোৎস্নেন্দুর সঙ্গে অর্ণব সেনের "পোস্টকার্ড" গল্প-সংকলন (১৯৮৬) দারুণ সাড়া জাগিয়েছিল। এ শহরের আর এক অসাধারণ গল্প লেখক তুষার চট্টোপাধ্যায়। নানা স্বাদের গল্প ও উপন্যাস লিখে তিনি আমাদের বিস্মিত করে দেন। সারা বাংলায় তাঁরও গল্প প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধ লেখকদের মধ্যে নাম উল্লেখ করব নরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর। "সাজাদপুরে রবীন্দ্রনাথ" তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। "দরদী রবীন্দ্রনাথ", "গ্রহ নক্ষত্রের মিছিল" তাঁর গ্রন্থ। "বহ্নিকন্যা" নামে উপন্যাসও লিখেছিলেন। সুরঞ্জন দত্ত রায় সাপ্তাহিক বসুমতীতে "অগ্নিবর্ণ" ছদ্মনামে লিখেছেন

একবিংশ শতাব্দী

শারদ সংকলন—১৪০৫



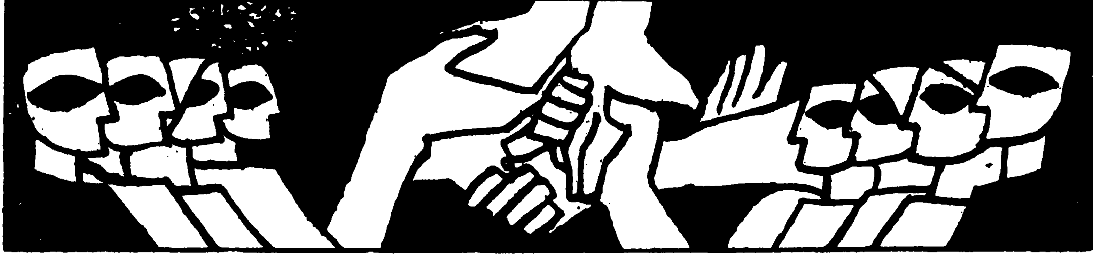
সম্পাদক : ডাঃ বিজয় ভূষণ রায়।

ডাঃ বিজয়ভূষণ রায় সম্পাদিত একবিংশ শতাব্দীর শারদ সংকলন

“তিমির প্রান্ত ডুয়ার্স” নামে রম্যরচনা। এখান থেকেই প্রবন্ধ লিখে থাকেন বনবিহারী ভট্টাচার্য, উদয়ন ভট্টাচার্য, গিরিজাশঙ্কর রায়, পবিত্র সরকার, মণিভূষণ রায়, বিমলেন্দু বিষ্ণু। ননী ভট্টাচার্য রাজনীতির জগতে থেকেও কাব্য ও প্রবন্ধ চর্চা করেছেন। কৃষ্ণপ্রিয় ভট্টাচার্য অসাধারণ পরিশ্রমী ও ব্যতিক্রমী প্রাবন্ধিক। লোকসংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে এখানকার প্রাবন্ধিক সুনীল পালের নাম সারা বাংলাতেই পরিচিত। দাবি পত্রিকার সম্পাদক রাণা সেন এবং বিধায়ক নির্মলকুমার দাসও উল্লেখযোগ্য কবিও প্রাবন্ধিক। পরিমল দে ভালো রম্যরচনার লেখক হলেও ভালো প্রাবন্ধিক। সমীর চক্রবর্তী মূলত কবি হলেও পরিশ্রমী প্রাবন্ধিক রূপে পরিচিত। এমনই অসাধারণ প্রাবন্ধিক তারাপদ দাশ এবং সুবোধকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ও নানা বিষয়ে মূল্যবান প্রবন্ধ লিখে থাকেন। সুধীরকুমার বিষ্ণু জলপাইগুড়ি জেলার লোকভাষার উপরে মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছেন। অধ্যাপক শক্তি ঘোষের নাম এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে করতে হয়। একসময়ে এ শহরে বসেই কলকাতার আনন্দবাজারে ও অন্যান্য পত্রিকায় ইতিহাসাশ্রিত রম্যরচনা লিখে সকলকে আনন্দিত করেছিলেন। তাঁর নাটক “হট্টগোলের দেশ” এক ব্যঙ্গ চিত্র। প্রদীপ দেও এ শহরের অতিখ্যাত নাট্যকার। “আঁধার বিবরে” এবং “নবারুণ” তাঁর বিখ্যাত নাটক। অনুপম হালদার এ শহরে বসেই “বক্সাবন্দীনিবাস” নামক মূল্যবান গ্রন্থটি লিখেছেন। একসময় জীবনীগ্রন্থ লিখতে শুরু করেছিলেন বিখ্যাত বিপ্লবী ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ দত্ত। পরে সেটি হারিয়ে যাওয়ায় এক বহুমূল্য স্বাধীনতা আন্দোলনের অধ্যায় থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি। সুভাষ গঙ্গোপাধ্যায় নামে ঔপন্যাসিক এ শহরেরই মানুষ। তাঁর কয়েকটি উপন্যাস আছে।

পরিশেষে উল্লেখ করা প্রয়োজন, শুধু জলপাইগুড়ি জেলাতেই নয়, কলকাতার বাইরে এখান থেকেই বুঝি অসংখ্য পত্র-পত্রিকাকে কেন্দ্র করে সাহিত্যচিন্তার বিকাশ সাধিত হয়েছে। ঐকতান, কাঞ্চনজঙ্ঘা, এই শতক, রোডসাইড, শপথ, সোচ্চার, কালজানি, দিশারী, যন্ত্রণা, বিনিদ্র, নোনাই, তরাই এর কল্লোল, সময়, তল্লাসী, সমুদ্র, উৎস, শতক, কবিতা পাক্ষিক, মাটির ছোঁয়া, মিনজুরি, গল্প ইদানীং, উত্তর-বাংলার চিঠি, বনমহল, দ্রোহ, মুক্তি, চন্দ্রমল্লিকা, আজকের কবিতা, আধুনিক বাংলা কবিতা, শিলালিপি, দৃশ্যমুখ, তিস্তাপক্ষ, দাবী, বক্সাবাজার প্রভৃতি। আবার নোনাই পত্রিকাকে কেন্দ্র করে আলিপুরদুয়ার থেকে সাহিত্যে উঠে এসেছেন নরেশচন্দ্র চক্রবর্তী। তাঁর বিখ্যাত বই শাজাদপুরে রবীন্দ্রনাথ। কলকাতার নানা কাগজে তিনি লিখতেন। বিমল দত্ত, হারাধন পাল, সুধাংশু কর্মকার প্রমুখের নাম উল্লেখের পরেও উল্লেখ করতেই হচ্ছে শিপ্রা সেন ধর ও চন্দন সরকারের নাম। কলকাতার নানা কাগজে শিপ্রা লিখছেন। কবি হিসেবে তাঁর বই কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এই পত্রিকায় লিখলেও কবি কমলেশ রাহা রায় ও কবি উত্তম চৌধুরীর খ্যাতি আজ সারা বাংলাতেই প্রতিষ্ঠিত। গল্পকার তুষার চট্টোপাধ্যায়ের খ্যাতি তার নানা ছোটগল্প ও উপন্যাসের মাধ্যমে সারা বাংলাতেই ছড়িয়ে আছে। এ শহরে নাটক লিখে খ্যাতি পেয়েছেন প্রদীপ দে। এখনো লিখছেন। লিখছেন কবি দেবাশিস চাকী। তাছাড়া খুবই অল্পসময়ের মধ্যে উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে উঠে এসেছেন এ জেলার সুভাষ চৌধুরী। দেশভাগের বেদনা নিয়ে বাঙালির উপন্যাসের অভাব তিনি এখান থেকে অনেকটাই মিটিয়ে দিয়েছেন। পর পর কয়েকটি উপন্যাসের নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতেই হয়। এগুলি হচ্ছে ওপার বাংলার স্মৃতিকথা, পদ্মাগঙ্গার সেতুবন্ধ। এ জেলার এক বিখ্যাত লেখক সলিল চট্টোপাধ্যায় তাঁর অজস্র গল্প লিখে সারা বাংলার প্রতিষ্ঠিত ছোটগল্প লেখক হয়ে উঠেছেন। কলকাতার সমতট পত্রিকার সঙ্গেও তিনি যুক্ত। এখান থেকেই রবীন বাগচী ছড়াকার হিসেবে কলকাতা পর্যন্ত নিজের সুনাম ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। সম্প্রতি তিনি প্রয়াত। তবে এখানকার ছেলে শিশুসাহিত্যে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেয়ে কলকাতায় চলে গিয়ে অশেষ খ্যাতির অধিকারী হয়েছেন। তবে জলপাইগুড়িতে সুজন ছড়ার আসরকে কেন্দ্র করে অনেক ছড়াকারের সৃষ্টি হয়েছে। তাদের মধ্যে বেদশ্রী বসুর নাম উল্লেখযোগ্য। সম্প্রতি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে গোপা ঘোষ পাল চৌধুরীর। এখানকার কিরাতভূমি পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদকের দ্বারা জলপাইগুড়ি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। আবার লোক-সাহিত্য, লোক সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রেও অনেকগুলি ভালো প্রবন্ধ লিখে চলেছেন উমেশচন্দ্র শর্মা। সম্প্রতি তাঁরও একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সব মিলিয়ে সাহিত্য সাধনার ক্ষেত্রে জলপাইগুড়ির স্থানটি খুবই গৌরবোজ্জ্বল। স্থানের অভাবে আরো শত শত বিকাশ উন্মুখ লেখক কবিদের নাম উল্লেখ করা গেল না। তাই তাঁদের কাছে আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

লেখক ❑ অধ্যাপক, কবি ও প্রাবন্ধিক



গৌতম গুহরায়

জলপাইগুড়ি : উত্তরবঙ্গের লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলন

ব্যক্তিসত্তার সময়-মন্থিত উপলব্ধি থেকে জন্ম নেয় শিল্প, এই উপলব্ধির অনুরণন থেকেই উঠে আসে সাহিত্যপত্র। সাময়িকী বা 'Periodical' যেখানে সময়কে বহন করে তথ্যগুচ্ছের মাধ্যমে, সাহিত্যপত্র সেখানে সময়ের চিহ্নবাহী অনুভূতিকেও ধারণ করে রাখে। এক্ষেত্রে তাই ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয় তার আয়ুষ্কাল, যতটা না তার স্বকীয়তা, তাতে ধরে রাখা অনুভূতি ও সময়ের চিহ্নাবলী। 'সাহিত্যপত্র' আজ সময়ের ধর্মেই হয়ে উঠেছে 'লিট্‌ল ম্যাগাজিন' বা ছোট ছোট বারুদ প্রকোষ্ঠ। সমকালীন জনজীবন, সমাজের নানা ঘটনা-দুর্ঘটনা, তার আলোড়ন, অনুরণন, চিন্তনের প্রতিফলন বা প্রকাশ বহন করে চলছে সে। 'ম্যাগাজিন' শুধু বারুদ প্রকোষ্ঠই নয় 'a portable receptacle for acticles of value'-ও বটে। শুধু সময়কে ধারণ করাই লিট্‌ল ম্যাগাজিনের ধর্ম নয়, সমাজের ঋণাত্মক প্রবণতাসমূহের চিহ্নিতকরণ, সমাজকে সচেতন রাখে যে তার নিজের ভঙ্গিমায়। শুধু গল্প, কবিতার প্রকাশ মাধ্যম নয়, গোটা সৃজন ভুবনকেই আলোড়িত করে সে দায়বোধ থেকে।

শিল্প হচ্ছে 'সৃষ্টি পরিবর্তন আর সীমাহীনতার' মুখপত্র। তাই একে স্থানিক সীমাবদ্ধতায় বেঁধে ফেলা যায় না। জলপাইগুড়ি, বাঁকুড়া বা কলকাতার থেকে প্রকাশিত লিট্‌ল ম্যাগাজিন প্রযুক্তিগত কারণে বা নাগরিক মনন বৈচিত্র্যের জন্য বহিরঙ্গে কিছু পার্থক্য থাকলেও ভাবনায়, লক্ষ্যে ও দ্বন্দ্বে একই দিশামুখী থাকে। তবে ঐতিহাসিক ও অনতিক্রম্য কারণেই উত্তরবাংলার মফস্বল শহর এবং কলকাতার থেকে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার মধ্যে বিভিন্নতা এসেছে, যদিও সময় ক্রমশ এই ভিন্নতাকে মুছে দিয়েছে। ভালো লেখার জন্য, ভালো কাগজের জন্য মফস্বল শহরগুলো দিকে তাকাতে বাধ্য হচ্ছেন বৃহত্তর বাংলা সাহিত্যের পাঠককুল। বিপণন-মুখ্য নাগরিক সাহিত্যে পাঠক আজ ক্লান্ত ও হতাশ। তবে হাল আমলের আলোক বর্ণচ্ছটায় নয়, উত্তরবাংলার সাংস্কৃতিক কেন্দ্রভূমি

> জলপাইগুড়ির প্রাচীনতম সাময়িক পত্রের উল্লেখ পাওয়া যায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাংলা সাময়িক পত্রের' ২য় খণ্ডে, ১৩০৩ সনের আশ্বিনে 'ভিক্ষুক' নামে একটি মাসিক পত্র জলপাইগুড়ি থেকে প্রকাশিত হয়। এই হিসাবে ১৮৯৬-কেই জেলার সাময়িক পত্রের সূচনা বর্ষ বলে ধরে নিতে হবে।

জলপাইগুড়ি বাংলা ভাষাভাষী পাঠকের কাছে বরাবর সম্ভ্রম আদায় করে নিয়েছে, ঐতিহ্যগর্ব বহন করছে সে। জলপাইগুড়ি থেকে সাময়িক পত্র প্রকাশ সূচনা শতবর্ষ অতিক্রান্ত, প্রসেনিয়াম থিয়েটার সঞ্চালনেও এজেলার ঐতিহ্যে রয়েছে শতবর্ষ অতিক্রান্ত গৌরব। জেলার কৃষ্টির ক্ষেত্রে আবহমানকাল ধরে লোকসংস্কৃতির যে বহমান ধারা তা এর প্রাণশক্তি, আধুনিক সংস্কৃতির ধারার প্রধান দুই ডানা সাহিত্য ও নাটকের গতিময় অগ্রগমন।

সমাজকে সাবালকত্ব দানে সাময়িকপত্রের বিশেষ ভূমিকা থাকে এবং সেই শ্রেণীর সাময়িক পত্র, যা মানুষের যুক্তিবাদী চিন্তাধারা, ইতিহাস ও ঐতিহ্য চেতনা, বিজ্ঞানমনস্কতা, সৃজনশীলতার মধ্য দিয়ে সাংস্কৃতিক বিকাশকে পুষ্টিদান করে। আজকের দিনে, বিশেষত চল্লিশ-পরবর্তী সময়কালে লিট্‌ল ম্যাগাজিন এই দায়িত্ব পালন করে আসছে এবং একে একে স্বতন্ত্র আন্দোলনের ধারায় পর্যবসিত করেছে। আন্দোলন মানে বদ্ধতা নয়, সৃষ্টিশীলতার উর্বর ভূমিতে সৃজন এবং তার যাবতীয় দ্বন্দ্বের বিকাশ যখন সমাজকাঠামোর জীর্ণতাকে আক্রমণ করে, বর্বর অশিল্পকে উৎখাত করে নির্দিষ্ট নৈতিক দর্শন ধারণ করে তখন আন্দোলন হয় সংহত বিকাশশীল লক্ষ্যাভিমুখী। আমাদের আলোচনার পরিমণ্ডল জেলার লিট্‌ল ম্যাগাজিন, তবে লিট্‌ল ম্যাগাজিন বলতে যেহেতু সাদা কাগজে কিছু কালো অক্ষরের মুদ্রণ নয় বা অবসর বিনোদন জাত সাহিত্য ও না-সাহিত্যের প্রকাশ নয় তাই স্বাভাবিকভাবেই এসে যায় আন্দোলন অনুসঙ্গ। এ কারণেই আমরা মূলত চল্লিশ-পরবর্তী ক্ষুদ্র পত্রিকাকে ধরব, তবে সন্ধ্যারতির আগে যেমন থাকে সলতে পাকানোর পর্ব, তেমনই চল্লিশের পরবর্তীতে যথার্থ আন্দোলন হয়ে ওঠার আগে সাময়িক পত্র-পত্রিকার পথ ধরেই এসেছে লিট্‌ল ম্যাগাজিনের আজকের এই উত্তরণ।

জলপাইগুড়ির প্রাচীনতম সাময়িক পত্রের উল্লেখ পাওয়া যায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাংলা সাময়িক পত্রের' ২য় খণ্ডে, ১৩০৩ সনের আশ্বিনে 'ভিক্ষুক' নামে একটি মাসিক পত্র জলপাইগুড়ি থেকে প্রকাশিত হয়। এই হিসাবে ১৮৯৬-কেই জেলার সাময়িক পত্রের সূচনা বর্ষ বলে ধরে নিতে হবে। এরপর ১৩০৭-এ শশীকুমার নিয়োগী ও ভূজঙ্গ ধর রায়চৌধুরী সম্পাদিত 'ত্রিস্রোতা'। যার উদ্দেশ্য পত্রিকা দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্যের উন্নতিকল্পে সবিশেষ চেষ্টিত থাকিবেন, কেবল রাজনীতি ও ধর্ম সম্বন্ধীয় বিষয়ে সকলের উপর বিশেষ সতর্কতা অবলম্বিত হইবে। যে সকল বিষয়ের ফল মন্দ হইতে পারে তাহা বিষবৎ পরিত্যক্ত হইবে।" প্রায় একশো বছর ধরে 'ত্রিস্রোতা' বহমান থেকে এক অনন্য নজীর তৈরি করলেও আজ স্রোতধারা স্তব্ধ।

১৯২৪-এর ১৪ জানুয়ারি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের প্রেরণায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের তেজস্বী পুরুষ জ্যোতিষচন্দ্র সান্যালের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'জনমত'। মূলত সংবাদ পত্রিকা 'জনমত' পরবর্তীতে ডাঃ চারুচন্দ্র সান্যাল এবং বর্তমানে মৃকুলেশ সান্যাল আজও প্রকাশ করে চলেছেন। এরপর ১৯২৮-এ খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের 'মুক্তিবাণী', ১৯২৯-এ রবীন্দ্রমোহন রায়ের 'ভারতবাণী' প্রভৃতি একের পর এক সাময়িক পত্র ও পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে। এর অধিকাংশই জাতীয়তাবাদী চেতনাকে বহন করেছে। জেলার সাময়িকী ও পত্রিকা নিয়ে অন্যত্র আলোচনার অবকাশ থাকায় আমরা মূলত 'লিট্‌ল ম্যাগাজিন' বা সাহিত্যপত্রকেই প্রধান আলোচ্য হিসাবে বেছে নিচ্ছি। 'লিট্‌ল ম্যাগাজিন' নির্দিষ্ট অভিধা পায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ উত্তর কালে তাই চল্লিশ-পরবর্তী সময়কেই আমরা আলোচনার সময় বৃত্ত হিসাবে ধরছি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে বিশ্বব্যাপী ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়, যা সমগ্র মানব সভ্যতাকে আলোড়িত করে যায়। এর পরপরই বিভিন্ন দেশের মুক্তি আন্দোলন, সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলন নয়া বাঁক নেয়, আমাদের জেলায় তেভাগা-সহ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সমান্তরাল নানা আলোড়ন ঘটে। এর পরবর্তীতে স্বাধীনতাপ্রাপ্তি, দেশবিভাগ, ব্যাপক আর্থিক মন্দা, পূর্ববঙ্গ থেকে আশ্রয় আবাসের খোঁজে আসা মানুষের ঢল, রাজনৈতিক টানাপোড়েন—এইসব যাবতীয় গরল ও সুধা নিয়ে সমাজ তখন টালমাটাল। দেশবিভাগে উত্তরবাংলার যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে যায়, অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে পড়ে। যাবতীয় ভাঙন ও নির্মাণের মধ্য দিয়ে জেলা এক নতুন চেহারা পায়, এর পাঁচটি বর্ধিষ্ণু থানা সীমান্তের পারে চলে যায়। প্রধানত চা-বাগান-কেন্দ্রিক বাঙালি মধ্যবিত্তের শহরে এসময় উচ্চশিক্ষার সুযোগ পৌঁছেছে। আনন্দচন্দ্র কলেজের প্রতিষ্ঠা প্রায় দশক পার হলেও একে ঘিরেই শহরে সমবেত হন বেশ কিছু মানুষ যাঁদের ভূমিকা জেলার সাহিত্য-ভূগোলে স্থায়ী হয়ে থাকবে। ১৯৪৪ সালে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এখানে বাংলার অধ্যাপক



জলপাইগুড়ি জেলার অণুপত্র পত্রিকার প্রদর্শনী। *ছবি : পবিত্রভূষণ সরকার*

হিসাবে আসেন। এই কলেজেই অধ্যাপক হিসাবে পরবর্তীতে আসেন ডাঃ দীনেশচন্দ্র বিশ্বাস, ডঃ জীবেন্দ্র সিংহরায়, ডঃ ভবানীগোপাল সান্যাল, ডাঃ রেবতীমোহন লাহিড়ী। এঁরা শুধু এখানে সাহিত্যের নব্যবীজ অঙ্কুরিতই করলেন না কলকাতা-সহ বৃহৎবঙ্গ সাহিত্য ভুবনের সঙ্গে সংযোগ সেতুও রচনা করলেন। বৃহৎ বঙ্গের প্রধান লিট্‌ল ম্যাগাজিন ও সাময়িক পত্রাদি তখন শহরের অনুসন্ধিৎসু পাঠকের হাতে পৌঁছে গিয়েছিল। অচলপত্র, কবিতা, পূর্বাশা, চতুরঙ্গ থেকে পরবর্তীতে কৃত্তিবাস পর্যন্ত জলপাইগুড়ির পাঠকের হাতে পৌঁছানোর ফলে সমকালের সচেতন পাঠককুলও তৈরি হয়ে যায় এখানে। উত্তরবাংলার লিট্‌ল ম্যাগাজিন আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু এ কারণেই জলপাইগুড়ি ; নেতৃত্বও বরাবর থেকে যায় এখানেই। লিট্‌ল ম্যাগাজিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য তার অবানিজ্যিক চরিত্র, ব্যবসায় সৎ সৃজনই তার অভিমুখ, এই লক্ষ্যেই তার উদ্দেশ্য— এর পাশাপাশি লিট্‌ল ম্যাগাজিন সাহিত্যের সূতিকাগার বলেও চিহ্নিত হয়, লিট্‌ল ম্যাগাজিন থেকে উত্থিত একজন সাহিত্যিক তাঁর সৃষ্টিগুণে যখন পাঠক মহলে পরিচিতি লাভ করেন, তখন বাণিজ্যমুখী কাগজ ওই লেখকের সুনামকে ব্যবহার করে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে লেখক ব্যবহৃত হলেও অনেকেই নিছক বাণিজ্য পণ্য হয়ে উঠতে চান না। পাঠক ও সাহিত্যিক উঠে আসার প্রক্রিয়ায় আজ বঙ্গসাহিত্যের আঙিনায় খ্যাতমান অনেক লেখক-সাহিত্যিকের সঙ্গেই জলপাইগুড়ির নাড়ির সংযোগ লিট্‌ল ম্যাগাজিন আন্দোলনে এই জেলার দৃপ্ত ভঙ্গিমাকে প্রমাণ করবে।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই, ১৯৪৮ সাল নাগাদ এই জেলা থেকে দুটো সাময়িক পত্রের প্রকাশ সূচিত হয়। জলপাইগুড়ি শহর থেকে 'আমাদের কথা' এবং মালবাজারের চালসা থেকে 'নবাগত'। সমাজসেবী ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব প্রফুল্ল ত্রিপাঠি বের করেন 'আমাদের কথা', যা ছিল মূলত সংবাদ পাক্ষিক। কিন্তু চালসা থেকে প্রকাশিত 'নবাগত' সম্পূর্ণ সাহিত্য পত্রিকা। প্রবোধবন্ধু অধিকারী ও শৈলবালা বিশ্বাস এর সম্পাদনা করেন। প্রবোধবাবুকে বাংলার মানুষ যাত্রাবন্ধু বলে জানে। 'নবাগত' দুবছর টিকেছিল। কলকাতায় মুদ্রিত হয়ে আসা এই কাগজটির দাম ছিল ছয় আনা। সমসময়েই (১৯৪৯) জলপাইগুড়ির জোতদার্স ব্যাঙ্ক বিল্ডিং থেকে 'হুঁসিয়ার' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এর দুবছর পরে উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা ভবরঞ্জন গাঙ্গুলীর সম্পাদিত 'আহ্বান'। চা-শিল্প ও চা-কর্মচারীদের বিভিন্ন সমস্যা ও বক্তব্য এর প্রধান বিষয় ছিল। এ সময়ের আর একটি উল্লেখযোগ্য কাগজ 'বার্ত্তা।'। স্বাধীনতা সংগ্রামী রবীন্দ্রনাথ শিকদার সম্পাদিত 'বার্ত্তা' এখনও প্রকাশিত হয়ে আসছে প্রায় নিরবচ্ছিন্ন ভাবে। বর্তমান সম্পাদক বীরেন্দ্রপ্রসাদ বসু। ১৯৫১-র আর একটি কাগজ সুধীরকুমার বিশ্বাস সম্পাদিত 'উত্তরবাংলা'। এটি মননশীল পাঠকের কাছে সমাদৃত ছিল।

উত্তরবাংলার লিট্‌ল ম্যাগাজিন আন্দোলনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনাটি ঘটে ১৯৫২-তে। সুরজিৎ দাশগুপ্ত ও বনবিহারী দত্ত প্রকাশ করেন 'জলার্ক'। জলার্কই সঠিক অর্থে উত্তরবাংলার প্রথম লিট্‌ল ম্যাগাজিন চরিত্রকে চিনিয়ে দেয় এই অঞ্চলের পাঠককুলকে। সুরজিৎবাবু সে-সময়ের বাংলা সাহিত্য জগতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ

উত্তরবাংলার লিট্‌ল ম্যাগাজিন আন্দোলনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনাটি ঘটে ১৯৫২-তে। সুরজিৎ দাশগুপ্ত ও বনবিহারী দত্ত প্রকাশ করেন 'জলার্ক'। জলার্কই সঠিক অর্থে উত্তরবাংলার প্রথম লিট্‌ল ম্যাগাজিন চরিত্রকে চিনিয়ে দেয় এই অঞ্চলের পাঠককুলকে। সুরজিৎবাবু সে-সময়ের বাংলা সাহিত্য জগতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ রেখেছিলেন। এর ফলে টাটকা স্বাদ ছিল কাগজে।

রেখেছিলেন। এর ফলে টাটকা স্বাদ ছিল কাগজে। চিন্তা চেতনার যে বিশ্বজনীন আবেদন রাজধানী শহরে ধাক্কা দেয় তার আলোড়ন এখানেও ছোঁয়া দিত জলার্কের মাধ্যমে। জীবনানন্দের সঙ্গে এই লিট্‌ল ম্যাগাজিন জলপাইগুড়ির সঙ্গে এক মনস্তাত্ত্বিক সেতু রচনা করেছিল। জীবনানন্দ, বিষ্ণু দের মতো উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বরা যেমন জলার্কের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেন, তেমনই এখানেও একে ঘিরে তৈরি হয় নিজস্ব সাহিত্য পরিমণ্ডল। সুরজিৎ দাশগুপ্ত, কার্তিক লাহিড়ী দীনেশ রায়, দেবেশ রায়, সুরজিৎ বসু প্রমুখ এই মফস্বল শহরে নিয়ে আসেন আধুনিকতার ছোঁয়া। পরবর্তীতে প্রত্যেকেই বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব।

'জলার্কের' পাশাপাশি ভালো কিছু সাময়িকীও প্রকাশিত হতে থাকে এখান থেকে। ১৯৫৬-তে ডঃ রেবতী লাহিড়ীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'উত্তরপথ' মাসিক পত্রিকা, প্রকাশক ছিলেন পরেশচন্দ্র গুহরায়। এই মাসিক পত্রিকাটিতে তফসিলি সম্প্রদায়ের আশা আকাঙ্ক্ষা গুরুত্ব পেত বিশেষ করে। কয়েক বছর চলার পরে বন্ধ হয়ে গেলেও ১৯৭৭ থেকে আবার দু বছর প্রকাশিত হয়ে বন্ধ হয়ে যায় এই কাগজটি। এর পরের বছর দুটি উল্লেখযোগ্য পত্রিকা বের হয় জলপাইগুড়ি থেকে। দেবেশ রায় প্রকাশ করেন 'নান্দীমুখ'। যামিনী রায় অঙ্কিত প্রচ্ছদ এক বিশেষ উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলো কাগজটিকে। এসময় তারুণ্যের তেজ নিয়ে বেশ কিছু কাগজ বের হয় এখান থেকে। সুকুমার চক্রবর্তী ও প্রতুল দাস সম্পাদিত 'সারথি', নন্দদুলাল সরকার সম্পাদিত 'কবি ও কবিতা', সুধাংশু বক্সী সম্পাদিত 'চিত্রা'। ১৯৫২-তেই 'অশোক' নামে একটি হিন্দি সাময়িকী পত্র প্রকাশিত হয়। রাজমঙ্গল পাণ্ডে ও গোপাল মাহেশ্বরী সম্পাদিত এই কাগজটি হিন্দি প্রকাশনার প্রথম প্রয়াস ছিল।

ষাটের দশকের বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে সৃজন সমৃদ্ধ দশক বলে অনেকে চিহ্নিত করেন। জলপাইগুড়িতেও যেন তার বাতাস লেগেছিল। পঞ্চাশের দশকের শেষ অঙ্ক থেকেই এখানে অনেক কাগজ প্রকাশিত হতে থাকে। দেবেশ রায় সম্পাদিত 'উত্তরবাংলা', পরে 'উত্তর দেশ', দেবব্রত মজুমদারের 'স্পষ্ট কথা' ও 'নিরপেক্ষ', দেবেশ রায় ও সুরজিৎ দাশগুপ্তর 'উত্তরাশা', কল্যাণ শিকদারের ও অমিয় মজুমদারের 'আবর্তন', মলয় বসুর 'পঞ্চধারা', অর্পণা গুহর 'দিশারী', তুষার বন্দ্যোপাধ্যায় ও কল্যাণ শিকদারের 'উত্তরের হাওয়া', ভবেন দত্তের 'পদ্মবাগ', অজিত বক্সী ও বরেন রায়ের 'উত্তরমেঘ', নির্মলেন্দু গৌতমের 'সমাবেশ', হরিমোহন বর্মণের 'উত্তরবঙ্গ'। ষাটের দশকেই জেলার অপর মহকুমা শহর আলিপুরদুয়ার থেকে দুটো ভালো কাগজ প্রকাশিত হয়। 'নোনাই' ও 'বনমহল'। 'নোনাই' তার অফুরন্ত প্রাণশক্তি নিয়ে মাঝে মাঝে এখনও প্রকাশিত হয়। ১৯৫৪ সালে জলপাইগুড়ির শিশু-কিশোরদের প্রতিষ্ঠান 'ডানপিটেদের আসর' থেকে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হতে থাকে 'ডানপিটেদের আসর'। ১৯৫৮ থেকে এটি নাম পাল্টে হয় 'ডানপিটেদের সমাচার'। এই পত্রিকাটিও শিশু সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক



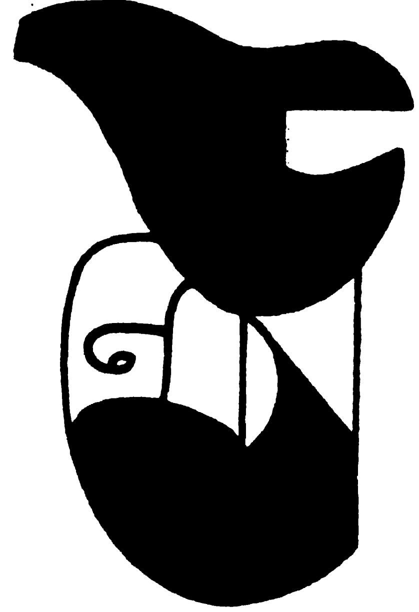
নোনাই : নেতাজী শতবর্ষ সংখ্যা

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। স্মরজিৎবাবু 'রত্নাকর' ছদ্মনামে এটির সম্পাদনা করতেন। জেলায় শিশু সাহিত্যের যে অনন্ত ও সমৃদ্ধ ইতিহাস অদ্যাবধি বহন করছে তার বীজ বুনেছিলেন 'রত্নাকর'। অধুনা এই কাগজ না থাকলেও জেলায় অসংখ্য ছোটদের কাগজ রয়েছে, বৃহৎ বঙ্গসাহিত্যে সম্মান আদায় করে নেওয়া শিশু সাহিত্যিককে দিয়েছে এই শহর। আশির দশকে 'হিংটিং' একটি উল্লেখযোগ্য শিশু কিশোর পত্রিকা।

সীমান্তের যন্ত্রণা নিয়েই বোধহয় জন্ম নিয়েছিল 'সীমান্তিক'। দেবাশিস ঘোষ সম্পাদিত এই পত্রিকাটি নতুনদের অনায়াস বিচরণ ক্ষেত্র ছিলো। বেশ কয়েক বছর চলে কাগজটি। এসময়ের উল্লেখযোগ্য আরও একটি কাগজ অর্ণব সেন ও রমেন বসুর 'নতুন সীমান্ত'। সতী সেনগুপ্ত ময়নাগুড়ি থেকে প্রকাশ করেন 'পাবক' (১৩৬৮), যা এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়।

আমরা জানি, প্রায় আধা সামন্ত, আধা বন্য, আধা পুঁজিবাদী এই সমাজ কোনও বিকশিত মূর্ত সমাজ নয়। আর এই অগোছালো সমাজে ছোট কাগজের ক্ষেত্র থাকে আরও দুর্বল। বিদ্যমান পুঁজিতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোতে শোষকের অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকট হলেও এ দ্বন্দ্ব মৌলিক দ্বন্দ্ব নয়। শোষিত ভুক্তভোগীর অসচেতনতাকে ব্যবহার করে স্বার্থান্বেষীরা প্রচলিত কাঠামোতে নিজেদের অবস্থান সংহত করে। যদিও ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় এটি একটি ব্যর্থ অপপ্রয়াস মাত্র। যখন আসে কাঠামো ভাঙার কথা, প্রতিষ্ঠিত জীর্ণ মূল্যবোধ উৎখাত করার কথা, যখন আসে সচেতন দৃষ্টিভঙ্গির কথা, সৃজনশীল পরিবর্তন, উন্নত জমিকর্ষণের প্রসঙ্গ, যখন নৈতিক অনুসন্ধিৎসু দায়বদ্ধতার কথা, তখন এসব বোধ, মনন, জিজ্ঞাসা, চিৎকার রাজনীতির বাইরে থাকে না। এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতেই জলপাইগুড়িতেও সত্তরের রাজনৈতিক ঝঞ্ঝার আশপাশের সময়ে বেশ কিছু সাহিত্যপত্র প্রকাশিত হয় যার ভূমিকা রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও ব্যাপ্ত ছিল। ১৯৬৯-এ কল্যাণ সিকদার সম্পাদিত 'জলপাইগুড়ি', যা সে সময়ের বামপন্থী ও প্রগতিশীল মহলে সমাদৃত ছিল। দীর্ঘদিন প্রকাশিত হয়ে কিছুকাল বন্ধ থেকে তা আবার আশির দশকে প্রকাশিত হতে থাকে গোবিন্দ কুণ্ডু, কল্যাণ দে প্রমুখের সম্পাদনায়। সাময়িক পত্রিকার ইতিহাসে এটি সম্ভবত এক ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত রাখে। সূচনার চতুর্থ বিপরিত সংখ্যাটি বামপন্থী যুবকর্মী বাদল দত্তের স্মরণ সংখ্যা, যার অত্যধিক চাহিদার জন্য দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশ করতে হয়।

১৯৭৪-এর (১ বৈশাখ) সৌরাংশুশেখর প্রামাণিকের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'সম্ভব'। পরের বছর এটি 'সম্ভবকাল' নাম নিয়ে রেজিস্ট্রিকৃত হয়। এটিও বামচেতনাকে ধারণ করে তার প্রতিষ্ঠান বিরোধী অবদানে অটুট থেকে। সৌরাংশুবাবুর অকাল প্রয়াণে এটি বন্ধ হয়ে গেলেও অনুজপ্রতিমরা পরবর্তীতে কয়েকটি সংখ্যা পুনরায় প্রকাশ করেন। ১৯৭৫—এই দুটো পত্রিকা বের হয়, যার সম্ভাবনা ছিল ব্যাপক এবং পাঠক সমাজে স্থায়ী প্রভাবও ফেলে গিয়েছে। একটি বীরপাড়ার থেকে কবি তুষার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বনভূমি', অন্যটি শহর জলপাইগুড়ির 'মন্দাক্রান্তা', যার সম্পাদনায় ছিলেন



উন্মেষ : শারদ সংখ্যা

অনুপ ঘোষ, পরিমল ঘটক, অচিন্ত্য সেন। মন্দাক্রান্তার প্রথমটিই অন্তিম সংখ্যা হলেও 'বনভূমি' গোটা উত্তরবাংলার প্রধানতম 'কবিতা পত্র' হিসাবে প্রকাশিত হয়ে চলেছে। বর্তমানে যদিও তুষারবাবু আর 'বনভূমি' প্রকাশ করেন না। দৈলা রায়, সুরজিৎ বসু প্রমুখের বিশেষ সংখ্যা একে আলাদা গুরুত্ব দিয়েছিল।

মননশীল পত্রিকা হিসাবে 'উত্তর দেশ' গোটা বাংলার লিট্‌ল ম্যাগাজিন পাঠককুলের কাছে একটি সমাদৃত নাম। সুবীর রায়, নারায়ণ দাস, অশোক দাশগুপ্ত এর সম্পাদনায় যুক্ত ছিলেন। একে ঘিরে গত দশকেও এক সাহিত্য আড্ডা জমে উঠেছিল। মলয় বসু, মালা ভট্টাচার্য, অনুপ ঘোষ, ভাস্বতী রায়চৌধুরী, অশোক বসু প্রমুখ এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এখন কাগজ ও আড্ডা দুটোই বন্ধ হয়ে গেছে। এর পরপর 'অজানা সাহিত্য আসর' নামে নবীন লেখক পাঠকের এক আড্ডাকেন্দ্রিক সাহিত্য পত্রিকা পাণ্ডাপাড়া থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। জীবনকৃষ্ণ রায় সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্য থেকেও এই কাগজটি আজও প্রকাশ করে চলেছেন। মূলত মলয় বসুর উদ্যোগে এসময়ই প্রকাশিত হয় মুক্ত গদ্যের কাগজ 'সমান্তর'।

শহর জলপাইগুড়ির বাইরেও জেলার বাঙালি বাজনা থেকে ভালো কাগজ প্রকাশিত হয়েছে এসময়। বাঙ্গালি বাজনা থেকে

জেলার অপর মহকুমা শহর আলিপুরদুয়ারেও লিট্‌ল ম্যাগাজিনের এই সৃজন প্রবাহ বহমান থেকেছে। পঁচাত্তর বছর আগে ১৯২৬-এ এখান থেকে প্রকাশিত হয় 'হিমালয়', বিজয়গোপাল ঘোষ ছিলেন এর সম্পাদক, এছাড়াও 'দি বেঙ্গল টাইম্‌স বলে দুটি কাগজও তিনি প্রকাশ করেন। অনিল গাঙ্গুলী 'দুয়ার লাঠি' বলে একটি কাগজ করেন। পঞ্চাশের পর থেকে বেশকিছু উল্লেখযোগ্য কাগজ বের হয় এখান থেকে— যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নীলকান্ত মুখোপাধ্যায়ের 'চাবুক', নির্মলেন্দু বিষ্ণু ও সন্তোষ ভদ্রের 'ঐকতান', পীযূষকান্তি মুখোপাধ্যায়ের 'চলাচল'।

বীরেন্দ্রনাথ রায়ের সম্পাদনায় 'করতোয়া' পত্রিকা উল্লেখযোগ্য। ময়নাগুড়ি থেকে দিলীপ ফণী বের করেন 'হাতুড়ী' (১৯৭৩), প্রিয় কুসুম চক্রবর্তীর সম্পাদিত 'উত্তর সৈকত'-ও মনোযোগ কেড়ে নিয়েছিল। সত্তরের শুরুতে কবিরা মিছিল করেছিলেন লিট্‌ল ম্যাগাজিনের ছত্রছায়ায়। ময়নাগুড়ি থেকে রাজবংশী বিভাষা বা Local Dilect-এ প্রকাশিত হয় 'পোহাতি'। ভূপেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদনা করেছিলেন। জলপাইগুড়ি শহর থেকে প্রকাশিত আরও কয়েকটি কাগজ মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল এসময় কিন্তু এদের অধিকাংশ স্বল্পায়ু ছিল। অলিভপ্রেস থেকে রবিশঙ্কর ঘোষ বের করতেন 'উত্তর দর্পণ'। মনোজিৎ নাগের 'সামুদ্রিক', তারাপদ গুহর 'বুদবুদ' এবং সাধন দেবের 'অর্ঘ'-র উল্লেখ পাওয়া যায়।

ময়নাগুড়ির এই সৃজন উল্লাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ধূপগুড়ি থেকেও বেশ ভালো কিছু কাগজ প্রকাশিত হয়। কবি পুণ্যশ্লোক দাশগুপ্ত এক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকায় থাকেন। ধূপগুড়ি ক্রমশ উত্তরবাংলার এক বড়সড় নাম হয়ে ওঠে। এখান থেকে বের হয় 'শালবনী', 'শব্দ'-র মতো কাগজ। কবি অন্যমন দাশগুপ্তর 'বুদ্ধদেব' এবং তপন চট্টোপাধ্যায়ের 'লাল নক্ষত্র' ছাড়াও চিত্রভানু সরকারের 'সৌধ' ভালো কাগজ হিসাবে নজর কেড়েছিল। স্থানীয় বিভাষায় ধূপগুড়ি থেকেও একটি কাগজ প্রকাশিত হয়েছিলে। 'কালসানঝি' নামে। ধূপগুড়ির পরেই চা-বাগান ও কাঠের ব্যবসার কেন্দ্র গয়ের কাটার উল্লেখ করতে হয়। এখান থেকে অশোক কুণ্ডুর সম্পাদনায় 'পঞ্জীর' বলে একটি কাগজ প্রকাশিত হয়েছিল। কবি বিকাশ সরকারের হাতেখড়ি তার 'যখন তখন' কবিতাপত্রের মধ্য দিয়ে। প্রতিবাদের শাণিত উচ্চারণে বিকাশ পরবর্তীতে প্রকাশ করেন থাবা। ধূপগুড়ির সংবাদপাক্ষিক 'লাল নক্ষত্র' এবং পরবর্তীতে ডঃ কৃষ্ণ দেবের 'তিস্তাতোর্ষা'-র শারদসংখ্যা উঁচুমানের সাহিত্য পত্রিকা হয়ে উঠে।

সত্তরের শেষদিকে আবার পত্র-পত্রিকার প্রকাশের জোয়ার আসে জলপাইগুড়ি শহরে, আশির দশকে আবার জলপাইগুড়ির উজ্জ্বল উপস্থিতি জানান দেয় সমগ্র বাংলার পাঠক সমাজকে। শামশের আনোয়ার, সমর রায়চৌধুরি, বিজয় দে, শ্যামল সিংহের সঙ্গে আলিপুরদুয়ারে দিবাকর ভট্টাচার্য, বয়সে তরুণ সুশান্ত নিয়োগী, বিকাশ সরকার, গৌতম গুহরায়, প্রমুখ এক ভিন্ন স্বাদের সতেজ বাতাস নিয়ে আসেন লিট্‌ল ম্যাগাজিন আন্দোলনে। লিট্‌ল ম্যাগাজিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য তার প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা, পুরোনোকে ডিঙিয়ে যায় অবজ্ঞা করে বলেই আত্মসম্মানকে আয়ুধ করে ও গতানুগতিকতাকে আক্রমণ করে সে। এ সময়কালে সমর রায়চৌধুরির 'ক্রুশেড', বিজয় দের 'পাগলা ঘোড়া', সুশান্ত নিয়োগীর 'যুদ্ধযাত্রা', গৌতম গুহরায়ের 'দ্যোতনা', দিবাকর ভট্টাচার্যের 'দ্রোহ' এক ভিন্ন ভাষা ও আঙ্গিকের সঙ্গে পরিচিত করান। 'ক্রুশেড' বরাবরই নির্বাচিত কবিতা প্রকাশ করে আসছে। 'পাগলা ঘোড়া' বিষয় বৈচিত্র্যে পাঠককে 'ঝট্‌কা' দিয়েছে বারবার। সুশান্তের 'যুদ্ধযাত্রা' আপাতত স্থগিত থাকলেও একটি উঁচুমানের কাগজ পেয়েছিল সে সময়ের পাঠকেরা। 'দ্যোতনা'-র সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন গৌতম গুহরায় ছাড়াও অপূর্ব মুখোটি, অনুপ কুণ্ডু, শক্তিব্রত মজুমদার, প্রসাদ রায়, শৌভিক কুণ্ডু প্রমুখ। এদের 'আরোয়াল গণহত্যা সংখ্যা' বা 'র‍্যাবো মৃত্যুশতবর্ষ সংখ্যা' বাংলার বৃহত্তর পাঠকের কাছে সমাদৃত হয়েছিল। দুই দশক অতিক্রম করেও 'দ্যোতনা' প্রকাশিত হয়ে চলেছে। এই কাগজগুলোর থেকে বেশ কিছু বইও প্রকাশিত হয়েছে। যার অন্যতম বিকাশ সরকারের 'কনিষ্কের মাথা', সমর রায়চৌধুরির 'পাখিবাজার', 'নিশিডাক', বিজয় দের 'কাঠুরিয়া আন্তর্জাতিক', 'স্বপ্নে টকি', গৌতম গুহরায়ের 'সাপ-স্বপ্ন-সহবাস', গৌতম গুহ রায়, সুশান্ত নিয়োগী সম্পাদিত কবিতা সংকলন 'ব্যক্তিগত ক্রুশকাঠ', 'জলপাই স্যাংচ্যুয়ারীর কবিতা' প্রভৃতি।

এসময় আরও কিছু ভালো কাগজ প্রকাশ হয়। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভাস্কর উদয় ঘোষের ও শশাঙ্কশেখর পালের 'শব্দমন্ড', দিলীপ সাহার 'বৃষ্টি', সলিল আচার্য, তমাল দে-র 'অতন্দ্রিলা', রমেন রায়ের 'অঙ্কুর', দেবাশিস বিশ্বাসের 'হ্রেষা', চম্পাবলী হোড়ের ও আত্রেয়ী মৈত্রর 'বার্ণিক', তপন বোসের 'বিকাওসা'। গভঃ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রদের উদ্যোগে এ সময় 'আলিম্পন' বলে একটি ভিন্ন স্বাদের কাগজ বের হয়েছিল, যুক্ত ছিলেন প্রবালকুমার বসু ও বিশ্বজিৎ তপাদার। মিলিন্দ চক্রবর্তী বের করেন 'ভিলানেল'।

জলপাইগুড়িতে উত্তরসরণি সাহিত্যচক্র থেকে অরবিন্দ করের সম্পাদনায় প্রকাশিত হচ্ছে 'কিরাতভূমি'। জলপাইগুড়ির ১২৫ বছর পূর্তিতে 'কিরাতভূমি' একটি মূল্যবান সংকলন প্রকাশ

করে। এই সাহিত্যচক্রকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু পত্রিকা প্রকাশ হচ্ছে। এ ছাড়াও সন্ধ্যাশ্রী চক্রবর্তীর 'মেধা' একটি উল্লেখযোগ্য পত্রিকা।

একদা ব্যস্ততম রেলবন্দর দোমহনী আজ অতীতের কঙ্কাল। এখানকার সাহিত্যক্ষেত্রও আজ শুকনো। 'আলতারাফ', 'অনামী সম্ভব' ও 'পতিত্তা সূর্য'-র মতো বেশ কয়েকটি কাগজে এখান থেকে বের হত একসময়। এরপর মলয় ঘোষ ও শোভন চক্রবর্তী বের করে 'সময় সূত্র' বলে এক রাগী কাগজ।

আশির শেষদিকে বেশ কিছু তরুণ কবি জলপাইগুড়িতে কাগজ করার নেশায় মেতে উঠে। শুভ্র চট্টোপাধ্যায়, দেবাশিস কুণ্ডু, অতনু ব্যানার্জি, নীলাদ্রি ভৌমিক, এঁরা বের করেন 'এরকা'। সংহত কবিতার ধারণা নিয়ে এঁরা কাব্য ভাবনায় এক ভিন্ন স্বাদ আনার চেষ্টা করেছিলেন। এ সময়ের উল্লেখযোগ্য আর একটি কাগজ দিলীপ সিং-এর 'কলম', মাষকলাইবাড়ি থেকে প্রকাশিত 'উয়', সন্তোষ চক্রবর্তীর 'মানসী', ডঃ বিজয়ভূষণ রায়ের 'রম্যকথা', এবং আরও অনেক পত্রিকা নিজস্ব মেজাজে বের করেছেন সাহিত্য উৎসুকেরা।

জেলার অপর মহকুমা শহর আলিপুরদুয়ারেও লিট্‌ল ম্যাগাজিনের এই সৃজন প্রবাহ বহমান থেকেছে। পঁচাত্তর বছর আগে ১৯২৬-এ এখান থেকে প্রকাশিত হয় 'হিমালয়', বিজয়গোপাল ঘোষ ছিলেন এর সম্পাদক, এছাড়াও 'দি বেঙ্গল টাইম্‌স বলে দুটি কাগজও তিনি প্রকাশ করেন। অনিল গাঙ্গুলী 'দুয়ার লাঠি' বলে একটি কাগজ করেন। পঞ্চাশের পর থেকে বেশকিছু উল্লেখযোগ্য কাগজ বের হয় এখান থেকে—যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নীলকান্ত মুখোপাধ্যায়ের 'চাবুক', নির্মলেন্দু বিযুঃ ও সন্তোষ ভদ্রের 'ঐকতান', পীযূষকান্তি মুখোপাধ্যায়ের 'চলাচল'। এসময় নির্দিষ্ট বাম রাজনৈতিক চেতনাকে উপজীব্য করে প্রকাশিত হয় 'দাবি', সম্পাদনা করেন দিব্যেন্দু সেন। ষাট দশকে আলিপুর থেকে ভালো সাহিত্যপত্র প্রকাশিত হয়ে দৃষ্টি টেনে নেয় উত্তরবাংলার সংস্কৃতি জগতের। তুষার চট্টোপাধ্যায়ের 'রোড সাইড', অর্ণব সেন ও রমেন বসুর 'নতুন সীমান্তে'র সঙ্গে বিমলেন্দু দাসের 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'। সত্তরের আলিপুরদুয়ার, লিট্‌ল ম্যাগাজিনের শহর হয়ে দাঁড়ায়—'বিনিদ্র', 'নোনাই', 'উৎস', 'মাটির ছোঁয়া', 'সমুদ্র' একের পর এক প্রকাশ হয়ে চলছে। এরমধ্যে বেণু সরকার ও তপন ঘোষের 'বিনিদ্র' বা পবিত্রভূষণ সরকারের 'উৎস', 'মাটির ছোঁয়া' দীর্ঘদিন বেঁচে থাকে মাথা উঁচু করে। মলয় মুখোপাধ্যায় প্রকাশ করেন 'সমুদ্র', শক্তি ঘোষের 'পরমাণু', বঙ্কিম মাহাতোর 'এই শর্তক', সুধীর ঘোষের 'যাত্রিক' এবং সমীর চক্রবর্তীর 'স্থানীয় সংবাদ' উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা ছিল। গল্প, কবিতা নিয়ে ভিন্ন ভাবনার ছায়া রেখে প্রকাশিত হয় দিবাকর ভট্টাচার্যের 'দ্রোহ', 'সময়'। এসময় ছোটদের মনের মতো বেশকিছু কাগজও প্রকাশিত হয়েছিল এই মহকুমা শহর থেকে—'খোলামেলা', 'দোলনা' 'উভয়ের বলাকা' প্রভৃতি তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। আলিপুর জংশন থেকে মণিভূষণ রায় ও সুধাংশু কর্মকার প্রকাশ করছেন 'নোনাই', ২০ বছর অতিক্রম করেও কাগজটি আজও প্রকাশিত হচ্ছে নিজস্ব মেজাজে। ফালাকাটা থেকে মিহির কুমার দত্ত প্রকাশ করেন 'অন্যবার', যা এখনও প্রকাশিত হচ্ছে।



মাটির ছোঁয়া : শারদ সংখ্যা

আশির দশকে কামাখ্যাগুড়ির কৃষ্ণপ্রিয় ভট্টাচার্যর 'বক্সাবাজার' এক চমক-লাগানো কাগজ ছিল, পরবর্তীতে এটি 'তিস্তা পথ' নামে প্রকাশিত হতে থাকে। এসময় অজস্র কাগজ বের হয়ে এখান থেকে যার সমস্ত নাম উল্লেখও যথেষ্ট কঠিন কাজ। রানার, ব্রততী, উৎস ভূমি, মুক্তি, জলপ্রপাত, সাগ্নিক, ময়ূখ বেশ ভালো কাগজ হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু বেশির ভাগই বন্ধ হয়ে যায় অকালেই। এর মধ্যে সুনির্মল বিশ্বাসের 'মুক্তি', অভয় দে-র 'ব্রততী', শিবনাথ চক্রবর্তীর 'নতুনের সন্ধানে' বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে।

'গল্প ইদানিং'-নামে একটি মননশীল গল্পের কাগজ বের করেছিলেন অর্ণব সেন। এসময়ের উল্লেখযোগ্য আরও কয়েকটি কাগজ রয়েছে—'তল্লাসী', 'প্লাবন' প্রভৃতি তার মধ্যে। এছাড়াও কমলেশ রাহারায়ের 'শিলালিপি', সোমনাথ চাকীর 'দুন্দুভি' প্রভৃতি।

আলিপুরদুয়ার শহরের বাইরেও এই মহকুমায় প্রত্যন্ত এলাকা থেকে ভালো ভালো কিছু কাগজের খবর উল্লেখ না করলে সত্যের অপলাপ হবে। গাঙ্গুটিয়া চা-বাগান থেকে কবি সনৎ চট্টোপাধ্যায়

কালশুদ্ধি

কালশুদ্ধি

সম্পাদক
শ্যামশ্রী চাকী (দাস)

কালশুদ্ধি : শারদ সংখ্যা

নিয়মিত প্রকাশ করে চলছেন 'উন্মেষ'। মূলত কবিতার কাগজ 'উন্মেষ' গোটা উত্তরবাংলায় আজ পরিচিত নাম। এছাড়াও জেলার সীমান্ত এলাকা ভলকা থেকে শান্তনু লাহিড়ী প্রকাশ করছেন 'ভলকা সমাচার', সুজিতকুমার পাল, দীপক বিশ্বাস 'কুমারগ্রাম সমাচার' যা মূলত সংবাদ সাময়িকী হলেও সাহিত্যকেও গুরুত্ব দিয়ে থাকে। রামেশ্বর রায় 'জনজীবন' নামে একটি ভালো কাগজ প্রকাশ করেছেন।

আশির শেষদিকে তন্ময় সরকার বের করেন 'আজকের কবিতা'। লিট্‌ল ম্যাগাজিন আন্দোলনের যাবতীয় সম্ভাবনা নিয়ে সক্রিয় তন্ময়। কল্যাণ হোড় ও প্রমোদ নাথের 'তৃণভূমি' এবং অরূপ দে-র 'উৎসভূমিও' ছাড়াও মনোযোগ কেড়েছে, শ্যামশ্রী চাকীর 'কালশুদ্ধি'।

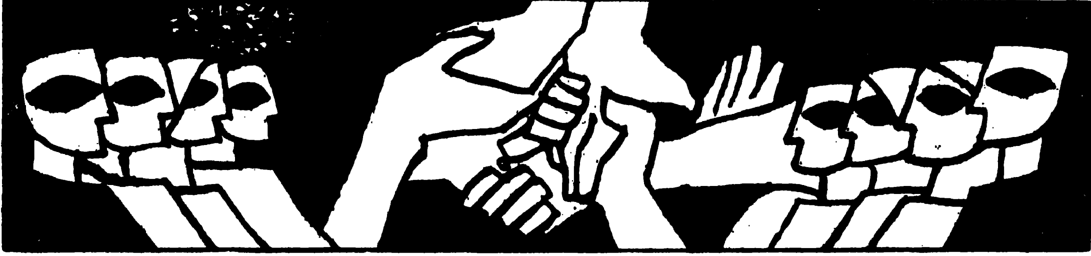
প্রথাগত সাহিত্য আন্দোলনের থেকে সার্বিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে মানুষের উপযোগী ও সমাজ বিকাশের স্বার্থে সংগঠিত করার লক্ষ্যে সক্রিয় থেকেছে পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের জেলা সংগঠন। এদের সদর, আলিপুরদুয়ার, ফালাকাটা, কালচিনি, ধূপগুড়ি আঞ্চলিক শাখা থেকে যথেষ্ট উন্নতমানের সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক মুখপত্র প্রকাশিত হয়েছে। আলিপুরদুয়ারের 'আবহমান কাল' বা জলপাইগুড়ি সদরের 'তিস্তাপত্র' উঁচুমানের সাহিত্য পত্রিকা হিসাবে মনোযোগ কেড়েছে। রাজগঞ্জ শাখা বের করেছে পত্রালী, কামাখ্যাগুড়ি শাখার 'সুচেতনা' ও সমৃদ্ধ সাময়িকীর চেহারা নিয়েছে। লিট্‌ল ম্যাগাজিন ও সাহিত্য পত্রের, সংবাদ-সাহিত্য সাময়িকীর মধ্যেকার বিভেদ রেখা বিষয়ে সচেতন থাকলেও এই গণ্ডিকে অনতিক্রম্য মেনে মফস্বলের সাহিত্য পত্রিকার আলোচনা অসম্ভব। এক্ষেত্রেও মূলতঃ চেষ্টা হয়েছে সমসাময়িক সাহিত্য পরিমণ্ডল ও পরিবেশের সঠিক চিত্রণের। অনেক পত্র-পত্রিকা আমার জানার বাইরে থেকে গেছে যাদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এই ত্রুটি আমার ব্যক্তিগত অনবধানবশত। বাংলার লিট্‌ল ম্যাগাজিন আন্দোলনের অন্যতম পৃষ্ঠভূমি এই জেলার ভূমিকাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। সমাজ বিকাশে সাহিত্য সংস্কৃতি যে সদর্থক ভূমিকা নেয় এই জেলার সার্বিক সামাজিক বিকাশেও সে-ভূমিকাই সে পালন করেছে। সমৃদ্ধ গণআন্দোলনের ইতিহাসে এর ভূমিকাও উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। বৈদ্যুতিন গণমাধ্যম ও বিপণন সংস্কৃতির দাপটে গণসংস্কৃতির মতো সৎ সাহিত্য সৃজনও আজ বিপন্ন। এই বিপন্নতার থেকে বাইরে নেই এই জেলার সাহিত্য পরিমণ্ডলও। ক্রমশ তাই কমে আসছে কাগজের সংখ্যা, তবুও যে প্রাণশক্তি লিট্‌ল ম্যাগাজিনের জন্ম দেয় তাকে অবলম্বন করেই স্বপ্ন দেখতে হয় জলপাইগুড়ি এক সম্পাদককেও—

"যে চাবুকের সপাংশিসে অপমান বিষ জমে ওঠে
যে পিস্তলের গুম গর্জনে নিয়ত কোতল হয়ে যায়
চিত্রল হরিণের ক্রমবিকাশ
যে ঈশ্বরের অট্টহাস্যে ভাষা হারিয়ে ফেলে কিশোর-কিশোরীর
যৌথ নিদ্রা ও জাগরণ
আমরা তাদের চিনি, যে মারে এবং যে মরে,
আমাদের রাত্রি ও মৃত্যুর কবিতাগুলি বেঁচে থাকার আর
বাঁচানোর দিন পঞ্জিকা
আমাদের জীবন ঘটিত ইচ্ছার কাগজ, আমাদের একটু করো
ভবিষ্যৎ।"

এই জেলার প্রধান ভাষিক গোষ্ঠি বাংলা ভাষায় কথা বলেন। কিন্তু এর বাইরেও রয়েছেন বিভিন্ন ভাষাভাষী, যাঁদের ভাষায়ও সমৃদ্ধ পত্র-পত্রিকা জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রকাশিত হয়ে চলেছে। বিশেষ করে রাভা, নেপালি, সাদরি (সংযোগ ভাষা), হিন্দি প্রভৃতি ভাষায় বেশকিছু কাগজ রয়েছে। তবে এই প্রবন্ধ মূলত বাংলা ভাষার সাহিত্য পত্র নিয়েই তাই ওই ক্ষেত্র অনুচ্চারিত থাকল।

আলোচ্য আলোচনায় তথ্য সংগ্রহে সহায়তা করেছেন অনেকে, তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় ডঃ আনন্দ গোপাল ঘোষ; ডঃ রণজিৎ মিত্র; সুশান্ত নিয়োগী; পবিত্রভূষণ সরকার প্রমুখের কথা। মধুপর্ণী ও কিরাতভূমির জেলা সংখ্যা একাজে বিশেষ সাহায্য করেছে।

লেখক ☐ কবি, সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক।



অর্ণব সেন

জলপাইগুড়ি জেলার ভাষাবৈচিত্র্য

একদিকে হিমালয়ের রাজকীয় বিশালতা আর গাম্ভীর্য, অন্যদিকে সমভূমির উদার বিস্তার। জলপাইগুড়ি জেলায় প্রবাহিত তিস্তা, মহানন্দা, জলঢাকা, তোর্সা, কালজানি, ডিমা, রায়ডাক, সংকোশ, গদাধর, নোনাই ইত্যাদি নদী, তাদের শাখানদী, উপনদী। আবার বহু বিচিত্র জাতি ও জনজাতির স্রোত এখানে নিত্য বহমান। জলস্রোত আর জীবনস্রোত—সেই সঙ্গে পাহাড়-পর্বত বন্য অরণ্য সমভূমি কৃষিভূমির নিবিড় সান্নিধ্যে এখানে গড়ে উঠেছে এক বহুমাত্রিক বর্ণময় সমাজ ও সংস্কৃতি। আবার তাদের মধ্যে আছে বহু বিচিত্র ভাষা-উপভাষা-বিভাষার ঐতিহ্য। এখানকার সমাজ, সংস্কৃতি ও ভাষা কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরস্পরবিরোধী হয়েও মূলত সমন্বয়ধর্মী।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের উত্তরের শেষ সীমানায় জলপাইগুড়ি জেলা। এই জেলার সীমানা ছুঁয়ে আছে প্রতিবেশী দুটি জেলা, একটি রাজ্য, আর দুটি রাষ্ট্র। প্রশাসনিক দিক থেকে ১৮৬৯-এ জানুয়ারির প্রথম দিন থেকে জলপাইগুড়ি জেলা এক নতুন জেলা হিসেবে চিহ্নিত হল। ভুটান যুদ্ধের পর পশ্চিম ডুয়ার্স, রঙপুর জেলার বৈকুণ্ঠপুর সহ কিছুটা অংশ নিয়ে তৈরি হল জলপাইগুড়ি জেলার নতুন চেহারা। বলা বাহুল্য স্বাধীনতা পরবর্তীকালে দেশ বিভাগের ফলে সেই ভৌগোলিক পরিচয়ও কিছুটা পরিবর্তিত, এমন কি আয়তনও খানিকটা কমে গেল। জেলার বর্তমান আয়তন ৬,২২৭ বর্গ কিলোমিটার। জলপাইগুড়ি জেলার ভাষা বিষয়ক আলোচনার ক্ষেত্রে যতটুকু পরিচয় দেওয়া নিতান্ত জরুরি সেইটুকুই দেওয়া যেতে পারে। ভাষা বিজ্ঞানের আলোচনায় ভৌগোলিক অবস্থান, প্রাকৃতিক পরিচয়, জলবায়ু, আবহাওয়া ইত্যাদিরও প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ, প্রভাব আছে বলেই ভাষা বিজ্ঞানীরা মনে করেন। অন্তত জলপাইগুড়ি জেলা এমন একটি জেলা যেখানে আমরা একটা ছোটখাটো মহাদেশের বিপুল বৈচিত্র্য লক্ষ্য করি। শুধু প্রকৃতির বিপুল বৈচিত্র্যই নয়, জলপাইগুড়ি

জেলার মানব সমাজের মধ্যেও আছে বিপুল বৈচিত্র্য, প্রায় পরস্পর বিরোধী ভাষা সম্প্রদায়ের পাশাপাশি অবস্থান। জলপাইগুড়ি জেলায় মোট ১৫১টি স্বতন্ত্র মাতৃভাষার সন্ধান পেয়েছেন গবেষকরা, আবার তার মধ্যে আছে ৮টি বিদেশি ভাষা, আবার ৪২টির বর্গীকরণ হয়নি। ১০১টি ভাষার অস্তিত্ব মোটামুটি ৪টি পরিবারে : (১) ভারতীয় আর্য (২) অস্ট্রিক (৩) দ্রাবিড় (৪) ভোটবর্মী। এককথায় জলপাইগুড়ি জেলা একটি বহু ভাষাভাষী জেলা (Multi Lingual District)। রণজিৎ দাশগুপ্ত তাঁর জলপাইগুড়ি বিষয়ক ইংরেজি ECONOMY, SOCIETY AND POLITICS IN BENGAL; JALPAIGURI 1869-1947 (১৯৯২) বইটিতে দেখিয়েছেন এ অঞ্চলে, অর্থাৎ জলপাইগুড়ি জেলায় মেচ, রাজবংশী, গারো, রাভা, টোটো ইত্যাদি সম্প্রদায় এবং গোষ্ঠীর মধ্যে (কেবলমাত্র টোটোরা ছাড়া) কয়েক শতাব্দীতে প্রতিটি ক্ষেত্রে সামাজিক, ধর্মীয় এবং অর্থনৈতিক বিপুল পরিবর্তন ঘটে গেছে। আমরা সাম্প্রতিক কিছু কিছু ক্ষেত্র সমীক্ষায় টোটোদের মধ্যেও পরিবর্তন লক্ষ করেছি। অবশ্য তা বিলম্বিত লয়ে।

সারণি—১

জলপাইগুড়ি জেলার মোট একশো একটি শ্রেণীনির্ণীত ভাষা

ভারতীয় আর্য ভাষাগোষ্ঠী (৪৬টি)	ভোট-চীনীয়/ভোটধর্মী ভাষাগোষ্ঠী (২৪টি)	অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠী (১৯টি)	দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠী (১২টি)
বাংলা, হিন্দি, গোর্খালি/নেপালি, গুজরাটি সাদরি (উপভাষা)	বড়ো/মেচ, রাভা, গারো, টোটো, ড়ুকমা, লেপচা, লিম্বু ইত্যাদি	সাঁওতালি, মুন্ডারি, লোধা, কুর্মি, হো, শবর, কোড়া ইত্যাদি	কুরুখ/ওরাওঁ, সালতো ইত্যাদি

সারণি—২

১৯৬১ সালের জনগণনা : জলপাইগুড়ি জেলার ভাষা পরিস্থিতি

মোট ভাষা-উপভাষা	বহির্ভারতীয় ভাষা	ভোটধর্মী ভাষা	শ্রেণী অনির্ণীত ভাষা	সংবিধান স্বীকৃত ভাষা
১০১টি	৮টি	২৪টি	৪২টি	১৪টি

জলপাইগুড়ি জেলার মানচিত্রে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষার অবস্থান

দার্শনিক হেরাক্লিটাস বহুকাল আগে মন্তব্য করেছিলেন—'একজন মানুষ একই নদীতে দুবার স্নান করতে পারে না।' ভাষার ক্ষেত্রেও ভিন্ন তাৎপর্যে একথা বলা যায়। জলপাইগুড়ি জেলার ভাষায় জীবন্ত বহতা স্রোতে এমন একটা গভীর পরিবর্তনশীলতা লক্ষ করা যায়, যা নিয়ত ভাষা প্রবাহকে ভাঙাগড়া উত্থান পতনের ভেতর দিয়ে পরিবর্তিত করে। এ বিষয়ে সাধারণ মানুষের সচেতনতা স্পষ্ট নয়। ভাষা বিজ্ঞানী ব্লুমফিল্ড মনে করেন, মৌখিক ভাষা দশ থেকে তেরো কিলোমিটারের মধ্যে বদলাতে থাকে, আঞ্চলিক মৌখিক ভাষা বা উপভাষার ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন জলপাইগুড়ি জেলায় নানা পারিপার্শ্বিক প্রভাবে প্রবলভাবে প্রতিফলিত। জলপাইগুড়ি জেলায় চা বাগিচা সৃষ্টির আগে মূলত ভোটবর্মী সম্প্রদায়ের মানুষ এখানে এসেছিলেন বা তাদেরই বসতি ছিল। মেচ বা বড়ো টোটো, রাভা, গারো সম্প্রদায়ের মানুষ এখানে ছিলেন। স্যার জোফেস ডালটন হুকার-এর Himalayan Journals-এর বিবরণ অনুযায়ী ১৮৫৪-র ১২ জানুয়ারিতে জলপাইগুড়ি এক ছোট্টগ্রাম, জলপাইগুড়ি জেলা (১৮৫৯) তৈরির পর ১৮৭৬-এ আলিপুর দুয়ার মহকুমা গঠিত হয় আর ১৮৭৪ থেকে চা বাগিচা তৈরি আরম্ভ হল। মনে রাখতে হবে কোচ রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষ নতুন জেলার দীর্ঘকালের বাসিন্দা হলেও চা বাগিচা স্থাপনে শ্রমিক হিসেবে তাঁদের অংশগ্রহণ করতে দেখা যায় না, একথা মেচ, রাভা ইত্যাদি স্থানীয় জনজাতি সম্পর্কেও বলা যায়। আমাদের জলপাইগুড়ি জেলার চা অঞ্চলে যাঁরা এলেন তাঁরা এসেছিলেন বাংলা তথা বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের বাইরে থেকে। তাই জলপাইগুড়ি জেলায় অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় জনজাতির জনসংখ্যা বিগত একশো বছরে ক্রমেই বেড়েছে। একটা ছোট হিসেব দেওয়া যাক। ১৯৭১ খ্রি. ওঁরাও ১৫৯৬১৯, মুণ্ডা ৭১,৬৮৫, সাঁওতাল ৭১,৫৩৯, মহালী ২৪,৩২০, খেড়িয়া ১৪,১২০ জন। এছাড়াও এ অঞ্চলে আমরা পাব কোরা, ভূমিজ, নাগেসিয়া, মালপাহাড়িয়া, হো ইত্যাদি জনজাতির মানুষ।

চা বাগিচা স্থাপনের সময় ছোটনাগপুর, রাঁচি, সিংভূম হাজারিবাগ, পুরুলিয়া, সাঁওতাল পরগনা, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা ইত্যাদি অঞ্চল থেকে অসংখ্য শ্রমিক আড়কাঠি এবং সর্দার মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছিল। অবশ্য চা বাগান পত্তনের পর প্রথম দিকে শ্রমিক হিসেবে এসেছিলেন নেপালিরা এবং বিশেষ করে ছোটনাগপুরের শ্রমিকরা। তাই দেখা যাচ্ছে জলপাইগুড়ি জেলার ভাষা-বৈচিত্র্যের মূল কারণ এখানকার বিভিন্ন জাতি ও জনজাতির অবিরত স্রোতধারা এবং অভিবাসন। জলপাইগুড়ি জেলার ভাষা বৈচিত্র্য আলোচনা করতে গেলে একটা পটভূমি জানিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন হয়, সেই পটভূমি না জানলে এখানকার ভাষা-বৈচিত্র্যের মূল কারণ বুঝে ওঠা সম্ভব নয়।

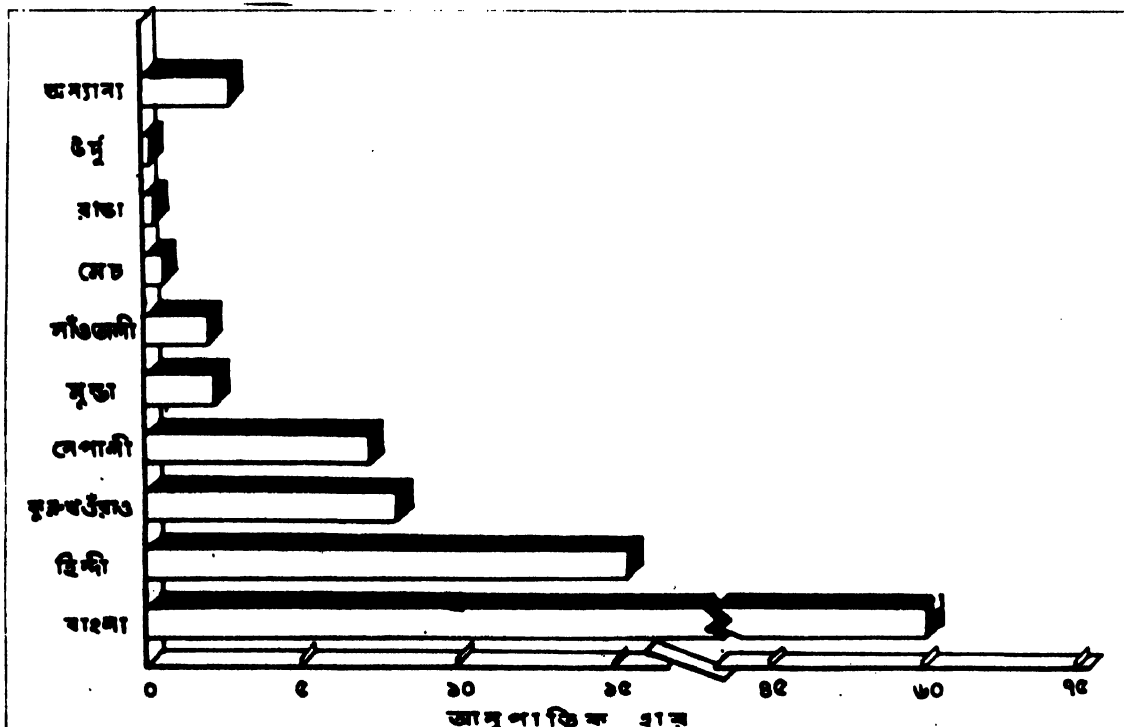
জলপাইগুড়ি জেলার জনবিন্যাসে ভারতের বর্তমান প্রচলিত প্রধান চারটি ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ যেমন আছেন তেমনি জলপাইগুড়ি জেলায় জেলার প্রধান ভাষা বাংলা ভাষাভাষী মানুষও এখানে দীর্ঘদিন ধরেই আসছেন একটা অবিরত প্রবাহের মতো। বসতিস্থাপন, চাকরি অন্যান্য জীবিকা উপলক্ষ করে যেমন বাংলার বাইরে থেকে মানুষ এখানে এসেছেন তেমনি বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল থেকেও ব্যাপক পরিমাণে বাংলা যাঁদের মাতৃভাষা, তাঁরাও এসেছেন। বলাবাহুল্য মাতৃভাষা যাঁদের বাংলা তাঁদের সংখ্যাই জলপাইগুড়ি জেলায় সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও ভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের সংখ্যাও উপেক্ষা করা যাবে না। ১৯৭১ সালে সেনসাস অনুসারে জলপাইগুড়ি জেলার মোট জনসংখ্যার মধ্যে বাংলা ১,০৫৪,২৫৫, হিন্দি ২৬২,১৯৯, কুরুখ/ওঁরাও ১৪৪,৭৮০, নেপালি/গোর্খালি ১২৮,৭৬৫, 'সুতরাং এই জেলার জনসংখ্যা গরিষ্ঠের ভাষা বাংলা। তবে এই গরিষ্ঠতার বিন্যাস জেলার সর্বত্র সমান নয়, কোথাও কোথাও বাংলার চেয়ে অন্য তিনটি ভাষার আঞ্চলিক গরিষ্ঠতা লক্ষ করা যায়। ১৯৭১-এর আদমসুমারির বিবরণে জনসংখ্যা অনুসারে এই চার ভাষার ব্যবহার—বিন্যাসের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা বিশ্লেষণ করলেই বিষয়টি পরিস্ফুট হয়।' (জলপাইগুড়ি জেলায় বাংলাভাষা : অবস্থান, বিন্যাস ও সমস্যা/মধুপর্ণী জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা ১৩৯৪—নির্মল দাশ)

জলপাইগুড়ি জেলা বিভিন্ন ভাষা সম্প্রদায়ের আনুপাতিক হার দেখানো হল :

জলপাইগুড়ি জেলার ভাষা বৈচিত্র্যের ক্ষেত্রে প্রধান অপ্রধান—নানা কারণ আছে তা কয়েকশো বছরের ইতিহাসের ধারা লক্ষ করলেই দেখা যাবে, ভারতের প্রায় সব কয়েকটি নৃ-গোষ্ঠির জাতি ও জনজাতির বাস এখানে, আবার বিচিত্র ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রভাব আছে এ অঞ্চলে। স্বাভাবিকভাবেই শতাধিক ভাষা উপভাষার ব্যবহার এ অঞ্চলে। জলপাইগুড়ি জেলা সৃষ্টির আগে ডুয়ার্সের বিভিন্ন এলাকায় বাস করতেন যে মানুষগুলি তাদের মধ্যে বিভিন্ন জোতদারের অধীনে রাজবংশী কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের প্রাধান্য ছিল। পাশাপাশি মেচ, রাভা প্রভৃতি জনজাতিরও জীবিকা ছিল চাষ, পশুপালন এবং অরণ্যনির্ভর নানা কাজকর্ম। একটা সময় ভুটান শাসনের প্রভাবে জলপাইগুড়ির বর্তমান চা অঞ্চল বা ডুয়ার্স এলাকায় জলপাইগুড়ি জেলায় ভোট শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে। বিতর্কিত বিষয় হলেও পরিতোষ দত্ত জলপাইগুড়ি জেলার নামকরণে ভোট তিব্বতীয় প্রভাব খুঁজে পেয়েছেন। তাই 'জলপেশ' অর্থ তাঁর মতে ভারতের পূর্ব দিকের কম্বলাদি গরম জিনিস বিনিময় কেন্দ্র। জলপাইগুড়ি এভাবেই—

JE—LE—PE —GO—RI— অর্থাৎ পাহাড়ে যাবার কম্বলাদি গরম জিনিস বিনিময় কেন্দ্র রূপে দরজা বা দুয়ার। (সূত্রঃ জলপাইগুড়ির নাম রহস্য ; পরিতোষ দত্ত। মধুপর্ণী জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা ১৩৯৪), উল্লেখ করা যেতে পারে জলপাইগুড়ি জেলার একটি অংশ ডুয়ার্স (Duars) অর্থাৎ ভুটান প্রবেশের দরজা হিসেবে ইংরেজ আমল থেকে পরিচিত। এ ব্যাপারে ডঃ চারুচন্দ্র সান্যাল ডি.বি.আই.টি এর শতবর্ষ সংখ্যায় (১৮৭৮-১৯৭৮) বিস্তৃত আলোচনা করেছেন ; মোট ১৮টি দুয়ারের মধ্যে পশ্চিম ডুয়ার্সে ৭টি, হিমালয়ের ভেতর দিয়ে ভারত ও ভুটানের মধ্যে ৭টি দুয়ার পশ্চিম দিকে।

'জলপাইগুড়ি জেলার ভাষা সংস্কৃতি বলয় ও ভাষা পরিস্থিতি' নিবন্ধে বিমলেন্দু মজুমদার (সমতট—114) দেখিয়েছেন জলপাইগুড়ি জেলার ভাষা সংস্কৃতি আলোচনায় আছে কয়েকটি স্তর-(ক) প্রাক

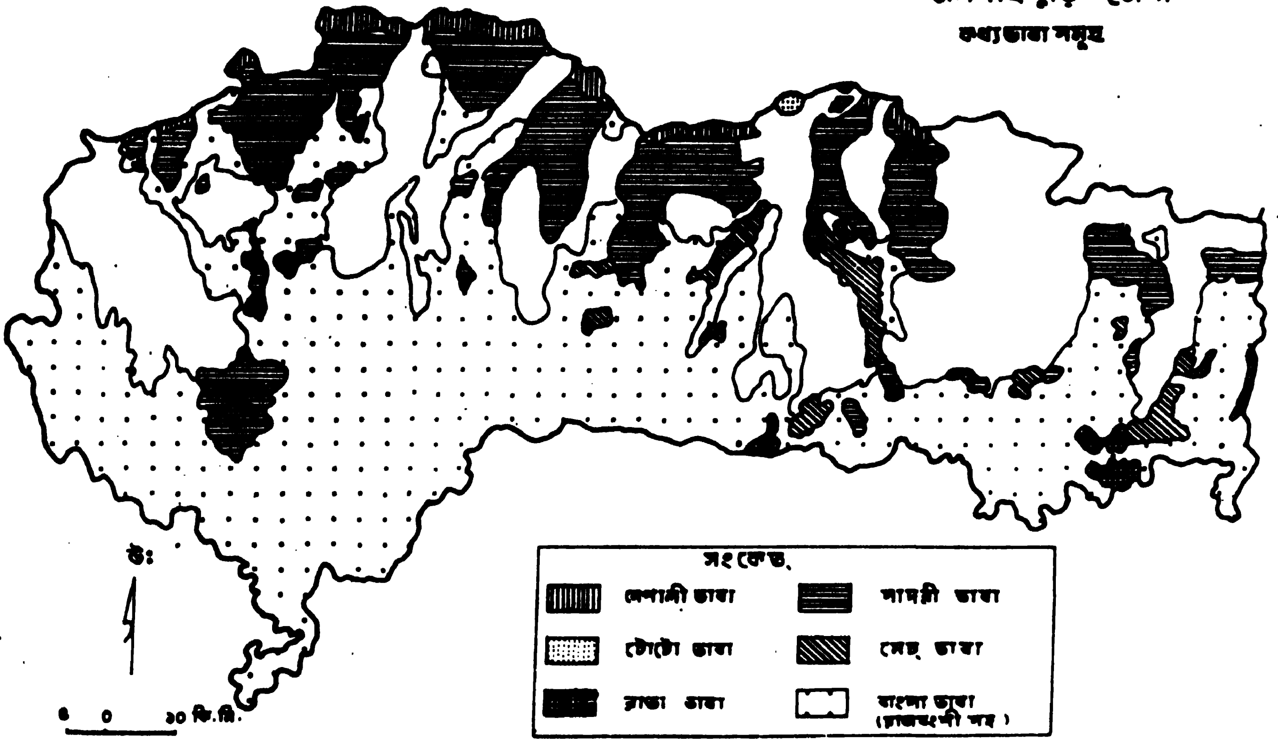


সূচকে প্রদর্শিত জলপাইগুড়ি জেলায় বিভিন্ন ভাষাসম্প্রদায়ের আনুপাতিক হার

> 'মধ্যযুগে য়ুরোপে সংস্কৃতির এক ভাষা ছিল লাটিন। সেই ঐক্যের বেড়া ভেদ করেই য়ুরোপের ভিন্ন ভিন্ন ভাষা যেদিন আপন আপন শক্তি নিয়ে প্রকাশ পেলে সেই দিন য়ুরোপের বড়দিন। আমাদের দেশেও সেই বড়দিনের অপেক্ষা করব—সব ভাষা একাকার করার দ্বারা নয়, সব ভাষার আপন আপন বিশেষ পরিণতির দ্বারা।'

ব্রিটিশযুগ (খ) ব্রিটিশ যুগ (গ) স্বাধীনতার পরবর্তী যুগ। আমাদের বিশেষ ভাবেই আলোচনা সংক্ষিপ্ত করার প্রয়োজনে বেছে নিতে হচ্ছে স্বাধীনতা পরবর্তী যুগ এবং বিশেষ করে ১৯৫০-২০০০ খ্রি. পর্যন্ত। স্বাধীনতা পরবর্তী অধ্যায়ে গোটা ভারতভূমি জুড়ে বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেছে। দেশ বিভাগের পরবর্তী অধ্যায়ে বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলেও বিপুল পরিবর্তন অনিবার্যভাবেই দেখা গেছে। দেশ বিভাগের ফলে, বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের স্বাভাবিক অবস্থানও পরিবর্তিত ও বিপর্যস্ত। তাছাড়া গ্রিয়ারসন ভারতীয় উপমহাদেশের নানা অঞ্চলের উপভাষা বিষয়ে যে গবেষণা চালিয়ে ছিলেন তার পরবর্তীকালে, বিশেষ করে স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ভাষা নিয়ে আর তেমন কোনো ভাষা বিজ্ঞানসম্মত জরিপ হয়নি। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ সুকুমার সেন প্রমুখ ভাষা বিজ্ঞানীরা বাংলা ভাষার প্রধান পাঁচটি উপভাষা নির্দেশ করেছিলেন রাঢ়ী, বরেন্দ্রী, বঙ্গালী, ঝাড়খণ্ডী, কামরূপী। গ্রিয়ারসনের হিসেব মতো Linguistic Survey of India—পঞ্চম খণ্ডে বাংলার আঞ্চলিক উপভাষা-বিভাষার সংখ্যা বৈচিত্র্য হিসেবে চল্লিশটিরও বেশি খুঁজে পেয়েছিলেন। আধুনিক ভাষা বিজ্ঞানীরা উপভাষার ক্ষেত্রেও বর্গীকরণের তিনটি স্তর লক্ষ করেন—শিষ্টভাষা, জনভাষা ও লোকভাষা। আধুনিককালে শিষ্ট বাংলাভাষা বা মান্যচলিত বাংলা শিক্ষিত শহুরে মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্তের ভাষা। আবার এই ভাষাই এখন নানা মাধ্যমে জলপাইগুড়ি জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলেও, চা-বাগানের জন বিরল এলাকাতেও, অরণ্য জীবনেও ছড়িয়ে পড়ছে বেতার—দূরদর্শন সংবাদপত্র সাহিত্য ইত্যাদি নানা গণমাধ্যমের সাহায্যে। ফলে জলপাইগুড়ি জেলার বাংলা ভাষা সহ অন্যান্য ভাষা বিভাষার ক্ষেত্রেও তার অনিবার্য প্রভাব দেখা যাচ্ছে। ফলে অনেকেই তাঁদের ভাষা উপভাষা বিভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ক্রমশ একটা মিশ্র সহজতর যোগাযোগ মাধ্যমের বাংলা ব্যবহার করছেন। গত বছরে ১৯৯৯ ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সোসাইটির হিসেবে পৃথিবীতে বাংলাভাষী জনসংখ্যার স্থান চতুর্থ। তার পরে পর্তুগিজ, রাশিয়ান, জাপানি ইত্যাদি। পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ব্যবহারকারী মানুষ ৯৬.৬৪ শতাংশ। তবে জলপাইগুড়ি জেলায় এই সংখ্যা স্বাভাবিকভাবেই অন্যান্য জেলার তুলনায় যথেষ্ট কম। জলপাইগুড়ি জেলায় বাংলা ভাষাই সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও অন্তত জলপাইগুড়ি সদর মহকুমার মেটেলি নাগড়াকাটা এবং আলিপুরদুয়ার মহকুমার বীরপাড়া ও কালচিনিতে বাংলা ভাষা সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভাষা নয়। মেটেলিতে হিন্দি, নাগরাকাটায় হিন্দি, বীরপাড়ায় নেপালি/গোর্খালি কালচিনিতে নেপালি/গোর্খালির আধিপত্য। এই হিসেব কয়েক বছরের পুরনো। তবে এর মধ্যে ব্যাপক সংখ্যক বাংলাভাষী মানুষ জেলার বাইরে থেকে, এমনকি ভিন্ন প্রদেশ ও ভিন্ন দেশ থেকে (বাংলাদেশ) বাধ্য হয়েই জীবিকার টানে এদেশে এসেছেন। তাছাড়া আমাদের প্রত্যক্ষক্ষেত্রে সমীক্ষা থেকে আমরা লক্ষ করি মাতৃভাষা বাংলা না হলেও জলপাইগুড়ি জেলায় বসবাসকারী মানুষ মোটামুটি প্রায় সবাই বাংলা বোঝেন। আবার আধুনিক শিক্ষিত সমাজে, বিশেষ করে তরুণ-তরুণীদের মধ্যে হিন্দি বিশেষত সিনেমা দূরদর্শন প্রচারিত সর্বজনবোধ্য হিন্দি কিছুটা প্রভাব বিস্তার করেছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ভাষার ব্যবহার বাড়িয়ে তোলার জন্য সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগ দেখা গেলেও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে জলপাইগুড়ি জেলার ভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের অবস্থানের জন্যই বাংলা প্রধান মাধ্যম হলেও অনেক ক্ষেত্রেই, বিশেষত শিক্ষা ক্ষেত্রে বাংলাভাষার পাশাপাশি নেপালি, হিন্দি এবং ইংরেজি ব্যবহার করতে হয়। এই জেলার বহু ভাষাভাষী মানুষের কথা ভেবেই তা করতে হয়। শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে একটি ভাষা সম্প্রদায় তার নিজস্ব আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য হারিয়ে চলিত মৌখিক ভাষাকেই গ্রহণ করে, কোনো ভাষা বা বিভাষাকে রাজনৈতিক সমর্থন দিয়ে বাঁচিয়ে তোলা যায় না তাই অনেক কথ্য ভাষাই শেষ পর্যন্ত লুপ্ত হয়। ভাষা বিজ্ঞানের সাধারণ নিয়ম চলিত মৌখিক ভাষার প্রসার এবং আঞ্চলিক ভাষার অবলুপ্তি। পবিত্র সরকার 'কোনটি ভাষা কোনটি উপভাষা : একটি তাত্ত্বিক আলোচনা' (তিস্তাপত্র তৃতীয় সংখ্যা আগস্ট ১৯৯৮) নিবন্ধে দেখিয়েছেন : 'ভাষা বিজ্ঞানে বলে Language is a political notion—অর্থাৎ কোনো একটি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে রাজ্য, রাষ্ট্র ইত্যাদির সমর্থন যে মান্য উপভাষার পিছনে থাকে সেটিই ভাষার পরিচয় পায়। বলা বাহুল্য ভাষার এ পরিচয় আংশিক। মান্য এবং অমান্য (No standard) সমস্ত উপভাষার সমষ্টিই হল ভাষা।' নিবন্ধের শেষ পর্বে পবিত্র সরকার লেখেন : 'কোনো ভাষা বিজ্ঞানী তথাকথিত কামতাপুরির পৃথক ভাষার দাবি, বিজ্ঞানের বিবেচনার ভিত্তিতে স্বীকার করতে পারে না। কী ধ্বনিগত, কী পদগঠনগত, কী বাক্য নির্মাণগত—কোনো তফাতেই এমন বিপুল নয় যাতে 'কামতাপুরি'কে আলাদা ভাষারূপে স্বীকার করা যেতে পারে।'

ডঃ নির্মল দাশ তাঁর উত্তরবঙ্গের ভাষা প্রসঙ্গ বইটিতে লিখেছেন : 'রাজবংশী নামকরণ একাধারে অব্যাপ্তি ও অতিব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট।' ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ সুকুমার সেন প্রমুখরা অবশ্য এই উপভাষার নামকরণ করেছেন কামরূপী উপভাষা। কামরূপী উপভাষার একটি বিভাষা রংপুরী বা রাজবংশী শাখাকে উদীচ্য অর্থাৎ বরেন্দ্রী শাখার একটি প্রশাখা বলে গণ্য করা উচিত এমত মুহম্মদ



জলপাইগুড়ি জেলার মানচিত্রে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষার অবস্থান — *ড. সুধীরকুমার বিশ্বর সৌজন্যে*

শহীদুল্লাহ্‌র। এর রাজবংশী এই জাতিগত নামকরণটি সমীচীন নয়।' [বাংলা ভাষা পরিক্রমা/পরেশ মজুমদার]। রাজবংশী ভাষা হিসেবে তাই বাংলার মধ্যেই গৃহীত। গ্রিয়ারসন কথিত 'Bahe' নাম অর্থের অবনতি জনিত কারণ অবশ্য বর্জনীয়। এ বিষয়ে সুখবিলাস বর্মা তাঁর জাগ গান বইটিতে জাগ গান আলোচনা প্রসঙ্গে জলপাইগুড়ি কোচবিহার অঞ্চলে প্রচলিত কামরূপী উপভাষা প্রসঙ্গে লিখেছেন : 'চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্‌-এর মন্তব্য অনুসরণ করে এবং ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বিশ্লেষণ গ্রহণ করে বাংলার ভাষাতত্ত্ববিদগণ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে রাজবংশীদের পূর্বপুরুষরা মধ্যভারতীয় আর্য ভাষার তৃতীয় স্তরের ভাষা মাগধী অপভ্রংশকে নিজেদের ভাষা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। এই ভাষাই বিবর্তিত হয়ে বর্তমানে কামরূপী যা রাজবংশী উপভাষা রূপ পরিগ্রহ করেছে। বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের মতো এই কামরূপ অঞ্চলের ভাষাও একই নিয়মে বিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতায় এই বিবর্তন মধ্য বাংলায় এসে থেমে গেছে।' পবিত্র সরকারের বৈজ্ঞানিক আলোচনা থেকে তা বোঝা যায় এবং সুখবিলাস বর্মাও তা স্বীকার করেছেন বিশেষ বিশেষ কারণেই এক এক অঞ্চলে বা দেশে একটি বিশেষ উপভাষা গুরুত্ব পায়। অন্যগুলি উপেক্ষিত হয়। বর্তমানে জলপাইগুড়ি জেলায় যে বাংলাভাষার প্রাধান্য আগেই তা উল্লেখ করা হয়েছে স্বাধীনতা পরবর্তী বিগত পঞ্চাশ বছরে তা রাঢ়ী-বরেন্দ্রী-বঙ্গালী-কামরূপী-ঝাড়খণ্ডী মিশ্রিত একটা বিচিত্র কথ্য বাংলা। চা অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষ যে ভাবে চা অঞ্চলের ভাষা গোষ্ঠীর দ্বারা প্রভাবিত হন তা অবশ্য 'কৃষিজীবী' মানুষের এলাকায় ঘটে না। বর্তমানে জেলায় ১০৬ টি বাগিচায় প্রায় তিন লক্ষ শ্রমিক, যার মধ্যে জনজাতি এবং নেপালি সম্প্রদায় মুখ্য। বাবু কর্মচারীরা মূলত বাঙালি।

জলপাইগুড়ি জেলার প্রায় ১৬০টি চা বাগানে বিভিন্ন জনজাতির মধ্যে বিচিত্র মাতৃভাষা ব্যবহার আছে, আবার চা বাগানে শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে বাংলা ভাষা ব্যবহার প্রায় নেই বললেই চলে। তাদের মধ্যে বিপুল পরিমাণ অস্ট্রিক দ্রাবিড় ইত্যাদি জনজাতির একটা পরিবর্ত ভাষা হিসেবে, যোগাযোগের ভাষা হিসেবে সাদরি ভাষা গ্রহণ করেছেন। এই ভাষায় চা অঞ্চলে বসবাসকারী বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর ভাষার শব্দ মিশে গেছে ওরাওঁ, মুণ্ডা, খাড়িয়া, অসুর, মাহালি, সাঁওতাল, চিকবারাইক ইত্যাদি কয়েক বছর ধরে মাতৃভাষার বদলে মাদ্রি বলে। ডঃ বিমলেন্দু মজুমদারের সমীক্ষা মতে অন্তত ৭৬.৬১০ জন মানুষ সাদরিকে তাঁদের মাতৃভাষা হিসেবে দেখিয়েছেন। তবে সাদরি ভাষার সঙ্গে হিন্দির চেয়ে বাংলার সম্পর্ক অনেক ঘনিষ্ঠ। এ বিষয়ে 'সাদরি ভাষা' নিবন্ধে সমীর চক্রবর্তী (সমতট 114) সাদরি ও বাংলার সম্পর্ক কতটা গ্রহণযোগ্য তা দেখিয়েছেন।

বর্তমানে সাদরি একটা এমন যোগাযোগ মাধ্যম ভাষা যে এই ভাষা কয়েক লক্ষ চা শ্রমিক এবং চা অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষ বুঝতে পারেন। তবে দুঃখের বিষয় চা অঞ্চলে শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে বাংলা ভাষার প্রভাব যতটা বাড়ছে তার চেয়ে অনেক বেশি প্রভাব বাড়ছে হিন্দির। বানারহাট, বীরপাড়া, মাল, নাগরাকাটা, কালচিনি,

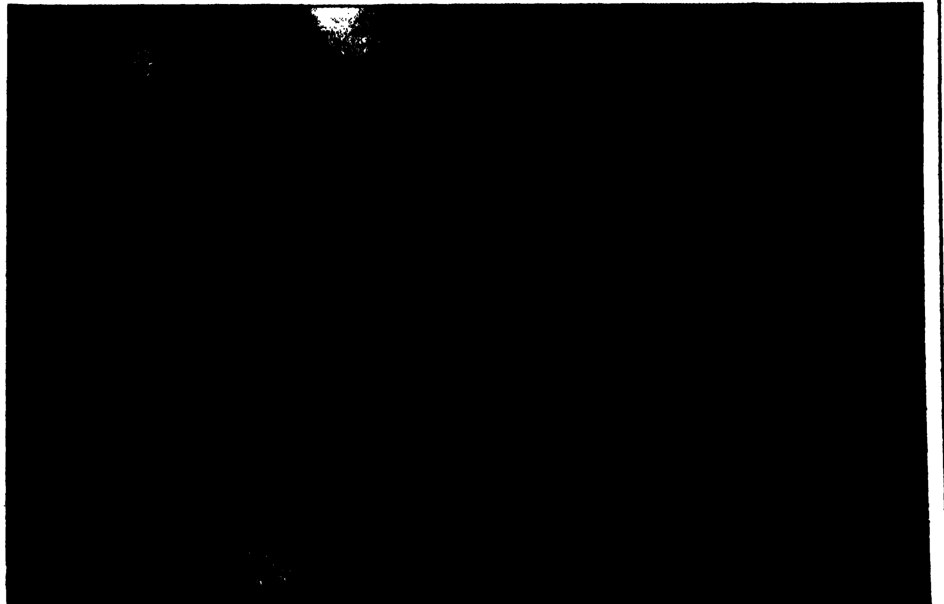
জলপাইগুড়ি জেলায় মোট ১৫১টি স্বতন্ত্র মাতৃভাষার সন্ধান পেয়েছেন গবেষকরা, আবার তার মধ্যে আছে ৮টি বিদেশি ভাষা, আবার ৪২টির বর্গীকরণ হয়নি। ১০১টি ভাষার অস্তিত্ব মোটামুটি ৪টি পরিবারে : (১) ভারতীয় আর্য (২) অস্ট্রিক (৩) দ্রাবিড় (৪) ভোটবর্মী। এককথায় জলপাইগুড়ি জেলা একটি বহু ভাষাভাষী জেলা (Multi Lingual District)।

মেটেলি প্রভৃতি অঞ্চলে বাংলা ভাষার প্রভাব থাকলেও মাধ্যমিক এমন কি উচ্চ মাধ্যমিক স্তরেও হিন্দির প্রাধান্য দেখা যাচ্ছে। একাধিক বিদ্যালয় এবং কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় হিন্দির মাধ্যমে শিক্ষা দিচ্ছে। মাতৃভাষা হিন্দি না হলেও ভারতের বিস্তৃত ক্ষেত্রে সুযোগ পাওয়ার জন্য অনেকে হিন্দি মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণে নিজের ছেলেমেয়েদের পাঠাচ্ছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা চলে, জলপাইগুড়ি জেলায় ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয় বেশ কিছু আছে। তবে সেই বিদ্যালয়গুলির মাধ্যমে ইংরেজি প্রসারিত হলেও কথ্য ভাষা হিসেবে সমাজের বিশেষ স্তরেই সীমাবদ্ধ।

জলপাইগুড়ি জেলায় একেবারে গোড়ার দিকে শ দেড়েক নেপালি বাস করতেন, ১৯৮১ জনগণনা হিসেবে জেলার নেপালি জনসংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৭.৩৫ শতাংশ অর্থাৎ ১,২৮,৭৬৫ জন। এক সময় নেপালি ভাষা সীমিত ক্ষেত্রে জনসমাজে ব্যবহার করা হতো। বর্তমানে এই জেলায় বাংলা এবং হিন্দির পরেই নেপালি ভাষাভাষী জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান চেহারাটি দেখা যাচ্ছে। লক্ষ করলে দেখা যাবে জলপাইগুড়ি জেলার সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় নেপালি জনসংখ্যা ব্যাপকভাবে বাড়ছে। এ ব্যাপারে সংবাদ মাধ্যমের ধারণা পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে, বিশেষত নেপাল ও ভুটান থেকে অত্যন্ত সুকৌশলে অনুপ্রবেশ ঘটছে জলপাইগুড়ি জেলায়। ভুটান থেকেও বহু সংখ্যক নেপালি সম্প্রদায়ের মানুষ চলে আসতে বাধ্য হয়েছেন। উত্তরবঙ্গে দার্জিলিং অঞ্চলে বা পার্বত্য পরিষদ গড়ে উঠেছে উদ্দেশ্যমূলকভাবে তার এলাকা প্রসারিত করার জন্যই জলপাইগুড়ি জেলায় এক শ্রেণীর বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। একটি খণ্ড এলাকায় অসম ভাষা বিন্যাস থাকলেই তাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কাজে লাগানোর চেষ্টা আদৌ সুস্থ রাজনৈতিক আন্দোলন বলা যায় না। জলপাইগুড়ি জেলার ভাষা বৈচিত্র্যের সহযোগ নিয়ে কিছু কিছু বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী নানাভাবে একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির চেষ্টা করছেন। বলা বাহুল্য সচেতন মানুষ এই জাতীয় বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের ফাঁদে পা দিয়ে গোটা রাজ্যের সর্বনাশ ডেকে আনবেন না বলেই আমাদের বিশ্বাস।

উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলায় ভাষা বৈচিত্র্য বিচারে মেচ সম্প্রদায় নিয়ে অনেকেই বহু বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। মেচ/বড়ো সম্প্রদায়ের ভাষার নাম বড়ো ভাষা, যার নিজস্ব বর্ণমালা নেই। তবে পশ্চিমবঙ্গে বাংলা অক্ষরেই তারা নিজেদের প্রয়োজনীয় লেখালেখি, এমন কি সাহিত্য চর্চাও করে থাকেন। উত্তরবঙ্গে জলপাইগুড়ি জেলায় বড়োভাষা ও সাহিত্য নিয়ে পত্র-পত্রিকাও প্রকাশিত হয়। মেচরা 'বড়ো' নামটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য মনে করেন। 'মেচ' অভিধাটি ডঃ চারুচন্দ্র সান্যালের মতে হিমালয়ের পাদদেশে মেচ নদী পর্যন্ত ছিল এদের জাতি। ভিন্নমতে, সংস্কৃত 'ম্লেচ্ছ' থেকে 'মেচ' কথাটি এসেছে। জলপাইগুড়ি ডুয়ার্সে মেচরা মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীজাতি। তাদের কাছাড়ি বা বড়ো গোষ্ঠীর শাখা বলে মনে করা হয়। কৃষিজীবী এই সম্প্রদায়টির মধ্যে অনেকেই উচ্চশিক্ষিত। জলপাইগুড়ি জেলার সাঁতালি বস্তি বর্তমানে জেলার বৃহত্তম মেচ বসতি। এছাড়া মহাকালগুড়ি, দক্ষিণ মেন্দাবাড়ি অঞ্চলেও মেচ সম্প্রদায়ের বাস। মেচদের মধ্যে হিন্দু এবং খ্রিস্টান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ আছে, মেচ বা বড়ো ভাষা ব্যবহারকারীরা

শ্রমজীবী রাজবংশী মহিলা — *ছবি : সৌভিক ঘোষ*



রাজবংশী কথ্য ভাষা বা বিভাষার ব্যাপকতা জলপাইগুড়ি জেলার মধ্যে আছে। এই ভাষায় উন্নত সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চাও দীর্ঘদিন থেকে অব্যাহত। তাছাড়া রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষ না হয়েও এই ভাষা ও সংস্কৃতি চর্চায় অনেকেই অংশগ্রহণ করেন। তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অললই ঝললই মাদারের ফুল' এই ভাষার কাব্যগ্রন্থ। আমরা লক্ষ করেছি শহুরে শিক্ষিত শ্রেণী এবং আধুনিককালের রাজবংশী যুবসম্প্রদায় আজকাল এই ভাষার ব্যবহারে আগ্রহী নন। তাঁরা অনেকেই বেছে নিচ্ছেন উত্তরবঙ্গের বঙ্গালী বরেন্দ্রী মিশ্রিত খানিকটা মান্যচলিত বা শিষ্ট বাংলা।

বাংলা ভাষা ব্যবহারেও দক্ষ। ১৯৭১-এর জনগণনায় জলপাইগুড়ি জেলা বড়োভাষীর সংখ্যা ২০,১৬২। তবে এই সংখ্যা আরো বেশি হবে বলেই মনে করা হয়, কারণ অনেক মেচ নিজেকে বড়ো বলে দাবি করেন।

জলপাইগুড়ি আর কোচবিহারের অধিকাংশ রাভাই কোচ রাভা গোষ্ঠীর, কিছু আছেন পাতিরাভা এবং আরো কিছু গোত্র। রাভাদের নিজস্ব ভাষা থাকলেও তারা স্থানীয় ভাষা ব্যবহার করেন। রাভা ভাষা বৃহত্তর বড়ো ভাষা গোষ্ঠীর একটি শাখা। রাভাদের মধ্যে দুটি শ্রেণী—গ্রামবাসী রাভা এবং অরণ্যবাসী রাভা। ১৯৭১-এর জনগণনায় রাভাভাষী সংখ্যা ৬,৫৭৮। জলপাইগুড়ি জেলার ডুয়ার্স এলাকার অরণ্য অঞ্চলে, নিমতি এলাকার পারো বস্তি, লতা বাড়ি, মেন্দাবাড়ি, কামাখ্যাগুড়ি, হেমাগুড়ি প্রভৃতি এলাকায় এই সম্প্রদায়ের বাস। রাভাদের নিজস্ব ভাষা থাকলেও তা বাংলা ভাষার প্রভাবে হারিয়ে যাচ্ছে।

টোটো জলপাইগুড়ি জেলার একটি ক্ষুদ্র উপজাতি, যাদের সংখ্যা বৃদ্ধি অত্যন্ত সীমিত। জলপাইগুড়ি জেলার মাদারিহাট থেকে বেশ কয়েক কিলোমিটার দূরে পাহাড়ি এলাকায় কাছাকাছি টোটো সম্প্রদায়ের বাস। নৃতাত্ত্বিক দিক থেকে মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর কাছাকাছি টোটো সম্প্রদায়ের মাতৃভাষা টোটো নামেই পরিচিত। এই ভাষা ভোটবর্মী ভাষা পরিবারের অন্তর্গত যা মূলত ভোটচীনীয় ভাষা বর্গে পড়ে। টোটো সম্প্রদায়ের মধ্যে দারিদ্র্য প্রবল। আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া এই জাতির নিজস্ব ভাষা ক্রমেই নেপালি ভাষার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে গুরুত্ব হারাচ্ছে। এখানে জনসংযোগের ক্ষেত্রে নেপালি এবং বাংলা দুটি ভাষারই প্রভাব আছে। তাছাড়া শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে একটি বিদ্যালয়ে বাংলাই মাধ্যম হিসেবে গণ্য।

বকসায় ডুকপা সম্প্রদায়ের মানুষের বাস। বক্‌সা দুয়ার থেকে সান্ত্রাবাড়ি প্রায় পাঁচ কিমি পথ, সেখান থেকে একটিমাত্র বাস আলিপুরদুয়ারে যাতায়াত করে। ডুক্‌পা সম্প্রদায়ের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন কৃষ্ণপ্রিয় ভট্টাচার্য তাঁর 'ডুক্‌পা' নিবন্ধে (মেঘের গায়ে জেলখানা—সম্পাদক, তুষার প্রধান)। তাঁর মন্তব্য হল : 'ভারতীয় ভাষাতাত্ত্বিক সমীক্ষার রিপোর্ট অনুযায়ী 'ডুক্‌পা'দের ভাষার নাম 'লোকে'। এই উপভাষা ভোট-ব্রহ্ম ভাষা পরিবারের 'ভোটিয়া' শাখার অন্তর্গত। তিব্বতি ভাষায় 'লো' অর্থ দক্ষিণ দিক। ভৌগোলিকভাবে ভুটানের অবস্থান তিব্বতের দক্ষিণ দিকে বলেই হয়তো তিব্বতিরা এদের ভাষাকে 'লোকে' (Lhoke) বলে। ডুকপাদের মধ্যে অনেকেই অন্যভাষীদের সঙ্গে নেপালিতে কথাবার্তা বলেন। সামান্য অংশই বাংলা বোঝেন।

গারো উপজাতির সংখ্যা ১৯৭১-এর জনগণনা অনুযায়ী জলপাইগুড়ি জেলায় ছিল মাত্র ৪২৮ জন। গারোরা মূলত অরণ্যবাসী, মাতৃভাষা গারো। তবে অনেকেই বড়ো বা রাজবংশী বিভাষায় কথাবার্তা বলতে পারেন। গারো সম্প্রদায় ডুয়ার্স অঞ্চলে বসবাস করেন। উত্তরবঙ্গে দুটি গারো পাড়া, একটি দিনহাটার পথে, অন্যটি রাজাভাতখাওয়া জঙ্গলের শেষে ডিমা নদী পার হয়ে। গারো ভাষা ভোটবর্মী বর্গের ভাষা। এই সম্প্রদায়ের প্রধান বাসস্থল অবশ্য কোচবিহার।

জলপাইগুড়ি জেলায় অস্ট্রিক ভাষা গোষ্ঠীর বৃহত্তম হচ্ছে মুণ্ডা সম্প্রদায়ের মানুষ। ১৯৭১-এর জনগণনায় এদের সংখ্যা ৭১,৬৮৫ জন। আজকাল এরা মাতৃভাষা মুণ্ডারি খুব কমই ব্যবহার করেন, তারা ব্যবহার করেন বাংলা হিন্দি মুণ্ডারি মেশানো সাদরি ভাষা।

খারিয়া জনজাতির মানুষ মূলত চা শ্রমিক। মাতৃভাষা খারিয়া, অস্ট্রিক গোষ্ঠীর ভাষা। মাতৃভাষার ব্যবহার অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। ১৯৭১-এ এদের জনসংখ্যা ছিল ১৪,১২০ জন। এঁরা বাংলা বোঝেন, অনেকেই সাদরি ব্যবহার করেন। সাদরির মধ্যে বাংলা, হিন্দি, কুরুখ ও অন্যান্য ভাষার শব্দ মিশে যায়।

ওঁরাও উপজাতির মানুষ অধিকাংশই চা বাগিচা নির্ভর, তবে কেউ কেউ কৃষিকাজে যুক্ত। ১৯৭১-এ জনগণনায় জলপাইগুড়ি জেলায় ওঁরাওদের সংখ্যা ছিল ১৫৯,৬১৯ জন। ওঁরাওদের মাতৃভাষা কুরুখ্, তবে অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে এবং নিজেদের মধ্যে কথাবার্তার সময় এঁরা সাদরি ভাষা ব্যবহার করেন। আবার প্রয়োজনে বাংলাও বলেন।

মালপাহাড়িয়া চা-শ্রমিক হিসেবে জলপাইগুড়ি জেলায় এসেছিলেন, অনেকে কৃষিকাজেও অভ্যস্ত। ১৯৭১-এর জনগণনায় এই উপজাতির জনসংখ্যা মাত্র ১০,৫০৫ জন। মাতৃভাষা দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর মালতো ভাষা, তবে অনেকেই বর্তমানে সাদরি ভাষা জনসংযোগের ভাষা হিসেবে ব্যবহার করেন। বাংলা ভাষা ব্যবহারেও এঁরা বিমুখ নন।

মাহালি সম্প্রদায় মূলত অস্ট্রিক ভাষা গোষ্ঠীর মানুষ, কিন্তু এঁরা বর্তমানে আদিভাষা মুণ্ডারি ভুলে গিয়ে হিন্দি-মেশানো বাংলায় কথাবার্তা বলেন এবং অনেকেই সাদরি ভাষা তাদের মাতৃভাষার মতো সহজ ভাবে ব্যবহার করেন।

শব্দের ভিন্ন ভিন্ন ভাষারূপ : ডুয়ার্সের লোকায়ত শব্দকোষ/কৃষ্ণপ্রিয় ভট্টাচার্য অনুসারী									
ইংরেজি	বাংলা	রাজবংশী	বড়ো	সাদরি	রাভা	সাঁওতালি	নেপালি	হিন্দি	টোটো
One	এক	এক	ছে	এক	গসা	মিৎ	এ্যাওড়া	এক	ইটো
Two	দুই	দুই	নৈ	দুই	আনিং	বার	দুওড়া	দো	নিসো
Forty	চল্লিশ	চল্লিশ	ব্রৈজি	চাল্লিশ	রুংনিং	পোনগেল	চালিস্	চালিস্	নিকাই
Finger	আঙুল	নেঙুল	আশি	অঙ্গরি	চিসিকর	কাটুপ	আঙুল	অঙ্গুলি	কোরয়

উত্তরবঙ্গে জলপাইগুড়ি জেলার জনবিন্যাস বিশ্লেষণ করতে গেলে লক্ষ করা যায় অখণ্ড বাংলায় পশম, চা, কমলালেবু, কাঠ, চামড়া, কৃষিজাত পণ্য, তামাক ইত্যাদির ব্যবসা সূত্রে জলপাইগুড়ি জেলায় নানা অঞ্চল থেকে মানুষ এসেছেন। আবার অনেকে এসেছেন শরনার্থী হিসেবে এখনকার 'বাংলাদেশ' বা অধুনালুপ্ত পূর্ব পাকিস্তান থেকে। বিহার, মধ্যপ্রদেশ, হরিয়ানা, রাজস্থান উত্তরপ্রদেশ থেকে যাঁরা এসেছেন তাঁদের ভাষা হিন্দি। আবার অন্ধ্র, গুজরাট, তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র, নেপাল, ভুটান, তিব্বত থেকেও মানুষ এসেছেন জীবনও জীবিকার প্রয়োজনে। জলপাইগুড়ি জেলায় নানা কারণেই বহিরাগতের অনুপ্রবেশ এখনও অব্যাহত। ১৯৯১-এ জনগণনার হিসেবের জরুরি দিকটি আমাদের লক্ষ করতে হবে। জলপাইগুড়ি জেলার মোট জনসংখ্যা ২৮,০০,৫৪৩ জন। এর মধ্যে তফসিলি জাতি ১০,৩৫,৯৭১ জন। তফসিলি উপজাতি ৫,৮৯,২২৫, জন, গ্রামীণ জনসংখ্যা ২৩,৪২,২৯৬ জন, শহরের জনসংখ্যা ৪,৫৮,২৪৭ জন। মনে রাখতে হবে, এই সংখ্যা প্রায় দশ বছর আগের, তাছাড়া তফসিলি জাতির মধ্যে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত জনসংখ্যা বর্তমানে প্রায় অর্ধেকের কাছাকাছি। জলপাইগুড়ি জেলার বেশির ভাগ মানুষ গ্রামজীবনে কৃষিনির্ভর জীবনযাপন করেন। জেলার কৃষিনির্ভর এলাকার অনেকগুলিতেই কামরূপী উপভাষার রাজবংশী কথ্য ভাষা বা বিভাষার ব্যবহার ব্যাপক। তিস্তা নদীর পশ্চিমে কথ্য ভাষা বা বিভাষার প্রাচীন রূপটি বাইরের প্রভাব এড়িয়ে অনেকটাই অপরিবর্তিত। তবে ডুয়ার্স এলাকায় ভোট কোচ অসমিয়া প্রভাব কিছুটা আছে। রাজবংশী কথ্য ভাষা বা বিভাষার ব্যাপকতা জলপাইগুড়ি জেলার মধ্যে আছে। এই ভাষায় উন্নত সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চাও দীর্ঘদিন থেকে অব্যাহত। তাছাড়া রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষ না হয়েও এই ভাষা ও সংস্কৃতি চর্চায় অনেকেই অংশগ্রহণ করেন। তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অললই ঝললই মাদারের ফুল' এই ভাষার কাব্যগ্রন্থ। আমরা লক্ষ করেছি শহরে শিক্ষিত শ্রেণী এবং আধুনিককালের রাজবংশী যুবসম্প্রদায় আজকাল এই ভাষার ব্যবহারে আগ্রহী নন। তাঁরা অনেকেই বেছে নিচ্ছেন উত্তরবঙ্গের বঙ্গালী বরেন্দ্রী মিশ্রিত খানিকটা মান্যচলিত বা শিষ্ট বাংলা।

জলপাইগুড়ির চা বলয়ে সাদরি ভাষার ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ। সাদরি ভাষা ডুয়ার্স এলাকার বাগিচাগুলি ছাড়াও কাছাকাছি এলাকার। হাটে-গ্রামে-গঞ্জেও অস্ট্রিক-দ্রাবিড়, এমন কি আর্যভাষা গোষ্ঠীর ভাষাগুলির মধ্যে একটা ঐক্যবিধায়ক সংহতির কাজ করছে। সাদরি ভাষায় 'সাঁঝ বিহান', 'পেয়ারকে ডহর' ইত্যাদি চলচ্চিত্র ভিডিও হলে দেখানো হচ্ছে। অভিনেতা-অভিনেত্রীও অনেকক্ষেত্রে স্থানীয় মানুষ। শুধুমাত্র শিল্পচর্চার উদ্দেশ্য নিয়ে এই প্রয়াস দেখা যাচ্ছে, তা নয়। চা-অঞ্চলে ছোট ছোট ভাষাগুলি ক্রমে হারিয়ে যাচ্ছে, মানুষ সাদরিনির্ভর হয়ে অনেকেই সাদরি ভাষাকে তাদের প্রধান ভাষা মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করছেন। বাংলা ভাষার সঙ্গেও তাঁদের বিরোধ নেই।

জলপাইগুড়ি জেলার কয়েকটি অঞ্চলে নেপালি ভাষার ব্যবহার বর্তমানে যোগাযোগ মাধ্যম ও শিক্ষার মাধ্যম হিসেবেও কাজ করছে। এই ভাষার ব্যবহার বিদ্যালয়ে শুধু নয়, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাতে স্বীকৃত। ফলে নেপালি প্রভাবে লেপচা ভাষার প্রভাবও বিলীয়মান। সাহিত্যচর্চা ও সংস্কৃতিচর্চার নানা প্রয়াস নেপালি ভাষাকে শক্তিশালী করে তুলছে জলপাইগুড়ি জেলায়। ভুটান সংলগ্ন সীমান্ত এলাকায় নেপালি জনসংখ্যার বৃদ্ধিও খানিকটা অস্বাভাবিক। ডুয়ার্সের আলিপুরদুয়ার কলেজ, মালবাজার কলেজেও নেপালি ছাত্রছাত্রী সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটছে। এই বৃদ্ধি অভিবাসন না শিক্ষিতের হার বৃদ্ধির ফল তা বিচার্য ও সমীক্ষার বিষয়। এ বিষয়ে আগেই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে জলপাইগুড়ি ডুয়ার্সে চা বাগিচা এলাকায় হিন্দি ভাষার গুরুত্ব বাড়ছে। হিন্দি বিদ্যালয়ও স্থাপিত হয়েছে জলপাইগুড়ি জেলার একাধিক শহর ও বাগিচা এলাকায়। হিন্দি ভাষার প্রসারে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগ তো আছে। ডুয়ার্সে কথ্য হিন্দির ব্যবহারও হাটে বাজারে পথে ঘাটে বাড়ছে। প্রসঙ্গতই একথা আমাদের মানতেই হবে, তুলনামূলকভাবে বাংলাভাষার প্রচার ও প্রভাব হিন্দি, সাদরি ও নেপালি ভাষার ব্যাপক প্রসারে খানিকটা খণ্ডিত। কালের অনিবার্য বিবর্তনে জলপাইগুড়ি জেলার ছোট ছোট ভাষাগুলি হারিয়ে যাবে অথবা লোকসংস্কৃতি ও ভাষাপ্রেমিকদের নিজস্ব চর্চার মধ্যে কোনক্রমে তাদের অস্তিত্ব রক্ষা করবে। ভোটচীনীয় বা ভোটবর্মী ভাষার ২৪টি শাখা জলপাইগুড়িতে আছে, ভারতে মোট ১১৬টি। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'ভারতের ভাষা ও ভাষা সমস্যা' নিবন্ধে এ বিষয়ে লেখেন : 'কিন্তু এই সমস্ত ভাষার জীবনীশক্তি বেশিদিনের জন্য আছে বলিয়া মনে হয় না, ভারতের বৃহত্তর জীবনে অংশগ্রহণ করিতে হইলে, কেবল এই সমস্ত সাহিত্যহীন পাহাড়িয়া ভাষায় চলিবে না ; ভোটচীনীয় ভাষীদের বাঙ্গালা, আসামী অথবা নেপালি শিখিতেই হইবে, এবং হইতেছে।'

বলাবাহুল্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আদিবাসী কল্যাণ বিভাগ থেকে নানা উন্নয়নমূলক কাজ করা হচ্ছে। লোক সংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র গড়ে উঠছে আলিপুরদুয়ারে। সরকারি সংস্থা হলেও উদ্যোক্তাদের মধ্যে আছেন নানা সম্প্রদায়ের মানুষ। কয়েকবছর ধরে তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের উদ্যোগে চা-বাগিচা শ্রমিকদের উৎসবে লক্ষ লক্ষ মানুষ তাঁদের সংস্কৃতি ও ভাষাচর্চার নান্দনিক দিকটি তুলে ধরছেন বিশাল মঞ্চে লক্ষ লক্ষ মানুষের সাগ্রহ উপস্থিতিতে। সেখানে উপস্থিত থাকলে মনে পড়বে পরিতোষ দত্তের প্রবন্ধের নামটি : 'দুটি পাতা একটি : বলো দেখি সে মুণ্ডারা কে ওঁরাও কে বা নেপালি।' [উৎস : লোকশ্রুতি—৯]

জলপাইগুড়ি জেলায় বিপুল ভাষা বৈচিত্র্যই তার ঐশ্বর্য, আবার আজকাল তা সংকট ও সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ভাষা ও সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার অজুহাতে মুষ্টিমেয় স্বার্থান্বেষী শ্রেণীর তথাকথিত আন্দোলন উত্তরবঙ্গের উন্নয়নকে পিছিয়ে দেবে, বাস্তবে বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়েই কোনো কোনো ব্যক্তি, দল বা গোষ্ঠী এই জাতীয় আন্দোলনের পশ্চাতে সাহায্যকারী শক্তি হিসেবে কাজ করে। জলপাইগুড়ি জেলার বিচিত্র জাতি উপজাতি তথা জনজাতির মানুষ এতে বিপর্যস্ত হবেন, কিন্তু বিভ্রান্ত হবেন না বলেই আমাদের বিশ্বাস।

বহুকাল আগেই রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের মতো দেশে ছোট বড় ভাষাসাহিত্যের পূর্ণবিকাশের কথা ভেবেছিল। লেনিন-স্টালিনের সোভিয়েত রাষ্ট্রেও ছিল বহু ভাষার এবং বহু জাতি ও ধর্মের অবস্থান। সেই সমস্যা সমাধানে ছোট বড় সব ভাষা ও ধর্মের বিকাশের সুযোগ দিয়ে সাংস্কৃতিক সংকট মেটাতে পেরেছিলেন সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রাথমিক পর্বের উদ্যোক্তারা। ছোট বড় ভাষার মাধ্যমেই ঘটতে পারে নানা ভাষা নির্ভর মানুষের বিকাশ। এ কথা ভেবেই রবীন্দ্রনাথ ১৯৩৮-এ 'বাংলাভাষা পরিচয়' বইটিতে লেখেন :

'মধ্যযুগে য়ুরোপে সংস্কৃতির এক ভাষা ছিল লাটিন। সেই ঐক্যের বেড়া ভেদ করেই য়ুরোপের ভিন্ন ভিন্ন ভাষা যেদিন আপন আপন শক্তি নিয়ে প্রকাশ পেলে সেই দিন য়ুরোপের বড়দিন। আমাদের দেশেও সেই বড়দিনের অপেক্ষা করব—সব ভাষা একাকার করার দ্বারা নয়, সব ভাষার আপন আপন বিশেষ পরিণতির দ্বারা।'

(রবীন্দ্র রচনাবলী, দশম খণ্ড, প. ব. সরকার, পৃঃ ১০৩১)

এখানেই লেখাটির সমাপ্তি টানতে হবে। জলপাইগুড়ি জেলার ভাষা বৈচিত্র্য আলোচনার বিষয়টি সহজ নয়। সংক্ষিপ্ত পরিসরে সীমিত এই আলোচনায় বিস্তৃত বিশ্লেষণ, ভাষাতাত্ত্বিক নিদর্শন, পরিবর্তন ইত্যাদি জটিল বিষয় বর্জিত হয়েছে। যথাসম্ভব বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে সামঞ্জস্যের চেষ্টাও করা হয়েছে। তবে এসব সত্ত্বেও আংশিকতা-ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকতেই পারে। ভাষা, সংস্কৃতি, সমাজ ও অর্থনীতির পাশাপাশি নানা রাজনৈতিক ঘটনাবলীও বিশেষ বিশেষ দেশকালের ভাষায় ক্রিয়াশীল ভূমিকা গ্রহণ করে। তবু মানুষের জীবন্ত ভাষার মধ্যে আছে এক বৃহৎ বটগাছের মতোই অজেয় প্রাণশক্তি। তার যথার্থ বিকাশ কৃত্রিম পদ্ধতিতে রোধ করা যায় না। রাষ্ট্রশক্তির বেড়াজাল ভাষাকে শেষ পর্যন্ত বাঁধতে পারে না।

লেখক ❑ বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক ও প্রাবন্ধিক

★ কৃতজ্ঞতা স্বীকার : ড. সুধীরকুমার বিশ্বাস/জলপাইগুড়ি জেলার কথাভাষা



রাজবংশী মহিষাল গরুমহিষ নিয়ে চলেছে বাথানে



মনোহর তিরকি

জলপাইগুড়ির আদিবাসী সমাজ ও সংস্কৃতি

১৬৬০ সালের আগে পর্যন্ত ইংল্যান্ডের লোকেরা চা পাতা গরম জলে সেদ্ধ করে সবজি হিসেবে পাঁউরুটির সঙ্গে মিশিয়ে খেতেন। ওঁরা তখন চা পাতাকে ঔষধি হিসেবেই ধরেছিলেন।... ডক্টর বিলি গ্রাহাম একবার কলকাতায় ঠাট্টা করে বলেছিলেন, 'পরে বুঝলেও চায়ের স্বাদ মজাদার বলেই ব্রিটিশরা ভারত ছাড়তে এত দেরি করেছিল।'

সেটা ১৭৭৫ সাল। ভূটানে ব্রিটিশের প্রতিনিধি তখন জর্জ বোগলে। তিনি ডুয়ার্স সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, দুর্গম অস্বাস্থ্যকর এই এলাকা জয়ের কোনও দরকার নেই। এখানে লাভজনক কিছু করা যাবে না। ১৮৫৪ সালে প্রকাশিত জে ডি হুকারের জার্নাল দেখুন। হাতির পিঠে করে দার্জিলিং যাওয়ার পথে হুকার জলপাইগুড়ি জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে দেখেছিলেন 'সাভানা' ঘাসের মতো তৃণভূমি। বাংলার এই অঞ্চল ছিল একেবারেই জনবিরল। বিচ্ছিন্নভাবে গড়ে উঠেছিল ছোট ছোট গ্রাম। সবই খড়ের ঘর। কিন্তু কলকাতার গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস ছিলেন ধূর্ত কূটনীতিক এবং দক্ষ প্রশাসক। তিনি বোগলের রিপোর্ট পেয়ে দমে যাননি। তাঁর নির্দেশে ১৭৭৮ সালে স্যার যোশেফ ব্যাঙ্ক রিপোর্ট দিলেন বিহারে ও কোচবিহারে চা চাষ সম্ভব। এ সময় চীন থেকে আনা চা বীজ বোগলের কাছে পাঠানোও হয়েছিল। যদিও তাতে ফল কিছু হয়নি। কাছাকাছি সময়ে, ১৭৮০ সালে কলকাতায়ও চা চাষের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয় সেই তৎপরতা। ১৮৩১ সালে হজসন বললেন, ডুয়ার্সে চা চাষ দারুণ লাভজনক হবে। চীনেও বিক্রি করা যাবে। ১৮৩৯ সালে পেমবার্টন বললেন, ডুয়ার্সে পৃথিবীর সেরা চা উৎপাদন করা সম্ভব। শেষ পর্যন্ত ১৮৩৪ সালে বড়লাট উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক সিকিমের মহারাজার কাছ থেকে শিভালিয়া পর্বতমালার দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চল ইজারা নিলেন বার্ষিক ৬ হাজার টাকার বিনিময়ে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রশাসক ডাঃ ক্যাম্পবেলকে চীনে পাঠানো হল চা-চারা রোপণের কলাকৌশল শিখে আসতে। ১৮৭৪ সালে ডুয়ার্সে চা আবাদের জন্য জমির বিলি বণ্টন শুরু হয়ে গেল।



তিস্তা-গঙ্গা উৎসবে আদিবাসী নৃত্য

মালিকরা শ্রমিকদের এককভাবে নিয়োগ করেছিল। কিন্তু, চা বাগানে নিয়োগ হয়েছিল পরিবারভিত্তিক। সাপখোপ, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বরের দুর্গম বনমহল কেটে চা বাগান গড়তে এই ধরনের কুলি তথা শ্রমিকদের অসমে এবং ডুয়ার্সে তুলে আনতে আড়কাঠি লাগানো হল। জমিদারি শোষণ, চোয়াড় বিদ্রোহ, ১৭৭০ সালে বাংলায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের কারণে পিতৃপুরুষের জঙ্গল মহল ছেড়ে মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম ও পুরুলিয়ায় এসে মানিয়ে নিচ্ছিল যারা, তাদের স্বর্গসুখের মিথ্যা প্রলোভন দিল আড়কাঠিরা। এরা সাঁওতাল পরগনা, ছোটনাগপুর ও জঙ্গল মহলে ঘুরে ঘুরে বিশেষত সাঁওতাল, ওঁরাও, মুণ্ডা আদিবাসীদের মধ্যে মিথ্যার জাল বিস্তার করে তাদের সপরিবারে চা বাগিচায় নিয়ে আসতে লাগল। সহজ সরল আদিবাসীরা আড়কাঠিদের কথা শুনে বিশ্বাস করে চা বাগানে এসে বন্দী ক্রীতদাসে পরিণত হতে লাগল। আর যাদের একবার নিয়ে আসা যাচ্ছিল, তাদের ফেরার পথ ছিল না। আড়কাঠিরা আদিবাসীদের বসতিতে গিয়ে বলতে শুরু করে, 'দেখ ওরা কেমন সুখে আছে, কেউ ফিরছে না। তোমরাও চল ওই আরাম আর সুখের দেশে।' আড়কাঠিরা বলত, 'দৈয়ারে দৈয়া/শিল্লিগুড়ি নকশালবাড়ি বাগডোগরা মাটিগাড়া/ভাইয়া মোরা দেখ্‌কে আলোঁবড়ে রিজুয়ারে সচ্চে কহথ।'

মানে হল, ওরে ভাই, শিলিগুড়ি নকশালবাড়ি বাগডোগরা মাটিগাড়া, সে তো খুব সুন্দর জায়গা, আমি দেখে এলাম, সত্যি বলছি।

আড়কাঠিদের দেখানো স্বপ্ন কীরকম প্রভাব ফেলত সাধারণ জীবনে তার একটা উদাহরণ দেওয়া যাক,

আয়ো বাবা গালি দেলাঁয়
চলু ভাটু নিকেল যাং
ভোটাং রাইজে কিরে ভাটু
নানা কিসিম কাম...।

বাবা মা রাগ করেছে মেয়ের ওপর। বকাবকিও করেছে। তাই মেয়ে তার বড় বোন-জামাইয়ের সঙ্গে ভোটাং রাইজে মানে ভুটান রাজ্যে চলে যেতে চায়। সে জেনেছে, সেখানে কাজের কোনও অভাব নেই। পরে সেই মেয়েই হয়ে উঠেছে ডুয়ার্সের বাগিচা মহলের অন্যতম রূপসী, ভোল অনেকটাই পাল্টে গেছে জীবনের। যেমন :

করিয়াটি পাতার ছুঁড়ি
টাঁড়ামে স্লিপ শাড়ি
গোরে হাওয়াই চপ্পল
টাঁড়া পাতর ছাতি চাকর।

এর বাংলা হল : সর্বাঙ্গ কালো। স্লিম গড়ন। কোমরে স্লিপ শাড়ি।

শিলিগুড়ির অদূরে জলপাইগুড়ি জেলার গজলডোবায় এর দু বছর বাদে ১৮৭৬ সালে পত্তন হয় গজলডোবা চা বাগানের। প্রথম ম্যানেজার ছিলেন রিচার্ড হাটন। এর আগে ১৮৭৪-৭৫ সালে ডব্লু বারান্টি ৫০২ একর ডুয়ার্স অরণ্য ইজারা নিয়ে জঙ্গল কেটে চা চাষ শুরু করেন। ১৮২১-২৩ সালে রবার্ট ব্রুস, তাঁর ভাই সি এ ব্রুস আর মণিরাম দেওয়ান অসম-বর্মা সীমান্তে চা গাছ লাগিয়ে যে সাফল্য পেয়েছিলেন, তা অসম হয়ে ডুয়ার্সেও ছড়াতে লাগল। উল্লেখ্য, এ দেশে প্রথম চা বাগান সুপারিনটেন্ডেন্ট সি এ ব্রুস-ই। ৪০০ টাকা মাইনেয় নিয়োগ করা হয়েছিল তাঁকে। এবার চাই শ্রমিক। সাঁওতাল, হো, মুণ্ডা, ওঁরাও আদিবাসী শ্রমিকদেরই চাই। যারা হাওড়া থেকে রামপুরহাট-সাহেবগঞ্জ হয়ে উত্তরবঙ্গে রেললাইন পাতার কাজ করেছিল, তাঁদেরই চাই। কারণ রেললাইন পাতার সময় পাশের জমি থেকে মাটি কেটে রেললাইনের ভিত উঁচু করা, পাথর ভাঙা, স্লিপারের জন্য গাছ কাটা এবং মাপমতো স্লিপার কাটার পরিশ্রম—সব কাজেই দক্ষতা দেখিয়েছিল এই শ্রমিকরা। জঙ্গল মহলের এই আদিবাসীদের দিনরাতের পরিশ্রমের ফলে নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল রেললাইন পাতার কাজ। অবিভক্ত বাংলার পুরুলিয়া, মেদিনীপুর জেলা এবং বিহারের ছোটনাগপুর ও সাঁওতাল পরগনার আদি বাসিন্দা এই জনগোষ্ঠী শুধু অত্যন্ত পরিশ্রমীই নয়, এরা কখনও মিথ্যে বলে না, ভিক্ষা করে না, স্বাধীনচেতা হলেও বিনয়ী এবং নম্র। সর্বোপরি ঐতিহ্যপ্রিয়। খুব বিপাকে না পড়লে এরা কখনও ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়ে না। ব্রিটিশরা মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা আর বিহার থেকে আইনের নানা মারপ্যাঁচে আদিবাসীদের জমি থেকে উৎখাত করেছিল। কোল বিদ্রোহ (১৮৩১), সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫), মুণ্ডা বিদ্রোহ (১৮৮৫)—এইসব বিদ্রোহের মধ্যেই এদের উৎখাত হওয়ার ইতিহাস পাওয়া যাবে। এই আদিবাসীদের কুলি হিসেবে নিয়ে আসা হয়েছিল সর্দার, আড়কাঠি আর স্থানীয় দালা—এই তিন প্রথায়। পাটশিল্পে, বস্ত্র শিল্পে

সিন্থেটিক শাড়ি বাতাসে বারবার বুকের ওপর থেকে সরে যাচ্ছে। পায়ে পরেছে সে হাওয়াই চপ্পল। তার কোমর চিকন। বক্ষ উন্নত।

জলপাইগুড়ি জেলায় শতকরা ৮০ শতাংশ চা শ্রমিকই আদিবাসী। এরা সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওঁরাও, হো, খেড়িয়া, অসুর, বরাইক, খাসি, মালপাহাড়ি, কোরোয় ইত্যাদি। পাশাপাশি আছে নেপালিরাও। আছে মাহাতো, ওড়িয়ারাও। কিন্তু চা বাগানের কাজে রাভা, মেচ, গারো এবং টোটোদের দেখাই যায় না। সর্বাধিক শ্রমিক ওঁরাও উপজাতির। সাধারণ জনগোষ্ঠীর থেকে এই শ্রমিকরা একেবারেই আলাদা। চা বাগানের মাঝেই এদের বেড়ে ওঠা। মানে জন্ম কর্ম বিয়ে সন্তান প্রতিপালন নাচ গান সবই বাগানের নির্দিষ্ট এলাকায় সীমাবদ্ধ। মহিলা শ্রমিকরা সারাজীবনই দিনমজুর। বৈদার, সর্দার, দফাদার, চাপরাশি, মুন্সি এসব পদ যেন মেয়েদের জন্য নয়। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে মেয়েরা পুরুষদের পাশে থাকলেও নেতৃত্বে নেই। অথচ ৫০ শতাংশ শ্রমিকই মহিলা। ১৯৮০ সালে পুরুষ শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৩.৭২ লাখ, স্ত্রী শ্রমিকের সংখ্যা ৩.৮৪ লাখ। দু-একজন মহিলা কিছুদূর উঠলেও দ্বিতীয় বা প্রথম সারিতে উঠে আসার সুযোগ পায়নি। চা বাগান এলাকায় মহিলা শ্রমিকদের বাচ্চা রেখে কাজ করার জন্য যে সুবিধাটুকু দেওয়া দরকার, সেই ক্রেশ পর্যন্ত বহু বাগানেই নেই। মেয়েদের আলাদা শৌচাগারও নেই। ১৮৫৬ থেকে ১৯৭৬ পর্যন্ত চা শিল্পে মেয়ে শ্রমিকদের মজুরি পুরুষদের তুলনায় অনেক কম ছিল। ১৯৭৬ সালে কেন্দ্রীয় সরকার সম মজুরি আইন চালু করে। আর ১৯৬২ সালে চালু হয় মেয়েদের জন্য মাতৃত্বকালীন সুযোগ-সুবিধা। পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে এধরনের অসাম্যে অবস্থা কেমন দাঁড়িয়েছিল যে শুধুই পাতা তোলা মানে গতরে খাটাটুকুই যেন মেয়েদের কাজ। তবে পণপ্রথা নেই। উল্টে বরপণ চালু আছে। মেয়েরা নিজেদের ইচ্ছেমতো বিয়ে করতে পারে। ডিভোর্সও। বিবাহ বিচ্ছেদ করলে বরপণের টাকাটা ফেরত দিতে হয়। যতবার খুশি বিবাহ বিচ্ছেদ, পুনর্বিবাহ করতে পারে।

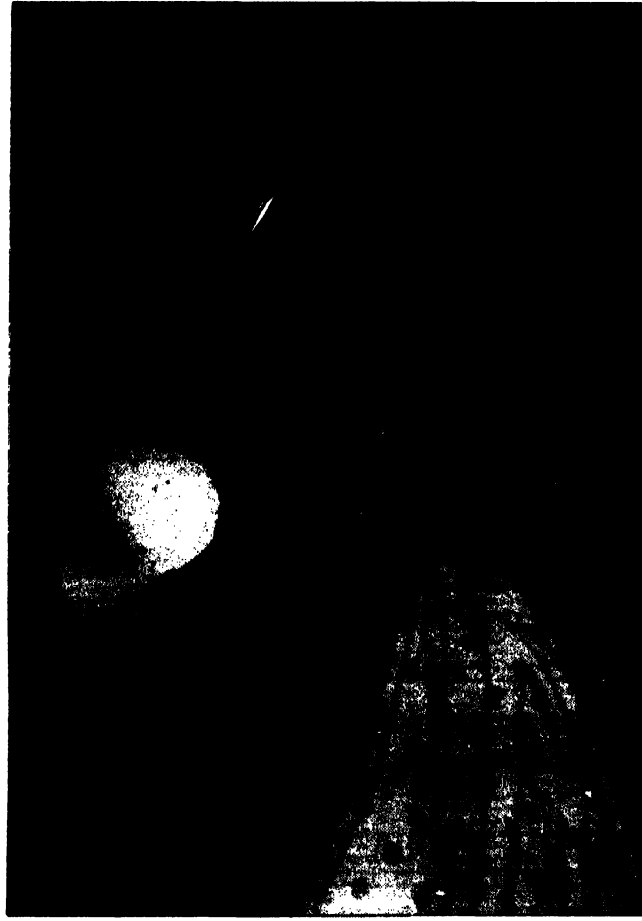
সরল এবং বিভ্রান্ত আদিবাসীরা ভুটানে তথা ডুয়ার্সে জোঁকের বীভৎস উপদ্রব, সাপের কামড়, বুনো মোষের গুঁতো, আমাশয়, রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার, হাতির আক্রমণ, বছরভর বৃষ্টি হাওয়ায় জেরবার হল। খাঁচায় বন্দী পশুর যে দশা হয়, অবিকল সেই দশায় জীবন কাটাতে লাগল সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওঁরাওদের। এ সময় বহু সাহেবকেও বাঘের মুখে পড়তে হয়। বার্নিশ ঘাট পেরোতে গিয়েও জলে পড়ে মারা যান বহু সাহেব, শ্রমিক।

যাই হোক, চা বাগিচায় সোনার ফসল ফলতে লাগল। পাশাপাশি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ওপর পীড়ন বাড়তেই লাগল। মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের সঙ্গে আদিবাসী রমণীর ওপর ভোগলালসা চরিতার্থ করার প্রবণতা ক্রমেই বাড়তে লাগল সাহেবদের মধ্যে। 'কুলি রমণীরা' ছিল সাহেব এবং তাদের সাঙ্গপাঙ্গদের যৌনলিপ্সা মেটানোর সামগ্রী। কুলি তথা মজুরদের এক বাগানের কাজ ছেড়ে অন্য বাগানে কাজে যাওয়ার উপায় ছিল না। বাইরের কোনও কুলি লাইনের লোক অন্য কুলি লাইনে ঢুকতে পারত না। এই কুলিদের এক কামরার খুপরিতে গাদিয়ে রাখা হত। মা, বাবা, ভাই, বোন, শালা, শালি, বৌ সব একসঙ্গে। কুলি লাইন পাহারা দিত চৌকিদার। ভাঙা বেড়ার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখত সব ঠিক আছে কিনা। দিনের গুনতির সঙ্গে রাতের গুনতি মেলে কিনা। মেয়েদের গুনতি প্রায়ই মিলত না। সাহেব আর আড়কাঠিদের যৌনলালসার বলি হত তারা, ফলে চৌকিদারের হিসেবে সব ঠিক হ্যায়। গুনতিতে পুরুষ কমে গেলে সাইরেন বাজত। ছোটাছুটি শুরু হত। এই করে অবশ্য আদিবাসীদের ঐতিহ্যলালিত সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকে কেড়ে নেওয়া যায়নি। আর তা কেড়ে নেওয়া যায়নি বলেই ধীরে ধীরে নিজেদের দাবি আদায়ের প্রতি মরিয়া হয়ে উঠেছে আদিবাসী শ্রমিকগোষ্ঠী।

১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ সালে ডুয়ার্সের বাগিচা অঞ্চলে জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছিল চার গুণ। তুলনায় শ্রমিকদের আয় বেড়েছিল মাত্র দু গুণ। ১৯৪২ সালে ডুয়ার্সে বহু বাগানের মুনাফার হার ছিল ১৩৫ শতাংশ থেকে ২০০ শতাংশ পর্যন্ত। ১৯৪৫-৪৬ সালে চা শ্রমিকদের চাল কমিয়ে দিয়ে গম ও গমজাত দ্রব্য সামগ্রীর পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়। এসময় বস্ত্র সঙ্কট এতই তীব্র হয়ে পড়েছিল যে কাপড়ের অভাবে অনেক নারী শ্রমিককে এসময় চট দিয়ে লজ্জা নিবারণ করতে হয়েছিল। এ কথা ইন্ডিয়ান টি প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের ১৯৪৫ সালের বার্ষিক রিপোর্টেও আছে।

মুলক্‌রাজ আনন্দের লেখায় আছে, "চা-বাগান এক অদ্ভুত কারাগার ভাই, এর দরজা জানালায় একটিও সিক নেই ভাই, একটিও খিল নেই, কিন্তু এই জেল ভেঙে পালাবারও কোনও উপায় নেই। সমস্ত চা বাগান ঘিরে চৌকিদার পাহারা দিচ্ছে, তুমি যদি লুকিয়ে পালাবার চেষ্টা কর, ধরে নিয়ে আসবে। সেদিন সাঁওতাল পাড়া থেকে বুঙ্গি মাঝি বলে একটা ছোট ছেলে পালিয়ে যায়, বেচারা ভেবেছিল,

জলপাইগুড়ি জেলায় শতকরা ৮০ শতাংশ চা শ্রমিকই আদিবাসী। এরা সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওঁরাও, হো, খেড়িয়া, অসুর, বরাইক, খাসি, মালপাহাড়ি, কোরোয় ইত্যাদি। পাশাপাশি আছে নেপালিরাও। আছে মাহাতো, ওড়িয়ারাও। কিন্তু চা বাগানের কাজে রাভা, মেচ, গারো এবং টোটোদের দেখাই যায় না। সর্বাধিক শ্রমিক ওঁরাও উপজাতির। সাধারণ জনগোষ্ঠীর থেকে এই শ্রমিকরা একেবারেই আলাদা। চা বাগানের মাঝেই এদের বেড়ে ওঠা। মানে জন্ম কর্ম বিয়ে সন্তান প্রতিপালন নাচ গান সবই বাগানের নির্দিষ্ট এলাকায় সীমাবদ্ধ।



জলপাইগুড়ির আদিবাসী মহিলা *ছবি : শৌভিক ঘোষ*

হেঁটে রাঁচির পাহাড়ে তার মা-র কাছে চলে যাবে......চৌকিদার মারতে মারতে তাকে ধরে নিয়ে এল।...সারারাত ধরে লণ্ঠন নিয়ে চৌকিদাররা পাড়া পাড়া ঘুরে বেড়ায়, প্রত্যেক ঘরে উঁকি মেরে দেখে, সাড়া নেয়। ঘরে আছে কি না?"

রামকুমার বিদ্যারত্নের 'কুলিকাহিনী' থেকে দুটো অংশ তুলে ধরছি :

"ব্র্যাণ্ডি ব্র্যাণ্ডি শ্যাম্পেন শ্যাম্পেন" এই বলিয়া সাহেব চা-করেরা সভার পার্শ্বস্থ বৃহৎ গৃহে প্রবেশ করিল। এখানে সভ্য মহোদয়দিগের আহারীয় প্রস্তুত ছিল, কেহ রীতিমত আহারে বসিয়া গেল, আর কেহ কেহ দণ্ডায়মান হইয়া মুখে ব্র্যাণ্ডি ঢালিতে লাগিল, কেহ মাতাল হইয়া খানসামাকে ঘুসি, চাকরকে লাথি মারিয়া বীরত্ব প্রকাশ করিল, কেহ মাথার টুপি, কেহ হস্তের যষ্টি, এদিকে ওদিকে ফেলিয়া রসিকতা দেখাইতে লাগিল, কেহ কেহ গ্লাস ও প্লেট ভাঙিয়া ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ আরম্ভ করিল। আহারাদীয় দ্রব্যাদি চতুর্দিকে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। সংগীতের রবে, নৃত্যের ধপাধপ্ শব্দে আর মাতলামির অস্পষ্ট ধ্বনিতে এই ঘরটি এক নতুন আকার ধারণ করিল। ইহাদের মধ্যে অনেকেই মদের নেশায় ভোর হইয়া কেহ টেবিলে, কেহ চেয়ারে, কেহ বা আর আর স্থানে চাল-চিত্তির হইয়া পড়িল; বড়োদিনের আমোদ শেষ হইল। যাহারা সজ্ঞানে ছিল, তাহারা বগি হাঁকাইয়া স্ব স্ব বাসস্থানে প্রস্থান করিল।"

[২]

"কৃতার্থের এখন ভরপুর যৌবন। সে দেখিতে সুশ্রী ও লাবণ্যবতী, তাহাকে যে দেখিত সেই না ভালোবাসিয়া থাকিতে পারিত না। একদিন সে কাজ করিতেছিল, এমন সময় বাগিচার বড় সাহেব তাহাকে দেখিতে পাইলেন এবং নানাপ্রকার প্রলোভন দেখাইতে লাগিলেন ; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইতে পারিলেন না।...

অনেক ভাবনা চিন্তার পর বড় সাহেব স্থির করিলেন, এই বাগিচার মধ্যে এই নিয়ম প্রচার করিতে হইবে যে, কুলিদের মধ্যে কেহই অবিবাহিত থাকিতে পারিবে না। এই হুকুম যে অমান্য করিবে, তাহাকে এক সপ্তাহ ফাটক ঘরে বাস করিতে হইবে। বড় সাহেব তৎক্ষণাৎ এক খণ্ড কাগজে এই নিয়মটি লিপিবদ্ধ করিয়া কুলিদিগের মধ্যে প্রচার করিয়া দিলেন এবং তাঁহার প্রিয় বাবু সর্দারকে ডাকিয়া বলিলেন, 'ড্যাখ রাটু, টুই আডরমনির মেয়ে কৃটার্ঠকে বিয়ে কর, অর্থাৎ টোর ঘরে লইয়া যা, টারপর টোর ভাবনা কি, টোকে টার খরপোষ জোগাটে হবে না, সে আমার বাংলোয় ঠাকিবে। যেডিন টুই কৃটার্ঠকে আমার বাংলোয় লইয়া আসিবি, সেই ডিন টুই কুড়ি টাকা পুরস্কার পাবি। আর বিবাহের খরচা স্বরূপ টোকে আজ ডশ্ টাকা দিলাম। যে প্রকারে হউক কৃটার্ঠকে আনা চাই। টাকার জন্য ভাববি না।' এই বলিয়া বেত সাহেব পকেট হইতে বাহির করিয়া বাবু সর্দারের হস্তে দশটি টাকা দিলেন।"

আমি উত্তরবঙ্গের এই আদিবাসী সমাজেরই একজন। বাবা হাসিমারার সাতালি চা বাগিচার শ্রমিক ছিলেন। খুব ছোটবেলায়, ৬-৭ মাস যখন বয়স আমার, তখন মা মারা যান। বাবা আমাকে পিঠে বেঁধেই চায়ের পাতা তুলতেন। আনন্দের সমবেত নাচ-গান আছে, শিশু-কিশোরদের জন্য রূপকথাও আছে আর আছে করম কাহিনী, আদি পিতামহ-পিতামহীদের নিয়ে লোকপুরাণ। আছে কিংবদন্তি, নীতিকথা, ব্রতকথা।

বিশের-ত্রিশের দশকে চা বাগানে ছিল মধ্যযুগীয় শাসন। কালো স্বদেশি শ্রমিক আর সাদা বিদেশি মালিকের সম্পর্ক ছিল দাস ও মনিবের। ডেসার্টার অর্থাৎ 'পলায়নকারী' বিশেষণ চাপিয়ে চা শ্রমিকদের গুলি করে মারার অধিকার ছিল সাহেবদের। বাগান ছাড়ার চেষ্টা করলেই গুলি খাওয়ার ঝুঁকি ছিল। ওয়ার্কম্যানস ব্রিচ অফ কনট্র্যাক্ট অ্যাক্ট (১৯২৫) এবং ইনডেনচার সিস্টেম অফ লেবার (১৯১৫) এই দুই আইনকে কাজে লাগিয়ে শ্রমিককে ক্রীতদাস করে রাখা হত দশকের পর দশক ধরে। সাহেবদের বউরা মানে মেমসাহেবরা শ্রমিকদের শরীরকে গুলির নিশানা তৈরির চাঁদমারিও নাকি করতেন!

ক্রীতদাস করে রাখা হলেও চা-শ্রমিকদের মধ্যে ভেতরে ভেতরে লড়াইয়ের তৎপরতা তৈরি হচ্ছিল। তার প্রমাণ মেলে ১৮৯৫ সালের এক ব্রিটিশ সরকারি রিপোর্টে। সেখানে বলা হল, 'ডুয়ার্সের চা-মজুররা ক্রমেই তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠছে, তারা মাঝে মাঝেই নিজেদের খেয়াল খুশিমত কাজকর্ম চালাচ্ছে, ম্যানেজার-সর্দার-বইদার কাউকেই মানছে না। এই চা-মজুর তথা কুলিরা কখনও কখনও বাগান কীভাবে চলবে, সেই ভূমিকায় চলে যাচ্ছে। একদল চা-মজুর অন্য মজুরদের কাজ না করার প্ররোচনা দিচ্ছে। গোষ্ঠী গড়ে উঠছে। সঞ্জীবনী পত্রিকার সম্পাদক দ্বারকানাথ

গঙ্গোপাধ্যায় এসময় চা শ্রমিকদের দুঃখ-দুর্দশা দেখতে যেতেন, তিনি ছিলেন এঁদের অবলা-বান্ধব। শ্রমিকদের সংগঠিত ইউনিয়ন ছিল না ঠিকই, ছিল না কোনও পরিকল্পনামাফিক আন্দোলনও। কিন্তু 'কুলিরা' বোঝাতে শুরু করে দিয়েছিল তারা কারও কেনা দাসদাসী নয়, জন্তু জানোয়ার নয়, পণ্য নয়। তারা মজুর, শ্রম বা মেহনত বেচে খায়। চা শ্রমিকদের মধ্যে জেগে ওঠা এই প্রতিবাদী মানসিকতাকে এগিয়ে নিয়ে যায় মূলত মেয়ে শ্রমিকরাই। মহিলাদের শ্লীলতাহানির এক ঘটনার প্রতিবাদ করতে গিয়ে নারী শ্রমিকরা প্রথমে এক বাগানের মালিক সাহেবকে পিটিয়ে মারে। কোদালের বাঁট দিয়ে মাথা থেঁতলে দেয়। গায়ে থুথু ছিটোয়। মৃত সাহেবের সারা শরীর জুড়ে প্রস্রাবও করে তারা।

গত শতাব্দীতে 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল একজন 'আদর্শ চা-কর' কেমন হওয়া উচিত তার মডেল। ইংরেজ বাগিচা মালিক মিঃ শেমম্যানকে সেই মডেল হিসেবে দেখানো হয়েছিল। কেমন ছিলেন কুখ্যাত শেমম্যান? ইনি ছিলেন চা-কুলি নির্যাতনে সিদ্ধহস্ত। চাবুক মেরে কুলি হত্যায় দক্ষ। কুলিদের পরিবারের সম্ভ্রম তছনছ করা এবং মেয়ে কুলিদের সম্ভোগে কৃতী। বেয়াড়া কুলিদের রাতের অন্ধকারে শ্বাপদসঙ্কুল জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে আসতে পারদর্শী। ইংরেজ চা-বাগান মালিক, ম্যানেজাররা এই শেমম্যানকেই আদর্শ ভাবতেন। অনুসরণ করতেন। শেমম্যানের পথ ধরেই কোনও কোনও বাগান ম্যানেজার থানার পুলিস, দারোগাদের কান ধরে ওঠবোস করাতেন। ট্রেড ইউনিয়ন নেতা সৈফুদ্দিন লিখছেন, "সেটা ছিল ১৯৪৫ সাল। রেল শ্রমিকদের আন্দোলন তখন তুঙ্গে। রেল শ্রমিকরা কীভাবে রেলের ম্যানেজার ও দালালদের শায়েস্তা করছে, সে কথা চা বাগানের ধূড়ায় ধূড়ায় আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়েছে। রেলের বিদেশি সাহেব ইঞ্জিনিয়ারকে এদেশের ফায়ারম্যান শ্রমিকরা ইঞ্জিনের আগুনের মধ্যে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে। দালালদের ঠেঙিয়ে বিষ ঝেড়ে দিয়েছে। শ্রমিকদের ন্যায্য দাবিদাওয়া না মানলে রেলের চাকা বন্ধ করে দিয়েছে। এমন সব সংগ্রামের গল্প চা বাগানের মজুর ও তাঁদের পরিবারের মধ্যে প্রচণ্ড শিহরন জাগায়। বাগানে বাগানে মজুররাই সে কথা প্রচার করে বেড়িয়েছে। চা শ্রমিকদের ছেলে-মেয়েরা মাকে প্রশ্ন করেছে, মাগো এমন হয়? ম্যানেজার সাহেবদের এরকম ঘেরাও করলে, মারপিট করবে না? হপ্তা মজুরি কেটে নেবে না, বাগানের বাইরে বের করে দেবে না?

এসব প্রশ্নের উত্তর চা-শ্রমিকরা নিজেরাই খুঁজে বের করে নিয়েছে। লড়াই করলে সাহেব বাগান ম্যানেজার, বদ বড়বাবুদের শায়েস্তা করা যায় সে-সাহস জোগায় রেল শ্রমিকদের লড়াই-ই। লাল ঝান্ডা ইউনিয়ন। দেখা গেল, বাঁশের মাথায় একটুকরো লাল কাপড় বেঁধে একদল আদিবাসী নারী-পুরুষ চা-মজুর বস্তিতে বস্তিতে ঘুরছে। রেশনের দাবি, মজুরি বাড়ানোর দাবি, চিকিৎসার দাবি, কোয়ার্টারের দাবিতে তারা সোচ্চার আওয়াজ তুলছে। কিছু লোক আবার ধূড়া ছেড়ে পাহাড়ি ঝোপজঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছে, তাক করে বসে আছে সাহেব বা ম্যানেজার রাস্তা দিয়ে গেলে ওখানেই তাকে ঘেরাও করে দেবে। দাবি পূরণের জন্য ওয়াদা আদায় করে নেবে। না হলে কোদাল, হাঁসুয়া দিয়ে মাথা ফাটিয়ে দেবে। ......আদিবাসী চা-মজুর শ্রমিক নেতা হয়ে উঠতে থাকল। কিন্তু বক্তৃতা দিতে গিয়েই যত গোল বাধলো 'ভাই বহিনমনে মোর গোটেক আপত্তি হৈক, সেকের বাদ, সেকের বাদ' ......কথা আর শেষ করে উঠতে পারেন না। মেয়েরা সব খিলখিল করে হেসে উঠতে বলতে থাকেন, 'বাত বাতি বাতিয়ায়েক ঢং নখে, লিডর বনলক্......' (কথা বলার ঢং জানে না, আবার নেতা বনেছে)।

একসময় বাগান-মালিক-ম্যানেজার-সাহেবদের নির্যাতনের বদলা নিতে শ্রমিকরা আর কোনও রাস্তা না পেয়ে চা গাছ কেটে সাফ করত। সেটাই ছিল রাগ দেখানোর একমাত্র উপায়। খ্রিস্টান মিশনারিদের আমদানি করে এদের বাগে আনার চেষ্টা চলে। পরে এই শ্রমিকরাই ধাপে ধাপে নানা ধরনের বিদ্রোহ করেছে।

> **শ্রমিকদের সংগঠিত ইউনিয়ন ছিল না ঠিকই, ছিল না কোনও পরিকল্পনামাফিক আন্দোলনও। কিন্তু 'কুলিরা' বোঝাতে শুরু করে দিয়েছিল তারা কারও কেনা দাসদাসী নয়, জন্তু জানোয়ার নয়, পণ্য নয়। তারা মজুর, শ্রম বা মেহনত বেচে খায়। চা শ্রমিকদের মধ্যে জেগে ওঠা এই প্রতিবাদী মানসিকতাকে এগিয়ে নিয়ে যায় মূলত মেয়ে শ্রমিকরাই।**

১৯০৬ সালে ডুয়ার্সের চা-শ্রমিকরা এক গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন করেছিল। সেই আন্দোলনের নাম 'চাল আন্দোলন'। বেশি হারে চাল না দিলে কাজ বন্ধ করে দেওয়া হবে, এই ছিল দাবি। সাঁওতাল, ওঁরাও, মুণ্ডারা এই আন্দোলনের প্রথম সারিতে ছিল। এই বছরেই আলিপুরদুয়ারের কাছে এক চা বাগানে বিদ্রোহী চা-শ্রমিকরা বাগানের চতুর্দিকে কাঁচাপাতা ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলে দিয়েছিল। ম্যানেজারদের বাংলো ও চা গুদামের কাচের দরজা, জানালা ভেঙেছিল। পুলিস আমদানি করে আন্দোলনের মোকাবিলা করতে হয়েছিল ইংরেজদের। ১৯১৬ সালে উত্তরবঙ্গের চা-মজুররা 'টানা ভগত আন্দোলন' নামে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলনও করেছিল। মূলত চা বাগান শ্রমিকদের বন্দিদশা থেকে উদ্ধারের আন্দোলন ছিল এটি। এই আন্দোলন যদিও শেষপর্যন্ত জমিদার, মহাজন এবং ব্রিটিশ প্রশাসনের অধীনতা থেকে মুক্তির আন্দোলনেই পর্যবসিত হয়েছিল। এ সময় মালিকদের বাগিচা সংস্থার রিপোর্টে আছে, টানা ভগত আন্দোলন পরিষ্কার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এক 'দেশদ্রোহী' আন্দোলন। একের পর এক এরকম বহু আন্দোলনই হয়েছে। ১৯৫৫ সালে দু লাখ শ্রমিক লাগাতার ধর্মঘটে শামিল হয়েছিল পাহাড়, তরাইয়ে।



জলপাইগুড়ি জেলার আদিবাসী তরুণী। *ছবি : শৌভিক ঘোষ*

তেভাগা, নকশালবাড়ি আন্দোলনের প্রভাব পড়েছিল চা বাগানের শ্রমিকদের ওপর।

তেভাগার সময় 'স্বাধীনতা' পত্রিকার সাংবাদিক ননী ভৌমিক ডুয়ার্সে এসেছিলেন। সে সময় পটল ওরফে দেবপ্রসাদ ঘোষ এবং ননী ভৌমিক গ্রেপ্তারও হয়েছিলেন।

ডুয়ার্সে গণ-আন্দোলনের সূত্রপাত হয় মূলত রেল শ্রমিকদের লড়াইয়ের মাধ্যমেই। ১৯৩৮ সালে রেল শ্রমিকদের বেঙ্গল আসাম রেল রোড ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন গঠন হয়। পরে জ্যোতি বসুর কাঁচরাপাড়ার রেল ইউনিয়নকেও এর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল। দেবপ্রসাদ (পটল) ঘোষ গ্যাংম্যান, পয়েন্টসম্যানদের কোয়ার্টার্সে ঘুরে ঘুরে রেল শ্রমিকদের সংগঠিত করতেন। এই গ্যাংম্যান, পয়েন্টসম্যানদের মারফত রেল লাগোয়া এলাকার চা বাগানগুলোতে চা শ্রমিকদের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তুলেছিলেন গোপনে। এই রেল শ্রমিকদের সাহায্যেই ডুয়ার্সে চা শ্রমিকদের সংগঠিত করার কাজ শুরু করেছিল কমিউনিস্ট পার্টি। ১৯৪৫ সালে ডুয়ার্সের মালবাজার ডাকবাংলোর ময়দানে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে এক বিশাল প্রকাশ্য সম্মেলনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় চা-শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন করা হয়েছিল। ওই ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন দেবপ্রসাদ (পটল) ঘোষ এবং সভাপতি রতনলাল ব্রাহ্মণ। এই পর্বে রাতের অন্ধকারে জঙ্গলের পথ হেঁটে শ্রমিকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন পটল ঘোষ, ননী ভট্টাচার্য, অনিল গুপ্ত প্রমুখরা। চা শ্রমিকদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে এঁদের অবদানের পাশাপাশি এল এম প্রধান, পরিমল মিত্র, মনোরঞ্জন রায়, বীরেন দাশগুপ্ত, দেবেন সরকার, ঘনশ্যাম মিশ্রদের অবদানও কম নয়। রেল শ্রমিকদের আন্দোলন, কৃষক বিদ্রোহ তথা তেভাগা আন্দোলনে এ সময় প্রচুর চা শ্রমিকও ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তেভাগা আন্দোলনের শহিদদের তালিকায় এঁদের নাম আছে। যেমন হপনা মাঝি, বুধু খাড়িয়া, কৃষ্ণা ওঁরাও,এতোয়া ওঁরাও, রামু মুণ্ডা, বিরসা ওঁরাও, চামড়া ওঁরাও, বেচগাঁ খাড়িয়া, লোধরা বুড়া, সহরাই মুণ্ডা, করমি ওঁরাওনি, স্বর্ণময়ী ওঁরাওনি।

১৯৪৬ সালে ডুয়ার্স চা বাগান ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা হয়। ননী ভট্টাচার্য, এ এইচ বেস্টারউইচ, সুরেশ তালুকদার প্রমুখ ছিলেন নেতৃত্বে। বেস্টারউইচকে সবাই কালো সাহেব হিসেবে চিনতেন। দারুণ ইংরেজি বলতেন বেস্টারউইচ। এজন্য সাহেবরাও ওঁকে ভয় পেতেন। আদালতে যাঁরা কাজকর্মে আসতেন, তাঁদের ইংরেজি লেখাজোখার কাজ নিখরচায় করে দিতেন উনি। এই পর্বেও বাইরের লোকেদের চা বাগানে ঢোকা নিষেধ ছিল। তাই হাটে হাটে গিয়ে ম্যাজিক দেখানো শুরু করলেন তিনি। হাতও দেখতেন। সহযোগী সুযেণ মিত্র, খোকা ঘোষ চোঙা ফুঁকে শ্রমিকদের মনোযোগ আকর্ষণ করতেন। ননী ভট্টাচার্য গান ধরতেন। নাথানিয়েল মুর্মু হারমোনিয়াম বাজাতেন। শ্রমিকদের মোহাবিষ্ট করে তাঁদের হাত দেখতে দেখতে বেস্টারউইচ সাহেব বলতেন, 'তোমার তো ভাই সামনে বড় বিপদ। তুমি এক কাজ কর, অমুক দিন তমুক গাছের নিচে এস, তমুক ঘাটে এস—আমি দেখব কী করে তোমার ফাঁড়া কাটানো যায়। এভাবে শ্রমিকদের গোপন এলাকায় ডেকে ডেকে সাহেবদের শোষণের বিরুদ্ধে সংগঠিত করে গেছেন বেস্টারউইচ। পাশাপাশি তৈরি করেছিলেন গম্ভীর সিং রাউতিয়া, বিরুয়া মহলি, বিতনা মহলি প্রমুখদের। এ সময়ের অন্য উল্লেখযোগ্য নেতারা হলেন : জন আর্থার বাখলা, ফাগু ওঁরাও, মোহন ওঁরাও, মহম্মদ জাহাঙ্গীর, আয়েতা সিং গুরুং।

এবার ফের একটু চায়ের কথায় আসি। চা গাছের বোটানিকাল নাম ক্যামেলিয়া সিনেনসিস। খ্রিস্টপূর্ব ২৭৩৭ সালে চীন দেশে প্রথম চায়ের প্রচলন। চীনা রূপকথায় আছে সম্রাট শেন নুং-এর আমলেই চীন দেশে প্রথম চায়ের ব্যবহার হয়। চীনা দার্শনিক কনফুসিয়াসের কবিতায় পিপাসার্তকে চা দেওয়ার কথা আছে। ৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে চায়ের ওপর প্রথম কর বসে চীনে। ইতিহাসে সেই প্রথম চায়ের ওপর কর। চীনের চিকিৎসক অধ্যাপক লন ফুকিং বছর ১১ আগে জানিয়েছেন, 'চা পান করলে হৃদপিণ্ডের কিছু রোগকে এড়াতে পারবেন।' ১৯২৩ সালে আমেরিকার আর্মি সার্জন মেজর জে জি ম্যাকনট এক গবেষণাপত্রে বলেছিলেন, চা টাইফয়েডের জীবাণু ধ্বংস করে। ৪ ঘণ্টায় অধিকাংশকেই মেরে ফেলে। ২০ ঘণ্টা পরে জীবাণুর অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যায় না। এছাড়া চায়ের ক্যাফিন মূত্রবর্ধক। সম পরিমাণ জলপানের তুলনায় ৫০ ভাগ বেশি।

চায়ে যে ক্যাফিন থাকে, তা হৃদযন্ত্রকে উত্তেজিত ও উজ্জীবিত করে। ক্যাফিন কুঁড়িতে থাকে ৪.৭ শতাংশ। প্রথম পাতায় ৪.২ শতাংশ। দ্বিতীয় পাতায় ৩.৫ শতাংশ। তৃতীয় পাতায় ২.৯ শতাংশ। কাণ্ডের ওপরের অংশে ২.৫ শতাংশ। পরবর্তী অংশে ১.৪ শতাংশ।

কুঁড়ি এবং প্রথম দুটি পাতায় ক্যাফিনের পরিমাণ বেশি থাকে বলে দুটি পাতা, একটি কুঁড়ি দিয়ে চা পাতা বানানোর ঐতিহ্য। এক কাপ চায়ে ৫৮ মিলিগ্রাম ক্যাফিন থাকে। বাড়িতে যে চা খাই আমরা, সেই কাপে ক্যাফিন থাকে ২৫ মিলিগ্রামের মতো।

চা হচ্ছে এমন একটা শিল্প, যার এক কণাও অবিক্রীত পড়ে থাকে না।

ছেঁটে না দিলে চা গাছ আম, জাম গাছের মতো উঁচু হতে পারে।

৫০ বছর বয়স হলে চা গাছ বুড়ো হয়ে যায়, পাতা দিতে পারে না।

চা বাগানে শিরীষ গাছের ছায়ায় হাট মানেই হাঁড়িয়া, রকসি, ছাং, মোড়গ লড়াই। আর হাটের বাসে উঠলেই আপনি শুনতে পাবেন এ ধরনের ভাষার আদান-প্রদান :

বাংলা

আজ বুধবার। আজ আমরা নিমতিঝোরা হাটে যাবো। জিনিসপত্র কিনবো।

সাদরি

আইজ বুধদিন। আইজ হামরে মন নিমতি হাটমে যাব। আউর জিনিস মারে কিনব।

নেপালি

আজ অ বুধবার হো। আজি হামিহরু বাজার-মা যাঙ্ছৌ। সামান হরু কিনছৌ।

কুরুখ / ওঁরাও

ইয়া বুধ। ইয়া নিমতি হাট কাওন আউর জিনিস খেন্দত।

রাভা

তিং বুধবার। তিং নিং নিমতিঝোরা হেটিসাং লইয়া হাজামতি পরইয়া।

মুণ্ডা

তিং সিং বুধবার। আলে টিসিং নিমতিঝোরা হাট সিনহালে সওদাকে কিরিং আলে।

মেচ বা বোড়ো

দিনেই বুধবার। দিনেই জৌং নিমতিঝোরা হাটাইয়াউ থাংলাই জিরাট ফর বাই নেই।

অসুর

টিহিনক বুধদিন। টিহিনক নিমতিঝোরা হাট সিনিং। লিয়ার জিনিস ফিরিং।

ছোটবেলা থেকে যে পরিবেশে বড় হয়েছি, তাতে খাড়িয়া, ওঁরাও, লিম্বু, লেপচা, মুণ্ডা, লোহার, মহলি, নেপালি, টোটো, মেচ, রাভা সব সংস্কৃতিরই অন্দর বাইরের খবর পেয়েছি। যেমন খাড়িয়া সমাজের কথা বলি : খাড়িয়া সমাজ পুরুষ প্রধান। এই সমাজে পিতাই ঘরের মালিক, সম্পত্তিরও। সন্তানরা পিতার গোত্র পায়। স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তি ভোগ করতে পারে। তবে ছেলে বা ছেলেরাই সম্পত্তির উত্তরাধিকার পায়। ছেলে না থাকলে এই সমাজে 'ঘর দামাদ' মানে ঘরজামাই রাখা যায়। পরে সেই ঘরজামাই-ই সম্পত্তির মালিক হয়। অন্যান্য ক্ষেত্রে মেয়েদের মর্যাদা যদিও পুরুষদের সমান সমানই। মেয়েরা শস্য বপন করতে পারে, শস্য কাটতেও পারে। এদের মেয়েরা ছেলেদের ধনুক বা শিকারের হাতিয়ার ছুঁতে পারে না। গর্ভবতী মেয়েরা শবযাত্রায় অংশ নিতে পারে না। ফাগুয়া, খেদ লেতা, দশাই পূজা, সারনা পূজা (শাল গাছ পূজা), বন্ধই গরু পূজা করে। মেয়ে পুরুষ দলবদ্ধ হয়ে নাচে। বিয়েতে ছেলের বাবা মেয়েকে কেনে বারোটি গরুর বিনিময়ে। ডুয়াসের চা বাগানে ওঁরাওদের সংখ্যাধিক্য। অন্য আদিবাসীদের মতো ওঁরাওরাও শক্তির উপাসক। এরা নিজেদের ধর্মকে 'সারনা' বলে। খুঁটি পুঁতে বংশ-পুজো করে এরা। ৫ বা ৭ পুরুষের পুজো করে খুঁটিতে দাগ কেটে। এ সময় ভেড়া, পাঁঠা, মুরগি বলি দেওয়া হয়। এছাড়া শুভ, অশুভ যে কোনও কাজের আগে ভাগকাটি (দণ্ডকাটনা) পুজো করে। দেওয়ালির সময় এরা গোয়ালি পুজো করে। এদের মুখ্য উৎসবের মধ্যে আছে নাওয়াখানি (নবান্ন), করম, সারহুল, জিতিয়া। যে কোনও উৎসবের মাসখানেক আগে থেকে মাদলের দ্রিমি দ্রিমি শব্দে এবং সমবেত নাচের মধ্য দিয়ে উৎসব আসছে আঁচ করা যেত। দুর্গাপুজো পর্বে সব চা বাগানেই সাহেবরা এই নাচ গানের উৎসব করাতেন, এজন্য টাকা পয়সাও দিতেন। এই নাচগান আদিবাসী সমাজে 'যাত্রা' হিসেবেই পরিচিত। এ সময়ের একটি গানে আছে, রাত দিন বৃষ্টি বাদলের মধ্যে কাজ করলাম, সাহেব তুমি বকশিস দিলে তোমার সুনাম হবে, না দিলে তোমারই বদনাম। সাদরিতে যেটা এরকম :

বাউদ বাউদ কামালো
পানি পানি কামালো
সাহেব দেবে কি নাহি
দেবে হোলে তোরে ভদা চলি
নি দেবে হোলে তোরে নিন্দা হবি...

এছাড়া আছে দেবীমাঈ, গাঁওদেওতি, বাঁকড়াবুড়িয়া, কালী, মনসা, শীতলা, মহাদেব ইত্যাদি। ওঁরাওদের মধ্যে আছে কাচ্ছপ বা এক্কা গোত্র। আর আছে মিনজ, টোপ্পো, টোপনো, খালখো, লাকড়া, তিরকি, আইনধ, কিনডো, খাখা, খেস। এই গোত্রগুলিই অনেকে পদবি লেখার ক্ষেত্রে ব্যবহার করে। এবার আসছি লোহারদের কথায়, এদেরও পুরুষ প্রধান সমাজ। তবে স্ত্রীদের ওপর অত্যাচার চলে না। জন্মের সাত দিন পর নবজাতকের মস্তক মুণ্ডন করা হয়। স্বজাতি, দ্বিজাতি বিবাহ চলে। মৃতদেহ কবর দেওয়া বা দাহ করা চলে। ডুয়ার্সে নাগেশিয়ারাও আছে। এরা কৃষিজীবী ছিল। এখন অধিকাংশই চা শ্রমিক। এরা সূর্যদেবের উপাসনা করে। পূর্বপুরুষের আত্মাকেও পুজো করে। আছে সাঁওতালরাও। এদের বারোটি গোত্র— হাঁসদা, কিসকু, হেমব্রম, মুর্মু, সোরেন, টুডু, বাস্কে ইত্যাদি। এদের প্রধান দেবতা মারাং বুরু। প্রতিটি উৎসব অনুষ্ঠানেই মারাং বুরুর পুজো করে এরা। নাচের সময় মেয়েরা ফুল দিয়ে সাজে। চাঁদনি রাতে এদের গোটা আদিবাসী সমাজের মাদলের টংকার মাতাল করে তোলে। আছে গারোরা। গারোদের পাঁচটি গোত্র। সাংমা, মারাক, মোমিন, আরাং, সিরা। গারো সমাজে ছেলে ও মেয়েদের গোত্র নাম আসে মায়েদের গোত্র থেকে। রাভা আদিবাসীদের মধ্যেও এটা রয়েছে। এদের বহু বিবাহে বাধা নেই। গারো চা শ্রমিক পাওয়া খুবই কঠিন। এরা মূলত ঝুম চাষ অভ্যস্ত ছিল। পরে কৃষিজীবী। আছে মেচরা। অসমে এরা বোড়ো, কাছারি হিসেবে অভিহিত। এরাও মূলত কৃষিনির্ভর। নৃত্যগীতের চর্চা এদের ঐতিহ্য। এদের বিয়ের সময় পান ভোজন আর নাচ গানে মুখরিত হয়ে ওঠে বিবাহ বাসর। এদের প্রধান দেবতা

বাঠো। অনেক মেচ-ই অবশ্য খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করেছে। আছে লিম্বুরা। চারুচন্দ্র সান্যাল লিখে গেছেন, লিম্বু এবং লেপচারা আসলে কোশী ও মেচি নদীর মধ্যবর্তী ভূখণ্ডের অতি প্রাচীন অধিবাসী। পরে এই লিম্বু ও লেপচারা সিকিমে বসবাস শুরু করে। সেই থেকে এঁরা সিকিমের আদিম অধিবাসী।

লিম্বুরা 'ওম্‌টাংগেরা-নিন্‌গুয়াফু-মং' দেবতাকে পুজো করে। ইনি পঞ্চভূতের দেবতা। লিম্বুরা শৈব ধর্মাবলম্বীও। কারণ এরা মহাদেব তথা কিরাতেশ্বরের পূজা করে এবং মহাদেবের জীবনসঙ্গিনী গৌরীরও পূজা করে।

লিম্বুদের বছর ফেব্রুয়ারি মাস থেকে শুরু হয়। লিম্বুরা গোরুর মাংস খায়। শুকর এবং মহিষের মাংসও। অধিকাংশই ভাত খায়। সবরকম পশু পাখিকে পুড়িয়ে খায় এরা। এই পোড়া মাংসের নাম 'টোটো ফুং'। জলে হাত-মুখ ধুয়েই এরা খেতে বসে যায়। খাবারে বসার ক্ষেত্রে জাতপাত মানে না। তবে ব্রাহ্মণ এবং ছেত্রীরা খেতে বসার আগে স্নান করে এবং বস্ত্র পরিবর্তন করে। রান্নার পর গোবরজল দিয়ে উনুন লেপে দেয়।

আছে সাঁওতালরাও। এদের বারোটি গোত্র— হাঁসদা, কিসকু, হেমব্রম, মুর্মু, সোরেন, টুডু, বাস্কে ইত্যাদি। এদের প্রধান দেবতা মারাং বুরু। প্রতিটি উৎসব অনুষ্ঠানেই মারাং বুরুর পুজো করে এরা। নাচের সময় মেয়েরা ফুল দিয়ে সাজে। চাঁদনি রাতে এদের তথা গোটা আদিবাসী সমাজের মাদলের টংকার মাতাল করে তোলে।

জাউ এদের মদ। জোয়ার, ভুট্টা জারিয়ে তৈরি করে। মদই লিম্বুদের সামাজিক উৎসবের প্রধান উপকরণ। এদের সব সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসবে নাচ প্রধান অঙ্গ। ধর্মীয় ব্যাপারে, বিয়েতে এরা 'কে ল্যাং' নৃত্য করে। কখনও নিকটাত্মীয়ার হাত ধরে নাচে না। শস্য মাড়াবার সময় 'যা-রেকসা' নাচ করে।

মানুষের মৃত্যুর পর কিছু অনুষ্ঠান লিম্বু ও মেচদের মধ্যে প্রায় একই রকম। মানুষের মৃত্যুর পর মৃতের উদ্দেশে শ্রাদ্ধের দিন বিগত আত্মার উদ্দেশে যা যা বলা হয়, লিম্বু ও মেচদের ক্ষেত্রে তা প্রায় একই রকম।

লিম্বুদের মতো মেচদেরও দেবদেবীর কোনও প্রতিমা নেই। কোনও মন্দির নেই। ধর্মীয় অনুষ্ঠানও একইরকম। লিম্বু ভাষায় আং হচ্ছে আমি। মেচ ভাষায়ও তাই। একইভাবে ছেলে হিনজা, ধান হল মাই।

মাঘী মেলা তথা মাই নদীর নাচ এঁদের খুব প্রিয়। অপদেবতাদের সন্তুষ্ট করতে লিম্বুদের মধ্যে একসময় সিংকি নৃত্যের প্রচলন ছিল। এই নাচের সাঙ্গে ঢ্যাংরো নামের ঢোল থাকত।

একই বাবা-মায়ের ছেলে-মেয়েরা কখনও এ ওর হাত ধরে নাচবে না। গানের শেষে হা হা শব্দ করে।

লিম্বুরা হাল, বলদ সহযোগে চাষ করে ধান, জোয়ার, ভুট্টা।

সব আদিবাসীদের জীবন-সংস্কৃতি তথা জীবন নিয়ে লিখতে গেলে একটা বিশাল জায়গা লেগে যাবে। এবার আসি টোটোদের কথায়। উত্তরবঙ্গ লাগোয়া ভুটান পাহাড়ের কোল ঘেঁষে ভারতের ক্ষুদ্রতম এই মানব প্রজাতির বাস। ওদের জনসংখ্যা এই মুহূর্তে ১১০০ বা তার কিছু বেশি। এরা মহিষ, প্যাঁচা, হরিণের মাংস খায়। মরা গরুর মাংস, পচা মাছও খায়। এক স্বামীর বহু স্ত্রী থাকতে পারে। কিন্তু স্ত্রীকুলের বহু পতি রাখার প্রথা নেই। এদের মদের নাম ইউ। চায়ের সঙ্গে এরা পান্তা ভাত মিশিয়ে খায়। পুজোর সময় যত জোরে সম্ভব চিৎকার করে। ওদের বিশ্বাস, ওভাবে চিৎকার করলে ভগবানের কানে পৌঁছনো যায়। সন্তানসম্ভবা না হওয়া পর্যন্ত কনেকে ছেলের বাড়িতে কাটাতে হয়, তারপরই বিয়ে।

আমি যে এলাকার বিধায়ক, সেই কালচিনির মধ্যেই পড়ে বকসা পাহাড়। সেখানে আছে ডুকপা নামে আদিবাসী। একসময় হয়তো ভুটানে ছিল। পরে ভুটান পাহাড়েরই লাগোয়া ভারতের দিকে চলে আসে। এদেরও বিচিত্র জীবন-সংস্কৃতি। ডুকপা সমাজে জন্মের ৩, ৫ কিংবা ১১ দিনের মাথায় নবজাতকের নামকরণ হয়। লামা বা বৌদ্ধ পুরোহিত নামকরণ করে থাকেন। ডুকপাদের ভাষার নাম লোকে। ভুটানিদের মতোই এদের ছেলেরা বখু পরে, মেয়েরা পরে কিরা। এরা বাবাকে বলে আপা, দাদাকে ফোগেন, দাঁতকে বলে সো। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাই ডুকপা সমাজের ভিত্তি। এরা মূলত বৌদ্ধধর্মাবলম্বী।

সবশেষে একটা কথা বলি, আদিবাসীরা বন, প্রাণী, মাটি, জল, সূর্য, আকাশ, চাঁদ সম্পর্কে যে তথ্য জানে, সেই তথ্য আদি ও অকৃত্রিম। তবে আদিবাসীদের সংস্কৃতি দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে। যে অর্থনৈতিক দুরবস্থার মধ্য দিয়ে আজও শ্রমিকদের দিন অতিবাহিত করতে হয়, তাতে বাদ্যযন্ত্র কেনার টাকা কোথায়? এর ওপর আছে টিভি সংস্কৃতির থাবা। তবুও সুখের কথা, মনটা মরে যায়নি। মাদল, সিঙা, ধামসা বেজে উঠলে সব কাজ ফেলে ছুটে আসে ওরা, ধিতাং ধিতাং বোলের তালে তালে নাচতে থাকে। হারিয়ে যাওয়ার মুখে আজ আদিবাসী সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতিকে বাঁচাতেই হবে। সংরক্ষণ দরকার। এখনই প্রয়োজন তথ্যচিত্র করে রাখার। আমাদের খেয়াল রাখতে হবে, ভারতের জনজীবনের মূলস্রোতে মেলাতে গিয়ে আদিবাসী সংস্কৃতির যেন কোনও সর্বনাশ না করা হয়।

কৃতজ্ঞতা : ডঃ সমর চক্রবর্তী, সৈফুদ্দিন, পরিমল দে।

লেখক ☐ রাষ্ট্রমন্ত্রী, পূর্তবিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও বিশিষ্ট আদিবাসী বুদ্ধিজীবী



গিরিজাশংকর রায়

উত্তরবঙ্গের সংস্কৃতি : রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির পূজাপার্বণ

ভারতীয় উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলের সংস্কৃতি থেকে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির বিশেষ অবদানের বিষয়ে সমাজ বিকাশী ও সংস্কৃতি বিশারদগণ সম্পূর্ণভাবে অবহিত রহিয়াছেন। এই প্রাচীন ও ঐতিহ্যশালী মহান সমাজটির ব্যাপক, বিচিত্র সাংস্কৃতিক উপাদান অদ্যাবধি যতটুকু সংরক্ষিত রহিয়াছে বিভিন্ন নামের ও প্রকৃতির দেবতা তথা পূজাপার্বণ এবং সংশ্লিষ্ট রীতি আচার ইত্যাদি প্রচলিত আছে তাহা অতীব বিস্ময়কর।

"কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা,
দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে, সমুদ্রে হল হারা।
হেথায় আর্য, হেথা অনার্য. হেথায় দ্রাবিড় চীন—
শক-হূন দল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন।
*　　*　　*　　*
রণ ধারা বাহি জয়গান গাহি উন্মাদ কলরবে,
ভেদি মরুপথ গিরি পর্বত যারা এসেছিল সবে
তারা মোর মাঝে সবাই বিরাজে কেহ নহে নহে দূর,
আমার শোণিতে রয়েছে ধ্বনিতে তারই বিচিত্র সুর ॥

বস্তুত ভারতের জনগঠনে কবিগুরুর "ভারততীর্থ" কবিতার উদ্ধৃতাংশটির পরম ও চরম সত্যকে প্রকাশ করিয়াছে। বৈদিক আর্যরা ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া এখানকার তৎকালীন প্রাগার্য সমাজগুলির সহিত রক্ত, ভাব-ভাষার আদান-প্রদান করিয়াছেন। পরবর্তীকালে বৈদিক আর্যদের ভাষার সহিত প্রাগার্যদের ভাষার মেল বন্ধনে সৃষ্ট হইয়াছে সংস্কৃত ভাষা। আবার ভারতীয় সংস্কৃতির অর্থই হইল সংস্কৃত বা সংস্কৃতায়িত সংস্কৃতি।[১] অন্যদিকে ইহাকেই আমরা হিন্দু সংস্কৃতি বা সভ্যতা বলিয়া জানি।[২]

বরেণ্য পণ্ডিতগণের মতে বিভিন্ন নরগোষ্ঠী ও ভাষাগোষ্ঠীর মানুষের সমন্বয়ে বৃহত্তর ভারতীয় জনসমাজের সৃষ্টি। নিগ্রোবটু, আদি অস্ট্রেলিয় (বর্তমান নাম ভেডিড), মঙ্গোলীয়, ভূমধ্যসাগরীয় (দ্রাবিড় ভাষা), ব্রেকিসেফালস্ (প্রশস্তশিরা)

এবং নর্ডিক প্রভৃতি নরগোষ্ঠীর রক্তে ভারতীয় জনের গঠন হইয়াছে।[৩] ভাষাগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে এতগুলি সংখ্যা পাওয়া যায় না। ইন্দো আর্য, অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় প্রভৃতি ভাষাভাষী গোষ্ঠীর সন্ধান ভারতবর্ষে মিলে।[৪] উত্তর পূর্ব ভারতের কতক কতক জনসমাজে তিব্বত ব্রহ্মদেশীয় বা ভোট ব্রহ্মীয় ভাষার সন্ধান পাওয়া যায়।[৫] সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে বৈদিক আর্যরা ভারতের মাটিতে বসবাস করিতে আরম্ভ করিলে এখানকার প্রাগার্য লোকেদের সহিত প্রাথমিক দিকে সংঘাত সংঘর্ষ ও পরবর্তীকালে সর্বস্তরে একটি সমন্বয় সৃষ্টি হইয়াছিল। শ্রদ্ধেয় আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাই বলিতেছেন, "ভারতবর্ষের সু-সভ্য, অর্ধ-সভ্য ও অ-সভ্য, সব রকমের অনার্য আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে আর্যদের প্রথম সংস্পর্শ হয়তো বিরোধময়ই হইয়াছিল। কিন্তু অনার্য ভারতে আর্যদের উপনিবেশ স্থাপিত হইবার পর হইতেই উভয় শ্রেণীর মানুষ অনার্য ও আর্য পরস্পরের প্রতিবেশ প্রভাবে পড়িতে থাকে। আর্যরা বিদেশ হইতে আগত এবং পার্থিব সভ্যতায় তাহারা খুব উচ্চ ছিল না। আর্যদের ভাষা আসিয়া দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক ভাষাগুলিকে হীনপ্রভ করিয়া দিল ; উত্তর ভারতের কোল ও দ্রাবিড় অনার্যদের মধ্যে ঐক্য বিষয়ক ভাষার অভাব ছিল, আর্য নরগোষ্ঠীর বিজেতৃ মর্যাদা লইয়া আর্যভাষা সে অভাব পূরণ করিল।"[৬] কিন্তু আর্য ও প্রাগার্যদের (আমরা অনার্য শব্দটির পরিবর্তে প্রাগার্য শব্দটি ব্যবহার করিতে ইচ্ছুক। কেননা 'আর্য নহে' এইরূপ একটি অর্থ হইলেও শব্দটির মধ্যে হীনতাবোধক একটি ভাব প্রকাশ পায় বলিয়া মনে হয়।) এই ঐক্য স্থাপন খুব সহজভাবে হয় নাই।—"শতাব্দীর বিরোধ মিলনের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে ভারতবর্ষের বুকে আর্যভাষীরা এক সমন্বিত জন, ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়িয়া তুলিল। সে জনের রক্ত বিশুদ্ধতা আর রহিল না, তাহার রক্তে বিচিত্র রক্তধারার স্রোতোধ্বনি রচিত হইতে লাগিল, কোথাও ক্ষীণ, কোথাও উচ্চগ্রামে। এই সমন্বিত জনের নাম ভারতীয় জন। সে ধর্মও আর বেদ ব্রাহ্মণের ধর্ম রহিল না, তাহার মধ্যে বিভিন্ন বিচিত্র পূর্বতন ধর্মের আদর্শ আচার, অনুষ্ঠান সব মিলিয়া মিশিয়া এক নতুন ধর্ম গড়িয়া উঠিল ; তাহার নাম পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম। সে সভ্যতাও বৈদিক আর্যভাষীর সভ্যতা থাকিল না ; বিচিত্র পূর্বতন সভ্যতার উপাদান উপকরণ আহরণ করিয়া তাহার এক নতুন রূপ ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিল, এই নূতন সমন্বিত সভ্যতার নাম ভারতীয় সভ্যতা। আর সেই সংস্কৃতিই কি বেদ-ব্রাহ্মণের সংস্কৃতি থাকিতে পারিল? তাহার মানস-লোকে কত যে পূর্বতন জন ও সংস্কৃতির সৃষ্টি পুরাণ, দেবতাবাদ, ভয়-বিশ্বাস, ভাব-কল্পনা, স্বভাব-প্রকৃতি, ইতিকাহিনী, ধ্যান-ধারণা আশ্রয় লাভ করিল তাহার ইয়ত্তা নাই। সকলকে আশ্রয় দিয়া সকলের মধ্যে আশ্রয় পাইয়া, সকলকে আত্মসাৎ করিয়া, সকলের মধ্যে বিস্তৃত হইয়া এই সংস্কৃতিও এক নূতন সমন্বিত রূপ লাভ করিল, তাহার নাম ভারতীয় সংস্কৃতি।"[৭]

ভারতীয় জন, ভারতীয় ধর্ম, ভারতীয় সভ্যতা, ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায় যাহা বলিয়াছেন জন ধর্ম সভ্যতা সংস্কৃতির প্রশ্নে বঙ্গদেশ সম্পর্কেও তাহা সমান ও সম্পূর্ণভাবে প্রযোজ্য। কেননা : 'ভারত হইতেছে সাধারণ, বাঙ্গালা হইতেছে বিশেষ। যাহা লইয়া বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব, বাঙ্গালীর অস্তিত্ব, তাহার মধ্যে বেশীর ভাগই ভারতবর্ষের অন্য জাতির মধ্যেও মিলে, ভারতের অন্যান্য প্রদেশের লোকেদের সঙ্গে সেই সব বিষয়ে বাঙ্গালীদের সমতা আছে।"[৮] বঙ্গদেশের উত্তরখণ্ডের পক্ষেও যে ইহা প্রযোজ্য তাহা অনস্বীকার্য।

পণ্ডিতবর্গের অভিমতে আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব ত্রয়োদশ হইতে ষোড়শ শতকের মধ্যে আর্যরা সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন এবং খৃষ্টপূর্ব অষ্টম শতকের মধ্যে আর্যভাষা ও ধর্ম পশ্চিম পাঞ্জাব হইয়া পূর্বদিকে বিহার অবধি প্রসারিত হয়।[৯] পরবর্তী কালে সম্ভবত খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে তাঁহারা বঙ্গদেশে প্রবেশ করিয়াছিলেন।[১০] কিন্তু বঙ্গদেশে আর্যভাষীদের আগমনের পূর্বেই বাঙালী একটি বিশিষ্ট জাতি হিসাবে পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া প্রখ্যাত ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন।[১১]

বঙ্গদেশের 'জন' ও 'সংস্কৃতি' লইয়া মোটামুটি ভাবে গবেষকগণ কাজ আরম্ভ করিয়াছেন এবং প্রাথমিক ভাবে তাঁহারা সফলতাও অর্জন করিতেছেন। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র দুঃখ সহকারে বাঙালীর ইতিহাসের অভাবের কথা বলিয়াছেন এবং বঙ্গদেশের সঠিক তথ্যসমৃদ্ধ ইতিহাস রচনার জন্য উপদেশও দিয়াছিলেন।[১২] এই ইতিহাস বলিতে তিনি রাজা-শাসন, সমাজ ব্যবস্থা, ধর্মবোধ, শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতি নানাবিধ বিষয় সম্বলিত একখানি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসের কথা বলিয়াছেন। পরবর্তীকালে এই জাতীয় একখানি ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছিল। ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের রচিত 'বাঙালীর ইতিহাস', আদিপর্ব।[১৩] বস্তুত বঙ্গদেশ ও জাতি সম্পর্কে ইদানীংকাল অবধি এই গ্রন্থখানি শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিতে পারে। কিন্তু সমগ্র বাঙালী জাতির যাবতীয় বিষয় গ্রন্থভুক্ত করাতে অত্যন্ত

উত্তর-পূর্ব ভারতের আদিম বাসিন্দাদের সম্পর্কে নৃ-গোষ্ঠী ও ভাষাতত্ত্বের মানদণ্ডে একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রামাণিক এবং প্রাথমিক আলোচনা করিয়াছেন শ্রদ্ধেয় ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার অপূর্ব কীর্তি 'বাঙলা ভাষার উদ্ভব ও বিকাশ' (ওরিজিন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অব দি বেঙ্গলী ল্যাঙ্গুয়েজ) এবং 'কিরাত-জন-কৃতি' গ্রন্থের মধ্যে। প্রথমটির উদ্দেশ্য হইল বাঙলা ভাষার একটি ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা এবং দ্বিতীয় গ্রন্থখানির উদ্দেশ্য মঙ্গোলিয় নৃ-গোষ্ঠীর একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু সঠিক তথ্য পূর্ণ আলোচনার অবতারণা করা। ফলে উত্তরবাঙলার জন-সংস্কৃতি সম্পর্কে বিশদ আলোচনার অবকাশ তাঁহার ছিল না।

স্বাভাবিক কারণে উত্তরবঙ্গ তথা তদঞ্চলের প্রাচীন জনসমাজ কোচ-রাজবংশীদের সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় ডঃ রায় সবিশেষ আলোকপাত করিতে অবকাশ পান নাই।

উত্তরবঙ্গ অঞ্চল বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশেরই অন্তর্ভুক্ত। অথচ 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' গ্রন্থে শ্রদ্ধেয় বিনয় ঘোষ এবং 'বাংলার লৌকিক দেবতা' গ্রন্থে গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু উত্তরবঙ্গকে সম্পূর্ণ ভাবে অবহেলা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। গ্রন্থ দুইখানি সম্পূর্ণ মধ্য ও দক্ষিণবঙ্গকেন্দ্রিক। কিন্তু উত্তর দক্ষিণ মধ্য সমগ্র অঞ্চলের সম্মিলিত সংস্কৃতিই পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি। বঙ্গদেশ বলিতে ইদানীংকালের পশ্চিমবঙ্গ বুঝায় না; পূর্ববঙ্গ, উত্তর দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গ, অর্থাৎ দেশ বিভাগের পূর্বেকার বাঙলাই প্রকৃত বঙ্গদেশ। 'বাঙলার লৌকিক দেবতা' নামটির মধ্যে অবশ্যই উত্তরবঙ্গের গ্রামীণ দেবতাদেরও অর্ন্তভুক্তির কথা ওঠে। এবং এইখানেই গ্রন্থ দুইটির নামকরণের সার্থকতা প্রতিপন্ন করে না।

উত্তর-পূর্ব ভারতের আদিম বাসিন্দাদের সম্পর্কে নৃ-গোষ্ঠী ও ভাষাতত্ত্বের মানদণ্ডে একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রামাণিক এবং প্রাথমিক আলোচনা করিয়াছেন শ্রদ্ধেয় ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার অপূর্ব কীর্তি 'বাঙলা ভাষার উদ্ভব ও বিকাশ' (ওরিজিন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অব দি বেঙ্গলী ল্যাঙ্গুয়েজ) এবং 'কিরাত-জন-কৃতি' গ্রন্থের মধ্যে। প্রথমটির উদ্দেশ্য হইল বাঙলা ভাষার একটি ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা এবং দ্বিতীয় গ্রন্থখানির উদ্দেশ্য মঙ্গোলিয় নৃ-গোষ্ঠীর একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু সঠিক তথ্যপূর্ণ আলোচনার অবতারণা করা। ফলে উত্তরবাঙলার জন-সংস্কৃতি সম্পর্কে বিশদ আলোচনার অবকাশ তাঁহার ছিল না।

উত্তরবঙ্গ সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসুদের নিকট খান চৌধুরি আমানতুল্লা আহমেদ রচিত 'কোচবিহারের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড' গ্রন্থখানি প্রচুর মান্য পাইয়া আসিতেছে। কোচবিহার রাজ্যের (অধুনা পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের একটি জেলা বিশেষ) রাজবংশ, রাজ্যের অধিবাসীদের আচার ব্যবহার প্রভৃতি নানাবিধ বিষয় এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে; কিন্তু জাতিগত উদ্ভব আলোচনায় গ্রন্থকার একটু মাত্রাধিক জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়াছেন। উপরন্তু গ্রন্থখানি রাজাদেশে বা রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় রাজকোষের অর্থব্যয়ে মুদ্রিত হইয়াছিল এবং প্রকৃতপক্ষে কোচবিহার রাজবংশের ইতিহাস প্রণয়নের জন্যই ইহা সংকলিত হইয়াছিল।'' ফলে ঐতিহাসিকের বৈজ্ঞানিক মানসিকতা তৎকালীন রাজা বাহাদুরের ব্যক্তিগত প্রভাব দ্বারা পরিচালিত হয় নাই তাহা অত্যন্ত জোরের সহিত বলিতে পারা যায় না।

উত্তরবাঙলার আদি প্রাচীন সমাজ রাজবংশী ক্ষত্রিয়দের সামগ্রিক বিষয় লইয়া পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সর্বপ্রথম আলোচনা করিলেন জলপাইগুড়ি নিবাসী শ্রদ্ধেয় ডঃ চারুচন্দ্র সান্যাল মহাশয়। বস্তুত বাঙলার বাহিরে (এবং ভারতবর্ষেরও বাহিরে) রাজবংশী নামক সমাজটির পূর্ণ চিত্র তিনিই তুলিয়া ধরেন তাঁহার রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত গ্রন্থ 'দি রাজবংশীজ অব নর্থ বেঙ্গল'' অর্থাৎ 'উত্তরবঙ্গের রাজবংশী'র মাধ্যমে। কিন্তু—(১) "উত্তরবঙ্গের রাজবংশী" গ্রন্থটির নাম হইলেও প্রকৃত পক্ষে তিনি সমগ্র উত্তরবাঙলার কথা বলেন নাই। ভূমিকায় তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে তরাই, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার অঞ্চলের রাজবংশীদের লোকজীবন ও লোকসংস্কৃতির একটি ধারণা দেওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য।'' (২) গ্রন্থটি গবেষণামূলক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া রচিত হয় নাই। একটি সমাজের বস্তুভিত্তিক তথ্যগুলির সংকলন তিনি করিয়াছেন মাত্র, তথ্যগুলির আশ্রয় ও সহায়তায় তিনি গভীরে প্রবেশ করিতে পারেন নাই, (৩) অনেক সময় তিনি আকস্মিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ ঘটনার যুক্তি দিয়াছেন।'' (৪) রাজবংশীদের যাবতীয় বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া উক্ত সমাজটির ধর্মবোধ আচার সংস্কৃতি সম্পর্কে মুলোদঘাটন করিতে পারেন নাই।

তথাপি 'দি রাজবংশীজ অব নর্থ বেঙ্গল'—এর সহিত গ্রন্থকার শ্রদ্ধেয় ডঃ সান্যাল মহাশয় বিশেষ প্রশংসাভাজন হইবেন। প্রাথমিক কাজ বলিয়া গ্রন্থখানিতে সামান্য কিছু পদ্ধতিগত (টেকনিকাল) ভুল থাকা অসম্ভব নহে, কেননা তিনি অনুসন্ধান কার্য মাত্র চালাইয়াছেন। তাঁহার এই অমূল্য গ্রন্থখানিকে ভিত্তি করিয়া পরবর্তী গবেষকগণ সুন্দর ও সুচারুভাবে কাজে হাত দিবার একটি খোলা পথ পাইতে পারেন। অবহেলিত তথা অপরিচিত একটি প্রাচীন সমাজের পরিচয়প্রদান ক্ষেত্রে তিনি জমি চাষ করিয়াছেন, বলা যায়; তাঁহার সেই কর্ষিত জমিতে পরবর্তী গবেষকেরা, ঐতিহাসিকেরা সোনার ফসল ফলাইতে সক্ষম হইতে পারিবেন।

স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পূর্বে বিদেশী শাসকের কিছু কিছু কর্মচারী উত্তরবাংলার তথা উত্তর পূর্ব ভারতের আদিম অধিবাসীদের সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত করিয়াছিলেন। ইহা স্বীকার না করিয়া উপায় থাকে না যে বাঙলা তথা ভারতের ইতিহাসরচনা, সংস্কৃতি-সন্ধান, জনতত্ত্ব-নিরূপণ, ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণা প্রভৃতি মহৎ কর্মের সূচনা বিদেশী ইংরেজরাই করিয়াছিলেন। এতৎ প্রসঙ্গে তাঁহাদের রচনাবলীর একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া যাইতে পারে :—

গ্রন্থকার	গ্রন্থনাম	প্রকাশকাল—খৃঃ
১. ফ্রান্সিস ওয়াল্টার হ্যামিলটন বুকানন—	ইস্ট ইন্ডিয়া গেজেটিয়ার—	১৮১৫ "
২. মন্টোগোমারী মার্টিন—	হিস্টি এ্যান্টিকুইটি টোপোগ্রাফি এ্যান্ড স্ট্যাটিসটিক্স অব ইস্টার্ন ইন্ডিয়া—	১৮৩৮ "
৩. বি. এইচ হজসন—	এসো অন কোচ বোডো এ্যান্ড ধীমল ট্রাইব্স—	১৮৪. "
৪ কর্ণেল ডাল্টন—	ডেস্ক্রিপটিভ এথনোলজি অব বেঙ্গল—	১৮৭২ "
৫. উইলিয়াম উইলসন হান্টার—	স্ট্যাটিসটিক্যাল এ্যাকাউন্ট অব বেঙ্গল—	১৮৭৬ "
৬ এইচ. এইচ. রিজলী—	দি ট্রাইবস এ্যান্ড কাস্টস অব বেঙ্গল	১৮৯১ "
৭. মিঃ ডি. এইচ. ই. সান্ডার সেটলমেন্ট অফিসার—	সার্ভে এ্যান্ড সেটলমেন্ট অব দি ওয়েস্টার্ন ডুয়ার্স ইন দি ডিস্ট্রিক্ট অব জলপাইগুড়ি (১৮৮৯-৯৫)—	১৮৯৫ "
৮. স্যার জর্জ এব্রাহাম গ্রীয়ার্সন—	লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে অব ইন্ডিয়া—	১৯২৭ "

উল্লিখিত তালিকার গ্রন্থকারগণের মধ্যে একমাত্র স্যার এব্রাহাম গ্রীয়ার্সনেরই ভারতীয় ভাষা সভ্যতা সংস্কৃতি সম্পর্কে নিবিড় পরিচয় ও জ্ঞান ছিল। অন্যান্যরা যেমন এখানকার স্থানীয় ভাষা বুঝিতেন না তেমনি সংস্কার সংস্কৃতি সম্পর্কেও বিশেষ অবহিত ছিলেন না বলিয়া

মনে হয়। উপরন্তু পরাধীন জাতির, বিশেষত অবহেলিত সমাজের প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধিত চিন্ততার কারণ না থাকাই স্বাভাবিক। তথাপি বাঙলা তথা ভারতের অন্ধকার যুগের সংগৃহীত তথ্যগুলি পরবর্তী ঐতিহাসিকগণের কাছে মূল্যবান উপাদান হিসাবে কাজে লাগে নাই ইহা বলা যায় না। তাঁহাদের আহৃত তথ্যগুলির মধ্যে সত্যতার অভাব বা ভ্রান্তি থাকিতে পারে, কিন্তু অজ্ঞাত সমাজগুলির একটি মোটামুটি চিত্রগ্রহণ তাঁহাদের যে উদ্দেশ্য ছিল এবং তাঁহারা যে সফল হইয়াছেন ইহা আমাদের স্বীকার করিতে হইবে।

উপযুক্ত তথ্যানুসন্ধানী ঐতিহাসিক গবেষক সকলের আহৃত উপাদানগুলির প্রতি পূর্ণ মর্যাদা দান করিয়াও আমরা বিনীতভাবে বলিতে চাই যে শ্রদ্ধেয় ডঃ চারুচন্দ্র সান্যাল ব্যতিরেকে অন্য কেহ প্রকৃতপক্ষে উত্তরবঙ্গ এবং এখানকার বহু শতাব্দীকাল হইতে বসবাসকারী রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজ সম্পর্কে স্পষ্টভাবে কোনো চিত্র তুলিয়া ধরেন নাই। অথচ বৃহত্তর বাঙলাকে বুঝিতে হইলে কেবল দক্ষিণবঙ্গ সম্পর্কে জানিলেই চলে না, উত্তরবঙ্গকেও সম্যকভাবে জানিতে হইবে। এবং উত্তরবঙ্গ সম্বন্ধে কিছু জানিতে হইলে প্রথমে যাহা সহজলভ্য বলিয়া মনে হয় তাহার একমাত্র উপযুক্ত ক্ষেত্র রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজ। সুদূর অতীত-হইতে দেশবিভাগের পূর্ববর্তীকাল পর্যন্ত যে বিশাল সময়রেখা তৎসম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলে স্বাভাবিকভাবেই কোচ-রাজবংশীদের কথাই মুখ্য হইয়া ওঠে। কোনও একটি প্রাচীন সমাজ সম্পর্কে সম্যক জানিতে হইলে উহার উদ্ভব-বিকাশ, অতীত আচার, ধর্মবোধ ও সংস্কার-সংস্কৃতির সহিত উহার বর্তমান প্রবণতার তুলনামূলক পর্যালোচনা না করিলে সম্ভবত সমাজটি সম্বন্ধে ধারণা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় না।

"বাঙালীর উৎপত্তি" শীর্ষক প্রবন্ধে প্রায় শতাব্দীকাল পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র কোচ সমাজকে বাঙালী বলিয়া গ্রহণ করিতে কুণ্ঠাবোধ করিয়াছেন : "বহুতর কোচ বাঙ্গলার ভিতর বাস করিতেছে। দিনাজপুর, মালদহ, রাজশাহী, রঙপুর, বগুড়া, ঢাকা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলায় কোচদিগকে পাওয়া যায়। বাঙ্গলার ভিতরে প্রায় এক লক্ষ কোচের বাস আছে। এই এক লক্ষ কোচকে বাঙালী বলা যাইবে কিনা? কেহ কেহ বলেন ইহাদিগকেও বাঙালীর সামিল ধরিতে হইবে। আমরা সে বিষয়ে সন্দিহান।"[১৮] সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক বা গবেষক ছিলেন না। তাই তাঁহার সুদূরপ্রসারী ও ইঙ্গিতবাহী এই সন্দেহটিকে কেহ কেহ অমূলক ভাবিয়া গুরুত্ব না দিতেও পারেন। কিন্তু আমাদের শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ রাখা কর্তব্য যে তাঁহার ইতিহাসমনস্কতা তৎকালে ছিল তুলনারহিত। বঙ্গদেশের প্রকৃত ইতিহাস প্রণয়নে তিনি তৎকালীন বুদ্ধিজীবী সমাজকে দারুণভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। অপরপক্ষে মন্তব্যটিকে সরাসরি খারিজ করার বিষয়েও কিছু বাস্তব অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র পূর্বতন পূর্ববঙ্গ অর্থাৎ বর্তমান বাঙলাদেশের এবং পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলায় রাজবংশী ক্ষত্রিয়দের অবস্থানের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত স্থানগুলি ছাড়াও আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা, বিহার, ভুটান নেপাল অর্থাৎ উত্তর-পূর্ব ভারতীয় উপমহাদেশের একটি বিস্তৃত ভূখণ্ড ইঁহাদের বাসভূমি। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ক্ষত্রিয়গণকে সাধারণভাবে আমরা বাঙালী বলিয়া অভিহিত করি। কিন্তু আবহমানকাল হইতে যাঁহারা আসাম, বিহার, নেপাল প্রভৃতি অঞ্চলে বসবাস করিয়া আসিতেছেন তাঁহাদিগকে সর্বাংশে বাঙালি অভিধায় ভূষিত করিলে তাহা সুসংগত তথা ইতিহাসসম্মত হইবে কি না বলা মুস্কিল।

পূর্বতন গবেষকরা রাজবংশীদের উদ্ভব সম্বন্ধে ঐকামতে পৌঁছাইতে পারেন নাই। কাহারও মতে ইঁহারা দ্রাবিড় বা অস্ট্রিক নৃ-গোষ্ঠীর বংশধর, কাহারও কাহারও মতে মঙ্গোলীয় নৃ-শাখার লোক। মধ্যপন্থা অবলম্বন করিয়া কেহ বা সংকর জাতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সমাজটির উদ্ভব শীর্ষক আলোচনায় আমরা ইহাদিগকে মঙ্গোলীয় শাখার বংশধর বলিয়া সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করিব। আমাদের যুক্তি ও অনুমান যদি গ্রাহ্য হইয়া থাকে তাহা হইলে উত্তর-পূর্ব ভারতীয় উপমহাদেশের সংস্কৃতিতে উত্তরবাঙ্গলার একটি বিশেষ ভূমিকার কথা স্বাভাবিক ভাবেই স্বীকার করিতে হইবে। কেননা ভারতীয় সংস্কৃতিতে মঙ্গোলীয় নৃ-গোষ্ঠীর দান অপরিসীম।

উপযুক্ত তথ্যানুসন্ধানী ঐতিহাসিক গবেষক সকলের আহৃত উপাদানগুলির প্রতি পূর্ণ মর্যাদা দান করিয়াও আমরা বিনীতভাবে বলিতে চাই যে শ্রদ্ধেয় ডঃ চারুচন্দ্র সান্যাল ব্যতিরেকে অন্য কেহ প্রকৃতপক্ষে উত্তরবঙ্গ এবং এখানকার বহু শতাব্দীকাল হইতে বসবাসকারী রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজ সম্পর্কে স্পষ্টভাবে কোনো চিত্র তুলিয়া ধরেন নাই। অথচ বৃহত্তর বাঙলাকে বুঝিতে হইলে কেবল দক্ষিণবঙ্গ সম্পর্কে জানিলেই চলে না, উত্তরবঙ্গকেও সম্যকভাবে জানিতে হইবে। এবং উত্তরবঙ্গ সম্বন্ধে কিছু জানিতে হইলে প্রথমে যাহা সহজলভ্য বলিয়া মনে হয় তাহার একমাত্র উপযুক্ত ক্ষেত্র রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজ।

ভারতবর্ষে মঙ্গোলীয় জনসমাজের এই অপরিসীম অবদান প্রসঙ্গে ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলিতেছেন যে নেপালে ব্রাহ্মণ পুরোহিত, বৌদ্ধ সন্ন্যাসী এবং বাঙলা ও আসামে ব্রাহ্মণ পুরোহিত, হিন্দু সেনানী ও সদাগরদের মাধ্যমে মঙ্গোলীয়রা হিন্দুকৃত বা ভারতীয়কৃত হইয়াছেন। উঁহাদের ভাষা, ধারণা, আচার অনুষ্ঠান প্রথা ভারতীয় আর্য অস্ট্রিক-দ্রাবিড়দের সম্মিলিত ভাষা, ধর্ম, আচার-সংস্কৃতিকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। তাঁহার মতে, বাঙলার হিন্দুধর্মের শাক্ত-শৈব বৈষ্ণবীয় শাখাসমূহের আচার-অনুষ্ঠান প্রথা, উত্তর-পূর্ব ভারতের লোকায়ত উৎসবাদি, শিল্পকলা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, অলঙ্করণ, বয়নশিল্প, পরিচ্ছদ, মুদ্রানির্মাণ, বাঙালীর মানসিকতা ও ভাবপ্রবণতা ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ের উপর মঙ্গোলীয় নৃ-শাখার প্রভূত প্রভাব পড়িয়াছে।[২০] সুতরাং রাজবংশীদিগকে মঙ্গোলীয় শাখার গোষ্ঠী ধরিলে ইহা স্বীকার করিয়া লইতে হয় যে বাঙালী সমাজের উপরও তাঁহাদের একটি প্রভাব পড়িয়াছে। কেননা, "আর্য সংস্কৃতি

সম্প্রসারিত হয়ে প্রথম বাসা বাঁধে উত্তরবাঙলায়."[২১] বা 'বাঙলাদেশে আর্যসভ্যতা বিস্তৃতির ইতিহাস আলোচনা করিলে জানিতে পারা যায় যে, উত্তর বিহার বা মগধ হইতে ইহার সংলগ্ন অঞ্চল উত্তরবঙ্গেই আর্যসভ্যতা সর্বপ্রথম বিস্তৃতি লাভ করে।'[২২]



ভ্রমণরতা রাজবংশী মহিলা

পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ জন-গঠনের সহিত উত্তরবাঙলার জনগঠনের মূলত কোনো সাদৃশ্য নাই। "বাঙালীর জন প্রকৃতিতে এ পর্যন্ত যে সব উপাদান পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে বলা যায়, ভেড্ডীয় উপাদানই বাঙলার জন গঠনের মূল ও প্রধান উপাদান।........অধিকাংশ বাঙালীই মধ্যমাকৃতি— মাথার গড়ন দীর্ঘও নয়, গোলও নয়, নাসিকা দীর্ঘও নয়, প্রশস্তও নয়, দেহাকৃতি দীর্ঘও নয়, খর্বও নয়। এই মধ্যমাকৃতি দেহলক্ষণই বাঙালীর বৈশিষ্ট্য।"[২৩] অন্যদিকে উত্তরবাঙলার জনপ্রকৃতিতে সাধারণভাবে মঙ্গোলীয় রক্তপ্রভাব অধিক বলিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করেন।—"বাঙলাদেশের জনসাধারণের কোনও কোনও অংশে মঙ্গোলীয় রক্তের একটি ধারাও বিশেষভাবে নজরে পড়ে।......দক্ষিণ-পশ্চিম চীন হইতে ইহারা ক্রমশ ব্রহ্মদেশ, মালয় উপদ্বীপ ও পূর্ব-দক্ষিণ সমুদ্রশায়ী দেশ ও দ্বীপগুলিতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। পথে উত্তর-পূর্ব আসামে এবং উত্তর ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার মিরি, নাগা, বোদো বা মেচ প্রভৃতি লোকদের ভিতর, কোচ, পলিয়া, রাজবংশী প্রভৃতি লোকেদের ভিতর ইহাদের একটি ধারাপ্রবাহ ধরা পড়িয়া গিয়াছে। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাধৃত ধারাটির একটি প্রবাহ বাংলাদেশে আসিয়া ঢুকিয়া পড়ে এবং রংপুর, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি অঞ্চলে এইভাবেই খানিকটা মঙ্গোলীয় প্রভাব আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।"[২৪] এই মঙ্গোলীয় প্রভাবের দরুন বাঙালী জাতির অপরাপর শাখার ন্যায় দেহলক্ষণ মধ্যমাকৃতি হইলেও ইঁহাদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া ওঠে কয়েকটি ক্ষেত্রে। সাধারণভাবে ইঁহাদের নাক চ্যাপ্টা, চোয়াল অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ, চক্ষু ক্ষুদ্র এবং ভ্রূ অন্যান্য বাঙালীর তুলনায় কম। এই সমস্ত বিষয়ে বৃহৎ মঙ্গোলীয় জাতিভুক্ত অন্যান্য শাখাগুলির সহিত রাজবংশীদের সাদৃশ্য সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়।

আর শুধু জনপ্রকৃতিতে নহে, উত্তরবাঙলার লোকভাষা-সাহিত্য সংস্কৃতি প্রভৃতির ক্ষেত্রেও পশ্চিমবঙ্গের সহিত ইহার কোনোরূপ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় না। বিষয়গুলি সম্পর্কে স্বতন্ত্রভাবে গবেষণা হওয়া দরকার। যাহা হউক পশ্চিমবঙ্গের ভাষা-সংস্কৃতি জন-প্রকৃতির এই বৈসাদৃশ্যের অন্যতম মুখ্য কারণ সম্ভবত ইহার প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য। পরোক্ষ আরও অনেক কারণ অবশ্যই থাকিতে পারে।

প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থ, কাব্য, তাম্রশাসন, বিদেশী পর্যটকদের ভ্রমণবৃত্তান্ত, ঐতিহাসিকগণের বিবরণী ইত্যাদি হইতে জানিতে পারা যায় যে রাজবংশী ক্ষত্রিয় অধ্যুষিত অঞ্চলটি বিভিন্নকালে বিভিন্ন নামে অভিহিত হইয়াছে, যথা—প্রাগ্-জ্যোতিষ, লৌহিত্য, কামরূপ, কামতাপুর প্রভৃতি।[২৫] কালিকাপুরাণ, যোগিনীতন্ত্রে উল্লিখিত আছে যে করতোয়া নদীর পূর্ব হইতে দিক্ষু পর্যন্ত এবং হিমালয় হইতে দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্রের শাখানদী লাক্ষার সঙ্গম পর্যন্ত এই বিশাল ভূ-খণ্ড কামরূপ দেশের অন্তর্গত ছিল। উভয় গ্রন্থে দেশের পরিমাণ ত্রিশ যোজন বিস্তার ও শত যোজন দীর্ঘ বলা হইয়াছে।[২৬] কোচবিহার রাজবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি মহারাজ নরনারায়ণের (রাজত্বকাল ১৫৩৩ হইতে ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দে) রাজত্বকালের একটি স্কেচ মানচিত্রে নেপালের মোরঙ্গ, বিহারের পূর্ণিয়া, মালদহ বাদে সমগ্র উত্তরবঙ্গ, সমগ্র আসাম, মণিপুর, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট, নোয়াখালি প্রভৃতি স্থানকে কোচবিহারের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। পরবর্তীকালে জলপাইগুড়ি জেলার উত্তর-পূর্বভাগের কিছু অংশ একদা ভুটানের শাসনে আসিয়াছিল। বৃটিশের আগমনে ও হস্তক্ষেপে প্রায় দুই শতক পূর্বে মাত্র উত্তর-পূর্ব ভারতের মানচিত্রটি পরিবর্তিত হইয়া যায়।[২৭] উপরন্তু দেশ ব্যবচ্ছেদের ফলে তাহা সম্পূর্ণভাবে রূপান্তরিত হয়। যাহা হউক কামরূপ কামতাপুর কোচবিহার রাজ্যগুলি রাজবংশী ক্ষত্রিয় প্রধান রাজ্য ছিল। উত্তরে দেবতাত্মা হিমালয়, পশ্চিম-দক্ষিণে অমৃতবাহিনী গঙ্গা নদী, দক্ষিণ-পূর্বে নদশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মপুত্র দ্বারা বেষ্টিত ত্রিভুজাকৃতি এই বিশাল অঞ্চলটি পৃথক ভৌগোলিক পরিবেশে সীমাবদ্ধ থাকার দরুন স্বভাবতই পূর্ব-দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের ভাষা-সংস্কৃতি হইতে একটি স্বতন্ত্র এবং প্রায় স্বাধীন ভাষা সংস্কৃতি বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। কেননা,—"বিচিত্র নর গোষ্ঠীর লোক লইয়া বৃহত্তর বাঙালীজনের গঠন। বাঙলাদেশে বহুদিন পর্যন্ত ইঁহাদের অধিকাংশই ছিল কোমবদ্ধ, গোষ্ঠীবদ্ধ জন, এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী ইঁহারা একান্ত কৌমজীবনেই অভ্যস্ত হইয়া আসিয়াছিল। এক একটি কোম এক একটি বিশিষ্ট স্থান লইয়া মোটামুটিভাবে স্ব-তন্ত্রপরায়ণ স্ব-সম্পূর্ণ জীবন যাপন করিত, অন্য কোমের সঙ্গে যোগাযোগ বড় একটা থাকিত না।"[২৮] নদী-নালা-খালবেষ্টিত পূর্ববঙ্গের পক্ষে ইহা যেমনভাবে প্রযোজ্য, তেমনতর ভাবে হিমালয় গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র দ্বারা সীমায়িত উত্তরবঙ্গ সম্পর্কেও তাহা নিঃসংশয়াতীত সত্য।

অধিকন্তু অন্য একটি বিষয় সম্পর্কেও আমাদের সজাগ থাকিতে হইবে। তাহা হইল উত্তরবঙ্গ সীমান্তবর্তী অঞ্চল। পূর্ব-উত্তরে আসাম, উত্তর ও উত্তর পশ্চিমে ভুটান ও নেপাল, পশ্চিমে বিহার। কাজেই সীমান্তবর্তী জাতি ও উপজাতিগুলির সহিত ইহার অধিবাসীদের একটা রক্ত ও সংস্কৃতি সংমিশ্রণের অনুমান নেহাৎ কাল্পনিক নাও হইতে পারে। গঙ্গার দুই তীরের সভ্যতা সংস্কৃতি যদি পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গ উভয়ের সভ্যতা সংস্কৃতির মিশ্রণ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে সেই মিশ্র সংস্কৃতি মালদহ অঞ্চলের রাজবংশী সমাজে প্রভাবিত হয় নাই, ইহা বলা যায় না। রাজবংশী ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের সংস্কৃতির উদ্ভব ও বিকাশ প্রধানত রঙপুর কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলাতে। উহা কালক্রমে সম্প্রসারিত হইয়া আসামের গোয়ালপাড়া এবং উত্তরবঙ্গের অন্যত্র প্রবেশ করিয়াছে। ফলে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় সামান্যভাবে এবং মালদহ জেলাতে একটু অধিক পরিমাণে তাহাতে পরিবর্তনের প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়।

বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের উত্তরাংশ, অর্থাৎ উত্তরবঙ্গের ছয় জেলা—কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদহে সর্বত্র রাজবংশী ক্ষত্রিয় সম্প্রদায় সংখ্যাধিক। ইহা ব্যতীত আসাম প্রদেশের সম্পূর্ণ গোয়ালপাড়া জেলা, কামরূপ জেলার উত্তরাংশ ও নওগাঁ জেলার পশ্চিমাংশে এবং মেঘালয়ে এই সম্প্রদায় রহিয়াছে। নেপালের ভদ্রপুর, ঝাপা ও মোরঙ জেলাতেও ইঁহাদের বসবাস আছে। অধুনা বঙ্গদেশের অন্তর্ভুক্ত সমগ্র রঙপুর ও পূর্বদিনাজপুর জেলাতে ইহাদের সংখ্যাধিক্য আছে। উত্তর-পশ্চিম ময়মনসিংহ এবং রাজসাহী জেলার উত্তরাংশে এবং বগুড়ায় রাজবংশী ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের লোক বসবাস করেন। উপরন্তু বিহারের পূর্ণিয়া জেলার পূর্বাংশ, ভুটানের নিম্নাংশ এবং ত্রিপুরার অঞ্চল বিশেষ রাজবংশী ক্ষত্রিয় অধ্যুষিত। আমাদের প্রকল্পটিতে সাধারণভাবে আমরা উত্তরবঙ্গ অঞ্চলের রাজবংশীদের সম্পর্কেই আলোচনা করিতে সচেষ্ট হইব।

১৯৬১ সালের আদমসুমারী অনুসারে একমাত্র পুরুলিয়া জেলা ব্যতীত পশ্চিমবঙ্গের অন্য সব জেলাতেই রাজবংশীদের অবস্থানের কথা জানা যায়। পরিসংখ্যানটি নিম্নরূপ :—

কোচবিহার—	৪১৮৮৯৩
জলপাইগুড়ি—	৩১৬০২০
দার্জিলিং—	৩১৪৭২
পশ্চিম দিনাজপুর—	৯৩৩৭১
মালদহ—	৩৮৪৪৩
বর্ধমান—	১১১৯৭
বীরভূম—	৫৫৭৫
বাঁকুড়া—	৩৯৮
কলিকাতা—	২৭২৯
হাওড়া—	৩৬২৪৬
হুগলি—	২০১৬৫
মেদিনীপুর—	৬৪৬১২
মুর্শিদাবাদ—	২৯৭৪২
নদিয়া—	১২৭৩৯
২৪ পরগনা—	১২০১২৪
	১২৫১৭০৬

পরিসংখ্যানটিতে ধৃত পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলার রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজকে উদ্ভবের ক্ষেত্রে একই শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে না। অন্যান্য জেলার রাজবংশীরা কৃষিজীবী হইলেও মূলত মৎস্যজীবী, কিন্তু উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের একমাত্র জীবিকা কৃষিকর্ম। উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের দেহ গঠন, ভাষা-সভ্যতা-সংস্কৃতির সহিত তাহার সামান্য সাদৃশ্য নাই বলিয়াই মনে হয়।[illegible] উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের সহিত পূর্বে উক্ত রঙপুর, পূর্বদিনাজপুর, গোয়ালপাড়া অঞ্চল এবং আসাম, বিহার, মেঘালয়, ত্রিপুরা, নেপাল, ভুটান, বাঙলাদেশ প্রভৃতি বিশাল ভূখণ্ডের রাজবংশীদের দেহ গঠন, ভাষা-সভ্যতা-সংস্কৃতি একসূত্রে গ্রথিত অর্থাৎ একই মূল অংশ হইতে উদ্ভূত। গাঙ্গেয় উপত্যকা অঞ্চলে বসবাসকারী মৎস্যজীবী রাজবংশীরাই ক্রমান্বয়ে পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণে ও অন্যত্র বিস্তৃত হইয়াছেন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। আমরা পূর্বেই একস্থানে উল্লেখ করিয়াছি যে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়কে আমরা মঙ্গোলীয় নৃ-শাখার লোক হিসাবে ধরিতে চাই। কোনো কোনো গবেষক রাজবংশী ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়টিকে যে অস্ট্রিক বা দ্রাবিড় শাখার লোক ধরিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার মূল কারণ হয়তো উত্তরবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের রাজবংশীদিগকে একই পর্যায়ে ফেলিবার প্রবণতা। বিষয়টি একটু পরিষ্কারভাবে বলার চেষ্টা করা যাউক।

ই .টি. ডাল্টন,[illegible] ডব্লিউ, হান্টার[illegible] এবং রিজলী[illegible] প্রমুখ বৃটিশ গবেষক রাজবংশী ক্ষত্রিয়দিগকে দ্রাবিড় শাখার অন্তর্ভুক্ত করিতে চাহিয়াছেন। ও, ডোনেল তাঁহার 'ভারতের আদমসুমারির বিবরণ' (১৮৯১)-এ মন্তব্য করিয়াছেন যে উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের জাতিগত অবস্থান নির্ণয়ের বিষয়টি যদিও বিতর্কমূলক, তথাপি তাঁহাদিগকে পূর্ব গিরিপথ সমূহ দিয়া মঙ্গোলীয় জাতির তৃতীয় আগমন ধারার শাখা ধরা যাইতে পারে।[illegible] ইহার পূর্বে বি, এইচ, হজসন তাঁহার "এস্যে অন কোচ বোডো এ্যান্ড ধীমল ট্রাইবস" (১৮৪৯)[illegible] এবং পরবর্তীকালে স্যার জর্জ আব্রাহাম গ্রীয়ার্সন 'লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে অব ইন্ডিয়া' (১৯২৭)[illegible] গ্রন্থে সমজাতীয় অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহার বহু পূর্বে মহম্মদ ইখতিয়ারউদ্দীন বখতিয়ার খিলজীর গৌড়-কামরূপ আক্রমণের[illegible] বিবরণমূলক গ্রন্থ 'তবকাৎ-ই-নাসিরী'-তে "কোচ-মেচ থারু" সম্প্রদায়ত্রয়কে মঙ্গোলীয় শাখার লোক বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।[illegible] পরস্পর বিরোধী এই দুই মতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য একটি তৃতীয় মতও প্রচলিত আছে। এই মতে বলা হয় যে বিষ্ণুপন্থী রাজবংশীরা দ্রাবিড়ীয় এবং শিবপূজক কোচসমূহ মঙ্গোলীয়।[illegible]

প্রথম অভিমতটি সম্পর্কে আমাদের বক্তব্যের একটু আভাস পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। আমাদের মনে হয় উত্তরবঙ্গ ছাড়াও অন্যত্র রাজবংশী নামে সম্প্রদায় রহিয়াছে, তাঁহাদের সহিত আমাদের প্রকল্প সংশ্লিষ্ট রাজবংশীদের কোনো সাদৃশ্যই নাই, সম্ভবত দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের রাজবংশীদের সহিত উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের গুলাইয়া ফেলার দরুন এইরূপ ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে। তৃতীয় মতটিও আমরা সমর্থন করিতে পারিতেছি না। কেননা এইসব অভিমতের জন্ম হইয়াছে রাজবংশী সমাজের বরণীয় নেতা রায়সাহেব পঞ্চানন বর্মা, এম.এ, বি. এল. এম. এল. সি, এম. বি. ই কর্তৃক রঙপুরে ক্ষত্রিয় আন্দোলনের পরবর্তীকালে। রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজের নেতৃস্থানীয়

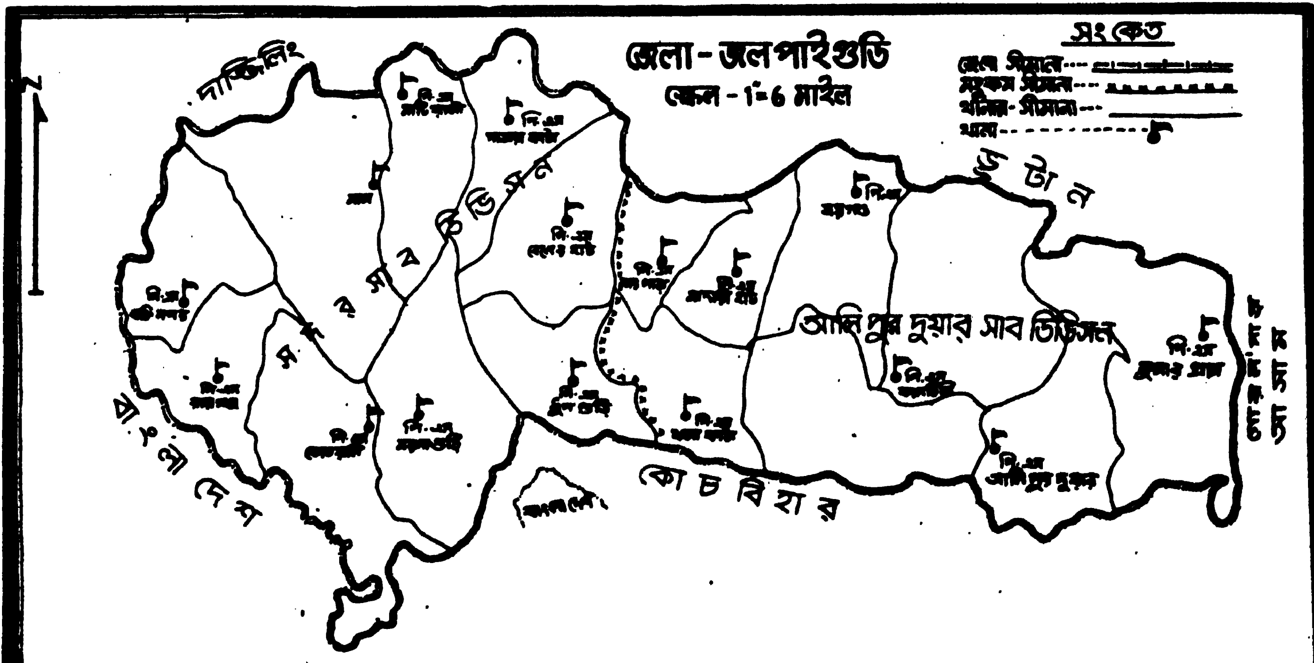
ব্যক্তিরা এখনও কোচ ও রাজবংশী বলিতে পৃথক জাতি বুঝিয়া থাকেন। রাজবংশী সমাজের ক্ষত্রিয়ত্বের দাবি তৎকালীন রংপুর ধর্মসভার পণ্ডিতগণ কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছিল।[১১] গণআন্দোলনের নিকট তৎকালের আদমসুমারী বিভাগের অধ্যক্ষরা যে প্রভাবিত হইয়াছিলেন তাহার প্রমাণ ও ম্যালের একটি বক্তব্য। তিনি বলিতেছেন : 'কোচ হইতে রাজবংশী জাতি ভিন্ন' এই দাবি অসংকোচে মঞ্জুর করা হইল। জাতির উৎপত্তি সম্পর্কে যতই প্রশ্ন থাকুক, আজ ইহাতে কোনোই সন্দেহ নাই যে রাজবংশী ও কোচ পৃথক জাতি।[১২]

রাজবংশীদের উদ্ভবের বিষয়ে আমরা দ্বিতীয় অভিমতটিকেই গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক, অর্থাৎ তাঁহারা ইন্দোমঙ্গোলীয় জাতির শাখা বিশেষ। আসাম, ব্রহ্মদেশ, ত্রিপুরা, নেপাল এবং হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত স্থানগুলির লোকেদের মধ্যে যে মঙ্গোলীয় নৃ-শাখার দৈহিক আকৃতির বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়, তাহারই পরিপ্রেক্ষিতে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়কে বিচার করিলে এই মতের সমর্থন না করিয়া পারা যায় না। পরবর্তীকালে ইহাদের সহিত অস্ট্রিক দ্রাবিড় গোষ্ঠীর মিশ্র জাতি বাঙালীদের সংস্কৃতি সংমিশ্রণ ঘটিতে পারে।

ভাষাচার্য ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় রাজবংশীদিগকে মঙ্গোলীয় নৃ-জাতির তিব্বত-ব্রহ্মদেশীয় ভাষা শাখার লোক বলিয়াছেন। অতএব এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে—রাজবংশীরা কখন উত্তরবঙ্গে বসতি স্থাপন করেন এবং কখন তিব্বত-ব্রহ্মদেশীয় ভাষা পরিত্যাগ করিয়া ভারতীয় আর্যভাষা সমেত স্থানীয় ভাষাকে নিজের ভাষা হিসাবে গ্রহণ করেন। বিষয়টি অত্যন্ত জটিল ও বিতর্কমূলক, ফলত সমাধানের প্রশ্নে ঐকামত প্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা কম থাকিলেও আমরা আনুমানিক একটি আপাত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি। কেননা বিষয়টি স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে গবেষণার অপেক্ষা রাখিতে পারে।

ভাষাচার্য শ্রদ্ধেয় ডঃ চট্টোপাধ্যায় অনুমান করিয়াছেন যে, খৃষ্টাব্দ গণনার সময়েই আসাম, পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে তিব্বত ব্রহ্মদেশীয় ভাষাশাখার বৃহৎ বোড়োজাতির মেচ-কোচ-কাছারি প্রভৃতি সম্প্রদায়গুলি বসতি স্থাপন করেন[১৩]। অন্যদিকে চতুর্থ খৃষ্টপূর্বাব্দে মৌর্য শাসনের সময় বাঙলাদেশে আর্যীকরণ আরম্ভ হয় এবং সম্ভবত গুপ্ত শাসনের কালে সপ্তম খৃষ্টাব্দে তাহা প্রায় সম্পূর্ণ হয়।[১৪] সুতরাং খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে আর্যভাষীরা এবং উহার কিছু কাল পরে তিব্বত ব্রহ্মীয়ভাষীরা যদি বঙ্গদেশে প্রবেশ করিয়া থাকেন তাহা হইলে ইহা অনুমান করিতে অসুবিধা নাই যে বঙ্গদেশে আর্যভাষী বনাম প্রাগার্যভাষীদের ভাষা-সভ্যতা সংস্কৃতির সংঘাত সমন্বয়-গ্রহণ বর্জন যখন চলিতেছিল, তখন উহাতে আর্যপর তিব্বত ব্রহ্মীয় ভাষাশাখার লোকেদের একটা সবিশেষ ভূমিকা বর্তমান ছিল। উপরন্তু সপ্তম খৃষ্টপর শতকের দিকে বঙ্গদেশে আর্যভাষা সভ্যতা-সংস্কৃতি তিব্বত-ব্রহ্মীয়ভাষাভাষীদের ক্ষেত্রেও সাধারণভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। ইহার নির্ভরযোগ্য প্রমাণ চৈনিক পরিব্রাজক হিউ-এন-সাঙ-এর বিবরণী। এতৎ-প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলিতেছেন :

"হিউ-এন-সাঙের সাক্ষ্য হইতে বলা যাইতে পারে যে সপ্তম শতাব্দের মধ্যে সমগ্র বঙ্গদেশে মোটামুটিভাবে আর্যভাষা গৃহীত হইয়াছে........। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় যে মধ্যভারতের ভাষা হইতে কামরূপের ভাষার মধ্যে তিনি সামান্য পার্থক্য লক্ষ্য করিয়াছেন।....... বাঙলা ও অসমীয়া ভাষার বর্তমান নিদর্শন হইতে যে কেহ ধারণা করিতে পারে যে ৭ম শতকে মধ্য-উত্তরবঙ্গ অর্থাৎ পুন্ড্রবর্ধন, উত্তরবঙ্গ এবং পশ্চিম আসাম অর্থাৎ কামরূপ প্রভৃতি অঞ্চলে একই তুল্যভাষা ব্যবহার হইত। আর্যভাষার উচ্চারণরীতি হইতে পরিবর্তনজনিত এই সামান্য পার্থক্যটি সম্ভবতঃ মাগধী প্রাকৃত বা অপভ্রংশ ভাষার লক্ষণ বলা যাইতে পারে।"[১৫]



অতএব খৃষ্টপর সপ্তম শতকেই রাজবংশী ক্ষত্রিয়গণ পূর্বাঞ্চলের কোনো একটি আর্যভাষার অন্তর্গত শাখা গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের কথ্য ভাষায় যে কয়েকটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়, তাহাও ভাষাচার্য নির্দেশিত মাগধী প্রাকৃত বা অপভ্রংশ ভাষার লক্ষণ বলিতে পারা যায়।

বৃটিশ সরকারের বেঙ্গল এস্টাব্লিশমেন্টের চিকিৎসক ফ্রান্সিস হ্যামিলটন বুকানন ১৮০৭ হইতে ১৮১৪ এই দীর্ঘ ৭ বৎসর কাল পূর্ব ভারতের স্থানগুলি হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইন্ডিয়া গেজেটিয়ার প্রকাশ করেন। বস্তুত পূর্ব ভারতের অজ্ঞাত ও অবহেলিত আদিম জাতিগুলির পরিচয় সর্বপ্রথম বুকাননই তুলিয়া ধরেন। পরবর্তীকালে গবেষকরা তাঁহার প্রদত্ত বিবরণের উপর ভিত্তি করিয়াই রাজবংশী ক্ষত্রিয় ও অন্যান্য সম্প্রদায়গুলি সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। বুকানন সাহেবের মতে বেশিরভাগ রাজবংশীই কোচ এবং তাঁহারা একই মূল বংশ হইতে উদ্ভূত।[৪৪] এইচ, রিভারলী এই মত সমর্থন করিয়াছেন।[৪৫] রিজলীর

উত্তরবঙ্গে রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজের মুখ্যতম দেবতা হইলেন শিব। এই অঞ্চলের শৈবধর্মই পরবর্তীকালে বঙ্গদেশের অন্যত্র পরিব্যাপ্ত হইয়াছে বলিয়া বিদগ্ধ পণ্ডিতেরা অনুমান করিয়া থাকেন। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ের মূল্যবান মন্তব্যটি স্মর্তব্য : "কোচ কৃষক সমাজেই বাংলার লৌকিক শৈবধর্মের প্রথম ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় ; কারণ, দেখিতে পাওয়া যায় যে, বাঙলার বহু দূরবর্তী অঞ্চলের প্রাচীন সাহিত্যেও শিবকে কোচ রমণীদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

মতে কোচ, রাজবংশী, পলিয়া, দেশিয়া প্রভৃতি সম্প্রদায় একই শাখার লোক।[৪৬] এ-ই-পার্টার এই মত স্বীকার করিয়াছেন।[৪৭] শ্রদ্ধেয় ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলিয়াছেন যে কোচেরা নিজেদের রাজবংশী বলিয়া পরিচয় দিতে গর্ববোধ করেন।[৪৮] আমরা দৈহিক গঠন, ভাষা-সভ্যতা সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে এই মতকে সমর্থন করিতে চাই। বস্তুত এই বিষয়গুলিতে কোচ-রাজবংশী পলিয়াদের মধ্যে সামান্যতম স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয় না। অবশ্য যদি কোথাও ইহার কোনোরূপ ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে তাহা হইলে আঞ্চলিক প্রতিবেশের প্রভাবের দরুন হইয়া থাকিতে পারে। পলিয়া সমাজকে রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির মধ্যে গণ্য করিলেও উক্ত সম্প্রদায়টির নেতৃবর্গকে কোচ সমাজকে অভিন্ন বলিয়া মানিয়া লইতে দেখা যায় না। রাজবংশী ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের সামাজিক প্রতিষ্ঠান ক্ষত্রিয় সমিতি। স্বাধীনতা লাভের পূর্বেই কোচ ও রাজবংশী যে পৃথক জাতি এবং তাঁহারা যে ক্ষত্রিয় শ্রেণীভুক্ত এই আন্দোলন ক্ষত্রিয় সমিতির মাধ্যমে চলিয়াছিল।[৪৯] পূর্বেই আমরা বলিয়াছি যে তাঁহাদের প্রথম দাবিটি তৎকালীন জনগণনা আধিকারিকগণ কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছিল। আমরা প্রধানত কয়েকটি কারণে এই দাবি মানিয়া লইতে পারিতেছি না।

প্রথমত রাজবংশী ও কোচের দৈহিক গঠন অভিন্ন, অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে মঙ্গোলীয় প্রভাব প্রচুরভাবে বর্তমান।

দ্বিতীয়ত উভয় সমাজের মধ্যে বহুপূর্ব হইতেই বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন প্রচলিত।

তৃতীয়ত উভয়ের ধর্ম-কৃষ্টি-সভ্যতা-সংস্কৃতি-ভাষা-সাহিত্য, জীবনযাত্রা প্রণালী অর্থাৎ সমস্ত কিছুই সম্পূর্ণত অভিন্ন।

চতুর্থত যে সকল যুক্তির ভিত্তিতে রাজবংশীরা নিজেদের ক্ষত্রিয় বলিয়া দাবি করেন সেই সকল যুক্তিতে কোচগণও নিজেদের ক্ষত্রিয় বলিয়া দাবি জানান। রাজবংশীদের প্রধান দাবি তাঁহারা পরশুরামের অত্যাচারে আত্মগোপন হেতু হিমালয়ের পাদদেশে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হন। কোচগণেরও দাবি, তাঁহারা পরশুরামের ভয়ে ভগবতীর কোচে অর্থাৎ কোলে আশ্রয় গ্রহণ করেন অথবা সঙ্কুচিত হন কিংবা সঙ্কোচ[৫০] নদীর তীরে বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। এই কোচ, সঙ্কোচ বা সংকোচ হইতে কোচ শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া তাঁহাদের ধারণা।[৫১] অর্থাৎ উভয়ে ক্ষত্রিয় জাতির অংশ এবং পরশুরামের ক্ষত্রিয় নিধনজনিত ভয়ে উত্তরবঙ্গে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং কোচ ও রাজবংশী নিঃসংশয়িতভাবে অভিন্ন না বলিয়া পারা যায় না।

পঞ্চমতঃ আসামে রাজবংশী জাতির পরিচয় কোচ-রাজবংশী নামে।

কোচ রাজবংশী পলিয়া সমাজত্রয়কে অভিন্ন হিসাবে গণ্য করিলে স্বাভাবিকভাবেই পূর্বোক্ত সংখ্যাটি কিছু বাড়িতে পারে। ১৯৬১ সালের আদমসুমারিতে ৩৫২২ জন কোচ এবং ৭৩৯৯৭ পলিয়া দেখা হইয়াছে। সুতরাং সমাজত্রয়ের মোট মিলিত সংখ্যা দাঁড়াইবে ৮৯৮১৯৯ রাজবংশী + ৭৭৫১৯ কোচ পলিয়া = ১৮৮৩৯১৭ জন। আমাদের সংশ্লিষ্ট সমাজ রাজবংশী ক্ষত্রিয় বলিতে এই সমাজত্রয়কেই বুঝিতে হইবে।

কোচ ও রাজবংশী শব্দ দুটির মধ্যে আমরা কোচ নামটিকেই আদি ও প্রকৃত বলিয়া সাব্যস্ত করিতে চাই। দিনাজপুর হইতে প্রাপ্ত ৮৮০ শক অর্থাৎ ৯৭৬ খৃষ্টাব্দের বাণগড় শিলালিপিতে কাম্বোজ রাজবংশের জনৈক গৌড়াধিপতি কর্তৃক শিবমন্দির স্থাপনের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাতে আধুনিককালের কোচকেই যে বুঝান হইয়াছে তাহা অনুমান করা যাইতে পারে।[৫২] ভাষাচার্য ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে কোচ শব্দটিরই সংস্কৃতায়িত রূপ কম্বোজ[৫৩] এবং যোগিনীতন্ত্র ও পদ্মপুরাণে যাহা 'কুবাচ' ও 'কুবাচক' হইয়াছে।[৫৪] ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, পঞ্চদশ শতাব্দীতে লিখিত দেবীবর মিশ্রের 'মেলবিধি' এবং ধ্রুবানন্দ মিশ্র লিখিত 'কুল-কারিকা' প্রভৃতি গ্রন্থে কোচ বা কোচক জাতির উল্লেখ আছে।[৫৫] সপ্তদশ শতকের 'তারিখে আসাম' ও 'আলমগীর নামা', অষ্টাদশ শতাব্দীর বিয়াজোস সালাতিন, উনবিংশ শতকের 'মোরসেদ জাহাঁনামা' প্রভৃতি মুসলমান ঐতিহাসিক লিখিত গ্রন্থে এতদঞ্চলের অধিবাসী বলিয়া কোচ ও মেচ ব্যতীত অন্য কোনো জাতির উল্লেখ নাই।[৫৬] ত্রয়োদশ

শতকে লিখিত মিনহাজুস সিরাজ-এর 'তবকাৎ-ঈ-নাসিবী' হইতে প্রমাণ মিলে যে তৎকালে কামরূপ 'কোচ-মেচ থারু' সম্প্রদায়ত্রয় দ্বারা অধ্যুষিত ছিল। উপরন্তু বাঙলা মঙ্গলকাব্যগুলিতে কোচ রমণীর প্রতি শিবের আসক্তির প্রসঙ্গও স্মরণীয়। লক্ষণীয় উল্লিখিত গ্রন্থগুলিতে বা এই সময়ে রচিত অন্য কোনো গ্রন্থে রাজবংশী বলিয়া কোনো জাতির নাম পাওয়া যায় না। কালিকাপুরাণ, ভ্রামরীতন্ত্র নামে পুরাণ বা উপপুরাণদ্বয়কে সুপ্রাচীন কালের না ধরিলে ইহাদের মাধ্যমে আমদানীকৃত 'রাজবংশী' শব্দটিকেও অনায়াসেই অবাচীন ধরিতে হয়। ফলে কোচ নামটিকেই আদি ও প্রকৃত না ধরিয়া উপায় থাকে না।

রাজবংশীরা সম্পূর্ণত কৃষিনির্ভর এবং ইঁহাদের অর্থনৈতিক জীবন ভারতের অন্যান্য প্রদেশের কৃষিজীবীদের ন্যায় অত্যন্ত সাধারণ মানের। ইঁহাদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার আশানুরূপভাবে হয় নাই। দরিদ্রতম বলিয়া ঘরবাড়ি, আসবাবসামগ্রী, পোষাক-পরিচ্ছদ, জীবনযাত্রা প্রণালী সকল কিছুই সাধারণ এবং বিলাসিতা ইঁহাদের মধ্যে এখনো প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। বিষয়গুলি সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় ডঃ চারুচন্দ্র সান্যাল মোটামুটি সম্পূর্ণ ও সুন্দরভাবে 'দি রাজবংশীজ অব নর্থ বেঙ্গল' গ্রন্থে আলোচনা করিয়াছেন। তাই উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের সহিত অত্রাঞ্চলের অন্যান্য জাতি ও উপজাতিগুলির অর্থনৈতিক জীবন লইয়া আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা হইতে বিরত থাকিতেছি।

রাজবংশীদের ধর্ম সম্পর্কে প্রায় সকল বরেণ্য পণ্ডিতগণের একটি বিশেষ মনোভাব কাজ করিয়াছে যে কোচবিহার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ বিশ্বসিংহের আমলে তাঁহারা হিন্দুকৃত হইয়াছেন। আমরা এই মনোভাবটিকে সমর্থন জানাইতে ইতস্ততঃ বোধ করিতেছি। কেননা : "....ভারতীয় সাংস্কৃতিক জনতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের আলোচনা যত অগ্রসর হইতেছে ততই আমরা স্পষ্ট জানিতেছি যে, আজ আমরা যাহাকে হিন্দু ধর্ম কর্ম সাধনা বলিয়া জানি তাহা একদিকে আর্য অন্যদিকে প্রাক্ আর্য বা অনার্য ধর্মসাধনার সমন্বিত রূপ মাত্র। বস্তুত, "আর্য-ব্রাহ্মণ্য সাধনায় যথার্থ আর্য প্রবাহ ক্ষীণ ; ক্রমে ক্রমে কালে কালে নানা বিচিত্র প্রবাহ সে প্রবাহে সমন্বিত হওয়ার ফলে আজ সে প্রবাহ প্রশস্ত ও বেগবান"। অথবা "ভারতবর্ষের বাইরে থেকে এসে ভারতবর্ষের মধ্যে আর্যেরা যাঁদের দেখা পেলেন, তাঁদের ডাকলেন 'অনাব্রত' বলে। এটা ঠিক যে আর্যেরা আসবার আগে এদেশে দলে দলে এইসব 'অনাব্রত'......—নিজেদের আচার অনুষ্ঠান দেবতা অপদেবতা কলাকৌশল ভয় ভরসা হাসি কান্না নিয়ে বাস করছিলেন। এবং এটাও ঠিক যে ভারতবর্ষের বাইরে থেকে যাঁরা এলেন এবং এদেশের মধ্যে যাঁরা ছিলেন সেই আর্য এবং না-আর্যরা 'অনাব্রত'-দের মধ্যে সব দিক দিয়ে, এমনকি বিয়েতে এবং ভোজেতেও আদান-প্রদান চলেছিল। পুরাণের দেবদেবীদের ইতিহাস এই আদান-প্রদানের ইতিহাস, ধর্মানুষ্ঠানের দিক দিয়ে শাস্ত্রীয় ব্রতগুলির ইতিহাসও তাই ;........"। সুতরাং পঞ্চদশ শতকের পূর্বেকার রাজবংশী ক্ষত্রিয় অর্থাৎ কোচ সম্প্রদায়কে কেন যে অহিন্দু ভাবিতে হইবে বা তৎকালে প্রচলিত এই সমাজের ধর্মকর্মানুষ্ঠানসমূহকে কেন যে অহিন্দুজনোচিত ভাবিতে হইবে তাহা বুঝিয়া উঠা দুষ্কর। আমাদের পূর্বে উল্লিখিত সিদ্ধান্ত অনুসারে রাজবংশীদিগকে ইন্দো-মঙ্গোলীয় নৃ-শাখার লোক ধরিলেও ইঁহাদিগকে অহিন্দু বলিয়া কল্পনা করা উচিত হইবে না। কারণ, প্রথমত হিন্দুধর্মসভ্যতা সংস্কৃতিতে ইঁহাদের অবদান অনস্বীকার্য, দ্বিতীয়তঃ, আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে বঙ্গদেশে যখন আর্যীকরণ চলিতেছিল তখনই হিন্দুধর্ম ভাষাসংস্কৃতিকে রাজবংশীরা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাই রাজবংশীদিগকে হিন্দু বলিয়া গ্রহণ করা সমীচীন হইবে বলিয়া মনে করি। হিন্দুধর্ম বলিতে বিশেষ কোনো একটি প্রথা বা বিশ্বাস বোঝায় না, নানাবিধ বিশ্বাস ও প্রথার সমন্বিত রূপ হিন্দুধর্ম। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ক্ষত্রিয় সম্প্রদায় অবশ্যই হিন্দু, ফলত বঙ্গদেশের অন্যান্য হিন্দু শাখার সহিত ইঁহাদের ধর্মকর্ম ও আচার অনুষ্ঠানের সাদৃশ্য থাকা একান্তই স্বাভাবিক। কিন্তু আমরা যথাস্থানে লক্ষ্য করিতে পারিব যে আঞ্চলিকতার দরুন কতক কতক ক্ষেত্রে রাজবংশীদের দেবদেবী ও আচরিত ধর্ম-কর্মানুষ্ঠানের একটি স্বাতন্ত্র্য রহিয়াছে। দেশ ও কাল অনুসারে এই জাতীয় ঘটনা ঘটিতেই পারে। এবং বলা চলে এই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যই আমাদিগকে বর্তমান প্রকল্পটিকে গ্রহণ করিতে অনুপ্রাণিত করিয়াছে।

"আর্য এবং আর্য পূর্ব দুজনেরই সম্পর্ক যে পৃথিবীতে তারা জন্মেছে তাকেই নিয়ে, এবং দুজনেরই কামনা এই পৃথিবীতেই অনেকটা বদ্ধ ধন-ধান-সৌভাগ্য-স্বাস্থ্য দীর্ঘজীবন এমন সব পার্থিব জিনিস ;..........।" তাই হিন্দু অ-হিন্দু জাতিমাত্রেরই কামনা বাসনা ভয় ভরসা হইতেই ধর্মের উৎপত্তি হইয়াছে বলা যায়। সম্ভবত 'ধর্ম' শব্দটির প্রকৃত তাৎপর্যও তাহাই, অর্থাৎ যাহা জীবনকে সুন্দর ও সুচারু রূপে ধারণ করিয়া রাখে বা যাহাকে ধারণ করিয়া সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে জীবন পরিচালনা করিতে পারা যায়। রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজের প্রার্থনীয় কামনা-বাসনাও একান্তভাবে পার্থিব এবং অতএব জীবনের প্রয়োজনীয়তাকেন্দ্রিক।

রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজটি সম্পূর্ণত কৃষিনির্ভর, ফলতঃ উপনিষদের 'পঞ্চকোষ' তত্ত্বের 'অন্ন-প্রাণ-মন-বিজ্ঞান-আনন্দ' সকল কিছুই কৃষিকর্মের মধ্যে নিহিত বা সীমিত। ইঁহাদের প্রায় সকল দেবদেবীর পরিকল্পনা, পূজা-উৎসবাদি এবং পূজা-উৎসবকেন্দ্রিক সঙ্গীত ইত্যাদি কৃষিকৃত্যের আধারে রূপ লাভ করিয়াছে। বিশুয়া, বৈশাখী-আষাঢ়ী সেবা, আমাতি, ধানের ফুল আনা, ক্ষেতিলক্ষ্মীর পূজা, পুষুনা, বুড়াবুড়ী, চড়ক ইত্যাদির পূজা ও উৎসবকে সম্পূর্ণভাবে কৃষিপূজাই বলিতে হয়। সংবৎসরের বিভিন্ন কালে কৃষিকার্যের স্তর ভেদে এই সকল কৃত্য সমাজমনে দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করিয়াছে। অনাবৃষ্টিজনিত কৃষিকর্মের অসুবিধা দূরীকরণার্থ হুদুমদেওঠাকুর পূজা এবং তাহার আনুষঙ্গিক কৃত্যাবলীর সৃষ্টি হইয়াছে। নদ-নদীর প্লাবনের প্রাবল্য যেমন মানুষ ও মনুষ্যেতর প্রাণীর অসুবিধা সৃষ্টি করে, ফসলের প্রভূত ক্ষতির কারণ হয়, তেমনই জমির উর্বরত্ব বৃদ্ধিরও সহায়ক হইতে পারে। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজে প্রচলিত নদী পূজা তিস্তাবুড়ীর পূজা এবং তৎসংশ্লিষ্ট মেচেনী খেলা নামীয় সঙ্গীত শাখাটিকেও কৃষিকৃত্যের পর্যায়ভুক্ত করা যাইতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্রই গ্রামঠাকুর তাঁহার নির্দিষ্ট স্থানে পূজা পাইয়া আসিতেছেন। উত্তরবঙ্গেও ইহার ব্যতিক্রম নাই। অত্রাঞ্চলেও গ্রামঠাকুর বিভিন্ন নামে ও বিভিন্ন ভাবে পূজা পাইয়া থাকেন। এই পূজা সাধারণত কর্ষিত জমি রোপণযোগ্য হইলে পর, জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসের দিকে সম্পন্ন হইয়া থাকে। অর্থাৎ হৈমন্তিক ধানের বীচন বা চারাগাছ জমিতে প্রোথিত করিবার পূর্বেই গ্রামঠাকুরের পূজা

দেওয়া হয়। সুতরাং ইহার সহিতও কৃষির সম্পর্ক সুনিবিড়। থানচিরি অর্থাৎ 'স্থানশ্রীরও সঙ্গে কৃষির ঘনিষ্ঠতা বর্তমান, কেননা আনুষ্ঠানিক ধান্যচ্ছেদনের পর শিষগুলি তাঁহার প্রতীক বংশদণ্ডে বাঁধিয়া দেওয়া হয়।

উত্তরবঙ্গে রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজের মুখ্যতম দেবতা হইলেন শিব। এই অঞ্চলের শৈবধর্মই পরবর্তীকালে বঙ্গদেশের অন্যত্র পরিব্যাপ্ত হইয়াছে বলিয়া বিদগ্ধ পণ্ডিতেরা অনুমান করিয়া থাকেন। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ের মূল্যবান মন্তব্যটি স্মর্তব্য : "কোচ কৃষক সমাজেই বাংলার লৌকিক শৈবধর্মের প্রথম ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় ; কারণ, দেখিতে পাওয়া যায় যে, বাঙলার বহু দূরবর্তী অঞ্চলের প্রাচীন সাহিত্যেও শিবকে কোচ রমণীদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। বাঙলার সর্বত্র প্রচলিত লৌকিক ঘিরে ছড়ায় কোচনী রমণীর প্রতি শিবের আসক্তির বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়। অতএব মনে হয় কোচ জাতীয় কৃষকদিগের সমাজেই পৌরাণিক শিব সর্বপ্রথম আসিয়া প্রবেশ লাভ করেন ; অতঃপর সেখানেই তাঁহার চরিত্র স্থানীয় কোচদিগের সামাজিক জীবনের উপাদানমিশ্রিত হইয়া একটি স্থানীয় ও লৌকিক ভাষা পরিগ্রহণ করে, কালক্রমে তাহাই বঙ্গের সর্বত্র প্রচার লাভ করে।"[১] অনুমানটিকে গ্রাহ্য করিলে ইহা অবশ্যই সমর্থন করিতে হয় যে কোচ অর্থাৎ রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজে প্রচলিত শিব পূজায় আদিম শৈবানুষ্ঠানের কতক কতক রীতিপদ্ধতির সাক্ষাৎ আজও মিলিতে পারে। যাহাই হউক এই শিবও কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে কৃষি-দেবতা। বিশেষত শৈব প্রতীকগুলি বিশ্লেষণ করিলে, যেমন বৃক্ষ, সর্প, লিঙ্গ ইত্যাদির মূলে একান্তভাবে যে কৃষিভাবনা ছিল তাহা বুঝিতে অসুবিধা হয় না।

উত্তরবঙ্গে শিব নানা নামে ও রূপে পূজা ও মান্য পাইয়া আসিতেছেন। শিবের এই জাতীয় আঞ্চলিক নাম ও রূপগুলিকে গ্রামঠাকুর হিসাবেও অনুমান করা যায়। সুতরাং তাঁহাদের মূলে কৃষিকৃত্যের পরিকল্পনা থাকা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু কৃষিভাবনা ব্যতিরেকেও ইঁহাদের পূজার মূলে অন্য কোনো কারণ সংগুপ্ত থাকাও অসম্ভব নহে। যেমন উত্তরবঙ্গে রাজবংশীদের ধারণায় মহাকাল হইতেছেন ব্যাঘ্রদেবতা। ইঁহাদের আরও একজন ব্যাঘ্র দেবতা আছেন, তাঁহার নাম সোনা রায়।

উত্তরবঙ্গ একদা ঘন বনাঞ্চলে আবৃত ছিল, সুতরাং হিংস্র শ্বাপদের অত্যাচার কম ছিল না বলিয়া মনে হয়। চৈত্র সংক্রান্তির দিনে কৃষিকেন্দ্রিক বিশুয়া কৃত্যটিকে হিংস্র জন্তুর অত্যাচার প্রতিহত করিবার যৌথ আক্রমণের স্মরণিকা হিসাবে ধরা যাইতে পারে। ব্যাঘ্র ভীতি দূরীকরণের জন্য যদি মহাকালঠাকুরের উদ্ভব হয়, তাহা হইলে হিংস্র জন্তুর অত্যাচার জনিত ভীতি ভান্ডানী দেবীর স্রষ্টা এমন অনুমান অসংগত নয়। বনের কাষ্ঠ সংগ্রহকারীদের দ্বারা পূজিত শালগিরিঠাকুর সম্ভবত এই জাতীয় দেবতা। ঝাড়জঙ্গল ঘেরা কেবল বঙ্গদেশে নহে, প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষে সর্পভীতির কারণটি মনসা ওরফে রাজবংশীদিগের বিষহরীকে জন্মদান করিয়াছে। নবান্নোৎসবে শিয়ালঠাকুরের নামে অর্ঘ্যদান অভিনব তথা কৌতূহলোদ্দীপক।

ব্যাঘ্রভীতি ভল্লুকভীতি মহাকাল সোনারায় ভান্ডানী শালশিরি পূজার মূলে থাকিলে ইহাকে পশুপূজার নামান্তর বা রূপান্তর বলা যাইতে পারে কিনা তাহা ভাবিতে হইবে। কেননা পৃথিবীর অনেক আদিমজাতির মধ্যে পশুপূজার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজে এই জাতীয় কৃত্যের সন্ধান মিলে, যেমন বৎসরে একাধিকবার গোজাতির পরিচর্যা ইঁহারা করিয়া থাকেন। গোরখনাথ ঠাকুরের নামটির তাৎপর্যও খুঁজিয়া দেখিতে হইবে।

কালীদেবীও এই অঞ্চলের রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজে প্রচুর মান্য পাইয়া আসিতেছেন এবং তিনিও কৃষির সঙ্গে এবং ইহলৌকিক নানাবিধ সুখদুঃখের কারণ সৃষ্টির সঙ্গে জড়িত। দশমহাবিদ্যার দশরূপা ব্যতিরেকেও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন নামের কালীর সহিত আমরা পরিচিত হইতে পারিব। তন্ত্রবিহিত কালী সাধনার একটি অন্যতম প্রধান কেন্দ্র এই উত্তরবঙ্গ ছিল বলিয়া মনে হয়।

বৃক্ষোপাসনাও রাজবংশী সমাজে সুপ্রচলিত। প্রত্যেক রাজবংশীর বাড়িতে তুলসীমঞ্চ থাকিবেই এবং যাবতীয় পূজা-অনুষ্ঠান সেইখানেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। বন্ধ্যাত্বমোচন কিংবা শিশুর দীর্ঘজীবন কামনায় জিগাগাছের পূজা বা তাহার সহিত সখীত্ববন্ধন ও বট পাকুড় গাছের বিবাহদান অভিনব ব্যাপার। অপদেবতার কুদৃষ্টি এড়াইবার জন্য পথপার্শ্বস্থিত খড় ইত্যাদির জুড়া অর্থাৎ নুড়া জাতীয় বস্তু গাছে বাঁধিয়া দেওয়া হয় কিংবা গাছের গোড়ায় ছুঁড়িয়া দেওয়া হয়। জলপাইগুড়ি-দার্জিলিং-কোচবিহার জেলায় এই জাতীয় দেবতার নাম জুড়াবান্ধা ঠাকুর, আবার দুই দিনাজপুর ও মালদহ জেলায় ইহার সহিত পীর শব্দ যুক্ত হইয়া জুনাপীর হইয়া গিয়াছে। বড় বড় গাছের নিচে থান তৈয়ারি করিয়া পূজাদানের ব্যাপারটির সহিত কোনো না কোনো ভাবে বৃক্ষ পূজার সম্পর্ক লুক্কায়িত থাকা অসম্ভব নহে। রাজবংশীদিগের কৃষিকৃত্যগুলির অনেক স্থলেই গাছের সহিত সুনিবিড় সম্পর্ক রহিয়াছে। বিশুয়া অনুষ্ঠানে গাঁজা, পানিমুথারি প্রভৃতি জাতীয় লতাপুষ্পের অংশ চালে গুঁজিয়া দেওয়া হয়। গচিবুনা অর্থাৎ ধান্য-রোপণের আনুষ্ঠানিক কর্মে কলা গাছ, কচু ও পাট গাছ প্রভৃতি উপাদানের প্রয়োগও এতৎপ্রসঙ্গে স্মর্তব্য। বাঁশখেলা মদনকাম প্রভৃতি উৎসবে বিচিত্রবর্ণ সুসজ্জিত বংশদণ্ডবহন ব্যাপারটির মধ্যে বাঁশপূজার ইঙ্গিত যে লুকাইয়া নাই, তাহা বলা যাইবে না।

শ্রদ্ধেয় ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় বলিয়াছেন : "প্রাচীন ভারতবর্ষের ধর্মকর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে যাঁহারা পরিচিত তাঁহারা জানেন ....নানাপ্রকারের ধ্বজাপূজা ও উৎসব এক সময় আমাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। প্রাচীন বাংলাদেশও তাহার ব্যতিক্রম ছিল না.......সাঁওতাল, মুন্ডা, খাসিয়া, রাজবংশী, গারো প্রভৃতি আদিবাসী কোম এবং বাঙালীর তথাকথিত অন্ত্যজ জনসাধারণের মধ্যে কোনো ধর্মকর্ম ধ্বজা এবং ধ্বজাপূজা ছাড়া অনুষ্ঠিত হয় না প্রায় বলা চলে।"[২] মন্তব্যটি যাথার্থ্য দাবি করিতে পারে। তুলসীমঞ্চে, গ্রামঠাকুরের থানে, বিষহরী এবং অন্যান্য দেবদেবীর মন্দিরে, এমনকি সাময়িকভাবে নির্মিত পূজা বা উৎসবমণ্ডপেও সাদা ও লালরঙের পতাকা লম্বা বাঁশের দণ্ডে উড়িতে দেখা যায়। কতক কতক অঞ্চলে তুলসীমঞ্চের পার্শ্বের পতাকাটিকে হনুমানঠাকুরের প্রতীক বলিয়া পূজা করা হয়। ইহা প্রাচীন ভারতীয় প্রথার কপিধ্বজের ক্ষীণ স্মৃতি কি না দেখা দরকার।

শারদীয়া দুর্গোৎসবের নবমী এবং কোথাও দশমীর দিনটিকে রাজবংশী ক্ষত্রিয়গণ যাত্রাপূজার দিন বলিয়া পালন করিয়া থাকেন। হলযাত্রা, গবাদি পশুর পরিচর্যা ইত্যাদি কৃত্য থাকিবার হেতু ইহাকে

কৃষিপূজাও বলিতে হয়। লক্ষণীয় যে যাত্রাপূজার অন্যতম অঙ্গ সরস্বতী দেবীর পূজা। সাধারণ দুর্গা ও সরস্বতী পূজায় যে রীতি পদ্ধতি অধুনা প্রচলিত হইয়াছে তাহা নিতান্ত আধুনিক কালের বলিয়া মনে হয়। কেননা এই পূজা দুইটিতে রাজবংশীদের নিজস্ব পুরোহিত অধিকারীর দুর্গা ও সরস্বতী পূজার কোনো অধিকার থাকে না। অথচ অধিকারী দ্বারাই পূজা প্রদান রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজের আদি ও প্রকৃত বৈশিষ্ট্য। যাত্রাপূজার দিনে সরস্বতী পূজাটিকেই আমরা এই সম্প্রদায়ের প্রকৃত বাণীবন্দনা বলিয়া অনুমান করিতে চাই।

লক্ষ্মীপূজা সম্বন্ধেও আমাদের ধারণা অনুরূপ। প্রতি বৃহস্পতিবার লক্ষ্মীপূজার দিন হিসাবে সাধারণ বাঙালি সমাজে যাহা ধার্য রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজে তাহা দেখা যায় না। কোজাগরী লক্ষ্মীপূজাটিও বাঙালী সমাজটির নিকট রাজবংশীগণ গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় এবং আমাদের অনুমানে ক্ষেতি বা ডাকলক্ষ্মীর পূজাটিই ইহাদের আদি ও অকৃত্রিম লক্ষ্মী অর্চনা।



মনীষী রায়সাহেব ঠাকুর পঞ্চানন বর্মা ছবি : হিমাংশু দেব

উত্তরবঙ্গ দীর্ঘদিন মুসলমান শাসনাধীন ছিল। হিন্দু ও মুসলমান ধর্মসম্প্রদায়দ্বয় পাশাপাশি বসবাস করিবার ফলে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজের মধ্যে অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণে ঐশ্লামিক কিছু ভাবধারার অনুপ্রবেশ ঘটিতে দেখা যায় যাহা বাঙালী হিন্দুর অপরাপর শাখাগুলিতেও অল্পবিস্তর সংঘটিত হইয়াছে। সত্যপীর, পাগেলাপীর, মাদারপীর প্রভৃতি মুসলমান দেবতার পূজা উৎসব এবং শিরনীদান প্রথা, বেড়াভাসান প্রভৃতি অনুষ্ঠান হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির সমন্বিত রূপ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। সমগ্র বিষয়টিকে স্বতন্ত্র অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনার চেষ্টা করা হইয়াছে।

অংশগ্রহণ-করণের দিক হইতে রাজবংশী সমাজে প্রচলিত পূজা-উৎসবসমূহকে মোট তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা (১) পাগেলাপীর, চোরখেলা, ভাডার ঘর ছুরা, বুড়াবুড়ী, হকাহকি এবং আমাতির শেষ পর্যায়টি একান্তভাবে বালকদের মধ্যে সীমিত, (২) ধানের ফুল আনা, মেচেনী খেলা, হুদুমাখেলা, বেড়াভাসান প্রভৃতি অনুষ্ঠান কেবলমাত্র নারী সমাজ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং (৩) অন্যান্য প্রায় সবগুলিই বয়স্ক পুরুষ পরিচালিত।

প্রবাদে বলে 'বাঙালীর বারো মাসে তেরো পার্বণ'। রাজবংশী ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়টির মধ্যেও পূজা উৎসবাদি কম নহে। ইহার মূলে মুখ্যত দুইটি কারণ সক্রিয় বলিয়া মনে হয়। প্রথমতঃ কৃষি কর্মের স্তরগুলিতে একটি হইতে অন্যটির মধ্যখানে সাময়িকভাবে একটি অবসর থাকে। এই অবকাশ যাপনের সুযোগ হইতে নানাবিধ দেবদেবী, পূজা-উৎসব-সঙ্গীত-নৃত্য ইত্যাদির কল্পনা করা হইয়াছে। দ্বিতীয়ত কৃষিকর্মে প্রাকৃতিক অনিশ্চয়তা কাটাইবার উদ্দেশ্যে কৃষকের অসহায় আদিম মানসিকতা স্বাভাবিকভাবে জাদুনিয়ন্ত্রিত কৃত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। রাজবংশীদিগের কৃষিকেন্দ্রিক অধিকাংশ পূজা উৎসবগুলির মধ্যে জাদুবিশ্বাসের তীব্রতা লক্ষ্য করা যায়।

"আদিম সমাজে উৎসব অনুষ্ঠান দেবতা নৃত্যগীতি কাহিনী কাব্য একই কৃত্যের আধারে মিলেমিশে ছিল; সমাজের ক্রম-রূপান্তরে জাদুবিদ্যা যেমন ধর্মে ও বিজ্ঞানে উপনীত, তেমনি নাচ গান কথা ইত্যাদি পটভূমি সরে সরে গিয়ে বিশুদ্ধ শিল্পরূপ নিতে থাকে, পরস্পর বিশ্লিষ্ট হয়ে বিকশিত বিবর্তিত হতে থাকে নিজ নিজ কক্ষপথে........তখন স্বকীয় স্বতন্ত্র পথে রূপ ও রূপান্তর লাভ করে তত্ত্ব দর্শন কথা কাব্য নৃত্য শিল্প গীত সাধন ধর্ম দেবতা। সংস্কৃতি হয় দ্বিধাবিভক্ত, কাল প্রবাহে বহুধাবিভক্ত, যেমন একটি সমাজ ভেঙ্গে পরিণত হয় বিভিন্ন শ্রেণীতে সম্প্রদায়ে।"[১] রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজের পূজা-উৎসব- সঙ্গীতের ব্যাপারেও এই সত্য থাকিতে পারে। ইহাদের অধিকাংশ পূজা-পার্বণের সহিত উৎসব অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বিশুয়া, নয়াখৈ, পুষুনা, ক্ষেতিলক্ষ্মী, দীপান্বিতা, চড়ক প্রভৃতি কৃত্যে পূজা ও উৎসবকে পৃথকভাবে দেখা যায় না। আবার অনেক পূজা উৎসবের সহিত সঙ্গীত সুনিবিড়ভাবে সংযুক্ত, যেমন তিস্তাবুড়ী, সোনারায়, মদনকাম, চড়ক প্রভৃতি। গান গাহিয়া চাউল সংগ্রহ করিয়া সেইগুলির বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা পূর্বোক্ত পূজাগুলির ব্যয় নির্বাহ করা হইয়া থাকে। বিবাহ বা মানসিক কারণে বিষহরী ও সত্যপীরের পূজায় সঙ্গীতই মুখ্য ব্যাপার। বিষহরী সত্যপীর প্রভৃতি পালাবদ্ধ গানে পুরুষেরা স্ত্রীবেশে নৃত্য পরিবেষণ করেন। বিষহরীর ভাসানে সাপের ভঙ্গীতে নৃত্য পরিবেশণের মধ্যে অভিনবত্ব আছে। অন্যান্য সঙ্গীত শাখাগুলিতে সামান্যভাবে নৃত্যের লক্ষণ মিলে। উৎসবকেন্দ্রিক সঙ্গীতগুলিকে প্রকল্পভুক্তির কারণ বলিলে বলিতে হয় যে এইগুলির মধ্যে উত্তর-বঙ্গের রাজবংশী ভাষা, দেবদেবী সম্পর্কিত রাজবংশীদের ধারণা ও বিশ্বাসের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। পালাবদ্ধ নহে এমন বিক্ষিপ্ত সঙ্গীতগুলির মধ্যে সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, চাওয়া-পাওয়া, মানুষের স্বভাব-চরিত্র, সমাজের রীতি-নীতি প্রভৃতি বিষয়ের সহিত পরিচিত হওয়া যায়। উপরন্তু শিক্ষিত শ্রেণী কর্তৃক অবহেলিত

সমাজের নিরক্ষর বা স্বল্পসাক্ষর মানুষগুলির মধ্যেও যে মাধুর্যমণ্ডিত কবিকল্পনা থাকিতে পারে এই সঙ্গীতসমূহ তাহার কিছুটা ইঙ্গিত দান করিতে পারিবে।

বিংশ শতকের শেষ পর্বে ভারতবর্ষে কোনো প্রাচীন সমাজই আদিম ভাবধারা লইয়া সম্পূর্ণভাবে চলিতেছে না, আধুনিকতার অপ্রতিরোধ্য ভাবধারার সহিত সমন্বয় সাধনের প্রবণতা প্রত্যেকটি সমাজেই লক্ষ্য করা যাইতেছে, এবং আমাদের রাজবংশী সমাজটিও যে ইহার সামিল হইতে চেষ্টা করিবে তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। রাজবংশীদিগের আচার-ব্যবহার, ভাষা-ভঙ্গী, এমনকি বলা যায় ইঁহাদের দৈহিক গঠনও বুঝি পরিবর্তনের পথে ঝুঁকিতেছে। এই দ্রুত পরিবর্তনের মুখে রাজবংশীদিগের আচরিত ধর্মকর্মানুষ্ঠানের অনেকগুলিই আজ প্রায় লুপ্ত হইয়াছে বা হইতে চলিয়াছে। ফলে অনেক দেবদেবীর কেবলমাত্র নাম পাওয়া যায়, পূজা অনুষ্ঠানের কোনো নিদর্শন মেলে না। ইহার কারণ একাধিক। সাধারণভাবে কারণগুলি এইভাবে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে :—

প্রথমত—উত্তরবঙ্গ বলিতে একদা কোচ-মেচ প্রভৃতি লোকেদেরই যে দেশ বুঝাইত তাহা ইতিপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। মহারাজ বিশ্বসিংহ এবং তৎপুত্র মহারাজ নরনারায়ণ তাঁহাদের রাজত্বকালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রধান প্রধান সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলি হইতে পণ্ডিত ব্রাহ্মণ আনিয়াছিলেন। উত্তরবঙ্গে স্থায়ী রাজবংশীদের মধ্যে সম্ভবত ইঁহারাই প্রথম বিদেশী। ইংরাজ আগমনের পূর্বে কোচবিহার রাজ্যের কিছু অংশ ভুটানের শাসনাধীন ছিল। ভোটপাটী, ভোটবাড়ী, ভোটের হাট, ভুটুনীর ঘাট প্রভৃতি স্থানের নাম হইতে অনুমান করিতে পারা যায় যে ভুটিয়ারা এই অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস করিয়াছিলেন। স্থানীয় মুসলমানগণ তো এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা। পরবর্তীকালে পার্শ্ববর্তী গৌড় রাজ্যের অ-রাজবংশী সমাজ পূর্বতন দিনাজপুর হইয়া উত্তরবঙ্গের অন্যত্র সামান্যভাবে ছড়াইয়া পড়িতে পারে। তথাপি মালদহের উত্তরাংশসহ উত্তরবঙ্গের অন্য পাঁচটি জেলাতে কোচ-রাজবংশী-পলিয়া-দেশিয়াদেরই প্রতিপত্তি ও সংখ্যাধিক্য ছিল বলা যায়। কিন্তু দেশ বিভাগের সময়ে ও পরে পূর্ব পাকিস্তান অধুনা বাঙলাদেশ হইতে দলে দলে ছিন্নমূল উদ্বাস্তু আসিয়া উত্তরবঙ্গে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে শুরু করেন। এই সকল উদ্বাস্তুদের মধ্যে অরাজবংশী হিন্দুই বেশি ছিলেন। ফলে গোষ্ঠীবদ্ধ ও সংরক্ষণশীল সমাজটি বৃহত্তর বর্ণহিন্দু সংস্কৃতির সহিত সহাবস্থান করিতে বাধ্য হইয়া পড়ে। সুতরাং ঐতিহাসিক কারণে দেশবিভাগজনিত পরিস্থিতির দরুন রাজবংশীদের মধ্যে পরিবর্তনের প্রবণতা দেখা দিয়া থাকিবে।

দ্বিতীয়ত—রাজবংশীদিগের অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত মান ভাল নহে এই জন্য ইঁহারা তফসিলীভুক্ত শ্রেণীতে পড়েন। রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির জনক রূপে সম্মানিত রায়সাহেব ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার উদ্যোগেই তাঁহাদিগকে তফসিলীভুক্ত করা হয়। বিষয়টি লইয়া সেই সময়ে প্রবল বাদ বিতণ্ডাও হইয়াছিল। কোনো কোনো ক্ষত্রিয় নেতা প্রকাশ্যে ইহার বিরোধিতা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের যুক্তি ছিল যেহেতু রাজবংশীগণ ক্ষত্রিয়, দ্বিতীয় বর্ণশ্রেষ্ঠ, দ্বিজ, সেই হেতু কোনো অবস্থাতেই তাঁহাদের হাঁড়ি, মুচি, ডোম, মেথর প্রভৃতি সম্প্রদায়ের সহিত সমপর্যায়ভুক্ত করা উচিত হইবে না। কিন্তু রায়সাহেবের অবিসংবাদিত নেতৃত্বদানের ক্ষমতা, অসাধারণ জনপ্রিয়তা এবং প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের কারণে তাঁহার বিরোধী পক্ষ বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন নাই। বলা চলে তাঁহার একক পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতেই রাজবংশীগণ তফসিলীভুক্ত জাতি হিসাবে পরিগণিত হইয়াছেন এবং তজ্জন্য শিক্ষার উন্নতিকল্পে সরকার হইতে তফসিলী শ্রেণীভুক্ত শিক্ষা বৃত্তির সুযোগ পাইয়া আসিতেছেন। ফলে রাজবংশীদের মধ্যে সন্তোষজনকভাবে না হইলেও ক্রমে ক্রমে শিক্ষার প্রসার ঘটিতেছে এবং তাঁহারা ক্রমেই শহরমুখী হইবার চেষ্টা করিতেছেন। ভারত সরকার কর্তৃক জমিদারী প্রথা বিলুপ্তিকরণের আইন ইঁহাদিগকে জমির আকর্ষণ হইতে টানিয়া লইয়া শিক্ষার দিকে ঝুঁকিতে সাহায্য করিতেছে। বস্তুত কৃষিনির্ভর সমাজটি এতাবৎকাল জমি-জায়গা-সংসার লইয়াই নিরুপদ্রব জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু উৎপাদনের অনিশ্চয়তা অপেক্ষা লেখাপড়া শিখিয়া চাকুরি লইয়া মাসান্তে একটি নিশ্চিত ও নিশ্চিন্ত আয় অধিকতর সম্মানজনক বিবেচনা করিয়া মোটামুটি সমগ্র সমাজটি শিক্ষার উপকারিতা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে। আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত কিছু সামান্য সংখ্যক লোকের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত হইতে শুরু হইয়াছে।

তৃতীয়ত—আধুনিকতার অনতিক্রম্য প্রভাব সকল গ্রামীণ সমাজগুলির উপরে কমবেশী পড়িতেছে। শহরের সহিত নিবিড়ভাবে ঘনিষ্ঠতার যোগ, ইদানীং দূরদর্শন, বেতার, ভিডিও, সিনেমা, বিভিন্ন সমাজের সহিত নৈকট্য, বিজ্ঞানের সহায়তায় দূরদেশে যাতায়াত বৃদ্ধি প্রভৃতি কারণেও রাজবংশী ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের নিজস্ব সংস্কৃতির প্রচ্ছন্ন রূপান্তর হইতেছে বলিয়া মনে হয়।

চতুর্থত—রাজবংশীদের অর্থনৈতিক দুরবস্থাও প্রাচীন ধর্ম-কর্মানুষ্ঠানগুলি পালনের প্রতিবন্ধকস্বরূপ। উদ্বাস্তু আগমনের ফলে প্রতিযোগিতায় আঁটিয়া উঠিতে না পারিবার কারণে জমির প্রতি আকর্ষণের তীব্রতা হ্রাস পাইতেছে ; তাই জীবিকা নির্বাহের হেতু কৃষি-নির্ভর সমাজটি ইদানীংকালে অন্যদিকে ঝুঁকিতে শুরু করিয়াছে। সেইজন্য স্বাভাবিকভাবেই কৃষিকেন্দ্রিক অনুষ্ঠানগুলি অ-কৃষক রাজবংশীদের এখন আর তেমনভাবে আকর্ষণ করিতে পারে না।

পঞ্চমত—বর্তমান যুগে বাঙলা বা ভারতবর্ষে প্রায় কেহই রাজনীতি নিরপেক্ষ থাকিতে পারিতেছেন না। কম বেশি প্রত্যেকে কোনো না কোনো দলে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ক্ষত্রিয়রাও সর্বভারতীয় দলগুলিতে অংশগ্রহণ করিতেছেন। রাজনৈতিক মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য একই আদর্শের পতাকাতলে সমবেত হওয়ার ফলে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের মধ্যে একপ্রাণতা ও জাতীয়তাবোধের ভিত্তি সুদৃঢ় হইয়াছে ; অনৈক্যের মধ্যে ঐক্য গড়িয়া উঠিতেছে। ফলে আদর্শায়িত বৃহত্তর সংস্কৃতির প্রভাবে আঞ্চলিক সংস্কৃতিটি বিবর্তনের পথে পা বাড়াইতে বাধ্য হইয়া চেষ্টা করিতেছে।

আমরা কিছু পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে রাজবংশীদের মধ্যে আচরিত ধর্মকর্মানুষ্ঠানগুলির অনেকগুলিই আজ অবলুপ্তির পথে। এই বিলুপ্তির জন্য দায়ী কেবল উপরে বর্ণিত বিষয়গুলিই নহে। ইহার মূলে অন্য একটি কারণও মুখ্যত ক্রিয়াশীল। তাহা হইল রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজের নিজস্ব পুরোহিত সম্প্রদায়ের মধ্যে

সংরক্ষণশীলতা ও পূজাপদ্ধতির মন্ত্রাবলির প্রতি অসাধারণ মমত্ববোধ। মন্ত্রগুপ্তির স্বাভাবিক প্রবণতাই মন্ত্রের সম্প্রসারে বাধাস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যোগ্য উত্তরাধিকারীর অভাবেও অনেক আভিচারিক ক্রিয়াকর্মের রীতিপদ্ধতি, মন্ত্রাবলি লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজের পুরোহিতের মধ্যে এই ধারণাটি অত্যন্ত ব্যাপক যা একটি মন্ত্র অধিক লোকের জানিত হইলে উহার কার্যকরী ক্ষমতা নষ্ট হইয়া যায়। ফলত সর্পদংশন ও রোগাদি দূরীকরণের অনেক লোকহিতকর মন্ত্র ও তৎসংশ্লিষ্ট ক্রিয়াগুলির কোনো হদিস এখন আর পাওয়া যায় না। ইহার মূলে হয়তো আরও অন্য কোনো কিছু কারণ থাকিতে পারে। যেমন প্রতিযোগিতার বাজারে গুণীন তাঁহার ব্যবসায়িক কারণে মন্ত্র হাতছাড়া করিতে চাহেন না,—যদি সেটির ক্ষমতা বিনষ্ট হইয়া যায় ; কিংবা মন্ত্রতন্ত্রের প্রতি আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক মানুষের ভক্তি শ্রদ্ধা নাই এই জন্য যোগ্য উত্তরাধিকারী পাইবার অসুবিধা ইত্যাদি।

সংস্কৃতি যাহা হউক রাজবংশী ক্ষত্রিয়দের পূজা পার্বণ ইত্যাদি উপাদানগুলি যাহাতে কালের প্রকোপে লুপ্ত হইয়া না যায় তাহাব জন্য সরকার গবেষক ও সর্বসাধারণকে যত্নবান হইতে হইবে নচেৎ ভবিষ্যত প্রজন্ম এই সম্পদ সমূহের উত্তরাধিকার হইতে চিরতরে বঞ্চিত হইবে।

তথ্যসূত্র

১। দ্রষ্টব্য : Kirata Jana Kriti—Dr. S.K. Chatterjee. (1951). Page—8.

২। দ্রষ্টব্য : Origin and Development of the Bengali Language —Dr. S.K. Chatterjee. (1926) Part-I Pages—16-27.

৩। বিরজাশংকর গুহ মহাশয় ৯ টি শাখা সমেত মোট ৬টি মূল মানবগোষ্ঠীর তালিকা দিয়াছেন। দ্রষ্টব্য : Kirata Jana Kriti. Page—4.

৪। দ্রষ্টব্য : বাঙালীর ইতিহাস—শ্রী নীহাররঞ্জন রায় (শ্রী জ্যোৎস্না সিংহ রায় কর্তৃক সংক্ষেপিত সংস্করণ, ১৩৭৩) পৃঃ—২৪-৩৩.

৫। বাঙালীর ইতিহাস—নীহাররঞ্জন রায়—পৃঃ—২৮.

৬। তুলনীয়—

(ক) "ভারতবর্ষ বিসদৃশকেও সম্বন্ধে বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছে"। স্বদেশ/ভারতবর্ষের ইতিহাস—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ—৪৪

(খ) "ভারতবর্ষের পুলিন্দ শবর ব্যাধ প্রভৃতিদের নিকট হইতেও বীভৎস সামগ্রী গ্রহণ করিয়া তাহার মধ্যে নিজের ভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহার মধ্য দিয়াও নিজের আধ্যাত্মিকতাকে অভিব্যক্ত করিয়াছে। ভারতবর্ষ কিছুই ত্যাগ করে নাই এবং গ্রহণ করিয়া সকলই আপনার করিয়াছে"। ঐ পৃঃ—৪৬.

৭। বাঙালীর ইতিহাস (সংক্ষেপিত সং), পৃঃ—৩৫-৩৬.

৮। জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য—শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

৯। দ্রষ্টব্য : Kirata Jana Kriti—Page—7.

১০। O. D. B. L.—Page—62.

১১। "আর্যজাতির সংস্পর্শে আসিবার পূর্বেই যে বর্তমান বাঙালী জাতির উদ্ভব হইয়াছিল এবং তাহারা একটি উচ্চাঙ্গ ও বিশিষ্ট সভ্যতার অধিকারী ছিল, এই সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত ছিল বলিয়া গ্রহণ করা যায়"। —বাঙলাদেশের ইতিহাস—ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাচীন যুগ, ৪র্থ সংস্করণ, ১৩৭৩, পৃঃ—১৩

১২। "বাঙ্গালার ইতিহাস নাই, যাহা আছে, তাহা ইতিহাস নয়, তাহা কতক উপন্যাস, কতক বাঙ্গালার বিদেশী বিধর্মী অসার পরপীড়কদের জীবনচরিত মাত্র। বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালার ভরসা নাই। কে লিখিবে?
তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে। যে বাঙ্গালী তাহাকেই লিখিতে হইবে।......." বঙ্গদর্শন/বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা, ১২৮৯, জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত।

১৩। প্রথম প্রকাশ—মাঘ, ১৩৫৬। পরে দুই একখানি কিশোর সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীজ্যোৎস্না সিংহ রায় 'সংক্ষেপিত সংস্করণ' বাহির করিয়াছেন, ফাল্গুন ১৩৭৩-এ। 'লেখক সমবায় সমিতি', কলিকাতা ২৬ হইতে প্রকাশিত।

১৪। দ্রষ্টব্য : গ্রন্থের ভূমিকা—"যাহাই হউক, রাজাদেশ প্রতিপালনের স্বাভাবিক আগ্রহই এই লেখকের পক্ষে এতাদৃশ গুরুতর কর্মে প্রবৃত্ত হইবার একমাত্র হেতু ......" ইত্যাদি।

১৫। ১৯৬৫ সালে Asiatic Society Monograph Series. Volume-XI কর্তৃক প্রকাশিত।

১৬। "This monograph is an attempt to give an idea of the folk-life and folk culture of the Rajbanshis living in Darjeeling Terai (Siliguri). Jalpaiguri and CoochBehar of West Bengal—PREFACE.

১৭। দ্রষ্টব্য : Pages—3-4.

১৮। বঙ্গদর্শন—মাঘ, ১২৮৭.

১৯। বাঙ্গালীর ইতিহাস—(সংক্ষেপিত সংস্করণ) পৃঃ—৪৩৩.

২০। দ্রষ্টব্য : Kirata Jana Kriti—Page—32.

২১। বাঙলা কাব্যে শিব—ডঃ গুরুদাস ভট্টাচার্য, ১ম সংস্করণ, (১৮৮২) পৃঃ—৭৪.

২২। বাঙলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস—ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, ৪র্থ সংস্করণ, (১৯৬৪) পৃঃ—১০২.

২৩। বাঙালীর ইতিহাস—সংক্ষেপিত সংস্করণ, পৃঃ—১৯.

২৪। বাঙালীর ইতিহাস—পৃঃ—১৮.

২৫। দ্রষ্টব্য : কোচবিহারের ইতিহাস খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা, ১ম খণ্ড, (১৯৩৬).

২৬। দ্রষ্টব্য : কামাখ্যা মাহাত্ম্যম্—শ্রীশিবকৃষ্ণ দেবশর্মা পাণ্ডা ও শ্রীবিষ্ণুকান্ত দেবশর্মা পাণ্ডা কর্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত, (১৩৩৪, পৌষ) পৃঃ—৩-৪

২৭। দ্রষ্টব্য : কোচবিহারের ইতিহাস

২৮। বাঙালীর ইতিহাস—সংক্ষেপিত সংস্করণ, পৃঃ—৪৩৩

২৯। দ্রষ্টব্য : Hand Book on Scheduled Castes and Scheduled Tribes of West Bengal—A.K. Das. B.K. Roychoudhury and M.K. Raha. (1966). Page—96.

৩০। দ্রষ্টব্য : Descriptive Ethonology of Bengal—H.H. Risely Vol-x, Page-89.

৩১। Statistical Account of Bengal—W.W. Hunter. Vol—X. Page—402.

৩২। The Tribes and Castes of Bengal—H.H. Risely Vol—I. Page—491.

৩৩। Vol—III. Page—262.

৩৪। Journal of Asiatic Society of Bengal. Vol—XVIII. Part—II. page—704-706.

৩৫। Vol—III. Part-II. Page—95.

৩৬। আক্রমণের কাল ১২০৩ বা ১২০৫ খৃঃ.

৩৭। দ্রষ্টব্য : Kirata Jana Kriti. Page—54.

৩৮। Imperial Gazetteer. 1908. Vol—X. Page—383.

৩৯। দ্রষ্টব্য : রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস—শ্রীউপেন্দ্রনাথ বর্মণ, (১৩৭০) পৃঃ—১০-১১.

৪০। রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস—পৃঃ—২১-২২.
৪১। দ্রষ্টব্য : O.D.B.L—Part-I. Page—69.
৪২। O.D.B.L.—পৃঃ—৭৯.
৪৩। O.D.B.L.—পৃঃ—৭৮-৭৯.
৪৪। দ্রষ্টব্য : History Antiquity Topography and Statistics of Eastern India—Montogomery Martin. 1933. Page—538.
৪৫। The Census Report of Bengal—1872. Vol-Page—130.
৪৬। The Tribes and Castes of Bengal—1891. Vol-I. Page—491.
৪৭। Census of India—1931. Vol—V. Part—I. Page—473.
৪৮। Kirata Jana Kriti. Page—61.
৪৯। দ্রষ্টব্য : রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস, পৃঃ—২৫-২৬.
৫০। দ্রষ্টব্য : রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস
৫১। "পরশুরাম ভয়াৎক্ষত্রি সংকোচৎ কোচ উদ্যতে"।
৫২। দ্রষ্টব্য :
(ক) কোচবিহারের ইতিহাস, পৃঃ—৪
(খ) কোচ রাজবংশী জাতির ইতিহাস আরু সংস্কৃতি—শ্রী অম্বিকা চরণ সরকার, (বঙ্গাইগাঁও, আসাম, ১ম সংস্করণ ১৯৬৯) পৃঃ—১১
৫৩। শ্রী আর, সি, চন্দ এই অনুমান করিয়াছেন, দ্রঃ—O.D.B.L. Vol—I. Page—69.
৫৪। O.D.B.L.—পৃঃ—৬৯.
৫৫। Kirata Jana Kriti. Page—61.
৫৬। কোচবিহারের ইতিহাস—পৃঃ—৪.
৫৭। কোচবিহারের—পৃঃ—৪, পাদটীকা—৬.
৫৮। Kirata Jana Kriti. Page—54.
৫৯। ১৯৬১ সালের আদমসুমারী অনুসারে রাজবংশী ১২.৬%, কোচ ২৫.২% এবং পলিয়াদের সাক্ষরযুক্ত শিক্ষার হার ১৪.৭ দেখানো হইয়াছে। অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে রাজবংশীদের শিক্ষার হার দাঁড়ায় ১৭.৫% মাত্র।—Hand book on the Scheduled Castes and Scheduled Tribes of West Bengal. Pages—97.64 and 87.
৬০। দ্রষ্টব্য : কোচবিহারের ইতিহাস এবং The Rajbanshis of North Bengal.
৬১। ইংরাজ গবেষকগণ হইতে আরম্ভ করিয়া ইদানীং কালের সর্বভারতীয় সুপণ্ডিত তৎকালীন জাতীয় অধ্যাপক আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় পর্যন্ত।
৬২। সিংহাসন আরোহণ কাল ১৪৯৬ খৃষ্টাব্দ।
৬৩। দ্রষ্টব্য : ভারতের ভাষা ও ভাষা সমস্যা—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী, ১৩৫৬.
৬৪। বাঙালীর ইতিহাস, সংক্ষেপিত সংস্করণ, পৃঃ—২৯৪.
৬৫। বাঙলার ব্রত—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, (পুনর্মুদ্রণ, আশ্বিন, ১৩৬৭) পৃঃ—৯-১০.
৬৬। দ্রষ্টব্য : Kirata Jana Kriti. Page—32.
৬৭। দ্রষ্টব্য : Cultural Heritage of India. Vol—II. Part—I.
৬৮। দ্রষ্টব্য : History of Dharmasastra—P.V. Kane. Bhandarkear Oriental Research Institute. Poona. 1958. Vol—V. Part—I.
৬৯। বাংলার ব্রত, পৃষ্ঠা,—৭.
৭০। ধৃ + ম (কর্মবাচ্য)
৭১। দ্রষ্টব্য :
(ক) পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি—বিনয় ঘোষ, প্রথম প্রকাশ, ১৩৬৩.
(খ) বাংলার লৌকিক দেবতা—গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু— ১ম সংস্করণ.
(গ) সীমান্ত বাংলার লোকযান—ডঃ সুধীরকুমার করণ. ১ম সংস্করণ, ১৩৭১
(ঘ) বাঙলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস—ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য
৭২। বাঙলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস—পৃষ্ঠা—১০৪.
৭৩। বাঙালীর ইতিহাস—আদিপর্ব, পৃষ্ঠা—২৯৭-২৯৮.
৭৪। বাঙলা কাব্যে শিব—পৃষ্ঠা—৩

লেখক ❑ অধ্যাপক, গবেষক ও প্রাবন্ধিক



উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্যদের এক্সিকিউটিভ কমিটির সভা। সভায় উপস্থিত মন্ত্রীগণ—দীনেশ ডাকুয়া, বিশ্বনাথ চৌধুরী, শ্রীকুমার মুখার্জি, কমল গুহ, উন্নয়ন পরিকল্পনা সচিব—সুখবিলাস বর্মা এবং ছয়টি জেলার জেলাশাসক ও সভাধিপতিগণ। *ছবি : তরুণ দেবনাথ*

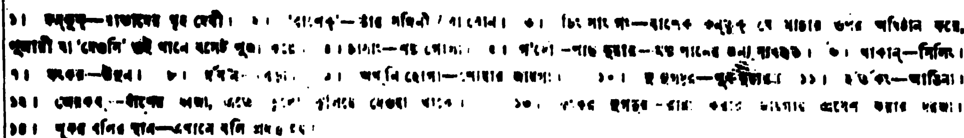


সুশীলকুমার রাভা

রাভা সংস্কৃতি ও জীবনধারা

"বৃক্ষের পরিচয় ফলে, নদীর পরিচয় জলে"— গ্রামাঞ্চলে বৃদ্ধ বৃদ্ধারা কোনও বস্তু বা মেধার নির্ণয় করতে উদাহরণস্বরূপ আজও এই প্রচলিত প্রবাদটি বলে থাকেন। ফলের স্বাদ ও আকৃতি দেখে যেমন বৃক্ষকে চেনা যায়, তেমনই জলের ধারা ও গতি দেখে নদীকে নির্ণয় করা যায়, কোনটি দুর্বল, কোনটি প্রবহমান। অনুরূপ সমগ্র মানবজাতির ক্ষেত্রেও নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতির মাধ্যমে চেনা যায় কে কোন গোষ্ঠীর।

বহু ভাষা, বর্ণ ও বিচিত্র সংস্কৃতির এই বৈচিত্র্যময় ভারতবর্ষের মানচিত্রে 'জলপাইগুড়ি' একটি উল্লেখযোগ্য নাম। বিদগ্ধ পণ্ডিতগণের মতে, বর্ণময় ভাষা ও সংস্কৃতির দিক থেকে 'জলপাইগুড়ি জেলা' একটি মিনি ভারতবর্ষও বটে। হাজার সৌরভের নানা বর্ণ বিচিত্র ফুল ফুটে আছে এই জেলায়। বন-পাহাড়ির সবুজে ঘেরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পরিবেশে, ছড়িয়ে আছে নানা বর্ণ, ভাষা ও সংস্কৃতির মানুষ, তার মধ্যে 'রাভা' একটি অন্যতম জনজাতি। অন্যান্যদের তুলনায় রাভাদের ভাষা, সংস্কৃতি, সম্পূর্ণ আলাদা ; সহজ সরল তাদের জীবনধারা ; হাজার ক্লান্তি ও পরিশ্রমের মাঝেও ভুলে যায়নি নিজেদের সংস্কৃতি ও রীতি নীতি। দুঃখ, কষ্ট, দারিদ্র্যকে উপেক্ষা করে, মনের ক্লান্তি ও বিষণ্ণতাকে দূর করতে, আজও সাড়া দেয় প্রকৃতির প্রেমে। সবুজ বনলতার আচ্ছাদনে বৃক্ষ যখন নব রূপ পায়, তখন রাভা যুবক-যুবতীরা যৌবনের উচ্ছলতার আনন্দে কোমর দোলায় মাদলের তালে তালে। বহু প্রাচীন কাল থেকে বহন করে নিয়ে আসা এই সংস্কৃতির ধারা আজও অম্লান হয়ে আছে এই রাভা সমাজে। ভাষাতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণের মতে, রাভারা মঙ্গোলিয়ান বংশোদ্ভূত ও ইন্দো-মঙ্গোলীয় ব্রহ্ম শাখার 'কোচ' গোষ্ঠীর। অতীতে রাভারা 'কোচ' নামেই পরিচিত ছিলেন। 'কোচ' নামটি এই জাতির অতি প্রাচীন ও ঐতিহ্যপূর্ণ নাম। 'রাভা' নামটি পরবর্তীকালে অন্যদের দেয় নাম। কিন্তু



রাভা সম্প্রদায়ের ঘরের নক্সা

কালক্রমে 'রাভা' একটি আলাদা জাতিতে রূপান্তরিত হয় এবং রাভা বলেই পরিচিত। ১৯০১ সনের আদমশুমারির রিপোর্টে পশ্চিমবঙ্গে আলাদা কোনও রাভা জনজাতি বা তার জনসংখ্যা পাওয়া যায়নি। ১৯১১ সনের আদমশুমারির রিপোর্টে মাত্র ৭২২ জন রাভা জনসংখ্যা পাওয়া গেছে, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে। অবশ্য বর্তমানে এর সংখ্যা অনেক বেশি। ১৯৮১ সনের সেন্সাস রিপোর্টে শুধু জলপাইগুড়ি জেলাতেই ৮৬৩২ জন রাভা জনসংখ্যা পাওয়া গেছে। সে যাই হোক, তবে রাভাদের অতীত সম্পর্কে বহু ইতিকথা, ইতিবৃত্ত ও ইতিহাসকল্প রয়েছে।

রাভারা মূলত মাতৃতান্ত্রিক ও নারী প্রধান কর্ত্রী। রাভা রমণীরা অত্যন্ত কর্মশালী ও সহনশীল হন। স্বামী, সন্তানের সেবা যত্নের পাশাপাশি সংসারের সমস্ত রকম দায়-দায়িত্বও নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে থাকেন। তাছাড়া রমণীরাই এই জাতির এবং সংস্কৃতির ধারক বাহক ও পরিচায়ক। পুরুষেরা বিভিন্ন পোশাক পরিধান করলেও জাতির মর্যাদা ও পরিচয়ের জন্য রমণীরা নিজেদের হাতে তৈরি পোশাক 'লুকুন/কেম্‌লেত, কাম্বাং ও ফাকচেক' পরিধান করে থাকেন। এ ছাড়াও অতি প্রাচীনকাল থেকে বংশ পরম্পরাগত বহন করে নিয়ে আসা 'হাঁসুক/হসুক হাদাম' অর্থাৎ গোত্রধারা—এই জাতির উল্লেখযোগ্য। আজও কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে এই ধারাটি সংরক্ষিত। 'হাঁসুক বায় বায়' অর্থাৎ একই গোত্রের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে বিবাহ বন্ধন নিষিদ্ধ। শুধু তাই নয়, এমনও 'হাঁসুক' বা গোত্র আছে, নামে ভিন্ন হলেও ছেলে-মেয়ের বিবাহ বন্ধন চলে না। তাকে বলা হয় 'হাঁসুক শীরু' বা 'শরু' অর্থাৎ জ্ঞাতিগোত্র। (পাশাপাশি আত্মীয় হেন একই রীতিনীতির গোত্রধারা) যেমন : 'মাঁজি, মাঁজিপ্রান, মাঁজিদং, মাঁজিসাম্পার' ইত্যাদি এই ধরনের আরও বিভিন্ন নামের 'হাঁসুক' (গোত্র) আছে। পাঠকবর্গের জ্ঞাতার্থে সামান্য কয়েকটি নাম উল্লেখ করা হল। যেমন : 'বান্দা, বান্দাধায়, বান্দা শুঙুক, মাঁজি, দ্বারবত, কারা, কান্তারাং, কাঁঞ্চেম, কাঁমা, নরা, নগরা, নক্‌মান, রভাগ, হায়ফাং, মচৎ, পাঁগ্রোই, পাঁঞ্চিবক্‌, উনি, উনিবামন, লাবং, চিঞ্চেৎ, কারতবেলেৎ, কাম্‌মচৎ, কেঞ্চাম, ইত্যাদি। এ সবের মধ্যেও জ্ঞাতিগোত্র আছে। নামে ভিন্ন হলেও একে অপরকে বিবাহ করা চলে না। তাছাড়াও প্রত্যেক গোত্রের নিয়ম নীতির ক্ষেত্রেও কিছু বিধিনিষেধ আছে। এক একটা 'হাঁসুক' এক একটা জিনিস খেতে পান না। যেমন':—'মাঁজি, মাঁজিপ্রান' ইত্যাদি বোয়াল মাছ খেতে পারেন না। 'পাঁম্বাই' কাছিম বা পানিমাছ খেতে পারেন না। এমনি করে কেউ হরিণের মাংস, কেউ ডাহুক পাখির মাংস, কেউ বা ময়ূর, আর কেউ বা ভাটি পাখি খেতে পারেন না। অনেকে আছেন হলুদের খেতে বা আদা লাগাতে পারেন না। কেউ কেউ 'চকত' (মদ) তৈরির 'বাকর' (নেশা জাতীয় ঔষধ) বানাতে পারেন না। এমনি নানা জনের নানা খাদ্যবস্তুর উপর বিধিনিষেধ রয়েছে। এই রূপ বিধিনিষেধ অতীতে কে কবে আরোপ করেছিল, বা কবে থেকে কে এই রীতিনীতি প্রচলন করেছিল তা বলা বাহুল্য। তবে আমার বিশ্বাস, অতীতদিনে কোনও মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে নিবেদন বা উৎসর্গ করে দেওয়ার কারণে, বংশানুক্রমিকভাবে বস্তুগুলি বর্জিত হয়ে এসেছে।

কারণ, বর্তমান সমাজব্যবস্থায়ও রাভা সমাজে কোনও ব্যক্তি মারা গেলে, তার পারলৌকিকক্রিয়ার দশকর্মার দিন মৃত ব্যক্তির ভোজের উদ্দেশ্যে যে কোনও মাছ বা ফলমূল প্রদান বা উৎসর্গ করে দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে বিরল প্রজাতির মাছ বা ওই জাতীয় ফল মূল দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। কারণ, এরপর থেকেই সেই মৃত ব্যক্তির সন্তানাদিগণ উৎসর্গীকৃত বা নিবেদিত ওই জাতীয় মাছ বা ফল খেতে পারেন না। যেমন—আমার মায়ের মৃত্যুর পর, তাঁর দশকর্মের দিন ভোজের উদ্দেশ্যে 'গোচিমাছ' (তুরিমাছ) নিবেদন করা হয়েছিল। এর পর সেই থেকেই আমি আর গোচিমাছ খেতে পারি না।

অনুরূপ অতীতে মাতৃতান্ত্রিক এই গোষ্ঠীর মাতৃস্থানীয় কোনও ব্যক্তি মারা যাওয়ার পর, ওইরূপ কোনও বন্যপ্রাণীর বা জীবের মাংস অথবা ফল জাতীয় কোনও বস্তু উৎসর্গ বা নিবেদন করেছিলেন। ফলে তাদের 'হাঁসুক' (গোত্র) অনুসারে, বংশানুক্রমিকভাবে যে যার নিবেদিত বা উৎসর্গীকৃত বস্তুগুলি বর্জন করে এসেছেন। আর সেই প্রচলিত ধারা রাভা সমাজে আজও প্রযোজ্য।

'হাঁসুক হাদাম' বা গোত্র পরিচিতি এই জাতির প্রথম পরিচয়। কোনও অপরিচিত ব্যক্তি বাড়িতে এলে, তাকে 'হাঁসুকের' কথা আগে জিজ্ঞাসা করা হয়, তারা কি 'হাঁসুক'? যদি একই 'হাঁসুকে'র মধ্যে পড়ে, তাহলে ধরে নেওয়া হয় অতীতে তারা একই পরিবারের লোক ছিল এবং তারা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। সুতরাং ভবিষ্যতে কোনও রাভা ব্যক্তি বিচ্ছিন্নভাবে হারিয়ে যাওয়া অসম্ভব কিছু নয়, কিন্তু রাভাদের

'হাঁসুক' হারিয়ে যাওয়া খুবই কঠিন। কারণ এই 'হাঁসুক হাদাম' রীতি নীতি কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলার মাধ্যমে সংরক্ষিত। আর এর ধারক বাহক রমণীরাই।

কোনও রাভা রমণী অন্য কোনও গোষ্ঠীর পুরুষকে গ্রহণ করলেও তাদের সন্তানাদি মাতৃপরিচয়েই পরিচিত হয়। অর্থাৎ মায়ের 'হাঁসুক'ই তাদের মূল পরিচয়। পিতা যেই পদবিরই হোক না কেন, তার পদবি কিন্তু সন্তানেরা গ্রহণ করে না।

পুরুষদের ক্ষেত্রে ভিন্ন প্রক্রিয়া। পুরুষরা মায়ের গোত্র বহন করলেও, তাদের গোত্র অর্থাৎ 'হাঁসুক' কিন্তু সন্তানরা পায় না। সন্তানেরা মায়ের যে 'হাঁসুক' সেই 'হাঁসুক'-ই বহন করবে। যদি কোনও রাভা পুরুষ অন্য কোনও গোষ্ঠীর রমণীকে বিবাহ বা গ্রহণ করে থাকে, তাহলে সে ক্ষেত্রে তার ঔরসজাত সন্তানাদিরা শুধু বাবার 'রাভা' পদবিটুকুই বহন করে থাকে। তাদের কোনও 'হাঁসক' বা গোত্র পরিচয় থাকে না। অতীতে এমনি বহু রাভা পুরুষ মূল সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, অন্য গোষ্ঠীর রমণীদের বিবাহ বা গ্রহণ করে বংশবিস্তার ঘটিয়েছে। তারাই আজ শুধু 'রাভা' বলে পরিচিত। তাদের নিজস্ব কোনও ভাষা, সংস্কৃতি বা 'হাঁসুক' (গোত্র) নেই। উত্তর পূর্বাঞ্চলে বসবাসকারী বহু রাভা জনজাতি আছে, তাদের নিজস্ব কোনও ভাষা, সংস্কৃতি বা 'হাঁসুক হাদাম' নেই।

মাতৃতান্ত্রিক প্রথানুযায়ী রাভা সমাজে ঘরজামাই বিবাহরীতি প্রচলিত। যদিও বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় অনেকটা পরিবর্তন ঘটেছে। অতীতে রাভা ছেলেদের ঘরজামাই থাকা বাধ্যতামূলক। যদি কোনও ধনবান শক্তিশালী পুরুষ, তার পছন্দমত অন্য কোনও গোষ্ঠীর রমণীকে নিয়ে এসে ঘরে তোলে বা বিবাহ করে, তাহলে সেই রমণীকে 'গুন্দুগার' (নিকা) করে 'হাঁসুক' বা গোত্র ধার দিয়ে, কুলে তুলে নেওয়া হত। কোনও নিপুত্রী (কন্যাসন্তানহীন) বৃদ্ধা মহিলা তার 'হাঁসুক' বা গোত্রর বংশবিস্তারের জন্য এই বিশেষ কাজটি করে থাকে। তার বিনিময়ে বৃদ্ধাকে প্রচুর খাদ্যশস্য ও বস্ত্রাদি দিয়ে সম্মানিত করা হয়। আর সেই থেকে ঋণগ্রহীতা রমণী 'হাঁসুক' প্রদানকারী বৃদ্ধাকে নিজের মাতৃরূপে সম্মান করে এবং গোত্রের মাতা বলে চিহ্নিত হয়। যদি কোনও সময় একই 'হাঁসুক' (গোত্রের)-র ছেলে-মেয়ের মধ্যে অবৈধ সম্পর্ক তৈরি হয়ে বিবাহ হয়, তাহলে সমাজের বিচারে তাদের চরম দণ্ড দেওয়া হয় এবং জরিমানাও করা হয়। জরিমানা হিসাবে 'চকত কাঁমবোঁই' (মদের কলসি) আর 'বাগ গদা' (আস্ত বড় শূকর) আবশ্যক। ওই জরিমানা অধিকও হতে পারে, আবার কম হতে পারে। সেটা দণ্ড প্রাপকের আর্থিক সামর্থ্যের উপর বিবেচিত হয়। দণ্ডের পর দম্পতিকে অর্থাৎ ছেলে অথবা মেয়েকে 'হাঁসুক' ধার দিয়ে গোত্র বিচ্ছেদ করে দেওয়া হয়। এইরূপ বিচার ব্যবস্থা অনেকাংশে আজও প্রযোজ্য। তবে সুরাপানি মানে 'চকত' এই রাভা সমাজে সর্ব ঘটের বিল্বপত্র। জন্ম, কর্ম, মৃত্যু পর্যন্ত এই 'চকত' আবশ্যক।

রাভারা মূলত মাতৃতান্ত্রিক ও নারী প্রধান কর্ত্রী। রাভা রমণীরা অত্যন্ত কর্মশালী ও সহনশীল হন। স্বামী, সন্তানের সেবা যত্নের পাশাপাশি সংসারের সমস্ত রকম দায়-দায়িত্বও নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে থাকেন। তাছাড়া রমণীরাই এই জাতির এবং সংস্কৃতির ধারক বাহক ও পরিচায়ক। পুরুষেরা বিভিন্ন পোশাক পরিধান করলেও জাতির মর্যাদা ও পরিচয়ের জন্য রমণীরা নিজেদের হাতে তৈরি পোশাক 'লুকুন/কেম্‌লেত, কাম্বাং ও ফাকচেক' পরিধান করে থাকেন।



বিবাহ : মহাকাল পূজা শেষে, শূকরের মাথা বহন করে নিয়ে যাচ্ছে 'কনে'

শিশু জন্মালে তার নামকরণ করা ও অশৌচ বিদায় পদ্ধতিও সম্পূর্ণ ভিন্ন ও অভিনব। বিচিত্র তার উপকরণ সামগ্রী। শিশু জন্মাবার চার দিনের পর যে ঘরে শিশুটি ভূমিষ্ঠ হয়, সেই ঘরের মেঝেতে পূজার উপকরণ সাজানো হয়। উপকরণগুলির মধ্যে 'চকত' ও একটি লাল মোরগ আবশ্যক। অন্যান্য উপকরণের মধ্যে আছে 'লায়চাগ' (কলা

প্রসাদ সেবনের সঙ্গে চলে নৃত্যগীত। বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা তাঁদের মনের আবেগ প্রকাশ করে থাকেন এইরূপ নৃত্যগীতের মাধ্যমে। বড় বিচিত্র এই নৃত্যগীতের দৃশ্য। বয়সের ভারে মেরুদণ্ড সোজা করে চলতে পারেন না, চোখের দৃষ্টিশক্তিও ক্ষীণ হয়ে এসেছে, অথচ আনন্দে আত্মহারা হয়ে, বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে বিভিন্ন অঙ্গ-ভঙ্গি করে নৃত্য করতে দেখা গেছে শতবর্ষের উর্ধ্বের বয়স্কা এক বৃদ্ধাকে। তাঁকে দেখে আমার মনে হয়েছে, যৌবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে হয়ত জীবনের শেষ আনন্দটুকু নিঙড়ে নিচ্ছে।

পাতার মূল আগাটুকু) ধূপ, ধুনা, সিঁদুর, ধান দূর্বা, তুলসী পাতা তেলের প্রদীপ এবং একটি সাঁমাবিহীন কাস্তে। পূজার স্থানটুকু লেপে কলার পাতাটি বিছানো হয়। তার উপর ধান দূর্বা দিয়ে, একটি জলের পাত্র বসানো হয়। জলের পাত্রটি কাঁসার থালা অথবা ওই জাতীয় অন্য কোনও পাত্র। পূজা করেন 'হুজি' (মন্ত্রপূত কবিরাজ)। পূজায় আমন্ত্রিত হন শিশুর ধাত্রীসহ গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিগণ। কবিরাজ উপস্থিত সকলের অনুমতি নিয়ে শিশুর নামকরণ ও ভবিষ্যত রোগ, ব্যাধি সম্পর্কে আলোকপাত করেন।

প্রথমে সাঁমাবিহীন কাস্তে দিয়ে মন্ত্র পড়ে জল কোষেন। এরপর লাল মোরগটির গলা চেপে ধরে জলের পাত্রটির উপর শূন্যে ঝুলিয়ে রাখা হয়। মোরগের ছায়া জলে ভাসলে শিশু হবে নরগণ আর ছায়া না ভাসলে হবে দেবগণ। শিশুর রোগ-ব্যাধি, নির্ণয় করা হয় মোরগের ঝোলানো পা দেখে। ছেলের হলে ডান পা আর মেয়ের হলে বাঁ পা। মোরগের ডান পা উপরের দিকে কোঁকড়ানো হলে শিশু হবে নীরোগ। আর লম্বা হয়ে ঝুলে পড়লে, সেই শিশু হবে ব্যাধিগ্রস্ত। মেয়ে শিশুদের ক্ষেত্রেও একই ভাবে মোরগের বাঁ পা দেখে নির্ণয় করা হয়। পূজায় উৎসর্গ করার সময় মোরগ যে শব্দে ক্রন্দন করবে, সেই শব্দ অনুসারে শিশুর নামকরণ করা হত—"চেলাও, চেলেং, চেল্‌লেক, চিলাং, কাস্তেল, কান্তাও, নাব্‌রাও, চাব্‌রাও,—" ইত্যাদি। এ সব নামের নমুনা জলপাইগুড়ির বিভিন্ন বনবস্তি ও বনাঞ্চল সংলগ্ন বসবাসকারী রাভাদের মধ্যে আজও পাওয়া যায়। অবশ্য বর্তমানে এসব নামের প্রবণতা খুবই কম দেখা যায়। কারণ আধুনিকতার ছোঁয়া সব জায়গাতেই পৌঁছে গেছে। ফলে নামকরণের পদ্ধতি ও আদ্যাক্ষরের প্রকরণও বদলে গেছে। এখন অন্যদের মতো রাভা শিশুদেরও সুন্দর সুন্দর নাম রাখা হয়। নামকরণ ও পূজার্চনা শেষে, উৎসর্গীকৃত মোরগের মাংস চাক্‌না করে, পূজার নৈবেদ্য 'চক্‌ত' (মদ) দিয়ে আনন্দ করে খাওয়া হয়। অনেক সময় একই সঙ্গে শিশুর ধাত্রীদেরও বস্ত্রাদি দিয়ে সম্মানিত করা হয়। তাকে বলা হয় "ধাইনী মান"।

বিবাহ রীতি

রাভাদের বিয়েতে "চকত" আর "বাগ-দীকাম" (মদ আর শূকরের মাথা) অতি আবশ্যক। তাছাড়াও অন্যান্য উপকরণও আছে। বিয়ের একদিন আগে, অর্থাৎ অধিবাসের দিন, উঠোনের পূর্ব দিকের এক প্রান্তে 'ত্রি শাখা-যুক্ত একটি গাছের ডাল পোঁতা হয়। তাকে বলা হয় "জীরফাঁক"। এই ত্রি শাখা-যুক্ত গাছের ডালটির আগা থেকে গোড়ালি পর্যন্ত পইতে স্বরূপ কাপাশ-যুক্ত এক লম্বা সুতো ঝোলানো থাকে। এই ত্রি শাখাটি "ঋষি বায়" অর্থাৎ জগৎ ঋষি (শিব) রূপে পূজিত হয়। পূজার উপকরণ বড়ই বিচিত্র ধরনের। না দেখলে বোঝা যাবে না। বিভিন্ন নৈবেদ্যের সঙ্গে 'চকত' নিবেদন অতি আবশ্যক। "ঋষি বায়" পূজা সমাপন করার পর, শুরু হয় "মাহ্‌কাল" (মহাকাল) পূজা। প্রথানুযায়ী এসব আচার অনুষ্ঠান 'কনে' পক্ষের বাড়িতেই হয়ে থাকে। মহাকাল পূজায় 'চকত' নিবেদন ছাড়াও শূকর বলি দেওয়া হয়। শূকরটি ঘাতক বলি দেওয়ার আগে, নিয়ম অনুসারে 'কনে' বাঁ



বিবাহ : বর-কনেকে আশীর্বাদ করছেন

হাতে একটি সীমাবিহীন কাস্তে দিয়ে শূকরের গলায় তিনবার স্পর্শ করে বলির নমুনা করে দেয়। এরপর ঘাতক শূকরটিকে বলি দেয়। বলির দৃশ্যও রোমাঞ্চকর। একটি কাঠের গুঁড়ির উপর শূকরটিকে চিৎ করে ধরে, গলায় কোপ মারা হয়। বলির পর শূকরের মাথাটি পূজার মূল আসনে বসানো হয়। পূজা করেন "দেউশি" (পুরোহিত)। 'দেউশি'কে জোগান দেওয়ার জন্য, সঙ্গে একজন লোক থাকে, তাকে বলা হয় "গাঁবি" অর্থাৎ ভারাল। এ ধরনের পূজানুষ্ঠানে, সমাজের বয়োঃজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি, আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী নিমন্ত্রিত হন এবং অনুষ্ঠানে সকলে উপস্থিত থাকেন। পূজার্চনার শেষে কনে (কন্যা) শূকরের মাথাটি কুলোতে করে, মাথায় নিয়ে উলু ধ্বনি সহকারে বরণ করে নিয়ে যায় বাস্তুঘরে। সে সময় "হেম" (ঢোল), "বাঁংশী" (বাঁশী), "কাল বাঁংশী" (ফোঁড়বিহীন এক ধরনের লম্বা বাঁশী, অনেকে "কাঁরানল" ও বলে)। এই সব বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে মুখরিত হয় বরণ উৎসব। বাস্তুঘরের এক কোণে মাচানের উপর প্রতিষ্ঠিত বাস্তুদেবীর পাদদেশে বসানো হয় শূকরের মাথাটি। এরপর শুরু হয় সারাদিন ধরে খাওয়া দাওয়ার উৎসব। পূজোয় নিবেদিত প্রসাদ "চকত" পরিবেশনের জন্য, লাল শালু মাথায় বাঁধা দুজন কুমারী যুবতী থাকেন, তাদের বলা হয় "জানায়"। উঠোনে গোলাকার হয়ে বসা নিমন্ত্রিতদের প্রসাদ (চকত) পরিবেশন করে তারা। প্রসাদ সেবনের সঙ্গে চলে নৃত্যগীত। বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা তাঁদের মনের আবেগ প্রকাশ করে থাকেন এইরূপ নৃত্যগীতের মাধ্যমে। বড় বিচিত্র এই নৃত্যগীতের দৃশ্য। বয়সের ভারে মেরুদণ্ড সোজা করে চলতে পারেন না, চোখের দৃষ্টিশক্তিও ক্ষীণ হয়ে এসেছে, অথচ আনন্দে আত্মহারা হয়ে, বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে বিভিন্ন অঙ্গ-ভঙ্গি করে নৃত্য করতে দেখা গেছে শতবর্ষের উর্দ্ধের বয়স্কা এক বৃদ্ধাকে। তাঁকে দেখে আমার মনে হয়েছে, যৌবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে হয়ত জীবনের শেষ আনন্দটুকু নিঙড়ে নিচ্ছে। এমনি করে একের পর এক অনুষ্ঠান শেষ হতে না হতেই আবার শুরু হয়, অধিবাসের রাত্রে গৃহদেবী "রাঁস্তক/রুস্তক"-এর পূজা (রৌস্তক তাণ্ডি)।

"রাঁস্তক" কালীর বিকল্প রূপ। লক্ষ্মী-পার্বতীর সম্মিলিত এক যুগল রূপ, "রাঁস্তক বায়" নামে খ্যাত। এই "রাঁস্তক বায়" যেমন লক্ষ্মী রূপে পূজিত হন, তেমনই আরাধ্যা দেবী কালী রূপেও পূজিত হন। এই দেবী অত্যন্ত জাগ্রত ও ভয়ঙ্করী বলে বিশ্বাস। যেমন মঙ্গলদায়িনী, তেমনই ক্ষতিকারক। তাঁর পূজার্চনার সামান্য ত্রুটি বা অবহেলা হলেই গৃহস্থের ক্ষতিসাধন করে থাকেন। বিশেষ করে গৃহকর্ত্রীর। শরীরে নানা ধরনের উপসর্গ দেখা দেয়। উপসর্গগুলি, হঠাৎ পেটের ব্যথা, কোমরের বা মাজার যন্ত্রণা, মাথা ধরা, শরীরের নানা অংশে ব্যথা যন্ত্রণা ইত্যাদি। সঠিক সময় নির্ণয় করতে না পারলে, প্রাণহানিও হতে পারে। এসব উপসর্গ নির্ণয় করেন "হুজি" অর্থাৎ 'গুনিন কবিরাজ'। সময়মতো নির্ণয় করে মানত করলে, অল্প সময়ের মধ্যে রোগী ভালো হয়ে যায়। ফলে বিশেষ তিথি-অনুষ্ঠান ছাড়াও মানসিক কারণে বিভিন্ন সময়েও পূজিত হয়।

"রাঁস্তক-তাণ্ডি" (রুস্তক পূজা) বিষয়টি অতি প্রাচীন এবং বংশানুক্রমিক। "রাঁস্তকের" ঘট স্থাপন ও প্রতিষ্ঠার বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিন্ন। মাতৃতান্ত্রিক প্রথা অনুযায়ী রমণীরাই "রাঁস্তক বায়" স্থাপন ও সংরক্ষণ করে থাকে। যে রমণীর আমলে 'রাঁস্তক'টি প্রতিষ্ঠা বা স্থাপন করা হবে, তার মৃত্যুর দিন পর্যন্ত সেই রমণীর দায়িত্বে রাঁস্তকের ঘটটি সংরক্ষিত থাকবে। তার জীবিতাবস্থায় ঘরে মেয়ে বা পুত্রবধূ থাকলেও তাদের পূজার্চনা করার অধিকার থাকে না। প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি যে দিন মারা যাবে, সে দিনেই তার সঙ্গে 'রাঁস্তক'-এর ঘটটি বিসর্জন দিতে হবে। পরবর্তীতে ঘরে যদি বিবাহিতা মেয়ে থাকে, তাহলে 'হাঁস্যুক' (গোত্র) অনুসারে নতুন করে আবার 'রাঁস্তক বায়' স্থাপন বা প্রতিষ্ঠা করে থাকে। অথবা ঘরে যদি উপযুক্ত মেয়ে না থাকে, তাহলে পুত্রবধূ ঘট স্থাপন করবে। তবে পুত্রবধূ শাশুড়ির 'রাসণ্ডে'র অর্থাৎ 'রীতি আচার'-এ ঘট স্থাপন করতে পারবে না। 'হাঁস্যুক' অনুসারে তার মায়ের বহন করা "চাঁলাই" অর্থাৎ 'বাঁজ' স্থানান্তর করে, তবেই নতুন করে, 'রাঁস্তকে'র ঘট প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। এমনি করে অতি প্রাচীন কাল থেকে ধারবাহিকভাবে চলে এসেছে এই 'রাঁস্তক' স্থাপনের বিষয়টি।

"রাঁস্তক বায়" (বাস্তু দেবী) স্থাপন করা হয়, উত্তর দিকের ঘরের পূর্ব প্রান্তে এককোণে, একটা মাচানের উপর। একটি বড়, একটি ছোট চাল পূর্ণ 'ঘট' বসানো হয়। চালের চুড়ায় একটি করে সিঁদুর মাখানো "তাঁচিই" (মুরগির ডিম) বসানো থাকে। পুজোর দিন মাচানটি যাত্রাশির পাতা ও কাপাস তুলো দিয়ে, সুতোর মালা গেঁথে, সুন্দর করে সাজানো হয়। পূজা করে "দেউশি/সারাঙ্গা"। পূজার জোগানদার থাকে এক জন 'গাঁবি' অর্থাৎ ভারাল। "রাঁস্তক" পূজায় "চকত চরলাওণ্ডি" অর্থাৎ সুরাপানি (মদ) নিবেদন অতি আবশ্যক। তাছাড়াও শূকর বলি দেওয়া হয়। অনেক সময় হাঁস-মুরগিও বলি দেওয়া হয়।

এখন নির্দিষ্ট একটা সময় ও দিনের মধ্যে শ্রাদ্ধাদির কর্ম করা হয়। বিশেষ করে জলপাইগুড়ির কামাখ্যাগুড়ি, পারোকাটা, চিক্‌লিগুড়ি, বারবিশা, দলদলি ইত্যাদি গ্রাম, পার্শ্ববর্তী কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জের বোচামাড়ি, শালবাড়ি, তল্লিগুড়ি, ভাণ্ডিজালাস, হরিপুর, ভাড়েয়া, টাকোয়ামারী, রসিকবিল ইত্যাদি গ্রামে বসবাসকারী রাভারা সম্পূর্ণ সনাতন ধর্মমতে পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম শ্রাদ্ধাদি করে থাকেন। নির্দিষ্ট তিরিশ দিনের মাথায় পুরোহিত দ্বারা শ্রাদ্ধাদির কর্ম করা হয়।



বিবাহবাসরে বর-কনে

পূজায় নৈবেদ্য "চকত" নিবেদনের পাত্রটি অত্যন্ত অভিনব এবং দেখতে অদ্ভুত। পাত্রটির নাম "বুর্কি"। এটি এক ধরনের লাউয়ের খোলের তৈরি করা হয়। দেখতে অবিকল আধ-চোপসানো যুক্ত বেলুনের মতো। পূজা শেষে প্রসাদ স্বরূপ "চকত" পরিবেশন করা হয় ওই "বুর্কি" দিয়েই। প্রসাদ পরিবেশন করে দুজন "জানায়"। রাতভর চলে খাওয়া দাওয়া, আনন্দ স্ফূর্তি, নৃত্য গীত। এর জন্য একের পর এক মজুত রাখা হয় "চকত কাঁম্বাই" অর্থাৎ মদের কলসি। অবশ্য প্রত্যেক পূজার জন্য আলাদা আলাদা হাঁড়ি নির্মাণ করা থাকে। সারা রাত আনন্দ স্ফূর্তি করার পর ভোরবেলা সাঙ্গ করা হয় "রাঁন্তুক" পূজানুষ্ঠান। এরপর শুরু হয় বিবাহ অনুষ্ঠান পর্ব।

বিবাহ অনুষ্ঠানটি হয় রাত্রিবেলা, ঘরের ভিতরে। যে ঘরে বাস্তুদেবী 'রাঁন্তুক" বসানো থাকে সেই ঘরের মেঝেতে বর কনের বিয়ের মণ্ডপ সাজানো হয়। বর কনের বসার আসনের সামনা সামনি দুটি বেঁড়ের উপর বসানো থাকে মদের পাতিল। তাকে বলা হয় "চকত বাঁন্দি"। পাতিলের উপর হাতির শুঁড়ের মতো একটি করে লম্বা বেঁড় বসানো থাকে। দেখতে প্রায় হাতির মাথার মতো। "চকত বাঁন্দি'র পাদদেশে যোল জোড়া গুয়াপান (পান সুপুরি) বিছানো থাকে। জোড়া গুয়াপান হাতবদলের মধ্য দিয়ে বিয়ে করানো হয়। পুরোহিতের কাজ করে "দেউশি/সারাঙ্গা"। একটি কাঁসার ঘটের উপর বরকনের হাতে হাত রেখে, 'দেউশি' মন্ত্র পড়ে বিবাহ বন্ধন করে দেয়। এর পর শুরু হয় আত্মীয়স্বজন ও নিমন্ত্রিতদের মধ্যে যৌতুক উপহার সামগ্রী দেওয়ার পালা।

এইরূপ বিবাহ ছাড়াও আর এক ধরনের বিবাহরীতি প্রচলন আছে। তা হল "রাঁন্তুকের" সামনে মন্ত্র পড়ে মুরগির গলা কেটে রক্তের ধারা দিয়ে বিবাহ। তাকে বলা হয় "গুন্দুগার" বা "বায় বাঁলাঁঙ" অর্থাৎ "নিকাহ্ করানো"। আর্থিক দিক থেকে দুর্বল অথবা তাৎক্ষণিক কোনও ঘটনার কারণে কিংবা বিধবা বিবাহের ক্ষেত্রে এরূপ বিবাহ হয়ে থাকে। এসবই 'দেউশি' দ্বারা করানো হয়।

পারলৌকিক ক্রিয়ানুষ্ঠান

রাভা সমাজে কোনও ব্যক্তির মৃত্যু হলে তাঁর পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম হয় প্রাচীন রীতিনীতিতেই। মৃত্যুর পর যে কোনও দিন পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম করা হত। নির্দিষ্ট কোনও সময় সীমা ছিল না। যারা আর্থিক দিক থেকে সচ্ছল তারা মৃত্যুর পর যে কোনও দিন পারলৌকিক ক্রিয়ানুষ্ঠান করে ফেলে। যাদের আর্থিক দিক থেকে দুর্বল বা গরিব, তাদের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান চালের মাথায় তুলে রাখা হত। পরে সময় হলে আর্থিক সুবিধা হলে স্বাভাবিক হলে চাল থেকে নামিয়ে শ্রাদ্ধাদি করা হত। এরূপ শ্রাদ্ধানুষ্ঠান বন-বস্তি ও বনাঞ্চল সংলগ্ন বসবাসকারী রাভা সমাজে আজও প্রচলিত। আর্থিক সচ্ছলতার উপর ভিত্তি করে, ছোট "কাম", বড় "কাম" করা হত। রাভা ভাষায় বলা হয়, "কাঁম গদা", "কাঁম পাঁমাঁর", অর্থাৎ বড় কাম দানদক্ষিণা, খাওয়া দাওয়ার শ্রাদ্ধ, ছোট কাম কোনও রকম নিয়মরক্ষার শ্রাদ্ধ। নিয়ম রীতির ক্ষেত্রে বর্তমান অনেকাংশে একটা পরিবর্তন এসেছে। এখন নির্দিষ্ট একটা সময় ও দিনের মধ্যে শ্রাদ্ধাদির কর্ম করা হয়। বিশেষ করে জলপাইগুড়ির কামাখ্যাগুড়ি, পারোকাটা, চিক্‌লিগুড়ি, বারবিশা, দলদলি ইত্যাদি গ্রাম, পার্শ্ববর্তী কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জের বোচামাড়ি, শালবাড়ি, তল্লিগুড়ি, ভান্ডিজালাস, হরিপুর, ভাড়েয়া, টাকোয়ামারী, রসিকবিল ইত্যাদি গ্রামে বসবাসকারী রাভারা সম্পূর্ণ সনাতন ধর্মমতে পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম শ্রাদ্ধাদি করে থাকেন। নির্দিষ্ট তিরিশ দিনের মাথায় পুরোহিত দ্বারা শ্রাদ্ধাদির কর্ম করা হয়। এ সব করলেও প্রাচীন রীতিনীতি কিন্তু বর্জন হয়নি। শ্রাদ্ধের দিন ঘরের ভিতরে সাজানো হয় রাভা নিয়মে "মায়লাঁশীন" অর্থাৎ পিণ্ড প্রশস্ত। সেখানে করা হয় "চিকা বাঁরাঁই" অর্থাৎ "জলদান"।

রাভা রীতিতে পারলৌকিক ক্রিয়া

যে ঘরে রোগী মারা যায়, সেই ঘরের ভিতরে সাজানো হয় "মায়লাঁশীন" (পিন্ডি প্রশস্ত) একটি 'বড় নেইস পাতা' (কলা পাতার আগা)র উপর বেশ কিছু ভাতের নাড়ু তৈরি করে, ভাগ ভাগ করে বসানো হয়। দলাগুলি লাইন করে সাজানো থাকে। তার উপর দই ঢেলে দিয়ে, আরও অন্যান্য উপকরণ সহ সুন্দরভাবে সাজানো হয়। দেখতে ঠিক ফুলঝুরির মতো হয়, মূল পিন্ডিটা একটু বড় সড় ঠিক মাঝখানে বসানো থাকে, তাঁর পাশেই যেখানে রোগী মারা যান, ঠিক সেই স্থানেই একটা 'ঢঙা'র মধ্যে (কলার খোলের তৈরি পাত্র) চাল ভেজে গুঁড়ো করে, সেই চালের গুঁড়ো 'ঢঙা' ভর্তি করে দিয়ে আলগা ভাবে পাতা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। সঙ্গে একটি 'তীর ধনুক' সাজিয়ে রেখে দেওয়া হয়, এবং সেখানে মদ ও জল সহ মৃত ব্যক্তিকে নিবেদন (চিকা বাঁরাঁই) করা হয়। এর মূল কারণ, মৃত ব্যক্তির আত্মা কীরূপ

নিয়ে স্বর্গে গেল, তাঁর পদচিহ্ন ওই ঢেকে রাখা চালের গুঁড়োর মধ্যে পাওয়া যায় বা দেখা যায় বলে বিশ্বাস।

মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে একটি জীবও উৎসর্গ করে দেওয়া হয়। তাকে বলা হয় "তৌশুনি" অর্থাৎ 'মুরগি' বিধানো। এও এক অদ্ভুত দৃশ্য। উঠোনের মাঝখানে একটু জায়গা লেপে কলাপাতা দিয়ে আসন সাজানো হয়। সেখানে একটি মুরগিকে বাঁশের ছুঁচ দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে প্রাণটাকে বের করে দেওয়া হয়, আর মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে নানাধরনের প্রলাপ বলা হয়। এই কাজটি যে করে, তাকে বলা হয় "বাঁলেক", (বাঁলেক' কথার অর্থ মরা কাটা ব্যক্তি)। কোনও কোনও ক্ষেত্রে "সারাঙ্গা" বা 'দেউশি' করে থাকেন। এর উদ্দেশ্য হল মৃত ব্যক্তির আত্মাকে সঙ্গ দিয়ে স্বর্গে নিয়ে যাওয়া। শুধু তাই নয়, মৃত ব্যক্তি যদি ইহলোকে কোনও পাপ কর্ম বা অপরাধ করে থাকে, তাহলে ভগবান যেন তাকে মাফ করে দেন। সেজন্য সঙ্গে একটি জীব উপহারস্বরূপ পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এসব কর্মের পর শুরু হয় "চিকা বীরাই" পর্ব (মুমূর্ষুর মুখে জল দান)।



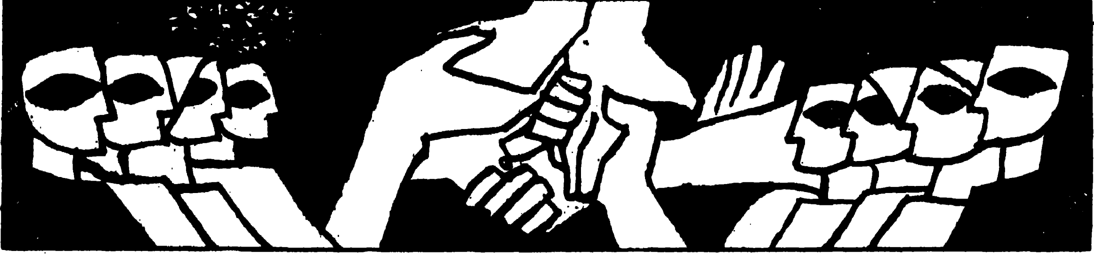
রাভাদের পারলৌকিক অনুষ্ঠান

এই "চিকা বীরাই" বা জলদানের বিষয়টি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও কঠোর শৃঙ্খলাপরায়ণ। মৃত ব্যক্তি যে গোত্রের অর্থাৎ 'হীসুকে'র হবেন, সেই 'হীসুকের'ই 'জল' দিতে হবে। প্রত্যেকটি 'হীসুকের'ই মানে গোত্রেরই আলাদা আলাদা 'জলধারা' আছে। তাকে বলা হয় "হীসুক বারায়চিকা" অর্থাৎ একই গোত্রের "জলধারা"। অন্য কোনও গোত্রের জল দিলে, সে পাবে না। গোত্র বা 'হীসুক' অনুসারে প্রত্যেক 'হীসুক'-এর 'জলদানের' (চিকা বীরাইর) জন্য গোপনীয় কয়েকটি 'কথা' আছে। যা নাকি অন্য কেউই জানে না। একমাত্র মাতৃস্থানীয় কোনও বয়স্কা মহিলা, তার জীবদ্দশা পর্যন্ত অতি সংগোপনে সংরক্ষণ করে রাখেন। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তাঁর কোন উপযুক্ত কন্যাসন্তানকে, সংরক্ষিত 'কথা' কয়টি দান করে যান। যদি নিজস্ব কোনও কন্যাসন্তান না থাকে, তাহলে একই গোত্রে (হীসুক) কন্যাসম উপযুক্ত কোনও মহিলাকে দিয়ে যান। এই "চিকা বীরাই" বা "হীসুক হাদাম" রীতিটি অতি প্রাচীন কাল থেকে, ধারাবাহিকভাবে চলে এসেছে। আর সেই প্রচলিত ধারাটি রাভা সমাজে আজও বিদ্যমান। সংরক্ষিত কথা কয়টি 'হীসুক' অনুযায়ী, মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে গোপনে উচ্চারণ করে, "মায়লীশানে" (পিন্ডি প্রশস্তে) জল দান করা হয়। প্রথমে একই 'হীসুকে'র কোনও বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলা 'চিকা বীরাই' (জলদানের) সূচনা করে, পরে একে একে অন্যান্যরা দেয়। 'চিকা বীরাই' পর্ব শেষে শুরু হয়, 'মায়লীশান-বাকাঁয়ভিই' অর্থাৎ পিন্ডির নৈবেদ্যাদি ফেলানো। ঘরের ভিতরে সাজানো 'মায়লীশান'টি বাইরে নিয়ে গিয়ে শ্মশানে বা বাড়ির আশপাশের কোনও জলাধারে ফেলে দেওয়া হয়। 'মায়লীশান বাকাঁয়টি' বা 'পিন্ডি ফেলানো' বিষয়টিও রোমাঞ্চকর ও দৃষ্টিনন্দন।

"হেম, বাঁংশী, কাল বাঁংশী," (ঢোল, বাঁশী, কাল বাঁশী) ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে, নৃত্য গীত করতে করতে নিয়ে যাওয়া হয়। একে বলা হয়, "লাম হউঙি" অর্থাৎ 'পথ প্রদর্শক'। একজন 'তরবারি' হাতে সামনে অগ্রসর হয়। আর একজন 'তীরধনুক' হাতে লড়াই করতে করতে যায়। মহিলারা 'মায়লীশান'টি নিয়ে সমবেতভাবে নৃত্য করতে করতে বেরিয়ে যায়। এর উদ্দেশ্য মৃত ব্যক্তিকে শেষ বিদায় দেওয়া, এবং স্বর্গে যাওয়ার পথ প্রশস্ত করা। তরবারি দিয়ে ঝাড় জঙ্গল কেটে স্বর্গে যাওয়ার পথ তৈরি করে দেওয়া হয়, এবং পথে যাতে কোনও বিপদ আপদ বা পশুপাখির আক্রমণ না ঘটে, তার জন্য 'তীর ধনুক' দিয়ে পাহারা দেওয়া হয়। এই প্রচলিত ধারাটি রাভা সমাজে আজও পরিলক্ষিত হয়।

পারলৌকিক ক্রিয়ানুষ্ঠানে, 'কাল বাঁংশী' (কাল বাঁশি) পরিবেশন রাভা সমাজে চিরাচরিত রীতি। এই 'কাল বাঁশীর' মাহাত্ম্য ও অতি অভূতপূর্ব। এই যন্ত্রটির মাধ্যমে, ইহকাল পরকালের যোগসূত্র রয়েছে বলে বিশ্বাস। "চিকা বীরাই" অর্থাৎ জলদানের সময়, এই বিস্ময়কর যন্ত্রটি এক হৃদয়গ্রাহী সুরে পরিবেশন করা হয়। যার সুরে সমস্ত পরিবেশ ক্রন্দন ধ্বনিতে আপ্লুত হয়ে উঠে। আবালবৃদ্ধ সকলে ক্রন্দনে আকুল হয়ে ভেঙে পড়ে। যাদের উদ্দেশে এই 'কাল' পরিবেশন করে 'জলদান' করা হয়, তারাও ইহলোকের আত্মীয় স্বজন, পুত্র পরিজনদের কথা মনে করে, এবং সমব্যথায় ব্যথিত হয় বলে বিশ্বাস। ইহকাল-পরকাল যোগসূত্র ঘটায় বলে, এই যন্ত্রটির নাম 'কাল'। আর বাঁশির সুরে বাজানো হয় বলেই নামকরণ হয়েছে 'কালবাঁংশী' অর্থাৎ 'কাল বাঁশি'। এই কাল বাঁশি গৃহের 'কাল' বলেও গণ্য করা হয়। সময়কাল নির্ণয় করে যন্ত্রটি বাজাতে হয়। অকারণে অসময়ে পরিবেশন করলে গৃহের অমঙ্গল সূচিত হয়। ফলে ইচ্ছা থাকলেও ভয়ে অকারণে কেউই বাজাতে বা সুর পরিবেশন করতে চায় না। এই অলৌকিক বিশ্বাস রাভা সমাজে আজও পোষণ করে।

লেখক ☐ বিশিষ্ট রাভা বুদ্ধিজীবী, কবি ও প্রাবন্ধিক



কাজিমান গোলে

ডুয়ার্সের তামাং জনজাতি ও তার সংস্কৃতি

পশ্চিম বাংলার উত্তরে, হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত জলপাইগুড়ি জেলা। জেলার ভিতর দিয়ে পাহাড়ের শীতল জল নিয়ে প্রবাহিত তিস্তা, তোর্সা, রায়ডাক, কালজানি সঙ্কোশ প্রভৃতি নদীগুলি। সঙ্গে বিস্তীর্ণ বনভূমিতে শাল, সেগুন, শিশু, শিরীষ প্রভৃতি বৃক্ষরাজি এবং জেলার কৃষিক্ষেত্রের সঙ্গে সঙ্গে অনেকাংশ চা বাগানে আবৃত। জেলার পূর্বদিকে অবস্থিত আসাম রাজ্য। এই অঞ্চল ডুয়ার্স নামেও খ্যাত। এলাকাটি চা বাগান এবং বনাঞ্চলে অধ্যুষিত বলে বাঙালি তথা রাজবংশী সম্প্রদায়ের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন জনজাতির বাস দেখা যায়। যেমন—মেচ, রাভা, গারো, টোটো, ওঁরাও, মুন্ডা, খড়িয়া, মহালি, কামার, গৌড়, সাঁওতাল এবং নেপালিদের মধ্যে রাই, লিম্বু, মংগর, গুরুংগ, কামী, দমাই, সারকী, তামাং, ভোটে ডুকপা, সেরপা ইত্যাদি। জেলায় আনুমানিক ৪৮ শতাংশ তফসিলি জাতি এবং উপজাতির বাস। এইসকল জনজাতির প্রায় সকলেরই নিজস্ব উপভাষা আছে। তবে পরস্পরের সঙ্গে ভাব বিনিময়ে সাধারণত বাংলা, নেপালি এবং সাদরি ভাষার প্রচলন দেখা যায়। এখানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বা ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান উৎসবের আকারে পালিত হয়। এইসব উৎসবে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ শামিল হয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাতাবরণ তৈরি করে। অনুষ্ঠানগুলি দোল উৎসব, দীপাবলি, করমজিতিয়া, দুর্গাপূজা, খ্রিস্টমাস এবং তামাং সম্প্রদায়ের লোছার (Lochhar) আনন্দের সঙ্গে পালিত হয়ে থাকে। এখানে বিভিন্ন ভাষাভাষী এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান হয়ে থাকে। এই কারণে এতদঞ্চলের সংস্কৃতির একটি আলাদা রূপ প্রকট হয়ে ওঠে যাকে মিশ্র সংস্কৃতি বলা যেতে পারে।

১৮৬৪-৬৫ খ্রিস্টাব্দে ভুটান রাজার সঙ্গে তৎকালীন ভারতের ব্রিটিশ সরকারের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে ভুটানের রাজা পরাজিত হন। তখন এই ডুয়ার্স অঞ্চল ব্রিটিশ ভারতের



তামাং সম্প্রদায়ের চই নৃত্য

অন্তর্ভুক্ত হয়। এর পূর্বে এই সব এলাকা ঘন জঙ্গল এবং পশুপাখির আবাসস্থল ছিল। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এই ঘন জঙ্গল কেটে চা বাগান করার পরিকল্পনা করে। জঙ্গল সাফাই অভিযান শুরু হয়। কোম্পানির গোরা সাহেব দালাল মারফত রাঁচি, সিংভূম, হাজারিবাগ প্রভৃতি অঞ্চল থেকে আদিবাসী সম্প্রদায়ের শ্রমিক এবং নেপালের তেমাল, ওয়াফল, মাওয়ার, থংয়াল, ইয়োলমো প্রভৃতি অঞ্চল থেকে নেপালি সম্প্রদায়ের শ্রমিক নিয়ে আসে। তৎকালীন নেপালের সামন্ত রাজার অত্যাচারে নেপালি সম্প্রদায়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেক তামাং সম্প্রদায়ের শ্রমিক এই অঞ্চলে চলে আসেন। শুরু হয় বৃক্ষছেদন এবং চা গাছ রোপণ। শ্রমিকদের কাজকর্মের সঙ্গে সঙ্গে কালাজ্বর এবং মানুষখেকো বাঘের উপদ্রবের মধ্যে ভোর থেকে রাত্রি না হওয়া পর্যন্ত অবিরাম কাজ করতে হত। অসুস্থ হয়ে পড়লে চিকিৎসার তেমন ব্যবস্থা ছিল না। গোরা সাহেবের হুকুমই ছিল আইন। এইভাবে এই অঞ্চলের জনজাতির পূর্বপুরুষেরা সাহেবের অত্যাচার, কালাজ্বরে ভুগে সারাদিন পরিশ্রম করে কোম্পানির লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে এসেছিল। এই সকল শ্রমিকদের মধ্যে একটা বড় অংশ ছিল নেপালিদের মধ্যে তামাং সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়ের মানুষ শুধুমাত্র চা বাগান নয়, বনবস্তি, কৃষিজ অঞ্চলের প্রভৃতি স্থানে কৃষিকাজের সঙ্গে সঙ্গে পশুপালন করে আসছে। চা বাগান শ্রমিকেরা দৈনিক মাত্র ৩৪ টাকা ৮০ পয়সা মজুরি পেয়ে অতিকষ্টে দিনযাপন করে আসছেন। পাশাপাশি বনশ্রমিকেরা সারা বছরে খুব বেশি হলে ৩০ দিন কাজ পাচ্ছে। বাকি সময় তাঁরা বাইরে মজুর খেটে অনেকে পশুপালন, অল্প একটু জমিতে শাকসব্জি প্রভৃতি চাষ আবাদ করে অতি কষ্টে দিনযাপন করে আসছেন। অতীব আর্থিক সমস্যার মধ্যেও তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার দিকে নজর দিতে হচ্ছে। ফলে আজকাল সরকারি কাজে, শিক্ষক, পুলিস এবং সেনাদলে কিছু কিছু তামাং সম্প্রদায়ের লোক দেখা যাচ্ছে। তবে সরকারি উচ্চপদে তামাং সম্প্রদায়ের লোক নেই বললেই চলে। এর প্রধান কারণ ছেলেমেয়েদের উচ্চশিক্ষা দেবার ক্ষমতা অভিভাবকদের থাকে না বলে। সামাজিক জীবনে এই সম্প্রদায়ের লোকের অবদান বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। চা-বাগানের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে এদের সক্রিয় ভূমিকা দেখা যায়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যেমন গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদেও এই সম্প্রদায়ের মানুষের প্রতিনিধিত্ব উল্লেখযোগ্য।

লোক সংস্কৃতির দৃষ্টিতে তামাং জনজাতির একটি আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে। নিজেদের আলাদা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং তাম্বা (তাম্বা অর্থাৎ সমাজের অভিজ্ঞ বৃদ্ধ এমন একজন ব্যক্তি যিনি পূর্বপুরুষদের কথা বলতে পারেন।) দ্বারা পূর্বপুরুষের বিভিন্ন ঘটনা জানার মাধ্যমে নিজেদের আলাদা অনুভব, অনুভূতি, ধর্ম, ইতিহাস পরম্পরা, রীতি-নীতি পালনের দ্বারা এক Tradition আবহমান গতিতে চলে আসছে। তাম্বা বিভিন্ন সংস্কার অনুযায়ী গান রচনা করে থাকেন। তামাংদের নরং অর্থাৎ (শিশুর জন্মের পর ছয় ষষ্ঠী অনুষ্ঠান) থেকে বিবাহ পর্যন্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আলাদা আলাদা গান রচনা হয়ে থাকে। তামাং সেলো বা ডম্ফু গানকে তামাং উপভাষায় ওহাই বলে। ডম্ফু বাজিয়ে গানের তালে তালে নাচে বলে তাকে ডম্ফু নাচ বলা হয়। এছাড়া বিভিন্ন ধার্মিক এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডের উপর নির্ভর করে বিভিন্ন নাচ এবং গান রচনা হয়ে থাকে। তামাং সেলো আবার তিন ভাগে বিভক্ত—খানদুগে, শেরপালি, সিন্দুপাল চোকে।

আবার তামাংদের মধ্যে ধর্মীয় নৃত্যের উল্লেখযোগ্য স্থান রয়েছে নাচগুলি—বাক্‌পা, ঝুঙবা, চই। নৃত্যের বিষয় অশুভ শক্তিকে পরাজিত করে শান্তি স্থাপনের প্রয়াস। এই নৃত্যশৈলীতে বলিষ্ঠ আঙ্গিকের প্রয়োগ বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

বাক্‌পা নৃত্য : এই নৃত্যে সাধারণত কাঠ খোদাই করে মুখোশ তৈরি করে ব্যবহার করা হয় এবং চমরী গরুর লেজ দিয়ে পরচুলা তৈরি করে ব্যবহার করা হয়। মুখোশধারীরা সাধারণত ভিন্ন ভিন্ন নৃত্যাভিনয় করেন, যেমন—ঢাকপো, মানিং, সিংদুং, চেকিয়ার প্রভৃতি। বাক্‌পার আরও নাম আছে যেমন—নাকপা, লামা ইত্যাদি। এই নৃত্যাভিনয়ে প্রধান বাদ্যযন্ত্র বড় করতাল, এছাড়াও ঢ্যাংরো দুং অর্থাৎ বড় আকারের শঙ্খ। এছাড়াও কাংলিং, গ্যালিং, ভিলবু, ধিংসা, চৈদর, খুনদর প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র থাকে। এই নৃত্যে সিল্কের তৈরি ঢোল্য জামা শিল্পীরা পরিধান করে থাকেন। এই নৃত্য রাতের বেলায় হয়। মাঝখানে আগুন জ্বেলে সেই আগুনকে কেন্দ্র করে এই নাচ চলতে থাকে।

ঝুঙবা নৃত্য : এই নৃত্য দিনের বেলায় হয়। এই নাচে মুখোশ ব্যবহার হয় না। তবে শিল্পীকে ভূতের মতো সাজতে হয়। বাদ্যযন্ত্র এবং পরচুলা বাক্‌পা নৃত্যের মতোই।

চই নৃত্য : তামাং সম্প্রদায়ের কেউ মারা গেলে সেই মৃতদেহটিকে খাড়াখাড়ি পদ্মাসনে বসিয়ে রাখা হয়। মৃতদেহ সঠিকভাবে বসাবার জন্য মন্দির আকৃতির যে খাঁচাটা বানানো হয় তাকে "ডোম" বলে।

তামাং সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত ধারণা যে মৃত্যুর পরে শয়তান রাক্ষসেরা মৃতের আত্মাকে অপবিত্র করতে আসে, তাই তামাং পুরোহিতরা চই নৃত্যের মাধ্যমে সেই মৃতের আত্মাকে স্বর্গের পবিত্র স্থানে নিয়ে যেতে চান। এরপর সেই মৃত ব্যক্তিকে ডোমে পদ্মাসনে বসিয়ে সৎকার ভূমিতে নিয়ে যাওয়া হয়। সকলে আনত প্রণামে মৃতের আত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। চই নৃত্যের মাধ্যমে ডোমটিকে দাহ স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়।

জলপাইগুড়ি জেলার চা বাগানের খেটে-খাওয়া শ্রমিক বর্গের একটা অংশ এই অঞ্চলের তামাং সংস্কৃতির ধারক ও বাহক কিন্তু এদের সঠিক মূল্যায়ন আজও হয়নি। যদিও এদের সংস্কৃতিতে প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির নজির দেখা যায়। আর এই সম্প্রদায়ের অধিকাংশ অশিক্ষা, অন্ধ বিশ্বাস প্রভৃতি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নয়। যদিও সাক্ষরতা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, সমাজের গঠনমূলক কাজে তামাং কলাকুশলীদের অবদান অনস্বীকার্য।

পরিবর্তনশীল বিশ্বে কোনও সংস্কৃতি চিরদিন নিজের আধিপত্য বজায় রাখতে পারে না। তবুও তামাংদের পূর্বপুরুষের ঐতিহ্যমণ্ডিত বর্তমান সংস্কৃতি এখনও অক্ষুণ্ণ। তবে বর্তমান সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণে ভারতীয় সংস্কৃতির উপর অশ্লীল নগ্ন পাশ্চাত্য প্রভাব পড়েছে। তা থেকে তামাং সংস্কৃতি ক্রমশ নিজস্বতা হারাচ্ছে। তাই এই লোকসংস্কৃতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য কত ধরে রাখা যাবে তা বলা যাচ্ছে না।

তামাং সংস্কৃতির সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের যোগ রয়েছে—সেজন্য জলপাইগুড়ি তথা ডুয়ার্স অঞ্চলে অনেক গুম্বা দেখা যায় (বৌদ্ধমন্দির)। এই জেলায় ১৯৩৬ সালে গাঙ্গুটিয়া চা বাগানে প্রথম একটি গুম্বা স্থাপন হয়। তার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন স্বর্গীয় একলে লামা। এরপর কালচিনি, বীরপাড়া, সামসিং, বাগ্রাকোট, দুমসিপাড়া, বুকিমবাড়ি, ভাটপাড়া, লঙ্কাপাড়া, দলসিংপাড়া, দলমোর, রাইমাটাং, চিনচুলা, লতাবাড়ি বস্তি, বীরপাড়া বস্তি, ধুমপাড়া, চুনাভাটি প্রভৃতি স্থানে গুম্বা স্থাপন হয়। কিছুদিন আগে জয়গাঁও অঞ্চলে মহাযানী বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা হয়।

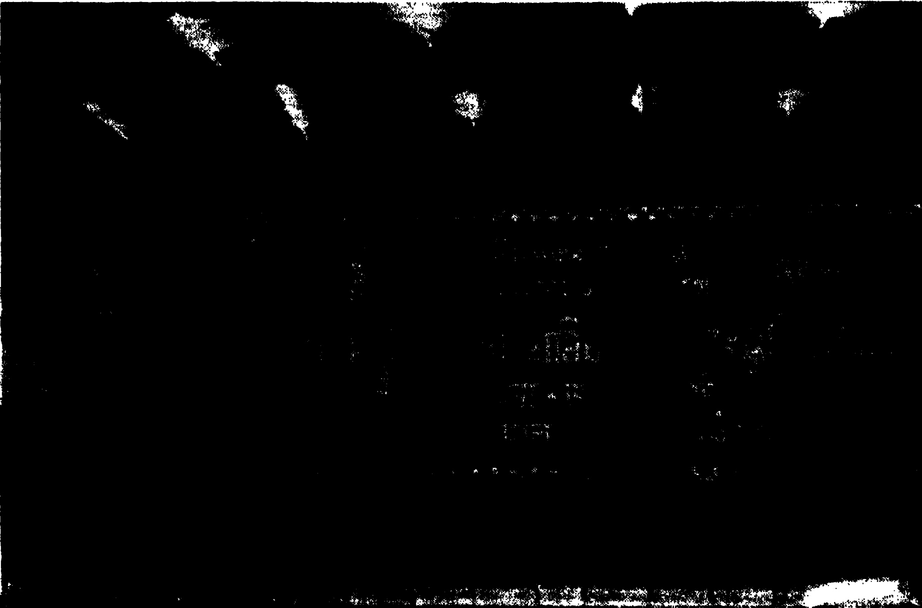
সরকারি উচ্চপদে তামাং সম্প্রদায়ের লোক নেই বললেই চলে। এর প্রধান কারণ ছেলেমেয়েদের উচ্চশিক্ষা দেবার ক্ষমতা অভিভাবকদের থাকে না বলে। সামাজিক জীবনে এই সম্প্রদায়ের লোকের অবদান বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। চা-বাগানের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে এদের সক্রিয় ভূমিকা দেখা যায়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যেমন গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদেও এই সম্প্রদায়ের মানুষের প্রতিনিধিত্ব উল্লেখযোগ্য।

তামাংদের ধর্মীয় দিক থেকে ঐতিহাসিক পটভূমিকায় পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে এরা তিব্বতে প্রচলিত তান্ত্রিক বজ্রযানী সম্প্রদায়ের এক শাখা নিংমাপা পন্থ। ভারতীয় তান্ত্রিক বজ্রগুরু পদ্ম সম্ভব রিম্পোছে দ্বারা স্থাপিত তিব্বতের সর্বপ্রথম ধার্মিক সম্প্রদায় মানা হয়। তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের আগে বোপ ধর্ম প্রচলিত ছিল। এই ধর্মে তান্ত্রিক ওঝা প্রভৃতির প্রভাব ছিল বেশি। এখনও তামাং সমাজে এর প্রভাব দেখা যায়। ধার্মিক বা সামাজিক কাজকর্মে কতকগুলি আচার অনুষ্ঠানে তান্ত্রিক বা ওঝাদের নির্দেশিত ক্রিয়াকর্ম হয়ে থাকে।

তামাং সম্প্রদায় মঙ্গোলিয়া অঞ্চলের চৈনিক ভোট বংশের অন্তর্গত ভোট বর্মেলী ভাষা পরিবারের সদস্য। তামাংদের মুল্মীও বলা হয়। তিব্বতি ভাষায় মুল-এর অর্থ সীমানা এবং মী-এর অর্থ মানুষ অর্থাৎ সীমানার মানুষ। মতান্তরে তামাংদের পূর্বপুরুষ তিব্বতের কেরুঙ ক্ষেত্র থেকে উদ্ভূত। আবার কেউ কেউ বলেন তিব্বতের রাজা স্রোং পং গম্পে নেপালের উত্তরাংশ আক্রমণ করে কাঠমান্ডু সমেত এলাকা কব্জা করে নিজের আধিপত্য বিস্তার করেন। তাঁর সেনাবাহিনীতে তামাং সম্প্রদায়ের মানুষ ছিল। তারা অশ্বারোহী ছিলেন। ভোট ভাষায় অশ্বারোহীকে তমক বলে। সেই তমক অপভ্রংশ হয়ে তামাং-এ পরিণত হয়।

বারো তামাং আঠারোজাত

তামাংদের পূর্বপুরুষ বারটা অঞ্চলে বসবাস করত বলে বারো তামাং বলা হয়। এদের মধ্যে আঠারোটি জাত। পরে অন্যান্য উপজাতি মিলিয়ে সংখ্যা দাঁড়ায় ১৩৪টিতে।



তামাং সম্প্রদায়ের বাকপা নৃত্য

আঠারোটি জাত নিম্নরূপ :

দোঙ—গ্রাংদান, গোলে, তিতুংগ, বল, ডিম্‌দং, গোংবা, গ্যাম্‌দেন, দারতাম, গাঙতাম।

হেন্যাজ্ঞান—বোমজন, ডুমজন, লোপচন, মিকচন,

ঘিসিং—লো, গ্লান, এঁওসুর।

মোক্তান—স্যাংদান, পাখরিন, স্যাঙবো, থোকর।

রুম্বা—জীম্বা, গ্যাবা, ওয়াইবা, গোঙবা।

লোপচন—চোখেন, ব্বন্দেন, সোংসুন, ঝরতেন, গ্রালদেন।

থিং—মার্পা, তোঙসাগ।

ঙ্যসুর—সিংগর, ব্রোন।

লো—লোবা

মার্পা—থিঙ, তোইসাঙ

টুপা—

ব্রোন—স্যাঙবো, স্যাঙদন

সিঙ্গর—নাসুর, থিঙ তোইসাঙ

বজ্য—

লুঙপা—

গ্যাপা—রুম্বা, জিম্বা, ওয়াইবা, গোঙবা

থোকর—মোক্তান, স্যাঙদন, পাখরিন, স্যাঙবো

পাখরিন—স্যাঙদন, মোক্তান, স্যাঙবো, থোকর।

বিভিন্ন সামাজিক সংস্কার ও অনুষ্ঠান

জন্ম সংস্কার (থাপ্সাপ ঠুই) বা ন্যরণ

তামাংদের ঘরে কোনও শিশু জন্মগ্রহণ করার পর তিনদিনের দিন এই অনুষ্ঠান পালন করা হয়। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ১১(এগারো) দিনেও এই অনুষ্ঠান করা হয়ে থাকে। ধর্মীয় রীতিতে এই দিনে শিশুর নামকরণ হয়ে থাকে। আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশীর নিমন্ত্রণ থাকে এবং ছোট অনুষ্ঠানটি ভোজন পর্বের মাধ্যমে শেষ হয়।



তামাং মুখোশ নৃত্য।

কান খ্যাবা (পাস্নী) বা ভাত খাই

এই অনুষ্ঠানটি অন্নপ্রাশন। কোনও তামাং শিশুর ৬ মাস বয়সে এই অনুষ্ঠানটি হয়। পরিবারের সবচেয়ে বৃদ্ধ ব্যক্তির হাতে সোনা বা রূপার পয়সায় নতুন বস্ত্র পরিহিত শিশুকে প্রথম ভাত খাওয়ানো হয়। এখানেও আত্মীয়স্বজন এবং প্রতিবেশীর নিমন্ত্রণ থাকে। সবাই মিলে একসাথে খাওয়া দাওয়ার সঙ্গে আনন্দ অনুষ্ঠান শেষ হয়।

ছেয়ার টাপচে তথা স্যামা পিম্বা

এই অনুষ্ঠান শুধু মাত্র বালকদের নিয়ে হয়ে থাকে। বালকের তিন বছর বা পাঁচ বছর বা সাত বছর বয়সে হয়ে থাকে। অনুষ্ঠানে বালকের মামার দ্বারা বালকের মস্তক মুণ্ডন করা হয়। তামাং সমাজে মামার দ্বারা কোনও শুভ কাজ সম্পন্ন হলে তা বালকের মঙ্গল হয় বলে প্রচলিত ধারণা চলে আসছে। অবশ্য মামা তার ভাগ্নেকে সাধ্যমতো উপঢৌকন দেয় হয়।

বিবাহ

তামাং সমাজে বাগদত্তা রীতিকে চারদম বলা হয়। গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং সমাজের সকল মানুষের উপস্থিতিতে বিবাহযোগ্যা কন্যার পিতা বা ভ্রাতা একটি থালায় স্বর্ণ বা রৌপ্যমুদ্রা, চাল, ফল ইত্যাদি সাজিয়ে পাত্রের পিতা বা ভ্রাতার হাতে তুলে দিয়ে পাত্র-পাত্রীর নাম সকলের কাছে ঘোষণা করেন। ঘোষণায় উল্লেখ থাকে যে হিমালয়ের তরুশাখা থেকে শুরু করে সমুদ্রের মাছ পর্যন্ত সকলের সম্মতিতে এই চারদম ঘোষিত হল। ঘোষণার পর উক্ত যুবক-যুবতী সামাজিকভাবে বিবাহে দায়বদ্ধ থাকেন। এই ঘোষণায় আরও উল্লেখ থাকে যে কন্যা পাত্রকে সম্প্রদান করা হলেও কন্যার শরীরের হাড়ের উপর সর্বদা পাত্রী পক্ষের দাবি থাকবে। অর্থাৎ শরীরের হাড় ব্যতিরেকে সবই সম্প্রদান করা হল।

তামাং সমাজে বিবাহে কোনও পণপ্রথা নেই। সাধ্যমতো যে তিনটি প্রথা মানা হয় তা মাওয়ালী, দুধৌলী, ঢোকৌলী। এই প্রথার জন্য শেল রুটি (বালার আকারের বড় ঘি বা তেলে ভাজা রুটি), মাংস, তরকারি আর গৃহে প্রস্তুত মদ পাঠানো হয় কন্যার বাড়িতে। নতুন জামাতার পরিচিতি প্রদান তামাং বিবাহ রীতির অন্যতম অঙ্গ।

এখানে একটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বাগদত্তা নারী যদি প্রেমঘটিত কারণে অন্য কোথাও বিবাহ করেন, সন্তানের জননী হন তা হলেও সেই বাগদত্তা নারীকে মৃত্যুর পরেও চিতায় উঠিয়ে চারদম বা বাগদত্তা হিসাবে বিবাহ দিতে হয় এবং নিয়ম এত কঠোর যে, সেই অনুষ্ঠান না হওয়া পর্যন্ত চিতাতে আগুন দেওয়া নিষেধ।

ঘেয়া বা শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান

পিতা বা মাতার মৃত্যুর পর যে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান হয় তাকে ঘেয়া বলে। অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে পিতা বা মাতার মৃত্যুর পর যে অশৌচ চলে সেইরূপ তামাং সম্প্রদায়ের মধ্যে মৃত্যুর পর প্রথম তিনদিন লবণ এবং তেল নিষিদ্ধ। তৃতীয় দিনে একটি অনুষ্ঠানের পর লবণ এবং তেল ব্যবহারের অনুমতি মেলে। আবার সপ্তম দিন নিষিদ্ধ থাকবে। সেই দিন অনুরূপ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে লবণ এবং তেল ব্যবহারের অনুমতি মেলে। এইভাবে প্রতি সাত দিন অন্তর এই অনুষ্ঠান চলবে। অবশেষে উনপঞ্চাশতম দিনে ঘেয়া অনুষ্ঠান সম্পন্ন হবে। তবে আজকাল সুবিধার জন্য অনেকে তেরো দিনে ঘেয়া

অনুষ্ঠান করে। মৃত পিতা বা মাতার ছেলেরা নিজেদের সাধ্য অনুযায়ী খরচ করে পিতৃ বা মাতৃদায় থেকে উদ্ধার পায়।

ঘেয়া চার প্রকার—

ঘেয়া— এইপ্রকারে অবিরাম আঠারো ঘণ্টা ত্রিপিটক পড়তে হয়। তবে অবিরাম পড়া সম্ভব নয় বলে দুই দিন এক রাত সময় লাগে।

খইপা— এই ক্ষেত্রে ত্রিপিটক বারো ঘণ্টা পর্যন্ত পাঠ করতে হয়।

ডিঙপা থো— এক্ষেত্রে তিন ঘণ্টা পর্যন্ত ত্রিপিটক পাঠ করতে হয়। সেজন্য এই প্রক্রিয়া একদিনে করা হয়।

সো ঘেয়া— যে সকল পিতা-মাতা নিঃসন্তান তাঁরা নিজেদের মৃত্যুর পূর্বেই ঘেয়া করেন তাকে সো-ঘেয়া বলে।

এই অনুষ্ঠান বৌদ্ধ মন্দিরেও করা যেতে পারে আবার বাড়িতে প্যান্ডেল খাটিয়েও করা যেতে পারে। জাঁক-জমক পূর্ণ ঘেয়া করলে ধার্মিক অনুষ্ঠান পরিচালনা করার জন্য ১১ জনের একটি সংগঠন তৈরি করা হয়।

প্রথম জন — লামা পুরোহিত

দ্বিতীয় জন — উমজে অর্থাৎ বাদ্যযন্ত্র বাদক।

তৃতীয় জন — গাম্বা বুড়ো অর্থাৎ এমন একজন অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন বয়স্ক ব্যক্তি যিনি সব কাজ পরিচালনা করবেন।

চতুর্থ জন — তাম্বা—পূর্বপুরুষের কথা জানেন সেই ব্যক্তি।

পঞ্চম জন — কোঙগোর—পূজার্চনার জিনিসপত্র ঠিকঠাক করবেন।

ষষ্ঠ জন — লহঈবা অর্থাৎ খাবার দাবারের ব্যবস্থা করবেন।

সপ্তম জন — কুটৌকে অর্থাৎ সমস্ত কাজ পরিচালনা করবেন।

অষ্টম জন — ছ্যঙবা অর্থাৎ মদ্যপানের ব্যবস্থা করবেন।

নবম জন — জ্বালানি, জল এবং পাতার ব্যবস্থা করবেন।

দশম জন — সুরক্ষা কর্মী

একাদশ জন — বোম্বো অর্থাৎ জনস্বাস্থ্যের দিকটি পরিচালনা করবেন।

তামাংদের ধর্মীয় দিক থেকে ঐতিহাসিক পটভূমিকায় পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে এরা তিব্বতে প্রচলিত তান্ত্রিক বজ্রযানী সম্প্রদায়ের এক শাখা নিংমাপা পন্থ। ভারতীয় তান্ত্রিক বজ্রগুরু পদ্ম সম্ভব রিম্পোছে দ্বারা স্থাপিত তিব্বতের সর্বপ্রথম ধার্মিক সম্প্রদায় মানা হয়। তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের আগে বোপ ধর্ম প্রচলিত ছিল। এই ধর্মে তান্ত্রিক ওঝা প্রভৃতির প্রভাব ছিল বেশি।

এদের পরিচালনায় এবং অন্যান্য ব্যক্তি সহযোগিতায় ঘেয়া সম্পন্ন হয়।

ঘেয়া অনুষ্ঠানের আচার অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন প্রধান লামা। যে বাড়িতে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হবে সেই বাড়ির কোনও ব্যক্তি আগে প্রধান লামার বাড়িতে গিয়ে আরও অন্যান্য লামা পুরোহিতদের নিয়ে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানাবে। তারপর নির্দিষ্ট দিনে প্রধান লামা পুরোহিত অন্যান্য লামা পুরোহিতদের নিয়ে আসবেন। প্রধান লামা প্রথমে ঘেয়ার মন্ডপ থাঙখা দিয়ে সাজাবেন। (থাঙখা হল কাপড়ের উপর ভগবান বুদ্ধের বিভিন্ন প্রকারের চিত্র)। তারপর আতপচালের নরম ভাত ঘি দিয়ে মেখে লেই আকারের তৈরি করবেন তাকে তোর্মা বলে। ওই লেই দিয়ে বিভিন্ন ফুল তৈরি করে তোর্মাকে সাজাবেন। প্রয়োজনে ওই লেই-এ রঙ প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। তারপর ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী ঘেয়ার কার্য শুরু হবে। তারপর যে উনপঞ্চাশ দিন ছেলেরা পালন করেন সেই কয়দিন এলাকায় তামাং সম্প্রদায় সাধারণত প্রতিদিন সন্ধেবেলায় ওই বাড়িতে উপস্থিত হয়ে মৃত ব্যক্তির নামে প্রার্থনা করবেন। এই সমবেত লোকদের বলে মানেপা টৌলী। তবে সামাজিক বিবর্তনের সাথে সাথে মদ্যপান ক্রমশ বন্ধ হয়ে আসছে এবং পরিবারের আর্থিক অবস্থার উপর নির্ভর করে আচার অনুষ্ঠান সংক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্ছে। তবে এই অনুষ্ঠানে মৃত্যুর দিন থেকেই বাড়ির জামাইয়ের বিশেষ ভূমিকা থাকে। জামাই ব্যতিরেকে এই অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয় না। এইভাবে ধার্মিক এবং সামাজিক নিয়মকানুন মেনে ঘেয়া অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়ে থাকে।



তামাংদেশ বাক্‌পা নৃত্য।

লেখক ❑ বিশিষ্ট তামাং বুদ্ধিজীবী ও লোকশিল্পী

অনুবাদক : কমলেন্দু চন্দ



দ্বারেন্দ্র ঈশ্বরারী

মেচ জীবন ও সংস্কৃতি

উত্তর ও উত্তর-পূর্ব ভারতের পাহাড়-পর্বত, বন উপবন, অসংখ্য ছোট-বড় নদ-নদী, খাল-বিল বিধৌত পবিত্র ও শস্য-শ্যামলা বিশাল ভূ-ভাগের শান্ত ও স্নিগ্ধ এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অতীব মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে মেচ বা বডোদের বসবাস। অনাদি অতীতকাল থেকেই প্রাকৃতিক পরিবেশের নানা জাতি ও নানা ধর্ম, নানা বেশভূষা ও আচার-অনুষ্ঠান, নানা ভাষা ও সংস্কৃতির মেলবন্ধনে—এমনকি নানা জাতীয় হিংস্র প্রাণীকুলের সঙ্গেও একই সহাবস্থানে সুখে-দুখে, কোমলে-কঠোরে জীবনযাপন করে আসতে হয়েছে এই মেচ বা বডো সম্প্রদায়ের মানুষকে।

শুধু কি তাই ? না, প্রকৃতি-পরিবেশের নানা প্রাকৃতিক শক্তি যেমন—ভূ-কম্প ও আগ্নেয়গিরি, ঝড়বৃষ্টি ও বজ্রপাত, বন্যা ও খরা, নানা রোগ ও মহামারী ইত্যাদি নানা কুজ্ঝটিকা তথা হিংস্র বন্যপ্রাণীদের সঙ্গেও নিত্য লড়াই করে বাঁচতে ও বংশ রক্ষা করে আসতে হয়েছে আদিমানবের বংশধর এই মেচ বা বডো সম্প্রদায়ের মানুষকে। সেজন্য তাদের জাতীয় জীবন চরিত্রে যেমন আমোদপ্রিয় সৎ-সরল ধর্মাশ্রয়ী ও সকল সম্প্রদায়ের মানুষকে আপন করে নেওয়ার উদার ও মহৎ আদর্শ দেখা যায় তেমনই তাদের এই ধর্মাশ্রয়ী ও সৎ-সরল মহান আদর্শে কেউ বিশ্বাসঘাতকতা বা ব্যাঘাত ঘটালে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে যথাযোগ্য জবাব দেওয়াও তাদের ত্যাগী, সাহসী, যোদ্ধা ও শৌর্য-বীর্যেরই পরিচয়।

প্রাচীন ইতিহাস, গবেষক ও প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে মেচ বা বডোগণ 'ইন্দো-মঙ্গোলীয় বড়' জাতির বংশধর। এই 'বড়' জাতির নামানুসারেই বর্তমান 'বড় > বড্ড > বডো > বড়ো' জাতির উৎপত্তি। তাছাড়াও ভারতের নানা প্রদেশে ছড়িয়ে থাকা বডোগণ নানা স্থান ও ভৌগোলিক পরিবেশগত কারণে নানা উপনামেও পরিচিত। যেমন—উত্তরবঙ্গ তথা নেপাল ও কাশ্মীর উপত্যকাবাসী বডোগণ মেচী নদীর নামানুসারে 'মেচ বা মেচে', সঙ্কোশ নদী থেকে পূর্বে ব্রহ্মপুত্র বা বরাক উপত্যকাবাসীগণ 'বড়ো', কাছাড় পর্বতবাসীগণ 'বডো-কছারী', ডিমাপুর-বাসীগণ 'ডিমাসাবডো', ত্রিপুরাবাসীগণ

'ত্রিপুরী বা কোক্ বড়ো', মণিপুরবাসীগণ 'মণিপুরীবড়ো' ইত্যাদি।

এই মঙ্গোলীয় বড়োগণ কবে ভারতে এসেছিলেন তা ইতিহাসে সঠিকভাবে উল্লেখ করা সম্ভব হয়নি। কারণ ইতিহাস রচনার বহুযুগ আগেই বড়োগণ ভারতে এসেছিলেন। মধ্য এশিয়ার মঙ্গোল-চীন দেশে যখন লোকসংখ্যা বেড়ে গিয়ে খাদ্য, বাসস্থান ও শান্তি তথা নিরাপত্তার অভাব হয় তখন এই মঙ্গোলীয় আদি 'বড়্' জাতির মানুষ তৃণলতা আচ্ছাদিত ভূ-ভাগ, পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য (ফল-মূল ও বন্য-পশু) এবং অপেক্ষাকৃত শান্তি, নিরাপদে ও সুন্দর বাসস্থানের সন্ধানে উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব-পশ্চিমে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েন। সেই মঙ্গোলীয় 'বড়্' জাতিরই বিভিন্ন শাখা বিভিন্ন সময়ে হিমালয়ের উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম গিরিপথ উজিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন। অনেকেই হিমালয়ের ঢালু ও চাষ-বাসযোগ্য ভূ-খণ্ডেই বসবাস করেন।

এইভাবেই মঙ্গোলীয় বড়োগণ উত্তর ও উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মনোরম ও শস্য-শ্যামলা বিশাল ভূ-ভাগে বসতি স্থাপন, নগর-বন্দর এমনকি সাম্রাজ্য স্থাপন করে বহুকাল যাবৎ মঙ্গোলীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়েছিলেন।

অসমবাসী বকুল বসুমাতারীর 'বড়ো-জারীমিন ১ম ভাগ' থেকে জানা যায় যে উত্তর-পূর্ব গিরিপথ দিয়ে আগত বড়োগণ উত্তর-পূর্ব ভারতে এবং উত্তর-পশ্চিম গিরিপথ দিয়ে আগত বড়োগণ উত্তর ভারতে বসবাস ও সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন।

এই মেচগণ সৎ-সরল ও কঠিন পরিশ্রমী। পুরুষের সঙ্গে রমণীগণও উৎপাদনের কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। শুধু তাই নয়, মেচ রমণীগণ এণ্ডি চাষ ও তাঁতশিল্পেও পারদর্শী। একপ্রকার এণ্ডিপোকার গুটি থেকে সুতা তৈরি ও নানাধরনের নক্সাখচিত সুন্দর সুন্দর এণ্ডি-চাদর এবং বাজার থেকে কেনা সুতা দিয়ে নিজেদের প্রয়োজনীয় বস্ত্রাদি যেমন—দোখ্না, চাদর, ফাত্রা, লিংটি; মাফলার ইত্যাদি তৈরি করতে পারদর্শী।



মেচ সম্প্রদায়ের বাগুরুম্বা নৃত্য

যে সকল মঙ্গোলীয় রাজা মহারাজাগণ রাজত্ব করে গেছেন, তাঁদের মধ্যে কয়েকজন রাজার নাম প্রমাণস্বরূপ তুলে ধরছি। যেমন—ডিমাপুর রাজ্যের রাজা মাইবং বা মহিরঙ্গ, প্রাগজ্যোতিষপুর বা কামরূপ-কামাখ্যার রাজা নরক বা নরকাসুর, শোণিতপুরের বাণ রাজা বা বাণেশ্বর, কামরূপ-কামতাপুরের রাজা খাণ্ডা বা কান্তনাথ (ইনি রাজা হয়ে নীলধ্বজ নাম নিয়েছিলেন), কোচবিহারের রাজা কুচুহাং (ইনি সিন্ধুপ্রদেশ থেকে এসে কোচবিহারে পুনঃ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন—ইমানসিংহ চেমজং-কিরাইত ইতিহাস), নরনারায়ণ, জলপাইগুড়ির পৃথ্বীরাজ চৌহান, চিক্নারাজ হাওরীয়া মেচ (হারীয়ার মণ্ডল), জম্মু-কাশ্মীর রাজা হরিসিং মেচ, কামরূপের সমুদ্রবর্মা, বলবর্মা, ভাস্করবর্মা, ব্রহ্মপাল, ধর্মপাল, দরংরাজ আরিমও, রত্নসিংহ ইত্যাদি। তাছাড়াও হর্ষবর্ধন, বীরদৈমালু, বীরচিলারায়, জাওলিয়া-দেওয়ান, রাজা ইরাগ্দাও, রাজশ্রী ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু এই প্রবল প্রভাবী মঙ্গোলীয় সাম্রাজ্য কোনও কারণে ধ্বংস হয়ে যায়। আজ প্রকৃতির পরিহাসে তারাই তফসিলি উপজাতি (Schedul Tribe) বলে পরিচিত। শুধু তাই নয়, এই মঙ্গোলীয় বড়ো সাম্রাজ্য ধ্বংস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই সম্প্রদায়ের মানুষ আজ ভারতের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছে।

মেচদের জীবিকা

মেচ বা বড়োদের জীবিকা বলতে একমাত্র কৃষি কাজকেই বোঝায়। আজও পর্যন্ত পুরোনো পদ্ধতিতে বলদ ও লাঙল দিয়েই তাদের কৃষিকাজ চলছে। তবে বর্তমানে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনানুযায়ী আধুনিক প্রথায় আউশ, আমন ও বোরো ধানের চাষ যেমন হচ্ছে তেমনই নানা জাতীয় রবি শস্যের উৎপাদনেও সচেষ্ট হয়েছে।

এই মেচগণ সৎ-সরল ও কঠিন পরিশ্রমী। পুরুষের সঙ্গে রমণীগণও উৎপাদনের কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। শুধু তাই নয়, মেচ রমণীগণ এণ্ডি চাষ ও তাঁতশিল্পেও পারদর্শী। একপ্রকার এণ্ডিপোকার গুটি থেকে সুতা তৈরি ও নানাধরনের নক্সাখচিত সুন্দর সুন্দর এণ্ডি-চাদর এবং বাজার থেকে কেনা সুতা দিয়ে নিজেদের প্রয়োজনীয় বস্ত্রাদি যেমন—দোখ্না, চাদর, ফাত্রা, লিংটি, মাফলার ইত্যাদি তৈরি করতে পারদর্শী।

অদূর ভবিষ্যতে বড়োদের এই তাঁতশিল্পকে ফ্যাক্টরির মর্যাদা দিতে পারলে মেচদের বেকার সমস্যা সমাধান ও অর্থনীতিতে যথেষ্ট সহায়ক হবে বলে আমার বিশ্বাস।

ধর্ম ও সমাজ

আগেই বলেছি যে, মেচ বা বড়োদের প্রাকৃতিক পরিবেশের নানা প্রাণীকুলের সঙ্গে ও প্রকৃতির নানা শক্তির সঙ্গেও লড়াই করে বাঁচতে ও বংশ রক্ষা করতে হয়েছে। ফলে প্রাকৃতিক কারণেই মেচদের সৎ-সরল, ধর্মাশ্রয়ী ও সমাজবদ্ধ তথা সমাজের নিয়ম-শৃঙ্খলাপরায়ণ হতে হয়েছে।

মেচদের নিজস্ব ধর্ম ও সমাজের রীতি-নীতি আছে। মেচদের আদিমকাল থেকে বংশ পরম্পরায় চলে আসা ধর্ম হল 'বাথৌ'। বাড়ির উঠানের উত্তর-পূর্বকোণে সাধারণভাবে মাটির বেদি নির্মাণ করে ও বাঁশের ছোট ছোট খুঁটি দিয়ে ঘিরে বেদীতে পঞ্চ আড়াবিশিষ্ট শিজুগাছ পুঁতে ও উত্তরের রান্নাঘরের উত্তর-পূর্ব কোণে মাটির সাধারণ বেদি করে মা মাইনাও বুড়ির পূজা করা হয়।

মেচদের ধর্মীয় নীতি পঞ্চশীল নীতি। অর্থা, বাথৌ, মাইনাও, সারির দেব-দেবী, ডেরায় মহেশ ঠাকুর, বিষহরি, কালী ইত্যাদি ও বাইরে পবিত্র স্থানে গ্রামের দেব-দেবীর পূজা করা হয়। মেচদের পূজা ১ বৈশাখ নববর্ষে, একই সঙ্গে সব দেব-দেবীর পূজা করা হয়।

সৃষ্টির আদিমকালে সাত্বিক-পূজা হলেও খুব সম্ভব দ্বাপর যুগ থেকে বলি প্রথায় পূজা করার রীতি চালু হয়েছিল বলে অনেকের ধারণা। বর্তমানেও বলি প্রথায় পূজা করলেও সচেতন লোকেরা ফুল-প্রসাদ দিয়ে সাত্বিক পূজা করছেন দেখা যায়।

বাথৌ ধর্মই মেচদের আদি ধর্ম হলেও বর্তমানে ব্রাহ্মধর্ম, খ্রিস্টধর্ম, নানাধরনের বৈদিক ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়ে মেচদের একতাসমাজ সংস্কৃতি ও সভ্যতা দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়েছে ও হচ্ছে।

মেচদের সামাজিক রীতি-নীতি তেমন কঠিন ধরনের ছিল না, আজও নেই। তবে শুচি-অশুচির দিকটি ছিল কঠোর অর্থাৎ ব্যভিচার থেকে শুরু করে কোনও অন্যায় কাজ করে থাকলে তা প্রায়শ্চিত্ত করতে হত এবং আজও তাই। এই কারণে মেচগণ নিজেদের জন্মশুদ্ধ জাত বলে মনে করেন।

মেচদের মধ্যে বিভিন্ন উপাধি থাকলেও শ্রেণী বা বর্ণ বিভেদ নেই। যে কেউ মন্ত্র শিখে রোজা বা পুরোহিতের কাজ করতে বা ধর্মচর্চা করতে পারেন।

মেচদের ধর্মীয় উৎসবের মধ্যে কেরাই পূজার উৎসবই শ্রেষ্ঠ। এই কেরাই পূজা তিন রকমের হয়ে থাকে। যেমন—(১) আই-কেরাই, (২) মাড়াই-কেরাই ও (৩) গার্জা-কেরাই। এই তিন রকমের কেরাই পূজার মধ্যে গার্জা-কেরাই শ্রেষ্ঠ। কারণ এই পূজা কয়েকটি গ্রাম মিলে সর্বজনীনভাবে করা হয়।

বর্তমানে অসমবাসী ছাড়া কোথাও কোনও প্রকার কেরাই পূজা হয় না। ধর্মান্তরকরণই এর মূল কারণ হতে পারে।

নাচ-গান ও আমোদ-উৎসব

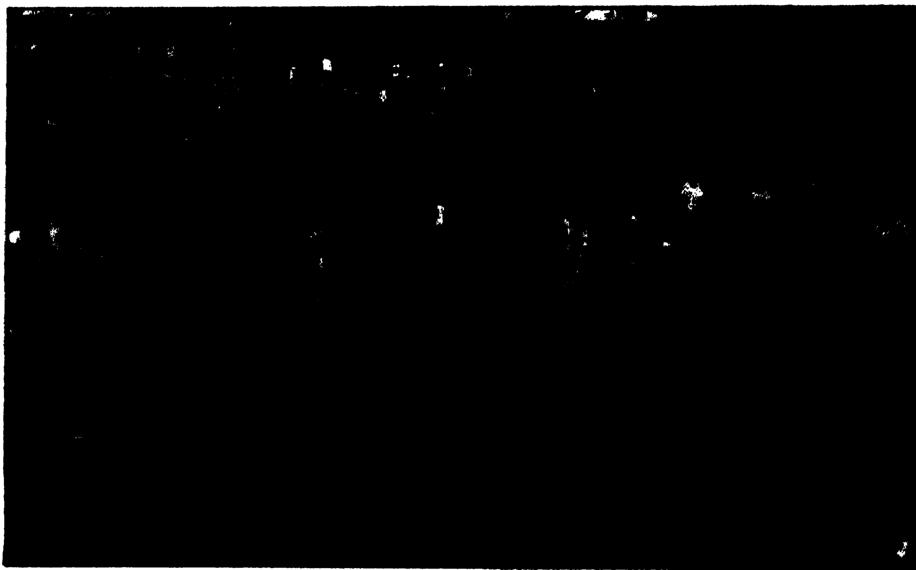
মেচগণ গ্রামবাসী ; সৎ-সরল, ধর্মাশ্রয়ী ও আমোদপ্রিয়। পূজা-উৎসব ছাড়াও বিবাহ-উৎসবাদিতেও মেচগণ নানাধরনের নাচ-গান ও আমোদ-উৎসব করে থাকেন। ১ বৈশাখ শুভ নববর্ষ হল মেচদের শ্রেষ্ঠ উৎসবের দিন। কারণ সেদিন মানব সমাজে প্রথম বাথৌ ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সমাজের নিয়ম-শৃঙ্খলায় আবদ্ধ করে মানবজাতিকে সভ্য ও শ্রেষ্ঠ জীবের মর্যাদায় ভূষিত করা হয়—এই দিনটিকেই বড়োরা শুভ নববর্ষ বলে গণ্য করেন।

মৎস্য ও পশুশিকার

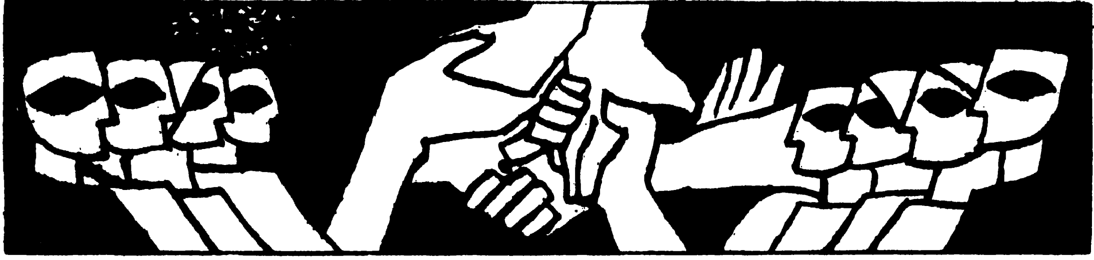
অতীতে মেচগণ মাছ ও মাংস বাজার থেকে ক্রয় করতেন না। কারণ তাঁরা নিজেরাই নানাধরনের অস্ত্র বা যন্ত্র দিয়ে মাছ ও পশু শিকার করতেন।

বর্তমানে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় বন-জঙ্গল ধ্বংস হয়েছে এবং নদী-নালা খাল-বিলও মৎস্যহীন হয়ে গেছে। ফলে মেচদের শিকার বৃত্তিও অনেকটাই লুপ্ত হয়েছে বলা যায়।

লেখক ❑ বর্ষীয়ান মেচ বুদ্ধিজীবী, কবি ও লোকশিল্পী।



জলপাইগুড়ির বর্ণময় লোকসংস্কৃতি বাগুরুম্বা লোকনৃত্য



ধনীরাম টোটো

টোটোদের সমাজ ও সংস্কৃতি

ভৌগোলিক অবস্থান

জলপাইগুড়ি জেলার মাদারীহাট থেকে ২৩ কিলোমিটার দূরত্বে টোটোপাড়া। টোটোপাড়ার ভৌগোলিক বৈচিত্র্যে ভরা। পূর্বে তোর্ষা নদী ও দক্ষিণে জলদাপাড়া একাংশ বন। পশ্চিমে পুদুয়া পাহাড় ও উত্তরে হিপসা পাহাড়। এই দুইটি পাহাড় টোটোর কাছে নমস্য 'পাহাড় দেবতা'। গ্রামে সারি সারি ঘেরা আম, কাঁঠাল, সুপারি গাছ।

টোটো জনজাতিরা কোথা থেকে এসেছে—এই বিষয় নিয়ে অনেক মতভেদ আছে। টোটো জনজাতিরা কেবল নিজের ইতিহাস শ্রুতির মাধ্যমে শুনে এসেছে। কোনও লিপি না থাকায় লিখিত ইতিহাস নেই। ইদানীং বাংলাভাষায় গান-কবিতা, গল্প-সাহিত্য প্রকাশ হয়েছে। টোটো জনজাতির মৌখিক ইতিহাসে কথিত আছে কোচ রাজত্বে থাকার সময়ে শিকার করতে গিয়ে একটি শিকার সংক্রান্ত অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল। এই ঘটনা রাজা দূত মারফত শুনতে পান। রাজ আদেশে কোচ সীমানা থেকে টোটো জনজাতিকে বিতাড়িত করে। টোটো জনজাতিরা দুর্গম বনগিরি নদীনালা পেরিয়ে অবশেষে ভুটান পাহাড়ের পাদদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে। সেখানে পাশের পাহাড়ে ভুটানের এক জনগোষ্ঠী বাস করত। তারা 'ভয়া' জাতি নামে পরিচিত, উভয়ের মধ্যে জমি সংক্রান্ত বিবাদ ঘটে, ফলে সাতী নদীর ধারে যুদ্ধ হয়, সাতী নদী রক্তে লাল হয়ে যায়। যার ফলে এই নদীর জল অপবিত্র হয়ে যাওয়াতে টোটো জনগণ পান করত না। আর যুদ্ধের শেষে যারা বেঁচেছিল তাঁরা সেখান থেকে দক্ষিণে কয়েকটি পাহাড়ের টিলা পার হয়ে এই টোটোপাড়াকে টোটো জনজাতিরা মাতৃভূমিরূপে বরণ করে। টোটো জাতি বসবাসের ফলে টোটোপাড়া সবার কাছে পরিচিত।

সমাজ ব্যবস্থা

টোটোসমাজ পরিচালনা করার জন্য পাঁচটি পদের নাম উল্লেখিত আছে। এইগুলির নাম—(১) কাইজি (পুরোহিত),



টোটো পরিবার

(২) গাপ্প (মোড়ল), (৩) পঞ্চায়েত, (৪) পাও (ওঝা), (৫) নানপম (লোকজন জড়ো করার লোক)। বর্তমানে চারটি পদ টোটো সমাজে প্রচলন আছে। নির্বাচন পদ্ধতি পঞ্চায়েত নির্বাচন হওয়াতে টোটোসমাজে পঞ্চায়েত পদ লুপ্ত হয়েছে। এই সব পদের ভূমিকা নিম্নে দেওয়া হল—

কাইজি—সমাজের কোন কোন মাসে টোটো উৎসব হবে তার দিন ক্ষণ ধার্য করেন। এছাড়া বিয়ের মন্ত্র ওরাংবে গোষ্ঠীর পূজা ও পরিচালনা এবং কেউ সামাজিক বিচার চাইলে বিচারের ব্যবস্থা করেন।

গাপ্প—ভূমি বণ্টন বিবাদ ব্যাপারে কেউ বিচারপ্রার্থী কাইজির বাড়িতে আপীল করলে বিচারপদ আসন গ্রহণ করা ও ওয়াংটেনবে গোষ্ঠী পূজায় পরিচালনা করেন।

পঞ্চায়েত—কাইজি ও মোড়লের সহকারীরূপে সহযোগিতায় ভূমিকা পালন করেন।

পাও—টোটো সমাজের কোনও নবজাতক জন্মগ্রহণ করলে বিজোড় দিনে গিয়ে নবজাতকের নাম ও মঙ্গলসূতা মন্ত্র উচ্চারণ করে গলায় পরিয়ে দেন। সকল উৎসবে পাওয়ের ভূমিকা থাকবে। এছাড়া কারও অসুখ হলে, মন্ত্রপাঠ কবিরাজি ঔষধপত্র তৈরি করে দেবেন।

নানপম—কোনও উৎসব অনুষ্ঠানের জন্য লোকজন জড়ো করার জন্য নানপম দরকার। তিনি পাড়ায় পাড়ায় চিৎকার করে জানিয়ে দেন।

টোটোসমাজে তেরোটি গোত্র আছে। তার মধ্যে একটি বৃহৎ গোত্রে আবার পাঁচটি উপগোত্র আছে। যথা : (১) দান্ত্রবে, (২) দাং কবে, (৩) বঙ্গোবে, (৪) ধিরিৎচাক্‌বে, (৫) নরিংচাংকবে, (৬) বুদ্ধবে, (৭) বৌদুবে (৮) নুবেবে, (৯) সাং কবে, (১০) মাংত্রবে, (১১) মাংচিনবে (১২) পিশাচাংকবে (১৩) লেংকাইচিংবে।

এছাড়া কয়েকটি ছোট ছোট গোষ্ঠী বৃহৎ গোষ্ঠীর মৈত্রী করে নিজের গোত্র লুপ্ত করে। যেমন—বাদারপা গোত্র দান্ত্রবে গোত্রের সঙ্গে মিশে দান্ত্রবে গোত্রের ব্যবহার করে। আবার ছটি গোত্রের মাত্র একটি করে পরিবার আছে। যেমন—পিশাচাংকবে গোত্রে কেবল দুইভাই আছে। আর মানচিংবে গোত্রের একজন আছে। টোটো সমাজ পিতৃতান্ত্রিক, তবে পরিবারের কর্তা মারা গেলে জ্যেষ্ঠ পুত্র নাবালক থাকলে সেক্ষেত্রে মা অভিভাবকরূপে পরিবার পরিচালনার ভার নেয়, যতদিন পুত্র সাবালক না হচ্ছে, পরিবারের সম্পত্তি কেবলমাত্র ছেলেদের মধ্যে ভাগবণ্টন চলে, মেয়ের বিয়ের সময় বাবা-মা স্বেচ্ছায় কিছু সম্পত্তি দান করতে পারে।

টোটোসমাজে নিজ গোত্রের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। মামা ও তার পিসতুতো ছেলেমেয়ের সঙ্গে বিবাহ সীমাবদ্ধ। এছাড়া বহির্ভূত সমাজের সাথে তাদের বিবাহ নিষিদ্ধ। শৈশব থেকে অভিভাবকরা বিয়ে ঠিক করে রাখে। বর্তমানে এই প্রথা লুপ্ত হয়েছে। ছেলের মনঃপূত পাত্রী হলে বাবা-মা বিয়ের আয়োজন করে। টোটো সমাজে দুই প্রকার বিয়ের প্রচলন আছে—(১) টাবোরিহী (২) তাইপাওয়া।

টাবোরিহী—বিবাহটি সরাসরি বরযাত্রী নিয়ে মেয়ের বাড়িতে গিয়ে কন্যাকে বধূরূপে বরণ করে সেইদিনেই ছেলের বাড়িতে নিয়ে আসে। বিয়ের সকল আয়োজন ছেলের বাড়িতে হয়।

তাইপাওয়া—প্রেমঘটিত ছেলেমেয়ে হলে দু-একদিনের জন্য পাড়া ত্যাগ করে পালিয়ে যায়। গ্রামে ফিরে এল বরের বাড়ি থেকে দুই কলসি হাঁড়িয়া ও একটি শাড়ি মেয়ের বাড়িতে যাবে। সেখানে মেয়ের বাবাকে জানিয়ে দেয় আপনার মেয়ে আমার ছেলের কাছে আছে। টোটোসমাজে সিঁদুর পরিয়ে দেবার প্রচলন নেই যা অন্যান্য সমাজে প্রচলিত আছে। এখানে পণপ্রথার প্রচলন নেই। বিয়ের খরচ বরপক্ষ বহন করে। দ্বিরাগমন হলে মেয়ের বাড়িতে ছোট্ট অনুষ্ঠান হবে এবং খরচ করবেন মেয়ের বাবা। সেইদিন ইচ্ছা করলে মেয়ের বাবা সম্পত্তি দান করতে পারেন। বরের এই বিষয়ে দাবি করার অধিকার নেই।

বিবাহবিচ্ছেদ : টোটো সমাজে বিবাহবিচ্ছেদ নেই বললেই চলে। তবে কেউ চাইলে তার ব্যবস্থা আছে। প্রধান পুরোহিত কাইজির নিকট দুই কলসি হাঁড়িয়া নিয়ে বিচার আবেদন করতে হবে। তিনি দিনক্ষণ ঠিক করে লোকজন সমেত উভয়পক্ষের বক্তব্য শুনবেন। প্রথমত মীমাংসার পথে চাপ দেবেন। কিন্তু তারপরেও উভয়ে চাইলে তার ব্যবস্থা করে দেবেন। তিনি উভয়কে একটি টাকা ও একটি পানসুপারি বিনিময় করতে বলেন তারপর মন্ত্র উচ্চারণ করে বিচ্ছেদ জানিয়ে দেন নাবালক সন্তান সাবালক না হওয়া পর্যন্ত মায়ের কাছে থাকবে। সম্পত্তি উভয়ে নিতে পারবে। (তবে স্থাবর সম্পত্তি)।

মৃত্যু

টোটোসমাজ ডাইনি প্রথা বিশ্বাস করে না। মানুষের মন্ত্র দ্বারা মানুষের মৃত্যু হতে পারে না, জন্ম হলে মৃত্যু হবে। মুক্তির জন্য মন্দির-মসজিদ-গির্জাতে যাবার প্রয়োজন নেই। কেবল বেঁচে থাকার জন্য প্রকৃতির পূজা করবে। কারণ পাহাড় নদী গাছপালা টোটোদের

জীবনে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। পুরুষের মৃত্যুতে ছয়দিন এবং মহিলার ক্ষেত্রে পাঁচদিন অশৌচ পালন করতে হবে। মৃতকে কবর দিতে হবে, স্বামী/স্ত্রী-র মৃত্যু হলে উভয়কে একবছর অশৌচ পালন করতে হবে, কবর দেওয়ার পর মহিলা হাতের কুড়ি এবং পুরুষের ঘড়ি খুলে রাখবে।

অশৌচ নিয়মগুলি স্বামী-স্ত্রীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

- হাতে বাঁশের লাঠি নিয়ে একবছর চলাফেরা করতে হবে।
- মাথায় তেল দেবে কিন্তু চিরুনি ব্যবহার করা চলবে না। পুরুষেরা চুল কাটতে পারবে না।
- কোনও গাছের গুঁড়ি বা দড়ি ডিঙানো চলবে না।
- মাথায় ছাতা দেওয়া যাবে না।
- গাছে চড়া নিষিদ্ধ।
- উৎসব-অনুষ্ঠান থেকে বিরত থাকবে, তবে সহানুভূতি দেখিয়ে অনুষ্ঠানের খাবার পৌঁছে দেওয়া যায়।

একবছর পূর্ণ সময় হলে সমাজের লোকজন এসে হাতের লাঠি মৃতের নামে কোনও নালায় বা ঝোরায় ফেলে দিয়ে আসে। পুরুষ হলে মাথার চুল তারা কেটে দেয়। স্ত্রী হলে মহিলারা আবার গয়নাগুলি হাতে, গলায় পরিয়ে দিয়ে যায়। এরপর কেউ যদি বিবাহে আবদ্ধ হতে চায় তার জন্য সমাজে বিধবাবিবাহ প্রচলন আছে।

সংস্কার

অন্যান্য জনজাতির মতো টোটো সমাজে শিকার, আনন্দ বিরহ—গোচারণ—বাণিজ্য যাওয়া উপলক্ষ করে অনেক নাচ-গান আছে। টোটো সমাজের ধর্মেই হল প্রকৃতির প্রতি আনুগত্য স্বীকার করা। তাই তাকে তুক করতে বর্ষা, শীত ও বসন্তে উৎসব টোটো সমাজ পালন করে। এই উৎসবে তারা দলে দলে নাচ-গান করে। টোটোদের প্রধান উৎসব তিনটি ১। অঞ্চু ২। ভয়ু ৩। সরদে। এছাড়া অঞ্চুপূজার পূর্বে গরইওয়া—মানকা পূজা দিয়ে বর্ষার উৎসব অঞ্চু পূজা আরম্ভ হয়। শীতে ভয়ুপূজা ও গওয়াটি পূজা। বসন্তে সরদে পূজা। অঞ্চু উৎসবে

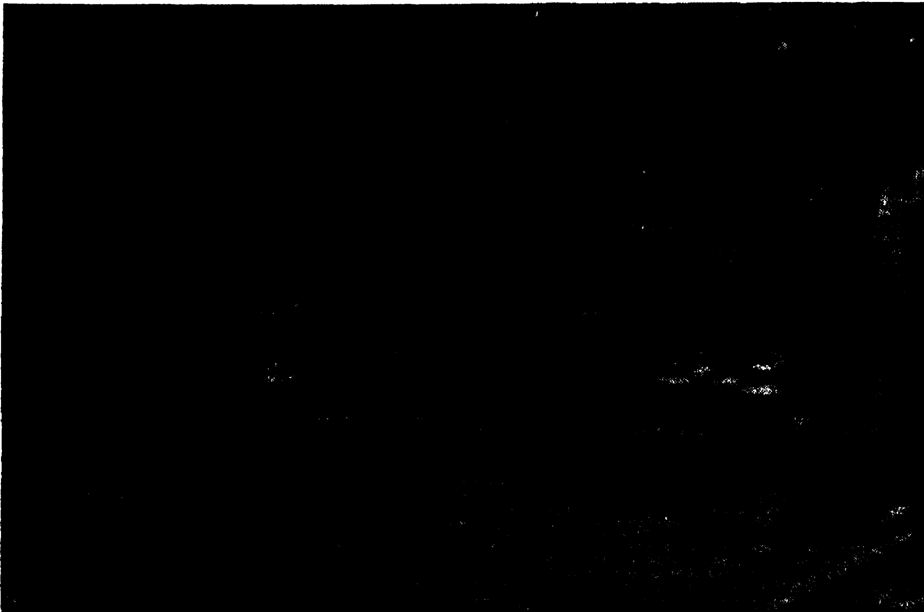
টোটোসমাজ ডাইনি প্রথা বিশ্বাস করে না। মানুষের মন্ত্র দ্বারা মানুষের মৃত্যু হতে পারে না, জন্ম হলে মৃত্যু হবে। মুক্তির জন্য মন্দির-মসজিদ-গির্জাতে যাবার প্রয়োজন নেই। কেবল বেঁচে থাকার জন্য প্রকৃতির পূজা করবে। কারণ পাহাড় নদী গাছপালা টোটোদের জীবনে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে।

সবাই নতুন জামা পরে ধেমসায় (টোটোদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কেন্দ্র) যাবে। আঠারো বছর পূর্ণ সদস্যরা প্রত্যেকেই একটি কলসিতে হাঁড়িয়া নিয়ে উপস্থিত হতে হবে। মেয়েদের ক্ষেত্রে বাদ।

এই উৎসবে সর্বপ্রথমে ধীরে গান দিয়ে সাংজা দেবতার বন্দনা করা হবে। সাংজার প্রতি হাঁড়িয়া মদ মন্ত্র পাঠ করে তার প্রতি নিবেদন করা হয়। সাংজা দেবতা নিরাকার। প্রথমেই আলোচনায় আছে—যেহেতু টোটোরা প্রকৃতির উপাসক। তবে কিছু দেবতার নাম আছে প্রকৃতির তার রূপ নেই। তারপর একে একে সকল নাচ পরিবেশন করা হয়। নাচের মধ্যে পুরুষের নাচ বেশি মেয়েদের ক্ষেত্রে মাত্র একটি ধরনের নাচ আছে। তার নাম চি-চি পাওয়া। নাচের নাম—সাংজা—কামুতাওয়া—চাংরো—লেই কাইমু—টুনটুনগামু—তাসিতাওয়া ইত্যাদি। এই সকল গান টোটোভাষার সাধু কথায় প্রচলিত। নতুন প্রজন্মের কাছে সকল অর্থ তেমন বোধগম্য হয়ে উঠে না। ইদানীং কিছু উঠতি যুবক চলিত ভাষায় গান-নাচ রচনা করে এগিয়ে এসেছে। পুরনো ও নতুন গানের মাধ্যমে টোটো সমাজ বেঁচে থাকার এক নতুন লড়াই আশা রাখে এই শতাব্দীতে।

সংস্কার

২০০০ সালের আগস্ট মাসের আদম সুমারির জনগননায় টোটো জনজাতি পুরুষ—৬০৪ মহিলা—৫৪৯ মোট—১১৫৩ জন। শিক্ষা—পাঁচজন মাধ্যমিক পাশ করেছে। তার মধ্যে একজন স্নাতক/গ্র্যাজুয়েট—একজন নিরাময় যক্ষ্মারোগে মারা যান, যিনি সর্বপ্রথম মাধ্যমিক পাশ করেছিলেন তার নাম চিত্তরঞ্জন টোটো। মেয়েদের মধ্যে এ যাবৎ কেউ মাধ্যমিক পাশ করতে পারেনি। টোটো মেয়েরা শিক্ষায় বিশেষভাবে পিছিয়ে আছে।



টোটো পাড়ার টোটো

লেখক ❑ বিশিষ্ট টোটো বুদ্ধিজীবী, কবি ও গল্পকার।



কিতাপসিংহ রাই

জলপাইগুড়ি জেলার নেপালি সমাজ ও সংস্কৃতি

জলপাইগুড়ি জেলার জন্ম ১৮৬৯-এর ১ জানুয়ারি। ৮ ডিসেম্বর, ১৮৬৮-এর এক গেজেট নোটিফিকেশন অনুসারে পশ্চিম ডুয়ার্সের ভূভাগ এবং রংপুর জেলার জলপাইগুড়ি মহকুমাকে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়ে জলপাইগুড়ি জেলা গঠন হয়েছে। দুই মহকুমা সদর এবং ফালাকাটা জেলাকে বিভাজিত করে বক্সাদুয়ার মহকুমা কার্যালয়কে ফালাকাটায় স্থানান্তর করা হয় এবং সদর মহকুমা ময়নাগুড়ি থেকে জলপাইগুড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। তিস্তা নদী ও জলঢাকা নদীর পশ্চিম ডুয়ার্সের ভূভাগ সদর মহকুমায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৮৭০ সালে আবার ফালাকাটা মহকুমাকে আলিপুরদুয়ারে নিয়ে যাওয়া হয় এবং মহকুমা কার্যালয়ও সেখানেই স্থানান্তরিত করা হয়।

প্রাক্কথন

জলপাইগুড়ি জেলায় নেপালি সমাজের গঠন ও সাংস্কৃতিক সচেতনতার ধারা প্রবাহিত হবার পূর্বে পশ্চিম ডুয়ার্সে নেপালিদের জনবসতি সম্বন্ধে পূর্ণ অনুসন্ধান বাঞ্ছনীয়। কোনও নেপালি অনুসন্ধানকর্তা কিংবা পুরাতাত্ত্বিকের দৃষ্টি এতে যায়নি। যা হোক, জনশ্রুতি, বংশাবলি, সন্ধিপত্র, পুরাতাত্ত্বিক ভগ্নাবশেষ, অভিলেখ, ভূর্জপত্র এবং তাম্রপত্রের সহায়তায় ইতিহাস লিখনকার্য আজও রয়েছে। জলপাইগুড়ি জেলার ডুয়ার্স ভূভাগে নেপালিদের বসবাস সম্বন্ধে ঐতিহাসিক কিছু তথ্য প্রস্তুত করবার চেষ্টা করছি।

এক : ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, খ্রিস্টপূর্ব ১০০০ বছর পূর্বে জলপাইগুড়ি জেলার উত্তরাংশে মঙ্গোল জাতিগোষ্ঠীর কিরাত বংশীদের অবিচ্ছিন্ন বসবাস ছিল। প্রাগৈতিহাসিক যুগে এই ভূখণ্ড কিরাতভূমিরূপে পরিচিত ছিল। মঙ্গোল জাতিগোষ্ঠীর রাই, লিম্বু, মগর, গুরুং, তামাং, নেওয়ার, মুর্মীকে কিরাঁত বা কিরাঁতি বলা হত।

দুই : ভোটাঙ(ভুটান)-এর নবরূপদাতা সাবড্রুঙ ও ওয়াং নামগেল ১৬২৪ খ্রিস্টাব্দে গোর্খার প্রতাপী রাজা রামশাহের



নেপালী নৃত্য পরিবেষণ করছেন বীরপাড়া উচ্চবিদ্যালয়ের নেপালী ছাত্রীরা

সঙ্গে মৈত্রী সম্বন্ধ সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে গোর্খা পৌঁছান। রাজা রামশাহ নামগেলের ইচ্ছা অনুসারে ধর্মা দেওয়ার দেশকে রক্ষা করে ধনধান্যে পরিণত করার জন্য বিশুন মগরের নেতৃত্বে নিজের চল্লিশ পরিবার এবং গোর্খার আইন ও মানাপাথি (ধান ইত্যাদি মাপবার পাত্রবিশেষ) নামগেলকে হস্তান্তর করেন। ওই নেপালি পরিবারে মগরদের আধিক্য ছিল, কিন্তু কামী, দমাই সার্কী, গুরুং, তামাং, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণরাও ছিলেন। গোর্খা থেকে স্থানান্তরিত ওই নেপালি মানুষগুলিকে তিস্তা নদীর পূর্ব ও তোর্সা নদীর পশ্চিমের থাগা প্রান্তে (কালিম্পঙের দামসাং এলাকা) জনবসতি বসিয়ে, ট্যাক্স সংগ্রহ করে ভূমিকে কৃষিযোগ্য করে নিয়ে তিব্বত-কোচবিহারের রাস্তারও পর্যবেক্ষণ ধর্মদেবের দেশকে সুরক্ষিত রাখার দায়িত্ব দেওয়া হয়। কাঠমাণ্ডুর রাজা শিবসিংহ মল্ল থেকেও ঠিক এইভাবেই ভুটানে জোং ও গুম্ফা নির্মাণের জন্য কিছু কিছু কাঠমিস্ত্রি ও রাজমিস্ত্রি, ধাতু ও কাঠের প্রতিমা তৈরি করার জন্য কিছু কর্মীকে ভুটানে নিয়ে যাওয়া হয়।

তিন : আঠারো শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকেই (১৭০১ খ্রিঃ) নেপালের মোরঙ প্রদেশ থেকে জলপাইগুড়ির বৈকুণ্ঠপুর পরগনার ঘন জঙ্গল পরিষ্কার করে জনবসতি বসিয়ে কৃষিকার্য ও কাঠের কাজে নিয়োজিত নেপালিরা এসে নিজেদের নিয়োজিত রেখেছে বলে গেজেটিয়ারগুলিতে উল্লেখ পাওয়া যায়।

চার : শ্রী পাঁচমহারাজাধিরাজ (মহামহিম) পৃথিবীনারায়ণ শাহের (খ্রিঃ ১৭২২-১৭৭৫) নতুন নেপাল নির্মাণ অভিযানের প্রসঙ্গে মহারাজাধিরাজের স্বর্গবাস হওয়ার পরে শ্রী পাঁচমহারাজাধিরাজ শাহের সময়ে ১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে নিম্ন সিকিম বিজয় করে নিয়ে বিজিত নেপালিদের সেনা তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে পূর্বদিকে আক্রমণ করার পরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত করার দিকে মন দেন। একটি দল রম্ফু, অন্য দলটি গোর্খে থুম (বর্তমানের দার্জিলিং বাজার) এবং অপর একটি দল সালঘারি (সালবন) (বর্তমানের সিলগড়ি বা শিলিগুড়ি) হয়ে তিস্তা নদী পার করে এগিয়ে যায়। রম্ফু থেকে তিস্তা নদী পার করে যে দলটি যায় সেটি মনসুঙের দিকে এগোচ্ছিল, গোর্খে থুম থেকে তিস্তা নদী পার করে আর একটি দল কালিম্পঙের ইছে ও পৈইউর দিকে বিজয়পতাকা তুলে এগোচ্ছিল। ঠিক সেই সময় নেপালিরা 'জয়কালী', 'জয় গোরখনাথ', 'জয় মনকামনা'-এর নাম করে খড়্গ (তরবারিবিশেষ), খুকুরি (ভোজালি) এবং তরবারে সুসজ্জিত হয়ে প্রতিরোধ করেছিল। উভয় পক্ষে একই দেবদেবীর নাম উচ্চারিত হতে থাকে। এতে উভয় পক্ষে সন্দেহ দেখা দেয়। তখন উভয় পক্ষই হাতিয়ার চালানো বন্ধ করে এবং উভয় পক্ষকেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।

ভুটানের নেপালিরা গোর্খা থেকে সতেরো শতাব্দীতে এসে এই ভুটানে বসবাস করছে। এইভাবে ধর্ম দেবার দেশ ভুটান ও গোর্খার মৈত্রী সম্বন্ধের লালমোহর ও চিঠিপত্র দেখানোর পর তিনটি দল একই জায়গায় একত্রিত হয়ে তামসাঙগড়িতে নেপাল সরকারের আদেশের প্রতীক্ষায় থাকে। এই বিজয়ী নেপালি সেনা সালঘারির রাস্তা (বর্তমানের শিলিগুড়ি) হয়ে তিস্তা নদী পার করে বাখ্রাকোট দখল করে। এভাবে এখান থেকে তারা জলপাইগুড়ি পৌঁছে পূর্ব দিকের বিজয়ের আদেশের জন্য গড় (fort) বানিয়ে থাকে।

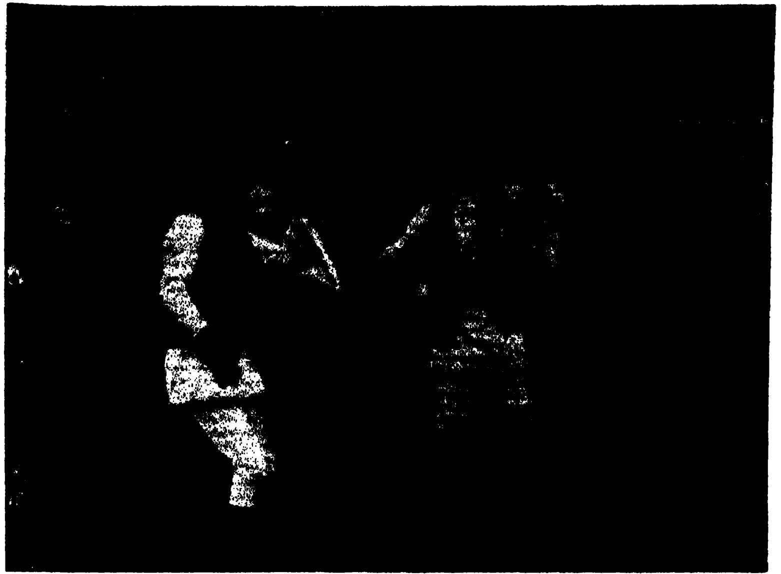
পাঁচ : ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে গঙ্গারাম থাপার নেতৃত্বে গোর্খা সেনা মহানদী (মহানন্দা নদী) পার করে বৈকুণ্ঠপুর হয়ে জলপাইগুড়ি পর্যন্ত এসে ফিরে গিয়েছিল। এই কথার উল্লেখ ইংরেজ ঐতিহাসিকদের রিপোর্টে পাওয়া যায়।

ছয় : ডব্লিউ হান্টারের উল্লেখ অনুসারে ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের প্রথম জনগণনায় বৈকুণ্ঠপুর পরগনার অন্তর্গত দু-একটি গ্রামে ১৫৫ জন নেপালিদের বসবাস ছিল বলে জানা যায়।

সাত : ১৮৭৪-এ ডুয়ার্সের গাজোলডোবায় ইংরেজ প্লান্টার রিচার্ড হ্যাটেন সর্বপ্রথম চা-এর উৎপাদন আরম্ভ করেন। এর আগে দার্জিলিঙের ধোত্রেতে উনি চা-এর চাষ শুরু করেছিলেন। এই সেই ধোত্রে (ধোতরিয়া) বাগান থেকেই নেপালি শ্রমিকদের তিস্তা নদী সন্নিকটের গাজোলডোবায় আনেন। জলপাইগুড়ি জেলার উত্তরাংশ ডুয়ার্স এলাকায় এভাবে ক্রমশ চা-বাগান তৈরি করবার প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়। এ সময় থেকেই এখানে জনবসতি ঘন হতে থাকে এবং ডুয়ার্স এলাকায় উনবিংশ শতাব্দীর শুরু অবধি প্রায় ১০০টি চা-বাগিচা তৈরি হয়ে গিয়েছিল। 'চা গাছে পয়সা ফলে' কিংবদন্তি অনুসারে অনেক নেপালি শ্রমিককে দার্জিলিং জেলা ও মোরঙ এলাকা থেকে ডুয়ার্সে আনা হয়। চা-শিল্পের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই এই এলাকাতে নেপালি জনবসতিও স্থায়ীভাবে বিস্তারিত হতে থাকে।

ভারতে নেপালিদের আগমনের ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে এই জাতিবিশেষের স্বতন্ত্র ও স্বচ্ছন্দবাদী প্রবৃত্তির বিবেচনাও অপরিহার্য হয়ে যায়। নেপালে নেপালিরা রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে একীকৃত হওয়ার পরে কোথাও সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার খোঁজে এবং কোথাও রাজনৈতিক উৎপীড়নের কারণে শাসক ও শোষিত জাতিগুলি (Sub castes) ভারতীয় ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশ করেছিল, এই সত্যতা কেউই অস্বীকার করতে পারবে না। ইতিহাসের বিভিন্ন কালখণ্ডগুলিতে স্বাধীনতার সন্ধানে এবং অস্তিত্বের সংরক্ষণের জন্য এদিকের নেপালিরা অনবরত সংঘর্ষময় জীবনযাপন করে আসছে। ভারতবর্ষের বুকে নেপালিরা নিজেদের সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক স্বত্বের অনুসন্ধান করতে থাকে। এই কারণেই পরবর্তীকালে একটি স্বতন্ত্র জাতিসত্তার চেতনা তাদের মধ্যে দানা বাঁধে। এতে জাতীয় গৌরব, ঐতিহ্য ও অস্তিত্বের অনুসন্ধানে তারা এখনও নিয়োজিত রয়েছে। স্বাধীন নেপালের প্রসঙ্গে সেখানকার রাজনেতাগণ

ও প্রজারা একত্রিতভাবে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা উপভোগ করে আসছে' নেপালের নেপালিদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যায়ন থেকে এই তথ্য স্পষ্ট হয়। এই মৌলিক ভিন্নতা ভারতীয় মূলের ও নেপালের নেপালিদের মধ্যে স্পষ্টভাবে রয়েছে। দার্জিলিং জেলা ও ডুয়ার্সের নেপালিরাও স্বচ্ছন্দবাদী হয়ে এই স্বত্বের খোঁজে এই এলাকা আবাদ করে।



নেপালী সম্প্রদায়ের কুখুরি নৃত্য

ডুয়ার্সে নেপালি সংস্কৃতি ও তার স্বরূপ

জলপাইগুড়ি জেলার উত্তর দিকে অবস্থিত ভুটান রাজ্যের পাদদেশে তিস্তা নদীর তীর থেকে পূর্বদিকে সঙ্কোশ (শনকোশ) নদী পর্যন্ত প্রায় ১৬০০ বর্গ মাইলের ভূভাগকে দ্বারক্ষেত্র অথবা ডুয়ার্স বলা হয়। এর উত্তর দিকের সীমাঞ্চলের প্রায় ১৭৬ কিলোমিটার এলাকা ভুটানের দক্ষিণ সীমার সঙ্গে মিশে আছে এবং প্রায় ১০০ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমি ভূখণ্ড দার্জিলিং জেলার সঙ্গে স্পর্শ করে আছে। ইংরেজ শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই হিমালয় এলাকায় সর্বপ্রথম ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে এবং তরাই ও দ্বারক্ষেত্রে ১৮৬২ ও ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে শুরু করে। এর সঙ্গে সঙ্গেই এই এলাকায় নেপালি জনবসতিও ক্রমশ বিস্তার লাভ করে। নেপালিরা তখন কৃষিগত পেশায় নিজেদের নিয়োজিত করেন। অন্যান্য জীবিকা উপার্জনের মাধ্যমে যেমন পশুপালন, দুধের ব্যবসা, বৃক্ষ-কাঠ কাটার পেশা এবং কয়লাখনি অঞ্চলে মজদুরি পেশা গ্রহণ করে তাঁদের স্থায়ীভাবে বসবাস করতে দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে বলা বাঞ্ছনীয় যে ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম পশ্চিম ডুয়ার্সের গাজোলডোবায় চা-বাগান আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ফুলবাড়ি, বাগ্রাকোট, গঙ্গাবিল, ডালিমকোট, রংগাটে ইত্যাদি বাগান আরম্ভ করতে এবং এই বাগানগুলিতে নেপালি মজদুরবর্গই নিজেদের পরিশ্রম নিয়োজিত করেন। জোহন এবং গ্রুনিত পূর্বী বেঙ্গল ও আসাম গেজেটিয়ারে এরূপ উল্লেখ করেছেন : "When the Tea Industry was started in the Western Duar's Soolies employed were Nepalies, but it was soon found that sufficient labour could not be obtained locally. A few gardens, which were practically in the hills, still work almost entirely with Nepali labour, but, as a whole, the Duars gardens are dependant on labour from a distance, the chief recruiting grounds being Chotanagpur and the Santhal Parganas". (অর্থাৎ পশ্চিম ডুয়ার্সে চা-শিল্পকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নেপালি কুলিরা পরিশ্রম করেছিল। কিন্তু স্থানীয়ভাবে প্রচুর সংখ্যাধিক্য কুলির জোগান পাওয়া সম্ভব নয় বলে জানা যায়। পার্বত্য এলাকায় অবস্থিত কিছু চা- বাগিচাগুলি নেপালি শ্রমিকগণের উপরই সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু ডুয়ার্সের চা-বাগিচাগুলি অত্যন্ত দূরত্বে অবস্থিত ছোটনাগপুর ও সাঁওতাল পরগনা থেকে আনীত শ্রমিকদের উপর নির্ভরশীল ছিল।) সারাংশে বলতে হয় যে ডুয়ার্স এলাকায় চা-শিল্পের সঙ্গে সঙ্গেই নেপালি জনবসতি বাবস্থিত, স্থায়ী এবং সামগ্রিকরূপে স্থাপনা করার পর নেপালি সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবনশৈলীরও বীজরোপণ হতে থাকে এবং কালান্তরে নেপালি সাংস্কৃতিক বিস্তারও ঘটতে থাকে।

ইংরেজি এবং ভারতীয় ভাষাবিদগণ নেপালি ভাষাকে আজও 'খস' বা 'গোরখালি' ভাষা বলে অভিহিত করেছেন। নেপালি ভাষার উৎপত্তি যেভাবে খস-প্রাকৃত এবং খস অপভ্রংশ থেকে হয়েছে বলে নেপালি ভাষাবিদগণ প্রায় একমত হচ্ছেন সেইভাবেই ভোট-বর্মী ভাষা পরিবার মঙ্গোলীয় জাতিগোষ্ঠিগণ ক্রমশ খম্বু (রাই), লিম্বু, মগর, গুরুং, নেওয়ার, তামাং ও মুর্মীগণ ও খস ভাষা ও খস-সংস্কৃতির প্রতি আকর্ষিত হবার তথ্য পাওয়া যায়। ভারতীয় মূলের নেপালিদের মধ্যে (মঙ্গোলীয় জাতিগোষ্ঠী) এই প্রবৃত্তি আরও বেশি দেখতে পাওয়া যায়। এই জাতি ও জাতিগোষ্ঠিগণ দার্জিলিং ও ডুয়ার্স এলাকায় পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে নিজের নিজের জাত ও ভাষাগোষ্ঠীর মৌলিকতাকে ভুলে গিয়ে একটি নেপালি জাতি ও ভাষাগোষ্ঠীতে আত্মসাৎ হয়ে পড়ে। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের পূর্বেই ভারতীয় মূলের নেপালিদের মধ্যে অর্থাৎ খস ভাষাগোষ্ঠীগণ এবং ভোট-বর্মী ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে 'সাঝা ভাষা' [মাধ্যমের ভাষা] (LINGUA-FRANCA) হিসেবে নেপালি ভাষাই বেশি ব্যবহৃত হতে আরম্ভ করে। এইভাবে হিমালয়-শৃংখলার বিভিন্ন আর্য ও আর্যের জাতিগোষ্ঠীদের মধ্যে নেপালি ভাষা 'জনভাষা' হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। এই জনভাষা ও জাতিগোষ্ঠীদের মহামিলন (Homogeneity)-এর কারণে 'সমষ্টিগত নেপালি সংস্কৃতি' (Composite Nepali Culture) বিকশিত হয়ে ওঠে।

নেপালি সংস্কৃতির মূল স্রোতই বৈদিক সংস্কৃতি। এতে আর্যেত্তর (ভোট-বর্মী) নেপালিজাত গোষ্ঠীগুলোর নিয়মনীতি, উৎসব-পার্বণ, আচার-আচরণ, বেশভূষা, কথা-বার্তা, আস্থা-পরম্পরা, চিন্তন-মনন, সংস্কার-সংস্কারাদি সহযোগী সংস্কৃতি হিসেবে মিশ্রিত হয়ে সমষ্টিগত

নেপালি সংস্কৃতি বিশাল বৃক্ষরূপে পরিণত হয়। কোনও জাতির সংস্কৃতিসচেতনতার অবিচ্ছিন্ন পরম্পরা সংশ্লিষ্ট জাতির গৌরব ও উক্ত সংস্কৃতির সুরক্ষা সংশ্লিষ্ট জাতিই করে থাকে। এরূপ সুব্যবস্থিত ও সমষ্টিগত নেপালি সংস্কৃতির স্বরূপ নির্মাণে দেশ, কাল পরিস্থিতি স্বাপেক্ষভাবে প্রভাবিত করে থাকে। নেপালি বিদ্বান এবং ঐতিহাসিক স্বর্গীয় সূর্যবিক্রম গেওয়ালী 'নেপালি জাতিত্বের বিকাশে ভানুভক্তের স্থান' নামক নিবন্ধে এরূপ লিখেছেন—"গোরখালি জাতিত্বে নেওয়ার ও কিরাঁত জাতিত্ব মিশ্রিত হয়েছে। গোরখালির সঙ্গে বাহাদুরি ছিল, নেওয়ারের সঙ্গে কলা ছিল এবং কিরাঁতের সঙ্গে প্রাচীন ঐতিহ্য ছিল। তিনটিই জাতি মিশ্রিত হয় এবং একটি নবীন জাতিত্বের সৃষ্টি হয়—সেটিই নেপালি জাতিত্ব।" এই নতুন জাতিত্ব আধুনিক নেপালি ভাষার স্বরূপ পেল এবং এই জাতিত্বের বিরাসতে নেপালি সংস্কৃতি এসেছে।

জলপাইগুড়ি জেলার প্রায় ১৫৬ চা-বাগান, ১৪৮টি গ্রাম পঞ্চায়েত সৃষ্টি এবং ৩০/৩৫টি বন-বসতি এলাকায় কোথাও অল্প সংখ্যক জাতিগোষ্ঠীরূপে নেপালিরা অন্যান্য জাতীয়-ভাষিক জনগোষ্ঠীগুলি (অনুসূচিত জাতি ও জনজাতির)-র সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহবাস, একাত্মতা এবং সমন্বয় হয়ে যায়। এতদ্‌সত্ত্বেও নেপালি জাতিত্ব নিজের স্ব-সংস্কৃতি, স্বত্ব অক্ষুণ্ণও রাখেনি, কিন্তু এর প্রভাব ও গ্রাহ্যতা অন্য অল্পসংখ্যক জাতীয়-ভাষিক জনগোষ্ঠীদের মধ্যে প্রসার করতে ও একাত্ম করতে সক্ষম হয়। এই জাতীয়-ভাষিক জনগোষ্ঠীদের সঙ্গে এক শতাব্দী থেকে বেশি সময়াবধির পারস্পরিক সম্বন্ধ, অন্তর-সংঘর্ষ, নিকট-সহবাস, ব্যাপারিক ও পেশাগত আদান-প্রদান, সাংস্কৃতিক বিনিময় ইত্যাদি কারণে বিশুদ্ধ নেপালি সংস্কৃতিকে কোনও বাহ্য অথবা আন্তরিক প্রভাব পড়েনি বলে বলা যায় না। উপরি-বর্ণিত ভাষিক-জাতীয় জনগোষ্ঠীগুলি নিজের সনাতন সংস্কৃতিতে নেপালি সংস্কৃতিকে সমাহিত করার ও আত্মসাৎ করার প্রমাণ পাওয়া যায়। বর্তমান সময়ে অত্যাধুনিক সঞ্চারমাধ্যম ও বিকশিত তথা প্রায়োগিকির প্রভাবে নেপালি সংস্কৃতিতেও অন্যান্য আভিজাত্য ও নিম্নবর্গের সংস্কৃতির সংমিশ্রণ হয়নি বলেও নিশ্চিত বলা যায় না।

ইতিহাসের বিভিন্ন কালখণ্ডগুলিতে স্বাধীনতার সন্ধানে এবং অস্তিত্বের সংরক্ষণের জন্য এদিকের নেপালিরা অনবরত সংঘর্ষময় জীবনযাপন করে আসছে। ভারতবর্ষের বুকে নেপালিরা নিজেদের সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক স্বত্বের অনুসন্ধান করতে থাকে। এই কারণেই পরবর্তীকালে একটি স্বতন্ত্র জাতিসত্তার চেতনা তাদের মধ্যে দানা বাঁধে। এতে জাতীয় গৌরব, ঐতিহ্য ও অস্তিত্বের অনুসন্ধানে তারা এখনও নিয়োজিত রয়েছে।

ডুয়ার্সের নেপালি জনজীবনে নিজ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সুরক্ষা করা, উন্নতি ও সংবর্ধন করার ক্ষেত্রে সামগ্রিক প্রচেষ্টাও চলতে থাকে। ডুয়ার্স এলাকার ছোট-বড় সংঘ-সংগঠনগুলি নিজ নিজ এলাকায় ভানুভক্ত জয়ন্তী, দেওকোটা জয়ন্তী, অগমসিংহ গিরি জয়ন্তীর পরম্পরাও তাঁরা রেখেছেন। ফুলপাতী (দুর্গাপূজার সপ্তমী)-এর দিন নেপালি বেশভূষায় সুসজ্জিত হয়ে পঁঞ্চে বাজা ও নেমিতি বাজা (ক্রমশ পাঁচ ও নয় প্রকারের বাজনাবিশেষ-এর সঙ্গে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ঝলক প্রদর্শনী) বের হয়ে থাকে। মাদলে গীত, চুটকে এবং পশ্চিমা গীত ও নৃত্য, মারুনী গীত ও নৃত্য দ্বারা গ্রাম, শহর-বাজারকে উৎসবমুখর করে তোলেন। 'ডুয়ার্স নেপালি সাহিত্য বিকাশ সমিতি' নামক সরকার দ্বারা অনুমোদিত সংস্থা ডুয়ার্সব্যাপী ভানুজয়ন্তী পালন করবার নিয়ম শুরু করে। এই উপলক্ষে রামায়ণ পাঠ প্রতিযোগিতা, নেপালি লোকগীতি-নৃত্য প্রতিযোগিতা এবং সাংস্কৃতিক প্রদর্শনী ইত্যাদি আয়োজিত করে নেপালি সংস্কৃতির সামগ্রিকভাবে সুরক্ষা করে আসছে। এই সংস্থার আয়োজনে ডুয়ার্সের বিভিন্ন এলাকায় সাংস্কৃতিক উৎসব করিয়েছে। এছাড়া নেপালি লোক ও আধুনিক গীত, নৃত্য প্রতিযোগিতা, সংগীত প্রতিযোগিতা এবং সাংস্কৃতিক প্রদর্শনী, নেপালি সংস্কৃতির উপর সেমিনার এবং বিচার গোষ্ঠী ইত্যাদি আয়োজন করেছে। এভাবে নেপালি সমাজে দৈনিক ব্যবহারে প্রযুক্ত অস্ত্রশস্ত্র, বাসনপত্র, বাঁশের তৈরি বিভিন্ন প্রকারের জিনিসপত্র, ভুট্টার আবরণের পিঁঢ়ি, চাটাই, বাজনা ইত্যাদির প্রদর্শনী নেপালি-অনেপালি দুই-ই জাতির সম্মুখে সমৃদ্ধ নেপালি সাংস্কৃতিক পরম্পরাকে প্রকাশ্যে আনার প্রচেষ্টাগুলি প্রশংসনীয় হয়ে উঠেছে। ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দের মার্চ ৮, ৯ এবং ১০ তারিখের দিন তিনদিনপর্যন্ত 'ডুয়ার্স নেপালি সাহিত্য বিকাশ সমিতি' ও 'তল্লাসী' নামক বাঙালী সংস্থার যৌথ আয়োজনে ডুয়ার্সের রাজাভাতখাওয়ায় 'বাংলা-নেপালি সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্মেলন' এবং ঐতিহাসিক 'সিঞ্চুলা সন্ধি'স্থল বক্সাদুয়ার দুর্গে বাংলা-নেপালি কবিগোষ্ঠী', বাংলা-নেপালি রসশিল্পী কর্তৃক নাটক প্রদর্শনী, পত্র-পত্রিকা প্রদর্শনী ইত্যাদি দ্বারা জেলায় বাঙালি নেপালি সাংস্কৃতিক বিনিময় ও সমন্বয় স্থাপিত করতে সক্ষম হয়। উপরিউক্ত তিনদিনব্যাপী বাংলা-নেপালি সাহিত্য সংস্কৃতি সম্মেলন ব্যাপারে ইংরেজি দৈনিক স্টেটসম্যান নিজের মুখপৃষ্ঠেই নিম্নলিখিত সংবাদ প্রকাশ করে :

Rajabhatkhawa, March, 12 : The three day session of Bengali and Nepali Writers' Conference the first of its kind in North Bengal ended here today. The conference organised by the Dooars Nepali Sahitya Bikash Samity and a Bengali Literary Organisation, Tallashi, stressed the need for greater cultural exchange and harmony between the two communities.

It passed a resolution condemning the Assam movement which the conference alleged, sought to declare Bengali and Nepali residents of the state as foreigners and drive them out. The resolution added that Bengalis and Nepalies has contributed to the growth and development of Assam. The meeting demanded inclusion of Nepali language in the eighth schedule of the constitution.

Surrendered by deep forest, the writers held the conference in the midst of a picturesque scene where wild elephants occasionally roam. Here the king of Cooch Behar ate rice for the first time after he was from neighbouring Bhutan by a contingent of troops of East-India Company in the late of 18th country.

Mr. Amiya Bhusan Majumdar, the well known novelist who has presented in his works many facts of North Bengal life, and Mr. Shiva Kumar Rai who has distinguished himself by depicting Nepali life in the neighbouring areas of Darjeeling, Dooars and Assam in his short stories spoke on the need for strengthening the bond between the two communities. Mr. Amitabha Das Gupta and Mr. Sandipan Chatterjee also spoke. Mr. Ramlal Adhikari, who is well-known for his translation of Tagore's works in Nepali, spoke on the Development of Indo-Nepali literature.

The last session of the conference was held at the 2500 ft. Buxa Duar camp. Young North Bengal poets Mr. Sumit Bhaduri, Dibakar Bhattacharya and Punyasloka Das Gupta and the Nepali poets Mr. Jivan Namdung and others participated in the poetry recital.

(By courtesy : *The Statesman*, Friday, 14.3.80)

এভাবে ডুয়ার্সের নেপালিরা জেলার উন্নত ও সম্ভ্রান্ত জাতির মাঝে নিজেকে নিজের সাহিত্য ও সংস্কৃতির মাধ্যমে চেনাতে ও অন্যাকে চিনতে নতুন দিগন্তের উন্মোচন হয়েছিল।

সাহিত্যিক ও শিক্ষাগত সচেতনতা

জেলার উত্তর প্রান্তের এলাকা উত্তর ক্ষেত্র অথবা ডুয়ার্সে বহু সংখ্যক নেপালিদের বাসস্থল থেকে বিংশতম শতাব্দীর পূর্বার্ধে কিছু কিছু সাহিত্যিকের রচনা দেখা দেয়। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে দেরাদুন থেকে প্রকাশিত 'গোরখা সংস্থার' পত্রিকায় ডুয়ার্সের কৈঁজলে বস্তিনিবাসী স্বর্গীয় হৈকমসিংহ রাইয়ের নিবন্ধ সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়েছিল বলে

জেলা লোকসংস্কৃতি উৎসবে নেপালী নৃত্য

প্রমাণ পাওয়া যায়। এর পরেও স্বর্গীয় রাইয়ের ৩/৪টা সামাজিক নিবন্ধ উক্ত পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। তারপরে ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে কালচিনি বুকখিমবারীর দীনবাহাদুর সর্দার লিখিত 'ধার্মীকো সওয়াই' নামক পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। স্বর্গীয় হৈকমসিংহ রাইয়ের নিবন্ধগুলিতে তৎকালীন নেপালি সমাজে ব্যাপ্ত অশিক্ষা, সামাজিক কুপ্রথা ইত্যাদির আলোচনা করে সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক চেতনা আনার আগ্রহ লক্ষ করা গেছে। স্বর্গীয় দীনবাহাদুর সর্দারের 'ধার্মীকো সওয়াই'-এ নেপালি সমাজে বহু প্রচলিত অন্ধবিশ্বাসকে আঘাত করা হয়েছে। তৎকালীন নেপালি সমাজে সাহিত্যের মাধ্যমে উপরিলিখিত লেখকগণ সাহিত্যিক সচেতনতা বৃদ্ধি করবার জন্য সৎ প্রয়াস করেছিলেন। উক্ত সৎ প্রয়াসের মাধ্যমেই ডুয়ার্সের নেপালিরা পরবর্তীকালে সচেতন হয়েছেন। এভাবে পঞ্চাশের দশক থেকে এই সাহিত্যিক সচেতনতা গতি পেতে আরম্ভ করে। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে দুচম্মীপাড়া চা-বাগান থেকে স্বর্গীয় চন্দ্রবীর প্রধানের সম্পাদনায় হস্তলিখিত পত্রিকা 'জাগৃতি' সর্বপ্রথম প্রকাশিত হবার পর .৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে সর্বশ্রী জগদীশচন্দ্র খরেলের সম্পাদনায় সর্বপ্রথম মুদ্রিত পত্রিকা হিসেবে 'হাম্রো ধ্বনি' আত্মপ্রকাশ করে। তারপর আশাবারি (ওয়াসাবাড়ি), বাগ্রাকোট, সামসিংহ, কালচিনি, দুচম্মীপাড়া, বীরপাড়া, মাদারিহাট, দলসগপাড়া, ভগতপুর, লুকসান, রাজাভাতখাওয়া, মালবাজার, জয়গাঁও ইত্যাদি স্থান থেকে ক্রমিক রূপে সাহিত্যিক পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে। ডুয়ার্স থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় ৫০টি পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। এভাবে এই সাহিত্যিক পত্র-পত্রিকার মাধ্যম থেকে ডুয়ার্সে নেপালি সাহিত্যিকদের একটি মণ্ডলী তৈরি হয়েছে।

ডুয়ার্সের বিশিষ্ট নেপালি লেখক স্বর্গীয় এস এন ছেত্রীর 'গাড়ধন' (গল্প, ১৯৮৫ খ্রিঃ) এবং 'দার্জিলিং সানো রেল' (নিবন্ধ সংগ্রহ, ১৯৯৮ খ্রিঃ), শ্রীমণিকুমার থাপার 'ডুয়ার্স' গীতিকাব্য, শ্রীবদ্রীনারায়ণ প্রধানের 'মহর্ষি কার্ল মার্কস' (জীবনী), ম্যাক্সিম গোর্কীর 'আমা'-অনূদিত, 'মৌলী', মৌলিক নেপালি উপন্যাস (১৯৯০ খ্রিঃ),

কিতাবসিংহ রাইয়ের 'জীবনফুল' (কবিতা সংকলন, ১৯৮০), 'গহেঁলো গুলাবকো ফুল' (গল্প সংকলন ১৯৮৫ খ্রিঃ), 'আঁখীঝ্যালবাট' (নিবন্ধ সংকলন , ১৯৯৭ খ্রিঃ), 'মোলেয়রকা দুই নাটক' (অনূদিত), 'A Study on the State of Education in Duars' (1995) ইংরেজিতে, শ্রীবিষ্ণু অধিকারীর 'প্রকৃতিকন্যা' ও 'বিজয়মালা' (উপন্যাস) এবং 'অসিনালে ঝারেকা ফুলহরু' (গল্প সংকলন), শ্রীমতী মায়াদেবী য়োঞ্জনের 'মন্দা' (গল্প সংকলন), কুমারী মটিন্ডা রাইয়ের গল্প সংকলন 'টোটোলাকো ফুল', শ্রীইন্দ্রবাহাদুর গুরুঙের 'আগোহরু অনি ফুলহরু' (কবিতা সংকলন), 'মেরা চার একাংকীহরু' (একাঙ্ক সংকলন), বুখিমবারী কা কথাহরু' (গল্প সংকলন), শ্রীনারায়ণ প্রধানের গল্প সংকলন, 'বিরোধ বোখ নসকেকা বিথানীহরু ; শ্রীলোকনাথ প্রধানের কবিতা সংকলন 'বিরুওয়া', পদম ভূজেলের কবিতা সংকলন 'ভক্কানোহরু', শ্রীনরেন্দ্র খঁড়কা এবং টিকা পরাজুলীর সংযুক্ত কিতাব সংকলন 'ফুলহরু', 'কাঁড়াহরু', শ্রীমতী কমলা খপ্তাবলীর গল্প সংকলন 'ক্রমশঃ এউটা দিন জন্মস্থ, শ্রীমনোনারায়ণ প্রধানের নিবন্ধ সংকলন 'কেহী সাহিত্যিক অধ্যয়ন'-র মূল্যাঙ্কন, শ্রীজীবন নামদুঙের সমালোচনা সংকলন 'নেপালি সাহিত্যিক ভৌপুওয়ালহরু' ইত্যাদি ছাড়াও সর্বশ্রী জনার্দন থাপা, মদন মোক্তান, জীবন রানা, বিধান নৌবাগ, অশোক বিশ্ব, মাগর রাই, দুর্গা চামলিং, দিলমান রাই 'চোট', কমল থুলুঙ, বি বি ছেত্রী, ভানুপ্রকাশ 'মার্মিক'-এর একটি উৎকৃষ্ট দল ডুয়ার্সের নেপালি সাহিত্যিক ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছেন।

যেখানে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক শোষণ থাকে সেখানে স্ব-অস্তিত্বের রক্ষার জন্য অনবরত সংলগ্নতা, সমর্পণ ও সংঘর্ষ জন্ম নেয়। সাংস্কৃতিক অতিক্রমণ, শোষণ, বঞ্চনা, সংঘর্ষ এবং অস্তিত্ব রক্ষার বিয়োগান্ত কাহিনী খুঁজতে হলে ডুয়ার্সের নেপালিদের স্মরণ করতে হয়। বিংশ শতাব্দীর উত্তরার্ধে সাংস্কৃতিক-সাহিত্যক সচেতনতার প্রারম্ভিক বিন্দু নেপালি মাধ্যমের শিক্ষক সচেতনতায় জাগরিত হয়ে ওঠে। পঞ্চাশের দশক থেকে ডুয়ার্সের নেপালি বহু চা-বাগানগুলিতে নেপালি মাতৃভাষা মাধ্যম থেকে প্রাথমিক শিক্ষার প্রারম্ভিক অবস্থায় নেপালি ভাষাভাষী শিক্ষকের অভাবে দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্শিয়াং, শিলং থেকে নেপালি শিক্ষকদের আনাতে হয়েছিল। উক্ত বহিরাগত শিক্ষকরা ডুয়ার্সে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। তাঁরা ডুয়ার্সে স্থায়ীভাবে বসবাস করে নেপালি প্রাথমিক শিক্ষার প্রচার-প্রয়াসে আত্মোৎসর্গের ফল আজকের প্রজন্ম ভোগ করে আসছে। জেলার মোট ১৯১৩টি সরকারি প্রাথমিক পাঠশালার মধ্যে সরকারি তথ্য অনুসারে নেপালি প্রাথমিক পাঠশালার সংখ্যা মাত্র ২৯টি দেখানো হয়েছে। তা সত্ত্বেও বেসরকারি অনুসন্ধান অনুসারে ১০৫ নেপালি ছাত্রবহুল প্রাথমিক পাঠশালা আছে। এভাবেই নেপাল সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় মোট ৪টি আছে, কিন্তু নেপালি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় (হায়ার সেকেণ্ডারি) একটিও নেই। জেলায় মোট ১১টি সংগঠিত নেপালি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি ২৫ বছর থেকে নেপালি জনসাধারণের একান্ত প্রচেষ্টায় পরিচালিত হচ্ছে। সরকারি স্বীকৃতির জন্য অনেক চেষ্টা চলানো সত্ত্বেও উক্ত সংগঠিত নেপালি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি আজ অবধি স্বীকৃতি পায়নি। জেলার জনসংখ্যা ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দের জনগণনা অনুসারে ২৮ লক্ষের মধ্যে নেপালি জনসংখ্যা মোটামুটি সাড়ে ৫ লক্ষ হলেও জনসংখ্যার অনুপাতে নেপালি প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা অপর্যাপ্ত আছে। জেলার সাক্ষরতার গড় ৪৮%, এর মধ্যে নেপালি ভাষাভাষী সাক্ষরতার গড় ৯ % মাত্র। নেপালিরা আজও শিক্ষার মতন মৌলিক ও সাংবিধানিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার তথ্য নিম্ন তালিকাই প্রমাণিত করে :

উৎস : জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শকের আঁকড়া।

ভাষার ভিত্তিতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়

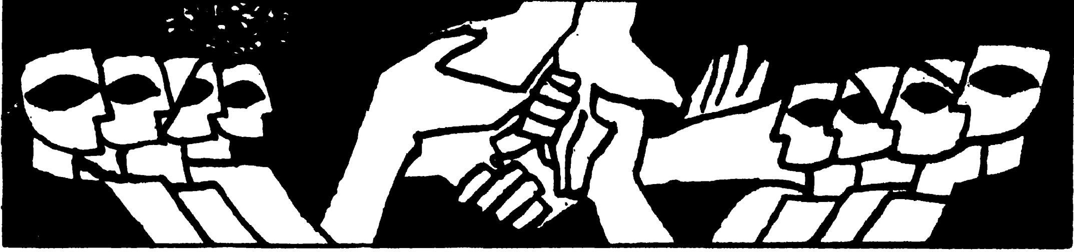
উৎস : জেলা মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শকের আঁকড়া।

জেলার শিক্ষার ইতিহাসে জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্ষদ এই বার সর্বপ্রথম ভাষার ভিত্তিতে প্রাথমিক শিক্ষকগণের নিয়োগ করেছেন। এজন্য তাঁদের ধন্যবাদ জানাই। একটি বৈষম্যের কথাও এখানে উল্লেখ করা দরকার। ডুয়ার্সের ডিগ্রি কলেজ আলিপুরদুয়ার কলেজ, বীরপাড়া কলেজ ও পরিমল মিত্র স্মৃতি কলেজ (মাল)-এ ডুয়ার্সের প্রায় ৩৫% নেপালি শিক্ষার্থীগণ অধ্যয়নরত আছেন। কিন্তু এই কলেজগুলিতে নেপালি বিভাগ খুলে নেপালি ঐচ্ছিক ও অনার্স বিষয় নিয়ে পড়ার সুযোগ এদের নেই, রাজ্য সরকারের এই বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। এভাবেই স্কুল সার্ভিস কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষক নিয়োগের জন্য পরিচালিত পরীক্ষায় ডুয়ার্সের নেপালি প্রার্থীগণকে নেপালি ভাষায় উত্তর লেখার সুযোগ থাকা উচিত। পাশাপাশি দার্জিলিং পার্বত্য পরিষদের অন্তর্গত পরীক্ষার্থীদের জন্য এরূপ সুযোগ দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার প্রত্যেক স্তরে রাজ্য সরকার সমান সুযোগ-সুবিধা নাগরিকগণকে প্রদান করলেই সুস্থ গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে থাকে। এর ফলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সহিষ্ণুতা থাকতে বাধ্য। কোনও জাতি বা বর্গের উন্নতির প্রথম সোপানই শিক্ষা। শিক্ষা ছাড়া মানবজাতির অগ্রগতি অসম্ভব।

Reference :

1. Settlement Reports of the Western Duars, Jalpaiguri District (1895) by D.H.E. Sunder.
2. Final Report on the Survey and Settlement Operation of Jalpaiguri District (1919) by Milligan, J. A.
3. Kirata-Jana-Kriti by Dr. Suniti Kumar Chatterjee.
4. A Statistical Account of Bengal (1876) Vol : VII & X by W.W. Hunter.
5. Imperial Gazetteer of India (1908), Vol : XIV
6. Jalpaiguri District Gazetteer by John F. Gruning.
7. A Census Hand Book by A. Mitra.
8. Nepal Ra Bhotangko Maitri Sambandha (In Nepali) by Bipin Deo Dhungel.
9. Bhanubhakta Smarak Grantha (In Nepali). Editor : Surja Bikram Gyawali.
10. The Gorkha Conquest by Dr. Kumar Pradhan.

লেখক ❑ বিশিষ্ট নেপালি বুদ্ধিজীবী, গল্পকার, কবি ও প্রাবন্ধিক।



সুনীল পাল

জলপাইগুড়ি জেলার বর্ণময় লোকসংস্কৃতি নৃত্য ও গীত

উত্তরবঙ্গের যে আদিবাসী ও তপসিলি জনগোষ্ঠী নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও তাঁদের সমাজে পরম্পরাগতভাবে প্রচলিত বিচিত্র নৃত্যসমূহের অমিত বিত্তকে আগলে রেখেছেন যার প্রকাশ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দেখা যায় তা নিয়ে এখানে আলোচনা করা হল।

রাভা নৃত্য

উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার রাভা জনজাতির জীবন চর্যায় নৃত্যের স্থান অতি নিবিড়। নৃত্যকে তাদের ভাষায় বলা হয় 'বসিলি'। তাদের শ্রম, আনন্দ, বিরহ-মিলনের বিচিত্র চিত্রণ-এর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত। যদিও ধীরে ধীরে তাদের সমাজ থেকে নৃত্য প্রায় অবলুপ্তির দিকে, তবুও শহর থেকে দূরে নিবিড় অরণ্যের কোলে লালিত যে রাভা সমাজ রয়েছে তারা এখনও সেখানে তাদের ঐতিহ্যপূর্ণ নৃত্যের সংরক্ষণ ও অনুশীলন করে চলেছেন। গ্রামীণ রাভাদের মধ্যেও নতুন করে সে সব নৃত্যের চর্চা চলছে।

সাধারণভাবে রাভা নৃত্যগুলি আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত। দেব উপাসনা, শ্রাদ্ধানুষ্ঠান ও ঋতু উৎসবে রাভা পুরুষ ও মহিলা যৌথভাবে নৃত্যে অংশগ্রহণ করেন। এই নৃত্য স্বতোস্ফূর্ত, কৌমের দৃশ্য রূপে, বিশেষত গৃহ দেবী 'রন্তুক'-'বাশেক' পুজোতে এবং নববর্ষে 'নডাউকন্ বাঁকেয়ী'-তে 'সারাঙ্গ' বা পুরোহিত নৃত্য করেন। তাঁর নৃত্য একক, এতে ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়াকলাপ ও দেবতাকে তুষ্ট করার আকৃতি।

মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যাবার পূর্বে মৃতের উদ্দেশ্যে যে চিকা বারার (মৃত ব্যক্তিকে জল ও মদ্য নিবেদন) অনুষ্ঠান হয় সে সময়ে এবং শ্রাদ্ধানুষ্ঠানেও রাভাগণ ডাংসি, কাল বাঁশী, গোমান, বাকক্ ডিংডং, হ্যাম ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র এবং সংগীতের তালে তালে নৃত্য করেন। মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যাবার সময় সকল আত্মীয়স্বজন সমবেতভাবে নৃত্যে অংশগ্রহণ করেন। তাদের হাতে থাকে তীরধনুক, ঢাল ও দা ; এই সময় মৃত ব্যক্তি

রাভাসম্প্রদায়ের যুদ্ধনৃত্য : হান্দাবারু

যে ঘরে বাস করত সেই ঘরের চালের খড় খুলে নিয়ে উঠোনে ছড়িয়ে দিয়ে তার ওপর দৈব্ সেরেঞ্জী বা উদ্দাম নৃত্য করতে করতে শব বাহকগণ শ্মশান অভিমুখে যাত্রা করেন।

এই নৃত্যকে বলা হয় 'মৈর বার চাঙি' বা 'মৈর গুদুঙি'। মৃতদেহ দাহনের চতুর্থ দিনে 'তৌলেঙ্ চেঁইয়া' বা চিল্ দেখানো অনুষ্ঠানেও নৃত্য করার রীতি রয়েছে। রাভাদের বিশ্বাস এই নৃত্য না করলে মৃতের 'কেবেঙ বয়ী' বা হাড় ভাঙে না।

অন্যান্য রাভা নৃত্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—কর্মভিত্তিক নৃত্য 'হাঙ্গায় সানি'—ধানের বীজ বপনের নৃত্য। নাকচেং রেনি নদী বা ঝোরায় চিংড়ি মাছ ধরার নৃত্য। দুটি নৃত্যেই মেয়েরা অংশগ্রহণ করে। মাছ ধরার নৃত্যে মেয়েরা কোমরে 'খলুই' বেঁধে হাতে জাকৈ নিয়ে জলের মধ্যে মাছ ধরার বাস্তব দৃশ্যটি ছন্দে ও গতিতে রূপদান করেন। এই নৃত্যটি ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে দিল্লির প্রজাতন্ত্র দিবস সমারোহে প্রদর্শিত হয়ে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং বিদগ্ধ রসিক মণ্ডলীর প্রশংসা লাভ করেছিল।

'হা পণ্ডি' অহল্যা ভূমি হাসিল করার নৃত্যে জমি পরিষ্কার করা, কাদলানো, ভূমি পুজো করা, ফসলের বীজ ছড়ানোর দৃশ্যগুলি রূপায়ণ করেন। এই সব নৃত্যে যৌথ শ্রমের মূল্যবোধ প্রকাশিত।

রণ নৃত্য 'হান্ডাবারুতে' দেখানো হয় নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বহিঃশত্রু প্রতিরোধের শৌর্যময় সংগ্রাম দৃশ্য। শিল্পীদের হাতে থাকে ঢাল ও খরশান তরবারি।

মাকপর বসিনি ভালুক মুখোশ নাচ। কার্তিক মাসে কালী পুজোর ছ'সাতদিন আগে রাভাগণ এ নাচের আয়োজন করেন। ভালুকের মুখোশ বা মুখা পরে কলাপাতা বা পাটের আঁশ দিয়ে ভালুকের রোমনা শরীরের মতন হ্যাম (ঢোল ব্রাংছি (বাঁশী) দব্দির (ঘটি) বোলের তালে তালে নেচে নেচে গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে মাগুন তুলে বারোয়ারী কালী পুজো করেন। এ নাচে একটি মুখোশই ব্যবহৃত হয়। পুজোর শেষে মুখোশটি নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়।

আর একটি মুখোশ নাচ যা আলিপুর-দুয়ারের দক্ষিণ যা রো বসতির কোচাদ্রাও দল করেন—তার নাম 'চোর খেলেয়ী'। এটিও ধর্মীয় নাচ, মাগুনের সঙ্গে যুক্ত। কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে বাৎসরিক কালী পুজো উপলক্ষে এ নাচের আয়োজন করা হয়।

চোর খেলেয়ী নাচে দু'টি মুখোশ ব্যবহার করা হয়। ভালুক মুখোশ যিনি পরেন তার দেহ পাটের আঁশের তৈরি খোলসে ঢাকা থাকে হাতে থাকে বাঁকানো ছড়ি। চণ্ডীর মুখোশ যিনি পরেন তার পরনে থাকে ডোরা কাটা লুঙ্গি, গায়ে বুক খোলা শার্ট ডান হাতে প্রাচীন হাণ্ডা বা তরবারি পায়ে ঘুঙুর বাঁধা থাকে।

নাচের সাঙ্গে বাজে খাগের দীর্ঘ কালো বাঁশী, হ্যাম্, দব্দি। এই নাচের সঙ্গে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গাওয়া হয় একটি গানের কলি, সেটি হল—

কালই মুই, হালিমুই মা রইন্
হালিয়া হালিয়া
আশিন-কাতিক চোর রে চোর ॥

গান ও বাজনার তালে তালে নাচ চলে, কখনো তড়িৎ গতিতে ঘুরে। কখনও ধীর গতিতে এগিয়ে পিছিয়ে, কখনও আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে।

'চোর খেলেয়ী'র মুখোশগুলি বিচিত্র। বিশেষ করে চণ্ডীর মুখোশটি। প্রসারিত ঠোঁট লক্লকে জিহ্বা লম্বা নাক। ডান চোখের ওপরে চাঁদ ও বাঁ চোখের ওপরে সূর্যের প্রতীক আঁকা ভালুক মুখোশটি না মানব না পশুর আদলে চিত্রিত।

এই মুখোশ নাচও মূলত গ্রাম দেবী চণ্ডী বা কালীর সমবেত উপাসনা, যা গ্রামের নাবিক কল্যাণ কামনায় আয়োজিত হয়। নাচে তাই অভিব্যক্ত হয় দৈব শক্তির জয় এবং পাশব শক্তির পরাভব।

রাভা নৃত্যে হস্তভেদ বা মুদ্রার প্রকাশ অতি অল্প পদক্ষেপণ ও অঙ্গের অবনয়ন ও উন্নয়নের কাজই বেশি। গ্রীবা নয়ন ও মুখের কাজ নেই। মেয়েরা রঙিন নক্শী 'নুফুন', কাম্বাং—'কেম ব্রেট' ও ফাক্ চেক পরেন। কোমরে বাঁধেন শিল্প সৌকর্য মণ্ডিত কোমর বন্ধনী লবক গলায় পরেন সুকি মালা টাকা মালা। পুরুষেরা মাথায় রঙিন পাগড়ি পরেন ও কোমরে জড়িয়ে নেন রঙিন উত্তরীয়। নৃত্য পরিবেশিত হয় খোলা জায়গায় সাধারণত বাড়ির উঠোনে এগিয়ে পিছিয়ে দক্ষিণে বামে এবং চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে নাচ চলে। নৃত্যে গতি তাল ও ছন্দের দক্ষতা ও রসের পূর্ণ প্রকাশ ঘটে।

মেচ নৃত্য

জলপাইগুড়ি জেলার মেচ (বোড়ো) আদিবাসীরাও নৃত্য ও গীতে পারদর্শী জীবন চর্যায় তার এক বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। বিবাহ, পূজা পার্বণ, নাম্যকর্ত্তন উৎসব শিকার ও অন্যান্য আচারানুষ্ঠান উপলক্ষে তাঁরা নৃত্যের আয়োজন করেন। এঁদের নৃত্যগুলির মধ্যে রয়েছে লালিত্য আবেগ এবং নান্দনিক ঐশ্বর্য। মেচ ভাষায় নৃত্যকে বলা হয় 'মৌসা নাই'।

মেচ সমাজে নানা ধরনের নৃত্য প্রচলিত আছে। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—নববর্ষ করণের নৃত্য 'বৈনাগু'। অনুষ্ঠিত হয় নববর্ষ শুরুর দশ পনেরো দিন পূর্ব থেকেই। এ উপলক্ষে মেচ অধ্যুষিত গ্রামগুলি নৃত্যে ও সঙ্গীতে মুখর হয়ে ওঠে। 'বৈনাগু' নৃত্যের ও সঙ্গীতের সঙ্গে পার্শ্ববর্তী অসম প্রদেশের 'রঙালী বিহু'র নৃত্য ও গীতের সাদৃশ্য রয়েছে। এই নৃত্যে মেচ যুবক-যুবতীগণ যৌথভাবে অংশগ্রহণ করেন।

এঁদের ধর্মীয় নৃত্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—'মাইনাও' গৃহদেবী পুজোর সঙ্গে সম্পর্কিত মাইনাও বুড়ি 'বরায় নায়' নৃত্য। এটি গৃহের মঙ্গলদাত্রী ও উর্বরতা শক্তির দেবী মাইনাও-এর উদ্দেশ্যে নিবেদিত। যা আধ্যাত্মিক ভাব রসে পুষ্ট।

'ছুবা গাঁটলাও' অর্থাৎ লম্বা দড়ির নৃত্য। এই নৃত্যে রূপায়িত হয় 'দেওদিনি' অর্থাৎ মহিলা ওঝা কর্তৃক প্রধান দেবতা বা বৌকে তুষ্ট করার দৃশ্য।

থৈ জুমা হীনায় নৃত্যে বা বৌ দেবতার প্রতীক সিজ মনসার বৃক্ষকে আরাধনা করার দৃশ্যটি।

'দাও থুইন্ লৌঙ্ নায়' মোরগ বলি দিয়ে তার রক্ত বাটিতে ধরে বা বৌ দেবতাকে নিবেদনের নৃত্য।

শ্রম ও কর্মভিত্তিক কয়েকটি নৃত্যও তাদের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে। যার মধ্যে 'বিং ফাং বাদারী' অর্থাৎ অরণ্যে কাঠ কাটতে যাবার নৃত্য এবং ধানের ক্ষেতে ধান রোপণের নৃত্য 'মায় গায় নায়' উল্লেখযোগ্য।

প্রকৃতি বিষয়ক নাচের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল গান ডেওলী বৌন্ নায়। এই নাচে প্রজাপতির রঙিন পাখনার আকারে শরীরে দুটি পাখনা বেঁধে নাচা হয়। 'ন্যাওলায়-মৌশানায়' দুটি গো-সাপের যুদ্ধ নৃত্য।

মেচদের বিবাহ-উৎসবের সঙ্গে সম্পর্কিত বৈরাতি নৃত্য চিত্তাকর্ষক ও বর্ণময়। কন্যা (হিনমাত গদান)-কে বরের (হাআ গভান) বাড়িতে নিয়ে আসবার জন্য যে সব বারিকিটাও (ত্রয়োগণ) যান তারা কনের বাড়ি প্রবেশের পূর্বে কনে পক্ষের অনুরোধে এ নৃত্যটি করেন। বিবাহের ভোজের দিনেও বৃদ্ধা মহিলাগণ মৃত শুয়োরের মাথা পিঠে বেঁধে গান গেয়ে নেচে আনন্দ করেন।

এঁদের মধ্যে রণনৃত্যও প্রচলিত আছে। একহাতে ঢাল ও অন্যহাতে খরশান তরবারি নিয়ে যে নৃত্যটি করা হয় তা ঢাল-থুংরী মৌলানায় নামে অভিহিত। দুই হাতে খোলা তরবারি নিয়ে যে যুদ্ধ নৃত্যটি করা হয় তার নাম 'সত্রালী'। এই রণ নৃত্য ১৯৮৩-র প্রজাতন্ত্র দিবস সমারোহে খোয়ার ডাঙ্গার রংজালী বোড়ো কৃষ্টি আকাৎ দেখিয়েছিলেন। যা রসিকদের হৃদয় মথিত করেছিল। দুটি নৃত্যেই অতীত দিনের যুদ্ধরীতি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে দেখানো হয়।

মেচদের সব চাইতে দৃষ্টি নন্দন নৃত্য হল 'বাসুরুম্বা'। এটি বসন্তোৎসবের নৃত্য। নব বসন্ত সমাগমে যুবতী হৃদয়ের উদ্বেলিত অপার আনন্দ লাস্যময় নৃত্য ছন্দে রূপায়িত। এটি সঙ্গীত নির্ভর নৃত্য—সেই সঙ্গীতটি মূল মেচ ভাষায় ও বাংলা রূপান্তরসহ এখানে দেওয়া হল।

মেচ : বা বা বা বাসুরুম্বা ॥
দৈ জিরি জিরি মামু খিংখিরি
সোনানি জিনজিরি হায় জিনজিরি ॥
স্বান লঙা ব্রা জুলি লঙা ব্রা
থাব বৌ রীম হোমনানৈ বামনা নৈ লাগৌমইন
দা আং লাগৌমইন দা ॥
থুরি বারিনি লায় দাওছেন
সো মৌ হৌমীর লানৈ মৌসাদে
হায় রৌং জাদে ॥

বাংলা : এসো সখিরা এসো তালে তালে
ছন্দে ছন্দে সবাই মিলে নাচি।
ছোট ছোট শামুকের মালা যেমন বাজে
স্রোতের দোলায় ঝর্ণায়
নৃত্যের দোলে তেমনি বাজে সোনার হার।
হায় যদি না থাকত কুলের বাধা
তোমায় নিতাম আদর করে কোলে হে সখা।
ওগো তৃণ বনের রঙিন পাখিটি
এসো গো সখা এসো গো সখিরা
আনন্দেতে নাচি সবাই ॥

মেচ নৃত্য 'মৌসানাই'তে হস্তপদ গ্রীবা নয়ন ইত্যাদি আঙ্গিক কর্ম রয়েছে। বৃত্তাকারে ঘুরে ঘুরে গৃহের অঙ্গনে সারারাত ধরে এই নৃত্য চলে।

যে সব বাদ্যযন্ত্র মেচ নৃত্যের আবহ-সুরসঙ্গতি রচনা করে তা হল খোদাই করা কাঠের লম্বা ঢোল 'খামবাং'। বাঁশের ত্রিপুরী ধরনের বাঁশী 'ছিফুং'। তার যন্ত্র সেরজা। তালযন্ত্র যোথা খণ্ডিত বাঁশের চটা 'ওয়া খোলটপ্'। খঞ্জনী 'থাপ্‌ক্রিং' ইত্যাদি।

অন্যান্য রাভা নৃত্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—কর্মভিত্তিক নৃত্য 'হাঙ্গায় সানি'—ধানের বীজ বপনের নৃত্য। নাকচেং রেনি নদী বা ঝোরায় চিংড়ি মাছ ধরার নৃত্য। দুটি নৃত্যেই মেয়েরা অংশগ্রহণ করে। মাছ ধরার নৃত্যে মেয়েরা কোমরে 'খলুই' বেঁধে হাতে জাকৈ নিয়ে জলের মধ্যে মাছ ধরার বাস্তব দৃশ্যটি ছন্দে ও গতিতে রূপদান করেন।



রাজবংশী মুখোশ নাচ

রাজবংশী

জলপাইগুড়ি জেলার রাজবংশী সমাজেও প্রচলিত রয়েছে নানা ধরনের লোকনৃত্য। যার অধিকাংশই ধর্মাচরণ ও সামাজিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কিত। বৈশাখ মাসে মেচনি পুজোয় মহিলাগণ দেবীর উদ্দেশ্যে বরণ নৃত্য করেন। মাগুন তোলার সময়ে ও নদীতে মেচেনি দেবীর ভাসানের সময়ে এই নৃত্য করেন। মহিলা পূজারিণীগণ হাতে তালি দিয়ে পায়ে তাল রেখে বৃত্তাকারে ঘুরে ঘুরে এই নাচটি করেন।

উর্বরতা শক্তির দেবতা মঙ্গল কামের নামে চৈত্রমাসে মদন চতুর্দশীর দিনে ধ্বজা উত্তোলন করে তা নিয়ে বাড়ি বাড়ি মাগুন করা হয়। এই সময়ে যুবকবৃন্দ ঢোল-সানাই-করকার তালে তালে নৃত্য করেন যা ক্রীড়াত্মক, এই নাচে দৈহিক কসরৎ প্রকাশিত। বিষহরি বা পদ্মা রাজবংশী সমাজের প্রধানা দেবী। যাঁর পুজো ব্যতীত কোনো শুভ কাজই সম্পন্ন হয় না। বিষহরি পালাকে তাঁরা বলেন মারৈ গান। এই পালা গানের মাঝেও নানা ধরনের নৃত্য রয়েছে। এই নৃত্য বর্ণনাত্মক। যিনি পালা পরিচালনা করেন সেই 'মূল' চাঁহর (চমর) দুলিয়ে নৃত্য করেন। এতে রয়েছে লক্ষ্মীন্দরের বালক বন্ধুদের জল ক্রীড়ার নৃত্য। রয়েছে বেহুলার সখীদের নৃত্য। যা কৌশল্যা ধামালী নামে পরিচিত।

অনাবৃষ্টি হলে বরুণ দেবতাকে সন্তুষ্ট করার জন্য যে 'হুদুম দেওয়ার পুজো অনুষ্ঠিত হয় তারও নৃত্য রয়েছে। কৃষি সমাজের রমণীগণ গভীর নিশিথে হুদুম পুজোর থানে পোতা একটি কলা গাছকে ঘিরে নাচেন এতে লাস্যের অভিব্যক্তি প্রকাশিত। কার্তিক মাসে অনুষ্ঠিত চোর চুন্নির গানের সঙ্গেও নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়। কার্তিক পুজো যাইটল পুজোরও নাচ রয়েছে যা ব্রত পালনকারিণী করেন। ঢাকের বোলের তালে তালে এই নাচ চলে। রাজবংশী সমাজের অন্যতম উল্লেখযোগ্য হল চৈত্র মাসে অনুষ্ঠিত চড়ক মাগুা বা গমীরা খেলার নৃত্য। এই নৃত্যে দেখানো হয়, শিব-পার্বতী, রাম-লক্ষ্মণ-হনুমান-সীতা, দশানন, মহিরাবন, চণ্ডীর মুখোশ পরিহিত বিভিন্ন দৃশ্যাবলী। মুখা কুশান 'মহি রাবণ বধ পালায়ও বিভিন্ন চরিত্রের মুখোশ নৃত্য দেখানো হয়। ভদ্রকালী বা ধাই চণ্ডীর নৃত্যও উল্লেখযোগ্য। লোল জিহ্বা-কালীর মুখোশ এবং ঘাগড়া পরে একহাতে খড়্গ অন্যহাতে রুধির পাত্র নিয়ে ঢাকের বাজনার তালে তালে উদ্দাম নাচ চলে।

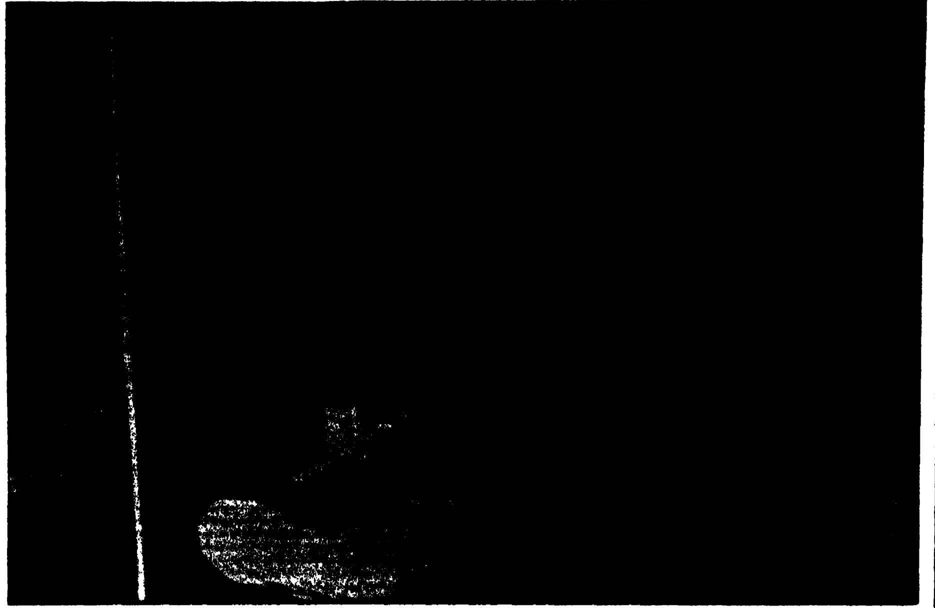
তামাং

জলপাইগুড়ি জেলার কালচিনিতে বাস করেন তামাংগণ। এঁরা বুদ্ধদেবের উপাসক। বৌদ্ধধর্মের মহাযান পন্থার অনুগামী। এঁদের মধ্যে আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ ও ধর্মাচরণের সঙ্গে যুক্ত অনেক ধরনের নৃত্য আছে। যার পরিচয় ব্যাপক নয়। সম্প্রতি কালচিনির তামাং বৌদ্ধদের বেশ কিছু চিত্তাকর্ষক নৃত্য দেখবার সুযোগ হয়েছিল। সেই সব নৃত্যের বর্ণনা এখানে দিলাম। 'বাক্‌পা' ও 'জুম্‌বা' এঁদের বিস্ময়কর মুখোশ নৃত্য এই নৃত্যে এঁরা দেখালেন—অসুর শক্তি মর্ত্য ও পাতাল জয় করে যখন স্বর্গে হানা দিল তখন সন্ত্রস্ত দেবকুল পদ্ম সম্ভব বা দেবাদিদেবের কাছে তাদের দুর্দশার কথা জানালেন তিনি তাঁর অমিত তেজের দ্বারা ত্রিশক্তি ডাক্‌পো, মানিং ও সিংভুম সৃষ্টি করলেন এবং এদের দিয়ে অশুভ শক্তিকে বিনাশ করে সৃষ্টি রক্ষা করলেন। প্রতিটি চরিত্রের জন্য মুখোশ ব্যবহার করা হয়। দেব-দানব ভেদে মুখোশের ধরনও ভিন্ন। জুম্বা নৃত্য অনুষ্ঠিত হয় বুদ্ধ পূর্ণিমার উৎসবের সময়।



তামাং বাক্‌পা নৃত্য

তামাংদের মধ্যেও শব-সৎকারের পূর্বে তাকে ঘিরে নৃত্যের আয়োজন করা হয় এই নৃত্যের নাম 'চোই'। তাদের বিশ্বাস যে রাক্ষসগণ মৃতদেহ ভক্ষণ করার জন্য সদা সচেষ্ট সংহার কর্তা মহেশ্বর বা পদ্ম-সম্ভব যুদ্ধ করে তাদের পরাস্ত করে মৃতকে অক্ষত অবস্থায় স্বর্গে নিয়ে যান। বাক্‌পা, জুম্বা, চৌই মূলত বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ নৃত্য। বিবাহোৎসবের সময় এরা 'ডাম্ফু' নাচের আয়োজন করেন, ফসল উৎসবের নৃত্য বেঁথি বা ধান নাচ এগুলি আষাঢ়-শ্রাবণে ধান রোপণের পর অনুষ্ঠিত হয়।



বর্ণময় লোকসংস্কৃতি : ভাওয়াইয়া গান

তামাংদের বিভিন্ন নৃত্যের সঙ্গে যে সব বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয় তার নাম হল—'ঘ্যাবুক' (পিতলের বড় ঝাঁঝ বা খত্তাল) ঢ্যাংরো (ঢাক) চৌইদর (ডমরু) খুন্দর (হাতীর দাঁতের তৈরি ছোট ডমরু) ঢিলবু (কাঁসার ঘণ্টা) ঘালিঙ (সানাই) কাংলিঙ মানুষের ঠ্যাঙের হাড়ের তৈরি সুশীর যন্ত্র, দুং (পাঞ্চজন্যশঙ্খ) স্থাবা (সানাইয়ের অনুরূপ যন্ত্র)।

নেপালি

নেপালি সম্প্রদায়ের নৃত্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'মারুনী' বা মাদল নৃত্য, দশেরা উপলক্ষে এই নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়। এদের যুদ্ধ নৃত্য 'খুকরী' এতে দেখানো হয় রণযাত্রার প্রাক্কালে বোনেরা ভাইয়েদের কপালে বিজয় তিলক পরিয়ে দিয়ে যুদ্ধে জয়ী হয়ে ফিরে আসার কামনা। 'দেউসী' খেলার নৃত্য অনুষ্ঠিত হয় ভাই ফোঁটার দিনে। বোনেদের হাত থেকে মালা চন্দন পরে ভাইয়েরা হাতে লাঠি নিয়ে আত্মীয়স্বজনের বাড়ি বাড়ি ঘুরে নেচে গেয়ে শুভ কামনা জানায়। এইসব নৃত্যেই যুবক-যুবতীগণ অংশগ্রহণ করেন।

'মুনা-মদন' খ্যাতনামা কবি দেওকোটার কাব্য অবলম্বন করে রচিত প্রণয় মূল ব্যালে ধর্মী নৃত্য-নাটক খুবই জনপ্রিয়। এদের মহাকালী নৃত্যে মুখোশের ব্যবহার রয়েছে। নৃত্যের সঙ্গে যে সব বাদ্যযন্ত্রগুলি বাজে সেগুলি হল ট্যামকা, মাদল, টুংনী, মুচুঙ্গা বিনায়ো দামাহা, ট্যাংরা, চোইদর ক্যামটা কাংলিং।

টোটো

টোটো পাড়ার ক্ষুদ্র উপজাতি টোটোগণ ভাদ্র মাসের শেষ সপ্তাহে মহাকালীর পুজোর আয়োজন করেন। যাকে তারা 'মায়ু' উৎসব বলে থাকেন। সেই সময় তারা পুজোর মন্ত্রের সঙ্গে নাচেন মেয়েরা এক সারে ও পুরুষেরা আরেক সারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নাচেন বাইরের বিভিন্ন মঞ্চে তাঁরা যে নৃত্যানুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন তাতে টোটো মেয়েদের অংশ নিতে দেখা যায়নি। পুরুষেরা হাতে তালি দিয়ে পা গানের তালে তালে মাটিতে ফেলে বৃত্তাকারে ঘুরে ঘুরে নাচেন। এই নৃত্যে রয়েছে আদিম ছন্দ। এরা নৃত্যের সঙ্গে কোনোরকম বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করেন না।

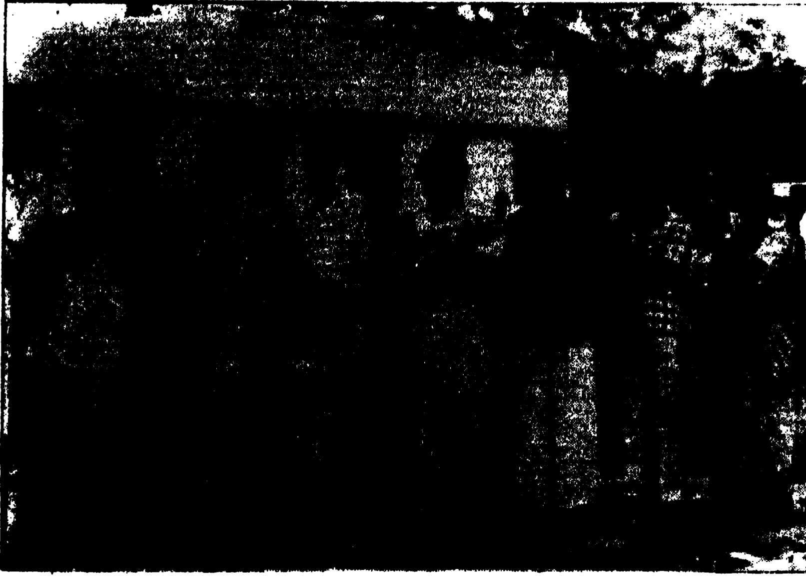
ডুক্‌পা

বকসা পাহাড়ের আদিবাসী ডুক্‌পা। যাঁরা বৃহত্তর জনসমাজে আজও অপরিচিত। সব মিলিয়ে এদের সংখ্যা শ' পাঁচেক কমলালেবু বাগানের শ্রমিকরূপে জীবিকা নির্বাহ করেন। এঁদের সমাজেও বেশ কিছু মনোহর নৃত্য রয়েছে। এঁদের বিবাহ উৎসবের দৃষ্টি নন্দন নৃত্যটির নাম 'চে নামফা ডা সা থেমে' কৃষি বা শস্য উৎসবের নৃত্যটির নাম 'কে সন্‌লা'। এঁদের নববর্ষ লোসার উৎসবের নৃত্যটির নাম 'আউসালে'। এঁদের ভাষায় নৃত্য হল 'সেক্‌টা'। প্রতিটি নৃত্যে যুবক-যুবতীগণ অংশগ্রহণ করেন। কোনো বাদ্যযন্ত্র নেই। সমবেত কণ্ঠ সঙ্গীতের তালে ধীর লয়ে নৃত্য করতে এরা অভ্যস্ত।

গারো

জলপাইগুড়ি জেলার গারো আদিবাসীদের মধ্যেও বিভিন্ন রীতির নৃত্য রয়েছে। পুজো-পার্বণ ও ফসল উৎসবে এঁরা নৃত্য গীতের আয়োজন করেন। এঁদের ফসল উৎসবের নৃত্য 'ওয়াংগাল্লা' বিখ্যাত। ক্ষেত্রপাল দেবতা 'মিচি সা ফং'-এর পুজোর সময়ে কার্তিক মাসে অনুষ্ঠিত হয়। সমগ্র গারো গ্রামগুলি এই অনুষ্ঠানে নৃত্য ও গীতে মেতে ওঠে। গারোদের যুদ্ধ নৃত্যের নাম 'গ্রিকা'। পুরুষগণ এই নৃত্যে অংশগ্রহণ করেন। একহাতে 'মিলাম' (তরবারি) ও অন্যহাতে 'সেপি' (ঢাল) থাকে। এঁদের ধান রোপণের নৃত্যের নাম 'মায় গেয়া' ও ধান কাটার নৃত্যের নাম 'মায় সুয়া' এবং অন্যান্য শস্য আহরণের নৃত্যের নাম 'ছাম্‌চিল মোয়া'।

জলপাইগুড়ি জেলার বৈচিত্র্যে ও বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত এইসব লোক নৃত্যগুলি শুধুমাত্র জেলান্তরেই আবদ্ধ নেই সর্ব ভারতীয় লোকনৃত্য উৎসবের আঙিনাতেও সমাদৃত। জলপাইগুড়ি জেলার মঙ্গলয়েড আদিবাসী বড়ো-মেচ এবং রাভাদের মধ্যেও ঐতিহ্যবাহী লোকসঙ্গীত রয়েছে। যেগুলি তারা দীর্ঘকাল ধরে পরম্পরাগতভাবে চর্চা করে চলেছেন। বড়ো-মেচগণ তাদের সঙ্গীতকে বলেন মেথায়। মেচদের জীবনের বৃন্তটিতে ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে সঙ্গীত। এগুলি



ভাওয়াইয়া লোকগীতির দল

নীং থাঙাব্রা নীং কেয়া ব্রা
হাবা মানখিফ্রা দুখু মীনী লৈ
আবৈ দুখু মীনী লৈ
ওই শিয়ালী শিয়ালী ॥

বাংলা রূপান্তর :

ওগো শিয়ালী নামের বৈরাতি
তুমি সবার বিয়েতে এয়োর কাজ কর
তুমি না এলে, তুমি না থাকলে
বিয়ের উৎসব যে জমে না ॥
বিয়ের ভোজের পান সুপারি
খিরাই পুজোর পান সুপারি
কোথায় রাখলে?
বিয়ের উৎসবে তুমি না এলে
সবার মনই বেদনায় ভ'রে ওঠে ॥

বৈশাগু বা নববর্ষ বরণের উৎসব মেচ জন গোষ্ঠীর এক প্রধান ঋতু উৎসব। এই উৎসবে সমগ্র মেচ পল্লীর যুবক-যুবতীগণ নৃত্য গীতে মেতে ওঠেন। এটি যেমন জলপাইগুড়ি জেলার ক্ষেত্রে তেমনি নিম্ন ব্রহ্মপুত্র এলাকার বড়োদের ক্ষেত্রেও এক সাড়া জাগানো সামাজিক উৎসব। সারা বছর ধরে এই ঋতু উৎসবটির জন্য প্রতীক্ষা করে যুবক-যুবতীগণ। এ উৎসবের আনন্দ সবার মনে ছড়িয়ে দিতে যুবক-যুবতীগণ গান গেয়ে নেচে পল্লী পরিক্রমা করেন। এর সঙ্গে রঙ্গালী বিহুর বড়ই সাদৃশ্য রয়েছে. বৈশাগু উৎসবকে মানব ও প্রকৃতির উর্বরতার অনুষ্ঠান বলে বিশেষজ্ঞগণ মত প্রকাশ করেছেন।

গীত হয় বিবাহ-উৎসবে, ঋতু উৎসবে, ফসল কাটার উৎসবে, দেব-দেবীর পুজো পার্বণে, সামুদায়িক শিকার উৎসবে গানগুলিকে মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—পূজা, প্রকৃতি, প্রেম ও কর্ম।

অন্য আদিবাসীদের সঙ্গীত রীতির মতোই মেচ সঙ্গীতগুলি সম্মেলক সুরে গীত হয়। তার সঙ্গে নৃত্যও সংযুক্ত, অর্থাৎ সংগীত ও নৃত্য পরস্পরের সম্পূরক। বর্তমানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নৃত্য ব্যতীত একক মেচ সঙ্গীতও গীত হতে দেখা যায়। কিন্তু এদের কৌম রীতি হল সামূহিক বা বৃন্দ গাওয়া।

মেচ সঙ্গীতের গায়নও সুরের যে বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য রয়েছে, তা হল তুলনামূলকভাবে পঞ্চস্বরে আবদ্ধ এই ঠাটকে অবলম্বন করে সুরের আরোহণ বা অবরোহণ ঘটে। যাঁরা এ গান শুনেছেন তাঁরা নিশ্চিতভাবেই অনুভব করেছেন—এ গানের সুরের আবেদন সোজাসুজি অন্তরকে ছুঁয়ে যায়। সেই হৃদয়স্পর্শী সংবেদন সংহত সমাজের সঙ্গীতে একেবারেই অনুপস্থিত।

প্রথমেই এদের সমাজের বিবাহোৎসবের সঙ্গে যুক্ত সঙ্গীতের উদাহরণ দিলাম। —এঁরা বিবাহকে বলেন 'হাবা' 'গাঁদান জুলি'। এই গানগুলিকে বলা হয় হাবা মেথায় গানগুলি গাওয়া হয় বৌভাতের উৎসবে। এগুলির মধ্যে নির্মল রঙ্গ-কৌতুকের পরিপ্রকাশ ঘটে। কন্যা পক্ষ ও বর পক্ষের আত্মীয়স্বজন পরস্পর পরস্পরের প্রতি গানের মাধ্যমে ঠাট্টা করার ছল খোঁজে। বিশেষ করে কিছু কিছু আচরণ প্রিয় পানীয় 'জৌ' বা সুরার বিষয় হয়ে ওঠে।

এখানে উদাহরণ রূপে বিয়ের গান সন্নিবেশিত হল মূল মেচ ভাষায় এবং তার বাংলা রূপান্তর সহ।

ওই শিয়ালী শিয়ালী
হারা জেংলাবনি বৈরাতি
নৌং নঙাব্লা হাবা জায়া নৈ
আবৈ—জায়া লৈ।
হাবা জানায়নি, খেরায় জানায়নি
ডায় ফাইতয়া বোহা থাং খৈ লৈ
আবৈ বোহায় থাংখৈ লৈ ॥

বৈশাগু উৎসবে গীত গানের কথা উল্লেখ করা হল :

মেচ :
নৈ ফৈলায় রায় সৈফেলায় রায়
বৈশাগু বী থাঁরা সকৈ লায় বায়
বাগরুম বাগরুম মীসাদাঁলায়
দাগরুম দা দা দাগরুম দা
খাম রিংখাং নাইযাও
টিং টো টিং টো যথানি ভেং খীয়াও
রৌংজানায় বী থাঁবা সফেলায় বায়
দে মীসাল দে রীংজা ছে
বাগরুম বাগরুম মীসাদে
বৈশাগু বীথাঁরাও জাঁইলাও সিখলা রোংজা দে।

বাংলা :
ঐ এল যে এসেই গেল
নতুন বছর বৈশাখের নতুন দিন।
আনন্দে মাতোরে নৃত্যের ছন্দের হিন্দোলে
এল বৈশাগু উৎসবের দিন
ঢোল-করতালের বোলে
মাতো নৃত্যে সঙ্গীতে
মাতোরে যুবক, মাতোরে যুবতী
আনন্দ ঘন নৃত্য ও সঙ্গীতে।

রাভা আদিবাসীদের উৎসব পুজো পার্বণ ফসলকাটা, মৃতদেহ সংকার শিকার বিবাহ উৎসব ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে নানা ধরনের গান রয়েছে রাভাগণ গানকে বলেন 'চা-অ'। এদেরও বিহু বা

বসন্তোৎসব আনন্দ মুখর হয়ে ওঠে নৃত্য ও সঙ্গীতে। একটি বিহু গানের পদ—

রাভা বসর পিদান দিনিয়ায়
বাস মাতানি হাপাগায়
রমক-জমক চাক পিদান
পার পিদান এমান মাগাপউ হাসংযায়
এমান চৈইয়া তাঙাতউ
গেলেই গেলেই পতক তাঙি
যাহারাঙি পাঞ্চাক
চৌচাক পুইমইন উলুঙ হালাঙ
এমান মাগামা হাসংযায়
এমন নতম তোয়া।

বাংলা রূপান্তর

নব বসন্তে ধরণী উতলা হল
বনে বনে রঙিন ফুল
গাছে গাছে নতুন পাতা
এমন দিনে ঘরে কে থাকে
আত্মহারা আনন্দে
আকাশ জুড়ে উড়ছে পাখি
উৎসব মুখর এ বসন্তে
এসো আমরাও মেতে উঠি ॥

'কমিউনিটি ফিসিং' সামূহিক মৎস্য শিকার আদিবাসীদের এক প্রিয় বিষয়, রাভারাও তা করেন। এ বিষয়ে এদেরও গান রয়েছে, সেটি দেওয়া হল—

ফৈ লগৌ ফৈ না রেতিয়া
বসর পিদান দিনিযায়
চিকা পিদানায়
লগৌ না গৌর না
হাসাম নইকচা চিকাওয়ায়
লগৌ না গৌর না
কুরুয়া বা ক্রুঙাইতা
মাসা লাংকা পুইমইন
না সানি লামাইতারে
ইবাই মানচা হওয়াই মানা
ফৈ লগৌ না গুর না ॥

বাংলা রূপান্তর

চল মাছ ধরি গিয়ে
নতুন বছরের নতুন জলে
ছাপিয়ে গিয়েছে নদীর কূল
জল থৈ থৈ মাঠ ঘাট
কুরুয়া পাখি উড়ে উড়ে কাঁদছে
বকেরা উড়ছে সার বেঁধে
মাছরাঙা বার বার ছোঁ মেরেও
পায়নি মাছ সে কি খাবে
এদিকে মাছ নেই ত ওদিকে চল্ ॥

রাভাদের প্রধানা দেবী 'জগ' ও দেবতা ঋিষি তার আরাধনার জন্য যে গানটি গাওয়া হয় তা হল—

রাভার : ই আমায় জগ ঋষি, জগ ঋষি
কোচানি আমায় তাংগাম
আওয়া তাংগাম নাঙি জগ
লাওয়া লাওয়া আমায় নানা কেটাও দিনাও
চকত আভং লাওয়া আমায় জগ
বাপান কারান লেয়া রইন
যা যিমি মাক্সা মাকপর
এরায় নিসিনা আমায় জগ
না চিনা লৈয়া রৈন
যা যিমি চং ফুক এরায় নিগি না ॥

রূপান্তর :

ওগো জননী জগ তুমি আমাদের প্রধান দেবী
ওগো পিতা ঋষি তুমি আমাদের প্রধান দেবতা।
নম্রনত প্রণাম নাও
আপদ-বিপদে আগলে রেখো।
হে জননী জগ, হে পিতা ঋষি
তোমাদের বন্দনা করি
পূত পবিত্র 'চকত' দিয়ে
অরণ্যের হিংস্র শ্বাপদ থেকে রক্ষা কোরো
জলায় কিম্বা বনে শিকারে গেলে
বিষাক্ত পোকা মাকড়ের হাত থেকে রক্ষা কোরো।

বর্ণময় লোকসংস্কৃতি : জৈওগীত

জেলার ক্ষুদ্র আদিবাসী গোষ্ঠী টোটোদের কয়েকটি গান রয়েছে, যে খুবই সহজ ও সরল। তার কটি নমুনা দেওয়া গেল বাংলা রূপান্তর সহ।

(১) পেলা হো পেলা হো
ইয়াচে গুঙে তেপু তেলায়া
চে দো ঙাতা সা সু ইংবা
পেলা হো।

দেবতা সূর্য উদিত হয়েছেন, অন্ধকার দূর হল সকালের এই আলোকের দেবতাকে দেখে আমরা আনন্দিত।

(২) পেলা হো পেলা হো
সোইসা ঙাতা চেমু ইংবা
পেলা হো পেলা হে ॥

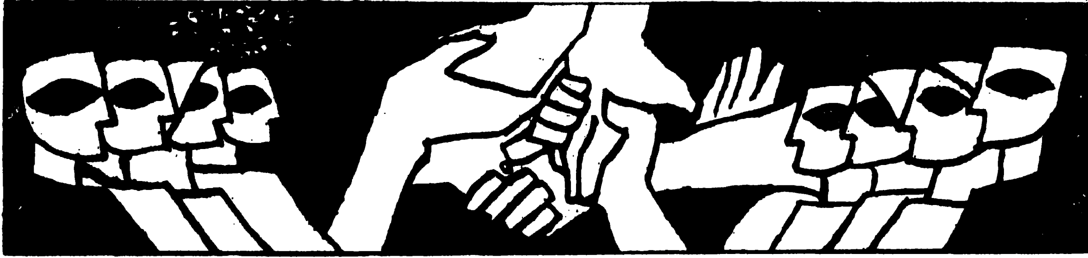
পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় ধরিত্রী পুলকে উছলে উঠেছে। আলোকিত অরণ্যে জীব-জন্তুগুলিও আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

(৩) পেলা হো পেলা হো
তামু নাং তুই কমু ইংবা
পেলা হো পেলা হো ॥

চাঁদের আলোয় বন থেকে বাঘ বেরিয়েছে ভেবেছিল লুকিয়ে আসবে, তা হল না ; আমরা তাকে দেখে ফেলেছি।

পরিশেষে বলা যেতে পারে গানগুলির মধ্যে দিয়ে সরল আদিবাসীদের জীবনচর্চা ও তাদের বেদনা-তাদের আনন্দের অভিব্যক্তি পরিপ্রকাশিত।

লেখক ❑ বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতির গবেষক ও প্রাবন্ধিক।



সুশান্ত নিয়োগী

জলপাইগুড়ি জেলার প্রগতি-সংস্কৃতির ধারা

প্রান্ত-উত্তরবাংলার ক্ষুদ্র ভারতবর্ষপ্রতিম জেলা জলপাইগুড়ির আনুষ্ঠানিকভাবে প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠার বছর ১৮৬৯। তারও পূর্বে ইতিহাসের নানা টানাপোড়েনের ঘটনার সাক্ষী এ জনপদ। জনসমাজের নানা মিশ্রণ সভ্যতার রূপান্তরেরই অংশ। অরণ্য নদী সঙ্কুলিত প্রায়-দুর্গম জলপাইগুড়ির জনসমাজে তা সত্ত্বেও এক বদ্ধতা ছিল। তা পরিবর্তিত হতে থাকে জেলায় চা-বাগিচার পত্তন ও বিস্তৃতির মধ্য দিয়ে। বিহারের ছোটনাগপুর অঞ্চল থেকে আগত আদিবাসী জনগোষ্ঠী হয়ে ওঠে এ জেলার চা-শ্রমিক-প্রধান শ্রমগোষ্ঠী। কৃষিগোষ্ঠীর মুখ্য অংশ ছিল রাজবংশী জনসম্প্রদায়। জেলার আরও প্রধান জনগোষ্ঠী—মেচ, রাভা, টোটো, নেপালি ও আরও ছোট ছোট সম্প্রদায়। এই সব জনগোষ্ঠীর জীবনযাপনের বাস্তবতা, অর্জিত লোকায়ত বিশ্বাস, ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তিতে নিজ নিজ সমাজে লোকসংস্কৃতিচর্চার ভেতর নানা উপাদান ছিল। মালিকের শোষণ-অত্যাচার, জমিদারের নিষ্পেষণ ব্রিটিশের অধীনতার বিরুদ্ধে নিজ নিজ জীবনচর্চার রক্ত-ঘামে প্রতিবাদের ভাষা ছিল তাঁদের সংস্কৃতিচর্চায়। আজকের প্রগতিশীল সংস্কৃতিচর্চার গতিধারার আধুনিকতায় সেই সব উপাদানকে গণ্য করেই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিত রচনা প্রয়োজন।

জেলায় চা-বাগানের বিস্তারকে কেন্দ্র করেই ব্রিটিশ শাসনাধীন জলপাইগুড়ি শহরের গড়ে ওঠা। চা-বাগান আর জেলা প্রশাসনের স্বার্থে আগত শিক্ষিত, স্বল্পশিক্ষিত কেরানি, উকিল, চা-কর, শিক্ষক, সরকারি কর্মচারী, ডাক্তারদের নিয়ে গড়ে ওঠে শহরের মধ্যবিত্ত সমাজ। এ সমাজের বড় অংশই ব্রিটিশ চা-করদের অনুগ্রহপুষ্ট ও আনুকূল্যভোগী। এঁদের জাতীয়তাবাদী চেতনার মধ্যে ব্রিটিশের প্রতি এক নির্বিবাদী মানসিকতার প্রতিফলন ঘটেছিল। জলপাইগুড়ির শহর সংস্কৃতির মূলকেন্দ্র 'আর্যনাট্যসমাজ'—সমাজের উপরিভাগের এই বাবুশ্রেণীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯০৪ সালে। তারও আগে ১৮৯৭ সালে প্রয়াত শশীকুমার নিয়োগীর প্রচেষ্টায় প্রয়াত বলাই লাহিড়ীর বাড়ির প্রাঙ্গণে 'বিল্বমঙ্গল' নাটক মঞ্চস্থ

হয়েছিল, যাকে আর্যনাট্য সমাজ প্রতিষ্ঠার সূত্রবীজ বলা যায়। আর্যনাট্যসমাজের চরিত্র ছিল সমাজের স্থিতাবস্থার মধ্যে বিনোদনমূলক সংস্কৃতিচর্চা। ১৯১১-তে ময়নাগুড়িতে স্থাপিত হয় 'হরেন্দ্র হল ও ড্রামাটিক ক্লাব'। ১৯২৪ সালে জলপাইগুড়ি শহরে বান্ধব নাট্যসমাজের প্রতিষ্ঠা। এভাবে জলপাইগুড়ির নাগরিক সংস্কৃতির বিকাশপর্ব শুরু।

ইতিহাসে যেভাবে সূত্রায়িত হয়নি, কিন্তু বলা যায় জলপাইগুড়ির সামাজিক-সাংস্কৃতিক স্তরে প্রগতির সূত্রপাত শহরে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা ও তাঁদের প্রবর্তিত 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন'-এর মাধ্যমে। শহরে আর্যনাট্যসমাজের পৌরাণিক নাট্যধারার পাশাপাশি রবীন্দ্র-নাটক প্রযোজন করেছিলেন প্রথম ব্রাহ্মরাই। বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠা, নারীশিক্ষার প্রচলন ও প্রসার, গ্রন্থাগার স্থাপন ও নানাবিধ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ব্রাহ্মসমাজ শহরে প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক পরিবেশ কিছুটা তৈরি করে দিয়েছিল।

জলপাইগুড়ির সামাজিক-সাংস্কৃতিক স্তরে প্রগতির সূত্রপাত শহরে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা ও তাঁদের প্রবর্তিত 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন'-এর মাধ্যমে। শহরে আর্যনাট্যসমাজের পৌরাণিক নাট্যধারার পাশাপাশি রবীন্দ্রনাটক প্রযোজন করেছিলেন প্রথম ব্রাহ্মরাই। বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠা, নারীশিক্ষার প্রচলন ও প্রসার, গ্রন্থাগার স্থাপন ও নানাবিধ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ব্রাহ্মসমাজ শহরে প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক পরিবেশ কিছুটা তৈরি করে দিয়েছিল।

সচেতন, সংগঠিতভাবে রাজনৈতিক দর্শনের আলোকে জেলায় প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক কাজকর্ম একটা আন্দোলনের মতো করে শুরু হয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠার পর থেকে। যাঁরা ছিলেন জেলায় কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা, তাঁরা প্রায় সকলেই কংগ্রেসের অভ্যন্তরে বামপন্থার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছিলেন। এ কারণে, কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে ওঠার আগেই নরেশ চক্রবর্তীর উদ্যোগে গঠিত হয়েছিল ইয়ং কালাচারাল অ্যাসোসিয়েশন। পরবর্তীতে যাকে গণনাট্য সংঘের বীজভূমি বলা যেতে পারে। তিরিশের দশকের শেষ দিক থেকে জেলায় কৃষক আন্দোলন গড়ে ওঠে। কৃষকসমাজে আলোড়নের পাশাপাশি শহরের মধ্যবিত্ত সমাজও চঞ্চলিত হল। সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে শ্রমজীবী মানুষ, কৃষকসংগ্রামের ছায়া প্রলম্বিত হল। ১৯৪৩-এ জেলায় গণনাট্য সংঘ তৈরি হয়ে যায়। তারও আগে মন্বন্তর-দুর্ভিক্ষের অশনি-দুর্যোগে আলোড়িত শিল্পী-সমাজ সংগঠিতভাবে পথে নামেন। গোপেন রায়, রেবা রায়চৌধুরী, সজল রায়চৌধুরীরা জলপাইগুড়িতে আসেন। বান্ধব নাট্যসমাজে অভিনীত হল 'ম্যায় ভুখা হুঁ"।

দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের ত্রাণের জন্য অর্থ সংগৃহীত হয়েছিল এই নাটকের মাধ্যমে। নাটকটি বেশ কয়েকটি জায়গায় অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

১৯৪৬-৪৭ সালে জলপাইগুড়ি জেলায় তেভাগা আন্দোলন গড়ে ওঠে। কৃষকসমাজের এই আন্দোলনের নেপথ্য শক্তি ছিল কমিউনিস্ট পার্টি। সংগঠকরা ছিলেন ডাঃ শচীন দাশগুপ্ত, গুরুদাস রায়, মাধব দত্ত, মনোরঞ্জন দাশগুপ্ত প্রমুখ। তেভাগার ফসল-সংগ্রাম জেলার হিন্দু-মুসলিম কৃষক সম্প্রদায়, যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই ছিলেন রাজবংশী সম্প্রদায়ের, সম্মিলিতভাবে আন্দোলনে সামিল হয়েছিল। সমাজের সাংস্কৃতিক চেতনা নির্মাণে এই আন্দোলনের একটা বড় প্রভাব ছিল। জলপাইগুড়ি জেলার ক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয়টি ছিল, তেভাগার কৃষক আন্দোলনের উত্তাপে ডুয়ার্সের রেলশ্রমিক আন্দোলন, চা-বাগিচার শ্রমিক আন্দোলনেও গতিবেগ। আদিবাসী শ্রমিকও তেভাগা আন্দোলনকে শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনে পরিণত করলেন। যা ইতিহাসে এক অনন্য ঘটনা। রাজবংশী কৃষক আদিবাসী শ্রমিক আন্দোলনে আত্মাহুতি দিয়ে তেভাগার শহিদ হলেন। এ ঘটনা কৃষকসমাজকে যেমন আলোড়িত করেছিল, প্রত্যন্ত চা-বাগানের চা-শ্রমিককেও আলোড়িত করেছিল। কালে কালে ১৯৪৭-এ দেশ স্বাধীনতা অর্জন করল। কিন্তু মানুষের সংগ্রাম, স্বপ্ন, আশা অপূর্ণ থেকে গেল। শোষিত-বঞ্চিতরা বঞ্চনার প্রান্তসীমাতেই রয়ে গেলেন। এ সময় ডুয়ার্সে মাদরী ভাষার লোক-কবি লালশুকরা ওঁরাও লিখলেন সাড়া জাগানো গান :

মালবাজার আনা যানা
মাটিয়ালী থানা রে
সুনা ভাই—স্বাধীন দেশ কা গানা রে।
এক বিতা পেটের লিগিন
গিলি জেলখানা রে
সুনা ভাই—স্বাধীন দেশ কা গানা রে।

সংস্কৃতিকর্মীর গলায়-গলায় কমিউনিস্ট পার্টির সভা-সমাবেশে এ গান মানুষকে জাগ্রত করল ডুয়ার্সের প্রান্তর-ময়দানে। শহরে গণনাট্য কর্মীরা শিল্পের নানাবিধ উপাচারে সজ্জিত হয়ে নাটক-গান নিয়ে ঢেউ তুললেন মধ্যবিত্ত জনমানসে। সে সময় গণনাট্যের অগ্রগণ্য কর্মীবাহিনীর মধ্যে ছিলেন তিনা চক্রবর্তী, তারাপদ ব্যানার্জি, গণেশ রায়, শশাঙ্কশেখর বসু, সতী বসু, রাধানাথ দাশ, কল্পনা নিয়োগী, কালিদাস সরকার, পরিতোষ দত্ত, ফটিক চ্যাটার্জি, প্রফুল্ল চক্রবর্তী, মেনকা ঘোষ, পুষ্পিতা দাশগুপ্ত, টুলকু চৌধুরী, সত্যেন রায়, প্রাণহরি করঞ্জাই, মাধু বিশ্বাস, মতিয়ার রহমান, সারদা চক্রবর্তী, প্রভাত দাশগুপ্ত, আরও অনেক নিষ্ঠাতাড়িত সতত সংগ্রামী কর্মী। গণনাট্য প্রযোজিত ও অভিনীত উল্লেখযোগ্য নাটক—



রাভা সম্প্রদায়ের মুখোশ নৃত্য

রাহুমুক্ত, বিসর্জন, দুঃখীর ইমান, বিদ্রোহী চার্বাক, অরুণোদয়ের পথে, বিচার, ছেঁড়াতার, নবান্ন, সূর্যশিকার, ছোটবকুলপুরের যাত্রী ইত্যাদি।

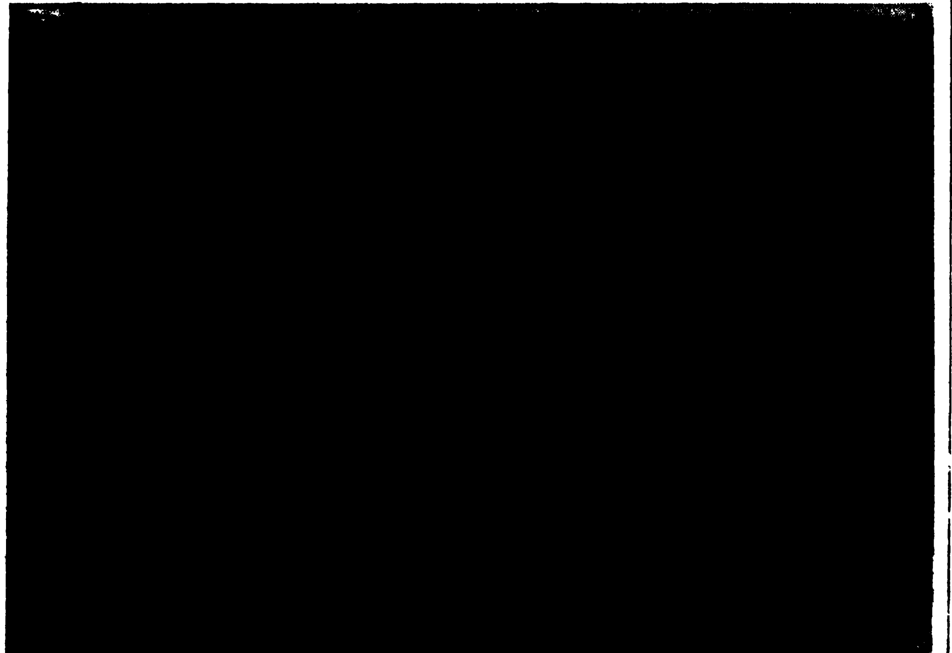
গণনাট্য সংঘের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন মধ্যবিত্ত নাগরিক সমাজে প্রগতিচেতনা প্রজ্বলিত হল, সাম্যবাদী ভাবাদর্শে সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলনে জনসমর্থন বাড়ল, অন্যদিকে নিছক বিনোদনের জন্য সংস্কৃতিচর্চার মঞ্চের কর্মীরাও গণনাট্য সংঘের শুভবোধে আকৃষ্ট হলেন, অংশগ্রহণ করলেন, যদিও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যবধান থেকে গিয়েছিল।

প্রগতিসংস্কৃতির আন্দোলনে গণনাট্য সংঘ লোকসংস্কৃতির মাধ্যমগুলি ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয়েছিল। আবার লোকসংস্কৃতির গ্রামীণ শিল্পীরাও নিজে নিজের মতো করে সমাজের অসাম্য, শোষিতের ক্ষোভ, শোষকের ক্রূরতাকে সমকালীন সমাজ বাস্তবতার নিরিখে গ্রামীণ লোকগান, পালাটিয়া—এসবের মধ্যে প্রতিফলিত করতে পেরেছিলেন। রাজবংশী শিল্পী সত্যেন রায় গণনাট্যর মধ্যে থেকে সরকারি কর্মচারী হয়েও লিখেছিলেন :

"তোমরা হলেন দ্যাশের নেতা গান্ধী অবতার
তোমাক্ বুঝায় বড় ভার।
তোমরা ভাইলে ভাতে নিজে খান
হামাক্ উপাস করির কন
খাবার চালে সেলায় দ্যাছেন
তোমরা নাঠির গুতা।"

আফ্রিকার কবি ও নেতা প্যাট্রিস লুমুম্বাকে সাম্রাজ্যবাদীদের হত্যা, আবার বঙ্গ-বিহার সংযুক্তিকরণের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধেও গণনাট্য সংঘ সাংস্কৃতিকভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। আবার ভারতীয় মার্গসংগীতকে অনুধাবন করার জন্য, ভারতের সাংগীতিক ঐতিহ্যকে বুঝবার জন্য গণনাট্য সংঘ ওস্তাদ ফয়েজ খাঁ আর বি ডি পালুসকরের জন্মদিবস অনুষ্ঠানও করেছিল। জলপাইগুড়ির নাট্য-ঐতিহ্যে গণনাট্য-র অন্যতম বড় অবদান ছিল সমাজকুলপতিদের বাধা উপেক্ষা করে মঞ্চে নারীকে অভিনয়ের সুযোগ করে দেওয়া। আবার গণেশচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে গ্রাম-গ্রামাঞ্চলে আবৃত্তিকে অন্যতম সাংস্কৃতিক হাতিয়ার করে মানুষের কাছে পৌঁছানোর প্রয়াস ছিল। তাঁরই প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় মঞ্চনাটকে আধুনিক ভাবনার প্রকাশ ঘটিয়েছিল গণনাট্য কর্মীরা। পরবর্তীতে সত্যেন রায় ছায়ানাট্যের মতো সৃজনশীল মাধ্যমকে ব্যবহার করে, নৃত্যনাট্য, সংগীত আলেখ্যর মতো অনেক উল্লেখনীয় কাজ করেছিলেন। আবার ১৯৫২-তে গয়েরকাটায় চা-শ্রমিকদের নাট্যাভিনয়ের তথ্যও গণনাট্যসূত্রে আমরা পাই। শ্রেণীসংগ্রামকে বিকশিত করার লক্ষ্যে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে প্রগতিচেতনা নির্মাণের এক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে গণনাট্য তখন জেলায় গড়ে তুলেছিল প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল। গড়ে তুলেছিল আন্তর্জাতিকতাবোধ।

কালের যাত্রার গতিধারায় যে কোনও আন্দোলনই একসময় মন্থর-গতি হয়ে পড়ে। গণনাট্যও ব্যতিক্রম ছিল না। পঞ্চাশের



জলপাইগুড়ি জেলার ভাওয়াইয়া নৃত্যের দৃশ্য

জেলায় প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের একটা বড় দুর্বলতা ছিল, নানা ভাষা ও জনজাতি গোষ্ঠীর মানুষরা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের একটা বড় শক্তি হয়েও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের শহুরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও নাগরিক অংশের সঙ্গে গ্রামীণ লোকশিল্পীদের সাংস্কৃতিক চর্চার একটা বড় ব্যবধান। আদান-প্রদানের অভাব। লোকসংস্কৃতির চিরায়ত ও গোষ্ঠীগত ভাবনার ভেতর চলমান জীবনের প্রাণসঞ্চার, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অংশ হয়ে উঠবার ভাবনা সঞ্চার হয়ে দাঁড়াল গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের প্রধান কাজ। জেলার সমস্ত সম্প্রদায়ের শিল্পীরা—রাজবংশী, আদিবাসী, মেচ, রাভা, নেপালি, টোটো সবাই আজ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের অংশ, কর্মী ও নেতৃত্ব।

দশকের একটা পর্বে কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরীণ নানা দুর্বলতা, মতভেদ, বিভ্রান্তির প্রভাব গণনাট্যের ওপর পড়ল। কিন্তু গণনাট্য যে পরিবেশ সাংস্কৃতিক জগতে, মানুষের ভাবনা-চিন্তা-চেতনার মধ্যে নির্মাণ করে দিয়েছিল, তার একটা প্রভাব তো থাকলই। যার প্রকাশ আমরা দেখলাম শহরের সাহিত্য ও পত্র-পত্রিকার জগতে। শহরে কমিউনিস্ট ও প্রগতিপন্থী সংস্কৃতিকর্মীদের আলোচনা ও শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার জন্য শহরে গড়ে উঠল সাহিত্যের আড্ডা। পি ডব্লিউ ডি আফিসের মেস, বাবুপাড়ার প্রমদা ফার্মেসি, আবার কখনও দৈলা (গণেশ) রায়ের বাড়িতে গড়ে ওঠা এই সাহিত্য আড্ডার পোশাকি নাম ছিল 'রূপায়ণ'। সেখানে আড্ডার সব উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বরা ছিলেন দেবেশ রায়, সুরজিৎ দাশগুপ্ত, কার্তিক লাহিড়ী, রণজিৎ দাশগুপ্ত, তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিতাভ দাশগুপ্ত, অর্ণব সেন, শক্তিনাথ ঝা, ল্যাডলী রায়, সুভাশিস গুপ্ত, সুরজিৎ বসু, সমীর চক্রবর্তী, মানিক সান্যাল ও আরও অনেকে।

'পরিচয়' পত্রিকার লেখালেখি নিয়ে সে-সব আড্ডায় তুমুল তর্ক আলোচনা সমালোচনা চলত প্রাণের উত্তাপে। ক্রমে প্রকাশিত হয় সাহিত্য পত্রিকা "জলার্ক"। যাকে জলপাইগুড়ির প্রগতিবাদী সমাজমনস্ক সাহিত্যভাবনার পত্রিকার জগতে মাইলস্টোন বলা যেতে পারে। কালে কালে ক্ষণজীবী অনেক পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে—উত্তরবাংলা, উত্তরাশা, নিরপেক্ষ, উত্তরদেশ ও আরও বেশ কয়েকটি। আবার বাবুপাড়া পাঠাগারকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে পাঠাগারের নিজস্ব নাট্যদল। যাদের অভিনীত 'নীল রঙের ঘোড়া', 'চোখের আলো'—বাংলা নাটকের জগতে এক অনন্য অধ্যায়।

পঞ্চাশের দশকের শেষ পর্ব থেকে বাংলার মধ্যবিত্ত সমাজ নানা আন্দোলনে আন্দোলিত হতে থাকে। তার তরঙ্গস্পর্শে মথিত থাকে জলপাইগুড়ির শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ। কমিউনিস্ট পার্টির পাশাপাশি গড়ে উঠেছিল ফরোয়ার্ড ব্লক, আর এস পি সোস্যালিস্ট পার্টি। দেশভাগ। উদ্বাস্তুর জনস্রোত, স্বাধীনতার অপূর্ণতা—এইসব নানা ক্ষোভ, পুঞ্জীভূত ব্যথা আর প্রতিবাদের স্পৃহা—এই নিয়ে নানা আন্দোলনে উত্তাল নগর-শহর-গ্রাম। উদ্বাস্তুদের আন্দোলন, খাদ্য আন্দোলন, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন-ধর্মঘট, শিক্ষক আন্দোলন, চা-বাগানে বাবুদের আন্দোলনের উত্তাপ-আগুনে সংস্কৃতির জগৎ, ছাত্রজগৎ আবেগে চঞ্চল। আনন্দচন্দ্র কলেজ, পি ডি কলেজ, পলিটেকনিক—সর্বত্র ছাত্র ফেডারেশনের যৌবন জলতরঙ্গের বিজয়নির্ঘোষ। এইসব আলোড়নের তুমুল প্রতিফলন ঘটেছিল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি নাটকের ক্ষেত্রে আকৃষ্ট হয়ে সৃজনশীল তৎপরতা। আনন্দচন্দ্র কলেজের ছাত্ররা পত্রিকা প্রকাশ (হাতে লিখেও), নাট্যাভিনয়ে, তর্কবিতর্কে তখন দামাল ও জিজ্ঞাসু। এইসব কর্মকাণ্ডে এক অনন্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন গণেশচন্দ্র রায়, পুরোধাপুরুষের মতো।

গণনাট্যের ভাবাদর্শে মার্কসবাদী চিন্তার প্রভাবে গড়ে ওঠা গ্রুপ-থিয়েটার আন্দোলনের ঢেউ প্রবাহিত হল জলপাইগুড়িতেও। তৈরি হল 'অগ্রণী' নাট্যসংস্থা। অগ্রণীর কয়েকটি অনন্য প্রযোজনা ছিল—লবণাক্ত, পোস্টমাস্টারের বউ, নীলকণ্ঠ, ফেরারী ফৌজ। এসব ষাটের দশকের ঘটনা।

ষাটের দশকের গোড়ায় ১৯৬১-তে জলপাইগুড়ির সাংস্কৃতিক জগতে এক আলোড়ন তোলা ঘটনা ছিল সরকারি স্তরে রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ কমিটির বিপরীতে বা বিরুদ্ধে বামপন্থী সংস্কৃতিকর্মীদের জনগণের রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন কর্মসূচি। আর্যনাট্য-সমাজের উন্মুক্ত ময়দানে পাঁচ দিনব্যাপী রবীন্দ্র জন্মোৎসবের অন্যতম ছিল—ছায়ানৃত্য, নাটক, গান, আবৃত্তি, আলেখ্য। এই কর্মসূচির যুগান্তকারী ঘটনা ছিল দৈলা রায়ের নির্দেশনায় "রক্তকরবী"। আজো মানুষের স্মৃতির উজ্জ্বল উদ্ধারে সেই "রক্তকরবী" প্রাণের আবেগে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। আর হয়েছিল কার্তিক লাহিড়ীর নির্দেশনায় "রথের রশি"। তুমুল ঝড়ের প্রাকৃতিক বিপর্যয় কাটিয়ে উঠে মানুষের হৃদয়তাড়িত আয়োজনে পূর্ণ এ উৎসব জলপাইগুড়ির শতাব্দীর সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের আপন গর্ব।

ষাটের দশকের শেষ দিক আর সত্তরের প্রথম—এই সময় বাংলার বামপন্থী রাজনীতির এক উত্তাল সময়। নকশালবাড়ি আন্দোলনের অগ্নি-উত্তাপে একদল তরুণ ভাবলেন সমগ্র সংগ্রামের অতিবাম পথই বিপ্লবের প্রকৃত পথ। সংস্কৃতির জগৎও অগ্নিগর্ভ এই পরিস্থিতির মধ্যে পথের বাঁকে পড়ল। এই পরিস্থিতির এক পর্বে 'অগ্রণী' ভেঙে তৈরি হল নাট্যদল 'কলাকুশলী'। 'কলাকুশলী'র

উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা ছিল অঙ্গার, টিনের তলোয়ার, চাকভাঙা মধু, বর্গী এলো দেশে, বিপ্লবের গান, রক্তের জোয়ারে শুনি, গ্যাব্রিয়েল পেরী ও আরও অনেক। কলাকুশলীদের মধ্যে কুমারেশ দেব প্রগতিশীল নাট্য আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য নাম। ক্রমে ক্রমে নানা ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে তৈরি হ'ল আরও থিয়েটার গ্রুপ—প্রান্তিক, শিলালী নাট্যম, মৌচাক, শিল্পী সংসদ, প্রগতি থিয়েটার, সম্বোধি। ধূপগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কুমারগ্রাম, বানারহাট, ময়নাগুড়ি, ফালাকাটা—সর্বত্র বাড়ল নাট্যচর্চা আর নাটকের পরিবেশ।

সত্তর দশকের গোড়ায় পশ্চিমবঙ্গে মাথা তুলেছিল আধাফ্যাসিস্ট সন্ত্রাস—বামপন্থী সংস্কৃতিকর্মী ও শিল্পীরা আক্রান্ত হলেন নানাভাবে। মধ্যসত্তরে জারি হল জরুরি অবস্থা। স্বৈরতন্ত্রের উত্থানে আক্রান্ত হল গণতন্ত্র ও গণ-আন্দোলন, বাক্‌স্বাধীনতা। এই দুর্যোগপূর্ণ পরিবেশের মধ্যেও জারি ছিল সংস্কৃতিপ্রিয় প্রগতিশীল কর্মীদের শিল্প সংস্কৃতির সংগ্রাম।



রাভা সম্প্রদায়ের হাণ্ডাবারু যুদ্ধ নৃত্যে অংশগ্রহণকারী শিল্পীবৃন্দ

কমিউনিস্ট পার্টির ভাঙনপর্বের পর আবার পুনর্গঠিত হল গণনাট্য সংঘ। সভাপতি হলেন দৈলা রায় আর সম্পাদক মাধু বিশ্বাস। এই পর্বের গণনাট্য কর্মীদের মধ্যে ছিলেন দুলাল দত্ত, দুলাল বিশ্বাস, পানু চৌধুরি, প্রদ্যুৎ চক্রবর্তী, রণজিৎ রায়, কালা পাল, প্রবীর রায়, প্রীতি ঝা, রণজিৎ ঘোষ, পরিমল বসু, জিতেন গুহ, অপূর্ব মুখোটি, অমর চৌধুরী, শিবনাথ সেনগুপ্ত, পূর্ণ মৈত্র, জটা আদক, সন্তোষ ভৌমিক, ভোলা রায় ও আরও অগণন আদর্শদৃঢ় সংস্কৃতিকর্মী।

এ সময় জেলায় গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল ভাবাদর্শের সাংস্কৃতিক কর্মধারার নেপথ্যে অভিভাবকপ্রতিম ব্যক্তিত্ব ছিলেন কমিউনিস্ট নেতা সুবোধ সেন। সাহিত্য-সংস্কৃতি নিয়ে তাঁর অসাধারণ বিশ্লেষণী মনন সমৃদ্ধ করেছিল সংস্কৃতিকর্মীদের।

সত্তরের দশকের শেষদিকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হল বামফ্রন্ট সরকার। বহু রক্তঝরানো গণ-আন্দোলন, শ্রমিক-কৃষকের রক্তঘাম, অসংখ্য শহিদের মৃত্যুঞ্জয়ী আত্মত্যাগের ফসল এ সরকার। সংস্কৃতিকর্মী বুদ্ধিজীবী লোকশিল্পীদের অবদানও এ সরকার গঠনে কম ছিল না।

আশির দশকের মাঝপথে জেলার গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন লেখক শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী লোকশিল্পী সংস্কৃতিকর্মীদের সংগঠিত করে গড়া হল গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ। এ সংঘ গড়ার ব্যাপারে প্রয়াত সুবোধ সেনের অভিভাবকীয় পরামর্শ ছিল শহুরে মধ্যবিত্তসুলভ মানসিকতা পরিহার করে জেলার নানা ভাষার নানা সম্প্রদায়ের শ্রমজীবী লোকশিল্পীদের শিল্পীর মর্যাদা দিয়ে সংগঠিত করার। জেলায় প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের একটা বড় দুর্বলতা ছিল, নানা ভাষা ও জনজাতি গোষ্ঠীর মানুষরা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের একটা বড় শক্তি হয়েও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের শহুরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও নাগরিক অংশের সঙ্গে গ্রামীণ লোকশিল্পীদের সাংস্কৃতিক চর্চার একটা বড় ব্যবধান। আদান-প্রদানের অভাব। লোকসংস্কৃতির চিরায়ত ও গোষ্ঠীগত ভাবনার ভেতর চলমান জীবনের প্রাণসঞ্চার, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অংশ হয়ে উঠবার ভাবনা সঞ্চার হয়ে দাঁড়াল গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের প্রধান কাজ। জেলার সমস্ত সম্প্রদায়ের শিল্পীরা—রাজবংশী, আদিবাসী, মেচ, রাভা, নেপালি, টোটো সবাই আজ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের অংশ, কর্মী ও নেতৃত্ব। গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের প্রতিষ্ঠা পর্ব থেকে আজও সম্পাদক হলেন কল্যাণ দে, সভাপতি প্রথমে শক্তিদাস মুখোপাধ্যায়, এখন অর্ণব সেন। এঁদের একটা বড় কাজ হল জেলার নানা ভাষার কবিদের একই মলাটে সংকলিত করে 'ভাষাবিভাষার কবিতা' গ্রন্থ প্রকাশ, তেভাগার সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার নিয়ে সব সম্প্রদায়ের শিল্পীকর্মীদের নিয়ে সাংস্কৃতিক কর্মশালা, জেলায় কামতাপুরী ভাষা আন্দোলনের নামে বিচ্ছিন্নতাবাদী ও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ভাষাবিজ্ঞান ও ইতিহাসনির্ভরতার ভিত্তিতে আলোচনাচক্র আয়োজন ও পুস্তক প্রকাশ, সাংস্কৃতিক উৎসবের আয়োজন। জেলার প্রায় সর্বত্র—জলপাইগুড়ি সদর, রাজগঞ্জ, ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়ি, নাগরাকাটা, কালচিনি, ফালাকাটা, আলিপুরদুয়ার, ভাটিবাড়ি, কুমারগ্রামে বিস্তৃত লেখক শিল্পী সংঘের শাখা। সৃজন, সংগ্রাম, সম্প্রীতির আদর্শের শিল্পীরা আজ সংগঠিত। এ কাজে অবশ্যই সহযোগী শক্তি গণনাট্য সংঘ।

শুধু নাগরিক সংস্কৃতি নয়, চা-বাগানের আদিবাসী শ্রমিক শিল্পী, খেতমজুর কৃষক শিল্পীর সংস্কৃতি ও মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হল বামফ্রন্ট সরকারের সাংস্কৃতিক নীতিতে। ১৯৮৯ সালে সরকারি উদ্যোগে মালবাজারে অনুষ্ঠিত হল চা-বাগান লোকশিল্পীদের প্রথম রাজ্য-উৎসব।

চা-বাগানের আদিবাসী শ্রমিক, সাঁওতাল, লোহার, মুণ্ডা, ওঁরাও, ভূমিজ, খারিয়া, বরাইক সব গোষ্ঠীর শিল্পীর প্রাণের মেলায় পরিণত হল এ উৎসব। পরবর্তীতে এ উৎসব হয়েছে জেলার অন্যান্য প্রান্তে। অন্যদিকে লুপ্তির গর্ভে চলে যাবার পথ থেকে পুনরুজ্জীবিত হল ভাওয়াইয়া গানের চর্চা, প্রসার। রাজ্য সরকারের ভাওয়াইয়া উৎসব বাঁচিয়ে তুলল ভাওয়াইয়া গানকে। সরকারি উদ্যোগে জেলার নানা প্রান্তে এখন আয়োজন হয় নানা অনুষ্ঠানের। সব ভাষা সম্প্রদায়ের মানুষ খুঁজে পান নিজেকে—এইসব উৎসবে। এর পাশাপাশি



জলপাইগুড়ি জেলার আদিবাসী নৃত্যের অনুষ্ঠান

সাক্ষরতার আন্দোলন, পরিবেশ রক্ষার আন্দোলন,—সর্বত্রই উপস্থিত প্রগতিশীল সংস্কৃতিকর্মীরা।

সংগঠিত সাংস্কৃতিক কর্মপ্রবাহের তালিকায় একটি সংযোজন অবশ্যই উল্লেখযোগ্য—তা হল ১৯৮০-তে জলপাইগুড়ি শহরে "সিনে সোসাইটি" প্রতিষ্ঠা। ভালো আন্তর্জাতিক ও ভারতীয় চলচ্চিত্র প্রদর্শন, সেমিনার, বুলেটিন প্রকাশ, চলচ্চিত্র লাইব্রেরি গড়ে তোলার মধ্যে দিয়ে সুস্থ ও সৎ রুচির সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি প্রকাশে প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক পরিবেশ সমৃদ্ধ হয়েছে, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। সিনে সোসাইটি আন্দোলনের একনিষ্ঠ কর্মী সুবীর রায়।

গত দু-তিন দশকে নিজ নিজ উদ্যোগে অনেকেই প্রগতিশীল ভাবনায় গড়ে তুলেছেন মূকাভিনয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, আবৃত্তিচর্চাকেন্দ্র, গানের স্কুল, অঙ্কনশিক্ষাকেন্দ্র, আবার কেউ কেউ প্রকাশ করেছেন লিট্‌ল ম্যাগাজিন। শিল্পের সমস্ত শাখার শতজলঝর্নাধারায় বিকশিত হয়েছে প্রগতিসংস্কৃতির ধারা।

প্রগতিসংস্কৃতির বিকাশের পদে পদে চিরকাল এসেছে নানা প্রতিবন্ধকতা। আজকে একমেরু বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মুখে শুধু প্রগতিসংস্কৃতি পড়েছে তা নয়, আঞ্চলিক বৈচিত্র্যময় লোকসংস্কৃতিও তার শিকড় থেকে উৎপাটনের মুখে। গণসংগ্রামকে বিকশিত করার পাশাপাশি প্রগতিসংস্কৃতির এক বড় দায় আজ, লোকসংস্কৃতির চিরঞ্জীবী ধারাকে জাগ্রত রাখা। তাকেই সংগ্রামের হাতিয়ার করা।

লোকসংস্কৃতিকে রক্ষা ও প্রসারের প্রক্রিয়াতে গতিবেগ সঞ্চার করা আজ প্রগতিসংস্কৃতির ওপর অর্পিত দায়িত্ব। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানা ভাবাগোষ্ঠী, জাতি-সম্প্রদায় গোষ্ঠীকে বিচ্ছিন্নতাবাদী মতবাদের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন করার যে সর্বনাশা চক্রান্ত আজ দেশের কয়েকটি প্রান্তে সক্রিয়, তারা জলপাইগুড়ি জেলাতেও সেই সর্বনাশের বিষগাছ রোপণে উদ্যত। আশার কথা জেলার প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলন এই অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলনের দায়িত্ব পালনে প্রস্তুত। আন্দোলনরত। কালের কল্লোলে জাগ্রত শিল্পীবিবেক সমাজপ্রগতির মহতি ব্রতে সৃজনসংগ্রামে যেভাবে সামিল, আবহমান জলপাইগুড়ি জেলাও তার সর্বাঙ্গীণ সংস্কৃতিসম্পদের আয়ুধসম্ভারে সামিল কালের যাত্রায়। এ চলার পথের নানা বাঁকে বাঁকে নানা বাধা, নানা দুর্বলতা, নানা বিভ্রমেও অবিচলিত জলপাইগুড়ির প্রগতিসংস্কৃতির ধারা। এখানে একাকার চা-বাগানের কুলি, ফসল-খেতের মজুর চাষি, শহরের নাগরিক সমাজ।

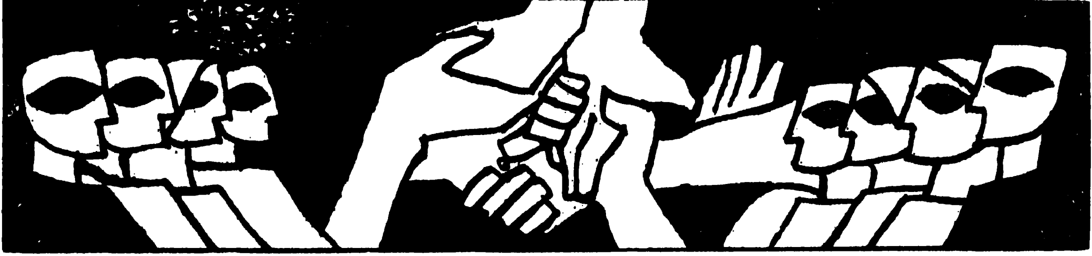
নিবেদন :

এ রচনা নির্মাণ প্রকৃতই দুরূহ। সম্বল শুধু প্রাচীন ব্যক্তিদের লিপিবদ্ধ স্মৃতিচারণ। ফলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ নাম অনুল্লেখিত রয়ে যাওয়া সমূহ সম্ভাবনা। এ ত্রুটির জন্য তাই অগ্রিম ক্ষমা প্রার্থনা। এর একটি সীমাবদ্ধতাও স্বীকার্য, এ রচনার অধিকাংশ তথ্যই জলপাইগুড়ি শহরনির্ভর।

তথ্যসূত্র :

১। প্রসঙ্গ সুবোধ সেন / ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী), জলপাইগুড়ি।
২। গণনাট্য : পঞ্চাশ বছর / গণনাট্য সংঘ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি।
৩। অতন্দ্রিলা / শারদ সংকলন ১৩৯৫।
৪। মধুপর্ণী / জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা ১৩৯৪।
৫। শতক স্মরণ : গণেশচন্দ্র রায় / গণেশচন্দ্র রায় জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটি ২০০০।
৬। সম্ভবকাল / অষ্টম বর্ষ—২য় / ৩য় সংখ্যা।
৭। দ্যোতনা / অক্টোবর ১৯৮৩।
৮। গণনাট্য সংঘ স্মারক ১৯৮৯ / জলপাইগুড়ি।
৯। চা-বাগিচা শ্রমিকদের লোকসংস্কৃতি উৎসব স্মারক পত্রিকা / মালবাজার ১৯৮৯।

লেখক ❑ কবি ও প্রাবন্ধিক।



কুমারেশ দেব

নাট্য আন্দোলনে জলপাইগুড়ি জেলা

রুর সেই দিনটাকে আন্দোলন বলা তর্কের বিষয় হলেও, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়—অবশ্যই আন্দোলিত ছিল সেদিন, সদ্য গড়ে ওঠা এই শহরের মানুষজন। কেননা, সেই প্রথম ভিন্ন অভিজ্ঞতা সংস্কৃতির অঙ্গনে—নাটক 'বিল্বমঙ্গল'। বাংলার সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার মাত্র পঁচিশ বছর পর থিয়েটার জলপাইগুড়ি শহরে—১৮৯৭ সাল।

বিস্তারিত জানা না গেলেও লোকমুখে যতটুকু—উদ্যোগী অভিনেতা ছিলেন শ্রদ্ধেয় রামলাল গঙ্গোপাধ্যায়। শোনা যায়, কোন কারণে মাঝপথে বন্ধ হয়ে যায় সেদিনের অভিনয়। অনেকের অনুমান, যেহেতু মৌলবী সোনাউল্লার বাড়ির মাঠে আয়োজন ছিল মঞ্চ বানিয়ে অভিনয়ের এবং নাটক 'বিল্বমঙ্গল', ফলে সাম্প্রদায়িক কারণ আশ্চর্যের নয়। অবশ্য এ জাতীয় অনুমানের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন স্বাভাবিক, যেহেতু সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অভাব এই শহরে তেমনভাবে দানা বাধেনি কখনো ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত, তখনকার সামাজিক চেহারা যাই হোক না কেন। তবে যত দূর মনে হয় নাটকটি 'বিল্বমঙ্গল' নয়, আমার ধারণা—নামটা 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর' হবে। নাট্যাচার্য গিরিশ ঘোষ ওই নামে একটি নাটক লিখেছিলেন ১৮৮৮ সালে এবং তখনকার কলকাতায় মঞ্চসফল এই নাটকটি এখানে মঞ্চস্থ হয়ে থাকবে—আমার বিশ্বাস।

এর পরের ইতিহাস আর্য নাট্যসমাজের। তবে সেই প্রসঙ্গে আসবার আগে, সেই সময়কার ইতিবৃত্ত একটু বুঝে নেওয়া দরকার বিবেচনায় প্রসঙ্গান্তরে যেতে চাই, কেননা কার্যকারণেই ঘটনা ঘটে। অতএব ভাবনার উৎস খুঁজতেই হয়, প্রদীপ জ্বালাবার আগে সলতে পাকানোর মতন—

১৮৬৯ সালের ১ জানুয়ারি ইংরেজ কর্তৃক জলপাইগুড়ি জেলা গঠিত হবার পর শিক্ষিত মানুষজন রুজিরোজগারের তাগিদে এখানে এসে বসবাস করতে শুরু করেন। এঁদের



উৎপল দত্ত রচিত 'টিনের তলোয়ার' প্রযোজনা : সম্বোধি নাট্য সংস্থা, জলপাইগুড়ি।

অধিকাংশই উকিল, মোক্তার, ডাক্তার এবং সরকারি আমলা। এঁদের মধ্যে অনেকেই ১৮৭৯ সালে চা-বাগান পত্তনের মধ্য দিয়ে দ্রুত সম্পদশালী এবং কর্তৃত্বের অধিকারি হয়ে ওঠেন। স্থানীয় রাজবংশী ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে এদের অমিলটাই ছিল লক্ষ করবার মতন, ফলে প্রচলিত ব্যবস্থার মধ্যে আরেকটা নতুন ব্যবস্থা তখন গড়ে উঠতে আরম্ভ করে। ভালোমন্দ মিলেমিশে এতদিন পর যার কুফল হয়তো এখানকার বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে প্রকট হচ্ছে ক্রমশ।

১৮৯৭ সালের জলপাইগুড়িকে একটা বড় বস্তি ব্যতীত শহর বলা চলে না। যদিও দার্জিলিং মেলে অধুনা বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে ৯/১০ ঘণ্টায় সহজেই পৌঁছে যাওয়া যেত কলকাতায় তখন, তথাপি আদমশুমারি অনুযায়ী শহরের মোট জনসংখ্যা ১৮৭২ সালে ৬৫০০, ১৯০১ সালে ১০২৮৯, ১৯১১ সালে ১১৭৬৫, ১৯২১ সালে ১৪৮১৩, ১৯৩১ সালে ১৮৯৬২ এবং ১৯৪১ সালে ২৭৭৬৫। উপরোক্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির স্বল্পমাত্রা সম্ভাবনাময় অথচ শ্বাপদসঙ্কুল এই অঞ্চলের ভয়াবহতাকেই সূচিত করে।

যাই হোক, অর্থসম্পদে বাড়-বাড়ন্ত হয়েও কিন্তু আমাদের পূর্বসূরিরা কখনো সমাজবিমুখ ছিলেন না। ভূমিকম্পে, ঘন ঘন অগ্নিকাণ্ডের দুর্যোগে, অথবা কালাজ্বর-আমাশা-ম্যালেরিয়া অধ্যুষিত এতদঞ্চলের অসুখ-বিসুখজনিত মহামারীতে কিংবা দুর্ভিক্ষের সময় ত্রাণকার্যে এঁদের ভূমিকা স্মরণযোগ্য—ফলে স্থায়ী সংগঠনের ভাবনা। ডাঃ সরোজিৎ বাগচীর মতে—'১৯০০ সালে শশিভূষণ নিয়োগী, শশিমোহন বন্দোপাধ্যায়, তারাপ্রসাদ বিশ্বাস, ত্রৈলোক্যনাথ মৌলিক, সুরেশ্বর সান্যাল, তারিণীপ্রসাদ রায়, যোগেশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ একটি স্থায়ী সংগঠনের কথা চিন্তা করে আর্য নাট্যসমাজ স্থাপন করেন। এবং এই সংগঠনের মাধ্যমে জনসেবার কাজ চালিয়ে যাবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।' (জলপাইগুড়ি জেলা শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ)

লক্ষণীয়, ইংরেজদের নিজস্ব সংগঠন জলপাইগুড়ি ক্লাব বা প্লানটার্স ক্লাব কিন্তু প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে তারও আগে ১৮৮৫ সালে, যেখানে কালো মানুষের কোনও প্রবেশাধিকার ছিল না। যাই হোক, ভিন্নমতে সমাজের প্রতিষ্ঠা ১৯০২ সালে। শোনা যায়, অর্থের প্রাচুর্যে বিপথগামী যুবসমাজকে সংযত করবার জন্য সংগঠনের ভাবনা সমাজ সচেতন আইনজীবী শশিভূষণ নিয়োগীর। হতে পারে, বিল্বমঙ্গল ঠাকুর থেকেই নাটকের ভাবনা—লোকশিক্ষার বাহক হতে পারে থিয়েটার ভেবেছিলেন হয়তো। একই ভাবনায় প্রথম কাগজ প্রকাশ করেন তিনি—ত্রিস্রোতা। আর আর্য হিসেবে পরিচিতির মধ্যে সাদা চামড়ার সমকক্ষতায় নিজেদের জাত্যাভিমান—এই সব মিলেই হয়তো আর্য নাট্যসমাজ। তবে লক্ষণীয়, মুসলিম সম্প্রদায়ের কেউ কিন্তু যুক্ত ছিলেন না এই উদ্যোগে। একমাত্র মৌলবী সোনাউল্লা প্রথম দিকে জায়গা দেন সমাজের সভ্যদের নিজের পাটগুদামে।

ডাঃ সরোজিৎ বাগচীর অভিমত মেনে নিলে, প্রতিষ্ঠার পর হয়তো নাটকের তোড়জোড়েই এই কালক্ষেপ এবং ১৯০২ সালে প্রথম অভিনয়। ১৯০২ সাল থেকে ১৯০৪ সাল পর্যন্ত মাত্র দুটি নাটকের নাম শোনা যায়—বিজয় বসন্ত এবং হরিশচন্দ্র। বিভিন্ন জায়গায় অভিনয় হত তখন—সান্যালবাড়ি, কোচবিহার কাছারিবাড়ি এবং জগদিন্দ্রদেব রায়কতের বাড়িতে।

এর পরের ইতিহাস সমাজের নিজস্ব ভবন নির্মাণের। শোনা যায় সেটেলমেন্ট হাঙ্গামায় জড়িত মৌলবী সোনাউল্লা ও জনৈক সীতারাম বাবাজি, উদ্ধারকারী আইনজীবী শশিভূষণ নিয়োগী ও আইনজীবী তারাপ্রসাদ বিশ্বাসের প্রতি কৃতজ্ঞতাবশত ভবন নির্মাণে সহায়তা করেন। বাবাজি প্রায় তিন বিঘা জমি ১৯০৪ সালে সমাজকে দান করেন আর মৌলবী সোনাউল্লা দেন নিজের ভাঙা পাট গুদামের কাঠ, টিন ইত্যাদি। জনসাধারণ এবং কিছু দেশীয় চা-বাগানের অর্থানুকুল্যে ওই জমির ওপর নির্মিত হয় আর্য নাট্যসমাজের নিজস্ব গৃহ এবং মঞ্চ। পাঞ্চ লাইট, গ্যাস লাইট, কার্বাইড ইত্যাদির আলো থেকে ক্রমে ১৯২৪ সাল—আগুনের মুখে আর্য্য নাট্য। সে আরেক ইতিহাস। আরেকটি সংগঠন নাটকের—বান্ধব নাট্যসমাজ।

আর্য নাট্যসমাজের পুরানো দিনের কথা বলতে গিয়ে বর্ষীয়ান সদস্য শ্রদ্ধেয় পান্নালাল চক্রবর্তী, সমাজের স্মরণিকায় (১৯৯০-৯১) লিখেছেন—'একদিন সমাজে একটা প্রস্তাব রাখলেন গোষ্ঠদা। থিয়েটার তো অনেক করা হলো। একটা যাত্রাগানের পালা করলে কেমন হয়। প্রাচীন সভ্যরা সকলেই মত প্রকাশ করলেন—মন্দ না, মন্দ না। চিন্তাহরণদা বললেন—পৌরাণিক নাটকই জইণ্ড ভালো। বীরেশদা বললেন—তা জইণ্ড ঠিকই, কিন্তু আমার মনে হয় ঐতিহাসিক নাটক দর্শকরা লইবে ভাল। আমাগো মখমলের পোশাক আছে, ছাওয়ালরা আছে সখীর নাচ নাইচবো, তারপর আমাগো কনসার্ট পার্টি আছে—লাইন ধইরা যাবো।'

উপরোক্ত বিভূতি থেকেই তখনকার দিনের নাট্যভাবনার পরিচয় স্পষ্ট। অথচ সময়ের বিচারে উদ্বেল জনমানস তখন—'ইংরেজ অহিন মানবো না।'

১৯০৫ সালেই বিলেতি শাড়ি বর্জন আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এখানে বৃটিশবিরোধী সংগ্রামের সূত্রপাত। ক্ষুদিরাম শহিদ হওয়ার মাত্র দুবছরের মধ্যে ১৯১০ সালে ফাঁসিকাঠে নিজেকে উৎসর্গ করেন জিলা স্কুলের ছাত্র বীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্ত। গোটা শহর টালমাটাল, স্বদেশিভাবনা, সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ, ১৯২১ জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা, মুসলিম লিগ, হিন্দু মহাসভা, ১৯৩৯ সালে কমিউনিস্ট মুভমেন্ট, ফরওয়ার্ড ব্লক—নানা মত, নানা পথ—গোটা সময় জুড়ে। আর আমাদের থিয়েটার? সেই উত্তাল সময়ে তখন প্রশ্নচিহ্নের মতন।

তবে যে আদর্শের কথা মাথায় রেখে আর্য নাট্যের প্রতিষ্ঠা—ডাঃ চারুচন্দ্র সান্যালের ভাষায় 'স্টেজের সামনে লেখা থাকতো-উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরান নিবোধত, মদাম দেয়ম পেয়ম গ্রাহ্যম, বন্দেমাতরম, মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন ইত্যাদি যাতে সব দর্শকের সামনে এগুলি থাকে, সবার নীতি শিক্ষা হয় ও দেশপ্রেম জাগে। ১৯০৭ সালেই এই গৃহে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। স্কুলটি ভেঙে গেল ১৯১১ সালে। এর পর হয়তো আদর্শের পরিবর্তন হলো। গৃহটি পুনরায় সংস্কারের সময় অনাবশ্যক বোধে ওই লেখাগুলি মুছে ফেলা হলো।' (জলপাইগুড়ি শতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ)।



জলপাইগুড়ির আর্য নাট্য সমাজ প্রযোজিত বিজয়া

সমাজে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় বিদ্যালয় সম্পর্কে ডাঃ সরোজিৎ বাগচী লিখেছেন 'কেবল লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়াই এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল না। শিক্ষার কাজ ও সেবার মাধ্যমে কর্মী গড়াই ছিল এঁদের অন্যতম উদ্দেশ্য। সমাজ ক্রমশ শহরবাসীর চিত্ত বিনোদন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য ব্যবহৃত হতে থাকায় সেবা সমিতি লুপ্ত হয়ে যায়।' (জলপাইগুড়ি শতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ)।

আর্য নাট্যের এই পরিবর্তন বিশেষভাবে লক্ষণীয়—শ্রদ্ধেয় শশিভূষণ নিয়োগীর অকালমৃত্যুর পর—তাই একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, প্রবল জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের সময় তেমনভাবে প্রভাবিত ছিল না থিয়েটার। বঙ্গে বর্গী, সিরাজদ্দৌলা, গৈরিক পতাকা ব্যতিক্রম হতে পারে (যদিও অভিনয়ের সঠিক সময় জানা নেই) যেমন বান্ধব নাট্যের কারাগার, গৈরিক পতাকা, সিরাজদ্দৌলা। তবে সেই আমলে রাজরোষে আমাদের থিয়েটার—এমনটা কিন্তু শোনা যায়নি কখনো।

কমবেশি মোট ৫০/৬০টি নাটকের ইতিহাস আর্য নাট্যের। বেশির ভাগই কলকাতায় অভিনীত পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটক। সামাজিক নাটকের সূত্রপাত ১৯২৫ সালে হলেও ঘুরেফিরে সেই পুরানো দিনেই। মৌলিক প্রযোজনার মধ্যে কামিনী রাহুত রচিত জীবন আহুতি ১৯২৭, জ্ঞানরঞ্জন ঘটক রচিত দশানন ১৯২৯ ও রক্তলেখা ১৯৩১, রামলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের তুষানল অভিনীত হয়েছিল কিনা জানা যায়নি। এবং সমর চৌধুরির নাট্যরূপ—স্বজন সাম্প্রতিক। শোনা যায় ১৯২৮ সালে কলকাতার স্টার থিয়েটারকে অভিনয়ের জন্য মঞ্চ ভাড়া দিয়েও শুধুমাত্র বারবনিতারা অভিনেত্রী থাকায় সদস্যদের প্রবল বিরোধিতার জন্য ক্ষতিপূরণ দিয়ে সে চুক্তি বাতিল করতে হয় কর্তৃপক্ষকে। যাঁরা চুক্তির পক্ষে ছিলেন, প্রতিবাদে মিলন মন্দির নামে আরেকটি সংগঠন গড়ে তোলেন।

আর্য নাট্যসমাজে আধুনিক প্রয়োজনার সূত্রপাত '৭০-এর দশকে। রক্তকরবী এই পর্বের একটি উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা। এছাড়া সোনার মাথাওয়ালা মানুষ, অলকানন্দার পুত্রকন্যা, দর্পণে শরৎশশী, রাজদর্শন বিশেষভাবে উল্লেখের। এখানেই পঞ্চাশের দশকে মঞ্চে প্রথম মহিলা শিল্পী সতী বসু, একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

যাটের দশকে সরকারি উদ্যোগে জেলায় জেলায় রবীন্দ্রভবন নির্মাণের কর্মসূচি অনুযায়ী সমাজ রবীন্দ্রভবনে রূপান্তরিত হলে (১৯৬৩—১৯৭৩ নির্মাণকাল) আশির দশকে সরকারি অধিগ্রহণের দাবিতে, শহরের গ্রুপ থিয়েটারগুলির আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করলেও একেবারে শেষ মুহূর্তে অধিগ্রহণ কার্যকরি হয়নি তবে আন্দোলনের পক্ষে থাকার জন্য এই শহরের দুজন বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব শ্রদ্ধেয় ডাঃ শশাঙ্কশেখর বোস, এবং শ্রদ্ধেয় তারা ব্যানার্জিকে আর্য নাট্যসমাজ থেকে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ছিন্ন করতে হয়। লক্ষণীয়, তারপর থেকে থিয়েটারের স্বার্থে প্রথমে একাঙ্ক, পরে পূর্ণাঙ্গ নাটক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে চলেছে আর্য নাট্যসমাজ। সেই সঙ্গে মাসে একদিন স্বল্প মূল্যে মঞ্চ ব্যবহারের সুযোগ করে দিয়ে বর্তমানে গ্রুপ থিয়েটারের সহযোগীর ভূমিকায়।

১৯২৪ সালে বান্ধব নাট্যসমাজের প্রতিষ্ঠা কোনও আদর্শজনিত কারণে নয়। বান্ধব নাট্যের দীর্ঘদিনের পরিচালক বর্ষীয়ান শ্রদ্ধেয় সত্য সান্যালের সঙ্গে একান্ত আলাপচারিতায় যা জেনেছি, বিস্তারিত নিম্নরূপ—আর্য নাট্যের সেই সময়ের (সম্ভবত) সম্পাদক উমাপদ মৈত্র বিশেষ কারণে অন্যান্য সভ্য দ্বারা লাঞ্ছিত হয়ে অভিমানে দলত্যাগ করেন এবং আর্য নাট্যসমাজের মাঠে মঞ্চ বানিয়ে বান্ধব নাট্যসমাজ নামে প্রথম অভিনয়ের সূত্রপাত ঘটান। যদিও নাটকের নাম তিনি স্মরণ করতে পারেননি। আস্তানা তখন কদমতলা পাটগুদামের পরিত্যক্ত টিনের চালা। শ্রদ্ধেয় সান্যালের কাছে আগে শুনেছি—সেই সময় পচাগড় (অধুনা বাংলাদেশ) নিবাসী এক মুসলিম জোতদার তখনকার জনৈক ডাকসাইটে দারোগার আনুকূল্যে ফৌজদারি মামলা থেকে অব্যাহতি পান এবং বিনিময়ে প্রাপ্ত অর্থে উক্ত দারোগা বন্ধু উমাপদ মৈত্রকে কদমতলায় বান্ধব নাট্যসমাজের নামে দেড় বিঘা জমি কিনতে সহায়তা করেন। পরে

সেই জমিতেই তৈরি হয় সমাজের মঞ্চ এবং প্রেক্ষাগৃহ। এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ছিলেন ডাঃ চারুচন্দ্র সান্যাল, আমীর হোসেন, রুক্মিণীকান্ত ভৌমিক, এনামুল হোসেন এবং সতীশ দাশগুপ্ত।

এখানেও একই ধারার ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক নাটকের অভিনয় '৫০-এর দশক পর্যন্ত। সেই সময় শ্রদ্ধেয় বিমল সান্যালের (গণনাট্যের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন প্রথমে, পরে ক্রান্তি শিল্পী সঙ্ঘ) নেতৃত্বে সামাজিক নাটকের শুরু। দুঃখীর ইমান নাটকের প্রশ্নে কিছু সদস্য সেই সময় সংগঠন ত্যাগ করে নটশ্রী নিকেতন নামে ভিন্ন এক সংগঠন গড়ে তোলেন এবং যাত্রাভিনয়ের প্রচলন করেন শুনেছি। নেতৃত্বে ছিলেন শ্রদ্ধেয় সজল দাশগুপ্ত।

এই পর্বে সংস্থার নিজস্ব নাট্যকার রবি ঘোষ এবং রবীশ্বর ভট্টাচার্যের সামাজিক নাটক উল্লেখযোগ্য। জলসাঘর, মহেশ, ক্ষুধিত পাষাণ, কৈলাস কাহানি, আনোখীলাল পাকোটিয়া, ছেঁড়া তমসুক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মোটামুটি বান্ধব নাট্যের মৌলিক প্রযোজনা। এবং সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাটক মুক্তধারা অবশ্যই উল্লেখের।

প্রথমদিকে স্পেনসার টকিজের নির্বাক চলচিত্র, পরে ১৯৩৬ থেকে ১৯৫৮ নিউ চিত্রালী নামে এক সিনেমা কোম্পানিকে প্রদর্শনের জন্য ভাড়া, অধুনা দীপ্তি টকিজ ('৫০ এর দশকে আর্য নাট্যে ভাড়ার বিনিময়ে সিনেমা প্রদর্শন করতো) নামে আরেকটি সিনেমা কোম্পানি এখনও ভাড়ার বিনিময়ে বান্ধব নাট্যে সিনেমা প্রদর্শন করে চলেছে। মাঝে কিছুদিনের বিরতি সহ এই ব্যবস্থা মোটামুটি ষাটের দশক থেকে। মাঝে মাত্র দুদিন থিয়েটারের জন্য সুরক্ষিত মঞ্চ, ভাড়ার শর্তে। ফলে সহজেই অনুমেয় যে, তেমনভাবে থিয়েটারের জন্য ব্যবহৃত হতে পারেনি মঞ্চ দীর্ঘদিন।

সত্তরের দশকেই গুণগত পরিবর্তন লক্ষণীয় বান্ধব নাট্যের প্রযোজনায়। তুঘলক, ত্রিংশ শতাব্দী, বল্লভপুরের রূপকথা, ক্যাপ্টেন হুররা, রোজদর্শন এই শহরের নাট্য আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য সংযোজন হলেও সম্ভবত সর্বাধিক অভিনীত নাটক—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ।

পাঞ্চ লাইট, গ্যাস লাইট, কার্বাইডের আলোতে চড়া মেক আপ, উচ্চস্বরে সংলাপ, স্ত্রীর ভূমিকায় পুরুষের অভিনয়—শুধুমাত্র অভিনয়-নির্ভর যে থিয়েটারের শুরু, সম্ভবত বৈদ্যুতিক আলো আসার পর কিছু পরিবর্তন অবশ্যই ঘটে থাকবে থিয়েটারে। ১৯৩৪ সালের ১৪ অক্টোবর এই শহরে প্রথম বিদ্যুৎ, উদ্বোধক ছিলেন স্বয়ং নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। তবে বাচিক অভিনয়ের ধারার পরিবর্তন আরো পরে। চল্লিশের দশকের প্রথমদিকে শ্রদ্ধেয় গণেশ রায়ের কলকাতায়, রঙমহলে অভিনয়ের অভিজ্ঞতা এই শহরের অভিনয় ধারার পরিবর্তন সূচিত করে। আর্য নাট্যে তিনি কতটা সুযোগ পেয়েছিলেন জানি না, বরং বলা চলে শহরের নাট্য আন্দোলনে তাঁদের নাম শ্রদ্ধায় স্মরণযোগ্য—গণেশ রায়, শশাঙ্কশেখর বোস, প্রবীর রায় প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। দীর্ঘদিন আর্য নাট্যের সঙ্গে যুক্ত থেকেও কিন্তু থিয়েটারে নিজেদের অবদান রেখে গেছেন অন্যত্র।

ডাঃ শশাঙ্কশেখর বোস 'সারথি' গড়েছিলেন '৬০-এর দশকে। একটিমাত্র অভিনয়ই সংস্থাটির স্থায়িত্বকাল। নাটক—বিদ্যাসাগর, শ্রদ্ধেয় গণেশ রায়ের সঙ্গে অভিনয় করবার সৌভাগ্য আমার সেই নাটকে। প্রবীর রায় জলপাইগুড়ি আর্ট থিয়েটার গড়েছিলেন পরবর্তী সময়ে, নাটক—দেবদাস। ফর্মের দিক থেকে আকর্ষণীয় হলেও একটিমাত্র প্রদর্শনীর বেশি এগোতে পারেনি সংস্থাটি। অনেক অভিমানে '৭০-এর মাঝামাঝি থেকে প্রবীর রায়ের প্রায় বছর বিশেকের স্বেচ্ছা নির্বাসনে, তাঁর কি ক্ষতি হয়েছে জানি না, তবে থিয়েটারের ক্ষতি অপরিসীম—নিঃসন্দেহে বলা যায়। শ্রদ্ধেয় গণেশ রায়ের অবসরও খুব বেশি বয়সে নয়, ৬০/৬২ বড়জোর। রবীন্দ্র নাট্যচর্চার পথিকৃৎ তিনি। স্কুলের ছোট ছোট মেয়েদের ভিড়িয়েছেন কখনো কবিতার নাট্যরূপ, কখনো বিসর্জন নাটকে। ১৯৬০ সালে রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপন কমিটি আয়োজিত অনুষ্ঠানে রক্তকরবী নাটক একটি উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা। পঞ্চাশের দশক থেকে বাবুপাড়া পাঠাগার ও এ সি কলেজ এক্সস্টুডেন্টস ইউনিয়নের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলি নাট্য আন্দোলনে অবশ্যই চিহ্নিত হয়ে থাকবে। ডাকঘর, বিসর্জন, থানা থেকে আসছি, রূপালী চাঁদ, একমুঠো আকাশ, নীলরং-এর ঘোড়া, বাঘবন্দী, চোখের আলো প্রভৃতি উপভোগ্য নাটকগুলি এইসময়কার ফসল। বিভিন্ন সময়ে পরিচালকের দায়িত্বে ছিলেন যথাক্রমে শ্রদ্ধেয় গণেশ রায় এবং প্রবীর রায়। বাবুপাড়া পাঠাগারের প্রযোজনা—স্থানীয় নাট্যকার সুরজিৎ বসুর নাট্যরূপ 'চোখের আলো' কলকাতায় লেনিন শতবর্ষ উৎসবে আমন্ত্রিত অভিনয় উল্লেখযোগ্য। পরিচালক ছিলেন প্রবীর রায়।

এই প্রসঙ্গে সবিশেষ লক্ষণীয় উপরোক্ত সংস্থা দুটির অভিনয়ে বেশির ভাগ অভিনেতা, অভিনেত্রীরা কিন্তু আর্য্য নাট্য এবং বান্ধব নাট্যসমাজের। শুধুমাত্র সময়োপযোগী নাটকে অভিনয়ের তাগিদেই সম্ভবত এই আগ্রহ। মূলত সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির অন্বেষণে সমস্ত রকম সঙ্কীর্ণতার বিরুদ্ধে ক্রমাগত লড়াই করেই থিয়েটারের প্রবাহকে সুদীর্ঘ সময় ধরে রাখতে হয়েছিল তখনকার নাট্যকর্মীদের। লড়াই, ভেতরে-বাইরে। বলা চলে এর প্রথম প্রকাশ ঘটেছিল কলেজ স্টুডেন্টস অ্যান্ড এক্স-স্টুডেন্টস ইউনিয়নের নাট্যচর্চায়। জেলার বাইরে যাঁরা পড়াশোনা করতেন তাঁদেরই উৎসাহে। তখনও এ জেলায় উচ্চশিক্ষার কোনও ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। সৌখিন নাট্যচর্চার পাশাপাশি সমসাময়িক কিছু সৃষ্টিশীল নাটকের খবর পাওয়া যায় সংস্থার প্রযোজনায়—নতুন প্রভাত, প্লাবন যার মধ্যে অন্যতম। শ্রদ্ধেয় গণেশ রায় যুক্ত ছিলেন এই উদ্যোগে শুনেছি।

এর পর যখন তিরিশের দশকের মধ্যভাগে সারা পৃথিবীর প্রগতিশীল মানুষ সংঘবদ্ধ হচ্ছিলেন ফ্যাসিবাদ-বিরোধী লেখক শিল্পী

কমবেশি মোট ৫০/৬০টি নাটকের ইতিহাস আর্য নাট্যের। বেশির ভাগই কলকাতায় অভিনীত পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটক। সামাজিক নাটকের সূত্রপাত ১৯২৫ সালে হলেও ঘুরেফিরে সেই পুরানো দিনেই। মৌলিক প্রযোজনার মধ্যে কামিনী রাহুত রচিত জীবন আহুতি ১৯২৭, জ্ঞানরঞ্জন ঘটক রচিত দশানন ১৯২৯ ও রক্তলেখা ১৯৩১, রামলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের তুষানল অভিনীত হয়েছিল কিনা জানা যায়নি।

সঙ্ঘে—তারই প্রভাবে লক্ষণীয়ভাবে আমাদের এই শহরে আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল একটি নতুন সংগঠনের—কালচারাল ইনস্টিটিউট। মূলত বামপন্থীদের উদ্যোগে ১৯৩৯ সালে। এখানেও যুক্ত ছিলেন শ্রদ্ধেয় গণেশ রায়। সংস্থার অন্যতম প্রযোজনা—কঞ্চি, রুম নং লাইন। অন্যান্য যাঁরা যুক্ত ছিলেন এই উদ্যোগে, তাঁদের অনেকেই পরবর্তীকালে জেলার বামপন্থী আন্দোলনে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। শচীন দাশগুপ্ত, নরেশ চক্রবর্তী, পরেশ মিত্র, শঙ্কর সান্যাল, অমল রায় এঁদের অন্যতম। (*সংস্থা সম্পাদক অমল রায়ের সাক্ষাৎকার।*)।

ফলে বিকাশের দ্বান্দ্বিক নিয়মে এই ভিত্তিভূমির ওপরই জেলার গণনাট্য আন্দোলন এবং জনযুদ্ধের প্রশ্নে গণনাট্য থেকে ক্রান্তি শিল্পী সঙ্ঘ। ১৯৪৪ সালের নবান্নের পর যে জোয়ার নাট্য আন্দোলনে তার প্রভাব আমাদের শহরেও। শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি গণনাট্যের যৌথ প্রযোজনায় 'রাহুমুক্ত' নাটকের কথা শুনেছি। ষাটের দশকে 'ক্ষুধা' দেখেছি। পরিচালক ছিলেন ডাঃ শশাঙ্কশেখর বোস। আর সত্তরের দশকে প্রবীর রায়ের পরিচালনায়—বিদ্রোহী চার্বাক। এছাড়া বড় আর কোনও প্রযোজনার কথা শোনা যায়নি তেমন। তবে সাহিত্যিক দেবেশ রায়ের পালটিয়া, রাধানাথ দাসের ছোট নাটক কিংবা সত্যেন রায়ের গঠিত আলেখ্য গণপ্রচারের মাধ্যম হিসেবে তেভাগা আন্দোলনের হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল শুনেছি। সংগঠকদের অন্যতম ছিলেন ডাঃ শশাঙ্কশেখর বোস এবং অন্যতম প্রাণপুরুষ প্রখ্যাত সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। উপদেষ্টা হিসেবে শ্রদ্ধেয় গণেশ রায়ের ভূমিকাও সুবিদিত। পরবর্তীকালে কিছু ছোট নাটক ও পথ নাটক থাকা সত্ত্বেও কিন্তু নাট্য আন্দোলনে গণনাট্য নানা কারণে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারেনি। আর ক্রান্তি শিল্পী সঙ্ঘ তো নাটকের ক্ষেত্রে একেবারেই উল্লেখনীয় নয়।

পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত পাড়ায় পাড়ায় পুজোপার্বণে মঞ্চ বেঁধে নাট্যাভিনয় যথেষ্ট সাড়া জাগাতো শহরে। এখন প্রায় নেই বললেই চলে। ভোলা রায়ের পরিচালনায় শতদল সঙ্ঘ এবং শেফালী রায় পরিচালিত মহিলা নাট্যসংস্থা জাগরী সঙ্ঘ এখন স্মৃতিচারণার শুধু।

সহজ এবং সোজাসুজি—এই ভাবনায় গণনাট্য। কাজটা নিঃসন্দেহে কঠিন। আর কঠিন বলেই বোধ হয় পরবর্তীকালে গ্রুপ থিয়েটারের ভাবনা। নিরাপদ দূরত্বে থেকে দায়বদ্ধতা—অথবা শিল্পের স্বাধীনতা, যেভাবেই বলা হোক না কেন, একথা অস্বীকার করবার কোনও উপায় নেই ১৯৪৮ সালে বহুরূপী নাট্য সংস্থার মধ্য দিয়ে যে ভাবনা থিয়েটারে, অচিরেই তার ব্যাপকতা সর্বত্র। প্রতিষ্ঠিত হলো অগ্রণী নাট্যসংস্থা (১৯৬১—১৯৭৪) মূলত ছাত্র ফেডারেশনের সঙ্গে যুক্ত কিছু উৎসাহীর উদ্যোগে। সম্ভবত প্রাতিষ্ঠানিক থিয়েটারের বাইরে সমগ্র উত্তরবঙ্গের প্রথম গ্রুপ থিয়েটার—অগ্রণী। সংস্থার প্রথম দুটি নাটকের পরিচালক ছিলেন শ্রদ্ধেয় ভোলা রায়, পঞ্চাশের দশকে মঞ্চ পরিকল্পনায় যাঁর অবদান নিঃসন্দেহে স্মরণীয়। নাটক দুটির নাম—লবণাক্ত, মৌচোর। সংস্থার অন্যান্য নাটক—পোস্টমাস্টারের বৌ, নীলকণ্ঠ, জীবনযৌবন, চক্র, পুষ্পকরণ, ফেরা। এই পর্বের প্রথম দুটো নাটকের পরিচালক ছিলেন শ্রদ্ধেয় প্রবীর রায় এবং অন্যান্য নাটকের—এই প্রবন্ধের প্রতিবেদক স্বয়ং।

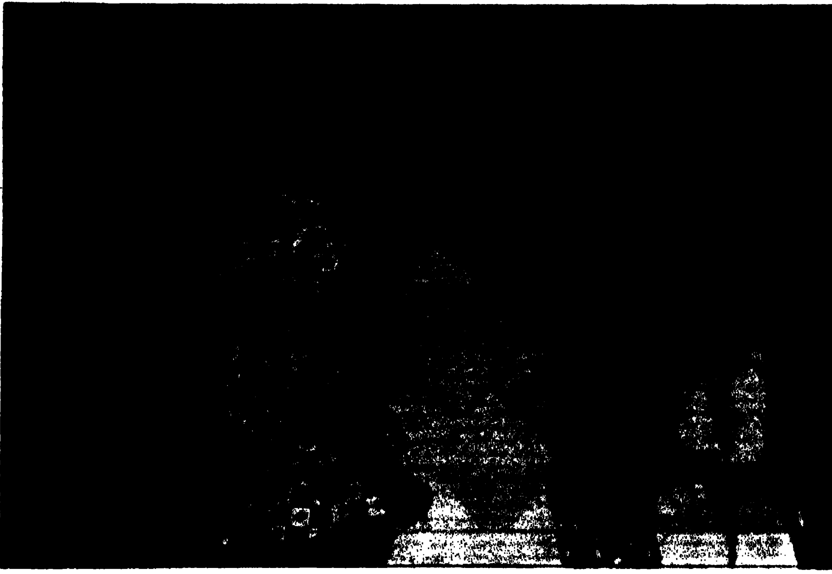
অজিত গঙ্গোপাধ্যায় রচিত 'পোস্টমাস্টারের বৌ' নাটকটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কারণ, শহরের নাট্য আন্দোলনে প্রযোজনার পুরানো ধারাটাই বদলে গিয়েছিল তারপর থেকে। প্রজেক্শনের ব্যবহার, জোনাল অ্যাকটিং, প্রতীকী মঞ্চসজ্জা, শব্দ সংযোজনে টেপরেকর্ডারের ব্যবহার—সব মিলিয়ে আগেকার শুধুমাত্র অভিনয়-নির্ভর থিয়েটার, দৃশ্যান্তরে ঘন ঘন পর্দা অথবা আলো নিভিয়ে (ফুট-স্কাইয়ে ব্যবহৃত সাধারণ ৫০০ বা ১০০০ ওয়াটের বাল্ব) দর্শকদের চোখের সামনে পরবর্তী দৃশ্যের ক্রমাগত প্রস্তুতি, গোটা মঞ্চ জুড়ে এক-একটি দৃশ্য, পেছনে ঝোলানো হাতে আঁকা সিন-সিনারি অথবা বিশাল সব কাট-আউটে দৃশ্যের পরিচিতি—মোদ্দা কয়েক ঘণ্টার যন্ত্রণার হাত থেকে সেদিন দর্শকদের অব্যাহতি দিয়েছিল নাটকটি। ১৯৬৮ সাল, স্থানীয় বান্ধব নাট্যমঞ্চে—সে এক ভিন্ন অভিজ্ঞতা সেদিনের, মুখ্য ভূমিকাভিনেতা এই প্রতিবেদক। সেই প্রথম প্রত্যক্ষ করা গিয়েছিল নাটকে নিয়ন্ত্রিত আলোর ভূমিকা। একটিমাত্র বিরতিতে ঘণ্টা দুয়েকের চলমান ঘটনাপ্রবাহ মঞ্চে। সে ধারা আজও প্রবাহমান। শ্রদ্ধেয় প্রবীর রায়ের পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চ বিন্যাসে দীপক কর্মকার এবং আলোকসম্পাতে অসিত গুহ নিয়োগীর ভূমিকাও প্রশংসনীয়।

অগ্রণী থেকে প্রান্তিক—মাত্র ছয় বছরের ব্যবধানে আরেকটি গ্রুপ উল্লেখযোগ্য থিয়েটারে (১৯৬৭—১৯৭৯)। অধুনালুপ্ত প্রান্তিক অমর বিশ্বাসের পরিচালনায় খুব সহজেই শহরের নাট্যধারায় নিজেদের জায়গা করে নেয়। সমসাময়িক নাট্য প্রযোজনায়—আজকাল, দুই মহল, ফেরারি ফৌজ, আবর্ত উল্লেখযোগ্য। গ্রুপ থিয়েটারের ইতিহাসে প্রান্তিকের 'আবর্ত' নাটকটি প্রথম শ্রেষ্ঠ প্রযোজনার সম্মান লাভ করে ১৯৭২ সালে, নিউ বঙ্গাইগাও রেলওয়ে ইনস্টিটিউট আয়োজিত সারা বাংলা নাট্য প্রতিযোগিতায়। পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন শ্রদ্ধেয় প্রবীর রায়। পরের বছর অগ্রণীর 'পুষ্পক রথ' নাটকটিও একই সম্মান লাভ করে উক্ত প্রতিযোগিতায় এই প্রতিবেদকের নির্দেশনায়।

উপরোক্ত ঘটনাদ্বয়ে প্রকাশিত—থিয়েটারের উৎকর্ষতায় খুব অল্প সময়েই গ্রুপ থিয়েটারের ভূমিকা। এই শহরের শতবর্ষ অতিক্রান্ত,



মোহিত চট্টোপাধ্যায় রচিত 'স্বদেশী নকসা'র একটি দৃশ্য প্রযোজনা : আর্য নাট্য সমাজ, জলপাইগুড়ি



কলাকুশলী প্রযোজিত নাটকের একটি দৃশ্য

নাটকের ইতিহাসে পরবর্তী চল্লিশ বছরে গ্রুপ থিয়েটারের প্রাধান্য অনস্বীকার্য। চিন্তায়, চেতনায়, নিষ্ঠায়, সততায়—সহায় সম্বলহীন শুধুমাত্র দর্শক-সহানুভূতিনির্ভর, নাটকপাগল কিছু নাট্যকর্মী তবু নিরলস এই শহরে। মাথার ওপর নিশ্চিন্ত ছাদটুকুর ভাবনা যাঁদের সর্বক্ষণ, নিয়মিত মহড়ার জন্য যাযাবরের মতন ঘুরে বেড়ানো যাঁদের নির্দিষ্ট—কেবলমাত্র থিয়েটারকে ভালবেসে এঁদের সম্মিলিত প্রয়াস নিঃসন্দেহে শহরের নাট্য আন্দোলন স্বমহিমায় উজ্জ্বল।

সত্তরের দশকে উল্লেখযোগ্য সংযোজন—কলাকুশলী, মৌচাক, প্রগতি, শিল্পী সংসদ। উপরোক্ত সংস্থাগুলির মধ্যে কলাকুশলী নাট্যসংস্থার রজতজয়ন্তী বর্ষ উদ্‌যাপন (১৯৭৪—১৯৯৯) সগর্বে উল্লেখের। বিগত ২৫ বছরে মোট ৪০টি সময় উপযোগী নাটক প্রযোজনায় সমৃদ্ধ জলপাইগুড়ি কলাকুশলী। এর মধ্যে ১৫টি সংস্থার মৌলিক প্রযোজনা। নাটকের গড় হিসেবেও কিন্তু এই শহরে সর্বাধিক প্রযোজনার কৃতিত্ব এখন পর্যন্ত সম্ভবত কলাকুশলীর। জরুরি অবস্থার সময় বিনা অনুমতিতে 'সিংহাসন' নাটকের অভিনয় সংস্থার একটি সাহসী পদক্ষেপ। বিশ্বায়নের বিপদ সূচিত করে ১৯৯৪ সালে অভিনীত 'খুড়োর কল' নাটকটি সংস্থার দূরদর্শিতার পরিচায়ক। শুধুমাত্র এই শহরেই নয়, সমগ্র উত্তর বাংলায় এবং তার বাইরেও নানারকম আমন্ত্রণমূলক ও প্রতিযোগিতামূলক নাট্যানুষ্ঠানে কৃতিত্বের স্বাক্ষর সহ আজও স্বমহিমায় উজ্জ্বল জলপাইগুড়ি কলাকুশলী। সংস্থার সর্বাধিক অভিনীত এবং সর্বাধিক বিতর্কিত অপেরাধর্মী ব্যঙ্গ-সম্পূর্ণ রাজনৈতিক মৌলিক প্রযোজনা 'সঙের পালা'—বিষয়বস্তু এবং উপস্থাপনার অভিনবত্বে নাট্য আন্দোলনে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

মৌচাক, প্রগতি এবং শিল্পী সংসদ—সত্তরের দশকের এই সংস্থাগুলোর প্রযোজনার সংখ্যা খুব বেশি না হলেও মৌলিক প্রযোজনায় মৌচাকের বিকাশ নিয়োগী, প্রগতির অপূর্ব মুখোটি এবং শিল্পী সংসদের সত্যজিৎ রায় নিজেদের রচনায় যে যাঁর সংস্থাকে সমৃদ্ধ করেছেন নিঃসন্দেহে। শিল্পী সংসদ অধুনা লুপ্ত হলেও মৌচাক এবং প্রগতি থিয়েটার আর তেমনভাবে সজীব নয় এখন।

'শত পুষ্প বিকশিত হোক'—হয়তো এমন ভাবনায় সুবাসিত হবার আকাঙ্ক্ষা তীব্রতর হতে পারে কিন্তু থিয়েটারে? বিশেষত আমাদের এই ছোট্ট শহরে ক্ষতির সম্ভাবনার দায়টা থেকেই যায় শেষ পর্যন্ত। সে হিসেবের ভার না হয় সময়ের ওপর ছেড়ে দিয়ে আপাতত চোখ ফেরাই আশির দশকে।

শিল্পীসংসদ ভেঙে শিলালী। শিলালী ভেঙে অন্বেষা আর তার সঙ্গে মুখোশ এবং ভলুয নাট্য সংস্থা। সংখ্যাধিক্যের জোয়ারে গ্রুপ থিয়েটার। এই পর্বে পথ নাটকে শিলালীর ভূমিকা লক্ষণীয়। শিলালীর অশোক ভট্টাচার্যের লেখা—সৈনিক বহু অভিনীত এবং পুরস্কৃত। প্রসূন বন্দোপাধ্যায়ের আমি ভিক্টর বলছি আরেকটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন শিলালীর পথ নাটকে। অন্বেষার স্বরবর্ণ পুরস্কারপ্রাপ্ত নাটক—সংস্থার অন্যতম নাট্যকার সন্দীপ বন্দোপাধ্যায় সংস্থার সম্পদ হলেও কিন্তু তেমন কার্যকরী ভূমিকা লক্ষ করা যাচ্ছে না আপাতত। ছোটদের হিংটিং সংস্থাও মাঝেমধ্যে, নিয়মিত নয় প্রযোজনায়।

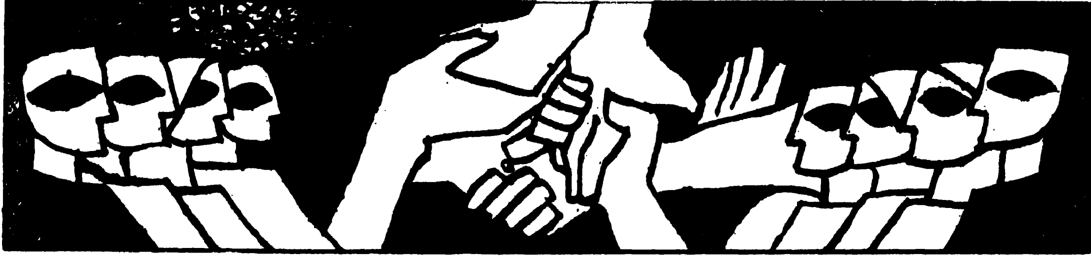
নব্বইয়ের দশকে সম্বোধি। সম্বোধি ভেঙে চিত্তপট। মুখোশ ভেঙে সায়ুধ আবার খুব অল্প সময়েই সায়ুধ ভেঙে উদীচী। আর এর সঙ্গে ইমন। সংখ্যাটা কম নয় নব্বইয়ের। '৯১ সাল থেকে মোট ৮টি নাটক প্রযোজনার ইতিহাস সম্বোধীর। নকশীকাঁথার গান এবং খোয়াব এদের সর্বাধিক অভিনীত নাটক। পুরস্কারপ্রাপ্ত নাটক প্রথমটি। মুখোশ নাট্যসংস্থার নাটকগুলির মধ্যে মহেশ, শতাব্দীর পদাবলী, মৃত্যুহীন বেঞ্জামিন, নৈশভোজ, ত্রিংশ শতাব্দী উল্লেখযোগ্য। তবে সর্বভারতীয় স্তরে লক্ষ্ণৌয়ে অনুষ্ঠিত নাট্য প্রতিযোগিতায় ত্রিংশ শতাব্দীর সাফল্যের পর যে আশার সঞ্চার হয়েছিল নাট্য আন্দোলনে তার বিপরীত পরিণতি হতাশাব্যঞ্জক হলেও সংস্থার ভাঙনে উদ্ভূত সায়ুধ এবং সায়ুধ থেকে উদীচী, নাট্য আন্দোলনে নিজেদের সঠিক উত্তরাধিকার বহনে সক্ষম হবে—এই আশা।

ইমনের 'একটি উপচ্ছায়ার কাহিনী অবলম্বনে' এবং 'কর্ণকথা' ভিন্ন স্বাদের দুটি প্রযোজনা। তবে কর্ণকথা-র কলকাতায় আমন্ত্রিত অভিনয় নিঃসন্দেহে আরেকটি মাত্রা যোগ করতে পেরেছে শহরের নাট্যধারায়। প্রযোজনাটির রচয়িতা এবং নির্দেশক শৈবাল বোস খুব অল্প সময়েই এই কৃতিত্বের অধিকারি—এ বড় কম কথা নয়।

শতাব্দীর শেষলগ্নে আরেকটি নাট্য সংস্থা—নাটমহল। প্রখ্যাত সাহিত্যিক নারায়ণ সান্যালের 'তিমি তিমিঙ্গিল' উপন্যাসের নাট্যরূপ নিয়েই আবির্ভাব নাটমহলের। প্রত্যাশা জাগিয়েছেন নিঃসন্দেহে শহরের বর্ষীয়ান নাট্যকার সমর চৌধুরী।

নতুন শতাব্দীর দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে বিগত শতবর্ষকে সঠিকভাবে দেখা দুঃসাধ্য, তবু একটা চেষ্টামাত্র। বহু মানুষের সক্রিয়তায় এবং মিলিত উদ্যোগেই আমাদের নাট্যচর্চা। পূর্বসূরিরা তেমনভাবে লিপিবদ্ধ করে যাননি পুঙ্খানুপুঙ্খ এই মহান প্রয়াস। তাই কিছু অভিজ্ঞতা—কিছু অনুমান, কিছুটা সাক্ষাৎকার এবং কিছু লেখালেখির ওপর ভিত্তি করেই লেখা—ত্রুটিমুক্ত, এ দাবির ধৃষ্টতা নয় বরং বিনীতভাবে এ আমার সশ্রদ্ধ নিবেদন।

লেখক ❑ জেলার নাট্য আন্দোলনের অন্যতম ব্যক্তিত্ব, নাট্যকার, নাট্য পরিচালক ও অভিনেতা

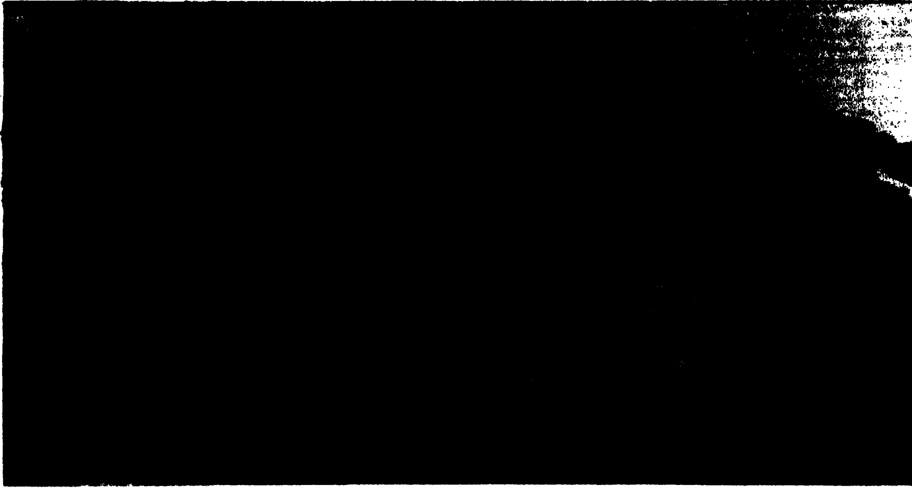


অঞ্জন সেনগুপ্ত

জলপাইগুড়ি জেলার খেলাধূলা

চা বাগান ঘেরা, সমৃদ্ধশালী প্রাকৃতিক সম্পদে বলীয়ান, ঐতিহ্যপূর্ণ, শিক্ষা-সংস্কৃতি-খেলাধূলায় যার নাম কলকাতার সঙ্গে একাসনে বসানো হত, সেই জলপাইগুড়ি শহর আজ নানা কারণে মৃতপ্রায়। তার মধ্যেও কিছু কিছু সংস্থা গঠনমূলক কাজের মধ্য দিয়ে জলপাইগুড়ির সুনামকে স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। খেলাধূলার ক্ষেত্রে জলপাইগুড়ি জেলা ক্রীড়া সংস্থা এমনই একটি সংগঠন। আজকের কথা লিখতে গিয়ে পূর্বসুরিদের স্মরণ না করলে অন্যায় হবে।

ফুটবল : ১৮৯৮ সালে কলকাতার ফুটবল লিগ খেলা শুরু হয়। সে বছরই জলপাইগুড়ি টাউন ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়। এর থেকেই বোঝা যায় যে জলপাইগুড়ির খেলার ঐতিহ্য কত প্রাচীন। ১৯১৫ সালে শুরু হয় 'লিজ ক্লাব টুর্নামেন্ট'। এই খেলায় তৎকালীন উত্তরবঙ্গের দলগুলো যেমন নীলকামাড়ি, গাইবান্দা, দিনাজপুর, সোদপুর, কাটিহার, B. D. Rly, বগুড়া, পাবনা, রাজসাহী প্রভৃতি জেলাগুলো অংশগ্রহণ করে। ১৯২৯ সালে সোনাউল্লা শিল্ড খেলা আরম্ভ হয়। এই খেলাতেও জেলা দলগুলো অংশগ্রহণ করে। ১৯৩৬-৩৭ সালে তৎকালীন D. C এস কে দে মহাশয় জলপাইগুড়ি খেলার জগতে একটা পরিবর্তন আনেন। তিনি নিজেও খেলতেন। সেই সময়, চাকরি দিয়ে তিনি জলপাইগুড়িতে নিয়ে আসেন মোজাম্মেল হক ও প্রাণেন্দু দাসকে। প্রখ্যাত খেলোয়াড় দুলাল গুহঠাকুরতাও তখনি আসেন এখানে চাকরির সুবাদে। এঁদের নিয়ে টাউন ক্লাবের বাইরে দল গড়েন এস কে দে মহাশয়। পরবর্তীতে এঁরাই জেলার খেলার মানকে উন্নত করেন। ১৯৪১ সাল, জলপাইগুড়ি টাউন ক্লাব অংশগ্রহণ করল আই এফ এ শিল্ডে। শক্তিশালী কাস্টম্‌স দল, যে দলে খেলতেন বিখ্যাত ফুটবলার জার্ডিন, টাউন ক্লাব তাদের দু গোলে পরাজিত করে। পরের খেলায় এরিয়ান্সও পরাজিত হল দু গোলে। দুর্ভাগ্য, আইনি কারণে সেই খেলা বাতিল হয়ে যায়। সন্তোষ ব্যানার্জি, ফজলার রহমান, নীধু বোস, মহেন্দ্র ঘটক, মহম্মদ আহমেদ, তালেব মহম্মদ,



১৯৪৭ সালে জলপাইগুড়ি জেলার প্রখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড়গণ : (উপবিষ্ট বাঁদিক থেকে রবি বিশ্বাস. এ গড়গড়ি. মুজাম্মেল হক. আমিন. আফসর আলি. রণু গুহঠাকুরতা প্রমুখ

সুরেনচন্দ্র, অঘোর রায়চৌধুরী প্রমুখ খেলোয়াড়েরা অংশ নিয়েছিলেন সেই খেলায়। এঁদের সমসাময়িক ছিলেন জামীর মিঞা, রজনী বসু, সন্তোষ ব্যানার্জি, ব্যোমকেশ মজুমদার, মন্মথ তলাপাত্র, ললিত দত্ত, রমেশ দাস, ব্রজেশ্বর সান্যাল, রমেশচন্দ্র রায়, গণেশচন্দ্র রায়, শৈলেশচন্দ্র রায় (লেবু), ভবকিঙ্কর ব্যানার্জি, সুরেশ রায়, ভুবন ভৌমিক, সরোজেন্দ্রদেব রায়কত, নলিনীকান্ত রাহুত, কামিনীকান্ত রাহুত, ধীরেন ভৌমিক, সত্যেন্দ্রপ্রসাদ রায়. বীরেন ঘোষ, গোড়া মহলানবিশ. আইসা সরকার, বাইসা সরকার, নৃপেন মৌলিক, মধু মৌলিক প্রমুখ।

১৯৪০ সালে জলপাইগুড়িতে ফুটবল খেলা আরও প্রসার লাভ করে। মহেশ্বর ঘটক, হিমাদ্রি ভাদুরি, শ্রীরাম সিংহ, হেমন্ত সরকার, শৈলেন চক্রবর্তী. জ্যোতিভূষণ ঘোষ, অরুণ সেন, ইয়াসিন আলি প্রমুখ বিশিষ্টগণ জে ওয়াই এম এ ক্লাব গঠন করেন। পরবর্তীতে মন রাহুত, নুন্ট রাহুত এবং কল্যাণ রাহুতের উদ্যোগে এফ ইউ সি ক্লাব, শঙ্কর মুখার্জির নেতৃত্বে রায়কতপাড়া ক্লাব, অলোক মুখার্জি ও কেষ্ট গুহনিয়োগীর প্রচেষ্টায় জে ওয়াই সি সি ক্লাব গড়ে ওঠে। '৪০ এবং '৫০এর দশকে যেসব খেলোয়াড়েরা সুনাম অর্জন করেছেন তাঁদের মধ্যে মহেশ্বর ঘটক, অরুণ ব্যানার্জি, প্রবোধ সাহা, সুধীন পাল (মাস্টারদা), সিদ্দিক, বাচ্চা আহমেদ, মোজাম্মেল হক, প্রাণেন্দু দাস, শঙ্কর মুখার্জি. মিথিলেশ গাঙ্গুলি, রুণু গুহঠাকুরতা. মণিলাল ঘটক, নীতি ঘটক, নারু রায়, কুটি রায়, রুণু গুহনিয়োগী, প্রসাদ মুখার্জি, আফসার আলি চৌধুরী, দেবু বোস, শিবু সিন্হা, বাচ্চু বোস, মেনকা দে, মোজারুল, মহাসিন, মহঃ বাকী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

১৯৪৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ক্রীড়া ফেডারেশন তৈরি করার পেছনে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম জলপাইগুড়ির তৎকালীন ক্রীড়া সংগঠক সত্যেন্দ্রপ্রসাদ রায়। তিনি তখন থেকে অনেকদিন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ক্রীড়া ফেডারেশনের সভাপতি ছিলেন। ১৯৪৭ সালে প্রথম জেলাভিত্তিক ফুটবল প্রতিযোগিতা হয় জলপাইগুড়িতে। এই খেলায় জলপাইগুড়ি জেলা দল রানার্স আপ হয়। '৫০-এর দশকে ফুটবল খেলা হত ওয়ার্ড ভিত্তিতে। সেই সময়ে খেলার মাঠে জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব সত্যেন্দ্রপ্রসাদ রায় মহাশয় অনুভব করলেন এই খেলাগুলোকে একটি নিয়মের মধ্যে আনা দরকার অর্থাৎ খেলাগুলোর একটি সাংগঠনিক রূপ দেওয়া দরকার। এদিকে সে সময় 'সারা রাজ্য ক্রীড়া ফেডারেশন' গঠিত হয়েছিল এবং তিনি ছিলেন তার সভাপতি। ওঁর সক্রিয় উদ্যোগে ১৯৫৪ সালে সৃষ্টি হয় 'জলপাইগুড়ি জেলা ক্রীড়া সংস্থা' (D.S.A)। শুরু হয় 'জেলা ক্রীড়া সংস্থার' ব্যবস্থাপনায় ক্লাবগুলোর মধ্যে লিগ পর্যায়ে ফুটবল খেলা। জলপাইগুড়িতে পরবর্তী পর্যায়ে সুনামের সঙ্গে খেলেছেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে বুড়া মুখার্জি, বাচ্চু সান্যাল, সুশীল সেন, রবি চক্রবর্তী, মঙ্গল ভৌমিক, অরুণ লামা, রঞ্জন (হাকিমপাড়া), প্রবীর দত্ত, বাচ্চুলাল ব্যানার্জি, শম্ভুলাল দে, রতন দত্ত, ভানু চক্রবর্তী, নৃপেন সেন, রাণু চক্রবর্তী, কমল ভৌমিক, বরুণ সান্যাল, সন্তু চ্যাটার্জি, ভলেন বাসুনিয়া, ভোলা রায়, গিরীন বাসুনিয়া, বিষ্ণু মুখার্জি, অমল দত্ত, টটাই গুহ, সুজিত গুহ, সুকল্যাণ ঘোষদস্তিদার, মিলন ঘোষ, বিপ্লব মজুমদার, পীযূষ সরকার, বুদ্ধ বাগচী, অমল সরকার প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

শিল্ড প্রতিযোগিতা : প্রথমে লিজ টুর্নামেন্ট, তারপর সোনাউল্লা টুর্নামেন্ট, পরবর্তীতে জলপাইগুড়ির নবাবসাহেব 'বেগম ফয়েজউন্নিসা'র নামে ফুটবল প্রতিযোগিতা শুরু করেন। এই প্রতিযোগিতায় কলকাতার দলগুলো অংশগ্রহণ করে। পরবর্তীতে 'প্রসন্নদেব স্মৃতি'



জলপাইগুড়ি জেলা ফুটবল প্রতিযোগিতায় প্রাপ্ত বিভিন্ন স্মারক

ফুটবল প্রতিযোগিতা এবং তারও পরে 'সন্তোষকুমার ব্যানার্জি স্মৃতি' ফুটবল প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়।

আমাদের সাফল্যের পরিসংখ্যান : সিনিয়ার জেলাভিত্তিক প্রতিযোগিতায় চাম্পিয়ন হয়েছে—১৯৬৩, ৬৪, ৮০ ও ৯৫ সালে এবং রানার্স আপ হয়েছে, ১৯৪৭, ৬৬, ৯৮ সালে। 'আই এফ এ' পরিচালিত আন্তঃজেলা ফুটবল প্রতিযোগিতায় রানার্স আপ হয়েছে ১৯৯৬ সালে। জুনিয়ার জেলাভিত্তিক প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে—১৯৯৬, ৯৯ সালে। রানার্স আপ হয়েছে—১৯৮১, ৮৫ ও ৮৭ সালে। সাব জুনিয়ারে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে—১৯৯৬, ১৯৯৮ সালে।

ক্রিকেট : জলপাইগুড়ির ক্রিকেট শুরু হয় '৪০ এর দশকে। শুরু করে ফণীন্দ্রদেব ও জেলা স্কুল। তারপর মেডিক্যাল স্কুলেও শুরু হয় ক্রিকেট। সেই সময় ক্রিকেটের প্রসার লাভে মেডিক্যাল স্কুলের ভূমিকা অনস্বীকার্য। অনেক প্রতিভাবান ক্রিকেটারই ছিলেন মেডিক্যাল স্কুলে। তার মধ্যে অন্যতম লাহিড়ীদা।

টাউন ক্লাবে '৪০-এর দশকের শেষ দিকে ক্রিকেট খেলা শুরু হয়। সে সময়ের কয়েকজন প্রতিভাবান ক্রিকেটারের নাম ডি পি রায়, জে পি রায়, (দুজনেই এস পি রায়ের সুযোগ্য পুত্র)। রথীন সেন, অরুণ ব্যানার্জি (লালু) পাকড়াশী, নাড়ু রায়, বাঘা সেন, কুট্টি রায়, মহুয়া ব্যানার্জি, অমিয় ব্যানার্জি প্রমুখ। অরুণ ব্যানার্জি বাংলার হয়ে রনজি ট্রায়ালে সুযোগ পেয়েছিলেন। জে পি রায় (গেদু রায়) সেই সময়কার শ্রেষ্ঠ বোলার ছিলেন। তিনি দুদিকেই সুয়িং করাতেন। তার সঙ্গে বিধ্বংসী বোলার ছিলেন কিনিকিনি। তখন উইকেটরক্ষক ছিলেন আলো রায়। তিনি জোরে বলের বিরুদ্ধেও সামনে দাঁড়িয়ে উইকেট রক্ষা করতেন। সেই সময় জে ওয়াই এম এ ক্লাবেও ক্রিকেট শুরু হয়ে যায়। এফ্ ইউ সি ক্লাব ক্রিকেট শুরু করে '৫০-এর শুরুতে। এই সময়ই প্রসারিত হয় জলপাইগুড়ির ক্রিকেট। আনন্দ চন্দ্র কলেজে তখনই ক্রিকেট শুরু হয় বেশ কিছু প্রতিভাবান ছেলের উদ্যোগে। এদিকে ঢাকার ক্রিকেট খেলোয়াড় অমূল্য বসুঠাকুর এবং শচীন্দ্র বসুঠাকুর জলপাইগুড়ি পলিটেকনিকে ক্রিকেট খেলা শুরু করে দেন। সে সময় জলপাইগুড়িতে কোনো লিগ খেলা হত না। নয়াবস্তি পাড়া, বাবুপাড়া এবং উকিলপাড়ায় পাড়াভিত্তিক ক্রিকেট খেলা হত।

জলপাইগুড়ি ক্রিকেট ইতিহাসে ১৯৫৪ সাল একটি উল্লেখযোগ্য সময়। সেই সময় আনন্দ চন্দ্র কলেজে যাঁরা খেলতেন তাঁরা অনুভব করেছিলেন তাঁদের খেলায় কোথায় যেন একটা ঘাটতি থেকে যাচ্ছে। তাই তাঁরা নিজেরাই উদ্যোগ নিয়ে কলকাতা থেকে ক্রিকেট প্রশিক্ষক শিবাজী বোসকে দিয়ে এক মাসের এক ক্রিকেট প্রশিক্ষণ শিবিরের ব্যবস্থা করেন। বলা যায় তখন থেকেই জলপাইগুড়িতে ক্রিকেটীয় ব্যাকরণ মেনে খেলা শুরু হয়। এই সময়েরই উল্লেখযোগ্য ঘটনা জলপাইগুড়ি ক্রিকেট লিগের প্রথম বছরেই—এ সি কলেজ চ্যাম্পিয়ন হয়। সেই দলে যাঁরা খেলেছিলেন তাঁদের মধ্যে মনোজ ব্যানার্জি (ক্যাপ্টেন), জ্যোতিপ্রকাশ রায় (গছু), কিনিকিনি, সুব্রত বোস, মঙ্গল ভৌমিক, মানিক রায়, রবি চক্রবর্তী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। জলপাইগুড়ি জেলাদল প্রথম আন্তঃজেলা ক্রিকেট খেলতে যায় কোচবিহারে ১৯৫৪ সালে। সেই দলের খেলোয়াড় ছিলেন কুটি রায় (ক্যাপ্টেন), বাঘা সেন, রবি ঘোষ, তিনু বসুঠাকুর, বাবলু বসুঠাকুর,

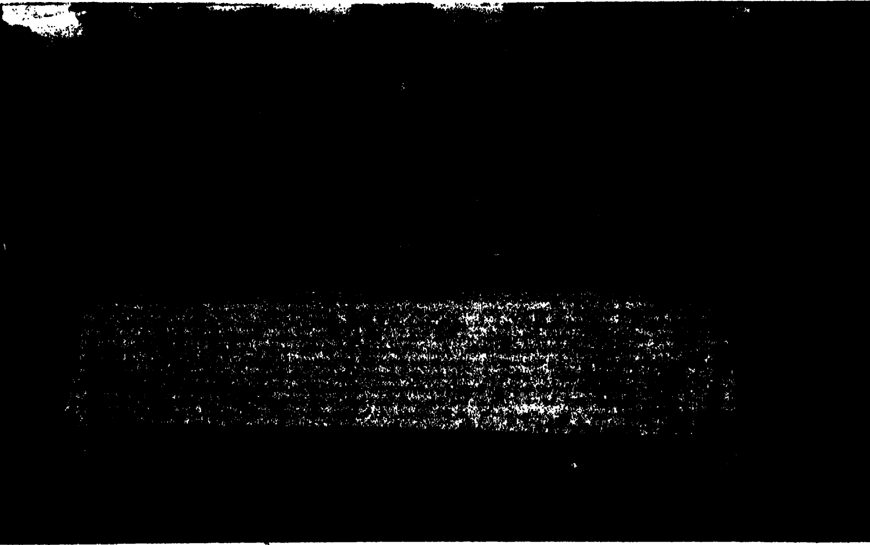


আন্তঃজেলা সাব জুনিয়র ফুটবল প্রতিযোগিতা চ্যাম্পিয়ান ১৯৯৮ : জলপাইগুড়ি জেলা দল

মঙ্গল ভৌমিক, মহুয়া ব্যানার্জি, আবু বোস, আলো রায় (উইকেটরক্ষক) রঞ্জন ও অসিত গাঙ্গুলি প্রমুখ।

'৬০-এর দশক জলপাইগুড়ি ক্রিকেটের স্বর্ণযুগ। সেই সময় এক ঝাঁক প্রতিভাবান ক্রিকেটারকে আমরা পাই। তারই ফলশ্রুতি ১৯৬৬- তে আন্তঃজেলা ক্রিকেটে জলপাইগুড়ির জয়। সেই দলে যাঁরা ছিলেন—বাবলু বসুঠাকুর (ক্যাপ্টেন), অশোকপ্রসাদ রায়, ধ্রুব রায়, বাবলু রায়, অভিজিৎ রায়, নীলু রাহুত, সুভায মুখার্জি, ফার্নান্ডেজ, বাবলু বোস, কেষ্ট চক্রবর্তী, সুব্রত ভৌমিক, স্নেহময় রায় প্রমুখ খেলোয়াড়। '৬০-এর দশক এবং '৭০-এর দশকে সেসব প্রতিভাবান ক্রিকেটারদের আমরা পেয়েছি তাঁদের মধ্যে মন্টু সান্যাল, সুভাষ মুখার্জি, শঙ্কর গুহঠাকুরতা, অরিন্দম গুপ্ত, মিলন ঘোষ, দিলীপ বোস, অজয় দাস, দেবজিৎ নাগ, প্রদীপ মুন্সী, দেবব্রত মুখার্জির নাম উল্লেখযোগ্য।

'৮০র দশকেও অনেক তরুণ প্রতিভাবান ক্রিকেটারের প্রতিভার বিকাশ ঘিরে জলপাইগুড়িতে সেই সময় তনয় দাস রাজ্যের সেরা স্কুল ক্রিকেটার নির্বাচিত হন। এই দশকের শেষের দিকে বিভিন্ন স্থানে ক্রিকেটে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খুলে ছোট ছোট ছেলেদের ক্রিকেটে প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু হয়। তার ফলস্বরূপ আমরা পাই রাজীব ঘোষ, বিজয় দে এবং কুনালকে যারা রাজ্য স্কুল দলে সুযোগ পায়। পরবর্তীতে অর্ণব সরকারও রাজ্য স্কুল দলে সুযোগ পায়। ১৯৯৮ সালে রাজ্যের সেরা খুদে খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়। আন্তঃজেলা ক্রিকেট প্রশিক্ষণ



আন্তঃজেলা সাবজুনিয়র ফুটবল প্রতিযোগিতা ১৯৯৮ পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

কেন্দ্রগুলোর প্রতিযোগিতায় জলপাইগুড়ির এম পি রায় মেমোরিয়াল ক্রিকেট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ১৫০টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মধ্যে রানার্স আপ হয়েছে এবং সেরা শৃঙ্খলাপরায়ণ দল হিসাবে পুরস্কৃত হয়েছে।

জলপাইগুড়ি ক্রিকেটের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা সুদীপ চন্দের বাংলা রাজ্য দলে নির্বাচিত হওয়া ১৯৯৮ সালে। এর আগে ১৯ বছরের অনূর্ধ্ব বাংলা রাজ্যদলেও খেলেছেন। এখন তিনি কলকাতার সেরা দলগুলি একটিতে নিয়মিত খেলেন।

সাফল্য : সিনিয়ারে চ্যাম্পিয়ন— ১৯৬৬, ৯৮ সালে, সিনিয়ারে রানার্স আপ—১৯৬৫, ৬৭, ৭৪, ৮৩, ৮৮, ৯২, ৯৪, ৯৫ এবং ৯৯ সালে। জুনিয়ারে চ্যাম্পিয়ন—১৯৮৭ সালে এবং সাবজুনিয়ারে রানার্স আপ—১৯৯৯ সালে।

অ্যাথলেটিক্স্ : আর একটি খেলায় এ জেলার নাম সর্বভারতীয় স্তরে যুক্ত হয়েছে, তা হল অ্যাথলেটিক্স্। জেলার ছেলেমেয়েরা রাজ্যস্তরে বহু পুরস্কার পাচ্ছে। ফলে বেশ কয়েকজন যুব ভারতীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে এবং পুরস্কার পেয়েছে। ডুয়ার্স অঞ্চলের ছেলেমেয়েরা মূলত অ্যাথলেটিক্স্ চর্চা করে অথচ সেখানে এর উপযোগী আধুনিক সরঞ্জাম নেই। সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থাগুলো যদি এ ব্যাপারে এগিয়ে আসে তাহলে আমাদের জেলা অ্যাথলেটিক্সে অনেক দূর এগিয়ে যাবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমাদের প্রতিভাবান অ্যাথলেটদের নাম শতদল দে, লতিকা মজুমদার, ছবি সাহা, জ্যোৎস্না রায়প্রধান প্রমুখ। সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায়—গোপাল মাহাতো, পরীক্ষিত রায়, সান্ত্বনা বর্মণ, দীপা রায়, বিনোদ রায় প্রমুখ অংশ নিয়েছিলেন।

সাফল্য : ১৯৯৬ সালে জেলা দল রানার্স হয়। ১৯৯৭ সালে বয়সভিত্তিক দুটো গ্রুপে চ্যাম্পিয়ন ও দল হিসাবে রানার্স হওয়ার কৃতিত্ব অর্জন করে।

ব্যাডমিন্টন : জলপাইগুড়ির আর একটি জনপ্রিয় খেলা ছিল ব্যাডমিন্টন। সেই সময় কলকাতার সঙ্গে এই শহরকে একই আসনে বসানো হত। আন্তঃকলেজ প্রতিযোগিতার ফাইনালে জেলার ছেলে অরূপ সর্বাধিক্ষ, বিখ্যাত খেলোয়াড় দীপু ঘোষের কাছে পরাজিত হন।

'৫০-এর দশকে যাঁরা কৃতিত্বের সঙ্গে ব্যাডমিন্টন খেলেছেন, তাঁরা ছিলেন নীতি ঘটক, কেষ্ট চক্রবর্তী, শিবু রাহুত, গিঞ্চা সিং, মঞ্জু রায়কত, বাদল সরকার প্রমুখ। পরবর্তীতে যেসব প্রতিভাবান ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড়কে আমরা পেয়েছি তাঁদের মধ্যে অনিতা ভট্টাচার্য, বাবলু বড়ুয়া, দেবাশিস বসাক প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। অনিতা ভট্টাচার্য ১৩ বছর উত্তরবঙ্গের শ্রেষ্ঠ ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় ছিলেন। ১৯৮৩ সালে তিনি বাংলার সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছিলেন। সেই বছরই তিনি মধুমিতা গোস্বামী (তখন জলপাইগুড়িবাসী ছিলেন)-কে সঙ্গে নিয়ে রাজ্য প্রতিযোগিতায় রানার্স আপ হয়েছিলেন। বাবলু বড়ুয়াও একবার রাজ্য প্রতিযোগিতায় রানার্স আপ হয়েছিলেন। জলপাইগুড়িতে ব্যাডমিন্টন প্রসারে 'উদয় সঙ্ঘে'র ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। তাঁরা প্রতিবছর অসম-বাংলার সেরা খেলোয়াড়দের নিয়ে প্রতিযোগিতা করতেন। এর আগে এফ ইউ সি ক্লাব কয়েক বছর সর্বভারতীয় খেলোয়াড়দের নিয়ে ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল। আজ জলপাইগুড়িতে আনন্দ চন্দ্র কলেজে ইনডোর জিমনাসিয়াম হয়েছে। তাকে ঘিরে ব্যাডমিন্টন অ্যাসোসিয়েশন গড়ে উঠেছে। তাঁরা রাজ্যস্তরের ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু এখনও এ জেলায় সর্বস্তরে ব্যাডমিন্টন সেভাবে প্রসার লাভ করেনি।

১৯৪৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ক্রীড়া ফেডারেশন তৈরি করার পেছনে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম জলপাইগুড়ির তৎকালীন ক্রীড়া সংগঠক সত্যেন্দ্রপ্রসাদ রায়। তিনি তখন থেকে অনেকদিন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ক্রীড়া ফেডারেশনের সভাপতি ছিলেন। ১৯৪৭ সালে প্রথম জেলাভিত্তিক ফুটবল প্রতিযোগিতা হয় জলপাইগুড়িতে।

হকি : '৫০-এর দশকে জলপাইগুড়ির জনপ্রিয় খেলা ছিল হকি। হকি মূলত স্কুলগুলিতেই খেলা হত। ফণীন্দ্রদেব, জেলা, সোনাউল্লা প্রভৃতি স্কুল এমন কি আনন্দ মডেল স্কুল (যেখানে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানো হত) হকি খেলত। তাছাড়া টাউন ক্লাব, জে ওয়াই এম এ, জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল স্কুল এবং জলপাইগুড়ি পুলিশ ক্লাব প্রভৃতি ক্লাব হকি খেলত। তবে হকিতে কোনো লিগ খেলা হত না, নিজেদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ খেলা হত। তবে প্রতি বছর কোচবিহারের সঙ্গে জে ওয়াই এম এ' র ম্যাচ খেলা হত। এখন জলপাইগুড়িতে আর হকি খেলা হয় না।



আন্তঃজেলা ভলিবল লীগ, ১৯৯৯ জলপাইগুড়ি জেলা

ভলিবল : ভলিবল আজ খুবই জনপ্রিয়। বিভিন্ন খেলা আজ ব্যয়বহুল হওয়ায়, গ্রামবাংলায় ভলিবল খেলা প্রসার লাভ করেছে। আমাদের জেলায় এই খেলা প্রায় '৫০-এর দশকে শুরু হয়। সে সময় পাড়া ভিত্তিক ভলিবল ম্যাচ খেলা হত। পরবর্তীতে পুলিশ ক্লাব, ফায়ারব্রিগেড কর্মী এবং তারও পরে পলিটেক্‌নিকের ছেলেরা ভলিবল খেলা শুরু করে।

সেই সময় জেলার বিভিন্ন স্থানে ভলিবল খেলার প্রতিযোগিতা হত এবং তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হত। এখন প্রায় ১৫টি ক্লাবে ভলিবল খেলা হয়। লিগ ভিত্তিতে খেলা হয়, এবং প্রতিবছরই আকর্ষণীয়ভাবে লিগ ম্যাচ শেষ হয়। তাছাড়া জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে কয়েকটি টুর্নামেন্টও খেলা হয় প্রতিবছর। এখানে রাজ্যভিত্তিক ভলিবল প্রতিয়োগিতার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তা সত্ত্বেও ভলিবলে আমাদের মান খুব একটা আশাপ্রদ নয়।

জেলার খেলায় আরো কয়েকটা বিভাগ আছে। যেমন— বাস্কেটবল, সাঁতার, কবাডি, টেবিল টেনিস প্রভৃতি। এরা নিজেদের সংস্থার মাধ্যমে জেলায় এই খেলাগুলো চালায়। বাস্কেটবল ও কবাডিতে রাজ্য প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তা সত্ত্বেও এই সমস্ত খেলার ধারাবাহিকতা না থাকায় এগুলোতে আমাদের জেলার মান খুব একটা ভালো নয়।

জেলা স্কুল ক্রীড়া সংস্থা : জলপাইগুড়ির খেলাধূলায় এই সংস্থার ভূমিকার কথা না লিখলে এই প্রতিবেদন অসম্পূর্ণ থাকবে। এই সংস্থার ব্যবস্থাপনায় জেলাকে কয়েকটি অঞ্চলে ভাগ করে বিভিন্ন বয়সভিত্তিক খেলা পরিচালনা করা হয়। যেমন—ফুটবল, অ্যাথলেটিক্স, খোখো, কাবাডি, ক্রিকেট প্রভৃতি এবং এই খেলাগুলোর রাজ্যভিত্তিক প্রতিযোগিতায়ও অংশ নেওয়া হয়। প্রতিবছর জেলাস্তরে স্কুল ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় হয়।



বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ১৯৯৯, জলপাইগুড়ি জেলা

আমাদের জেলা দল ১৬ বছরের খেলায় রাজ্য চ্যাম্পিয়ন এবং ১৪ বছরের খেলায় রানার্স আপ হয়েছিল ১৯৯৯ সালে। স্কুল অ্যাথলেটিক্‌সে জেলার মান খুবই ভালো। বেশ কয়েকজন সর্বভারতীয় স্কুল প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে।

বিদ্যালয় ক্রীড়া সংস্থার এই প্রচেষ্টা সামগ্রিকভাবে জেলার খেলার মানোন্নয়নে সাহায্য করেছে বলে আমার বিশ্বাস।

সামগ্রিক পর্যালোচনা : জলপাইগুড়ির কৃতি সন্তান রুণু গুহঠাকুরতা, মণিলাল ঘটক, সুকল্যাণ ঘোষদস্তিদার। মনীশ (নীতি) ঘটক, বিপ্লব মজুমদার, ভোলা রায়, আফসার আলি চৌধুরী,

ভলেন বাসুনিয়া, শিবু দে প্রমুখ কলকাতার প্রথম সারির দলে ফুটবল খেলেছেন রুণু গুহঠাকুরতা, মণিলাল ঘটক, সুকল্যাণ ঘোষদস্তিদার ভারতীয় দলেও একাধিকবার খেলেছেন। অভয় মাহাতো দীর্ঘদিন ধরে সর্বভারতীয় বি এস এফ-এর হয়ে খেলেছেন। বিপ্লব মজুমদার যুব বাংলা দলের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন। তাছাড়া আরো অনেকে কলকাতার বিভিন্ন ক্লাবে খেলেছেন।

আজ যে ভয়াবহ আর্থ-সামাজিক অবস্থা তার প্রতিফলন আমরা মাঠেও দেখতে পাই। অস্বীকার করবার উপায় নেই। খেলাধুলার জগৎ এই জেলায় ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়ে পড়ছে। 'খেলে কি হবে'?— এরকম এক ধারণা যুবসমাজের মনে স্থান পেয়েছে। অথচ খেলার মাঠই পারে তাদের চারিত্রিক দৃঢ়তা বাড়াতে। পারে সাম্প্রদায়িকতা দূর করতে এবং জাতীয় সংহতি রক্ষা করতে। তাই যুবসমাজকে সুস্থ, শৃঙ্খলাপরায়ণ করে তুলতে—খেলার পরিবেশ এবং সর্বোপরি খেলাধূলাকে বাঁচিয়ে রাখতে সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে। আমরা শিহরিত হই—যখন দেখি জেলার খেলার মূলকেন্দ্র ডুয়ার্স অঞ্চলে ক্রমশ খেলাধূলা বিলীন হয়ে যাচ্ছে। আমরা জানি আদিবাসী যুবকদের শক্তি, দৃঢ়তা এবং ক্ষিপ্রতা সাধারণ ছেলেদের চেয়ে বেশি, ফুটবল সাফল্যে এদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। জেলার খেলার মানকে উন্নত করতে হলে ডুয়ার্সে খেলাধূলার চর্চা বাড়াতে হবে। এ ব্যাপারে 'ডি বি আই টি এ' এবং 'আই টি সি এ' উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। প্রতিযোগিতামূলক বিভিন্ন খেলায় তাঁরা আর্থিক সাহায্য করেন। কিন্তু তাঁরা যদি গঠনমূলক 'টাটা ফুটবল আকাদেমি'র মতো ডুয়ার্সেও একটি 'আকাদেমি' গঠন করেন, তাহলে আমার বিশ্বাস জেলার ফুটবলের মান কয়েকগুণ বেড়ে যাবে। বেকারত্বে হতাশাগ্রস্ত শারীরিক সক্ষম ছেলেরা ফুটবলের মধ্যেই খুঁজে পাবে সামাজিক নিরাপত্তা। এভাবেই সৃষ্টি হবে পেশাদার খেলোয়াড়। পেশাদারি মনোভাব না থাকলে খেলায় উন্নতি সম্ভব নয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার খেলার উন্নতিকল্পে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। যেমন—

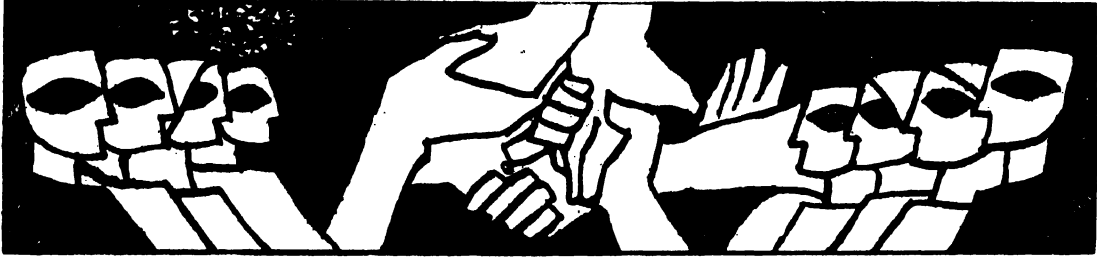
আমরা জানি আদিবাসী যুবকদের শক্তি, দৃঢ়তা এবং ক্ষিপ্রতা সাধারণ ছেলেদের চেয়ে বেশি, ফুটবল সাফল্যে এদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। জেলার খেলার মানকে উন্নত করতে হলে ডুয়ার্সে খেলাধূলার চর্চা বাড়াতে হবে। এ ব্যাপারে 'ডি বি আই টি এ' এবং 'আই টি সি এ' উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে।

স্পোর্টস কমপ্লেক্স, যেখানে ফুটবল মাঠ সহ আন্তর্জাতিক মানের অ্যাথলেটিকস্ ব্যবস্থা, মাল্টিজিম এবং বাস্কেটবল কোর্ট ও সুইমিং পুল থাকবে। এই পরিকল্পনা পূর্ণাঙ্গ রূপ পেলে জলপাইগুড়ি সহ পূর্বাচলের খেলার মান কয়েকগুণ বেড়ে যাবে। স্পোর্টস কমপ্লেক্স-কে প্রাথমিকভাবে ব্যবহারোপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য দ্রুততার সঙ্গে কাজ করা দরকার। ওখানে খেলাধূলা খুব দ্রুত শুরু করতে না পারলে ওই কমপ্লেক্সের অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে বলে আমার বিশ্বাস।

লেখক ❑ সাম্মানিক সাধারণ সম্পাদক, জলপাইগুড়ি জেলা ক্রীড়া সংস্থা



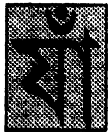
এপার বাংলা-ওপার বাংলা প্রাক্তন ফুটবল খেলোয়াড়গণের মিলনোৎসব ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠান



বিজয় দে

তিস্তাপারের কয়েকজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব

ভূমিকা

রা প্রয়াত তাঁরাই শুধু এ সংকলনে স্থান পেয়েছেন। সেজন্য বাদ পড়ে গেলেন লক্ষ্মণ মৌলিক, লাল শুকরা ওঁরাও, অসিত সেনের মতো ব্যক্তি। পরিমল মিত্র, দেবপ্রসাদ ঘোষ (পুটলা), নলিনী পাকড়াশি, যজ্ঞেশ্বর রায়, যতীন বাসুনিয়া, উমেশ চৌধুরি, টুনিয়া রায়, ঘনশ্যাম মিত্র প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত না হলে এই সংকলন অসম্পূর্ণ। জলপাইগুড়ি শহরে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। আমরা মোটামুটি তাঁদেরই নিয়েছি, যাঁদের জন্ম অন্যত্র হলেও কর্মক্ষেত্র জলপাইগুড়ি। তাঁরাই বিবেচ্য হয়েছেন। নিজস্ব জ্ঞানও খুব কম ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়েছে। এটা যেন পূর্বসূরিদের স্বীকারের সামান্য চেষ্টা। প্রয়োজনবোধে কোথাও কোথাও লেখার মধ্যেই সূত্র নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে। বাদবাকি লেখার পরিশিষ্টে। ব্যক্তিত্ব বর্ণমালা অনুযায়ী সাজানো হয়েছে।

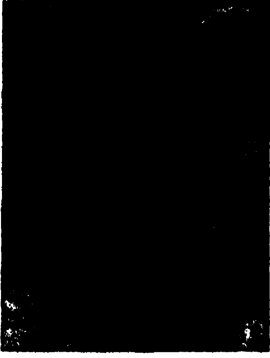
অবনী ধর গুহনিয়োগী

একজন চিকিৎসক সম্পর্কে আরেকজন অনুজ চিকিৎসকের লেখা উদ্ধৃত করে শুরু করছি পীড়িতের সেবা করাই ডাক্তারের ধর্ম। ডাঃ অবনী ধর গুহনিয়োগীর সঙ্গে আমার ছিল গুরুশিষ্যের সম্পর্ক। তিনি বলতেন : মনে করবে তুমি সেবাব্রত গ্রহণ করেছ, মানুষের সেবার মতো বড় কাজ আর নেই,............

(ডাঃ অনুপম সেন, বর্তমান বিধায়ক, কিরাতভূমি ঃ জলপাইগুড়ি জেলা সংকলন)

ডাঃ গুহনিয়োগী, সাদা খদ্দর আর চওড়া গোঁফ..... .দীর্ঘদেহের অধিকারি 'অবনী ডাক্তার' নামেই তিনি অর্ধেক পরিচিত। তিনি জন্মেছিলেন ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে। বাবার নাম গিরিধন গুহনিয়োগী, মা সুরস দেবী, পরিবারের আদি নিবাস টাঙ্গাইল, জেলা ময়মনসিং, পূর্বতন অবিভক্ত বাংলায়।

ডাঃ গুহনিয়োগী সন্তোষ জাহ্নবী হাই স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাস করেন, সেটা ১৯১৭ সাল। তারপর



অবনীধর গুহনিয়োগী

১৯২১ সনে কলকাতা বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট, তারপর ১৯২৮ সনে কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ থেকে এম বি ডিগ্রি অর্জন। এরপর ১৯৩০ সনে তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় আইনজীবী সত্যকুমার বসুর পরামর্শে, জলপাইগুড়িতে এসে চিকিৎসক বৃত্তি গ্রহণ করলেন। তিনি জড়িয়ে পড়লেন জলপাইগুড়ির জীবনপ্রবাহের সঙ্গে।

একটি সময় ছিল যখন 'পীড়িতের সেবা'ই মুখ্য, এটা কোনো কথার কথা ছিল না, তখন জলপাইগুড়ি শহরে গুটি কয়েক ডাক্তার। সাধারণ মানুষের চিকিৎসার ভার ছিল এঁদেরই হাতে। তখনকার প্রধান অসুখ যেমন কালাজ্বর, ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড, ক্ষয়রোগ ইত্যাদির চিকিৎসার জন্য রোগীরা তাঁর কাছে এসে যেন প্রাণ ফিরে পেত। এতটা নির্ভরতা ছিল তাঁদের। অথচ গরিব, অসহায় সাধারণ মানুষের অধিকাংশেরই ফি দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু অবনী ডাক্তারের চিকিৎসা চলত নিয়মিত। মানুষের প্রতি এই মমত্ববোধ তাঁর সমগ্র জীবনেই ছড়িয়ে গিয়েছিল। ডাঃ গুহনিয়োগী ছিলেন Common man's doctor. চিকিৎসা পদ্ধতিও ছিল সহজ সরল অথচ কার্যকরি। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় পর্যন্ত তাঁর চিকিৎসাপদ্ধতির যথেষ্ট তারিফ করেছেন।

আসলে তিনি ছিলেন প্রকৃত দেশপ্রেমিক। তিনি মনে করতেন মানুষের জন্য কাজ না করলে দেশের জন্য কাজ একটা অর্থহীন কথা। সমাজের উন্নতি, সামাজিক মানুষের উন্নতি ছিল তাঁর ধ্যানজ্ঞান। রাজনীতিতে নির্লিপ্ত ছিলেন না। ফলে তৎকালীন কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত থেকে (১৯৩৯-৪০) কংগ্রেসের অভ্যন্তরে সমাজবাদী কর্মীদের নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন 'কংগ্রেস সোসালিস্ট গ্রুপ'। এই সময় জলপাইগুড়ি জেলা কৃষকের আন্দোলনে উত্তাল। সংগ্রামী কৃষকরা স্লোগান দিচ্ছে 'লাঙ্গল যার জমি তার'...যে স্লোগান আজ ইতিহাস। ডাঃ গুহনিয়োগীও সেই স্লোগানের সহমর্মী. শ্রদ্ধেয় শচীন দাশগুপ্তর লেখা থেকে উদ্ধৃত করছি......'১৯৩৯-এর ১৮ জুলাই অনুষ্ঠিত হল প্রথম জেলা সম্মেলন—গরিব আধিয়ার, দিন মজুরদের দ্বারা সংগঠিত প্রথম কৃষক সম্মেলন, প্রাদেশিক নেতৃত্বের পক্ষ থেকে এলেন মহম্মদ আবদুল্লাহ রসুল। তাঁরই সভাপতিত্বে সম্মেলন পরিচালিত হয়। এই সম্মেলনেই প্রথম আধিয়ার সমস্যাকে এখানকার প্রধান সমস্যারূপে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিয়ে প্রস্তাব পাস হয়, গৃহীত হয় গাণ্ডি আদায়ের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নামার দাবি।

সেই সম্মেলনে যে কর্মকর্তা নির্বাচিত হয়, তার সভাপতিমণ্ডলীর অন্যতম ডাঃ অবনী ধর গুহনিয়োগী।

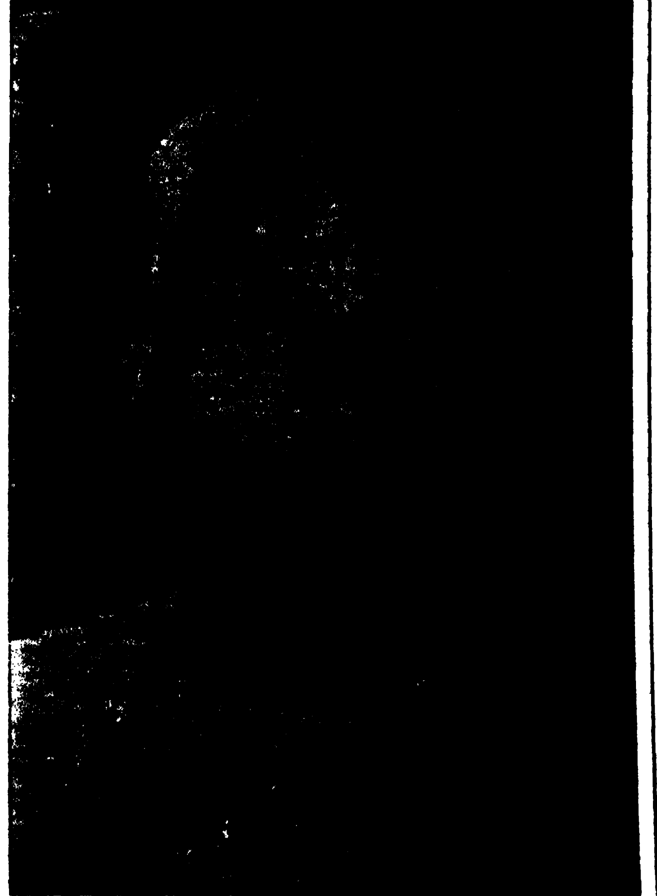
এই যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ ছিল। বাস্তুহারাদের আন্দোলনের প্রতি সমর্থন দিতে তাঁর সেজন্য দ্বিধা হয়নি। আবার ১৯৪২ সনে 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের সময় তখন সমগ্র ভারতের সঙ্গে জলপাইগুড়িও অগ্নিগর্ভ। কোর্ট-কাছারি থানা দাউদাউ করে জ্বলছে। অত্যাচারী পুলিশ গ্রেপ্তার করছে বরেণ্য স্বাধীনতা কর্মীদের, তখন সেই আন্দোলনের সমর্থনে অন্যান্যদের সঙ্গে তিনিও ১৯৩৮ সনে নির্বাচিত মিউনিসিপ্যাল-কমিশনারের পদ থেকে ইস্তফা দিতে দ্বিধা করেননি। কারাবরণ না করেও যাঁরা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সতত সক্রিয় সমর্থন জুগিয়ে এসেছেন, তাঁদের মধ্যে তিনি অন্যতম।

সমাজসেবামূলক কাজেও তাঁর অনন্য অবদান। জলপাইগুড়ির রানী প্রতিভাদেবীর সহযোগিতায় যক্ষ্মারোগীদের জন্য 'রানী অশ্রুমতী' নামাঙ্কিত টিবি হসপিটাল নির্মাণে তিনি একটি বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন। বলতে গেলে তাঁরই প্রচেষ্টায় জলপাইগুড়ি রেডক্রস সোসাইটি স্থাপিত হয়েছিল। ১৯৬৯ সালে রাষ্ট্রপতি জাকির হোসেন রেডক্রস সোসাইটিতে অসামান্য অবদানের জন্য Award of Merit প্রদান করেছিলেন। এছাড়া তিনি ১৯৩৯ থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত 'ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন' জলপাইগুড়ি জেলা শাখার সভাপতি ছিলেন। নেতাজির মর্মর মূর্তি স্থাপনেও তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল।

১৯৭৫ সনের ১৫ অক্টোবর, জলপাইগুড়িতে ডাঃ অবনী ধর গুহনিয়োগী দেহত্যাগ করেন।

উপেন্দ্রনাথ বর্মণ

জলপাইগুড়ির ভাণ্ডারের উজ্জ্বলতম রত্নের মধ্যে একজন। জন্ম জলপাইগুড়িতে নয়, কিন্তু কর্মভূমি এই শহরেই...আর এটা এই শহরের সৌভাগ্য যে, তাঁর মতো একজন সন্তানকে সে কাছে পেয়েছে। যদি তাঁর সব কীর্তি বাদও দিয়ে দিই, তাহলেও একটি কীর্তির জন্য জলপাইগুড়ির ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।



উপেন্দ্রনাথ বর্মণ

তিনি স্মরণীয়, কেননা ১৯৪৯ সালের ২৫ নভেম্বর যে ২৫২ জন প্রতিনিধি ও সংবিধান রচনাকারী ভারতীয় সংবিধানে স্বাক্ষর দিয়েছিলেন, উপেন্দ্রনাথ তাঁদেরই একজন। তিনি জন্মগ্রহণ করেন ১৮৯৮ খ্রিঃ মার্চ মাসের ৩১ তারিখ, তৎকালীন কোচবিহার রাজ্যের মাথাভাঙা মহকুমায় গোপালপুর গ্রামে। পিতার নাম বীরনারায়ণ বর্মণ, মাতা কামিনীসুন্দরী দেবী। প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় মাথাভাঙাতেই। এরপর ১৯১৫ সনে। ওখান থেকে ম্যাট্রিক পাস করে ১৯২০ সালে কোচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে স্নাতক উপাধি প্রাপ্ত হন। তারপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে জলপাইগুড়িতে চলে আসেন এবং এখানকার আদালতে আইন ব্যবসা শুরু করেন।

তখনকার সময়টা ছিল ভারতীয় রাজনীতির অগ্নিযুগ। ইংরেজ শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্তিলাভের স্বাদেশিকতা। তরঙ্গের অভিঘাতে দেশ কম্পমান। দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনের হাতছানি। উপেন্দ্রনাথ এই ডাকে সাড়া দিলেন। তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হলেন। কিন্তু কংগ্রেসি রাজনীতির পাশাপাশি তিনি নিজেকে ঠাকুর পঞ্চানন বর্মা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজের সাংগঠনিক কাজেও যুক্ত করলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন ঠাকুর পঞ্চাননের ভাবশিষ্য। তাই তিনি আত্মনিয়োগ করলেন উত্তরবঙ্গ রাজবংশী সমাজের ইতিহাস, ভাষা, সংস্কৃতি এবং সর্বোপরি আত্মানুসন্ধানের কাজে। রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজের হৃত সম্মান পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টায় তিনি হয়ে উঠলেন পঞ্চানন বর্মার যোগ্য উত্তরাধিকারি। আজকের আধুনিক উত্তরবঙ্গে ভাষা, উপভাষা নিয়ে নানারকম চর্চা হচ্ছে। শ্রদ্ধেয় সুখবিলাস বর্মা তাঁর 'ভাওয়াইয়া' গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন...'(উপেন্দ্রনাথ বর্মণ) রাজবংশী ভাষা নিয়ে বিশদ চর্চা করেছেন এই শতাব্দীর প্রথম ভাগে। প্রকৃতপক্ষে তিনিই ছিলেন এ বিষয়ে পথপ্রদর্শক'......আবার তিনি কোচবিহারের কিছু মানুষের 'আসাম চলো' প্রচারের বিরুদ্ধে চারুচন্দ্র সান্যালরা যখন পাল্টা প্রচার শুরু করেন, তখন......'উপেন্দ্রনাথ তাঁর দ্বিধাহীন যুক্তি দেন বঙ্গভাষার পক্ষে ও পশ্চিমবঙ্গে যুক্ত হবার পরামর্শে'।

তাঁর কর্মবহুল রাজনৈতিক জীবন কি এই সামান্য পরিসরে করা সম্ভব? সন-তারিখের হিসেবে এভাবে বলা যেতে পারে।

১৯৩১ ॥ সরকার মনোনীত সদস্যরূপে জলপাইগুড়ি পৌরসভায় যোগদান এবং সর্বসম্মতিক্রমে পৌরসভায় উপপৌরপতি নির্বাচিত।

১৯৩৫ ॥ শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি সম্মিলিত প্রাদেশিক আইনসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হন।

১৯৩৭ ॥ অবিভক্ত বাংলায় আইনসভার সদস্য।

১৯৪১ ॥ অবিভক্ত বাংলার ফজলুল হক মন্ত্রিসভায় যোগদান এবং সেটা ১৯৪৩। আবাগারি মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তখন মন্বন্তর। দুর্ভিক্ষের সময় জলপাইগুড়িতে peoples food committee'র সঙ্গে যুক্ত হন।

১৯৪৭ ॥ ভারতীয় গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত।

১৯৪৮ ॥ লন্ডনে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ সম্মেলনে ভারতের পার্লামেন্টারি দলের প্রতিনিধি নির্বাচিত।

১৯৪৯ ॥ সংবিধানের স্বরাষ্ট্রবাদীদের মধ্যে একজন হওয়ার গৌরব অর্জন।

১৯৫০ ॥ রেঙ্গুনে ভারতীয় চাউল কমিশনে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতা নির্বাচিত।

১৯৫৫ ॥ লোকসভায় অস্পৃশ্যতা-বিরোধী আইনের সিলেক্ট কমিটিতে চেয়ারম্যান নির্বাচিত।

১৯৫৮/৫৯ ॥ লোকসভায় পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান, পিটিশন কমিটিরও চেয়ারম্যান। এছাড়া লোকসভার স্পিকার প্যানেলের সদস্য নির্বাচিত।

১৯৬৪ ॥ পঃ বঃ বিধান পরিষদের ডেপুটি চেয়ারম্যান।

১৯৬৫ এবং ১৯৬৯ ॥ পঃ বঃ বিধান পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত।

মোটামুটি সংক্ষেপে এই তাঁর রাজনৈতিক কর্মের পঞ্জি। তার থেকেও বড় পরিচয় তিনি একজন সমাজহিতৈষী। সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টি দিয়ে সমস্যা বুঝতে চেয়েছিলেন। ইতিহাসবিদ্ আনন্দগোপাল ঘোষের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বুঝিয়েছিলেন তাঁর জীবনের লক্ষ্য...'বিভিন্ন জাতি-প্রজাতির আত্মাকে উপলব্ধি করে তাদের সংস্কৃতিকে বিচার... এবং ইতিহাসের নিদর্শনকাল সংরক্ষণ......'

এই আত্মাকে উপলব্ধি করার লক্ষ্যে তিনি আমৃত্যু অবিচল ছিলেন। গ্রন্থপ্রকাশেও তিনি পথিকৃৎ ; তাঁর লেখা বিভিন্ন গ্রন্থাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য (১) রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস, (২) রাজবংশী মানবজাতির ইতিহাস। (৩) রাজবংশী প্রবাদ-প্রবচন এবং হেঁয়ালি, (৪) জল্পেশ মহাপীঠ (৫) ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার জীবনচরিত এবং নিজস্ব আত্মজীবনী 'উত্তরবঙ্গের সেকাল ও আমার জীবনস্মৃতি'। এর মধ্যে রাজবংশী প্রবাদ-প্রবচন নিয়ে ছোট্ট বইটি সম্পর্কে একটু আলাদাভাবে বলতে হয়। তথ্যসমৃদ্ধ এই বইটি রাজবংশী উপভাষা মূল বাংলা এবং ইংরেজি টিকাসহ লিপিবদ্ধ করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গবেষণার একটি ক্ষেত্র উন্মোচন করেছেন এবং পথিকৃতের গৌরব অর্জন করেছেন। এই পুস্তক প্রসঙ্গে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়াত রবীন্দ্র অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য এক পত্রে উপেন্দ্রনাথ বর্মণকে জানিয়েছেন...'আপনি দীর্ঘদিন ধরে নানা কাজের মধ্যেও বঙ্গভারতীর যে নিরলস সেবা করে যাচ্ছেন সেজন্য বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রেমিক ব্যক্তিমাত্রই আপনার নিকট কৃতজ্ঞ থাকবে।'...

বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং শেষ জীবন পর্যন্ত তিনি সংগঠনগুলির শুভাশুভ নিয়ে চিন্তা করে গেছেন। ১৯৮৮ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি বাংলার এই মহান সন্তানের জীবনাবসান হয়।

কৈলাসচন্দ্র রাহুত

এই এক বাড়ি, বিশ্ব প্রতিষ্ঠানও বলা যায়। একান্নবর্তী নয়, অথচ সবাই যেন একটা প্রচ্ছন্ন শৃঙ্খলার আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। অর্থে, বৈভবে, শিক্ষায়, স্বাস্থ্যে, ক্রীড়ায়, রূপে, প্রেমে, সুখে-দুঃখে এই বাড়ি যেন শহরের আর সবকটা বাড়ির থেকে আলাদা। একজন পথ-চলতি পাগল নাকি মন্তব্য করেছিল এই বাড়িটির দিকে তাকিয়ে...'মনে হয় যেন দেবী মহামায়ার দশটা সোনার হাত এই বড় বাড়িটার দশ দিকে ছড়িয়ে আছে।' এই বাড়ি......শহরের বিখ্যাত রাহুতবাড়ি। একটা বাড়িতে এতগুলো কৃতবিদ্য মানুষের বাস যে, কাকে ছেড়ে কাকে ধরব, সেটাই নিশ্চিত নয়। কয়েকটি নাম, আনন্দচন্দ্র, প্রহ্লাদচন্দ্র, নলিনীকান্ত, অবনীকান্ত, রমণীকান্ত, কামিনীকান্ত, অনিল রাহুত...সবাই প্রয়াত, যাঁরা শিল্পে,

শ্রদ্ধেয় সুখবিলাস বর্মা তাঁর 'ভাওয়াইয়া' গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন...'(উপেন্দ্রনাথ বর্মণ) রাজবংশী ভাষা নিয়ে বিশদ চর্চা করেছেন এই শতাব্দীর প্রথম ভাগে। প্রকৃতপক্ষে তিনিই ছিলেন এ বিষয়ে পথপ্রদর্শক'......আবার তিনি কোচবিহারের কিছু মানুষের 'আসাম চলো' প্রচারের বিরুদ্ধে চারুচন্দ্র সান্যালরা যখন পাল্টা প্রচার শুরু করেন, তখন......'উপেন্দ্রনাথ তাঁর দ্বিধাহীন যুক্তি দেন বঙ্গভাষার পক্ষে ও পশ্চিমবঙ্গে যুক্ত হবার পরামর্শে'।

নাটকে, অভিনয়ে, ক্রীড়ায় এই শহরে সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনে যথেষ্ট ছাপ রেখে গেছেন। বর্তমানদের কথা বাদই দিচ্ছি। কিন্তু যাঁর সূত্র ধরে এই বাড়িটির মূল...মহীরুহের আকার নিয়েছে—তিনি কৈলাসচন্দ্র রাহুত। পিতা রামলোচন রাহুত আর মাতা চন্দ্রকলা দেবী, আদি নিবাস তৎকালীন পূর্ববঙ্গের ঢাকা জেলায়। চারুচন্দ্র সান্যাল, তাঁর জলপাইগুড়ির ১০০ বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন......'১৮৭০ থেকে ১৮৭৮ সনে রেলগাড়ির এদিকে আসবার পূর্বে......ঢাকার কৈলাসচন্দ্র রাহুত আসেন সরকারি কাজে......প্রথমে বাড়ি সওদাগরপট্টিতে, তারপর ১৯০০ সন থেকে বাবুপাড়ায়।......এসেছিলেন নৌকায়—যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা ও করলা নদী দিয়ে দিনবাজার কালীবাড়ির ঘাটে।'...... রাহুত পরিবারের অন্যতমা সদস্য রেবা রাহুতের ভাষ্য অনুযায়ী......'রাহুত বংশ মহারাষ্ট্রের বালাজি বাজীরাওয়ের বংশধর। ......রাহুত শব্দের অর্থ অশ্বারোহী যোদ্ধা, 'রাহুত' শব্দের অর্থ থেকে মারাঠা সৈন্যবাহিনীতে (বালাজি বাজীরাও) এই বংশের পূর্বসূরিরা যে ছিলেন তার একটা সমর্থন পাওয়া যায়।......'

সেই পরিপ্রেক্ষিতে চারুবাবু কথিত 'সরকারি কাজ' আর রেবা রাহুত কথিত 'জলপাইগুড়িতে পুলিশ বিভাগে দারোগার চাকরি' যেন সৈনিক-বংশের যোগ্য কাজ বলেই মনে হয়। কিন্তু ইতিহাস পাল্টে গেল।

১৮৬৯-এ জেলার সৃষ্টি, তার ৬ বছর পর ১৮৭৫ সনে ইউরোপীয়ানদের দ্বারা তৈরি প্রথম চা-বাগান 'গজলডোবা'য় স্থাপিত হলো। তারপর ১৮৭৫ থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত একের পর এক, প্রায় ১৪০টি বাগান প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল। ইংরেজদের পাশাপাশি দেশীয় মানুষরাই এই মহাযজ্ঞে শামিল হয়েছে। ফলত কৈলাসচন্দ্র 'দারোগার চাকরি' ফেলে দিয়ে চা-বাগানের দিকে হাত বাড়ালেন খুব স্বাভাবিকভাবেই। হয়তো ঢাকা বিক্রমপুরের জমিদারিতে উদ্বৃত্ত অর্থও জমেছিল, তা না হলে দারোগার চাকরি করে একক প্রচেষ্টায় বাগান কেনা সম্ভব নয়। এদিকে কিছু কিছু চা-বাগানের হাতবদলও শুরু হয়েছিল। কৈলাসচন্দ্র সুযোগের সদ্ব্যবহার করে জলপাইগুড়ি জেলায় প্রথম বাগান গজলডোবা চা-বাগানটি কিনে নিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য, বন্যায় বারবার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার জন্য বাগানটি বিক্রি করে দিলেন। কিন্তু শর্তানুযায়ী উপযুক্ত অর্থ না পাওয়াতে কৈলাসচন্দ্র মামলা করেন। মামলার শেষ তিনি দেখে যেতে পারেননি। ১৯১৮ সনে তিনি মারা গেলেন।

এরপর উত্তরাধিকারি ভ্রাতা আনন্দচন্দ্রের কর্মকুশলতায় নিজস্ব চা-বাগান স্থাপিত হতে বেশি সময় লাগেনি। ১৯২৭-এ গঠিত হল নিজস্ব আনন্দপুর চা-বাগান। ১৯২৮ সনে আনন্দচন্দ্র মারা গেলেন। রাহুতবাড়ি আর পেছনদিকে মুখ ফেরায়নি। কৈলাসের সূত্র ধরে আর আনন্দচন্দ্রের হাত ধরে শুরু হল পরিবারের দীর্ঘ অভিযান।

কুমুদিনীকান্ত চক্রবর্তী

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জলপাইগুড়ি জেলায় স্বাধীনতা অধ্যায়ের আধুনিক অধ্যায় শুরু। 'বিলাতি দ্রব্য বর্জন' কর্মসূচি ছিল সেই আন্দোলনের অন্যতম অংশ। কিন্তু শুধু কাপড় পোড়ানো নয়, সঙ্গে সঙ্গে গঠনমূলক প্রচেষ্টাও শুরু হল। তার প্রমাণ শিল্পসমিতি পাড়ায় 'কাপড়ের কল', শশীকুমার নিয়োগীর বাড়িতে 'স্বদেশি মিলন ভান্ডার', খগেন দাশগুপ্ত'র বাড়ির সামনে 'যুবক ভাণ্ডার' এছাড়া কামারপাড়ায় 'বরুণ বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা। সঙ্গে সঙ্গে গ্রামে-শহরে চরকাকাটা তো চলছেই। ১৯২২-২৩ পর্যন্ত এরকম অবস্থা। যদিও কোনোটিই শেষ পর্যন্ত টেকেনি। অনেক প্রতিকূল কারণ ছিল। যাই হোক, ইতিমধ্যে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ব্যবসাবিমুখ বাঙালিকে জাগানোর বার্তা পৌঁছে গেছে নবযুগের যুবকদের মধ্যে। ফলে একটা পরিমণ্ডল যেন তৈরি হয়েছিল। এই প্রেক্ষাপটে শহরে একজন যুবকের আবির্ভাব ঘটল। আসলে তিনি শহরেরই মানুষ। ১৯০৭ সালে শহরে গঠিত 'জাতীয় বিদ্যালয়ে'র ছাত্র হিসেবে জীবন শুরু। অত্যন্ত মেধাবী, চৌকশ ছাত্র। পরবর্তী জীবনে ছাত্রাবস্থায় 'ডাফ' 'ভলাম' এবং 'র‍্যাংলার' স্কলারশিপ হস্তগত হয়েছে। চারুচন্দ্র সান্যাল লিখেছেন......'১৯২৫ সনে জলপাইগুড়ির একজন কৃতি ছাত্র কুমুদিনীকান্ত চক্রবর্তী প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে রসায়ন শাস্ত্রে অনার্স পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হবার পর কলেজ ছেড়ে এই শহরে আসেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল চাকরিমুখী বাঙালিকে কিভাবে ব্যবসামুখী করা যায়। তিনি বলতেন বাঙালির আর্থিক দুর্গতি স্বরাজের পরেও তার রাজনৈতিক অবনতি আনবে। বহু দূর তিনি দেখতে পেয়েছিলেন। তাই শহরে এসে পুরনো কাপড়ের কলটি যেখানে ছিল, সেখানে একটা দেশলাইয়ের কল স্থাপন করেন। কিছুদিন বেশ চলল, কিন্তু, মালমসলা কিছুতেই সংগ্রহ করা গেল না যতখানি দরকার। ১৯৩৩ সনে এটি বন্ধ হয়ে গেল।'



কুমুদিনীকান্ত চক্রবর্তী

চারুচন্দ্র আরো লিখেছেন......'কুমুদিনীবাবু এক মুদির দোকান দিলেন দিনবাজারে। হাটে হাটে যেতেন পসরা নিয়ে। ঠাণ্ডা মেজাজের ভদ্রলোকেরা বলতেন, এত পড়াশুনা করে কুমুদিনীর মাথা খারাপ হয়েছে।......' চারুবাবুর মন্তব্য '...জাতিকে নতুন পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে এমনি মাথা খারাপ লোকেরও দরকার আছে।'......

কৃষিব্যবস্থা, চাষবাস নিয়েও কুমুদিনীবাবুর বিশেষ চিন্তাভাবনা ছিল। তিনি খুব ভেবেচিন্তে কৃষিসংক্রান্ত ব্যাপারে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর নিজেরই এবং লেখায় তিনি বলেছেন......'আমাদের ছাত্রাবস্থায় শিক্ষিত মধ্যবিত্তের ছেলেদের ধারণা ছিল যে ম্যাট্রিক পাস করা শক্ত আর কৃষির কাজ সহজ ; কারণ ম্যাট্রিক পাস করিতে মাথা খাটাইতে হয় ; সেটা মধ্যবিত্ত ছেলেদের বৈশিষ্ট্য ; আর কৃষিকার্যে মাথা খাটাইবার প্রয়োজন নাই—দেহে শক্তি থাকিলেই যথেষ্ট। সেইজন্য চাষীর ছেলেরা সহজেই কৃষি আয়ত্তে আনিতে পারে। ধারণাটা আংশিক সত্য হইলেও সম্পূর্ণ সত্য নয়। দেহ ও মন উভয়ের পারস্পরিক বিকাশের দ্বারা পূর্ণাঙ্গ মানবের সৃষ্টি হয়, এবং পুঁথিগত বিদ্যার মতো কৃষিও একটি বিদ্যা।......'

সেই আমলে কৃষি যে একটি বিদ্যা......বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মতোই, সেটা এই জেলাশহরে বসেই করেছিলেন বলে আশ্চর্য হতে হয়। আসলে কৃষি হয়তো নয়, তাঁর উদ্দেশ্য নিহিত ছিল অন্য জায়গায়। তিনি লিখেছেন......'মধ্যবিত্তের ছেলেদের কৃষি সম্বন্ধে inferiority complex অর্থাৎ হীন ধারণা আছে, তাহা সর্বাগ্রে দূর করা প্রয়োজন। কারণ কৃষির উন্নতি করিতে হইলে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের একটি বৃহৎ অংশকে খাঁটি কৃষক হইতে হইবে।'...

এই বৈপ্লবিক ধারণা ছিল তাঁর চরিত্রের বিশেষত্ব। এই প্রসঙ্গে চারুচন্দ্র সান্যাল লিখেছেন...'উন্নত কৃষিশিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে শহর থেকে পাঁচ মাইল দক্ষিণে কিছু জমি নিয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ-আবাদ শুরু করেন। ইতিমধ্যে ওকালতি পরীক্ষা দিয়ে উকিল হয়ে এলেন। আশা ছিল, ওকালতির উপার্জন এই চাষের কাজে ব্যয় করবেন। উপর্যুপরি কতগুলি সাংসারিক বিপর্যয়ে একাজে তিনি এগিয়ে যেতে পারলেন না।'......

শেষে চারুবাবুর মন্তব্য......'আপাতদৃষ্টিতে তাঁর সবগুলি প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু এই কাজের ফলে শহরের অনেক ভদ্রলোকের ছেলে ব্যবসায়ে নেমেছে, দোকান দিয়েছে। এতে আর এখন মানহানি হয় না। সমাজের নীচুস্তরের লোক বলে গণ্য হয় না। তবে ব্যর্থ প্রচেষ্টার বিরাট সম্ভাবনার কৃতকার্যতা উত্তরকালে সবাই কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করবে।...'

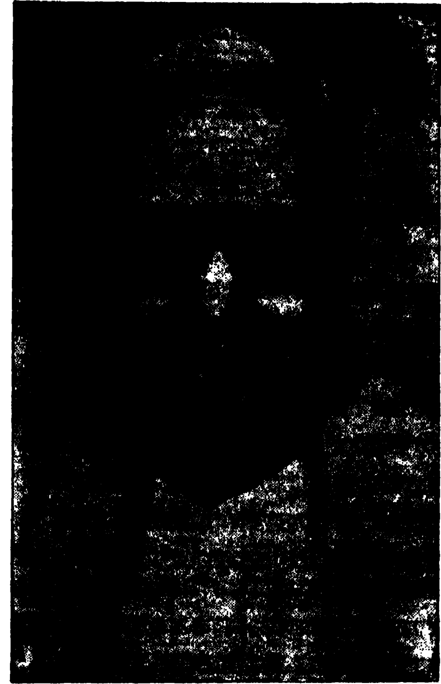
এই স্মরণ অনিবার্য। জলপাইগুড়ির সৌভাগ্য এরকম একজন মানুষ এখানে জন্মগ্রহণ করেছেন। রাজনীতি সম্পর্কেও নির্লিপ্ত ছিলেন না। প্রথমে কংগ্রেসের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। ১৯৩০-এ আইন অমান্য আন্দোলনের সময় চারুবাবু, শশধর কর গ্রামে গ্রামে গ্রামীণ মানুষদের উপযোগী প্রচারপুস্তিকা বিলি করতেন, সেগুলি লেখার দায়িত্ব কুমুদিনী রায় গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৪০-এর পরে হিন্দু মহাসভার সঙ্গে যোগাযোগ হয়। তিনি জলপাইগুড়িতে মহাসভার প্রধান প্রবক্তাদের মধ্যে অন্যতম বলে বিবেচিত হয়েছিলেন। হিন্দুমহাসভায় থাকাকালীন ভাগলপুর সম্মেলনে গিয়ে গ্রেপ্তার পর্যন্ত হন।

মাঝখানে তিনি 'জনমত' পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। শেষ জীবনে 'ভারতীয় চা-কর সমিতির' সম্পাদকের চাকরি গ্রহণ করে জীবননির্বাহ করেছিলেন।

খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

স্বাধীনতা-পূর্ব জলপাইগুড়ি জেলায়, কৃষকদের সংগঠিত করবার আন্দোলনের অন্যতম নেতা এবং স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূর্তমন্ত্রী...এই দুটি ভূমিকাতেই যিনি মানিয়ে নিয়েছিলেন, তাঁর নাম খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। প্রয়াত নির্মল বসুর ভাষায়...'কর্ম ও দেশসেবার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত'...।

খগেন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৯৮ সালে। জলপাইগুড়ি শহরে। পিতা ঈশানচন্দ্র দাশগুপ্ত, যিনি উকিল হয়ে ১৮৭০ থেকে ১৮৭৪-এর কোনো সময়ে জলপাইগুড়ি এসেছিলেন।



খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

১৯২১ সনে খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আইন পরীক্ষায় উদ্যোগ নিচ্ছিলেন। কিন্তু তিনিও চারুচন্দ্র সান্যালের মতো অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে অধ্যয়ন থেকে বিরত থাকলেন, এবং কলেজ থেকে বেরিয়ে এসে কংগ্রেসে সাধারণ কর্মিরূপে যোগ দিলেন। প্রকৃতপক্ষে ১৯২০ সনের অনেক আগে থেকেই তিনি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ শিকদারের ভাষায়......'১৯১৬ সালে খগেনদা ও অবনী গোস্বামী দোল উৎসব উপলক্ষকে কেন্দ্র করে অস্ত্রশস্ত্র লুকোবার জন্য স্থান নির্ণয়ে বেরিয়ে পড়েন।.........খগেনদা পুরোপুরিভাবে ১৯২০ সালের নভেম্বর মাসের প্রথম দিনেই স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন। ......সে সময়ে খগেনদারা ভুটানের সীমান্ত থেকে বোদার শেষ প্রান্ত, বিহার সীমান্ত থেকে অসম সীমান্ত পর্যন্ত কংগ্রেসের বার্তা বহন করে নিয়ে গেছেন।'......খগেনবাবু খুব ভালো বক্তব্য রাখতে পারতেন। তাঁর বক্তব্যের জন্য গ্রামে গ্রামে অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া

গেল। তিনি কংগ্রেসের ভেতরে শহরের এবং গ্রামের যুগপৎ দু'পক্ষেরই সমর্থনে অবিসংবাদিত নেতা হয়ে উঠলেন। ১৯২২ সনে বগুড়া রাজশাহীতে প্রবল বন্যা, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে গঠিত হল সারা বাংলা ত্রাণ কমিটি। জেলা থেকে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গেল। নেতৃত্বে চারুচন্দ্র সান্যাল এবং খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। ১৯২৩-এ ফৌজদারি আইনে গ্রেপ্তার হলেন। ১৯২৭-এ মুক্তি পেলেন। এর মধ্যে ১৯২৫-এ পৌরসভার কমিশনার নির্বাচিত হলেন। ১৯২৯-এ খগেন্দ্রনাথের সম্পাদনায় প্রকাশিত হল সাপ্তাহিক পত্রিকা 'মুক্তিবাণী'। রাজরোষে পড়ে পত্রিকাটি এক বছরের মধ্যেই উঠে যায়। ১৯৩০-এ আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ নিয়ে গ্রেপ্তার হলেন। তার সঙ্গে এবং স্ত্রী অরুণা দাশগুপ্তাও গ্রেপ্তার বরণ করলেন।

এরপর জেল থেকে বেরিয়ে কংগ্রেস সংগঠন গড়ার লক্ষ্যে প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে লাগলেন। তখন তিনি জলপাইগুড়ি কংগ্রেসের এক নম্বর কর্মী নেতার জায়গায় প্রায় পৌঁছে গেছেন। ১৯৩২ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে আবার গ্রেপ্তার। জলপাইগুড়ি জেলে বন্দী হলেন। ১৯৩৭-এ তিনি নির্বাচিত হলেন বঙ্গীয় বিধানসভার সদস্য হিসাবে, ১৯৩৯ সনে জলপাইগুড়ি শহরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্মেলন। অভ্যর্থনা সমিতির সাধারণ সম্পাদক হলেন খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত।

এরপর ১৯৪২-এ 'ভারতছাড়' আন্দোলন, গ্রেপ্তার হলেন এবং ১৯৪৬ পর্যন্ত আটক থাকলেন বক্সা বন্দী শিবিরে। ১৯২০ সন থেকেই কংগ্রেসে, কিন্তু ১৯৩৯ সালে ফরওয়ার্ড ব্লক গঠিত হলে তিনি সাময়িকভাবে নবগঠিত দলে যোগ দিয়েছিলেন।

এই হল স্বাধীনতা-পূর্ব রাজনৈতিক জীবন......'সুদীর্ঘ দিন বহু নির্যাতন, আত্মত্যাগ, কারাবরণ সহ্য করেছেন। ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে তাকাননি। সেটাই ছিল তাঁর জীবনের ধ্যান ও জ্ঞান।.....' (নির্মল বসু)।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলার, স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম সারির নেতা এবং সরকারের প্রথম সারির মন্ত্রীরূপে অভিষিক্ত হলেন। ১৯৫২ থেকে ১৯৬৭......একটানা পনেরো বছর পশ্চিমবঙ্গের পূর্তমন্ত্রী। ১৯৭৭ থেকে ১৯৮০ জলপাইগুড়ি কেন্দ্র থেকে লোকসভার সদস্য নির্বাচিত। ১৯৮০ সালের শেষের দিকে তিনি রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করলেন। মন্ত্রী থাকাকালীন তিনি জলপাইগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করেছেন। কিছু সফলও হয়েছেন।

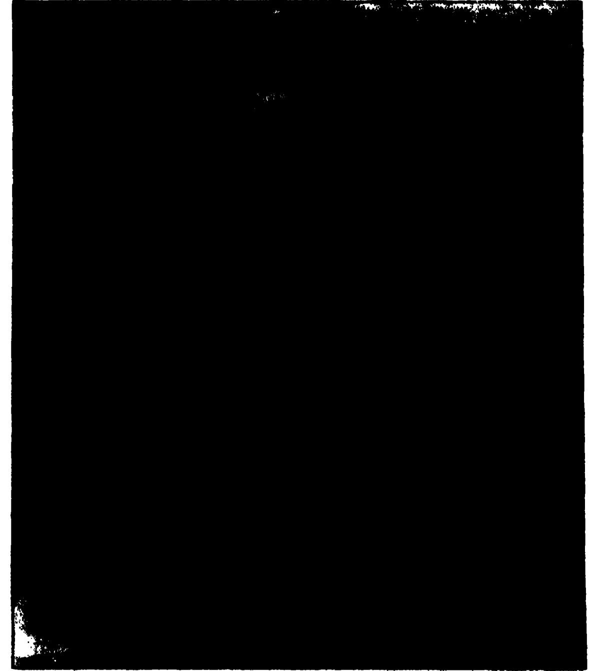
অবসরকালীন সময়ে তিনি পড়াশোনা চালিয়ে গিয়েছিলেন এবং লেখালিখিও শুরু করেছিলেন। তারই ফলশ্রুতি, ১৯৮৫ সনে মনীষা গ্রন্থালয় থেকে প্রকাশিত হল 'আর্য-সভ্যতার সন্ধানে', সেখানে তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন 'আর্যরা বাইরে থেকে আসেনি, তারা এই দেশেরই লোক।' এটা হয়তো তাঁর আত্মানুসন্ধানের একটা প্রচেষ্টা।

জুন মাসের ১৫ তারিখ, ১৯৮৫ সাল, এই প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামীর জীবনাবসান হল, সংযোজনায় আরো একজনার কথা বলা প্রয়োজন, তিনি খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের যোগ্যা সহধর্মিণী অরুণা দাশগুপ্তা, দুটি নামই ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে ইতিহাসের একটা অধ্যায়ে। একজন আরেকজনের যেন পরিপূরক। ১৯২৭ সনে অরুণা দাশগুপ্তা জলপাইগুড়ি এলেন। কংগ্রেসের সঙ্গে জড়িয়ে যেতে বেশি সময় লাগেনি। ১৯৩০-এর আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ নিয়ে কারাবরণ করলেন। সঙ্গে স্বামী খগেন্দ্রনাথ। কিন্তু অরুণা দাশগুপ্তার মূল কৃতিত্ব, শহরে শিশুদের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন। নাম 'শিশুনিকেতন'। শিশুশিক্ষার নবদিগন্ত স্থাপিত হল, ১৯৪১ সনের ৬ জানুয়ারি। এই কাজে স্বামী খগেন্দ্রনাথ একটি বিরাট ভূমিকা পালন করেছেন। স্বাধীনতার পরে খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এই বিদ্যালয়টিকে আদর্শ বিদ্যালয়রূপে গড়ে তুলতে সর্বতো চেষ্টা চালিয়েছিলেন। কেননা, মানুষ গড়ার কারিগরদের হাতেই তো স্বাধীনতার ভবিষ্যৎ!

১৯৮৫ সালে এই প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামীর জীবনাবসান হয়।

গুরুদাস রায়

'কমুনিস্ট' নেতা ডাঃ শচীন দাশগুপ্ত, তেভাগা আন্দোলন প্রসঙ্গে স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে লিখেছিলেন......'গুরুদাস রায় কৃষক আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা। অনেক কৃষক নেতার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। কিন্তু গুরুদাস রায়ের মতো সর্বগুণসম্পন্ন একজন কৃষকনেতার দেখা আমি পাইনি। কৃষকের সমস্যাগুলি বোঝার অসাধারণ ক্ষমতা, এবং তার মূল দাবিগুলি তুলে ধরার দক্ষতা এবং লড়াইয়ের ময়দানে তাকে কার্যকরী করার কৌশল



গুরুদাস রায়

প্রয়োগের কুশলতা এমন বহুগুণের সমন্বয় একমাত্র গুরুদাস রায়ের মধ্যেই দেখেছি......। কেবল কৃষকের শোষণের দিকটাই নয়, কৃষক-সমাজকে সমগ্রভাবে ভাবতে হলে কৃষকের কৃষ্টি সাহিত্য ছড়া, কবিগান ইত্যাদিও জানতে হবে। এ বিষয়ে গুরুদাসবাবুর অনুসন্ধিৎসা ছিল অপরিসীম। প্রচুর প্রচলিত ছড়া কবিতা কবিগানের সংগ্রহ তাঁর ছিল। নিজেও অনেক কবিগান লিখেছিলেন। 'স্বাধীনতা' কাগজে হাজি দীনেশ বর্মণ ছদ্মনামে কিছু কিছু প্রকাশিত হয়েছিল। কৃষকদের সভায় তিনি স্থানীয় ভাষাই ব্যবহার করতেন। ছোটো ছোটো কথায়

কৃষকদের বোধগম্য নানা উদাহরণ দিয়ে, মাঝে মাঝে প্রচলিত ছড়া ও কবিগানের কলি ব্যবহার করে সভাগুলি জমিয়ে তুলতে পারতেন। গুরুদাস রায়ের বক্তৃতা খুব সহজেই কৃষকদের অন্তরে পৌঁছতে পারত। জলপাইগুড়ি কৃষক তথা আধিয়ার আন্দোলনের যে অবদান সমগ্র বাংলার কৃষক আন্দোলনে রূপান্তর হয় তার অন্যতম প্রধান নায়ক গুরুদাস রায়।'......

এই দীর্ঘ উদ্ধৃতি যে নায়ক সম্পর্কে, তিনি জন্মসূত্রে জলপাইগুড়ির মানুষ নন, ১৯১৩ সালে জন্ম। জন্মস্থান ঢাকা জেলার রামনগর গ্রামের মানিকগঞ্জে। তার পঁচিশ বছর পর ১৯৩৮ সালে তিনি প্রথম জলপাইগুড়ি জেলায় প্রবেশ করেন। মাঝখানের পঁচিশটি বছর। ডাঃ দাশগুপ্তর ভাষ্য অনুযায়ী......'১৯২৮ সালে ম্যাট্রিক পাস করেন ও ঢাকা জগন্নাথ কলেজে ভর্তি হন। প্রথমে শ্রীসংঘ ও পরে বি ভি-তে যোগ দেন এবং ১৯৩১ সালে সর্বসময়ের কর্মী হিসাবে কলকাতায় চলে আসেন ; লেবং কেসে গ্রেপ্তার হন। তারপর আটক বন্দী হিসাবে বক্সা, বহরমপুর, হিজলি—তারপর বরিশাল জেলায় অন্তরীণ ও সর্বশেষে নিজগ্রামে অন্তরীণ হন। ১৯৩৭ সালে মুক্তি পান......'

তারপর মুক্তি পেয়ে, ১৯৩৮ সালে জলপাইগুড়ি। জেলে থাকাতেই মার্কসবাদ চর্চা শুরু করেছিলেন। জলপাইগুড়িতে হাতে-কলমে কাজ করবার সুযোগ পেয়ে, সর্বক্ষণের কর্মী হিসেবে কৃষক ফ্রন্টে চলে গেলেন। উদ্দেশ্য শ্রেণীভিত্তিক সংগ্রামী সংগঠন তৈরি করা।

১৯৩৮-এ তৈরি হল কৃষক সংগঠনী সমিতি। গুরুদাস রায় হলেন সাধারণ সম্পাদক। তারপর 'আধিয়ার সমস্যাই ভূমি সমস্যার—কৃষক আন্দোলনের মূল সমস্যা'—এই সঠিক সিদ্ধান্ত থেকে জেলার ভেতরে কৃষক আন্দোলন ছড়িয়ে দিতে লাগলেন এবং একের পর এক আন্দোলনে গণসংগঠনের রূপান্তর ঘটল বিস্ময়কর। কৃষকদের সংগ্রামের পুরোভাগে নিয়ে আসতে দেরি হল না। এরপর ১৯৩৯ সনের ৬ ফেব্রুয়ারি, গঠিত হল, কমিউনিস্ট পার্টির জেলা সংগঠনী কমিটি। তিনজন মাত্র সদস্য, গুরুদাস রায় তার মধ্যে অন্যতম। ১৯৪০ সালে প্রাদেশিক কৃষকসভার অফিসে, তিনি ও মহঃ মিজিমুদ্দীন মিলে জেলার কৃষকদের অবস্থা নিয়ে একটি রিপোর্ট পেশ করেন, চা আধিয়ার বর্গাদার তেভাগার লড়াই পরিচালনা করতে পথপ্রদর্শকের কাজ করেছিলেন।

১৯৬১ সালের ২৫ অক্টোবর গুরুদাস রায়ের জীবনাবসান হয়।

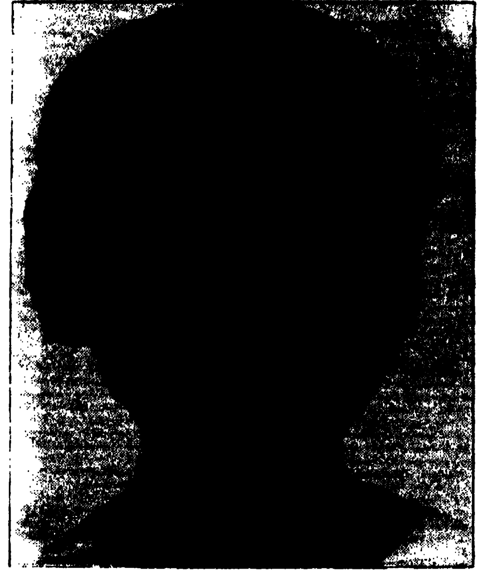
গণেশচন্দ্র রায়

'জলপাইগুড়ির তিনি অলিখিত সাংস্কৃতিক নেতা ছিলেন'...

'তিনি নাটকের ভিতর দিয়ে ধরতে চেয়েছিলেন গোটা সংস্কৃতি ও মানুষ। থিয়েটারের তিনদিক বন্ধ থাকলেও একদিক খোলা থাকে। সেই খোলা দিক দিয়ে থিয়েটার যুক্ত হয়ে যায় বাইরের পৃথিবী ও মানুষের সঙ্গে।'......

'সাংস্কৃতিক জগতে তিনি ছিলেন অনন্য সাম্যবাদী, যা ছিল জলপাইগুড়ির তদানীন্তন শহরে সংস্কৃতি ও কুলপতিদের দৃষ্টিতে সমাজবিরোধীর চেয়েও দূষণীয়'......

ওপরের তিনটি উদ্ধৃতি তিনজন গুণগ্রাহীর, যথাক্রমে পরিতোষ দত্ত, কার্তিক লাহিড়ি এবং শুভাশীষ গুপ্তর (দ্রষ্টব্য গণেশচন্দ্র রায় শতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ), আর উদ্ধৃতিগুলি যাঁর সম্পর্কে তিনি এই শহরে দৈলাদা নামে সমধিক পরিচিত। তিনি 'উন্নত নাসা, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, গড় বাঙালির উচ্চতার তুলনায় কিছুটা উচ্চদেহী, প্রায় আজানুলম্বিত বাহু ও শিল্পীর মতো, দীর্ঘাঙ্গুলিবিশিষ্ট, সুরেলা কণ্ঠসম্পন্ন......(শুভাশিস গুপ্ত/ঐ)।



গণেশচন্দ্র রায়

তিনি কি শুধু নাটকের লোক? না, তিনি সঙ্গীতেরও। তিনি কি শুধুই সঙ্গীতের লোক? না, তিনি আবৃত্তিরও। তিনি কি শুধু অভিনয়ে? না, তিনি নাটক লেখাতেও আছেন, মঞ্চ প্রকরণেও আছেন। চরিত্রস্ফুটনে আছেন। নৃত্যের রূপারোপে আছেন। তিনি এই জেলা শহরে আমাদের থেকে ১০০ পা এগিয়ে থাকা একজন মানুষ।

গণেশচন্দ্র রায়ের জন্ম ১৮৯৯ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি, কোচবিহার জেলার দিনহাটা শহরে। পিতার নাম ললিত রায় আর মাতা কুসুমকুমারী দেবী। আদি নিবাস ময়মনসিংহ, পিতার কর্মস্থল কোচবিহার হলেও, তাঁর অকালমৃত্যুর পর তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কর্মস্থল জলপাইগুড়ি শহরে চলে আসেন, এবং এই শহর তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের নিয়ামক হয়ে পড়ে।

নাটকের প্রতি তাঁর আগ্রহ কবে থেকে? খুব সম্ভবত কলকাতার রিপন কলেজে পড়বার সময়েই তিনি নাট্যভাবনার জগতে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে যান। এরপর বাল্যবন্ধু, তৎকালীন বিখ্যাত নাট্যকার মন্মথ রায়ের আহ্বানে আরো দু'জন যুবা, শিবপ্রসাদ কর এবং সতীশচন্দ্র গুপ্ত, এই তিনজন মিলে কলকাতার নাট্যমঞ্চে প্রবেশ করলেন।

শুধু নিছক নাট্যমঞ্চে যোগদান বললে ভুল হবে। তিনি যোগ দিলেন বঙ্গনাট্যপ্রতিভা শিশির ভাদুড়ির সংগঠনে। তাঁর সঙ্গে তখন কারা কারা অভিনয় করছেন? প্রতিটি নাটকই রোমাঞ্চ......যেমন দুর্গাদাস বন্দোপাধ্যায়, অহীন্দ্র চৌধুরি, মধু বোস, সাধনা বোস, নির্মলেন্দু লাহিড়ি, নরেশ মিত্র, যোগেশ ঘোষ প্রমুখ। শুধু শিশির ভাদুড়ি নন, মন্মথ রায়ের মঞ্চেও তাঁর অবারিত দ্বার, ফলে এঁদের নাটকগুলোয় অভিনয় করার সুবাদে, তিনি আত্মস্থ করলেন নাটকের কৃৎকৌশল, আঙ্গিকের বৈচিত্র্য আর অভিনয় পারদর্শিতা। তিনি

কলকাতার বিখ্যাত রঙ্গমঞ্চে কুশলী অভিনেতা হিসেবে পরিচিত হতে লাগলেন। এক মফস্বলী যুবকের পক্ষে এও এক উত্তরণ বৈকি।

কিন্তু কলকাতা তাঁকে ধরে রাখতে পারেনি। তিনি ফিরে এলেন জলপাইগুড়ি। আসলে তিনি ছিলেন স্বাধীনচেতা, যুক্তিবাদী মানুষ। তিনি প্রশ্ন করতে শিখলেন। প্রশ্ন নাটক নির্বাচন নিয়ে, প্রধান চরিত্রের গঠন নিয়ে, প্রশ্ন নাট্যমঞ্চ নির্মাণ নিয়ে। প্রশ্ন নাটক মঞ্চস্থর উদ্দেশ্য নিয়ে। যে সমস্ত প্রশ্ন পেশাদার মঞ্চের কাছে অভাবনীয়। তাই জিজ্ঞাসু-প্রবৃত্তি নিবৃত্তির অভাবে তিনি ফিরে এলেন জলপাইগুড়ি। শুরু হল জীবনের দ্বিতীয় পর্ব।

জলপাইগুড়ি শহরের সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটটা কেমন ছিল? চা-বাগান মালিক, জোতদার, মুৎসুদ্দি এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের উদ্বৃত্ত অর্থ আর কেরানিকুলের দুর্বল সঙ্গতে একধরনের কলকাতামুখী বাবু-কালচার। সেই কালচারে সব আছে। কিন্তু শিকড় নেই। এদিকে শহরের ধনবান, ক্ষমতাবান সাংস্কৃতিক অভিভাবকদের চেষ্টায়, ১৯০৪ সালে গঠিত হয়ে গেছে নাট্যমঞ্চ...আর্য্য নাট্যসমাজ। কিন্তু বাংলা নাটকের ধারার কোনো যেন পরিবর্তন নেই। যা কলকাতায়, তাই জলপাইগুড়িতে। নাটকগুলো যেন উৎপল দত্ত লিখিত টিনের তলোয়ার নাটকে উল্লিখিত ম-য়ূ-র-বা-হ-ন পালার মতো। এর মধ্যেই গণেশচন্দ্র আর্য নাট্যে যোগদান করলেন। কলকাতার পেশাদারি মঞ্চের অভিজ্ঞতাকে তিনি আরও পোক্ত করে তুললেন। একের পর এক অভিনয় করে চললেন পৌরাণিক, ঐতিহাসিক থেকে সামাজিক পর্যন্ত। নাটক করতে চললেন শহরের বাইরে, জেলার বাইরে এমন কি বাংলার বাইরেও। সম্মানিত হলেন। কিন্তু 'তবু ভরিল না চিত্ত'। তিনি আবার প্রশ্ন করতে শুরু করলেন। আধুনিক সাহিত্যের স্লোগান অনুযায়ী 'ছাঁচ ভেঙে ফ্যালো'—এমনই অভিপ্রায়। আসলে গতানুগতিক জগদ্দল নাটকের স্থিতাবস্থা ভেঙে না ফেলতে পারলে তাঁর স্বস্তি হচ্ছিল না। ঐতিহ্যকে ধ্বংস করে নয়, ঐতিহ্যের ভেতরে থেকে নবনির্মাণের কাজ......বিরোধ বাধলো। তিনি আর্যনাট্য ছেড়ে দিলেন। শুরু হল জীবনের তৃতীয় পর্ব।

তার জন্য যেন অপেক্ষা করছিল যেন আরেকটি জগৎ। তিনি জড়িয়ে পড়লেন সদ্যগঠিত গণনাট্য সঙ্ঘের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে। তাঁর আরেক অস্ত্র নাট্যভাবনা সম্পৃক্ত আবৃত্তি নিয়ে তিনি হাজির হতে লাগলেন, কৃষিজীবী সাধারণ শিক্ষিত-অশিক্ষিত মানুষের কাছে। তাঁর ইচ্ছার নাটক কবিতা গান যেন নতুন প্রাণ ফিরে পেল। কবিতা পাঠের মধ্য দিয়ে তিনি সম্পর্ক গড়ে তুলতে চাইলেন মানুষে মানুষে। শিল্প নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার এক নতুন পর্ব। আসলে এ সবই ছিল সুস্থ সংস্কৃতি গড়ে তোলার পক্ষে এক স্বপ্ন-অভিযান। তারই সূত্র ধরে তিনি নাটকের বিভিন্ন দিক নিয়ে নিজস্ব ভাবনাগুলি কার্যকরভাবে ব্যাখ্যা করতে শুরু করলেন। তিনি হয়ে উঠলেন, নবপ্রজন্মের কাছে নতুন দিকনির্দেশ, আচার্যপ্রতিম ব্যক্তিত্ব। একাধারে শিক্ষক, বন্ধু, বুদ্ধিজীবী ও সমালোচক—শহরে তার ভূমিকা যেন তুলনারহিত।

তাঁর সাংগঠনিক প্রতিভার একটি পরিচয় পাই, ১৯৬১ সনে রবীন্দ্রশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের সময়, সরকারি কমিটির বিপরীতে সতীর্থদের সঙ্গে গড়ে তুলেছিলেন সমান্তরাল সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড। কয়েকটা দিন জলপাইগুড়িতে যেন তুলকালাম কাণ্ড ঘটেছিল। শহর প্রত্যক্ষ করেছিল নতুন পথের দিশারীদের। তাঁর পরিচালনায় অভিনীত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী। তাঁর প্রিয় রক্তকরবী। এই রক্তকরবীর আত্মাই ছিল তাঁর সারা জীবনের সঙ্গী। ১৯৮১ সালের ২৫ মে, এই রক্তকরবী বুকে নিয়েই অন্ধকার ঘুমের দেশে যাত্রা করলেন।

থেনু বসু

'থেনু' তার ডাক নাম। পোশাকি নাম ডাঃ শশাঙ্কশেখর বসু। পোশাকি নামটা পোষাকের আড়ালেই মনে হয় লুকিয়েছিল। শহরে গ্রামে প্রকাশিত হল ডাকনামের সহজিয়া, আর্য নাট্য থেকে গণনাট্যে রূপান্তরের অন্যতম সাংস্কৃতিক কর্মী।

জন্মেছিলেন আনুমানিক ১৯১৩ সনে। শিক্ষারম্ভ জলপাইগুড়ি জিলা স্কুলে, সেখান থেকে স্কটিশ চার্চ......তারপর জলপাইগুড়ির নিজস্ব জ্যাকসন মেডিক্যাল স্কুলে। তিনি চিকিৎসকের বৃত্তি গ্রহণ করলেন। নাটকের পোকা মাথায় আগেই ঢুকেছিল। ডাক্তারি পাস করবার বছরই তিনি, তখনকার নাট্যমঞ্চ আর্যনাট্য সমাজে যোগ দিলেন। সেটা তিরিশ দশকের শেষ দিকে। তাঁর নাট্যপরিক্রমা শুরু হল আর্যনাট্য থেকে, শেষ হল ষাট দশকের শেষে গণনাট্যের আঙিনায়......প্রায় পঁচিশ বছরের একটানা সাংস্কৃতিক জীবন, এই মফস্বল শহরে বাচিয়ে রাখটা কম কথা নয়।

আর্যনাট্যে তখন চলছিল প্রথাগত নাটক। কলকাতার বাণিজ্যিক থিয়েটারের মফস্বলী অনুকরণ। হাততালি আছে, কিন্তু হাতিয়ার নেই। ১৯৩৬ থেকে ১৯৪২...সময়টা ভারতীয় রাজনীতির এক মহাসন্ধিক্ষণ। নতুন নতুন আন্দোলনের টানাপোড়েনে নতুন নতুন সম্পর্কের জাল তৈরি হচ্ছে। বাইরে যখন এরকম, তখন মঞ্চের ভেতরে চলছে কৃত্রিম কাব্যের কলাকৈবল্যবাদী ক্যারিকেচার। ফলত ক্ষেত্র প্রস্তুত। নরেশ চক্রবর্তী, শচীন দাশগুপ্ত, সুবোধ সেনের মতো মানুষের সাংস্কৃতিক শামিয়ানার নীচে। সঙ্গত যোগাযোগে ১৯৪৩ সালে জলপাইগুড়িতে গণনাট্য সংঘ গঠিত হল। সুশীলরঞ্জন চক্রবর্তী (তিনাদা) সম্পাদক। কর্মিবৃন্দ থেনু বসু, স্ত্রী সতী বসু ও রাধানাথ দাস। সংগঠনে আসছেন পরিতোষ দত্ত, সত্যেন রায় প্রমুখ। নাটক করলেন 'রাহুমুক্ত' আর্য্য নাট্যমঞ্চে অভিনীত হল। প্রধান ভূমিকায় এবং পরিচালনায় থেনু বসু। আর্যনাট্যে দৈনিক তিরিশ টাকা ভাড়ায় পরপর তিন রাত্রি অভিনয়। তারপর হল মঞ্চ সফল নাটক 'ম্যয় ভুখা হুঁ', জনপ্রিয় নাটকটি নিয়ে দার্জিলিঙ গিয়েছিলেন রতনলাল ব্রাহ্মণের ব্যবস্থাপনায়। তারপর শ্রমিক-কৃষকের অভ্যুত্থান নিয়ে একটি নৃত্যনাট্য, দারুণ সাড়া পেলেন। ১৯৫২ সনে করলেন রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন'। আর্যনাট্যে পরপর দু'রাত্রি অভিনয় হল। বৃহত্তর গণতান্ত্রিক শক্তির সাহায্যে মঞ্চ বাঁধার স্বপ্ন যেন সফল হতে চলল। রবীন্দ্রশতবার্ষিকীতে, আর্যনাট্যের মাঠে অভিনয় করলেন রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী'। পরিচালক দৈলীদা বা গণেশচন্দ্র রায়। রাজার ভূমিকায় প্রাণহরি করঞ্জাই, নন্দিনী : শেফালী সরকার, বিপ্র পাগলের ভূমিকায় প্রবীর রায় (কুট্টি) আর ফাগুলাল থেনু বসু। বোধ হয় জলপাইগুড়ি প্রগতিশীল, সুসংস্কৃতি- সম্পন্ন নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে শহরের সেরা নক্ষত্র সমাবেশ।

১৯৬৮ সালে বন্যার পর নির্বাচনী নাটক 'একটি ষড়যন্ত্র', সম্ভবত : তাঁর লেখা শেষ নাটক। তার এই পথপরিক্রমা, যার সাহায্য ছাড়া সাফল্য অসম্ভব ছিল, তিনি সতী বসু। যোগ্য স্বামীর যোগ্য স্ত্রী, যাঁরা দু'ধরনের মঞ্চেই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। আর তাঁদের একটাই স্বপ্ন ছিল, মানুষের শিরায় শিরায় উদ্দীপনা জাগিয়ে তোলা...।

১৯৯৩-এর মার্চ মাসে 'থেনুদা' বা ডাঃ শশাঙ্কশেখর বসুর জীবনাবসান হয়।

ডাঃ ধীরাজমোহন সেন

...'স্বাধীনতার আগে কংগ্রেস ছিল স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের কংগ্রেস, তাতে তিন ডাক্তারের নেতৃত্ব ছিল—ধীরাজ সেন, অবনী ধর গুহ নিয়োগী আর চারুচন্দ্র সান্যাল। স্বাধীনতার পর অত্যন্ত কম সময়ের মধ্যে জলপাইগুড়ির কংগ্রেস হয়ে গেল চা-মালিকদের কংগ্রেস...।'

সাহিত্যিক দেবেশ রায়ের উক্তি, হয়তো একটু সরলীকৃত, এক প্রজন্মের চোখ দিয়ে আরেক প্রজন্মকে দেখার ভেতরে হয়তো একটু কৌতুকও লুকিয়ে আছে, তবু স্বাধীনতা-পূর্ব চিকিৎসক-নির্ভর কংগ্রেসকে চিনে নিতে অসুবিধা হয় না। ডাঃ ধীরাজ সেন বা ধীরাজমোহন সেন কিংবা সংক্ষেপে 'ধীরাজ ডাক্তার', জন্মেছিলেন ১৮৯৫ সনে ঢাকার বিক্রমপুরে। পিতা প্রফুল্লনলিনী সেন। ঢাকা শহরেই শিক্ষারম্ভ। বিদ্যালয় শিক্ষা সমাপ্ত করেন কলকাতার কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজে। কিন্তু শিক্ষা সম্পূর্ণ হল না। তখন স্বদেশি আন্দোলনের জোয়ার। ইংরেজ-শাসকের ডিগ্রি প্রত্যাখান করলেন, তেমন করেছিলেন ডাঃ চারুচন্দ্র সান্যাল এবং ডাঃ সুধীর বসু। যাই হোক পরবর্তীকালে, ডাঃ চারুচন্দ্র সান্যালের আমন্ত্রণে চিকিৎসক হয়েই জলপাইগুড়ি শহরে প্রবেশ করলেন। তখন জলপাইগুড়ির যুবসমাজ স্বাধীনতার মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত। ফলে একই সময়ে তিনি রাজনৈতিক ব্যক্তি এবং চিকিৎসক। গরিবের ডাক্তার, সাধারণ মানুষের ডাক্তার, স্বভাবগুণে তাঁর দিনবাজারস্থিত 'চেম্বার'টি হয়ে গেল সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যম। চিকিৎসাকে সাধারণ মানুষের আছে সুলভ্যে, বেশির ভাগ সময়েই বিনা অর্থে, পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য হল তাঁর জীবনের ব্রত। ফলে তাঁর নাম তখন শহরের মানুষের মুখে মুখে।

১৯৩০ সনে বিখ্যাত ডান্ডি মার্চ। রাজদ্রোহের অপরাধে কারাবরণ, জলপাইগুড়ি জেল থেকে বহরমপুর সেন্ট্রাল জেল। একনাগাড়ে ৮ মাস অন্তরীণ। ১৯৩৯ সনে জলপাইগুড়ি শহরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের যে সম্মেলন হয়েছিল, সেখানে তিনি প্রদর্শনী বিভাগের অধিকর্তা। সতেরো বছর জলপাইগুড়ি জেলা কংগ্রেসের সভাপতি। ১৯৪৭ সন থেকে আমৃত্যু জলপাইগুড়ি জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান। সন, তারিখের হিসেবে এটা তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সংক্ষিপ্ত রূপ। শুধু তিনি নন, তাঁর স্ত্রীও কারাবরণ করেছিলেন। স্বাধীনতা-সংগ্রামী, সর্বজনপ্রিয় চিকিৎসক, ডাঃ ধীরাজমোহন সেন দু'টি গৌরবের অধিকারি। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট, কংগ্রেস অফিসে তিনিই প্রথম ভারতের ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা উত্তোলন করেন এবং কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে, ১৯৪৮ সনে গান্ধীজির চিতাভস্ম তিনিই তিস্তা-করলার সঙ্গমস্থলে মিশিয়ে দিয়েছিলেন।

শহরের প্রবীণ শিক্ষা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। সেন্ট্রাল গার্লস স্কুল, সোনাউল্লা ইনস্টিটিউশন, রেডক্রশ... প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের শ্রীবৃদ্ধির পেছনে তাঁর সহযোগিতা স্মরণযোগ্য। ত্যাগ, নিষ্ঠা এবং আদর্শের প্রতি অবিচল আস্থা, তাঁকে সম্মানীয় ব্যক্তি হিসেবে চিরস্থায়ী করেছে। খুব ছোট ঘটনা, তৎকালীন স্বদেশি আবহাওয়ায় খদ্দর পরিধান ছিল অবশ্যকর্তব্য। ডাঃ সেন তার থেকেও এগিয়ে গিয়ে বাড়ির চাদর, মায় মশারিও খদ্দরে ঢেকে দিয়েছিলেন। এই আদর্শ থেকে তিনি কখনো বিচ্যুত হননি। ফলে তৎকালীন বিরোধী রাজনৈতিক মানুষের কাছেও তিনি বন্ধু, আদর্শস্বরূপ। জলপাইগুড়ি জেলা কম্যুনিস্ট পার্টির প্রথম সম্পাদক বীরেন দত্তর কথায়... 'ডাঃ ধীরাজমোহন সেন... আমার জীবনে শ্রেষ্ঠ বন্ধুদের একজন, সদাহাস্যময় প্রখ্যাত চিকিৎসক ও কংগ্রেসের স্তম্ভস্বরূপ...'

১৯৫৬ সালে ৩০ মে, জলপাইগুড়িতে ডাঃ ধীরাজমোহন সেনের জীবনাবসান হয়।

চারুচন্দ্র সান্যাল

চারুচন্দ্র সান্যাল স্মারকগ্রন্থের প্রস্তাবনায় এরকম লেখা রয়েছে... 'চারুচন্দ্র ছিলেন উত্তরবাংলার মাটির সন্তান। তিনি উত্তরবাংলার মাটি ও মানুষের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে পড়েছিলেন গভীর মমত্বের 'ফান্দে', সেই মমত্বের বন্ধনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর বিজ্ঞানমনস্ক অসাধারণ সমাজবিশ্লেষক শক্তি। এই দুই মানসিক যৌগের প্রেক্ষিতেই তিনি সারাজীবন উত্তরবাংলায় বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জীবন ও বাস্তু-স্থিতিস্থান সম্পর্কে বহু অমূল্য সম্পদ সংগ্রহ করে গিয়েছেন। ভাবনাচিন্তা করেছেন এসব সম্পদ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণের পন্থাপদ্ধতি। এভাবে চারুচন্দ্র উত্তরকালের গবেষকদের জন্য উন্মোচন করে গিয়েছেন এক অফুরন্ত লোকায়ত ভাণ্ডারের দ্বার। চারুচন্দ্রের অনুসন্ধিৎসার জগৎ ছিল বহুব্যাপ্ত যা কোনো একক গবেষকদের পক্ষে সমাপ্ত করা সম্ভব না। চারুচন্দ্রের পক্ষেও তা সম্ভব হয়নি। তাঁর বহু বিস্তৃত গবেষণার কাজ অসম্পূর্ণ রেখে চারুচন্দ্রকে বিদায় নিতে হয়েছে তাঁর আজীবন পালিত স্বপ্নের জগৎ থেকে।...



ডাঃ চারুচন্দ্র সান্যাল

এই দীর্ঘ উদ্ধৃতি যার সম্পর্কে তিনি একজন সমাজতত্ত্ববিদ, নৃতত্ত্ববিদ, লোকসংস্কৃতিবিদ...তিনি একজন প্রতিভাবান লেখক, রাজনৈতিক নেতা এবং একজন গুণী চিকিৎসকও।

'উত্তরবাংলার মাটির সন্তান' চারুচন্দ্র সান্যাল জন্মেছিলেন জলপাইগুড়ি শহরে, ১৮৯৭ সালের ২৩ জুলাই। পিতা বিশিষ্ট আইনজ্ঞ, স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং চা-শিল্পে জেলায় প্রথম জয়েন্ট স্টক কোম্পানি খোলার প্রধান উদ্যোক্তা চারুচন্দ্র সান্যাল। মাতা মনোমোহিনী দেবী। আদি নিবাস পাবনা।

অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র। শিক্ষারম্ভ জলপাইগুড়ি জেলা স্কুলে। ১৯১৪ সালে সেখান থেকে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে, ১৯১৬ সনে কলকাতা রিপন কলেজ থেকে আই এস-সি পাস করেন। এবং এরপর ১৯১৮ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ফিজিওলজিতে অনার্স সহ প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে বি এস-সি ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর ১৯২০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এস-সি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে (ডি এস-সি) গবেষণায় নিযুক্ত হন এবং একই সঙ্গে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করেন। কিন্তু শেষ ধাপের পরীক্ষায় না

বসে, তিনি আইন অমান্য আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং রাজদ্রোহের অপরাধে প্রেসিডেন্সি জেলে অন্তরীণ হলেন। এই প্রসঙ্গে চারুবাবুর নিজের কথায় ...'জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের পর বড়লাট লর্ড চেমস্‌ফোর্ড কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে সভাপতিত্ব করতে আসেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের বহু ছাত্র তাঁর হাতে ডিগ্রি নেওয়া বর্জন করেন। চারুবাবুও চেমস্‌ফোর্ডের হাত থেকে তার এম এস-সি ডিপ্লোমা নেননি ও তৎপর মেডিকেল কলেজের প্রথম দুটি পরীক্ষার সার্টিফিকেটও গ্রহণ করেননি।...'

চারুবাবু পরে আরেক জায়গায় লিখেছেন... '১৯২২ সনের শেষের দিকে কলকাতার ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ খোলা হল। অধ্যক্ষ সুন্দরীমোহন দাস সংবাদ দিলেন, চারুবাবুকে কলকাতায় এসে এই কলেজে অধ্যাপনা করতে। তিনি কলকাতায় ১৯২৪ সন পর্যন্ত কাজ করেন ও এই সময়েই চিকিৎসাবিদ্যার অবশিষ্ট পাঠ সমাপন করেন, কিন্তু ডিগ্রি গ্রহণ করেন ১৯৪৮ সনে...।'

সংক্ষেপে এই তাঁর শিক্ষাপর্ব, প্রেসিডেন্সি জেল থেকে মুক্তি পেয়ে ফিরে এলেন জলপাইগুড়ি। শুরু হল তাঁর জীবনের দ্বিতীয় পর্ব। সে সময়ে জলপাইগুড়িতে মাদকদ্রব্য, বিলাতি দ্রব্য বর্জনের আন্দোলন চলছিল। খগেন দাশগুপ্ত সহ তিনিও অংশ নিলেন চরকা কাটা, সভা-সমিতি, সমাবেশে। খগেনবাবুকে সঙ্গে নিয়ে গ্রামে গ্রামে কংগ্রেসের বার্তা পৌঁছে দিতে লাগলেন।

সনওয়ারি হিসেবে, তাঁর রাজনৈতিক সক্রিয়তা এরকম :

১৯২২ ॥ আন্দোলনের অঙ্গ হিসেবে, জনগণকে স্বয়ম্ভর করার লক্ষ্যে শহরে গড়ে উঠল একটি বয়ন বিদ্যালয়। উদ্যোক্তাদের মধ্যে তিনি অন্যতম।
এই বছরেই বগুড়া-রাজসাহীর বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যের জন্যে গঠিত ত্রাণ কমিটিতে তিনি জেলার পক্ষ থেকে আক্কেলনুর ক্যাম্পে প্রতিনিধি হয়ে গেলেন। এই বছরেই শহরে একটি সেবা সমিতি গঠিত হল। সম্পাদক তিনি।

১৯২৩-২৪ ॥ কলকাতায় অধ্যাপনা এবং চিকিৎসাবিদ্যা পড়ার কাজ।

১৯২৫ ॥ শহরে মহাত্মা গান্ধীর আগমন। তিনি গান্ধীজির সভায় স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর মহাপরিচালক।

১৯২৯ ॥ জলপাইগুড়িতে ছাত্র সম্মেলন। চারুবাবু অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি।

১৯৩০ ॥ আইন অমান্য আন্দোলন, 'ডান্ডি মার্চ'। রাজদ্রোহের অপরাধে গ্রেপ্তার বরণ করলেন। অন্তরীণ জলপাইগুড়ি/দমদম সেন্ট্রাল জেলে।

১৯৩২ ॥ আবার গ্রেপ্তার, প্রেরিত হলেন দমদম স্পেশাল এবং আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে।

১৯৩৪ ॥ বিহার-বাংলার প্রচণ্ড ভূমিকম্পের সময় গঠিত ত্রাণ কমিটির তিনি যুগ্ম সম্পাদকদের অন্যতম।

১৯৩৯ ॥ শহরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্মেলন। তিনি হলেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি।

১৯৪৬-৪৭ ॥ বাংলা সরকারের আইন সভার সদস্য নির্বাচিত।

১৯৫২-৬৯ ॥ উত্তরবঙ্গ গ্রাজুয়েট কনস্টিটিউয়েন্সি থেকে নির্বাচিত হলেন। হলেন পুনরায় বিধান পরিষদের সদস্য।

১৯৭১-৭২ ॥ জলপাইগুড়ি জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি।

এই রাজনৈতিক, সামাজিক ক্রিয়াকলাপের ফাঁকে ফাঁকে চলছে লেখালিখি, গবেষণার কাজ। যখন কারাগারের বাইরে, তখন তিনি চিকিৎসায় ব্রতী। সব মানুষের বন্ধুচিকিৎসক। ইতিমধ্যে ১৯৩৩ সনে প্রকাশিত হয়েছে 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'র বঙ্গানুবাদ 'সাম্যবাদীর আদর্শ, সম্ভবত সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পর দ্বিতীয় বাংলা অনুবাদ। সেই সময়, একজন গান্ধীবাদীর পক্ষে এরকম একটা বই লেখা এক আশ্চর্য ঘটনা। কিন্তু চারুবাবু মনে করেছিলেন কমিউজমের আদর্শটা জানা থাকলে তার প্রয়োগ সম্বন্ধে চিন্তা করার সুবিধা হয়।'... এছাড়া প্রকাশিত হয়েছে চিকিৎসা ও বিজ্ঞান বিষয়ক বিভিন্ন গবেষণাপত্র। যার একটি ছাত্রাবস্থাতেই কলেজপাঠ্য হয়েছিল। তার মূল সৃষ্টিগুলি প্রকাশিত হল দেশের স্বাধীনতার পরে। ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত হল 'টোটো'...উপজাতিদের জীবনযাপন সম্পর্কিত পুস্তক। ১৯৬৫ সনে এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত হল বিখ্যাত হল 'রাজবংশী' অফ্ নর্থ-বেঙ্গল' এবং ১৯৭৩ সনে 'The Meches and the Totos'। এই তিনটি বই তাঁকে খ্যাতির তুঙ্গে নিয়ে যায়। রাজনীতিবিদ থেকে তিনি অভিষিক্ত হলেন গ্রন্থকারের ভূমিকায়। এই তিনটি বই সম্পর্কে অনুজ সাহিত্যিক দেবেশ রায়ের অভিমত প্রণিধানযোগ্য ...'চারুবাবুর বই তিনটি যদিও সামাজিক নৃতত্ত্বের বই—তিনি কিন্তু সমাজবিজ্ঞানী হিসাবে এই বই লেখেননি। লিখেছিলেন রাজনৈতিক কর্মীর সমাজ-জিজ্ঞাসা থেকে। শিক্ষিত মানুষ হিসেবে যে রাজবংশী ও মেচ সমাজের মধ্যে তিনি কাজ করেছেন, রাজনৈতিক মানুষ হিসাবে তাদের ইতিহাস উদ্ধারের দায় তিনি বোধ করেছিলেন। খানিকটা অবচেতনভাবেই, এই দায় তিনি খোলামনে নিয়েছিলেন। সেই দায়বহনের জন্যেই এই তিনটি আদিবাসী গোষ্ঠী সম্পর্কে এমন বিপুল তথ্য এককভাবে সংগ্রহ করে যেতে হয়েছিল।'...

তিনি আরো লিখেছেন...'কমিউনিস্টরা সচেতনভাবে সামাজিক রূপান্তর ঘটাতে চায়। উত্তরবঙ্গে বা জলপাইগুড়ি জেলাতে যে কমিউনিস্টকে সামাজিক রূপান্তরের কাজ করতে হবে...তাঁকে রাজবংশী,, মেচ ও অন্যান্য জনগোষ্ঠী সম্পর্কে, তাদের ইতিহাস-ভূগোল সম্পর্কে জানতে হবে। চারুবাবুর এই দুটি বই কমিউনিস্ট কর্মীদের হ্যান্ডবুক।'...

আজকের পরিপ্রেক্ষিতে এই কথা আরো বেশি সত্য। প্রয়াত উপেন্দ্রনাথ বর্মণ, একজন প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি, যিনি উত্তরবঙ্গের ইতিহাসবেত্তারূপে সর্বজনস্বীকৃত, তিনি লিখেছেন...'চারুবাবু চিকিৎসক হিসাবে এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন মুখ্য সঞ্চালকরূপে উত্তরবঙ্গের, বিশেষ করে জলপাইগুড়ি জেলায় দিনের পর দিন রাজবংশী সমাজের সংস্পর্শে আসেন এবং নিবিড়ভাবে এই সমাজকে পর্যবেক্ষণের সুযোগ পান। এই সমাজের আচার-ব্যবহার, বাসগৃহ নির্মাণ প্রণালী, জীবিকা, বিবাহাদি সংস্কার, ধার্মিক জীবন, পূজা-পার্বণ, ভাষা, সংগীত, প্রবাদ-প্রবচন, খেলাধুলা প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য সংগ্রহ করে স্বীয় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। এজন্য তিনি যে অধ্যবসায় ও অপরিসীম পরিশ্রম নিয়োগ করেছেন—

আর দশটা কাজের মধ্যে, তা সত্যিই বিস্ময়কর। বস্তুত রাজবংশী জাতি সম্বন্ধে এ প্রকার নিখুঁত তথ্য তাঁর পূর্বে বা পরে আর কেউ দিয়ে যাননি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সামান্য মতদ্বৈধ থাকলেও সামগ্রিকভাবে এই তথ্যগুলি রাজবংশী প্রত্নতাত্ত্বিক ইতিবৃত্ত বলে আমার অভিমত।...

স্বাভাবিকভাবেই এই শ্রদ্ধার্ঘ্য একজন প্রতিভাবান, সমাজ-সচেতন উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের প্রতি।

১৯৬৮ সনে চারুচন্দ্র সান্যাল The Rajbanshis of North Bengal গ্রন্থের জন্য রবীন্দ্রপুরস্কার পেলেন। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মান জানালো ডি লিট উপাধি দিয়ে। তাঁর নামে বিশ্ববিদ্যালয়ে গীতি হয়েছে, সমাজতত্ত্ব বিষয়ে একটি 'চেয়ার' স্থাপিত হয়েছে।

১৯৮০ সালে এই দেশবরেণ্য সন্তান জলপাইগুড়িতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

জগদিন্দ্রদেব রায়কত

জলপাইগুড়ি জেলার ইতিহাসে চিরস্থায়ী এক বর্ণাঢ্য চরিত্র। এত রঙের মিছিল বোধ হয় খুব কম চরিত্রেই আছে। জমিদারি প্রাপ্তি এবং স্বল্প সময়ে জমিদারি হারানোর যে ঘটনা, যেন জমকালো ঐতিহাসিক নাটকেরই একটি অংশ।

বৈকুণ্ঠপুর রাজ এস্টেটের রাজগদি যোগীন্দ্রদেবের মৃত্যুর পর দত্তকপুত্র হিসাবে তিনিই পেয়েছিলেন। কিন্তু মকরন্দদেবের পুত্র ফণীন্দ্রদেব এই সিংহাসন প্রাপ্তিকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে মামলা করেন এই মর্মে যে, বৈকুণ্ঠপুরের রাজকীয় নিয়মে দত্তকপুত্রের সিংহাসন পাবার কোনো অধিকার নেই। হাইকোর্টে হেরে যান। পরে লন্ডনে প্রিভি কাউন্সিলে গিয়ে মামলা জিতে আসেন। কিন্তু ততদিনে প্রায় অনেক বছর চলে গেছে. রাজত্ব অধিকারের পর তিনি বিলেতে গিয়েছিলেন, রাজকীয় প্রথাগুলি লিখতে। ফিরে এসে নোয়াখালি বেড়াবার সময় ব্রাহ্মসমাজের নেতা কেশবচন্দ্র সেনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ষষ্ঠীচরণ সেনের কন্যা সরলতা দেবীকে দেখে পছন্দ হয় এবং তাঁকে বিবাহ করে নিয়ে আসেন। জগদিন্দ্রদেব ছিলেন যথার্থই শিক্ষিত, তাই বিলেত থেকে ফিরে আসবার পর, দেশীয় কুলপতিরা যখন প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য দাবি জানালো তখন তিনি তা প্রত্যাখান করলেন। প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থার মধ্যে ছিল মস্তকমুণ্ডন, গোচনা সেবন এবং ব্রাহ্মণ ভোজন। তিনি কোনোটিই করতে অস্বীকার করলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, 'বিলেত দেশটা আমাদের দেশের মতোই, ভাষা আলাদা, গায়ের রঙ আলাদা, তার তাছাড়া তিনি কোনো নিষিদ্ধ ভক্ষণ করেননি এবং কুসংসর্গেও যাননি, সুতরাং কুলপতিদের নিয়ম মানতে তিনি অক্ষম।' জগদিন্দ্রদেব এতটাই দৃঢ় ছিলেন যে, সামাজিক-বয়কটকেও ভয় পাননি। এদিকে প্রিভি কাউন্সিলের রায়ে রাজত্বও হাতছাড়া। তিনি তখন বর্তমানে 'রায়কতবাড়ি' নির্মাণ করে সেখানে বসবাস শুরু করলেন। এবং সবাইকে শিক্ষা দেবার জন্য সম্পূর্ণ সাহেবী পোশাক পরে জীবনযাপন করতেন।

এই মানুষটিই গান্ধীজির আত্মত্যাগের দর্শনে উদ্বুদ্ধ হয়ে মুহূর্তে সবকিছু ত্যাগ করতে দ্বিধা করেননি। তখন তাঁর পরনে ফতুয়া পায়ে কাষ্ঠপাদুকা আর হাতে তালপাতার ডাঁটের ছাতি। রাজত্ব আর রাজকীয় প্রথা ত্যাগ করলেও জনসাধারণের চোখে তিনি যেন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী রাজা। বিপ্লবী নেতা, কম্যুনিস্ট পার্টির জেলা সম্পাদক বীরেন দত্ত তাঁর স্মৃতি কথায় বলেছেন... 'জগদিন্দ্রদেব রায়কত মহাশয় শিবমন্দির, রাজবাড়ির দিঘি প্রভৃতি স্থানে বসিয়া বহু উপদেশ আমাকে দিতেন যাহা পরবর্তী জীবনে আমার মনোরাজ্য দেদীপ্যমান হইয়া আছে....'

ইতিমধ্যে মহাত্মাজির ডাকে তিনি, ১৯২১ সালে নবগঠিত জলপাইগুড়ি জেলা কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি, তাই ১৯৩৯ সনে পাণ্ডাপাড়ায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্মেলন স্থানটি তাঁরই স্মৃতিতে 'জগদিন্দ্র নগর' রাখা হয়েছিল। কংগ্রেসের সঙ্গে যোগাযোগটা এতটা আত্মিক ছিল যে, শেষ বয়সে প্রায় অন্ধ অবস্থায় তিনি নিয়মিত পাণ্ডাপাড়া কংগ্রেস অফিসে গিয়ে বসতেন। তাঁর মানসিক দৃঢ়তা যে কোনো গড়পড়তা বাঙালির চেয়ে অনেক বেশি ছিল, সাহসী ছিলেন এবং তেজস্বী ছিলেন... ফলে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন যখন ব্রিটিশ শাসকদের কুনজরে, তখন তিনি একবার জলপাইগুড়ি এসেছিলেন। সেটা জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের পরের ঘটনা। রাজরোষের ভয়ে জলপাইগুড়ি কংগ্রেসের তাবড় তাবড় নেতারা কেউই নির্ধারিত বর্ধনপ্রাঙ্গণ বা গান্ধী ময়দানে সমাবেশ আয়োজন করতে সাহস পাননি, এমন কি কেউ তাঁকে গৃহে রাখতেও ভয় পেয়েছিলেন। তখন জগদিন্দ্রদেব তাঁর বাড়ির সামনের মাঠে এই সভার ব্যবস্থা করলেন এবং নিজের গৃহেই তাঁদের আশ্রয় দিলেন। সেই বিরাট জনসভায় দেশবন্ধুর বক্তব্যে সবাই উদ্বেল। জগদিন্দ্রদেব ঘৃণায় তাঁর অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেটের পদ ছেড়ে দিলেন।

স্ত্রী সরলতা দেবীর মৃত্যুর পর তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক সমাজের শৃঙ্খলার প্রতি এতটাই আকৃষ্ট ছিলেন নববধূকে এক শর্তে বেঁধেছিলেন...ধান রোপণ করতে হবে এবং পুকুর করতে হবে। অর্থাৎ স্বনির্ভরতার পথে পরিবারকে যাত্রা করতে হবে।

পারিবারিক শান্তি, স্বস্তি ও সম্ভ্রম বজায় রাখতে তাঁর চারটি উপদেশ আজও স্মরণীয়। যেমন—(১) ছায়ায় ছায়ায় পথ চলবে অর্থাৎ বাড়ির চারিদিকে বড় বড় গাছ পুঁতবে। (২) বাড়িতে হাট বসাবে অর্থাৎ বাড়ির বাইরে পেছনে বাগান করবে। (৩) গোটা গোটা মাছ খাবে অর্থাৎ অবশ্যই পুকুর কাটতে হবে এবং (৪) তেমাথার কাছে বুদ্ধি নেবে অর্থাৎ বয়স্ক লোকের কাছে উপদেশ গ্রহণ করবে।

তাঁর প্রাণ ছিল, কৃষি ও কৃষক অন্ত। তাই তখনকার দিনের চা-বাগানের অগ্রগতির সময়, যখন তিনি লক্ষ করলেন, চা-বাগানের জন্য কৃষিজমিও নিয়ে নেওয়া হচ্ছে, তখন তিনি ক্ষোভে তাঁর সংগৃহীত চা-কোম্পানির শেয়ারগুলি মুহূর্তের মধ্যে বিক্রি করে দিলেন। সেগুলির মূল্য তখনকার মূল্যে ৭৫,০০০ টাকা। আজ তা কত হবে, সহজেই অনুমেয়। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও তাঁর নজর ছিল। এই শহর তথা জেলার সুস্থ সংস্কৃতি বিষয়ে তিনি অপরিসীম অবদান রেখে গেছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর পৌত্র সমরেন্দ্রদেব রায়কত (তরু) কিরাত ভূমি পত্রিকার ১২৫তম সংখ্যায়) লিখেছেন...'আমার মতে বলতে দ্বিধা নেই যে জেলায় এমন একজন বিদ্বান, সুধী, জ্ঞানী ও শিল্পকলায় যাঁর প্রভূত রুচি ও প্রেম ছিল। তাঁরই অনুপ্রেরণায় এই জেলাতেই প্রথম সঙ্গীতের চর্চা শুরু হয়। সেই মহাজ্ঞানীর নাম স্বর্গীয় জগদিন্দ্রদেব রায়কত। তিনি আজ থেকে ৮০ বছর পূর্বে জলপাইগুড়ি বৈকুণ্ঠপুর রাজ এস্টেটের অধিকারি ছিলেন। রাজকার্য চালানোর জন্য

তাঁকে বিলেতেও শিক্ষা গ্রহণের জন্য যেতে হয়েছিল। বাংলা ভাষা ছাড়াও সংস্কৃত, আরবি, ফারসি, ইংরেজি ভাষাতেও শিক্ষালাভ করেছিলেন। এই মহাপুরুষের সঙ্গীতচর্চা করাটাও একটা সুষ্ঠু এবং সুন্দর জীবনযাপনের জন্য অত্যাবশ্যক বিষয় বলে প্রতীয়মান হয়েছিল। সেজন্য তিনি নিজের তিন পুত্রকে এই শিল্পকলায় চর্চা করার জন্য উৎসাহ অনুপ্রেরণা দেন।'...

সমরেন্দ্র রায়কত আরো লিখেছেন...'জলপাইগুড়ি শহরের 'রায়কতবাড়িতে' তখনকার দিনে সঙ্গীতচর্চা করার জন্য একটি জলসাঘর স্থাপিত হয়। এই জলসাঘরের নাম ছিল সঙ্গীত সমাজ। এটা স্থাপিত হয় ১৯১৮ সালে। সেকালে মধ্যবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজে গান-বাজনা করাটা খুব সুনজরে দেখা হত না। কারণ, অনেকেরই ধারণা ছিল যে গানবাজনা বিলাসের বস্তু এবং রাজা-বাদশাহদের দরবারেই তা মানায়। আর গানবাজনা করে বাইজিরা বা নীচুস্তরের লোকেরা। কিন্তু ভদ্রসমাজে সঙ্গীতচর্চা করার যে বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে, সেই সৎসাহস দেখানোর জন্যই জগদিন্দ্রদেব রায়কত অনেক উৎসাহী শ্রোতা ও শিক্ষানবিশীদের এই বিষয়ে আকৃষ্ট করেন।...

১৯৩৪ সনে এই মহাপ্রাণ রাজা দেহত্যাগ করেন।

জ্যোতিশচন্দ্র সান্যাল

স্বনামধন্য দুর্গাচরণ সান্যালের পুত্র, শিক্ষায়, চিন্তায়, সাহসে সংগ্রামে তিনি যেন পিতার যোগ্য উত্তরাধিকারি। স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম জেলা সম্পাদক বীরেন দত্তর ভাষায়... 'চিরভাস্বর এক জ্যোতিষ্ক...আমার জীবনে চিরদিন যশস্বী ও অনন্য প্রতিভাধর পুরুষসিংহরূপে চির জাগরুক রহিয়া গেলেন...

জ্যোতিশচন্দ্রের জন্ম ১৮৮৪ সনে, প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কিছুদিন জলপাইগুড়ি জেলা স্কুলে কিছুদিন শিক্ষকতা করেছিলেন। তারপর ১৯০৭ সনে গঠিত 'জাতীয় বিদ্যালয়ে'-ও শিক্ষকতার কাজ করেন। এরপর ওকালতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে জলপাইগুড়ি কোর্টে আইন ব্যবসার শুরু। এই সময় কলকাতায় থাকাকালীন, বিখ্যাত হিলি মামলায় পিতার সমর্থনে মামলা লড়তে গিয়ে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ, সাহিত্যিক বীরবল প্রমুখ প্রাতঃস্মরণীয় মানুষদের সংস্পর্শে আসেন। সেখান থেকেই তাঁর জীবনের মূল আকাঙ্ক্ষাগুলির ছক তৈরি হয়ে যায়। সমস্ত কিছু ছাপিয়ে সাহিত্যিক ও সাংবাদিক জ্যোতিশচন্দ্রই বড় হয়ে ওঠে। ইংরেজ শাসনের আত্ম-অহংকারের বিরুদ্ধে তিনি একদিকে যেমন সক্রিয় প্রতিবাদ করেছেন, তেমনি সাংবাদিকের কলম দিয়ে শাসকবর্গের বিরুদ্ধে আপসহীন প্রতিবাদ করে গেছেন।

১৯২১ সনে 'ইংলিশম্যান' কাগজে দেশবন্ধুর council-এ প্রবেশ নিয়ে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সেই প্রবন্ধ প্রকাশের পর আলোড়িত মালিকপক্ষ তাঁকে ইংলিশম্যান কাগজে তিনশো টাকা মাসিক বেতনে সাব-এডিটরের চাকরির প্রস্তাব পাঠান। কিন্তু জ্যোতিশচন্দ্র সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। আর্থিক অবস্থা তখন শোচনীয়, কিন্তু তখনকার ৩০০ টাকা মাইনের চাকরি প্রত্যাখ্যান করার মতো হিম্মত তাঁর ছিল। কেননা, স্বাধীনচেতা জ্যোতিশচন্দ্র জানতেন, ওই কাগজে স্বাধীন মত ব্যক্ত করা যাবে না। এর আগে ১৯২০ সালে, তিনি নবগঠিত জেলা কংগ্রেসের প্রথম সম্পাদক নির্বাচিত হলেন। আবার একই সালে ইংরেজ শাসকদের প্রস্তাবমতো জলপাইগুড়িতে মেডিকাল স্কুল স্থাপনের ব্যাপারে উদ্যোগ নিলেন। কিন্তু শাসক-বিরোধী জ্যোতিশচন্দ্রের এই প্রচেষ্টাকে অনেক কাজেই বিস্ময়বোধের সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু জ্যোতিশচন্দ্রের লক্ষ ছিল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলার মাধ্যমে এলাকার মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন। বলা বাহুল্য, কিছুদিন পরেই এই উদ্যোগ সফল হল।

১৯২৪ সনে 'জনমত' পত্রিকা যাত্রা শুরু করল, তাঁর সম্পাদনায়। মনে যেন 'জনমত' পত্রিকার ইতিহাসই জ্যোতিশচন্দ্রের ইতিহাস। তাঁর সমস্ত শিক্ষা, সাহসিকতা, সাহিত্যপ্রতিভা সমস্তই যেন ঢেলে দিয়েছিলেন ওই কাগজের প্রকাশনায়। আমৃত্যু এই কাগজে, প্রায় একযুগ, বাংলা সাংবাদিকতার ইতিহাসে ওই সময়টুকু কিছুতেই বাদ দেওয়া যাবে না। এই কাগজ এখনো চলছে।

রাজরোষের ভয়ে জলপাইগুড়ি কংগ্রেসের তাবড় তাবড় নেতারা কেউই নির্ধারিত বর্ধনপ্রাঙ্গণ বা গান্ধী ময়দানে সমাবেশ আয়োজন করতে সাহস পাননি, এমন কি কেউ তাঁকে গৃহে রাখতেও ভয় পেয়েছিলেন। তখন জগদিন্দ্রদেব তাঁর বাড়ির সামনের মাঠে এই সভার ব্যবস্থা করলেন এবং নিজের গৃহেই তাঁদের আশ্রয় দিলেন। সেই বিরাট জনসভায় দেশবন্ধুর বক্তব্যে সবাই উদ্বেল। জগদিন্দ্রদেব ঘৃণায় তাঁর অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেটের পদ ছেড়ে দিলেন।

১৯২৫ সনে তিনি 'জনমত' ছাড়াও BARENDRA নামে একটি ইংরেজি সাপ্তাহিক প্রকাশ করেছিলেন। যদিও তা বেশিদিন বাঁচিয়ে রাখা যায়নি। পাশাপাশি সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপও তাঁর বজায় ছিল। ১৯২৬ সনে সরোজিনী নাইডু জলপাইগুড়ি এলে তাঁর ইংরেজি বক্তব্যের বাংলায় অনুবাদ করবার ভার পড়েছিল তাঁরই ওপরে। এছাড়াও ছাত্র সম্মেলনে তাঁর উপস্থিতি ছিল। বিপ্লবীদের পক্ষে মামলা লড়তেও তিনি হাজির। ১৯৩০ সনে জারি এমার্জেন্সি প্রেস আইনের প্রতিবাদে, জাতীয় কংগ্রেস এবং সংবাদপত্রসেবী সংঘের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 'জনমত' প্রকাশ বন্ধ রেখেছিলেন। এক মাস পরে আবার প্রকাশিত হলেও, সম্পাদকীয় কলম শূন্য রেখে দিয়েছিলেন। শুধুমাত্র এই ক্ষেত্রেই নয়, যে কোনো ঘটমান সামাজিক, রাজনৈতিক অন্যায় অবিচারের ক্ষেত্রে তিনি তাঁর কাগজকে চাবুকের মতো ব্যবহার করতেন। তাঁর জন্য জ্যোতিশচন্দ্রের বাড়িতেও পুলিশের খানাতল্লাশ হয়েছে। ১৯৩২ সালের এক সরকারি আদেশে 'জনমত' পত্রিকার প্রকাশ ১ মাসের জন্যে বন্ধ হয়েছিল। ১৯৩৩-এ

আরেকটি সরকারি আদেশে 'জনমত' পত্রিকায় সরকারি বিজ্ঞাপন দেয়াও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কোনো দমনমূলক ব্যবস্থাই জ্যোতিশচন্দ্রকে নিবৃত্ত করতে পারেনি। যে কারণে নীতির গরমিল হওয়াতে, জেলা কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদনা হলেও কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করতে বাধ্য হন।

সাহিত্যিক হিসেবেও তিনি যথেষ্ট পরিণত ছিলেন। তাঁর লেখা কয়েকটি গল্প সে আমলে সাড়া জাগিয়েছিল। মুসলিম অন্তঃপুর নিয়ে গল্পগুলি তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। ১৯৩৫ সনে যখন জলপাইগুড়িতে প্রথম বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা চালু হয়, সেই বিদ্যুতের তাৎপর্য নিয়ে 'বিজলী বউ' নামে যে রম্যগল্পটি লিখেছিলেন, তার নজির খুব বেশি নেই।

শিল্পে উন্নতির জন্য জলপাইগুড়ি শহরে যে 'চা-কর সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তিনিই ছিলেন এর অন্যতম প্রতিষ্ঠতা এবং প্রথম সম্পাদক। জলপাইগুড়ি জিলা স্কুল তুলে দেবার সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে তিনি তাঁর কাগজে গর্জে উঠেছিলেন। ফলে সরকার তার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নিয়েছিল। ১৯৩৬ সালের ২ নভেম্বর, মাত্র ৫২ বছর বয়সে, এই বিদ্রোহী মানুষটির জীবনাবসান হয়।

দুর্গাচরণ সান্যাল

...'ইংরেজি ১৯০৭ সালের শরৎকাল। হিলি স্টেশনে লোকে লোকারণ্য, সকলে উত্তেজনায় ভরপুর। বৈধ রেলের টিকিট থাকা সত্ত্বেও কোর্ট ও স্মার্ট নামক দুজন ইংরেজ যাত্রী একজন বাঙালি বৃদ্ধ ভদ্রলোককে ট্রেন থেকে নামিয়ে দিতে উদ্যত হয়েছে, রেলকর্মচারীদের আবেদনেও তারা ভ্রূক্ষেপ করছে না—'কালা-আদমিকো ঘুসনে নেহি দেগা'। অবস্থা বেগতিক দেখে বৃদ্ধ ভদ্রলোক ফুঁসে উঠলেন। ট্রেনের কামরায় বলপূর্বক ঢুকে ওই ইংরেজদেরই ছোরা কেড়ে নিয়ে আত্মরক্ষা করলেন। নিজের অধিকার এবং আত্মসম্মান তাঁকে রক্ষা করতেই হবে। ধস্তাধস্তির সময় ছোরার আঘাতে সাহেব দু'জন সামান্য জখম হন। এই অপরাধে দিনাজপুর জজকোর্ট থেকে এই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির চার বৎসর কারাদণ্ডের আদেশ হল। এই বৃদ্ধ ভদ্রলোকের নাম দুর্গাচরণ সান্যাল, জলপাইগুড়ির উকিল।'...

জলপাইগুড়ির প্রয়াত ইতিহাসবেত্তা নির্মলচন্দ্র চৌধুরির এই উদ্ধৃতির পর চারুচন্দ্র সান্যালের মন্তব্য '...কলকাতার বহু দেশীয় সংবাদপত্র খুব লেখালেখি করে কিন্তু জেলটা খাটতেই হল। সেই থেকে সান্যাল বাড়ির কেউ ইংরেজ আমলে সরকারি চাকরি পায়নি'... নির্মলচন্দ্র আরো লিখেছেন... 'দুর্গাচরণের এই সংগ্রামী মনোভাব এবং আত্মসম্মান জ্ঞান কিন্তু হঠাৎ বা একদিনে জন্মে নাই। এটা ছিল তাঁর পুরুষ পরম্পরাগত রক্তের সঙ্গে প্রবহমান ধারা।'...

দুর্গাচরণ জন্মেছিলেন আজ থেকে প্রায় দেড়শো বছর আগে (আনুমানিক ১৮৫০ সনে পূর্ববঙ্গের পাবনা জেলায়)। পিতা রামচন্দ্র সান্যাল। নানা পরীক্ষায় বৃত্তি পাওয়া ছাত্র, ১৮৭৪ সনে জলপাইগুড়িতে ওকালতি করতে আসেন। তারপর ঘটনাচক্রে কিছুদিন কানপুর, কলকাতায়ও ওকালতি করেছেন, পরে আবার পিতৃবিয়োগের পর ১৮৮৪'র শেষদিকে জলপাইগুড়ি চলে আসেন। দুর্গাচরণ আইন ব্যবসা এবং সাহিত্যচর্চা দুটো কাজই মধ্যমাচীর মতো করতে পেরেছিলেন। বিভিন্ন স্থানে থাকার জন্য ইংরেজি ছাড়াও উর্দু, ফারসি, সংস্কৃত ভাষাতেও ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। কানপুরে থাকাকালীন, তিনি রচনা করেন 'মহামোগল' কাব্য। এছাড়া 'পারস্য কাব্য', জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কিত বই 'মগোল ভূগোল' ইত্যাদি। পারস্য কাব্যটি লিখিত হয়েছিল ফারসি ভাষায়। কিন্তু তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি বাঙালার 'সামাজিক ইতিহাস' নামক গ্রন্থ রচনা। এই একটি কীর্তিই তাঁকে বঙ্গভাষীদের মধ্যে চিরস্মরণীয় করে রাখবে। এই ইতিহাস নীহাররঞ্জন রায়ের বাঙালির ইতিহাস রচনার অনেক আগেই রচিত। ১৯১০ সনে প্রকশিত এই গ্রন্থ সম্পর্ক রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন 'বাঙ্গালার প্রকৃত ইতিহাস লিখনে বোধ হয় এই প্রথম উদ্যম।'...

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ভূমিকায় লিখেছেন...'সান্যাল মহাশয়ের পূর্বে আমাদের সামাজিক ইতিহাস এইরূপে রচনার কেহ চেষ্টা করিয়াছে কিনা জানি না। গ্রন্থকার যে-সকল কিংবদন্তী সংগ্রহ করিয়া এই ধারাবাহিক ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহার অনেক কথা তাদের অজ্ঞাত ছিল, বোধ করি অনেকের নিকট অজ্ঞাত আছে। এই সকল কিংবদন্তী সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থকার অন্যান্য ইতিহাস লেখকের পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন। প্রকৃত সামাজিক ইতিহাসের কেবলমাত্র সংগ্রাহক নহেন, তিনি বহুস্থলে নূতন অনুসন্ধানের ও চিন্তার পথ মুক্ত করিয়া গিয়াছেন। বস্তুতই গ্রন্থখানি এইসকল কারণে বাঙ্গালী সাহিত্যে অতি উপাদেয় সামগ্রী হইয়াছে। এ পর্যন্ত বাঙ্গালার ইতিহাস বলিয়া যে সকল গ্রন্থ পরিচিত ছিল, তাহা কেবল রাষ্ট্রপতিদিগের বিবরণেই পূর্ণ থাকিত, বাঙ্গালীর জাতির কথা কিছুই থাকিত না।'...

মধুপর্ণী জেলা সংখ্যায় মন্তব্য করা হয়েছে...'অনেকে অনুমান করেন যে, ডঃ নীহাররঞ্জন রায় দুর্গাচরণ সান্যালের গ্রন্থ থেকে বহু তথ্যাদি গ্রহণ করেছেন, কিন্তু ঋণ স্বীকার করেননি। ...পরবর্তীকালে এই অসামান্য গ্রন্থ থেকে আখ্যানসূত্র ধার করে যশস্বী লেখক প্রমথনাথ বিশী রচনা করেন 'জোড়াদিঘীর চৌধুরি পরিবার' ও 'লেন বিল'; মুস্তাফা সিরাজের 'নয়নতারা'র মতো উপন্যাস আর কুমারেশ ঘোষ লিখলেন ছোটগল্প। এঁরা দুর্গাচরণের গ্রন্থের ঋণ প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে স্বীকার করেছেন।'... যেমন স্বীকৃত হয়েছে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ে 'সেই সময়' উপন্যাসের সূত্রপঞ্জিতে।

মরণোত্তর রবীন্দ্র পুরস্কার দেবার প্রচলন থাকলে, প্রথম পুরস্কারটি অবশ্যই দুর্গাচরণ সান্যাল পাবেন।

ইন্দ্রাজমল আগরওয়ালা

শহর পত্তনের অনেক আগে থেকেই এই অঞ্চলে বহিরাগতদের আগমন চলছিল ১৯৬৯-এর আগে থেকে ১৯০০ সনের গোড়া পর্যন্ত যাঁরা শহরে এসেছিলেন তাঁদের শতকরা নব্বইভাগই পূর্ববঙ্গের হিন্দু ও সামান্য কিছু মুসলমান সম্প্রদায়। এঁদের শতকরা ১০০ ভাগই বাঙালি। আবার এঁদের অধিকাংশই পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন আইন ব্যবসাকে, কেউ মোক্তারি, কেউ পেশকার, কেউ সরকারি অফিসের কেরানিগিরির কাজ। চা-বাগান প্রতিষ্ঠার পর এঁরাও কেউ কেউ ঢুকেছেনমাত্র। এদের পাশাপাশি কিছু অবাঙালি মাড়োয়ারি সম্প্রদায়ের মানুষও এ শহরে ভাগ্যানুসন্ধানে এসেছিলেন। যেমন দাগা পরিবার, কল্যাণী পরিবার, মাদু সিং পরিবারের পূর্বপুরুষেরা। এঁদের কথা জলপাইগুড়ির ইতিহাসে উল্লেখিত আছে। কিন্তু অচেনা অখ্যাতও অনেক, যেমন রামযশরাই আগরওয়ালা। ইনি এসেছিলেন রাজস্থানের ঝুনুঝুনু জেলার বিখ্যাত রাজা ক্ষেত্রী এস্টেটের পাশের গ্রাম টিব্রাসাই থেকে। উদ্দেশ্য, শহরে কাটাকাপড়ের ব্যবসা করে

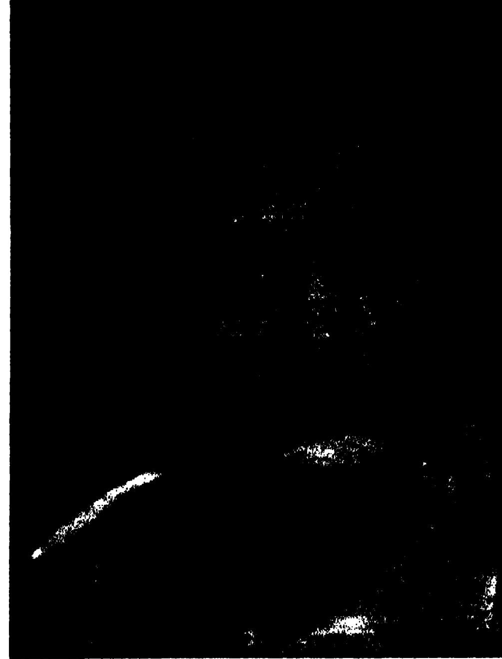
উপার্জন করা। সম্ভবত ১৮৫০ থেকে ১৮৯৬-এর মধ্যেই তিনি এদেশে এসেছিলেন। তাঁরই পুত্র ইন্দারজমল আগরওয়ালা। পিতা কাটাকাপড়ের ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করলেও, তিনি প্রথানুগ পথে চলতে চাইলেন না। সেই সময়ে তাঁর সম্প্রদায়ের পরিমণ্ডলের ভেতরে যা অভাবনীয়, তারই চিন্তায় তিনি আত্মনিয়োগ করলেন। হয়তো, এটা খুবই স্বাভাবিক, সেই সময়কার আলোকপ্রাপ্ত বাঙালি রেনেঁসার সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল। তিনি শিক্ষার দিকে নজর দিলেন। ফলে ব্যবসায় মুনাফার অর্থ দিয়ে তিনি একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ে তুললেন। বর্তমান শিবাজি রোডে 'শিশুমহল' বিদ্যায়তনের সামনে একটুকরো জমিতে বিদ্যালয়টি পরবর্তীকালে 'ইন্দ্রাজমল প্রাথমিক বিদ্যালয়' নামে পরিচিত হল, যদিও পরবর্তীকালে এটি রেলস্টেশনের কাছে, জলপাইগুড়ি হাইস্কুল নামের আড়ালে হারিয়ে গেছে। কিন্তু এখনো মিউনিসিপ্যালিটির খাতায় ইন্দ্রাজমল নামটি বজায় আছে। এখানে একটি ব্যাপার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি কিন্তু নিজের সম্প্রদায়ের সন্তানদের জন্য বিদ্যালয়টি নির্দিষ্ট করেননি। সর্বধর্ম সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েরা যেখানে পড়াশোনা করতো, মুষ্টিমেয় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির মধ্যে 'ইন্দ্রাজমলের স্কুল' একটা বিশেষ পরিচিতি লাভ করেছিল। সাধারণ ঘরের সন্তানদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারে তাঁর উদ্যোগের জন্য তিনি অবশ্যই স্মরণীয়। তিনি জলপাইগুড়ি পুরসভার কমিশনারও নির্বাচিত হয়েছিলেন। জনশ্রুতি, শহরে অধুনালুপ্ত গোলাকার পাকা জলের কলগুলি তাঁর আমলেই স্থাপিত হয়েছে। তাঁর এই কবিপুত্র বৈজনাথ আগরওয়ালের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল। 'বেজুয়া' নামে খ্যাত এই ব্যক্তি নাটকপাগল, বাংলা নাটকের দক্ষ অভিনেতারূপে পরিচিত হয়েছিলেন। তিনি অভিনয় করেছিলেন, মহেন্দ্র গুপ্তের সঙ্গে কোনো ঐতিহাসিক নাটকে। মুনলাইট থিয়েটার (কলকাতায়) বিখ্যাত অভিনেত্রী গীতা দেবীর সঙ্গেও অভিনয় করেছিলেন। যোগ্য পিতার যোগ্য পুত্র নিঃসন্দেহে। ১৯৩৩ সনের শ্রাবণ মাস, সোমবার, ইন্দারজমল আগরওয়ালা চিকেন-পক্সে আক্রান্ত হয়ে মারা যান।

নরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

যৌবনে একজন রূপবান ব্যক্তি, যাঁকে দেখলে মনে হবে কোনো মঞ্চসফল অভিনেতার অবয়ব, অথচ তিনি একেবারেই তা নন, বিপরীতে তিনি একজন সংগ্রামী কর্মী, তার্কিক বুদ্ধিজীবী, আইন ব্যবসায়ী, সর্বোপরি কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য।

নরেশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন ১৯১৭ সালে। সোনাউল্লা স্কুলে পড়াকালীন, ১৯৩০ সালে আইন অমান্য সত্যাগ্রহে অংশ নিতে আলিপুরদুয়ার কোর্টে চলে যান। ২১ দিনের কারাবাস হয়। সম্ভবত এটাই তাঁর রাজনীতির বীজ, একদিন মহীরুহ হয়ে উঠেছিল।

তারপর ওই স্কুল থেকেই ম্যাট্রিক-উত্তীর্ণ হয়ে চলে গেলেন রংপুর কলেজে। যেখান থেকে স্নাতক হয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, আইন কলেজে। সেখানে বামপন্থী ছাত্রনেতা হতে বেশি সময় লাগেনি। ১৯৩৯ সালে জলপাইগুড়িতে অনুষ্ঠিত প্রথম জেলা ছাত্র সম্মেলনে তিনি সভাপতি নির্বাচিত হলেন। তারপর ১৯৪০ সনে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সোজা জলপাইগুড়ি। আইন ব্যবসাটা নিতান্ত গৌণ। বামপন্থী আন্দোলনে নিজেকে নিয়োজিত করলেন। তবে কাজ হল একদিকে গ্রামের কৃষক চা-বাগানের শ্রমিক...তাদের লড়াইয়ে সক্রিয় মদত অন্যদিকে শহরের বুদ্ধিজীবীদের চেতনার স্তর উন্নত করে আন্দোলনের সমর্থনে নিয়ে আসা। এ কাজে তিনি যথেষ্ট সফল হয়েছিল। তাই কৃষক সমিতির আধিয়ার আর তেভাগার আন্দোলনে তিনি ছিলেন গ্রাম ও শহরের যোগসূত্র। শহরের বুদ্ধিজীবীদের একত্রিত করবার জন্য একটি সংস্থা গড়ে তোলেন। নাম cultural Institute। ভাবের আদান-প্রদান, সুস্থ বিতর্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে সংস্থাটি অচিরেই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এটি শহরের কবি শিল্পী অধ্যাপক বুদ্ধিজীবীদের কেন্দ্রস্থল হয়ে ওঠে। সাংবাদিক হিসেবেও তিনি প্রণিধানযোগ্য। তেভাগা আন্দোলনে ডুয়ার্সের গয়ানাথ জোতে গুলি চালনার রিপোর্টিং দিকে দিকে চাঞ্চল্য হয়।



নরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

১৯৪১ সালে তিনি কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেছিলেন। ১৯৬৯ সালে তিনি যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হিসেব খগেন্দ্র দাশগুপ্তকে পরাজিত করেন। বামপন্থী হিসেবে তাঁর কাজ বা কৃতিত্ব কিন্তু কখনোই ভোলার নয়। ১৯৪৩-এর মন্বন্তরে জলপাইগুড়ি শহরে দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে তিনি যে ভূমিকা নিয়েছেন, তা যে কোনো সংগঠন কর্মীর আদর্শ। শচীন দাশগুপ্তর ভাষাতেই বলি,...

> নরেশের অদম্য প্রচেষ্টায় জলপাইগুড়িতে সব দল ও মতের মানুষদের নিয়ে গড়ে উঠল 'পিপল্‌ ফুড কমিটি'। নরেশ সাধারণ সম্পাদক। দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নরেশকে দেখেছি নতুন রূপে। সমস্ত স্তরের মানুষকে এক করে একটা সুদৃঢ় সংগঠন গড়ে তাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার যে কুশলতা—তা সপ্রশংস দৃষ্টিতে জলপাইগুড়ি শহরবাসী লক্ষ করেছে। প্রতিটি ওয়ার্ডে কমিটি হয়েছে, শত শত ভলান্টিয়ার বাহিনী গড়ে উঠেছে, ধান, চাল আসছে, অর্থ উঠছে, একটা বিশাল ব্যাপার। কিন্তু কোনো বিশৃঙ্খলা নেই। 'জলপাইগুড়ি জেলায় লোককে না খেয়ে মরতে দেব না'—এই প্রতিজ্ঞা নরেশের নেতৃত্বে শহরবাসী সেদিন পালন

করেছিল—জলপাইগুড়ির, কোনও লোক সেদিন না খেয়ে মরেনি, মরতে দেওয়া হয়নি।......

১৯৭০ সনের ৮ সেপ্টেম্বর, এই জনদরদী নেতা, নরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর জীবনাবসান হয়।

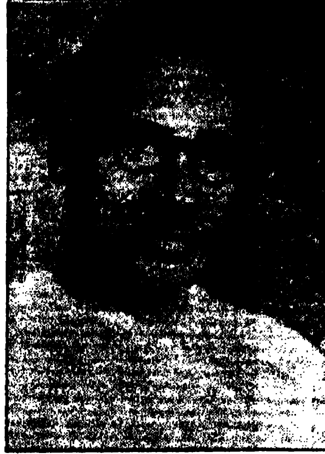
নীতি ঘটক

পোশাকি নাম মনীষী ঘটক। জন্ম ১৯২৯ সনে। সম্ভবত শহরের একমাত্র ফুটবল খেলোয়াড়, যিনি একই সঙ্গে টেনিস, ব্যাডমিন্টন এবং বক্সিং... ফুটবলের সঙ্গে সঙ্গে এই চারটি খেলাতেও যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

মাঠে 'ব্যাক' পজিশনের খেলোয়াড়, তিনি কলকাতায় রাজস্থান এবং ভবানীপুর ক্লাবের নিয়মিত ফুটবলার ছিলেন।

নীরেন্দ্রনাথ বাগচী

কালু বাগচী নামে বিশেষভাবে পরিচিত। নীরেন্দ্রনাথ একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং চা-শিল্প প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম। জলপাইগুড়ির বিখ্যাত বাগচী পরিবারের সন্তান। পূর্বপুরুষ হৃদয়নাথ বাগচী, আইনজীবী, পাবনা থেকে ১৮৭০ থেকে ১৮৭৮-এর মধ্যে এসেছিলেন।



নীরেন্দ্রনাথ বাগচী

১৯২২ সালে বগুড়া-রাজসাহীর ভয়াবহ বন্যায় ত্রাণ-সমিতির স্বেচ্ছাসেবক হয়ে গিয়েছিলেন।

১৯৩০ সনে অসহযোগ আন্দোলনে কয়েকবার কারাবরণ। ডুয়ার্সে গয়েরকাটার হরতাল পরিচালনার জন্য নীরেন্দ্রনাথ রাজরোষে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন।

১৯৩২-এ সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের অভিযোগে গ্রেপ্তার এবং সবশেষ ১৯৪২-এ ভারত ছাড় আন্দোলনে অংশ নেবার জন্য কারাবরণ করেছিলেন।

বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। আর্য নাট্যসমাজের প্রতিপত্তিতে তিনি বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

নির্মল বসু

জলপাইগুড়ি শহরের আধুনিক যুগের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের অন্যতম। তিনি একজন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী, ছাত্র-শিক্ষক আন্দোলনের অন্যতম নেতা, একজন দক্ষ মন্ত্রী কিংবা সর্বজনপ্রিয় অধ্যাপক নির্মল বসু।

নির্মল বসুর জন্ম ১৯২৯ সনের ১০ সেপ্টেম্বর জলপাইগুড়ি শহরে। আদি নিবাস পাবনা জেলার সোলাকুড়া গ্রাম। পিতা হেরম্বকুমার বসু, মাতা প্রভাবতী দেবী। পিতাও একজন স্বনামধন্য অগ্নিযুগের সৈনিক। গঠনমূলক কাজে একজন প্রথম সারির আদর্শবাদী কর্মী। ফলে পিতার জীবনযাপন আদর্শ তাঁর ভেতরে সঞ্চারিত হয়েছিল খুব সহজেই। পিতার হাত ধরে 'হরিজন বিদ্যালয়ে' বেড়াতে যাওয়া কিংবা পিতার সঙ্গে কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলনে উপস্থিতি, সবই শৈশবে তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করে।

নির্মলবাবু জলপাইগুড়ি জেলা স্কুল থেকে ১৯৪৭ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাস করেন। পরবর্তীকালে জলপাইগুড়ির আনন্দচন্দ্র কলেজ থেকে স্নাতক উপাধি অর্জন করে কলকাতায় পড়তে আসেন। এর মধ্যে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এম এ পাস করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম এ পাস করেন এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।

নির্মলবাবুরা ৮ ভাইবোন, পিতা সামান্য একজন হোমিওপ্যাথির ডাক্তার এবং 'হরিজন বিদ্যালয়ের' অবৈতনিক শিক্ষক। সেজন্য কলকাতায় থাকার খরচ নিজেই 'টিউশনি' করে চালাতেন। শিক্ষা শেষে এ জি বেঙ্গলে করণিকের চাকরিতে ঢোকেন, কিন্তু সেখানে কর্মচারীদের সংগঠিত করার অপরাধে চাকরি থেকে বরখাস্ত হন। তারপর হাওড়া উলুবেড়িয়া কলেজে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৯১ সালে এই পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন।



নির্মল বসু

তাঁর রাজনৈতিক জীবন যদি সংক্ষিপ্তভাবে পর্যালোচনা করা যায় তাহলে তা এরকম :

১৯৪০ ॥ নেতাজী-অনুগামী ফরওয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ছাত্র-রাজনীতির হাতেখড়ি।

১৯৪৫-৪৬ ॥ জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বছর। জলপাইগুড়ি আনন্দচন্দ্র কলেজে ছাত্র ইউনিয়নের সম্পাদক নির্বাচিত। সেই বছরই সারা বাংলা ছাত্র সম্মেলনে প্রতিনিধি হয়ে বর্ধমানে উপস্থিত। এই বছরেই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনে অংশ নিয়ে প্রথম কারাবরণ।

১৯৫৭-৬১ ॥ নেহেরু-নুন চুক্তি অনুযায়ী জলপাইগুড়ির একটি অংশ বেরুবাড়িকে পাকিস্তানের অঙ্গ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল। নির্মল বসু এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু করলেন। একদিকে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের জন্য আইন-আদালতকে ব্যবহার করলেন এবং অন্যদিকে সক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু করলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি জয়ী। ভারত সরকার বাধ্য হল বেরুবাড়িকে ভারতের অচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে ঘোষণা করতে। তিনি উঠে এলেন পাদপ্রদীপের আলোয়। সারা ভারতে আপসহীন নেতা হিসেবে পরিচিত হলেন।

১৯৬৪ ॥ রাজ্য বিধান পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। আবার এই বিধান পরিষদ তুলে দেবার জন্য কক্ষে অসাধারণ বক্তব্য রেখেছিলেন।

১৯৭৭ ॥ জলপাইগুড়ি বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত।
১৯৮২ ॥ প্রথমে সমবায়মন্ত্রী, তারপর শিল্প-বাণিজ্য সহ উচ্চশিক্ষারও দায়িত্ব নিলেন।
১৯৮৭-৯২ ॥ খাদ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করলেন।

এর মধ্যে তিনি Indian Political Science Association-এর কর্মকর্তা নির্বাচিত। যুক্ত হলেন International Political Science Association-এর সঙ্গে। বিশ্বের বহু দেশ ভ্রমণ করে তিনি অনুসন্ধান করেছেন, সেই সব দেশের রাষ্ট্র পরিচালন ব্যবস্থা, সংবিধান কাঠামো ইত্যাদি বুনিয়াদী গঠনতন্ত্রগুলি।

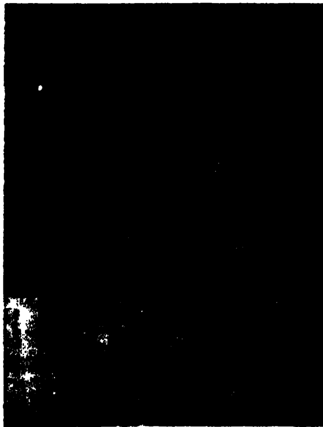
বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র থাকাকালীন তিনি পত্রিকা সম্পাদনায় হাত বাড়িয়েছিলেন। এই অভিজ্ঞতায় তিনি, একক প্রচেষ্টায় Towards Socialism নামক একটি পত্রিকা প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছিলেন।

রাজা রাজনীতির টানাপোড়েনে থাকা সত্ত্বেও তিনি অধিকাংশ সময় ব্যয় করেছে জেলা তথা শহরের উন্নয়নের কাজে। একটা সময় গেছে, যখন তিনি ছাড়া শহরের রাজনৈতিক মানচিত্র অসম্পূর্ণ ছিল। এই রাজনীতি শুধুমাত্র বামপন্থীদের দলগত নয়, শহরের তথা জেলার সামগ্রিক রাজনীতিতে তাঁর বক্তব্য, প্রশ্ন, মনোভাব যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিল।

জলপাইগুড়ির এই কৃতী সন্তান, ১৯৯৪ সালের ২২ মার্চ, কলকাতায় পরলোকগমন করেন।

প্রসন্নদেব রায়কত

প্রসন্নদেব রায়কত, জলপাইগুড়ি জেলার ইতিহাসের এক বর্ণময়, রাজকীয় চরিত্র। সম্ভবত তাঁর হাত ধরেই আধুনিক জলপাইগুড়ির ইতিহাস শুরু। রাজা দর্পদেবের বংশধর, বৈকুণ্ঠপুর রাজ এস্টেটের সপ্তদশ পুরুষ, প্রসন্নদেব (আনুমানিক) ১৮৯৬ সনে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ফণীন্দ্রদেব। রাজন্যপ্রথা অনুসারে শিক্ষা (জেলা শতবার্ষিকী গ্রন্থে উল্লেখিত আছে, তিনি জেলা স্কুলের ছাত্র ছিলেন) শেষ বারে, ১৯১৪ সালের ৯ অক্টোবর স্বাধীনভাবে বৈকুণ্ঠপুর রাজ এস্টেট পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। সম্ভবত এই রাজ এস্টেটই ছিল ভারতবর্ষের অন্যতম জমিদারি, যেখানে রাজারা কোনো সময় প্রজাদের সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েননি। প্রত্যেকেই প্রজানুরঞ্জক রাজা হিসেবে খ্যাত। খাজনার পরিমাণ অত্যন্ত কম। তাই রাজস্ব সংগ্রহের পরিমাণও কম। কিন্তু এই রাজপরিবার প্রজাদের সামগ্রিক অবস্থা বিবেচনা করে খাজনা বৃদ্ধি তো দূরের কথা, বকেয়া আদায়ের জন্য অত্যাচারও চালাননি। এই ঐতিহ্য নিয়ে, সীমিত উপার্জন সত্ত্বেও রাজকুলপ্রথা বজায় রেখে যেভাবে জনহিতকর কার্যে ব্রত হয়েছিলেন তা সত্যিই বিস্ময়কর।


প্রসন্নদেব রায়কত

প্রসন্নদেবের খ্যাতি ছিল শিকারি হিসাবে। অসমসাহসিকতার জন্য তিনি তৎকালীন রাজন্যবর্গের কাছে ছিলেন অত্যন্ত প্রিয়। 'বিট' পদ্ধতি অনুসরণ করে, শিকার করার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন এক নম্বরে। ফলে এই খ্যাতির জন্যই ভাইসরয়ের শিকারসঙ্গী হবার সুযোগ ঘটেছিল। সবচেয়ে বড় বাঘ শিকারের কৃতিত্ব নাকি তাঁরই। জনশ্রুতি আছে, রাজা প্রসন্নদেব কখনো কোনো ঘুমন্ত বাঘকে শিকার করেননি।

এইসবই তৎকালীন রাজকীয় প্রথার অভ্যাসমাত্র। তাই তাঁর আসল পরিচয় তাতে শিক্ষাবিস্তার আর শিল্পস্থাপনের প্রচেষ্টার দিকে নজর দিতে হয়। যে ঐতিহ্যে জগদীশ্বরী পাঠশালা, রানী অমৃতেশ্বরী বিদ্যালয়, সেই ঐতিহ্যেই ফণীন্দ্রদেব বিদ্যালয় এবং পরবর্তীকালে প্রসন্নদেব মহিলা মহাবিদ্যালয়, সদর বালিকা বিদ্যালয় ইত্যাদি। এ সমস্ত ক্ষেত্রে অর্থদানে প্রসন্নদেব কোনো কার্পণ্য করেননি। জেলা শতবার্ষিকী গ্রন্থে অমিয়কুমার পাকড়াশী লিখেছেন...'রাজা প্রসন্নদেব রায়কত এই বিদ্যালয়ের (ফণীন্দ্রদেব) উচ্চ-ইংরেজি বিদ্যালয়রূপে উন্নয়নের ব্যাপারে ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা দিতে স্বীকৃত হন এবং তন্মধ্যে ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা দান করেন নগদ অর্থে এবং কিছু কাঠ, টিন ইত্যাদিও দান করেন।... তিনি আরো লিখেছেন... 'এই সময়েই অসহযোগের বন্যার সহিত এই বিদ্যালয়ের উপর নামিয়া আসে দুর্যোগ। ১৯৩০ সনে যখন সর্বত্র গান্ধীজির আইন অমান্য আন্দোলন চলিতেছিল, তখন তাহার ঢেউ এই বিদ্যালয়েও আসিয়া লাগে।'... সেই আন্দোলনে অংশগ্রহণের ফলস্বরূপ বিদ্যালয়ের সরকারি সাহায্য বন্ধ হয়ে যায়। অমিয়বাবু এই পরিস্থিতিতে প্রসন্নদেব রায়কতের ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন...' বিদ্যালয়ের এই ঘটনার সময় রাজাবাহাদুর প্রসন্নদেব রায়কত এই বিদ্যালয়ের সভাপতি ছিলেন এবং তৎকালীন বিধানসভার সরকারি পক্ষের সদস্য ছিলেন। তাঁহার চরিত্রের একটি দিকই আমাদের নিকট পরিজ্ঞাত, সেটি হইতেছে যে, তিনি সব সময়েই ইংরেজঘেঁষা ছিলেন ; কিন্তু অপর দিকটিতে দেখা হয় যে, তিনি এই সঙ্কট সময়ে সর্বক্ষেত্রেই সম্পাদক মহাশয়ের পার্শ্বে ছিলেন এবং তাঁহাকে সমর্থন জানান। এই দিকটি আমাদের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। তাঁহার একটি উক্তি এই ব্যাপারে সর্বকালের সাক্ষী হইয়া আছে তাহার চরিত্র প্রকাশনে 'ছাত্রদের ধরাইয়া দিয়া আমরা পুলিশদের গোয়েন্দার কাজ করিতে পারি না।'

এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি প্রমাণ করে, তৎকালীন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি তাঁর প্রচ্ছন্ন সমর্থন ছিল। বর্তমান বংশধর প্রতিভা দেবীর পুত্র প্রণতকুমার বসু লিখেছেন... 'তিনি (প্রসন্নদেব রায়কত) স্বাধীনতা সংগ্রামী ও বিপ্লবীদের দেহচর্চা করিবার জন্য রাজবাড়ির দক্ষিণ পাশে যেখানে বর্তমানে R.S.A. ক্লাবের মাঠ, ঐখানে একটি ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠা করিয়া কালিদাস কবিরাজ মহাশয়কে ভার অর্পণ করেন এবং অর্থাদি সাহায্য করেন। রাজবাড়ির প্যালেস মাঠের নিকট তিনি মাড়োয়ারি সম্প্রদায়ের ব্রীজমোহন মুন্দ্রার প্রার্থনা অনুযায়ী জমিদান করিয়া ব্যায়ামাগার স্থাপন করেন।...'

শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সংগ্রামের ক্ষেত্রে এই ভূমিকার পাশাপাশি, তাঁর আরেকটি ভূমিকা উল্লেখ না করলে চরিত্রাঙ্কন অসম্পূর্ণ থাকে। এই ভূমিকা গ্রামোন্নয়নকারীর এবং শিল্পস্থাপনকারীর। তিনি যেমন বিশ্বাস করতেন 'শিল্পের উন্নতি না হইলে দেশের উন্নতি সম্ভব নয়' ...তেমনি দেশের মূল প্রাণশক্তি গ্রাম ও কৃষিতেই নিবদ্ধ আছে, এই বিশ্বাস দৃঢ় ছিল। এই কারণে তাঁর জমিদারির অংশ বেলাকোবায়, গ্রামের

মানুষদের উন্নতিকল্পে সাধারণ মানুষদের নিয়ে সমবায় সমিতি গঠন করে পল্লী উন্নয়নের কাজ শুরু করেছিলেন। যে কাজগুলি আজকের দিনে সবচেয়ে বেশি প্রণিধানযোগ্য বলে বিবেচিত হচ্ছে। এই কাজের ফলে তিনি যে সমর্থন ও সম্মান লাভ করেছিলেন, যেটা বোঝা যায়, তাঁর মৃত্যুর পর বেলাকোবাবাসীরা যখন জায়গার নাম 'প্রসন্ন নগর' অভিহিত করেন। ফলে শহরের নাম বেল্যাকোবা হলেও, পোস্ট অফিসের নাম প্রসন্ন নগর হয়ে গেল। এছাড়া, শিল্পস্থাপনের উদ্দেশ্যে, বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলে চিনিকল, তেলকল এবং করাত কল স্থাপন করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, এলাকার মানুষদের স্বনির্ভরতার পথ দেখানো, যদিও অবস্থার পরিবর্তনে কোনোটিই শেষ পর্যন্ত টিকতে পারেনি। আরেকটি উল্লেখযোগ্য কাজ, যা তৎকালীন উদ্যোগী পুরুষরা এই জেলায় শুরু করেছিলেন, সেটা চা-বাগান স্থাপনের কাজ। প্রসন্নদেব একধাপ এগিয়ে, শুধুমাত্র চা-বাগিচা স্থাপনেই নয়, সেটাকে আধুনিক ও পেশাদারি দক্ষতায় চালানোর অভিপ্রায়ে তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন। বীরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ লিখেছেন...'In the Baikunthpur Zamindary Danguaihar, the only European managed Tea Estate, was existing but the Zaminder Prasanna Dev Raikut agreed to have more Tea Estates within his Zamindary. ...In 1919 Bhandiguri of Goodwill tea Co. was started. The Zaminder himself started Shikarpur and Bhandarpur Tea Estates of his own....

চা-বাগানে আধুনিকতা আনয়নের লক্ষ্যে বৈকুণ্ঠপুর ফরেস্ট থেকে শিকারপুর চা-বাগান পর্যন্ত দীর্ঘ ৮ মাইল ট্রলি-লাইন স্থাপন করেছিলেন। কাঠ ও চা-পাতা চলাচলে তা কাজে লাগানো হত। এই আধুনিক পদ্ধতি, তখনকার দিনের তুলনায় যথেষ্ট আধুনিক ছিল।

তাঁর আমলেই রাজবাড়িতে প্রথম দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়। তিনি বিবাহ করেন কোচবিহার মেচপাড়ার কন্যা অশ্রুমতী দেবীকে। তাঁরই কন্যা প্রতিভাদেবী। স্বাধীনতা-উত্তরকালে তিনি ফজলুল হক মন্ত্রিসভার বন ও আবগারিমন্ত্রী এবং ভারতীয় গণপরিষদের সদস্য।

১৯৪৬ সনে, ৪ ডিসেম্বর, জলপাইগুড়ি রাজবাড়িতে তাঁর জীবনাবসান হয়।

প্রফুল্ল ত্রিপাঠী

কৃষকনেতা প্রয়াত মাধব দত্ত তাঁর তেভাগা আন্দোলনের স্মৃতিকথা প্রসঙ্গে লিখেছেন... '১৯৩৭ সালের ডিসেম্বর মাসের যুক্ত হইয়া বিনয়বাবুর (বহরমপুর জেলে রাজবন্দী বিনয় ঘোষ) সঙ্গে কয়েক মাস কলকাতায় থাকি। সে সময় বিনয়বাবু আমাকে বলেন—জলপাইগুড়িতে কৃষক আন্দোলনের বেশ অনুকূল পরিবেশ পাইবেন। ওখানে কংগ্রেসের রাজনৈতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে '৩৮-এর শেষের দিকে। ওখানে বীরেন দত্ত ও বিজয় হোড় আছেন, তাঁহাদের সঙ্গে কংগ্রেসের নেতাদের বেশ ঘনিষ্ঠতা আছে। এখন কংগ্রেস সর্বক্ষণের কর্মী চায়, তাহারা বি ভি (বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স)-এর প্রফুল্ল ত্রিপাঠীকে সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে রাখিয়াছেন।'...

চারুচন্দ্র সান্যাল লিখেছেন...'১৯৩৯ সালে...জলপাইগুড়ি জেলে ছিলেন অন্তরীণ। ছাড়া পেয়ে ১৯৪০ সন থেকে জলপাইগুড়ি কংগ্রেসে কাজ করতে লাগলেন। প্রচারক ও সংগঠক হিসাবে তাঁর দক্ষতা ছিল অপরিসীম। শেষের দিকে কংগ্রেস ছাড়লো, কিন্তু জলপাইগুড়ি কংগ্রেস তার সহায়তা চিরকাল মনে রাখবে।'...

মুকুলেশচন্দ্র সান্যাল লিখেছেন...'১৯৪২...প্রফুল্ল ত্রিপাঠী এখান থেকে পালিয়ে ছিলেন কিন্তু মেদিনীপুরে গ্রেপ্তার হন।'...

আর নিখিল ঘটকের লেখা থেকে জানতে পারি...১৯৫২ সালে জেলায় গঠিত হল প্রজা স্যোসালিস্ট পার্টি...যুগ্ম সম্পাদক প্রফুল্ল ত্রিপাঠী এবং নিখিল ঘটক।

এরকমই টুকরো টুকরো স্মৃতিকথা মিলিয়ে তিনি...বিপ্লবী প্রফুল্লকুমার ত্রিপাঠী। নিখিল ঘটকের কথায়...'যে সব রাজনৈতিক নেতা জনচিত্তে নিজেদের পৃথক স্থান রেখে গেছেন প্রফুল্ল ত্রিপাঠী তাঁদের মধ্যে একজন।'...

আসলে তিনি ছিলেন মেদিনীপুরের মানুষ। জেলা তখন অগ্নিগর্ভ। 'যুগান্তর দল' কাজ করে চলেছে। যুবক প্রফুল্লর সঙ্গী বিপ্লবী সতীশ সামন্ত, বীরেন্দ্র শাসমল প্রমুখ। সমগ্র তমলুক মহকুমা জুড়ে দুবার খাজনা বন্ধ আন্দোলন শুরু হয়ে গেল।'...কথিত আছে, সেই সময়ই তাঁর বিবাহ। ফুলশয্যার রাতে, পুলিশ তাঁকে বাসরঘর থেকে তুলে আনে। স্ত্রীর মুখ দেখতে পারেননি। প্রায় পঁচিশ বছর পর এই উত্তরবঙ্গে স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হয়। মেদিনীপুরের জেলা শাসক পেডিসাহেবকে হত্যার অভিযোগে তিনি অন্তরীণ হলেন। তাঁর মেদিনীপুর থেকে জলপাইগুড়ি জেল। তিনি এই জেলায় প্রবেশ করলেন। ১৯৩৮ সালে মুক্তি পেয়ে জেলায় কৃষকদের মধ্যে কাজ করবার জন্য কংগ্রেসে যুক্ত হলেন, যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এই সময় তিনি কৃষকদের সমস্যা নিয়ে একটি পুস্তিকা 'ভাই চাষী তুমি গরিব কেন?' প্রকাশ করেন। নিখিল ঘটক লিখেছেন...'পুস্তিকাটি ডুয়ার্স অঞ্চলে কৃষকদের মধ্যে ভীষণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। পুলিশ এই পুস্তিকাটি প্রকাশের জন্য তাঁকে গ্রেপ্তার করে বিচারের জন্য কোর্টে পাঠায়। উকিল নগেন্দ্রনাথ মহলানবীশ প্রফুল্ল ত্রিপাঠীর পক্ষ সমর্থন করে এই মোকদ্দমা লড়েছিলেন এবং প্রফুল্লদাকে সালাম করেছিলেন। সুপুরুষ, সুবক্তা ও মিষ্টিভাষী প্রফুল্ল ত্রিপাঠীর মানুষকে কাছে টানবার এক আকর্ষণীয় ক্ষমতা ছিল। এই জন্যই কৃষকদের মাপে তিনি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন।'... ১৯৪২-এর ভারত ছাড় আন্দোলনের সময় গ্রেপ্তার হলেন এবং ১৯৪৬ সালে মুক্তি। উল্লেখিত হয় তিনি এই সময় বক্সা বন্দিশিবিরে অন্তরীণ ছিলেন।

কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ হয় স্বাধীনতার পরপরই। কংগ্রেসের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক পথের অনুগামীদের নিয়ে গড়ে তুললেন 'কৃষক মজদুর প্রজা পার্টি'। সেটা ১৯৫১ সাল। তিনি ডুয়ার্স অঞ্চলে চা-বাগান কর্মচারীদের সংগঠিত করবার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। তারপর ১৯৫২ সালে 'প্রজা স্যোসালিস্ট পার্টি' যা আগেই উল্লেখিত হয়েছে। এবং মধ্যে 'আমাদের কথা' পত্রিকা প্রকাশ করে সাংবাদিকতার নতুন যুগের সূচনা করেন।

১৯৫৪ সালে গুরুতর অসুস্থ হওয়ার পর তিনি ময়নাগুড়ি চলে যান এবং সেখানকার উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়টুকু এই জেলাতেই অতিবাহিত করেছেন। তাই তিনি এই জেলারই সন্তান। পুলিশ তাঁর ওপরে যথেচ্ছ অত্যাচার করেছিল।

লাঠির আঘাতে মেরুদণ্ড ভেঙে গিয়েছিল। তাই শেষ জীবনে অন্ধ হয়ে, ১৯৩৬ সালের গোড়ার দিকে ময়নাগুড়ি শহরে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

পরেশ মিত্র

......'জলপাইগুড়ি জেলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের সে ছিল অন্যতম নেতা। চা-বাগান, গ্রাম, আদালত, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, ল' কলেজ, শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি ডেভেলপমেণ্ট অথরারিটি, কলেজ, স্কুল, সিটিজেনস্ কমিটি—কোথাও আর ওর ওই দৃপ্ত কণ্ঠ শোনা যাবে না। প্রখ্যাত নাম আইনজীবীর 'গাউনসজ্জা' কোনোদিন ওকে প্রয়োজনে লাঠি ধরতে বিরত করতে পারেনি। এস্টাব্লিশমেন্টের অন্তঃসারশূন্য মেকি আচরণবিধি ওকে কোনোদিন বিড়ম্বিত করেনি। মুক্ত পুরুষ। চলে গেল, এ যাওয়া যে কত বড়ো যাওয়া—জলপাইগুড়ির সর্বস্তরের মানুষ প্রতি পদে তা অনুভব করতে থাকবেন'......

এই শোকবিলাস গাথার ভাষা অনুসরণ করলেই বোঝা যায়, মৃত্যুটি কতটা মর্মবিদারক...পঙ্ক্তির ফাঁকে ফাঁকে যেন সেই দামাল, দাপিয়ে-বেড়োনো মানুষটির ছায়া। পরেশ মিত্রের আকস্মিক মৃত্যু সুবোধ সেনের মতো স্থিতধী মানুষকেও কাঁপিয়ে দিয়েছিল।

জলপাইগুড়ির অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা-আন্দোলনের অন্যতম নেতা, বিশিষ্ট আইনজীবী ও অধ্যাপক পরেশ মিত্র জন্মগ্রহণ করেন এই জলপাইগুড়ি শহরে, এক নিম্নবিত্ত, সুস্থ চেতনাসম্পন্ন পরিবারে। শিক্ষারম্ভ সোনাউল্লা ইনস্টিটিউশনে। যখন সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র, তখন থেকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের শুরু। মেধাবী ছাত্র, ফলে রাষ্ট্রবিজ্ঞান M.A. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন স্বাভাবিকভাবেই। তারপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে জলপাইগুড়ি কোর্টে প্রবেশ। প্রবেশ করলেন এবং জয় করলেন। শুধু নিছক আইন ব্যবসা নয়, তাঁর লক্ষ্য ছিল আইন বিশারদ হওয়া। তাই ক্ষুরধার বুদ্ধি, অধ্যবসায়, দূরদর্শিতা সর্বোপরি প্রতিভার সাহায্যে তিনি অচিরেই শহরের আইনজীবীদের মধ্যে অন্যতম হয়ে উঠলেন। কিছুদিনের মধ্যেই যে আনন্দচন্দ্র কলেজ থেকে তিনি স্নাতক উপাধি লাভ করেছিলেন, সেই কলেজেই শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। তখন তাঁর আইনি প্রতিভাব কথা ছড়িয়ে গেছে, তিনি এবার উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজের অধ্যাপকের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। তাঁর দক্ষতার স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাউন্সিল মেম্বারও হয়েছিলেন। তাঁর প্রারম্ভিক শিক্ষাস্থল সোনাউল্লা বিদ্যালয়েও শিক্ষকতা করেছেন।

এদিকে সপ্তম শ্রেণীতে যে রাজনীতির বীজ ঢুকে গেছে, সেটাই মহীরুহ হয়ে, ১৯৩৮ সালে ডাঃ শচীন দাশগুপ্তর প্রভাবে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছেন। ফলে আইনজীবীর পোশাক আর রাজনীতির স্লোগান তাঁর জীবনচর্চার অঙ্গাঙ্গি বিষয় হয়ে গেল।

বামপন্থী রাজনীতি করতেন, সংগঠন তৈরিতে ওস্তাদ ছিলেন, কিন্তু তাঁর কাছে মানুষই ছিল মুখ্য. সেটা যে-কোনো দলের, যে-কোনো রঙের হতে পারে। ফলে আপমার জনসাধারণের কাছে পরেশ মিত্র থেকে 'পরেশদা' হতে বেশি সময় লাগলো না। সমস্ত সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে গঠনমূলক কাজে কিভাবে আত্মনিয়োগ করা যায়, এটাই ছিল জীবনের লক্ষ্য।

তিনি নিজের প্রতিভার জোরে ফৌজদারি আদালতের একনম্বর আইনজীবী হতে পেরেছিলেন আবার ছাত্র ফেডারেশনের রাজনীতি থেকে জেলা রাজনীতির উচ্চস্তরে পৌঁছে গিয়েছিলেন, কিন্তু সব ছাপিয়ে তিনি ছিলেন মানবতাবাদী, উদার ও দরদী মানুষ। ফলে সাধারণ মানুষের স্বার্থে ৭০ ভাগ মোকাদ্দমায় বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করেছেন।

রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করবার জন্য তাঁকে বহুবার কারাবরণ করতে হয়েছে। ১৯৪৮ সাল, ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি বেআইনি হলে তিনি গ্রেপ্তার হলেন। আবার ১৯৬২ ও ১৯৬৫ সালে ভারত রক্ষা আইনে (D.I. Rule) অন্তরীণ হলেন। এছাড়াও একাধিকবার তাঁকে কারাবরণ করতে হয়েছে।

শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি ডেভেলপমেন্ট অথরিটির প্রতিষ্ঠার পেছনে তাঁরও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিলেন। তিনি এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম থেকেই সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। এছাড়া জলপাইগুড়ি সিটিজেন কমিটির চেয়ারম্যান, ১০ বছর যাবৎ মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার হিসেবে তাঁর ভূমিকা অত্যন্ত উজ্জ্বল।

পরেশ মিত্রর বৈশিষ্ট্য ছিল, মুখে সহজ-সরল হাসি, প্রচণ্ড গতিতে হাঁটতে হাঁটতে লোকের সঙ্গে কথা বলা, অমায়িক ব্যবহার আবার অন্যায়ের প্রতিবাদে কঠোর... দুই ভূমিকাতেই তিনি স্বচ্ছন্দ স্বাভাবিক।

একটা সময় ছিল, যখন পরেশ মিত্র মানেই 'নির্ভরতা', পরেশ মিত্র মানেই 'আশ্রয়'... পরেশ মিত্র মানেই 'মুশকিল আসান', পরেশ মিত্র মানেই 'উন্নয়নের আশা'।

এই অজাতশত্রু মানুষটি, ১৯৮০ সালের ২০ মে, প্রায় ৬০ বছর বয়সে এক পথ দুর্ঘটনার প্রাণ হারান।

প্রবীরকুমার রায়

জলপাইগুড়ি শহরের আধুনিক প্রজন্মের প্রথম সারির সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের মধ্যে একজন। বহুগুণের সমন্বয় ঘটেছিল তার মধ্যে। উচ্চমানের অভিনেতা, নাট্য-নির্দেশক হিসেবে তিনি যেমন খ্যাতির শিখরে পৌঁছেছিলেন, তেমনি শহরে আবৃত্তিকর হিসেবে বা কবিতা-পাঠের শিক্ষক হিসেবে তিনি স্মরণীয়।

প্রবীর রায় 'কুট্টি' বা 'কুট্টিদা' ডাকনামে সবচেয়ে বেশি পরিচিত, জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কোচবিহারে, ১৯৩২ সনের ২৫ জুন। পিতা গণেশচন্দ্র রায় (দৈলাদা), জলপাইগুড়ি জেলার সাংস্কৃতিক-রেনেসাঁর অগ্রদূত। মাতা সবিতা রায়। প্রাথমিক শিক্ষারম্ভ : আনন্দ মডেল স্কুলে...তারপর ফণীন্দ্রদেব বিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণ হয়ে আনন্দচন্দ্র কলেজ থেকে স্নাতক হন।

যোগ্য পিতার কাছেই সংস্কৃতির হাতেখড়ি। ফলে পরিণত ব্যক্তিত্বে পৌঁছুতে বেশি দেরি হয়নি। সত্তর দশকে 'চোখের আলো' নাটকের পরিচালনা আর '৭৫-এর জরুরি অবস্থার দিনে 'বিদ্রোহী চার্বাক'-এর নির্দেশনা তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর। 'চোখের আলো' নাটকের জন্য শ্রেষ্ঠ পরিচালকের সম্মান ১৯৯০ সনে ঋত্বিক ঘটক স্মৃতি পুরস্কারপ্রাপ্তিতে সেই প্রতিভারই স্বীকৃতি মেলে। নাটক নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনায় অক্লান্ত ও অনুসন্ধানী আলোচনা তাঁর স্বভাব বৈশিষ্ট্য। চাকরি থেকে অবসর নিয়ে তিনি যখন আবার নতুন করে সাংস্কৃতিক মঞ্চ তৈরির কথা ভাবছেন, তখনই তাঁর আকস্মিক মৃত্যু, ১৯৯৩ সালের ১৪ ডিসেম্বর প্রবীরকুমার রায়ের জীবনাবসান

হয়। মৃত্যুকালে তিনি ছিলেন গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের জলপাইগুড়ি শহর শাখার সভাপতি।

বীরেন দত্তগুপ্ত

১৯০৫ সনে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় থেকে শহরে যে গুপ্ত সমিতি গড়ে উঠেছিল, তার প্রথম দিককার অন্যতম সদস্য ছিলেন বীরেন দত্তগুপ্ত। জলপাইগুড়ি জেলা স্কুলের ছাত্র ছিলেন। বাসস্থান শহরের আদি এলাকা রায়কতপাড়ায়। শহিদ ক্ষুদিরাম বসু এবং শহিদ কানাইলাল দত্তের আত্মাহুতির তিন বছর পরে। ১৯১১ সনে গুপ্ত সমিতির সক্রিয় সদস্য স্কুলের ছাত্র থাকাকালীন, কলকাতা হাইকোর্টের ভেতরে ঢুকে সি আই ডি'র ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট শাসমুল হককে হত্যা করেন। বিচারে তাঁর ফাঁসির হুকুম হয়। এই মৃত্যুর পর জলপাইগুড়ি শহরে স্বাধীনতা সংগ্রামে এক নতুন দিগন্তের সৃষ্টি হয়।

সম্ভবত বীরেন দত্তগুপ্ত, জলপাইগুড়ি জেলায় স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম শহিদ।

বীরেন দত্ত

...'১৯৩০...(শহরে) আইন অমান্য আন্দোলনের জোয়ার এল, শহর-গ্রামের মানুষ জোট বাঁধল—'ইংরেজ আইন মানব না'। বিজয়া দশমীর দিন প্রতিমা নিয়ে করলা নদীর দুপাশে শোভাযাত্রা বের হয়েছে, বিরাট বিরাট নৌকা করে। নদীর দুপাশে অগণিত দর্শকের ভিড়। প্রতিমা নিয়ে যে নৌকা চলেছে তার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি করে নৌকা। তাতে প্রতিমা নেই। তাতে প্রচার হচ্ছে 'স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার', 'বিলেতি জিনিস বয়কট কর' 'অস্পৃশ্যতা দূর কর', 'মাদকদ্রব্য বর্জন কর'। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের আক্রমণ। সেদিন মিছিলের নেতা ছিলেন বীরেন দত্ত মহাশয়।'...

আরো একটি উদ্ধৃতি। ...'১৯১৯-২০... লাটবাহাদুর জেলখানা পরিদর্শনে যাইবেন তাই আমলাতন্ত্র তার পুলিশ ও ফৌজে রাস্তাঘাট কড়া পাহারায় সূচিভেদ্য করিয়া তুলিয়াছে—মনুষ্য-প্রাণী কাহারও সে রাস্তা দিয়া চলিবার অধিকার নাই। জনসাধারণের চলাচলের রাস্তা এভাবে বেআইনিভাবে বন্ধ থাকিবে কেন? হোক না কেন লাটসাহেব—আমাদের গণতান্ত্রিক এ অধিকার তাহাকে ভাঙিতে অধিকার কে দিল? তাই এক দুর্ধর্ষ তরুণ জনসাধারণের এ পবিত্র অধিকারহরণকারী পুলিশ-বেষ্টনী ভেদ করিয়া সগর্বে বেষ্টনীর মধ্য দিয়া পথ করিয়া চলিতে শুরু করিল।'...

বলা বাহুল্য, এই দুর্ধর্ষ তরুণের নাম বীরেন দত্ত, স্বাধীনতা সংগ্রামের অকুতোভয় সৈনিক থেকে বহু পথ পেরিয়ে জেলা কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সম্পাদক। এক এক মহান উত্তরণ।

জন্ম ১৯০৩ সনে, তিনি জানিয়েছেন...'পূর্ববঙ্গের এক গ্রাম্য স্কুলের ছাত্র, হুজুক ও উৎসাহে ভরপুর। যেমন খায় তেমনি ফুটবল খেলিয়া বেড়ায়। সব স্বদেশি আন্দোলনের সময়কার 'বন্দেমাতরম', 'বাঙালির প্রাণ-বাঙালির মন—বাংলার ঘরে ঘরে যত ভাই-বোন—এক হউক এক হউক—হে ভগবান—বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নে বিভোর হইয়া স্বপ্নকে মন্ত্রে মথিত করিয়া শৈশবের ভাবালুতা লইয়া ১৯১১ সালে গাঁয়ের ছেলে শহরে আসিয়া পড়ি ও স্থানীয় বাংলা স্কুলে বর্তমানে ফণীন্দ্রদেব বিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হই। কিন্তু খেলাধুলায় তৎপরতা ও কোমল অন্তঃকরণ লক্ষ করিয়া অধুনালুপ্ত উত্তরবঙ্গ বিপ্লবী দলের নজরে পড়িয়া যাই। ফলে Recruitment-এর শিকার হইয়া ১৯১৪ সালে উক্ত দলের আওতায় আসিয়া পড়ি।'...

এই হল শুরু। তারপর... 'দুই বছর গান্ধীজির আন্দোলনে ব্যয় করিয়া এবং স্থানীয় ফণীন্দ্রদেব বিদ্যালয়ে স্থান না পাইয়া জিলা স্কুলেই নীচের ক্লাসে...ভর্তি হইলাম।...' তারপর ১৯২৩ সন থেকে ১৯২৫ সন পর্যন্ত কোচবিহার কলেজের ছাত্র। ছাত্র থাকাকালীন অনুশীলন সমিতির গোপন কাজকর্মে হাত পাকিয়ে ফেললেন। সশস্ত্র সংগ্রামের উদ্দেশ্যে জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, পাতলাখাওয়া, শিলবাড়িহাট, কালিম্পং, কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ির সংযোগস্থলে ৮টি গুপ্ত ঘাঁটি গড়ে তুললেন। জলপাইগুড়ি শহরের তিনিটি ঘাঁটির মধ্যে একটি ছিল দিনবাজারে, বাকি দু'টি বাবুপাড়ায়। সমিতির কঠোর অনুশাসনের জন্য সীমিত কয়েকজন ছাড়া কেউ বিন্দু বিসর্গ জানতো না। এর মধ্যে ১৯২৫-এ, ছাত্র-আন্দোলন সম্পর্কে কোচবিহার কলেজের অধ্যক্ষ মনোরথধন দে'র ছাত্রসমাজের প্রতি একটি অবমাননাকর উক্তির প্রতিবাদে ২১ দিনের জন্য কলেজ থেকে বহিষ্কৃত হলেন এবং ৩০ টাকা জরিমানা দিতে বাধ্য হলেন। সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা চলছে, অথচ এই অঞ্চলে সমিতির প্রতিষ্ঠা, ছাত্র ও যুব আন্দোলনে মদত, মহিলা সংগঠনের প্রতি বিশেষ নজর, এছাড়া গুপ্ত ঘাঁটিগুলির সুরক্ষা, সবই বীরেন দত্তর একক দায়িত্বে। এর মধ্যে কিছু জানাজানি হওয়াতে, কোচবিহার State Police তাকে ২৪ ঘণ্টার নোটিশে কোচবিহার রাজ্য ছেড়ে দেবার বিজ্ঞপ্তি জারি করল। তিনি গোপনে কলকাতায় চলে এলেন। সেটা ১৯২৮-২৯ সালের ঘটনা। এর আগে ১৯২৬-২৭-২৮ সালে রাজশাহী তে সংগঠন গড়ার কাজে প্রেরিত হলেন। এদিকে ১৯২২ সালে থেকে অসহযোগ আন্দোলনে ভাটার টান...নিস্তেজ, ফলে বিপ্লবীরা এবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠলেন। ১৯২৭ থেকে ১৯২৯-এর মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত তিনি রাজশাহী জেলার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত, কলেজকে কেন্দ্র করে ইউনিয়নগুলির সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্রের সমর্থন আদায় করে নিলেন। ইতিমধ্যে শহরে অনুষ্ঠিত হল, প্রথম জেলা যুব সম্মেলন। উপস্থিত ছিলেন যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত।

২৯.৪.২৯, তিনি গ্রেপ্তার হলেন। ১৯২৯ থেকে ১৯৩৯, একটানা ১০ বছরের জেল। জলপাইগুড়ি দমদম আলিপুর হিজলি,...ইংরেজ পুলিশের অত্যাচারে তিনি যেন আরো খাঁটি সোনা হয়ে উঠলেন।

ইতিমধ্যে তিনি বিবাহ করেছেন। তাঁর পূর্ববঙ্গের পাশের গ্রামের মেয়েকে। না, বিয়ের সময় তিনি হিজলি জেলে বন্দী। সরকারের অনুমতি নিয়ে প্রচুর সশস্ত্র পুলিশের বেষ্টনীতে তিনি বিবাহ করলেন নিভা দেবীকে, বিবাহের পর তিনি স্ত্রীকে উপহার দিলেন ম্যাক্সিম গোর্কি'র লেখা 'মা' বইটি।

তখন মার্কসবাদী চর্চা চলছে পুরোদমে। কংগ্রেসের মধ্যে যারা বামপন্থী, তারা ১৯৩৮ সালে গঠন করেছে কংগ্রেস স্যোসালিস্ট পার্টি। জেলায় কৃষক সংগঠনী সমিতি গঠিত হল। কৃষক আন্দোলনের নেতৃত্বে চুনীলাল বসু, গুরুদাস রায়, মাধব দত্ত এবং শচীন দাশগুপ্ত। ১৯৩৯ কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলন। শহর তোলপাড়। মাধব দত্ত কৃষকদের মিছিল নিয়ে সম্মেলনে এলেন। সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে কমিউনিস্ট পার্টির জেলা সাংগঠনিক কমিটি তৈরি হল। সদস্য মাত্র তিনজন...বীরেন দত্ত, গুরুদাস রায় এবং শচীন দাশগুপ্ত।

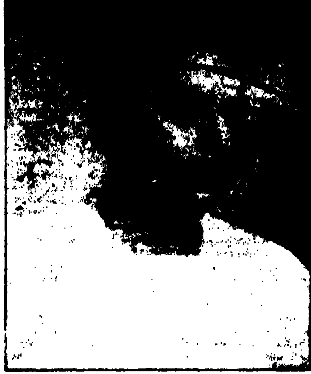
বীরেন দত্তর নেতৃত্বে কম্যুনিস্ট পার্টির কাজ এগিয়ে চলল। ১৯৪৮ সনে পার্টি বেআইনি ঘোষিত হলে আবার গ্রেপ্তার হলেন। তারপর আবার ১৯৬২ সনে চীন-ভারত সংঘর্ষের সময়। এর মধ্যে একটা চা-কোম্পানিতে চাকরি নিয়েছিলেন। জেলে যাবার অপরাধে চাকরি থেকে বরখাস্ত হলেন, যদিও পরে নাকি পুনর্বহাল হয়েছিলেন।

স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে বামপন্থী কমিউনিস্ট পার্টির আন্দোলন... এই একটা অগ্নিক্ষরা যুগের ইতিহাসের কয়েকটি পাতা নিশ্চয়ই বীরেন দত্তর নাম বরাদ্দ থাকবে। ১৯৭৬ সনের ২৩ সেপ্টেম্বর, এই সংগ্রামী মানুষটির জীবনাবসান হয়।

বীরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ

জলপাইগুড়ি শহর তথা জেলার সামগ্রিক উত্থান ও উন্নয়নে যে কয়েকটি নাম প্রথম সারিতে উঠে আসে, তার মধ্যে অন্যতম বীরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বা অতি পরিচিত নাম বি সি ঘোষ। শহরের অন্যতম ঘোষ পরিবারের সন্তান বীরেন্দ্রচন্দ্রের পিতা যোগেশচন্দ্র ঘোষ। পিতামহ স্বনামধন্য গোপালচন্দ্র ঘোষ, যিনি চা-শিল্পে শহরের প্রথম জয়েন্ট-স্টক কোম্পানির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

যোগ্য পিতার যোগ্য পুত্র। যে-পিতা ছিলেন জলপাইগুড়ি জেলা স্কুলের এন্ট্রান্সে প্রথম হওয়া পদকপ্রাপ্ত ছাত্র, যিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের স্নাতক আবার আইনজীবী হিসেবেও সফল, যিনি জেলার স্বাধীনতা আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী, জেলায় সামাজিক ও আর্থিক উন্নয়নের ব্যাপারে প্রধান উদ্যোগী, তাঁরই পুত্র বীরেন্দ্রচন্দ্র, পিতার সেই ভাবাদর্শের একান্ত অনুগামী।


বীরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ

বীরেন্দ্রচন্দ্রের জন্ম ১৯০৬ সনের ১৭ নভেম্বর। মায়ের নাম সুভাসিণী দেবী। কলকাতার স্কটিশ চার্চ থেকে বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা শেষে কলকাতারই বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান J. Thomas & Co.-তে কিছুদিন শিক্ষানবিশী থেকে পারদর্শিতা অর্জন করে, পিতার সংস্থায় যোগ দেন। তারপর অধ্যবসায়, কর্মকুশল তৎপরতায়, ধীরে ধীরে উত্তরবঙ্গে এবং অন্যান্য জায়গায় চা-বাগিচা প্রতিষ্ঠা করে, চা-শিল্পের একজন প্রবাদ প্রতিম ব্যক্তিত্বে পরিণত হন।

পিতার প্রতিষ্ঠিত ইন্ডিয়ান টি প্ল্যানটার্স অ্যাসোসিয়েশন (I.T.P.A.)-এর সেক্রেটারিরূপে ১৯৩৪-১৯৩৫ পর্যন্ত, তারপর ভাইস-প্রেসিডেন্টরূপে ১৯৪৮ থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত এবং শেষে ১৯৫১ এবং ১৯৬৩ সালে চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়া তিনি চা-শিল্পের সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির সদস্য হিসেবে, বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান, রেল ইত্যাদি সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ পদ অলঙ্কৃত করেছেন। চা-শিল্পের স্বর্ণযুগে এবং মন্দার সময়, দু সময়েই তিনি ব্যক্তিগতভাবে এবং সরকারি প্রতিনিধিরূপে বিদেশ সফর করেছেন। বিদেশে চা-শিল্পের বাজার তৈরির উদ্দেশ্যে, তিনি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর নির্দেশে অনেক দেশে গিয়েছিলেন। ১৯৬৮-র বন্যার পর, তারই প্রভাবে, রাশিয়ার কনসাল-জেনারেল জলপাইগুড়িতে সহমর্মিতা জ্ঞাপন করতে এসেছিলেন।

শহরের বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নতিকল্পে তিনি, তাঁর প্রভাব বিস্তার করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ১৯ মে, ১৯৮৪ সালে এই উদ্যোগী পুরুষ বীরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের জীবনাবসান হয়।

তখন মার্কসবাদী চর্চা চলছে পুরোদমে। কংগ্রেসের মধ্যে যারা বামপন্থী, তারা ১৯৩৮ সালে গঠন করেছে কংগ্রেস স্যোসালিস্ট পার্টি। জেলায় কৃষক সংগঠনী সমিতি গঠিত হল। কৃষক আন্দোলনের নেতৃত্বে চুনীলাল বসু, গুরুদাস রায়, মাধব দত্ত এবং শচীন দাশগুপ্ত। ১৯৩৯ কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলন। শহর তোলপাড়। মাধব দত্ত কৃষকদের মিছিল নিয়ে সম্মেলনে এলেন। সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে কমিউনিস্ট পার্টির জেলা সাংগাঠনিক কমিটি তৈরি হল। সদস্য মাত্র তিনজন...বীরেন দত্ত, গুরুদাস রায় এবং শচীন দাশগুপ্ত। বীরেন দত্তর নেতৃত্বে কম্যুনিস্ট পার্টির কাজ এগিয়ে চলল।

মাখনলাল ভৌমিক

জলপাইগুড়ির বিখ্যাত স্বাধীনতা-সংগ্রামী ভৌমিক পরিবারের আদিপুরুষ। এই পরিবারেই ছিলেন হরেন ভৌমিক, নরেন ভৌমিক... নরেন ভৌমিকের মতো বিপ্লবী, স্বাধীনতা সংগ্রামী মানুষেরা, আবার রমেন ভৌমিকের মতো কৃতবিদ্য পুরুষরাও ছিলেন। সম্ভবত গত শতাব্দীর গোড়ার দিকে মাখনলাল ভৌমিক পাবনা থেকে এসেছিলেন। শিক্ষারম্ভ পাবনা থেকে, তারপর ঢাকা আসানুল্লা কলেজ থেকে, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমা নিয়ে এই শহরে এলেন। সে আমলে এরকম শিক্ষাগত যোগ্যতা খুবই বিরল। শুধুমাত্র জীবিকার সন্ধানে না থেকে, তিনি বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী সংগঠন গুপ্তসমিতির সক্রিয় সদস্য হিসেবে যোগ দিলেন। আবার ১৯০৭ সালে, আর্য্য নাট্যসমাজগৃহে যে 'জাতীয় বিদ্যালয়' গড়ে উঠেছিল, তিনি সেই বিদ্যালয়ে শিক্ষাগুরুদের মধ্যে অন্যতম। এছাড়া বিলাতি বস্ত্র বর্জন আন্দোলনের অঙ্গ হিসেবে, শহরে যখন স্বদেশি দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য দুটি দোকান খোলা হল, এবং যে যুবকরা এই দোকানগুলি চালাতেন, মাখনলাল ভৌমিক তাঁদের অন্যতম। ইংরেজ সরকারের অধীন কোনো চাকরি গ্রহণ করেননি। ব্যক্তিগত উদ্যোগই ছিল সম্বল। তাঁর ইঞ্জিনিয়ারিং

জ্ঞান সেই আমলে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। অনেক চা-বাগানের ফ্যাক্টরি তৈরিতে তাঁর একটা বিশেষ ভূমিকা ছিল। জনশ্রুতি আছে, শহরে নবাব পরিবারের দু-টি প্রাসাদ, নুরমঞ্জিল এবং বর্তমানে 'নবাববাড়ি'র structural design মাখনলাল ভৌমিকেরই চিন্তাপ্রসূত।

মুন্‌শী মোহম্মদ সোনাউল্লা

জলপাইগুড়ি শহরে অনেক ধনী, অর্থনৈতিক প্রতিপত্তিসম্পন্ন ব্যক্তি বাস করেছেন। হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়নির্বিশেষে, তাঁদের কেউ কেউ দান-ধ্যানেও স্বনামধন্য। কিন্তু একজনকেই এখানকার লোকে দানবীর হিসেবে জানে। তিনি জলপাইগুড়ির ভূমিপুত্র মুন্‌শী মোহম্মদ সোনাউল্লা।

মোহম্মদ সোনাউল্লার পরিবারের আদি নিবাস শহরের সন্নিকটে পাহাড়পুর-পাতকাটায়। তাঁরা ছিলেন দেশীয় মুসলমান। সামান্য জোতদার কৃষক থেকে স্বীয় বুদ্ধিবলে, জমি থেকে উৎপন্ন উদ্বৃত্ত অর্থ পুনর্বিনিয়োগ করে তিনি প্রভূত অর্থের অধিকারি হয়েছিলেন। আর এই অর্থ ব্যবহার করেছিলেন এক অনন্য উপায়ে। এখানেই বহিরাগত ধনী মুসলমান ব্যক্তিদের চেয়ে তিনি অনেক আলাদা। বরঞ্চ, তাদের চেয়ে তিনি অনেক ওপরেই অধিষ্ঠিত হয়েছেন।

তাঁর এই ঐশ্বর্যের প্রচার নেই, সহমর্মিতা আছে। এই অর্থে ক্ষমতার লোভ নেই, কিন্তু মানুষের জন্য মমতার ছোঁয়া আছে। এটা সম্ভব হয়েছিল, তিনি দেশী বা ভূমিপুত্র বলেই। এখানকার মানুষের দৈনন্দিন সমস্যা, তাদের মনোবেদনার কথা জানতেন। তাই তাঁর দান-ধ্যান তাদেরকে ঘিরেই। তিনি কিছুটা ধর্মভীরু সরল মানুষ। তাই সর্বসাধারণের মসজিদ নির্মাণে তাঁর উদ্যোগ লক্ষণীয়। পূর্বপুরুষদের গ্রামে তিনি তৈরি করলেন মসজিদ, পুষ্করিণী। শহরেও তৈরি করলেন বৃহৎ মসজিদ, যা ব্যক্তিগত মালিকানাধীন নয়। তিনি স্বল্পশিক্ষিত হলেও শিক্ষার জন্য তাঁর দান অবিস্মরণীয়। তাঁরই অর্থে নির্মিত হয়েছে বর্তমান 'সোনাউল্লা বিদ্যালয়'। ফণীন্দ্রদেব বিদ্যালয়ের স্মৃতিকল্পে তিনি অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। নিজের মায়ের নামে স্থাপিত করলে করিমনেছা প্রাথমিক বিদ্যালয়। দেশপ্রেমিক শিক্ষানুরাগীর হৃদয় না হলে এটা সম্ভব নয়। তাঁর স্বাদেশিকতার সবচেয়ে বড় নিদর্শন, কুড়ির দশকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ডাকে সাড়া দিয়ে তাঁর স্বরাজ্য ফান্ডে এক হাজার টাকা দান, যা আজকের বিচারে কয়েক লক্ষ টাকায় শামিল। এই জন্য দেশবন্ধু কর্তৃক তাঁকে আমীর-উল-মুলুক উপাধি দান একটি ঐতিহাসিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সমস্ত সংস্থাগত দান বাদ দিয়ে গরিব দুঃখীদের যে তিনি কত দান করেছেন, তাঁর ইয়ত্তা নেই। প্রতিটি শীতের সময় গরীব দুঃখীদের কম্বল দান করা তার জীবনযাপনেরই একটি অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তিনি সাধারণ মানুষের বিপদ-আপদের ত্রাতা। আর এই ব্যাপারে তাঁর হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদ ছিল না।

এছাড়া চিকিৎসা-সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁর অনুরাগ ছিল। তাই তিনি জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে দাদার স্মৃতিতে একটি অংশ তৈরি করে দিয়েছিলেন, নাম 'ইদার মহম্মদ ব্লক'।

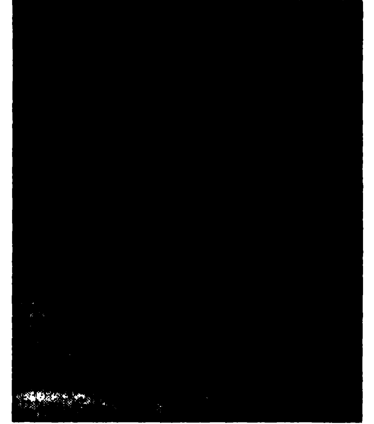
সোনাউল্লা ছিলেন ব্রিটিশ শাসক-পরিমণ্ডলের বাইরে একজন দেশপ্রেমিক ব্যক্তিত্ব। ঐতিহাসিকদের মতে, শুধু তাঁর পরম স্বাদেশিকতার কারণে, তিনি শাসকদের দেয়া সরকারি উপাধিছত্র থেকে বঞ্চিত হন। এই বঞ্চনার জবাব তিনি দিয়েছেন শহর এবং শহরের মানুষের উন্নয়নে তাঁর নিজস্ব কর্মসূচি অব্যাহত রেখে।

১৯৩০ সনে এই 'দানবীর' মুনশী মোহম্মদ সোনাউল্লার জীবনাবসান ঘটে।

মোসারফ হোসেন

প্রথমে রহিম বক্সের অধীনে কর্মী, তারপর জামাতা, মোসারফ হোসেন জলপাইগুড়ির অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ইতিহাসের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৮৮০ সনে, পূর্ববাংলার কুমিল্লায়। ১৮৯৮ সনে স্নাতক হয়ে তিনি এই শহরে আসেন। কর্মযোগী পুরুষ, ফলে স্বীয় উদ্যোগ চা-বাগান প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসতে তিনি বোধ হয় অনেকের চেয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন।

মধুপর্ণী জেলা সংখ্যায় আনন্দগোপাল ঘোষ লিখেছেন...'রহিম বক্সের যোগ্য উত্তরাধিকারি হিসেবে জেলার মুসলমান সমাজের সমাজপতি হয়েছিলেন...। সফল চা-কর ছিলেন মোসারফ হোসেন। শোনা যায়, তাঁর দখলে বাইশটি চা-বাগান ছিল। একক ভাবে তারিণীপ্রসাদ রায় ছাড়া এতগুলি চা-বাগান আর কারো দখলে তখন ছিল না।'...


মোসারফ হোসেন

উমেশ শর্মা তাঁর 'জলপাইগুড়ির খানবাহাদুর রায়বাহাদুর', গ্রন্থে লিখেছেন '...১৯২৫ খ্রিঃ বাংলা সরকারের মন্ত্রিত্ব লাভ করেন। এই মন্ত্রিত্ব লাভের পর ১৯২৬ খ্রিঃ তিনি নবাব উপাধি লাভ করেন। নবাব উপাধি লাভের দু'বছরের মধ্যে তিনি 'খানবাহাদুর' উপাধি লাভ করেন।'... পর্যালোচনা করলে এটাই ধারণা হয়, স্বদেশি-আন্দোলন-বিরোধী মনোভাব এবং ইংরেজ শাসকদের সহযোগিতার জন্যই তাঁর এই পুরস্কারপ্রাপ্তি। আনন্দগোপাল ঘোষ লিখেছেন... 'নবাবের চেষ্টাতেই জলপাইগুড়ির পাঁচটি থানা পাকিস্তানে চলে গিয়েছিল। শুধু তাই নয়, নবাব নাকি চেষ্টা করেছিলেন তিস্তা নদীকে সীমা করে জলপাইগুড়ি শহরকে পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত করতে।'...

এটা জনশ্রুতি, স্বাধীনতা দিবসে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত 'নবাববাড়ি'তে পাকিস্তানের কালো পতাকা উড়েছিল।

তাঁর আরো একটি কলঙ্কিত ভূমিকায় কথা উল্লেখ করতেই হয়। ডাঃ শচীন দাশগুপ্ত, 'জলপাইগুড়ির আধিয়ার আন্দোলন' প্রসঙ্গে লিখেছেন... 'এই সময়ে জলপাইগুড়িতে এলেন নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য জলপাইগুড়ির নবাব মোসারফ হোসেন, জোতদারদের ব্যাকুল আবেদনে সাড়া দিয়ে। নবাব সাহেব জলপাইগুড়ি এসে জোতদারদের নিয়ে সভা করলেন। নানা কমিউনিস্ট-বিরোধী বক্তব্য রাখলেন। তাঁরই উদ্যোগে শুরু হল কৃষকদের ওপর প্রত্যক্ষ আক্রমণ।...'

শ্রেণী-চরিত্রের হিসাবে, এটাই বোধ হয় তাঁর স্বাভাবিক আচরণ ছিল। এসব সত্ত্বেও, শিক্ষাবিস্তারের জন্য তাঁর কিছু উল্লেখযোগ্য কাজ আছে। স্ত্রী মারা যাবার পর, বেগম ফয়জন্নেসার নামে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এছাড়া শাশুড়ি মেহেরুন্নেছার নামে একটি বালকদের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, যে দুটি এখনো পূর্ণোদ্যমে শিক্ষা দিয়ে চলছে। এছাড়া জলপাইগুড়ি সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার পেছনে তাঁর একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল।

ব্যক্তি হিসেবে তিনি বিতর্কিত নিশ্চয়ই, কিন্তু বিশিষ্ট বটে। এই অভিজাত ব্যক্তি নবাব মোসারফ হোসেন ১৯৬৬ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে পরলোকগমন করেন।

মাধব দত্ত

...'শিলিগুড়ি থাকার সময়ও মাধববাবু তাঁর স্বভাবানুযায়ী যেখানে সেখানে মার্কসবাদের তত্ত্ব আওড়াতেন। একদিন এক চায়ের দোকানে মার্কসবাদ ব্যাখ্যার সময় এক চা-পায়ী তাঁকে জানালেন, শিলিগুড়ি কংগ্রেসের সভাপতি বীরেশ্বর বসুর পুত্রও তো এইসব কথাই বলে থাকে। মাধববাবু কালবিলম্ব না করে বীরেশ্বরবাবুর পুত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলাপ করে জানলেন যে, সত্যিই ইনি মার্কসীয় তত্ত্ব পড়াশুনা করেছেন এবং এই তত্ত্বে বিশ্বাসী। তখন মাধববাবু তাঁকে বললেন, তত্ত্ব তো জানেন, কিন্তু কী ফল, যদি আপনার এই তত্ত্বজ্ঞান আপনি কাজে প্রয়োগ না করলেন। আপনার তো কমিউনিস্ট পার্টির কৃষক-শ্রমিক আন্দোলনে যোগ দেওয়া উচিত। ব্যক্তিটি বললেন, কমিউনিস্ট পার্টির কাজে আত্মনিয়োগ করতে তিনি খুবই উৎসুক। কিন্তু সে সুযোগ, তিনি পাচ্ছেন কোথায়? সে সময়ে বেআইনি কমিউনিস্ট পার্টির দুই জেলা নেতা বোদা পচাগড়-দেবীগঞ্জ অঞ্চলে কৃষক সংগঠনের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। মাধববাবু ওই ব্যক্তিটির আন্তরিকতা বুঝে ওঁকে সেখানে যোগাযোগের ব্যবস্থা করে দিলেন। পর-পর মাধববাবুর সংকেতসূত্র অনুসরণ করে ইনি দেবীগঞ্জে গিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে কৃষক আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করলেন। ইনিই হলেন পরবর্তীকালের নকশালবাড়ি তথা নকশাল আন্দোলনের স্রষ্টা চারু মজুমদার।'... (বীরেন নিয়োগী/মাধব দত্ত-স্মৃতি/করতোয়া থেকে তিস্তা/পৃঃ ৮৩)

এই দীর্ঘ উদ্ধৃতির নায়ক মাধববাবু বা মাধব দত্ত, রক্তাক্ত তেভাগা-রূপকথার নায়ক, সংগ্রামী কৃষকের চোখের মণি...মাধব দত্ত। কিন্তু এটা তো অনেক পরের কথা। আমরা আরো আগের কথা বলি।

জন্ম (আনুমানিক) ১৯১৫ সনে। প্রাপ্তবয়স্কের খাতায় নাম লেখাতে না লেখাতেই রাজনীতির শুরু। বরিশালের ছেলে, ১৯৩২ সনে রাজবন্দী হয়ে বহরমপুর বন্দিনিবাস। সেখানেই আলাপ রাজবন্দী বিনয় ঘোষের সঙ্গে। ১৯৩৭ সালে বিনয় বসুর পরামর্শে কংগ্রেসের হোল-টাইমার হিসেবে কাজ করতে চলে এলেন জলপাইগুড়ি। আশ্রয় নিলেন ডাঃ চারুচন্দ্র সান্যালের বাড়িতে। শহরের সঙ্গী খগেন দাশগুপ্ত আর বাদল নিয়োগী। তারপর জুটলেন গুরুদাস রায়, নরেশ চক্রবর্তী, শচীন দাশগুপ্ত। গ্রামে সঙ্গী জুটল যতীন বসুনিয়া, রাধামোহন বর্মণ, গুলুকান্ত রায়, কামিনী রায়, দীননাথ মোহন্ত, লাল্টু বর্মণ, উজানী বর্মণ, কিশোরী বর্মণ, বুড়িমা পুণ্যেশ্বরী... অসংখ্য লড়াকু কৃষকেরা।

১৯৩৮-এর মাঝামাঝি কৃষকের ঘরে আশ্রয় নিয়ে শুরু হল কৃষক আন্দোলনের হাতেখড়ি। কংগ্রেসের ভেতরে থেকে সাম্যবাদী প্রচারই ছিল আর আন্তরিক উদ্দেশ্য। বঞ্চিত, নিপীড়িত, শোষিত এবং অসংগঠিত কৃষকদের সংগঠিত করতে তিনি চষে বেড়ালেন সমগ্র জেলা। তাঁর প্রধান কর্মাঞ্চল বোদা, পচাগর আর দেবীগঞ্জ। কংগ্রেসি খগেন দাশগুপ্তদের সাহচর্যে কৃষক সমিতির ছাতার নীচে দাঁড়িয়ে শোষণ-মুক্তির কাজ আবার শহরে এসে গোবিন্দ কুণ্ডুদের সঙ্গে শলা-পরামর্শ করে, একটি শক্তিশালী মার্কসবাদী সংগঠন গড়ে তোলাই ছিল তাঁর গোপন কর্মসূচি।

এদিকে জোতদারের লাঠিয়াল-পুলিশের অত্যাচারের বিরুদ্ধে চলছে লাগাতার প্রচার, কৃষকরা বিশাল বিশাল মিছিল, রাতে-বিরেতে গোপন মিটিং... ছড়িয়ে পড়লো তার সত্যি-মিথ্যে সাংগঠনিক প্রতিভার অজস্র গল্প। তাঁর নিজের ভাষাতেই বলি '...শুকনা চিঁড়া চিবাইয়া ১০/১২ মাইল ভলান্টিয়ার সহ অবিশ্রাম হাঁটা, নদী-নালা-জঙ্গল পার হওয়া যেন নিত্য-নৈমিত্তিক অভ্যাসে পরিণত হইল। ১৯৩০-৩১ সালে পলাতক জীবন কাটাইয়াছি মধ্যবিত্ত ঘরে, ৩৯-৪০ সালে কৃষকের ঘরে গোয়ালঘরে চাটাই ও শপের উপর। বোদায় ২/৩টি মধ্যবিত্ত ঘর ছিল যাহারা আদরে ও দরদে পুলিশের ভয় তুচ্ছ করিয়া আশ্রয় ও খাদ্য দিয়াছে।...(করতোয়া থেকে তিস্তা/পৃঃ ২৮) এরপর চারু মজুমদারের সঙ্গে আলাপ।

১৯৪০ সাল থেকে শুরু হল নতুন অধ্যায়। গঠিত হল কমুনিস্ট পার্টি। আর 'নিজ খোলানে ধান তোলো' এই স্লোগান সামনে রেখে আধিয়ার কৃষকদের নিয়ে আরম্ভ হল লাগাতার সংগ্রাম। তীব্রতর হল। শেষ পর্যন্ত জয়যুক্ত হল। শাসক শ্রেণীর নির্দেশে গ্রেপ্তার হলেন। তারপর অন্তরীণ দীর্ঘদিন।

তারপর ১৯৪৫-এর সেই ঐতিহাসিক তেভাগা আন্দোলন। সব কিছুতেই তাঁর উপস্থিতি। এত গভীর, ব্যাপ্ত জঙ্গি আন্দোলন যে '৪৭-এর স্বাধীনতার চেহারাটাই যেন পাল্টে গেল।

জলপাইগুড়ি জেলার কৃষক আন্দোলনের মূল স্থপতি হিসেবে মাধব দত্ত, ১৯৯০ সনে, তাঁর ৭৫ বছরের ঝোড়ো জীবন নিয়ে ইতিহাসে প্রোথিত হয়ে গেলেন।

রবীন্দ্রনাথ শিকদার

১৯০৫ সন। লর্ড কার্জনের প্রস্তাবিত বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে বাংলা জুড়ে আন্দোলন। তার তিনবছর পরে, ১৯০৮ সনে জলপাইগুড়ি শহরে রবীন্দ্রনাথ শিকদারের জন্ম। পিতা নগেন্দ্রনাথ, জলপাইগুড়ি কোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইন ব্যবসায়ী। এই পিতাই ছিলেন, দ্বিতীয় পুত্র রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনের আদর্শ। তাঁর প্রেরণাভূমি ছিল বাড়িতেই।

প্রাথমিক শিক্ষারম্ভ ফণীন্দ্রদেব বিদ্যালয়ে, তারপর রাজসাহী কলেজ। যেখানে স্নাতক স্তরে পড়তে পড়তেই, ১৯৩৯০ সনে, স্বাধীনতা সংগ্রামের মুক্তিসৈনিক হিসেবে নাম লেখালেন। তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু হল, সেই সময়ের বিখ্যাত 'অনুশীলন সমিতি'র সক্রিয় সদস্য হিসেবে।

তখন তাঁর মাত্র ২৪ বছর বয়স। ১৯৩২ সন। সমগ্র ভারত জুড়ে মহাত্মা গান্ধীর ডাকে আইন অমান্য আন্দোলন। সেই আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে দীর্ঘসময়ের জন্য কারাবাস।

নিজের কথা বলতে গিয়ে, রবীন্দ্রনাথ শিকদার, আরেকজন স্বাধীনতা সংগ্রামী খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তর লেখা উদ্ধৃত করে বলেছেন... 'আন্দোলন শুরু হবার বৎসর খানেক আগে একনিষ্ঠ কর্মী যুবক রবীন্দ্রনাথ শিকদার জিলা কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে জেলা কংগ্রেসে আন্দোলন সংঘর্ষ পরিচালনায় তিনি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৩২ সালের আন্দোলন চলাকালে, প্রথমেই স্থির হয়, জলপাইগুড়ি শহরে বর্ধন প্রাঙ্গণে সকল প্রকার ভ্রূকুটি চ্যালেঞ্জ করে, সরকারের ১৪৪ ধারা অমান্য করে আমার (খগেন্দ্রনাথের) সভাপতিত্বে জলপাইগুড়ি জেলা সম্মেলন আহ্বান করে। সভার বিজ্ঞাপন কোনো স্থানীয় কাগজ প্রকাশ করবে না, কোনও প্রেস মুদ্রিত করবে না। তাই গোপনে সাইক্লোস্টাইল করে সভার বিজ্ঞাপন ছাপাবার ব্যবস্থা হল। স্টেশনপাড়ার মণীন্দ্র নাগের বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ শিকদার যখন সাইক্লোস্টাইল করার কাজে ব্যস্ত, পুলিশ অতর্কিতে হানা দিয়ে সাইক্লোস্টাইল কপি সহ রবীন্দ্রনাথকে ও উপস্থিত বরেন ভৌমিক, যতীন্দ্র রায় ও মণীন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করে।...

কারাবাসের এই শুরু। দীর্ঘদিন পর জেল থেকে বেরিয়ে, ১৯৩৪ সনে আবার গ্রেপ্তার। অভিযোগ সন্ত্রাসবাদ। দার্জিলিঙের সন্নিকটে লেবংয়ে তৎকালীন গভর্নরকে গুলি চালাবার অভিযোগ সরকারের সন্ত্রাসবাদী আইন অনুযায়ী বিচার হয়। বিচারে ১৮ মাসের জেল। জেল থেকে বেরিয়ে, একনিষ্ঠ কংগ্রেস কর্মী হিসেবে কংগ্রেসের প্রচারক হিসেবে কাজ করতে লাগলেন।

তারপর ১৯৪২ সনে, সেই 'ইংরেজ ভারত ছাড়' আন্দোলন। অংশগ্রহণ করে অনেকের সঙ্গে তিনিও গ্রেপ্তার হলেন। তার মধ্যে অনেক বন্দী তাড়াতাড়ি মুক্তি পেলেও রবীন্দ্রনাথ পাননি। প্রায় চার বছর পর ১৯৪৬-এর ডিসেম্বর মাসে খগেন দাশগুপ্ত ও শশধর করের সঙ্গে তিনিও মুক্তি পান। দেশ স্বাধীন হল। স্বাধীনতার পরে, এই দেশপ্রেমিক মানুষটি আদর্শবাদী কংগ্রেসি হিসেবে কাজ করতে থাকেন। সরল, সাদাসিধা, অনাড়ম্বর জীবনযাপন, খদ্দরের মাহাত্ম্য তাঁর সর্বাঙ্গে। 'কথা কম কাজ বেশি'র সর্বোত্তম উদাহরণ। সভা-সমিতিতে সুচিন্তিত, লিখিত ভাষণে বিশ্বাসী। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজ, জেলা স্কুল বোর্ডের সভাপতি থাকাকালীন, গ্রামাঞ্চলে শিক্ষাপ্রসারে উদ্যোগ। প্রাথমিক শিক্ষার বুনিয়াদ গড়তে তিনি সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছিলেন। এছাড়া জেলার দুটি অনাথ আশ্রমের সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগাযোগ ছিল। অধুনালুপ্ত 'অরণি প্রেস', সুচারু দৃষ্টিনন্দন মুদ্রণের জন্য বিখ্যাত, তাঁরই হাতে গড়া। একটা সময় এই ছাপাখানা শহরের অনেক সাংবাদিক সাহিত্যিক সাংস্কৃতিক উদ্যোগের সূতিকাগার হয়ে উঠেছিল। 'জেলা সাংবাদিক সংঘ' গঠনে তিনি শেষ উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

১৯৯২ সালের ৭ অক্টোবর, রবীন্দ্রনাথ শিকদারের জীবনাবসান হয়।

রুনু গুহঠাকুরতা

জলপাইগুড়ির ক্রীড়াব্যক্তিত্বদের অন্যতম। স্বাধীনতা-পূর্ব এবং স্বাধীনতা-উত্তর যে সমস্ত ফুটবল খেলোয়াড়, যেমন মোজাম্মেল হক, নীতি ঘটক, সন্তোষ ব্যানার্জি প্রমুখ তাঁদের মধ্যে তিনি সবচেয়ে বেশি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। শুধু বাংলা নয়, ভারত থেকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাঁর খ্যাতি হয়েছিল। জন্মগ্রহণ করেছিলেন, ১৯২৭ (মতান্তরে ২৮) সনে জলপাইগুড়ি শহরের উকিলপাড়ায়। স্থানীয় ক্লাব থেকে জর্জ টেলিগ্রাফ হয়ে মোহনবাগানের নিয়মিত খেলোয়াড় হয়েছিলেন। ১৯৫৬ সনে হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে ভারতীয় ফুটবল দলের প্রতিনিধিত্ব করে, মাতৃভূমিকে গৌরবান্বিত করেন।

শশধর কর

১৯০৫ সনের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পর জলপাইগুড়ি শহর তথা জেলায় যে স্বদেশি বিপ্লববাদী গুপ্তসমিতি গড়ে উঠেছিল, তার ভেতরে কিশোর তরুণ যুবক সক্রিয় কর্মী এবং সমর্থক মিলিয়ে সংগ্রামী যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। তাঁদের মধ্যে যেমন ছিলেন শহিদ বীরেশ দত্তগুপ্ত, পরবর্তীকালের জননেতা খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, তেমনি আজীবন সক্রিয় কর্মী শশধর কর মহাশয়।

শশধর কর কেমন? প্রয়াত চারুচন্দ্র সান্যালের কথায় : ......'বৈচিত্র্যময় এই শশধরবাবুর জীবন। দেশ পাবনা জেলায়। রংপুরে এসে বিপ্লবী দলে যোগ দেন।'...

তিনি আরো লিখেছেন...'রংপুর থেকে শ্রীশশধর কর এদের (জলপাইগুড়ির গুপ্তসমিতির সদস্যদের) সাথে রংপুরের বিপ্লবী দলের যোগাযোগ রাখতেন ও সক্রিয় সাহায্য করতেন। এই দল বাইরে গীতা পড়তো, সংকীর্তন করতো, মকফাইট খেলতো কিন্তু তলে তলে অস্ত্রসংগ্রহের চেষ্টা করতো। ইতালির স্বাধীনতা সংগ্রামের গ্যারিবল্ডি ও ম্যাটসিনি ছিলেন এদের আদর্শ...'।

বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদের আগুন এক সময়ে নিস্তেজ হয়ে গেলেও, শশধর কর চেষ্টা করেছিলেন তাঁর তীব্র স্বাদেশিকতার আগুন দিয়ে এই সমিতিকে বাঁচিয়ে রাখতে। কিন্তু ব্যর্থ হন। কিন্তু তিনি স্বদেশি আন্দোলনের মূল স্রোত থেকে কখনো হারিয়ে যাননি। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের ধারাবাহিকতা চারুচন্দ্র সান্যাল মহাশয়ের লেখায় চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে.... '১৯১৩ সনে বেকার বলে ফৌজদারী আইনের ১০৯ ধারায় গ্রেপ্তার করা হল রংপুরে। এক বছর শ্রীঘর বাস। বেরিয়ে আসতেই রংপুরের সহকারী পুলিশ সুপার নন্দলাল ঘোষকে হত্যা করার অপরাধে ৩০২ ধারায় আবার গ্রেপ্তার। তিনমাস হাজত বাসের পর প্রমাণাভাবে মুক্তি। সাথে সাথেই ১৯১৪ সনে ভারত রক্ষা আইনে আবার গ্রেপ্তার। ১৯২০ পর্যন্ত আটক। ১৯২১-এ কংগ্রেসে যোগ দেন পাবনায় ফিরে। আইন অমান্যে ছয় মাস জেল। ১৯২৩-এ রংপুরে এসে এক দোকান দিলেন যাতে ১০৯ ধারা না হয়। তারপর 'ফাল্গুনী' নাম দিয়ে এক বাস-গাড়ি কিনে বেহালা-ফলতায় চালাতেন। ভালো লাগতো না। উত্তর বাংলা তাঁকে ডাকতো। এই বাস নিয়ে এলেন জলপাইগুড়িতে ১৯২৬ সনে। তখন সবাই তাঁকে বলতো 'ফাল্গুনী'দা। ১৯২৯-এ কিনলেন এক মোটরগাড়ি। এটা ট্যাক্সি হিসেবে চালাতেন।...... বিচিত্র ভবঘুরে জীবন। পেশা গাড়ির ড্রাইভারি, কিন্তু মাথার ভেতরে স্বাদেশিকতার আগুন তখনো দাউদাউ জ্বলছে। চারুবাবু একজায়গায় লিখেছেন নিজের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে... 'শশধরবাবু একটি টেক্সি চালাতেন। চারুবাবু সাজসরঞ্জাম নিয়ে শহরের বাইরে রোগী দেখতে যেতেন ঐ টেক্সিতে চড়ে ও গাড়ি চালাতেন শশধরবাবু। আসল কাজ ছিল প্রচার। চার-পাঁচশত গ্রামবাসীর কাছ থেকে তাদের সংসারের হিসাব সংগ্রহ করা হয়েছিল। সেগুলি অবলম্বনে কতগুলি একপাতা প্রচারযন্ত্র লেখা হয়। গ্রামে গ্রামে ঘুরে, সেগুলি পড়ে, বুঝিয়ে, বিলি করা হত।'...

আসলে শশধরবাবুর সাময়িক জীবিকাকে ছাপিয়ে গিয়েছিল তাঁর রাজনৈতিক সংগ্রাম। কখনো প্রত্যক্ষ কখনো বা অপ্রত্যক্ষভাবে। রাজনৈতিক নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতা ছিল। ফলে দলের ভেতরে কর্মী হিসেবে নেতা হিসাবে তিনি ছিলেন সমাদরযোগ্য। ত্যাগী, সংগ্রামী ভাবমূর্তির বলে, তৎকালীন যুবসমাজের ভালোবাসা শ্রদ্ধা আনুগত্য পেতে তাঁর দেরি হয়নি।

...'১৯২৯-এ জলপাইগুড়ি কংগ্রেসে যোগ দিলেন। ফলে ১৯৩০ ও ১৯৩২-এ দু'বার জেল হয় এক বছর করে। ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৮ পর্যন্ত ফৌজদারী দণ্ডবিধির সংশোধিত আইনে অন্তরীণ থাকলেন। ১৯৩৯-এ ফিরে এসে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় কংগ্রেসের জলপাইগুড়ি সম্মেলনে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অধিনায়ক হলেন। ১৯৪২-এ 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে আবার জেল। ১৯৪৫-য়ে মুক্তি। জীবনের ১৪।১৫ বছর ইংরেজের সম্মানিত হিসেবে জেলেই কেটে গেল।...'

১৯৫৫ সনে চারুবাবু শশধর করের স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে, রামায়ণ অনুসরণ করে লিখেছিলেন... '(শশধরবাবু) বর্তমানে অতি বৃদ্ধ, দেহে জটায়ু, তেজে ও সাহস এখনও জটায়ু'।

এর মধ্যে বাংলা তথা ভারতের রাজনীতিতে পটপরিবর্তনের আভাস। সবাই অনুভব করছেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর বজ্রনির্ঘোষ! ফলে, ১৯৪৫ এর পরে জেল থেকে বেরিয়ে, তৎকালীন আজাদ হিন্দ ফৌজ তথা নেতাজির বীরত্বের অনুগামী হয়ে, জেলায় নবগঠিত ফরওয়ার্ড ব্লকের কিছুদিন সভাপতিত্ব করেছিলেন। আরেক স্বাধীনতা সংগ্রামী রবীন্দ্রনাথ শিকদার 'জেলার জাতীয় আন্দোলনের ধারা' পর্যালোচনা করতে গিয়ে লিখেছিলেন... 'দেশপ্রেমের আদর্শে অটুট মনোবল নিয়ে ইংরেজ রাজপুরুষদের অকথ্য অত্যাচার ও পীড়ন সত্ত্বেও শুধুমাত্র আদর্শের জন্য অক্লান্তভাবে অকৃতদার শশাদা (শশধর কর) কাজ করে গেছেন।'...

শশধরের অনুগামী যাঁরা এখনো আছেন, তাঁদের বক্তব্য, শশধরবাবু কখনো পরমুখাপেক্ষী হননি। কারুর কাছ থেকে সাহায্যের হাত পাতেননি। বরঞ্চ নিজেকে বিপন্ন করে অন্যকে সাহায্য সহযোগিতা করাটা যেন তাঁর স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল।

শশীকুমার নিয়োগী

জেলাশহর জলপাইগুড়ি গঠনের সময় ১৮৬৯ সনের ১ জানুয়ারি। বোধ হয়, এই এ সময়েই জলপাইগুড়ির ইতিহাসের এক অনন্য চরিত্র শশীকুমার নিয়োগীর জন্ম। আদি নিবাস ঢাকা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে আইন পাস করে, ১৮৯২ সালে তিনি এ শহরে পদার্পণ করেন এবং জলপাইগুড়ি কোর্টে আইন ব্যবসা শুরু করেন। শহর তখন বেড়ে উঠছে। জনসমাগমও দিন দিন বাড়ছে। প্রশাসনিক কারণে আইন ব্যবসায় বৃদ্ধি ঘটছে। শশীকুমার ছিলেন অসম্ভব পরিশ্রমী, ক্ষুরধার মেধাসম্পন্ন মানুষ। ফলে পসার জমতে দেরি হয়নি। প্রচুর অর্থের অধিকারি হলেন তিনি। এই অর্থ ধনীর দুলালের মতো নষ্ট না করে জনহিতকর কাজের জন্য ব্যয় করা স্থির করলেন। সেই আমলে এটা ছিল অভিনব।

তাঁর ক্ষুদ্র জীবনসীমার মধ্যে আমরা চারটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ লক্ষ করি। প্রথম : আর্যনাট্য সংস্থার প্রতিষ্ঠা, দ্বিতীয় : জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন, তৃতীয় : জলপাইগুড়ি হাসপাতালের উন্নতিসাধন এবং চতুর্থ : 'ত্রিস্রোতা' পত্রিকার প্রকাশ। একটু বিশদভাবে বলা যাক, ১৯০১ সালে সাহিত্যসেবার লক্ষ্যে কবি ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরীর সঙ্গে যুগ্ম সম্পাদনায় 'ত্রিস্রোতা' নামক একটি পত্রিকা প্রকাশ করে শহরে নতুন দিনের সূচনা করেন। বলতে গেলে, তিনিই ছিলেন এই পত্রিকায় প্রাণ। ১৯০২ সালে তাঁর বাড়িতে এক সভায় আর্য নাট্য সংস্থা গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। উদ্দেশ্য—মধ্যবিত্ত মানুষের সংস্কৃতি বিকাশ এবং অবক্ষয় রোধ, যা সভ্যতার প্রতীক নাট্যমঞ্চ ছাড়া সম্ভব নয়। সঠিকভাবে বলতে গেলে, তাঁকেই জলপাইগুড়ি শহর তথা জেলার নাট্যচর্চার আদিপুরুষরূপে চিহ্নিত করা যায়। ১৯০৫ সন। শহরে চিকিৎসা ব্যবস্থা তখন খুবই অনুন্নত। সদর হাসপাতালের জীর্ণ দশা। তিনি উদ্যোগী হয়ে জোতদার-জমিদার, চা-বাগান মালিকদের কাছে থেকে অর্থসংগ্রহ করে হাসপাতালের কুঁড়েঘর থেকে পাকা ইমারতে রূপান্তরিত করেন। ১৯০৭ সাল। জলপাইগুড়ি জেলায় তখন স্বদেশি জাগরণের ঢেউ এসে লেগেছে। স্বাদেশিকতার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে আরো অনেক শিক্ষানুরাগীর সহযোগিতায় গড়ে তুললেন 'জাতীয় বিদ্যালয়'। যেখানে শহরের প্রায় সব পরিবার থেকেই সেই বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের জন্য আসতো।

১৯০৯ সনে এই কর্মযোগী পুরুষের জীবনাবসান হয়।

মুনশী রহিম বক্স

১৮৬৯ সনে জলপাইগুড়ি জেলা গঠিত হওয়ার পর থেকে, শহরে লোকবসতি বেড়ে যায়। পূর্ববঙ্গ থেকে বহিরাগতরা জীবিকার সন্ধানে জলপাইগুড়িই প্রথম পছন্দ হিসেবে বেছে নেন। প্রথম দফায় যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের ৯৯ ভাগই হিন্দু। একমাত্র মুসলিম এসেছিলেন নোয়াখালি থেকে, নাম রহিম বক্স। নোয়াখালি থেকে প্রথম সুখানি মহকুমা অফিসার জরিপ বিভাগের পেশকার, তারপর জলপাইগুড়ি। পেশকারের পেশা ছিল, তাঁকে পেশকার রহিম বক্সও বলতো।

রহিম বক্স ছিলেন অত্যন্ত সুযোগ সন্ধানী, কর্মকুশল, ব্যবসায়িক-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। তাঁর দূরদৃষ্টি ছিল। তিনি জানতেন, ইংরেজদের সাহায্য-সহযোগিতা না পেলে ব্যবসায়ে উন্নতি করা সম্ভব নয়। ফলে তাদের সঙ্গে যোগসাজশে তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। এরপর জোতদারি কিনতে কিনতে চা-বাগান প্রতিষ্ঠায় মাথা ঘামান। এটাই তাঁর প্রধান কীর্তি। ১৮৭৭ সনে, ডুয়ার্সের জলঢাকা অঞ্চলে একটি চা-বাগান প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিষয়ে বিশিষ্ট চা-শিল্পপতি বীরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ লিখেছিলেন।

1877 was a remarkable year for in this year the first Indian to take a leak was Munshi Rahim Baksh, who apparently utilising his position as Peshkar of the Deputy Commissioner induced the 'Saheb' to allow him a grant for the purpose of cultivation of tea and this was the Jaldhaka grant taken on 17.8.1877 to 728 acres.

(The development of the tea industry in the district of Jalpaiguri. : 1869—1968 : জলপাইগুড়ি জেলা শতবার্ষিকী গ্রন্থ)।

এরপর তাঁকে কেন্দ্র করে বাইরের ভাগ্যান্বেষী মুসলিমদের ঢল নেমে যায়। তিনি শহরের মুসলমান সমাজের প্রধান পৃষ্ঠপোষকে পরিণত হন। তাদের নিয়ে একের পর এক চা-বাগান জোতদারি

খুলতে বেশি দেরি হয়নি। প্রায় ৯০ বছর বয়সে প্রথম ভারতীয় চা-শিল্পপতি মুনসী রহিম বক্সের মৃত্যু হয়।

শ্রীনাথ হোড়

...১৯৩৯ সন। মাসটা বোধহয় জুন। ...জেলার প্রথম কৃষক সম্মেলন।... জেলা সম্মেলন হল ময়দানদীঘিতে। ...ময়দানদীঘি থেকে জলপাইগুড়ি ফিরে আসবার পর কমরেডরা সেখানে একটা জনসভা ডাকলেন। সে সভায় আমি বক্তৃতা করেছিলাম। কিন্তু তার বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, সে সভায় সভাপতিত্ব করলেন প্রয়াত শ্রীনাথ হোড় মশাই। তিনি বিকায় হোড়ের পিতা এবং রাজনীতিতে হিন্দু সভা-ঘেঁষা।'...

মুহম্মদ আবদুল্লাহ রসুলের স্মৃতিকণিকা থেকে উদ্ধৃত অংশের ভেতরে লেখা 'শ্রীনাথ হোড় মশাই'য়ের তৎকালীন 'হিন্দুসভা-ঘেঁষা'র চেহারাটা কেমন ছিল? মুকুলেশ সান্যাল মহাশয় জলপাইগুড়ি জেলার স্বাধীনতা আন্দোলন প্রসঙ্গে লিখেছেন... '১৯৪০-এ এই শহরে হিন্দু মহাসভা গঠিত হয়। এঁরা রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলেন। কম্যুনাল অ্যাওয়ার্ডের 'না গ্রহণ, না বর্জন' নীতিতে অনেকেই কংগ্রেসের প্রতি আস্থা হারায়। মুসলিম তোষণ নীতিতে অনেক কংগ্রেসি সেদিন প্রতিবাদ করেন এবং হিন্দু মহাসভার সমর্থক হন...... আবার অধুনা এটাও শোনা যায় যে, জেলার আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে হিন্দু বলে অভিহিত করার উদ্যোগ গ্রহণের জন্য হিন্দু মহাসভায় নাম লেখান, কেননা তাদের আশঙ্কা ছিল, হিন্দু জনসংখ্যা কম হয়ে গেল গোটা জলপাইগুড়িটাই পাকিস্তানে চলে যেতে পারে।

আসলে তিনি ছিলেন সেই সময়ের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব যে, কংগ্রেস থেকে হিন্দু-মহাসভা, আবার হিন্দু-মহাসভা থেকে কৃষক সভা যেতে কোথাও আটকায়নি। হয়তো সেটা পারিবারিক বিপ্লবী পরিমণ্ডলের এক বিশেষ প্রভাব ছিল। তাই অগ্নিযুগের সংগ্রামী নেতা বিজয় হোড়, পুত্র হিসেবে 'খুবই খুশি হলেন, পিতাকে তিনি এতদূর আনতে পেরেছেন...'

শ্রীনাথ হোড়ের জন্ম ১৮৮০ সনে, ঢাকার তৎকালীন মানিকগঞ্জ মহকুমার বড়ঙ্গাইল গ্রামে। পিতা নবীনচন্দ্র হোড়। যখন বছর দশেক, ওই গ্রামেরই মানুষ গোপালচন্দ্র ঘোষের হাত ধরে জলপাইগুড়ি আগমন। ভর্তি হলেন জেলা স্কুলে। প্রথমে বিজয় বোসের বাড়ির তারপর তারিণীপ্রসাদ রায়ের বাড়িতে থেকে পড়াশোনা শুরু হল। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র। মাত্র ১৫ বছর বয়সে এন্ট্রান্সে উত্তীর্ণ। জেলা শতবার্ষিকী গ্রন্থে অমিয়কুমার পাকড়াশী লিখেছেন... 'শ্রীনাথ হোড় মহাময়ের ছাত্র হিসাবে অদ্ভুত কৃতিত্বের কথা শোনা যায়, তিনি একই বৎসরে পরপর তিন শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন' এবং সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। প্রথম তিনি VIth Class হইতে Vth Class-এ ওঠেন। কিছুদিন পরেই তাঁহাকে IVth Class-এ Promotion দেওয়া হয়। কয়েক মাস পরে তাঁহাকে আরও উপরের শ্রেণীতে উঠাইয়া দিবার জন্য শ্রেণীশিক্ষক মহাশয়গণ প্রধানশিক্ষক মহাশয়কে অনুরোধ জানান। কিন্তু প্রধানশিক্ষক মহাশয় অস্বীকৃত হন। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই হোড় মহাশয়ের অধিগত বিদ্যা ও নৈপুণ্যের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে IIIrd Class-এ Promotion দেন'...

এরপর শ্রীহোড় কোচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজে অধ্যয়ন করেন। তখন অধ্যক্ষ ছিলেন আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। তারপর কোচবিহার 'ল' কলেজ থেকে উত্তীর্ণ হয়ে, ১৯০২ থেকে ১৯০৪-এর মধ্যে জলপাইগুড়ি কোর্টে আইন ব্যবসা শুরু করেন।

তখন জেলার চারিদিকে স্বাদেশিকতা অসহযোগ আর সত্যাগ্রহের হাওয়া। ফলে তিনি নির্লিপ্ত হয়ে থাকতে পারেননি। একটা সময় তাঁর সমাজপাড়ার বাড়িতেই গুপ্তসমিতির গোপন আস্তানা গড়ে উঠেছিল। কিন্তু কংগ্রেসেই তাঁর রাজনৈতিক জীবনের হাতেখড়ি। জনশ্রুতি এটাই যে, জলপাইগুড়ি জেলা কংগ্রেসের প্রথম সভাটি তাঁর সমাজপাড়ার বাড়িতেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কংগ্রেস-অন্তঃপ্রাণ, আবার আইন ব্যবসাতেও প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছেন, তাই জলপাইগুড়ি জিলা কংগ্রেসের নিজস্ব অফিসগৃহ নির্মাণের জন্য, বর্তমান কংগ্রেসপাড়ার একটি ভূখণ্ড নিজের টাকায় কিনে তারপর আবার এক টাকায় কংগ্রেসকে বিক্রয় করে দেন। যদিও সেই অফিস কংগ্রেস ধরে রাখতে পারেনি। ১৯৩০ সন থেকে শ্রীহোড় কয়েক বছর জলপাইগুড়ি জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে, তিনি রাজনীতি অপেক্ষা আইনবিশারদের ভূমিকায় যথেষ্ট সফল প্রতিপন্ন হয়েছেন। তখন দেওয়ানি মামলার যুগ। জমিদারি Intermediatory tenancy act এবং বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের মারপ্যাঁচে কোর্টে পা ফেলা দায়। আর এইসব মামলায়, মেধাবী এবং পরিশ্রমী হোড় মহাশয় এতটা সিদ্ধ হয়ে ওঠেন যে, সেই সময় জমিজমা মামলায় ৮০ শতাংশ মোকদ্দমায় যে কোনো এক পক্ষের 'ব্রিফ' তাঁর কাছেই থাকতো। আবার এই কোর্ট চত্বরে তিনি ইংরেজ-প্রশাসনের বিরোধিতা করে তিনমাসের জন্য বরখাস্ত হয়েছিলেন।

তখনকার স্বদেশি আবহাওয়া অনুযায়ী তিনি আইন ব্যবসা থেকে উদ্বৃত্ত অর্থ দিয়ে চা-বাগান তৈরিরও চেষ্টা করেছেন। সেই সময় কারা চা-বাগান তৈরিতে এগিয়ে এসেছিলেন, বীরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের মতে, শ্রীনাথ হোড় 'the third group of enterpreneur'-দের মধ্যে অন্যতম।

এই সমস্ত কাজের পাশাপাশি তিনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাতেও সুনাম অর্জন করেছিলেন এবং কিছু দুরারোগ্য রোগও তাঁর ঔষধে যথেষ্ট উপশম ঘটেছিল। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বোর্ডেও তাঁর একটি বিশেষ ভূমিকা লক্ষ করা গেছে। দীর্ঘদিন তিনি এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। জলপাইগুড়িতে water works নির্মাণের ক্ষেত্রে তিনি যথেষ্ট ভূমিকা নিয়েছিলেন। আবার ১৯৩৯-এ শহরে মুক্তি আন্দোলনে নিয়োজিত কর্মীদের ওপর পুলিশ যখন অত্যাচারের বন্যা বইয়ে দিচ্ছিল, তখন পৌরবোর্ড থেকে অন্য ব্যক্তিদের সঙ্গে পদত্যাগ করতে তাঁর কোনো দ্বিধা হয়নি। শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রেও তিনি সদর্থক ভূমিকা নিয়েছিলেন। ফণীন্দ্রদেব বিদ্যালয়, আনন্দচন্দ্র মহাবিদ্যালয় প্রভৃতি শিক্ষায়তনের পরিচালক-সভার সদস্য হিসেবে, এছাড়া সদর বালিকা বিদ্যালয়ের উচ্চতর বিভাগ নির্মাণের ক্ষেত্রে তিনি স্মরণযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন।

প্রয়াত বিপ্লবী বীরেন দত্ত, তাঁর স্মৃতি কথায় শ্রীনাথ হোড়ের পরিচয় সম্পর্কে যা বলেছেন, সেটাই যথার্থ।... বীরেন দত্ত বলেছেন... 'শ্রীনাথ হোড়...অন্নদাতা, দেশপ্রেমের একনিষ্ঠ সাধক, কংগ্রেসের স্তম্ভস্বরূপ ও পরবর্তীকালে গীতার শ্রেষ্ঠ সাধক, প্রখ্যাত আইনজীবী ও বিখ্যাত হোমিও চিকিৎসক...।'

এই সবগুলো পরিচয় নিয়েই শ্রীনাথ হোড় ১৯৬৮ সনে দেহত্যাগ করেন।

শচীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

সেটা ১৯৭১ সাল। একজন সরকারি চিকিৎসক, সরকারি নিয়মেই বর্তমান পোস্টিং কার্সিয়াং থেকে বদলি হয়ে জলপাইগুড়ি হাসপাতালে যোগদান করবার জন্য চিঠি এসেছে। খুবই সাধারণ ও স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু এই ডাক্তারবাবুটি এতটাই জনদরদী, সেবাপরায়ণ, সক্রিয় সমাজসেবী...সেই বদলির আদেশ প্রত্যাহার করবার জন্য অঞ্চলের পাঁচ হাজারের বেশি মানুষের স্বাক্ষরসহ দরখাস্ত সরকারি দপ্তরে জমা পড়ছিল...

আবার এই ডাক্তারবাবুই যখন ছাত্র ছিলেন, তখন একদিন শুধু রবীন্দ্রনাথের দর্শন পেতে আরও দু'জনকে সঙ্গে নিয়ে পায়ে হেঁটে জলপাইগুড়ি থেকে দার্জিলিং চলে গিয়েছিল...

এই ডাক্তারবাবুটির নাম, বলা বাহুল্য, শচীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। জন্ম জলপাইগুড়িতে ১৯১৩ সালের ২৪ অক্টোবর। পিতার নাম জিতেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। মায়ের নাম সুমতি দেবী। পরিবারে সচ্ছলতা নেই, কিন্তু স্বপ্ন দেখার সাহস আছে। শিক্ষা শুরু ফণীন্দ্রদেব বিদ্যালয়ে। ১৯৩০ সনে ম্যাট্রিক পাস করে, জলপাইগুড়িতে সদ্য স্থাপিত জ্যাকশন মেডিক্যাল স্কুল। তারপর বৃত্তি পেয়ে, একের পর এক ধাপ পেরিয়ে সারা বাংলায় প্রথম স্থান এবং স্বর্ণপদক। অত্যন্ত উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। কিন্তু আগে একটা ঘটনা ঘটে গেছে।

দেশ তখন পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত হবার জন্য সংগ্রামে অবতীর্ণ। বাংলা তার দিশারি। জলপাইগুড়ি পিছিয়ে নেই। তখন তিনি মাত্র নবম শ্রেণীর ছাত্র, কিন্তু প্রাপ্তমনস্ক চেতনা থাকলে যা হয়, তিনিও জড়িয়ে পড়লেন সংগ্রামে। সেই সময় চলছিল বিলাতি দ্রব্য বর্জনের আন্দোলন, ধূপগুড়ি হাটে চলছিল সত্যাগ্রহ। তিনি অংশগ্রহণ করতে চলে গেলেন। পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে, কিন্তু নাবালক প্রতিপন্ন হওয়ায় তিনি তাড়াতাড়ি মুক্তি পেয়ে যান। কিন্তু এই যে স্বদেশমুক্তির বীজমন্ত্র তাঁর ভেতরে প্রবেশ করল, সেটা সারাজীবন বয়ে নিয়ে চললেন।

ফলে চিকিৎসকের বৃত্তি গ্রহণ করে শুধুমাত্র গৃহস্থ জীবনযাপনের বদলে তিনি পাশাপাশি বেছে নিলেন এক দুরূহ পথ। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথ। একজন সাধারণ কংগ্রেস কর্মী হিসেবে তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু হল। এদিকে চাকরি সূত্রে ডুয়ার্সের বিভিন্ন চা-বাগানে থাকাকালীন তিনি পরিচিত হলেন শ্রমিকের বেঁচে থাকার লড়াই সম্পর্কে আমার পাশাপাশি মালিকপক্ষের বিভিন্ন ভিন্ন অত্যাচার শোষণ সম্পর্কেও সচেতন হলেন। তিনি বুঝলেন স্বদেশমুক্তির সঙ্গে সঙ্গে শোষণমুক্তির কাজটাও অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু কংগ্রেসে কি এ কাজ করা সম্ভব হবে? সমর্থন পাবেন না বুঝেই, তিনি কংগ্রেসের মধ্যেকার বামপন্থীদের নিয়ে গড়ে তুললেন বাম-সংহতি গোষ্ঠী। আহ্বায়ক তিনি নিজেই। অবস্থার পরিবর্তন হতে শুরু করল। পড়াশোনা এবং অভিজ্ঞতার ব্যাপ্তি বাড়তেই মার্কসবাদে দীক্ষিত হচ্ছেন অনেকেই। এঁদের সবাই বিশেষ, জলপাইগুড়ি জেলায় গড়ে তুললেন কংগ্রেস স্যোসালিস্ট পার্টি। তিনি সম্পাদক হলেন। তারপর ১৯৩৯ সন, জলপাইগুড়ি জেলায় গঠিত হল কম্যুনিস্ট পার্টি। কার্যকরী সম্পাদক হলেন তিনিই। প্রথম জেলা পার্টির তিনজন সদস্য... শচীন দাশগুপ্ত ছাড়া গুরুদাস রায় এবং বীরেন দত্ত। সোমনাথ লাহিড়ির উপস্থিতিতে, এই পার্টি গঠনের মধ্য দিয়ে হল এক নতুন অভিযাত্রা। পার্টি তখন বেআইনি। তিনি আত্মনিয়োগ করলেন জেলা কৃষক সমিতিকে শক্তিশালী করবার লক্ষ্যে। কেননা, কৃষকেরাই দেশের ভিত্তি। উঃ বঙ্গে আধিয়ার আন্দোলনকে অগ্র এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, তৎকালীন জোতদার, সরকার, রাষ্ট্র তথা পুলিশের সন্ত্রাসের মুখোমুখি, কখনো প্রকাশ্যে, কখনো আত্মগোপন করে সংগঠন পরিচালনা করতে লাগলেন। এর মধ্যে ১৯৪১ সালে তিনি বিয়ে করেছেন ব্রাহ্মসমাজের মহিলা কল্যাণী চন্দকে। কিছুদিন পর শুরু হলো লাগাতার গ্রেপ্তার আর গৃহবন্দী হয়ে থাকবার জীবন। তিনি আধিয়ারের লড়াইয়ের পাশাপাশি মনোনিবেশ করলেন চা আর রেলশ্রমিকদের রুটি-রুজি অধিকার রক্ষার সংগ্রামে।

১৯৪২ ॥ পার্টি তখন প্রকাশ্যে। দেশব্যাপী ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আন্দোলনে তিনি পুরোভাগে। মানবসৃষ্ট দুর্ভিক্ষ মন্বন্তরের বিরুদ্ধে লড়াইয়েও তিনি সবার সামনে।

১৯৪৩ ॥ প্রথম জেলা পার্টির সম্মেলন। তিনি সম্পাদক নির্বাচিত হলেন।

১৯৪৫ ॥ সাধারণ নির্বাচন। পার্টির মনোনীত প্রার্থী রাধারমণ বর্মণকে জয়যুক্ত করবার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়লেন। জয় যদিও হয়নি, কিন্তু পার্টির বক্তব্য জনগণের কাছে পৌঁছোবার লক্ষ্যে জয়ী হলেন। তারপরই শুরু হল বাংলায় গণ-আন্দোলনের ইতিহাসের এক রক্তরঙা অধ্যায়। তেভাগা আন্দোলন পার্টির নির্দেশিত পথে তিনি বোদা পচাগর দেবীগঞ্জ অঞ্চলে কখনো বা ডুর্য়াসের রেলজংশন, চা-বাগান অঞ্চলে, কখনো তাঁদের সঙ্গে সংগ্রামের কংগ্রেসের সাথী হিসেবে কখনো বা পরিচালক হিসেবে। বহু নিপীড়িতের লড়াই বহু শহিদের আত্মত্যাগ, তাঁর ছাত্রজীবনের স্বপ্নের সঙ্গে যেন মিলেমিশে একাকার।

১৯৪৭ ॥ দেশ স্বাধীন হল। কিন্তু গ্রেপ্তারি পরোয়ানা তাঁকে ছাড়লো না।

১৯৪৮ ॥ পার্টি আবার বেআইনি। আবার গ্রেপ্তার। আবার গৃহবন্দী। সেই অবস্থাতেই পিতা জিতেন্দ্রনাথের মৃত্যু।

১৯৫০ ॥ আবার গ্রেপ্তার। জেলে থাকতে থাকতেই তখনকার একমাত্র কন্যা জয়ার মৃত্যু।

১৯৫১ ॥ মুক্তি হল, সংগ্রামী জীবনের যেন একটা অধ্যায় শেষ হল।

১৯৫৩ ॥ সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর, কিন্তু জড়িয়ে পড়লেন অন্যান্য অনেক কাজে।

কখনো স্টুডেন্টস হেল্‌থ হোম সংগঠনের কাজ, কখনো শহিদ বীরেন দত্তগুপ্তর মূর্তি প্রতিষ্ঠার কাজ, কখনো তেভাগার শহিদ স্মৃতি রক্ষা কমিটির কাজ...তাঁর কাজ যেন আর শেষ হয় না, অবশ্য একজন স্বপ্নদ্রষ্টা, দৃঢ় অথচ কোমল, মানবিকগুণ সম্পন্ন, পরিশ্রমী মানুষের এটাই তো পরিণতি।

জলপাইগুড়ির এই মহান সন্তান ১৯৯০ সালের ১২ নভেম্বর, আমাদের জন্য অনেক স্বপ্ন রেখে পরপারে চলে গেছেন।

ডাঃ সুধীর বসু

স্বাধীনতা-পূর্ব জলপাইগুড়ি রংপুরে যে কয়েকজন শিক্ষিত চিকিৎসক, শহরের চিকিৎসার মান উন্নয়ন করতে এবং একই সঙ্গে নিজের কর্মক্ষেত্র হিসেব এই শহরকে বেছে নিয়েছিলেন, ডাঃ সুধীর বসু তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

বালক বয়সে পূর্ব বাংলার ফরিদপুরের এক গণ্ডগ্রাম থেকে লেখাপড়া শেখার জন্য চলে এলেন। তারপর স্থানীয় এক অর্থশালী ব্যক্তির বদান্যতায়, তাঁর বাড়িতে থেকেই পড়াশুনা শুরু করলেন। প্রাথমিক মাধ্যমিক লেখাপড়া ফণীন্দ্রদেব বিদ্যালয়ে। সেখান থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে চলে গেলেন কলকাতা। ভর্তি হলেন কারমাইকেল কলেজে চিকিৎসাবিদ্যা পড়তে।

তখন সময়টা ছিল ঝোড়ো হাওয়ার। স্বাদেশিকতার মন্ত্রে দীক্ষিত হচ্ছে বাংলার তরুণ দল। বিদ্যালয় থেকে মহাবিদ্যালয়... বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত ছাত্ররা মুক্তি সংগ্রামে উত্তাল। সেই হাওয়া সুধীর বসুর গায়েও লাগলো। তখন যে তিনজন চিকিৎসক ডাক্তারি পরীক্ষার শেষ ধাপ না দিয়ে বেরিয়ে এসেছিলেন সুধীর বসু তাঁদের অন্যতম। জলপাইগুড়িতে অন্য দু'জন ডাঃ ধীরাজমোহন সেন এবং ডাঃ চারুচন্দ্র সান্যাল।

তারপর সুধীর বসু চলে গেলেন মাদ্রাজে। সেখান থেকে ধাত্রীবিদ্যা বিশারদ হয়ে ফিরে এলেন। বলতে গেলে, তিনিই শহরের প্রথম গায়নোকোলজিস্ট (Gynaecologist)। এখনকার চিকিৎসা ব্যবস্থায় সন্তান জন্মের কার্যকলাপটাই ছিল হাতুড়েবিশেষজ্ঞ-নির্ভর, সন্তানের প্রসবটাই প্রধান, মায়ের স্বাস্থ্য নয়, পূর্বাপর চিকিৎসা নয়। ফলে শিশুমৃত্যু, প্রসূতির মৃত্যু যথেচ্ছ। কখনো কখনো হয়তো দক্ষতার প্রমাণ পাওয়া যায়, কিন্তু সেটা ছিল অভিজ্ঞতা-নির্ভর, বিজ্ঞান-নির্ভর নয়। আর কুসংস্কারের কু-আচারের প্রশ্ন তো আছেই। বড় শহরেই ছিল এরকম। জলপাইগুড়ির মতো আধা-গ্রাম আধা-শহরে ব্যবস্থাটা সহজেই অনুমেয়। এই প্রেক্ষাপটে ডাঃ সুধীর বসুর আবির্ভাব দেবতার আশীর্বাদের মতো। গ্রামগঞ্জ শহরের জননীরা সঠিক উপদেশ; সঠিক নির্দেশ, সঠিক চিকিৎসা পেতে লাগলেন। তখন চিকিৎসা ডাক্তারের চেম্বারের মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। রোগীর বাড়ি গিয়ে চিকিৎসা। ওষুধপথ্য খাওয়ানো থেকে ইনজেকশন দেয়া, সবই করতেন ডাক্তারবাবুরা। সুধীরবাবুও ছিলেন এই পথের পথিক। কিন্তু এতেও তিনি সন্তুষ্ট হলেন না। তাই আরো কয়েকজনের সহযোগিতায় তিনি গড়ে তুললেন জনকল্যাণ সেবা সমিতি। এই সমিতির সেবামূলক কাজ চলতে লাগলো। তারপর আরো সুষ্ঠুভাবে কাজ করবার জন্য তিনি একটি হাসপাতাল গড়ে তোলবার সিদ্ধান্ত নিলেন। শহরের অদূরে ডাঙ্গাপাড়ায় স্থানীয় বাচ্চা মিঞার কাছ থেকে একখণ্ড জমি কিনে ভবন নির্মাণ শুরু করলেন। প্রথমে আউটডোর, তারপর অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাযুক্ত ব্যবস্থাও চালু হল। মূলত মাতৃসদন, কিন্তু সাময়িকভাবে ব্যবস্থা হিসেবে অন্য চিকিৎসাও বজায় থাকলো। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে বেসরকারি প্রচেষ্টায় এরকম একটি চিকিৎসালয় গড়ে তোলবার নজির খুব কম, বিশেষত মফস্বল শহরে। নাম ছিল 'জনকল্যাণ হসপিটাল', কিন্তু লোকে জানতো 'সুধীর বসুর হাসপাতাল', একটা সময়ে অজস্র মানুষ এই হাসপাতাল থেকে উপকৃত হয়েছে।

আমাদের দুর্ভাগ্য, তাঁর মৃত্যুর পরে উপযুক্ত তদারকির অভাবে হাসপাতালটির অবলুপ্তি ঘটেছে।

সুনীতিবালা চন্দ

১৯৬৯ সনে জলপাইগুড়ি জেলা গঠিত হওয়ার সময়, এই অঞ্চলের শিক্ষাচিত্রটি কেমন ছিল? মূলত কৃষিনির্ভর এই জেলা। ১৮৭২ সালের সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী এই জেলায় মাত্র ১৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয়। ২৮৩ জন বালক এবং শিক্ষক সংখ্যা ২২। ছাত্রী নেই বললেই চলে। ১৮৭২ সনে জেলার লোকসংখ্যা ৩২৭৯৮৫ আর ওই বছরে জলপাইগুড়ি শহরের লোকসংখ্যা ৬২৮১। এরপর বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়লেও, নারীশিক্ষা কিছুমাত্র এগোয়নি। কেননা, তাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ গৃহেই সীমাবদ্ধ ছিল।



সুনীতিবালা চন্দ

সুনীতিবালা চন্দের কথায়...... 'স্ত্রীশিক্ষার প্রতি আগ্রহ, উৎসাহ ও উদ্যোগ বৃদ্ধি পেল— স্বর্গীয় জালান মিঞা নামধারী এক ব্রাহ্ম মুসলমানের আগমন এই কার্যে সহায়তা করল।...'

১৯০২ সন থেকে কুড়ির দশক পর্যন্ত নারীশিক্ষার চিত্র অল্পবিস্তর একই রকম। সেটা গতি পেল, যখন সুনীতিবালা চন্দ তাঁর স্বামী দেবেন চন্দকে সঙ্গী করে এই শহরে প্রবেশ করলেন এবং পূর্বতন জালান মিঞার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দায়িত্বভার হাতে নিলেন। সেটা ১৯২৫ সন। প্রাক্তন পৌরপতি অমিত সেনের কথায়...'শিক্ষিকা সংক্রান্ত ব্যাপারে কাগজে বিজ্ঞাপন দেয়ার পর সুনীতিবালা চন্দ ও তাঁর স্বামী এখানে আসেন এবং বিদ্যালয়টি দেখে তাঁদের ভালো লেগে যায়।'...

তিনি উচ্চশিক্ষিতা, তদুপরি ঢাকার মেয়ে। পড়াশোনা করেছেন কলকাতার বিখ্যাত ডায়োসেশন কলেজে এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। M.A. ডিগ্রি পেয়ে গেছেন এবং সরস্বতী উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। এককথায় উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। অথচ তিনি দক্ষিণবঙ্গ ছেড়ে দিয়ে, এক ডাকে উত্তরবঙ্গ তথা জলপাইগুড়িতে চলে এলেন কিসের টানে?

সুনীতিবালা চন্দের লেখা থেকেই উদ্ধৃত করছি।...'স্ত্রী-শিক্ষার আবশ্যকতা বোধ হয় কাহাকেও যুক্তি-তর্কের দ্বারা বুঝাইয়া দিতে হইবে না। অধুনা প্রচলিত স্ত্রী-শিক্ষা ভারতের স্ত্রী-জাতির উপযোগী কিনা সে সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন হইতে পারে। বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির সংস্কারসাধন অনেকের নিকট যুক্তিযুক্ত বোধ হইতে পারে। কিন্তু শিক্ষার দ্বার উদঘাটিত করিতে হইবে। এদেশে স্ত্রী-লোকদিগের দুরবস্থা দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। অন্ধকার শবাগার সমান অন্তঃপুরে যেমন আলোকের পথ রুদ্ধ থাকে, তাহাদের মনও তেমনি অজ্ঞান ও কুসংস্কারের অন্ধকারে আবৃত থাকে। দেশের সঙ্গে তাহাদের কোনো সম্পর্ক নাই। সেই অজ্ঞান ও কুসংস্কারের আবাসস্থান আমাদের অন্তঃপুরে যাহাতে বিদ্যার আলোক প্রবেশ করিতে পারে, তাহা না হইলে কখনই মঙ্গল নাই।'...

এই বোধ যাঁর, তাঁর পক্ষে আর শহর-গ্রামের ভেদাভেদ সম্ভব নয়। এই মঙ্গলবোধ শুভবোধে অনুপ্রাণিত হয়েই তিনি নদীর পারের

চালাঘরটিকে সারা জীবনের কর্মক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিলেন। এই বিদ্যালয় থেকেই জেলা তথা উত্তরবঙ্গে নারীশিক্ষার জয়যাত্রা শুরু হলো। সাদা ফুলহাতা ব্লাউজ, সাদা কালো-পাড় শাড়ি, মাথায় একরাশ কালো চুল...এই তাঁর প্রতিদিনের চেহারা। সাধারণ অথচ অসম্ভব ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, সেদিনের সেই রক্ষণশীল সমাজে ছাত্রী ও শিক্ষার শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বিদ্যালয়কে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া কথার কথা নয়। তবে এ ব্যাপারে তাঁর স্বামী দেবেন চন্দের সাহায্য সহযোগিতা না পেলে অনেক কষ্টকর হতো। শিক্ষিকা জোগাড়ের ভারটা স্বামীই কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। তিনি আবার ক্লাসে ইংরেজিও পড়াতেন।

ফণীন্দ্রদেব বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক সুবোধ মিত্র বলেছেন...'নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে সামাজিক জড়তা অপসারণের ক্ষেত্রে এঁর অবদান শিক্ষিত মানুষের কাছে চিরদিন অবিস্মরণীয়। শিক্ষা প্রসারে বিদেশি শাসকদের অনীহা, শিক্ষাব্যবস্থায় মুষ্টিমেয়র মধ্যে শিক্ষাকে সীমাবদ্ধ রাখা—এগুলোর বিরুদ্ধে এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ হল এই বিদ্যালয়। এমন এক সামাজিক প্রয়োজনীয়তার কথা মনে রেখেই সুনীতিবালা চন্দ যাত্রা শুরু করেছিলেন যখন জাতীয় স্বাধীনতা ও শিক্ষার আন্দোলনে সবে দেশ উত্তাল। নিরক্ষরতার অন্ধ কুসংস্কার, অবৈজ্ঞানিক চিন্তা এগুলিকে পেছনে ঠেলে দিয়ে সর্বজনীন শিক্ষার দাবিতে মানুষ উদ্বেলিত। জলপাইগুড়ি তথা গোটা উত্তরবঙ্গই ছিল বরাবরই শিক্ষার ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ। ১৯৫৪ সালে শিক্ষকরা শিক্ষা প্রসার আন্দোলনে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করেন। এতে বিরাট আন্দোলন সংগঠিত হয়। সেই সময় দেখেছি যে সরাসরি আন্দোলনে অংশগ্রহণ না করেই সুনীতিবালা দেবী তাঁর সমর্থনকে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। পরামর্শ দিয়েছেন, উৎসাহিত করেছেন। এছাড়াও ডেকে আমাদের সঙ্গে কথা বলেছেন। ১৯৫৮-র কিছু পরে জলপাইগুড়ির বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে ঘুরে তিনি নিজে আমাকে নিয়ে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে যোগাযোগ করেছেন। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সেই অঞ্চলে নারীশিক্ষার ব্যাপারে ও তার প্রসারে অনুসন্ধান চালিয়েছেন।'...

এই উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায়, তিনি শুধু বিদ্যালয়ের চৌহদ্দিতেই সীমাবদ্ধ ছিলেন না, তিনি সমাজের অন্য অংশের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ ছিল। বিভিন্ন সদর্থক আন্দোলনের শুভাশুভ নিয়ে তাঁর বিশেষ চিন্তা ছিল। এই চিন্তার ভেতর গা বাঁচিয়ে চলার অভিপ্রায় ছিল না। কৃতী ছাত্রী প্রতিমা ঘোষের কথায়,.'শহরে জনকল্যাণমূলক কাজের সঙ্গে বড়দিদিমণির যোগ ছিল। ১৯৪৬-এর শেষদিকে দেখেছি কংগ্রেসকর্মী বেলা দাশগুপ্তের সঙ্গে চাঁদা সংগ্রহে তিনি পায়ে হেঁটে চলেছেন।'... তাই জলপাইগুড়ি জেলার রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনে নারীদের ভূমিকা পর্যালোচনা করতে গিয়ে 'বড়দিদিমণি' সুনীতিবালা চন্দের ছাত্রী এবং বামপন্থী বহু সংগ্রামের নেত্রী কল্যাণী দাশগুপ্তা লিখেছেন...'এবারে আন্দোলনের আর একটি ধারার পটোত্তলন করা যাক। প্রথমেই স্মরণ করি সুনীতিবালা চন্দকে। শহরের নারী জাগরণ ও স্ত্রীশিক্ষার জননীস্বরূপা, নিখিল ভারত মহিলা সমিতির সদস্যা, '৬২ সালে রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত উত্তরবাংলার প্রাচীনতম বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষিকা, এমন কি কমিউনিস্ট বলে অভিহিত মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি ও পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতির অন্যতমা প্রধান আশীর্বাদিকা যাঁকে আমরা সবাই বলি বড়দিদিমণি'...

২৩ এপ্রিল, ১৯৮২ সনে কলকাতায়, প্রায় চুরাশি বছর বয়সে জলপাইগুড়ি জেলার নারীশিক্ষার 'মা টেরিজা'র জীবনাবসান হয়।

সরোজেন্দ্রদেব রায়কত

জলপাইগুড়ি বিখ্যাত রায়কত পরিবারের 'রাজা' জগদিন্দ্রদেবের কনিষ্ঠ পুত্র। জলপাইগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গের শাস্ত্রীয় সঙ্গীতচর্চার পুরোধা পুরুষ। সুধীর মজুমদার, নারায়ণ রাও যোশী, গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী, ওস্তাদ মালামত হোসেন খাঁ, ওস্তাদ নাজম আলি খাঁ, বিষ্ণুপুর ঘরানার গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ মহান সঙ্গীত-শিল্পীদের সাহিত্যিক পরিমণ্ডলে বড় হওয়া মানুষ তিনি। ফলে সঙ্গীত তাঁর রক্তের মধ্যে মিশে গিয়েছিল। ফলে ভারতের বিভিন্ন সম্মেলনে গেয়ে বেড়াতে তিনি ছিলেন একজন পরিচিত মুখ। দু'টি ব্যাপারে তাঁর 'প্রথম' হবার কৃতিত্ব তিনি দাবি করতে পারেন। প্রথম কৃতিত্ব, উত্তরবঙ্গে পাঁচটি জেলার মধ্যে তিনিই প্রথম গান রেকর্ড করা শিল্পী আর দ্বিতীয় কৃতিত্ব, তিনি গান্ধীজি এবং রবীন্দ্রনাথকে গান শুনিয়েছিলেন। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য এটাই যে, তিনি এরকম কালোয়তি ঘরানার মধ্যে থেকেও প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। সঙ্গীতরসিক, একদা গণনাট্যের অন্যতম কাণ্ডারি তাঁর এক রচনায় লিখেছেন...'এ সময়ে সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক নিয়ে আমরা শহরে নরেশ চক্রবর্তী, সুবোধ সেনদের সঙ্গে কথা বলতাম। বঙ্গ-বিহার একীকরণ করার প্রস্তাব এলে যে আন্দোলন হয় তাতে গণনাট্য দোলের গানে এক নতুন বক্তব্য হাজির করে। দোলে গান বেঁধে শহর টহল দেবার রীতি আর্যনাট্য সমাজ শুরু করে। তাতে ওঁরা যোগ দিতেন, যোগ দিতেন সরোজেন্দ্রদেব রায়কতের মতো সঙ্গীতজ্ঞরাও। গণনাট্য শুরু করে রাজনৈতিক দোলের গান। স্বয়ং সরোজদার বাসায় গিয়ে আমরা গাইলে তিনি জড়িয়ে ধরেছিলেন।'...

এই জড়িয়ে ধরাটা নিছক সৌজন্য নয়, আত্মিক। ফলে পরিতোষ দত্তর কথায়...'ইতিমধ্যে আমরা দুজন শাস্ত্রীয় সঙ্গীতজ্ঞকে নিয়ে অনুষ্ঠান করেছি। ওস্তাদ বিষ্ণু দিগম্বর পালুশকর ও ওস্তাদ ফয়েজ খাঁর উপর। প্রথমটির সভাপতিত্ব করেন মান্য সঙ্গীতজ্ঞ কংগ্রেসের সরোজেন্দ্রদেব রায়কত।'... এই একই কারণে ১৯৬১ সনে সরকারি রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উৎসব কমিটির সমান্তরাল বেসরকারি কমিটির সভাপতিমণ্ডলীতে সরোজেন্দ্রদেব রায়কতের থাকতে কোনো অসুবিধা হয়নি।

চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ সঙ্গীতচর্চা নয়, মানুষে মানুষে যোগ, বিশ্ব সঙ্গে যোগ...এই দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন সরোজেন্দ্রদেব রায়কত। এই দায়িত্ববোধেই, শহরের, জেলার ছেলেমেয়েদের সঙ্গীতচর্চায় উৎসাহ দেবার জন্য আর্যনাট্য সমাজ যে সঙ্গীত প্রতিযোগিতার আয়োজন করতো, সেখানে সরোজেন্দ্রদেব রায়কত বিচারকের আসন গ্রহণ করে প্রতিযোগিতায় সম্মান বৃদ্ধি করতেন।

১৯৬২ সনে সরোজেন্দ্রদেব রায়কত দেহত্যাগ করেন।

সতীশচন্দ্র লাহিড়ী

একজন ব্যক্তি, যিনি একাধারে শিক্ষানুরাগী, দানবীর, ত্যাগী, স্বাধীনতা সংগ্রামী, চা-শিল্প পরিচালক, কৃষক-দরদী এবং কবিরাজ, তিনি জলপাইগুড়ির স্বনামধন্য সতীশচন্দ্র লাহিড়ী।

বিখ্যাত চিকিৎসক এবং বর্তমান বিধানসভা সদস্য, অনুপম সেন তাঁর একটি লেখায় বলেছেন... 'কবিরাজদের মধ্যে নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠতম ছিলেন সতীশচন্দ্র লাহিড়ী মশাই, লাহিড়ী মশাইকে তো লোকে সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী বলতেন। জলপাইগুড়িতে তাঁর অবদানও প্রচুর। তাঁর বহু ছাত্র আজও চিকিৎসা করে চলেছেন।'...

লাহিড়ী মশাই পাবনা জেলার লোক। থাকতেন কলকাতায়। স্বাধীনতা সংগ্রামী জ্যোতিশচন্দ্র সান্যাল মহাশয় কবিরাজী চিকিৎসা চালানোর জন্য জলপাইগুড়ি নিয়ে এলেন। অত্যন্ত পরিশ্রমী, সাহসী কবিরাজের বিপ্লবী হতে বেশি সময় লাগলো না। কেননা, সে সময়টা ছিল স্বদেশি আন্দোলনের গৌরবজনক অধ্যায়। ফলে স্বাদেশিকতার যে-বীজ তাঁর চেতনার ভেতরে ঢুকে গেল, সেটাই তাঁর মূল জীবন-নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করেছে।

১৯৩০ সনে আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে গ্রেপ্তার হলেন। এই বছরটা তাঁর জীবনে গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৩০ সনেই তিনি জেলা কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হলেন, সঙ্গী শ্রীনাথ হোড়। ১৯৩০ সনে জলপাইগুড়ি শহরের বর্ধন প্রাঙ্গণে প্রথম বারোয়ারি দুর্গাপুজার ব্যবস্থা হলো। তিনি প্রধান উদ্যোক্তা, এ পুজার বৈশিষ্ট্য এ কারণেই যে, কুসংস্কারমুক্ত লাহিড়ী মশাই অব্রাহ্মণ পুরোহিত দিয়ে পুজো করিয়ে অস্পৃশ্যতা-বিরোধী আন্দোলনে এক নতুন মাত্রা যোগ করেন। সেই পুজোয় হরিজন বস্তির বাসিন্দাদের ছিল অবারিত দ্বার।

১৯৩৯ সালের জুলাই মাসে জেলায় প্রথম কৃষক সম্মেলন হল। গরিব কৃষক আধিয়ার, দিনমজুরদের আন্দোলন নিয়ে জেলা তোলপাড়। তিনি সেই সম্মেলনের সভাপতিমণ্ডলীর অন্যতম নির্বাচিত হলেন।

কৃষক নেতা প্রয়াত মাধব দত্ত লিখেছেন...'১৯৪০-এ...শহরে কমঃ শচীনবাবু ও নরেশ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে বেশ কিছুসংখ্যক ছাত্র মধ্যবিত্ত কৃষক ও কয়েকজন ডাক্তার আমাদিগের কৃষক আন্দোলনের সক্রিয় সমর্থক হইয়া শহরে প্রভাবশালী শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। বৃদ্ধ সতীশ লাহিড়ী মহাশয়ের বাহিরের ঘরে জেলা কৃষকসভা অফিস বেশ জমিয়া ওঠে ও গ্রামের কৃষকদিগের যোগাযোগের কেন্দ্র হইয়া ওঠে...।' এরপর সেই বিখ্যাত ১৯৪২-এর ভারত-ছাড় আন্দোলন। গ্রেপ্তার হলেন। জেল থেকে বেরিয়ে ১৯৪৫ সনে লাহিড়ী মহাশয়ের বাসায় প্রথম ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রতিষ্ঠা করলেন। তিনিই হলেন প্রধান সভাপতি। এটা তাঁর মোটামুটি সংক্ষিপ্ত রাজনৈতিক জীবন। এর মাঝখানে জ্যোতিশচন্দ্র সান্যালের মৃত্যুর পর 'জনমত' পত্রিকাও সম্পাদনা করেছেন। চা-বাগান প্রতিষ্ঠাতেও তিনি কৃতকার্য হয়েছিলেন। অনেক বাধার সম্মুখীন হয়েও পিছপা হননি। বীরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, চা-শিল্পের ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন... 'Duars was then terribly plagned by malaria, which took a conciderable toll every year. Drinking water was scarce, only a few hill streams being available for the supply. Ferocies denizens of the forest wrought havoc in the garden. Roads were few. Thus not only money but many lives had to be sacrificed to bring the tea industry in the Duars to its success....' এরকম দুর্বিষহ পরিস্থিতিতে সতীশচন্দ্র লাহিড়ী মশাইরা চা-বাগান প্রতিষ্ঠার কাজ করেছেন। বীরেন্দ্রচন্দ্র লিখেছেন... 'risked their lives to secure lands for the tea Estates'.... শিক্ষা বিস্তারেও তাঁর দান উল্লেখযোগ্য। দেবনগর তাঁর নামাঙ্কিত মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং কুমুদিনী বালিকা বিদ্যালয় তাঁরই দানে প্রতিষ্ঠিত। এছাড়া আজাদ হিন্দ পাঠাগার, নেতাজি প্রতিমূর্তি স্থাপনে তাঁর অবদান স্মরণযোগ্য।

সুবোধ সেন

একজন সত্যিকারের কমিউনিস্ট, সাচ্চা কমিউনিস্ট, ধীর-স্থির চিন্তাশীল কমিউনিস্ট, নীতিবোধ ও মানবতাবোধসম্পন্ন কমিউনিস্ট, 'প্রখর রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন, দূরদর্শী, নিরহংকার ও এক আত্মপ্রচারবিমুখ কমিউনিস্ট...এতগুলো বিশেষণ যাঁর নামের সঙ্গে এক নিশ্বাসে জুড়ে দেয়া যায়, তিনি সুবোধ সেন, একজন বড়ো মাপের মানুষ। যদি 'কমিউনিস্ট' কথাটাকে বাদ দিয়ে শুধু একজন বড়ো মাপের নেতার কথা ভাবি, তাহলেও সুবোধ সেনের কথাই মনে হবে। মনে পড়বে, জেলায় জেলায় দ্রুত রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের কথা ভাবলে, মনে পড়বে সাম্প্রদায়িকতাবাদ আর বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গিয়ে, মনে পড়বে শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলন সংগঠিত করতে গিয়ে, মনে পড়বে ডুয়ার্সের চা-বাগানে ট্রেড ইউনিয়নের গতিপ্রকৃতি অনুধাবন করতে গিয়ে, কিংবা কখনো ভাষা-উপভাষা বিভাগের প্রশ্নে, মনে পড়বে গণতান্ত্রিক চেতনার মূল স্রোতে মানুষকে যুক্ত করার প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে। লেখক ডস্টারভস্কিনে যেমন বলা হয় 'লেখকদের লেখক', তেমনি সুবোধ সেনকেও সেভাবে বলা যায় 'কমিউনিস্টদের কমিউনিস্ট'। অথচ কি সহজ, সাধারণ, অনাড়ম্বর মানুষ, বোঝাই যায় না তাঁর ভেতরে জেলা থেকে রাজ্য, রাজ্য থেকে দেশ, দেশ থেকে মহাদেশ... সব মিলিয়ে এক মহাজগৎ তৈরি করে চলেছেন। একবার রুশ বুদ্ধিজীবীকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, বলুন তো, what is socialism? বুদ্ধিজীবী উত্তর দিয়েছিলেন 'socialism means normal life.' মনে হয়, এই উত্তর রুশ বুদ্ধিজীবী দেননি, সুবোধ সেন দিয়েছিলেন।

সুবোধ সেনের জন্ম ১৯১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে, অধুনা বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলায়। পিতা নীরদবরণ সেন এবং মাতা লাবণ্যবালা সেন। পিতা ছিলেন আইনজীবী এবং স্বাধীনতা সংগ্রামী ফলে পিতার আদর্শই তাঁর ভেতরে সঞ্চারিত হয়। শিক্ষারম্ভ জলপাইগুড়ি জেলা স্কুলে। সেখান থেকে ম্যাট্রিক পাস করে কলকাতার রিপন কলেজ থেকে I.A. পাস করেন। সেখান থেকে আবার আদি নিবাস ফরিদপুরে। সেখানকার রাজেন্দ্র কলেজে ভর্তি হয়ে B.A. পড়তে থাকেন এবং সেখানেই ছাত্র রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে নিজেকে আদর্শপরায়ণ করে তোলেন। এরপর B.A. পাস করে আবার কলকাতায়। সেখানেই সক্রিয় বামপন্থী রাজনীতির হাতেখড়ি। সম্ভবত সেটা ১৯৩৯ সাল, পার্টির কর্মী হয়ে, শিবপুরের ঘিঞ্জি চটকল-বস্তিতে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের কাজ শুরু করলেন। তখন খুবই কঠোর জীবনযাপন। বন্ধু অসিত সেনের কথায়......'সারাদিনে ওদের খোরাকি ছিল এক আনার মতন। সেই সামান্য পয়সায় তারা রুটি ও সিককাবাব খেয়ে দিন কাটাত।'... এরপর ভুল মতাদর্শের ভিত্তিতে পার্টি থেকে বেরিয়ে যখন লেবার পার্টি গঠিত হয়, সুবোধ সেন সেখানে যোগ দেন। তার কিছু পরেই তিনি ভুল স্বীকার করে কমিউনিস্ট পার্টিতে ফিরে আসেন। ১৯৪২ সালে তিনি ফিরে এলেন জলপাইগুড়ি। তারপর কিছুদিনের জন্য মাদ্রাজে চলে গেলেন চাকরি

নিয়ে। সেখানেও ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের কাজ, চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে এলেন। কিছুদিন এক চা-কোম্পানিতে কাজ। তারপর সব ছেড়ে দিয়ে পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হয়ে গেলেন। প্রথমে কৃষকের আধিয়ার বর্গাদার তেভাগার আন্দোলন, তারপর তিনি চা-বাগিচা এলাকায় শ্রমিক সংগঠন গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। এই ডুয়ার্সের চা-বাগানই শেষে তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের কর্মক্ষেত্র হয়ে উঠল। ১৯৪৮ সালে পার্টি বেআইনি হল। নরেশ চক্রবর্তী, চারু মজুমদার, শচীন দাশগুপ্ত গ্রেপ্তার হলেন। অন্তরীণ করা হল আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে। ১৯৫১ সালে মুক্তি পেলেন। তিনি আবার নবোদ্যমে পার্টির কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। প্রয়াত রণজিত দাশগুপ্ত, কম্যুনিস্টকর্মী এবং গবেষক, স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে লিখেছেন...'সুবোধদা জলপাইগুড়ি জেলায় কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত নানাবিধ আন্দোলন, সংগ্রাম ও তৎপরতায় অন্যতম প্রবীণ নেতা ও সংগঠক ছিলেন। ১৯৫৪ সালে কমঃ গুলুকান্ত রায়ের উপনির্বাচন, ওই বছরেই মাধ্যমিক শিক্ষক আন্দোলন, ১৯৫৫ সাল চা-শ্রমিকদের বোনাস ধর্মঘট, ১৯৫৪-তে বেলাকোবায় এবং ১৯৫৬ সালে গায়রকাটায় জেলা কৃষক সমিতির সম্মেলনের খুঁটিনাটি কাজ, পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি কৃষক উচ্ছেদ-বিরোধী কার্যক্রম, ওই একই সময়ে এবং তারপরেও নতুন পর্যায়ে তেভাগা আন্দোলন, পরবর্তীকালে মাসজমি দখল ও বণ্টনের সংগ্রাম, ১৯৫৬ তে বঙ্গ-বিহার সংযুক্তি-বিরোধী আন্দোলন, বন্যাত্রাণ সংক্রান্ত তৎপরতা—এসব নানাবিধ কাজের পরিকল্পনা, পরিচালনা ও সংগঠনের পুরোভাগে ছিলেন তিনি।'...

১৯৫০-এর দশকে রাজ্য বিধান পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৮০ সালে লোকসভায় নির্বাচিত...তারপর আর দাঁড়াননি। এরপর একটু একটু করে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর স্বপ্ন ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের মঞ্চ, সেটা গঠিত হল, ১৯৬৫ সালে চা-শিল্পের শ্রমিক-কর্মচারীদের যুক্ত সমন্বয় কমিটির গঠনের মাধ্যমে। তিনি চেয়েছেন, সেই মঞ্চকে চা-শ্রমিকের অঙ্গন থেকে নগরে-বন্দরে খেতেখামারে কারখানায় ছড়িয়ে দিতে। জেলার সৌভাগ্য, এরকম 'একনিষ্ঠ ও আনুগত্যের' প্রতীক নেতাকে আমরা পেয়েছিলাম।

১৯৮৯ সালের ৭ অক্টোবর, জলপাইগুড়িতেই তাঁর জীবনাবসান হয়।

সুরজিত বসু

এই শহরে যেন কয়েকজন সুরজিত বসু। আমরা কোন্ সুরজিত বসুকে মনে রাখব? একজন, যিনি সরকারি অফিসের সাধারণ কেরানি, যাঁর 'সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু তলস্তয় ও দস্তয়েভস্কি'। একজন, যিনি সমরেশ বসু বিরচিত 'বিবর'-এর পূর্বসূরি উপন্যাস 'আতামসী'র লেখক, নাকি একজন, যিনি প্রথাভঙ্গকারী চারটি জাপানি 'নো' নাটকের অনুবাদক!

কেউ তাঁকে চেনেন, বন্ধুমহলে উদাসীন...'নিখুঁত ও দরাজ গলায় গাওয়া রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়ক' হিসেব... কেউ বা চেনেন, বৃহৎ যৌথ পরিবারের একজন বিশাল হৃদয়ের অধিকারী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হিসেবে...।

সব মিলিয়েই তিনি, সুরজিত বসু, 'বাচ্চুদা' নামে যিনি সমধিক পরিচিত। তিনি কবি, শিল্পী, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার এবং প্রবন্ধ লেখক। এই শহরের, একটা যুগের সাংস্কৃতিক অভিভাবকদের মধ্যে অন্যতম ব্যক্তিত্ব। তিনি জন্মেছিলেন ১৯২৯ সালে অবিভক্ত বাংলার সৈয়দপুর শহরে। জমিদারি, ঐতিহ্যবাহী বংশ। পিতা গিরীন্দ্রলাল বসু। অবস্থান্তরে পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি জলপাইগুড়ি শহরে চলে আসেন। ছয় ভাই, চার বোন। অল্প বয়সে, পিতার মৃত্যুর পর তাঁর কাঁধেই সংসারের প্রধান দায়িত্ব। সাংসারিক বাধায় উচ্চতর শিক্ষা নিতে পারেননি। সুরজিত দাশগুপ্ত লিখেছেন...'কোনো সাবানে কারখানায় কেমিক্যাল্স গোলানোর কাজ দিয়ে তার জীবন শুরু, তারপর সিনেমার পোস্টার আঁকা...সবশেষে সরকারি চাকরি। কিন্তু পিতা গিরীন্দ্রলালের যেমন ছিল কবি-শিল্পীর মন, তেমনি সেই রক্ত তার ভেতরে যেন প্রবল হয়ে উঠল। প্রয়াত অধ্যাপক শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কথায়,...'এরই ফলশ্রুতি 'ছেকমারীর বাবুজোত'। এমন ঐতিহাসিক নিষ্ঠা, এমন বস্তুবোধ, এমন প্রত্যক্ষতা বাংলা সাহিত্যের ক'টি গল্পে আছে তা হিসাব করে বলা যায়।...'

...'এরপর একটানা বিশ-পঁচিশ বছর নন্দনতত্ত্বের নানা শাখায় মৌলিক রচনার অসংখ্য পত্রপুষ্প বিস্তার। পুরোগামী জীবনের মিছিলে পথ চলা। কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে সুর। দেশ ও মানুষকে দু'হাত জড়িয়ে অফুরন্ত উষ্ণ ভালোবাসা। আর...'সাম্যবাদী দর্শনকেই নিজের জীবনের দিগদর্শন' হিসেবে বাঁচিয়ে রাখা। তাই যখন আদর্শ আর নীতির সঙ্কট, তখন তার বিশ্বাস ছিল...'একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে, কারণ ডায়ালেকটিক্সে কোনো ভুল নেই, আর দ্বন্দ্ব, সংশয় সংগ্রামের অমসৃণ পথ ধরে শুভবুদ্ধির ক্ষীণ আলোয় নবচেতনার দ্বারে পৌঁছনো নিয়মের অঙ্গ।'... আর তার আদিবাসী চা-শ্রমিকদের আন্দোলনে সঙ্গ দিতে তার দ্বিধা হয়নি।

এই শহরে অনেকেই দেখেছেন রিক্শায় একজন দীর্ঘকায় পুরুষ, রিক্শার হুড় না তুলে ছাতা খুলে যাচ্ছেন...শুধুমাত্র মাথা হেঁট করবেন না বলে। মাথা উঁচু না করে চলতে পারতেন না। এটা ছিল জীবনচর্চার অঙ্গ। শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে একবার বলেছিলেন...'সাংবাদিকতার হাত থেকে, সব জাতের স্কিমের হাত থেকে সাহিত্যকে মুক্ত করতেই হবে। আমরা যারা মফস্বলে থাকি তাদের কতটুকুই বা ক্ষমতা? তবু সম্মিলিত চেষ্টা নিয়ে বর্তমানের এই ভয়ঙ্কর প্রবণতাকে রুখতে হবে। কেননা লেখকের মতো স্বাধীন সংসারে আর কেই বা আছেন?'... এই স্বাধীনচেতা মানুষটি সম্পর্কে মন্তব্য...'যোগ্যতা ও দক্ষতা প্রশ্নাতীত ছিল। উপন্যাসের ব্যর্থ নায়কের মতো ছিল তাঁর জীবন। কত কিছু হতে পারতেন তিনি, কিন্তু তেমন কিছু হল না। তাঁর জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার ঝুলি পরিপূর্ণ ছিল। দু-হাতে লিখতে চেয়েছিলেন তিনি, কিন্তু কালান্তক এক রোগ তাঁকে শেষের দিকে একদিনের জন্যও স্বস্তিতে থাকতে দেয়নি।...'

একটি কাব্যগ্রন্থ, পাঁচ-ছটি উপন্যাস, ন'টি নাটক আর কিছু ছোটগল্পের লেখক ১৯৮৩ সালে, জলপাইগুড়ি শহরে শেষ নিশ্বাস করেন।

সত্যেন রায়

'তোমরা হলেন দ্যাশের নেতা গান্ধী অবতার
তোমাক্ বুঝায় বড় ভার
তোমরা ডাইলে ভাতে নিজে খান
হামাক্ উপাস করি কন
খাবার চালে সেলায় দিছেন
তোমরা নাঠির গুতা...'

কিংবা

'বাবু তোমাক দেছি নমস্কার
তোমরা হলেন দ্যাশের নেতা গান্ধী অবতার
গদি আঁটা খরৎবসি কিবা কল্লেন কাম
ঐ বেলাতেই হয়া গেল হের হিন্দু পাকিস্তান...'

দুটি নয় একটিই গান। যিনি গানটির লেখক, তিনিই গায়ক। এমন অজস্র গানের জন্ম দিয়েছেন যিনি, তিনি একজন নিছক গীতিকার নন, তিনি লোকশিল্পী, লোককবি, কিংবা স্বদেশি মুকুন্দ দাসের মতো একজন অনন্য চারণকবি। এই জলপাইগুড়ি তথা উত্তরবাংলার মাঠেঘাটে ময়দানে জলসায় এই গান যাঁরা শুনেছেন, তাঁরাই জানেন, জনগণ উন্মাদনা কাকে বলে। শ্রোতার নাড়ীর সঙ্গে তাল মিলিয়ে শিল্পীর অন্তরের যথার্থ অভিব্যক্তি তিনি যেভাবে পরিবেশন করতেন, তার তুলনা বেশি ছিল না। সবাই সারা বছর উৎসুক হয়ে থাকতো তাঁর গান শোনাবার জন্য। তিনি শুধু গায়ক নন, সাহিত্যিকও বলা যায়। শিল্পের সব শাখায় যেন অবাধ বিচরণ।

পঞ্চাশ দশকের শেষে, কলকাতায় মহম্মদ আলি পার্কে, বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে, ভাওয়াইয়া সঙ্গীত পরিবেশনের পর তিনিই হয়ে ওঠেন জনতার প্রধান নায়ক। আবার এই গ্রামীণ ভাওয়াইয়া থেকে শহর-বন্দরের জনশিল্পী হতে আর অনায়াস উত্তরণে একটু বাধেনি। ভেতরের সদর্থক রাজনীতিবোধই তাঁকে এই পথ দেখিয়েছিল।

শিল্পীর নাম সত্যেন রায়। জন্ম বঙ্গাব্দ ১৩২৫ সালের ১৮ কার্তিক, কোচবিহার জেলার কোনাপাড়া গ্রামে। বাবার নাম নিত্যানন্দ রায়। সাধারণ জোতদার। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সত্যেন রায়ের শিক্ষারম্ভ জলপাইগুড়ি শহরে। ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাস করে উচ্চশিক্ষার জন্য রঙপুর কলেজে...কিন্তু অবস্থান্তরে পড়াশোনা অসমাপ্ত রেখে ফিরে আসতে হল। সরকারি দপ্তরে চাকরি গ্রহণ করলেন।

তার গলায় সুর লেগেছিল ছোটবেলাতেই, জন্মস্থান কোচবিহারের কোনাপাড়া গ্রামে। গ্রামীণ ভূমিজ শিল্পীদের গাওয়া গানই তিনি গলায় তুলে নিয়েছিলেন। কিন্তু উপযুক্ত গুরুত্ব দিয়ে সঙ্গীতসাধনার সময়, তিনি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের চর্চাও বহাল রেখেছেন। সেই যুগ ক্যাসেট-যুগ নয়। গান ছিল মুখে মুখে, পড়ায় পাড়ায়, জলসায় আর সঙ্গীত সম্মেলনে। তখন সুস্থ রুচির উত্থান-আন্দোলন চলছে। কিন্তু তিনি আরো বৃহত্তর লক্ষ্যে, জড়িয়ে পড়লেন নবগঠিত গণনাট্য সংঘের সঙ্গে। সেটা চল্লিশের দশক। সম্পর্কের রুটি-রুজির লড়াই, অধিকার রক্ষার লড়াই, দাবি আদায়ের লড়াই, সবই যেন নানা বেশে উঠে এল গানে। তিনি প্রায় দাপিয়ে বেড়াতে লাগলেন সারা উত্তরবঙ্গ তথা সারা বাংলায়। হয়তো দায়বদ্ধ শিল্পী হিসেবে এই ছিল তাঁর প্রচ্ছন্ন অভিপ্রায়মাত্র।

আসলে গণনাট্য তাঁর মনপ্রাণ হয়ে উঠেছিল। তাই সরকারি কর্মচারী হয়েও সংঘাতের পথ থেকে পিছিয়ে আসেননি। এখানে তাঁর সঙ্গী ছিলেন রাধানাথ দাস, তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পরিতোষ দত্ত। ফলে জমে উঠল দল। তিনি লোকসংস্কৃতির আধারে রচনা করলেন কিছু নৃত্যনাট্য। ব্যঙ্গগীতি গীতিনাট্য ইত্যাদি, যেগুলি সে আমলে যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিল। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উৎসবের সময়, রবীন্দ্রনাথের 'সভ্যতার সঙ্কট' প্রবন্ধকে নৃত্যনাট্যে রূপান্তরিত করার কৃতিত্ব তাঁরই। সত্যেন রায়ের কীর্তির মধ্যে দু'টি উল্লেখ করতেই হয়। ১৯৪২ সনে তিনি 'যন্ত্রী সংঘ' নামে একটি সংগীত শিক্ষার প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। ভাওয়াইয়া সঙ্গীত শিক্ষাই ছিল মূল উদ্দেশ্য। আরেকটি কীর্তি, জলপাইগুড়ি জেলায় ছায়ানাট্যের প্রবর্তন। এই অভিনব মাধ্যমটি নিয়ে সৃষ্টির আরেক মাত্রাকে ধরতে চেয়েছিলেন।

তাঁর গানে মুগ্ধ হয়নি কে, সাধারণ শ্রোতা ছাড়াও প্রখ্যাত সংগীতবিদগণ, যেমন রবিশংকর, উদয়শংকর, নির্মলেন্দু চৌধুরী, পূর্ণদাস বাউল প্রমুখ। তাঁরই নির্দেশনা সংগঠনায় গ্রাম্য মহিলাদের নিয়ে অনুষ্ঠান সকলেরই বাহবা পেয়েছিল।

তিনি সম্মান পেয়েছেন আকাদেমি অফ ফোকলোর/উত্তরবঙ্গ লোকসংগীত পরিষদ ইত্যাদি সংগঠন থেকে।

বঙ্গাব্দ ১৩৮৪ সনের ১ বৈশাখ, এই স্বনামধন্য শিল্পীর জীবনাবসান ঘটে।

ডাঃ সরোজিত বাগ্‌চী

জলপাইগুড়ির বিখ্যাত বাগচী বাড়ির সন্তান। একজন চিকিৎসক। শুধু চিকিৎসাতেই তিনি ব্যস্ত থাকতে পারতেন। তার বদলে, শিশু-কিশোরদের নিয়ে এমন একটি সংস্থা গড়ে তুললেন, যার নজির বাংলার কম শহরেই আছে। সংস্থার নাম 'ডানপিটেদের আসর'। সম্ভবত ষাট দশকের গোড়ায় বা পঞ্চাশের থেকে এর সৃষ্টি। ছোটদের মানসিক বিকাশ বুদ্ধিবৃত্তিকে মনে রেখে শহরে শহরে পাড়ায় পাড়ায় আসর গঠন করে, ছোটদের দিয়ে মানসিক স্ফূর্তির কাজ করিয়ে তিনি এক অনন্য নজির গড়ে তুলেছিলেন। একটা সময় ছিল 'ডানপিটেদের আসরে'র অন্য কোনো বিকল্প ছিল না। একটা পত্রিকা ছিল ছোটদের, সেখানে 'রত্নাকর' ছদ্মনাম নিয়ে উপস্থিত থাকতেন সরোজিত বাগ্‌চী মহাশয়। কিন্তু সেখানে ছোটরা লিখত, ছোটরা প্রুফ দেখতো ছোটরাই কখনো সম্পাদনা করতো। প্রতিবছর সদস্যদের নিয়ে 'ডানপিটেদের আসর'-এর শিক্ষামূলক ভ্রমণ শহরের ভেতরে আলোড়ন তুলতো। এইসব কর্মকাণ্ডের পিছনে একজনই, তিনি ডাঃ সরোজিতবাবু। পরবর্তী সময়ে আঞ্চলিক আসরটি 'নিখিল ভারত ডানপিটেদের আসর'-এর রূপ পেয়েছিল।

ডাঃ সরোজিত বাগ্‌চীর জন্ম ১৯১০ সালের এপ্রিল মাসে। পিতা সঞ্জীব বাগচী। আদি নিবাস—দিনাজপুর (বর্তমান বাংলাদেশ)।

উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'নিজে বাঁচাও গ্রামকে বাঁচাও'। এই বইটির জন্য তিনি রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেয়েছিলেন।

১৯৯৫ সনের জুলাই মাসে, 'রত্নাকর' তথা ডাঃ সরোজিত বাগ্‌চীর জীবনাবসান হয়।

সত্যেন্দ্রপ্রসাদ রায়

জলপাইগুড়ি শহরের বিখ্যাত রায় পরিবারের সুযোগ্য সন্তান সত্যেন্দ্রপ্রসাদ রায় সম্পর্কে কিছু লেখায় আগে, তাঁর পিতা তারিণীপ্রসাদ রায় সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। ১৮৭৮ সালের কিছু পরে তিনি ঢাকা থেকে উকিল হয়ে এই শহরে আগমন করেন। উদ্দেশ্য আইন ব্যবসা। সেই সময়টা ছিল শহর তথা জেলা জলপাইগুড়ি গঠনপর্ব, উত্থানের সময়। তিনিও উদ্যোগী, কর্মযোগী পুরুষ, ফলে শহরের জনজীবনের ঢেউয়ে নিজেকে ভাসিয়ে দিতে দেরি করেননি। কি রাজনৈতিক, কি সাংস্কৃতিক কিংবা অর্থনৈতিক, সমস্ত পিছনে তিনি প্রথম সারিতে। ১৯০৭ সালে শহরে জাতীয় বিদ্যালয় গঠনে, ১৯২১ সনে জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি হিসাবে, ১৯২৫ সনে শহরে মহাত্মা গান্ধীর সফর উপলক্ষে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে, ১৯৩৪ সনে বিহার-বাংলা ভূমিকম্পে

ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য গঠিত সেবাসমিতির সভাপতি হিসেবে, তিনি সবগুলো ভূমিকাতেই সঠিক দায়িত্ব পালন করেছেন। এটা তাঁর একরকম ভূমিকা, আরেকটি ভূমিকা পথিকৃৎ চা-কর হিসাবে। জলপাইগুড়ির চা-শিল্পে সম্পর্কে মানস দাশগুপ্তর লেখায় আছে... 'এই তারিণীপ্রসাদ রায় ছিলেন অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। আইন পড়েছিলেন কোচবিহারে। প্রথম জীবনে অনেক কষ্ট স্বীকার করেছিলেন। চা-সম্বন্ধে তার জ্ঞান ছিল অত্যন্ত উঁচু দরের। গোপালচন্দ্র ঘোষ (বীরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের পিতামহ) প্রতিভাবলে তারিণীপ্রসাদকে সাদরে কাছে টেনে নিলেন।'...


সত্যেন্দ্রপ্রসাদ রায়

শুরু হল জলপাইগুড়ির চা-শিল্পের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল অধ্যায়। এই পিতারই পুত্র সত্যেন্দ্রনাথের জবানীতেই শুনুন '...জলপাইগুড়ি শহরে কতিপয় দুঃসাহসী বাঙালি ইংরেজি চা-করদের সঙ্গে বাগান খোলার ব্যাপারে প্রতিকূল অবস্থা অগ্রাহ্য করে, প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হন এবং ১৮৭৯ সাল থেকে বাগান খোলা শুরু করেন। যে কতিপয় বাঙালি এই দুঃসাহসিক কাজে ব্রতী হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে আমায় স্বর্গীর পিতা তারিণীপ্রসাদ রায় অন্যতম।...'

১৯৪৮ সনে তারিণীপ্রসাদ রায়ের মৃত্যু হয়।

এই তারিণীপ্রসাদ রায়ের সুযোগ্য পুত্র সত্যেন্দ্রপ্রসাদের জন্ম হয় ১৯০৫ সনে এই শহরেই। উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণের পর, পিতার উদ্যোগে সংগঠিত চা-বাগানে প্রবেশ করেন এবং ধীরে ধীরে সেগুলিকে সম্প্রসারিত করেন। তার পাশে পাশে নতুন নতুন চা-বাগানও অধিগ্রহণ করেন। ক্রমশ তিনি এক প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিতে পরিণত হন। কিন্তু পিতার আদর্শের প্রতি অবিচল থেকে, তাঁর পরিবারের উপার্জিত অর্থের অনেকটাই ব্যবহার হয় জনহিতকর কার্যে। চা-শিল্পের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠানগুলোতে মর্যাদাসম্পন্ন পদগুলি অলঙ্কৃত করা ছাড়াও, জেলায় ক্রীড়া ও শিক্ষা প্রসারে এবং শহর উন্নয়নে সবচেয়ে বেশি সময় তিনি ব্যয় করেছেন। নিজেও দীর্ঘদিন খেলাধূলা করেছেন এবং উপযুক্ত সময়ে জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন খেলাধূলার আয়োজন সংগঠিত করে স্মরণীয় হয়ে আছেন। জেলার প্রাথমিক পরিকাঠামো গঠন ছিল তাঁর আজীবনের স্বপ্ন। তাই একটা সময় খেলাধূলার আসর মানেই এস পি রায় আর এস পি রায় মানেই মুশকিল আসান...এমন একটা যাদুকরী শব্দবন্ধ গড়ে উঠেছিল। খেলাধূলার প্রতি এই ভালোবাসা, সেটা শহরের প্রাণাধিক টাউন ক্লাবই হোক, বা বানারহাট হাই স্কুলের মাঠই হোক কিংবা কলকাতায় ইস্টবেঙ্গল অথবা জেলা ক্রীড়াসংস্থার ব্যাপারই হোক, তিনি সর্বদা নেতৃত্বে। আজকের জেলার ক্রীড়া সংগঠনগুলির প্রসারে, প্রতিষ্ঠার পেছনে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা প্রণিধানযোগ্য।

শিক্ষার ব্যাপারেও সত্যেন্দ্রপ্রসাদ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন। পলিটেকনিক, নিজিনিয়ারিং কলেজ থেকে সদর বালিকা বিদ্যালয়, এছাড়া ডুয়ার্সে চা-বাগানের বিভিন্ন অঞ্চলে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ব্যাপারে তিনি প্রধান উদ্যোগী। এছাড়া অভাবী, মেধাবী শরনার্থী যুবকদের আশ্রয়স্থল হিসেবে পরিবারের উদ্যোগকে মদত দিয়েছেন এবং এর জন্যে তহবিল সৃষ্টি করে সকলের সাধুবাদ অর্জন করেছিলেন। প্রতিবেশী শহরগুলোতেও তিনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ার ব্যাপারে এগিয়ে এসেছিলেন। এছাড়াও স্টেডিয়াম, রবীন্দ্রভবন নির্মাণে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

তৎকালীন রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে কংগ্রেস দলের চা-বাগিচা মালিকদের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তিনি তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে, ১৯৫২ থেকে ১৯৭০ কংগ্রেসি রাজনীতিক হিসেবে, রাজ্যসভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৮৭ সালের ৭ ডিসেম্বর সত্যেন্দ্রপ্রসাদ রায়ের জীবনাবসান হয়।

কারাবরণে স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব

চন্দ্রদীপ কুলদীপ

একজন নয়, দুজন......দুটি নাম, দুটি নাম যেন আলিপুরদুয়ার মহকুমার ইতিহাসে...রূপকথার দুটি পৃষ্ঠা। এখানকার মানুষ নন। উত্তরপ্রদেশ থেকে আগত এই দুই তরুণ...গান্ধিজীর স্বদেশী মন্ত্র প্রচারে নিবেদিত প্রাণ। ১৯১৯-২০ সময়ের মহকুমার সমাজজীবনে এক অভাবনীয় ঘটনা, ..."পরনে খদ্দরের সাত হাত ধুতি, গায়ে খদ্দরের পাঞ্জাবী, মাথায় গান্ধী টুপি...। ঘুমাত কখন, খেত কখন? কেউ জানে না, সর্বক্ষণ চরৈবেতি চরৈবেতি, চন্দ্রদীপ চলছে ভল্কা অঞ্চলের সীমাহীন অরণ্যের মধ্য দিয়ে, বাঘ ভালুক হাতিকে উপেক্ষা করে। ...কুলদীপ চলছে রায়ডাক নদী সাঁতরে (অনিল গঙ্গোপাধ্যায় জেলা শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ)।"...দুজন এরকমই আকর্ষণীয় চরিত্র। চোস্ত হিন্দি, উর্দু.....এমনকি বাংলাতেও ভালো বক্তৃতা দিতে পারতেন। সম্ভবত উত্তরবঙ্গে এরাই প্রথম...ডুয়ার্সের গ্রামে গ্রামে 'গান্ধীপূজা' চালু করেছিলেন। গান্ধিজির স্বদেশীমন্ত্র মননে আচ্ছন্ন এরকম চরিত্র কোথাও খুব বেশি নেই।

দেবেন দাস

জাতিতে রাভা সম্প্রদায়ের মানুষ। মহকুমার কুমারগ্রামদুয়ার অঞ্চলের বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী। তিনি ছিলেন সাংস্কৃতিক কর্মী এবং শিক্ষাব্রতী। কেউ তাকে মনে রেখেছেন, ১৯৪২-এর আন্দোলনে......আলিপুরদুয়ার থানা অভিমুখী দল হাজার মানুষের মিছিলে সামনের সারির একজন দৃপ্ত কর্মী হিসেবে। কেউ মনে রেখেছেন ভবিষ্যৎ মানুষ গড়ার কাজের একজন মানবতাবাদী সংগঠক হিসেবে। কেউ বা তাঁকে জনজাতির সম্মানিত প্রতিনিধি হিসেবে অভিহিত করেছেন। সব মিলিয়ে তিনি, দারিদ্রের ভেতরে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা একজন আদর্শ মানুষ।

পি এল ম্যাকউইলিয়ম

ম্যাকউইলিয়ম সাহেব। স্কটল্যান্ডের অধিবাসী, অক্সফোর্ডে লেখাপড়া। ১৯৩৪-৩৫ সালে আলিপুরদুয়ারে এসেছিলেন মহকুমা শাসক হিসেবে। দ্বিতীয়বার ১৯৩৬ থেকে ১৯৩৮। এরপর সেবার

কমিশনার হিসেব অবসর গ্রহণ করে পূর্ব আফ্রিকায় চলে যান। এই মহকুমা শহরে থাকাকালীন, এই শহরের ভালোমন্দের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন। তিনি এই শহরের মানুষের প্রতি কতটা সহৃদয় ছিলেন তার একটা উল্লেখ করছি।......"১৯৪২-এর ভারত ছাড় আন্দোলনের অন্যতম সেনানী নলিনী পাকড়াশী সে বছরের অক্টোবর মাসে ধরা পড়ার পর তাঁর ওপর অন্তরীন থাকার আদেশ জারী হয়। সেই আদেশ লঙ্ঘনের দায় নলিনী পাকড়াশীর পুত্র অমিয়বাবুর ওপরও পড়ে। তাঁকেও এক বছরের জন্য গৃহে অন্তরীন থাকার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। তবে তদানীন্তন বিভাগীয় ডেপুটি কমিশনার পি এন ম্যাকউইলিয়মের চেষ্টায় সেই আদেশ কিছুটা শিথিল হয়েছিল। ফলে কলেজে উপস্থিত হওয়ার জন্য তিনি প্রতিদিন কোচবিহারে যাওয়ার অনুমতি পেয়েছিলেন (সম্পাদক, দাবী পত্রিকা, ১৯৯৩)। ......" এর সঙ্গে আরেক বিষয়ও উল্লেখ করতে হয়, নলিনী পাকড়াশী যখন অন্তরীন ছিলেন তখন তাঁর ছেলের স্কুল-কলেজের মাইনে ম্যাকউইলিয়ম সাহেবই নাকি দিয়ে দিতেন। কথিত আছে, আজকের আধুনিক আলিপুরদুয়ার শহর পরিকল্পনায় তাঁর একটি বিশেষ প্রভাব ছিল। এই শহরে তাঁর নামে 'ম্যাকউইলিয়াম হাইস্কুল' এবং অধুনালুপ্ত ম্যাকউইলিয়ম ইনস্‌টিটিউট (বর্তমানে মায়া টকিজ) স্মৃতির চিহ্নস্বরূপ।

প্রাণবল্লভ ব্রজবাসী

কবিগান থেকে ভাওয়াইয়া...নিবারণ পণ্ডিত থেকে গণসঙ্গীত...সব পথেই যিনি সিদ্ধহস্ত শিল্পী, তিনি চারণকবি প্রাণবল্লভ। নেশা সঙ্গীত, অন্য পেশা ছিল গাছকাটা। ডুয়ার্সের গ্রামে গ্রামে তিনি 'ঘ্যাচাং বৈরাগী নামেই সমধিক পরিচিত' (বক্সাবাজার, ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৪)।

জন্ম নোয়াখালিতে। নানা ঘাটের জল খেয়ে কামাখ্যাগুড়িতে এসে ডেরা বাঁধলেন। শয়ে শয়ে গান লিখেছেন, সুর দিয়েছেন আবার গ্রামে গ্রামে ঘুরে গান গেয়েছেন প্রচুর মানুষের সামনে। একটা বিশেষ সময়ে, অসমে, ত্রিপুরায় মার্কসবাদী নেতা প্রমোদ দাশগুপ্তের সফরসঙ্গী হয়ে জনসভায় গান গেয়েছেন। তাঁর আরেকটা নাম কিভাবে 'ঘ্যাচাং বৈরাগী' হল? কেউ বলেন, কোনো ভাওয়াইয়া গানের একটি পদ......'নাকটা মোর ঘ্যাচাং করি কাটি দিল' থেকেই তাঁর নাম পাল্টে গিয়েছিল। কেউ বলেন, মগডালে বসে গাছ কাটতেন বলেই তাঁর নাম এমন হয়েছিল। কেননা তিনি গাছ কাঠুরে হিসেবে প্রায় হাজারের মতো গাছ কেটেছিলেন। শেষ সময়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্বীকৃতিস্বরূপ বসবাসের জন্য কিছুটা জমি দান করেছিলেন।

রসিকলাল গঙ্গোপাধ্যায়

বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী। সফল আইনজীবী এবং একজন উদার শিক্ষক। 'স্বাধীনতা সংগ্রামে আলিপুরদুয়ার' প্রসঙ্গে লিখিত আছে...... "শ্রীরসিকলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সমগ্র মহকুমায় ইংরেজের খাজনা বন্ধ আন্দোলন এক তীব্র আকার ধারণ করে......।" শ্রীগঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়িকে কেন্দ্র করেই সে যুগে আলিপুরদুয়ারের কংগ্রেসী আন্দোলন গড়ে ওঠে। এদেশীয় কবি নীলকণ্ঠ রায়ের একটি কবিতা থেকে বোঝা যায় :

রসিকবাবুর বাসার সামনে কংগ্রেসের মিটিং বান্ধা,
ইংরেজ সাহেব হোচট্ খান চক্ষুতে খান ধান্ধা।......
(অনিল গঙ্গোপাধ্যায়, জেলা শতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ, পৃঃ ৩৩৭)

তিনি কেমন শিক্ষানুরাগী ছিলেন, সেটা ওই স্মারকগ্রন্থের একটি লেখা থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায়। 'জলপাইগুড়ি জেলার শিক্ষাবিস্তারের রূপরেখা' প্রসঙ্গে লেখা হয়েছে...... "আজ প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পরে ভাবিতেও বিস্ময় বোধ হয় যে, আলিপুরদুয়ারের প্রসিদ্ধ অ্যাডভোকেট শ্রী রসিকলাল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় এই বিদ্যালয়ের (আলিপুরদুয়ার উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়) প্রথম প্রধান শিক্ষক হিসাবে বেত্র হস্তে বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলারক্ষার ভার লইয়াছিলেন। অবশ্য তাঁহাকে এই 'গাধা মানুষ করা' বোঝায় বেশীদিন নিযুক্ত থাকিতে হয় নাই এবং খুব অল্প দিনই তিনি এ দায়িত্ব পালন করেন। অবশ্য এ প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে তিনি এজন্য কোন পারিশ্রমিকও গ্রহণ করেন নাই। (অমিয়কুমার পাকড়াশী, জেলা শতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ, পৃঃ ১৭৩)। শহরের বিদগ্ধ অভিভাবক হিসেবে আজও তিনি স্মরণীয়।

পোয়াতু দাস (রায়)

পরাধীন ভারতবর্ষে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামের ইতিহাসে শাসকশ্রেণীর বেয়নেটের সামনে বুক পেতে দেওয়ার যে গল্পগাথা প্রচলিত আছে তার মধ্যে আমরা গর্ব বোধ করতে পারি...... কুমারগ্রামদুয়ারের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। স্থানীয় জনজাতির মানুষ পোয়াতু সেই গল্পের এক উজ্জ্বল চরিত্র। ১৯৪২-এর আন্দোলন প্রসঙ্গে লেখা আছে...... "টেলিগ্রাফ লাইন বিচ্ছিন্ন। ইংরেজ সরকারের হেড অফিস আলিপুরদুয়ার কোর্ট থেকে সংবাদ এসে পৌঁছায়নি তখনো। থানার আর্মড গার্ডরা রাইফেল নিয়ে এসে তাক্ করে দাঁড়াল। গুলি ভরে নিল রাইফেল-এ ; কয়েকবার খট্‌খট্ শব্দ হোলো মাত্র। অবিরাম গুরুম্-গুরুম্ শব্দের জন্য তারা ছিল প্রতীক্ষারত......পোয়াতু দাস। ৬৫ বছরের বৃদ্ধ বীর পোয়াতু দাস এসে রাইফেলের সামনে বুক পেতে দাঁড়াল —করেন ক্যানে গুলি, মুই দেখিম ইংরেজের কয়টা গুলি আছে; বন্দুক কেন ছোঁড়েন না?" .....(অনিল গঙ্গোপাধ্যায়, জেলা শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ, পৃঃ ৩৪২)।

আবার ১৯৯৫ সনে কুমারগ্রাম থানার ইতিহাস প্রসঙ্গে লেখা হয়েছে... "১৯৪২-এর আন্দোলনের চূড়ান্ত সন্ধিক্ষণে এই থানার দখল নেয় কুমারগ্রামের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা......কর্মরত দারোগাবাবু মিছিলের অগ্রভাগে থাকা পোয়াতু রায়ের সামনে এগিয়ে এলে পোয়াতু সগর্বে বলে ওঠেন—'মারো, দেখং তোমার বন্দুক আগও যায়, না হামার তরোবারী আগৎ যায়।' বেগতিক বুঝতে পেরে দারোগাবাবু আত্মসমর্পণ করে হাতের বন্দুক মাটিতে রেখে দেন। অবশেষে তরতর করে ইউনিয়ন জ্যাক নেমে এলে বিপ্লবীরা জয়োল্লাস মেতে ওঠেন। সে এক অবিশ্বাস্য মুহূর্ত অবিশ্বাস্য অধ্যায়......।" (শান্তনু লাহিড়ী, কিরাতভূমি, জেলা ১২৫ বর্ষপূর্তি সংখ্যা, পৃঃ ৬২৬)।

পদবিতে অমিল কিন্তু ব্যক্তি একই, পোয়াতু। দু-জনের পরিবেশনায় অমিল কিন্তু পরিপ্রেক্ষিত সঠিক। পোয়াতু, বীর সৈনিক আজও সাহসিকতার জন্য বিপ্লবী কর্মীদের কাছে আদর্শ।

নীলকান্ত মুখোপাধ্যায়

বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী এবং ক্রীড়ানুরাগী, শহরে শিক্ষাপ্রসারে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয়। বর্তমান ম্যাকউইলিয়ম স্কুল এবং আলিপুরদুয়ার কলেজ স্থাপনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। এরকম লিখিত আছে...... "১৯৫৭ সনে আলিপুরদুয়ার কলেজ এই জেলার কলেজীয় শিক্ষা ব্যবস্থার আসরে নিজের স্থান বাছিয়া লয়। এই মহাবিদ্যালয় স্থাপনার ব্যাপারে আলিপুরদুয়ার ম্যাকউইলিয়ম স্কুলের প্রধান শিক্ষক নীলকান্ত মুখোপাধ্যায়ের অবদান স্মরণীয়। তিনি এই কলেজের জন্য প্রায় ৫০ (পঞ্চাশ) বিঘা জমি বিনামূল্যে সংগ্রহ করিয়া দেন (অমিয়কুমার পাকড়াশী, জেলা শতবার্ষিক স্মারকগ্রন্থ, পৃঃ ১৮৬)।

তিনি রাজনীতিতে সরাসরি যুক্ত ছিলেন না। তবে বামপন্থী রাজনীতির প্রতি প্রচ্ছন্ন সমর্থন ছিল। শোনা যায়, মুজফ্ফর আহমেদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।

হেদায়েৎ আলি খান

জলপাইগুড়ি জেলার পশ্চিমাঞ্চল (Western Zones)-এর একটি অঞ্চল ভল্‌কাদুয়ার পরিবর্তিত হয়ে আলিপুরদুয়ার হল যাঁর নামে, তিনি কর্নেল হেদায়েৎ আলি খান। 'কিরাতভূমি' ১২৫ বর্ষপূর্তি জেলা সংকলনে গবেষক স্বাতী দাস ও অধ্যাপক ডঃ শৈলেন দেবনাথ লিখেছেন..."বিহারের দানাপুরের অধিবাসী হেদায়েৎ আলি খান, যিনি দ্বিতীয় ইংরেজ ভুটান যুদ্ধে ইংরেজদের কর্নেল ছিলেন। এই কর্নেল হেদায়েৎ আলির নামের ভল্‌কাদুয়ারের নাম আলিপুরদুয়ার করা হয়, ১৮৬৫-৬৬ সালের কথা। ভল্‌কাদুয়ার মুছে গেল প্রশাসনিক ইতিহাস থেকে।" (পৃঃ ৭১৮)।

১৯১১ সনে প্রকাশিত E. F. Gruning লেখায় উল্লেখ পাই... "Mr Donough (F. A. Donough, Assistant Commissioner) then went to Buxa as civil officer and was succeeded in 1867 by Colonel Hedayet Ali Khan... (পৃঃ ২৫)। একই বইয়েরই ১৪৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে......'Alipurduar is named after the late Colonel Hedayet Ali Khan, who did good service in the Bhutan war and was the first Extra Asstt. Commissioner to be stationed there... (দ্রষ্টব্য : Eastern Bengal and Assam District Gazetteers : Jalpaiguri)।

জেলা শতবার্ষিকী গ্রন্থে উল্লেখ আছে...'The place Alipurduar was named after Colonel Hedayet Ali who was a political connected with the Indo-Bhutan War of 1865...(Sri Aswini Kumar Sen, Western Duars—Past & Present, পৃঃ ৫২)।

মোট কথা, তিনি যে ব্রিটিশ সরকারের বিশেষ আস্থাভাজন রাজকর্মচারী ছিলেন, একথা বলা বাহুল্য। এটাও বলা যেতে পারে, ওই অঞ্চলগুলির গঠন-পরিকল্পনা এবং পরিমার্জনায় তাঁর একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল। বিশেষ ক্ষমতাশীল হওয়ায় প্রচুর ভূসম্পত্তি তিনি করায়ত্ত করেছিলেন। জলপাইগুড়ি শহরেও তার কিছু জমিজমা ছিল। চারুচন্দ্র সান্যালের লেখায় উল্লেখ পাই......"১৯১১-১২ সনে তিস্তার ধারে কর্নেল হেদায়েৎ আলীর বাসায় স্কুলটি উঠে গেল; বড়ো মাঠ। কর্নেল সাহেবের একটা বড়ো খড়ের ঘর ছিল আর মাঠের ভেতরে একটা টিনের ঘর তোলা হলো।......এখানে স্কুল (জিলা) চলতে থাকল আর কর্নেল সাহেবের হাতার এক ধারে স্কুলের দালান উঠতে থাকে (জেলা শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ, পৃঃ ৮৬)...।"

মঘা দেওয়ানী

১৯৪২-এর 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের অভিঘাতে অবিভক্ত বাংলার যে কয়টি থানা সংগ্রামী-তীব্রতার তুঙ্গে উঠেছিল, তার মধ্যে অন্যতম কুমারগ্রামদুয়ার থানা, আর সেই আন্দোলনে বীজ রোপিত হয়েছিল প্রায় ২০ বছর আগে। সেই সংগ্রামী ঐতিহ্যের বাহকের নাম মঘা দেওয়ানী। তাঁরই বলিষ্ঠ নেতৃত্বে জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে কুমারগ্রামদুয়ার একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে নিয়েছে।

১৯২০-২১ সালের কথা। তখন ইংরেজ সরকার বিরোধী খাজনা বন্ধ আন্দোলন ছড়িয়ে ছিটিয়ে হচ্ছিল এবং তার প্রভাবও পড়ছিল চারদিকে। মঘা দেওয়ানীর কৃতিত্ব, তিনি সেই খাজনা বন্ধ আন্দোলনকে আরও এগিয়ে নিয়ে গিয়ে, সংগঠিতভাবে তাকে 'হাটবন্ধ' আন্দোলনে রূপান্তরিত করেছিলেন। তার পেছনে তখন ইংরেজ শাসনে অত্যাচারিত, শোষিত মানুষদের মিছিল। স্বদেশীমন্ত্রে মুক্তিদীক্ষায় তারা তখন উত্তাল উদ্দাম। ফলে সরকারের বিষনজরে পড়তে তার আর দেরি হল না। রাজদ্রোহের অপরাধে গ্রেপ্তার হলেন। আর তারপরই আরেক অধ্যায়। জাতিধর্মনির্বিশেষে জনতার স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভে, প্রবল চাপে...অবিলম্বে ইংরেজরা এই জনপ্রিয় নেতাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হলেন। এই মুক্তি যেন আলিপুরদুয়ারের রাজনৈতিক জীবনে এক যাদুকাঠির ভূমিকা পালন করেছিল। রণক্ষেত্র আরও বিস্তৃত, ব্যাপক হল। মঘা দেওয়ানীর সংগ্রাম তখন কুমারগ্রামদুয়ারের গ্রামীণ অঞ্চল থেকে সমগ্র আলিপুর মহকুমার। ১৯৪২-এ এসে সেই সংগ্রামের বিস্ফোরণ ঘটল। যদিও সেই শীর্ষ আন্দোলন ঘটবার আগেই মঘা দেওয়ানীর জীবনাবসান ঘটেছিল।

নলিনীকুমার পাকড়াশী

কখনো অভিহিত তিনি নলিনী ঠাকুর নামে, কখনো বা তারকাটা ঠাকুর, কখনো বা ভুটান গান্ধী.....মতান্তরে ডুয়ার্স গান্ধী...এমনই রোমাঞ্চকর বর্ণাঢ্য চরিত্রের অধিকারী নলিনী পাকড়াশী। অথচ তাঁর পুঁজি ছিল সামান্য, গান্ধীজি তথা কংগ্রেসের বাণী প্রচার আর অদম্য সাহস এবং দ্বিধাহীন আপসহীন পরিশ্রম ক্ষমতা।

১৯২০-২১ সনে সক্রিয় সংঘাতের প্রাক্কালে.....ডুয়ার্সের হাটে মাঠে ঘাটে বাগানে হাজার হাজার লোককে বন্দেমাতরম মন্ত্রে দীক্ষিত করে চলেছেন আবার সেই অহিংস আন্দোলনের প্রতিভূ নলিনীকুমার ১৯৪২-এ ভারত ছাড় আন্দোলনের সময় প্রত্যক্ষ সংগ্রামে সেনানায়কের অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

স্বদেশীয়ানার মন্ত্র কানে গিয়েছিল বাল্যকালেই, কিন্তু তা বীজ থেকে মহীরূহ হয়ে উঠতে সময় লেগেছিল অনেক।

১৯১২ সাল নাগাদ রংপুরে পুলিন রায় নামে একজন ঠিকাদারের অধীনে চাকুরিতে জীবন শুরু। সাত টাকা মাইনে। তার ঠিক ৮/৯ বছর পরে ওই চাকুরি ছেড়ে দিয়ে, চলে এলেন আলিপুরদুয়ার,

তৎকালীন বিখ্যাত ঠিকাদার রামরূপ সিংহের অধীনে পঞ্চাশ টাকা মাইনের চাকুরি নিলেন। এখানেই তাঁর পর্বান্তর ঘটল। চাকুরির সুবাদে ডুয়ার্সের গ্রামেগঞ্জে জঙ্গল ঘুরতে ঘুরতে তিনি ইংরেজ সরকারের স্বৈরাচারী জনবিরোধী কার্যকলাপগুলো প্রত্যক্ষভাবে বুঝতে পারলেন। তিনি এটাও বুঝলেন, নিরক্ষর সরল সাদাসিধা গ্রামবাসীরা ইংরেজ সরকারের কালা কানুনের দ্বারা কিভাবে শোষিত হচ্ছেন। এরা প্রতিবাদহীন। এদের কোনো সংগঠন নেই। এদের কোনো নেতৃত্ব নেই। এদের কথা ভাববার কেউ নেই। নলিনী ঠাকুরের যেন রূপান্তর ঘটল। ১৯৩০ সনে, মহাত্মা গান্ধীর লবণ সত্যাগ্রহের দিক্‌নির্দেশে, তিনি ফালাকাটায় সামান্য কিছু লোকজন নিয়ে সত্যাগ্রহ শুরু করলেন এবং যথারীতি ব্রিটিশ সরকারের রোষানলে পড়লেন। কিন্তু তাঁর আর ফেরার পথ ছিল না। দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমুক্তির আকাঙ্খা, যা মনের মধ্যে দীর্ঘদিন সুপ্ত হয়েছিল, এবার সেটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। ১৯৩০ সালে, সেই সময়ের অত্যন্ত লোভনীয় দেড়শত টাকা মাসমাইনের চাকুরি ছেড়ে দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের সর্বক্ষণের কর্মী হয়ে গেলেন। ১৯৩৫ সালে তিনি জেলা কংগ্রেসের সদস্য সংগ্রহকারীর ভূমিকায়। ১৯৩৫ সনে, প্রচুর স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে তিনি জলপাইগুড়ি কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দিলেন, পরিচিত হলেন সুভাষচন্দ্র বসুর মতো বিখ্যাত নেতাদের সঙ্গে। পরবর্তীকালে ফরওয়ার্ড ব্লক গঠিত হলে তিনি সেই দলে যোগ দেন। এর পরেরবারই তাঁকে এক বছরের গৃহান্তরীন থাকবার আদেশ হোল। কিন্তু মেয়াদ শেষ হবার আগেই, ১৯৪২-এর সেই বিখ্যাত আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। অবর্ণনীয় কষ্ট আর পরিশ্রমের মধ্যে তিনি স্বাধীনতার সৈনিকদের সমবেত করে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু করলেন। তিনি সেনানায়ক, তাঁর নির্দেশে সমস্ত সরকারি যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করবার জন্য, মহকুমার সমস্ত কাঠের ব্রিজ নষ্ট করা হল। উপড়ে দেওয়া হল টেলিগ্রাফের পোস্ট। সমস্ত টেলিগ্রাফের তার কেটে ফেলা হল। গ্রামেগঞ্জে তিনি অভিহিত হলেন তারকাটা ঠাকুর নামে। সেই সময়ের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে, ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে মহকুমার তিনি 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' বাহিনী প্রস্তুত করার কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন।

ননী ভট্টাচার্য

বিপ্লবী দল অনুশীলন সমিতির সক্রিয় কর্মী থেকে যাত্রা শুরু। শেষ করলেন রাজ্যসরকারের মন্ত্রী হিসেবে। ১৯৩৫ থেকে ১৯৯৩, দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবন। কখনো প্রচারক, কখনো সংগঠক, কখনো লেখক......নানা ভূমিকায় তিনি স্বচ্ছন্দ। আসলে তাঁর প্রধান কৃতিত্ব, জেলার, বিশেষত ডুয়ার্সের চা বাগান, বনবস্তি, আর গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে থাকা অগণিত অবহেলিত কৃষক শ্রমিক আর তফসিলি আদিবাসী মানুষদের এককাট্টা করে লড়াই সংগঠিত করবার কাজে আত্মনিয়োগ করে সফল হতে পেরেছিলেন। এটা তাঁর দূরদৃষ্টি, সাংগঠনিক প্রতিভা আর সাধারণ মানুষদের সঙ্গে সহজ সরলভাবে মিশবার ক্ষমতার জন্যই সম্ভব হয়েছিল। সেজন্য তিনি গ্রামগঞ্জ বাগানের রেলস্টেশনের সাধারণ মানুষদের কাছে ননী ভট্টাচার্য নন, 'ননীভাই' হিসেবে সমধিক পরিচিত।

ইংরেজ শাসনকাল, ১৯৩৫ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত তিনি বিভিন্ন কারাগারে বন্দী ছিলেন। অগ্নিযুগের সেই রক্তক্ষরা অধ্যায়ের পর, মুর্শিদাবাদ থেকে আলিপুরদুয়ার। জীবনের আরেক অধ্যায়। সালক্রম অনুসারে এভাবে লেখা যায়।

১৯৪৮ : আলিপুরদুয়ার শহরে মোটর কর্মীসংঘের সংগঠক।

১৯৫০ : দৈনিক গণবার্তার সম্পাদকের দায়িত্বভার গ্রহণ।

১৯৫১ : চা-বাগান বস্তিতে আর বাগানের হাটে সংগঠন গড়ার প্রয়াস।

১৯৫৪ : চা-শ্রমিকদের বোনাস আন্দোলনের সংগঠক।

১৯৫৮ : চা-বাগানের এক আন্দোলনের ফলস্বরূপ গ্রেপ্তার।

১৯৬০ : আলিপুরদুয়ারে রেলশ্রমিকদের পাশে দাঁড়িয়ে ধর্মঘটে সমর্থন।

১৯৭৪ : সারাভারত রেল ধর্মঘটের ফলস্বরূপ আবার গ্রেপ্তার।

১৯৮৫ : আলিপুরদুয়ারের মতো একটি মহকুমা শহরে, পার্টির সর্বভারতীয় প্লেনাম অনুষ্ঠিত করার সাফল্য অর্জন।

এসব তাঁর দলগত সাংগঠনিক প্রতিভার পরিচয়। এই ননীবাবুই আবার মন্ত্রী হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় ছিলেন। ১৯৬৭ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত যুক্তফ্রন্ট সরকারের এবং ১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত বামফ্রন্ট সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী, আবার ১৯৮২ থেকে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত সেচমন্ত্রী হিসেবে কাজ করেছেন।

স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে একজন লিখেছেন......"ননী ভট্টাচার্যের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড কোনো একটা নির্দিষ্ট পথ ধরে এগোয়নি, বহু পথে বিস্তৃত হয়েছিল। মার্কস-এঙ্গেল্স-লেনিনের মূল দর্শনের সঙ্গে তিনি সম্যক পরিচিত ছিলেন, অবহিত ছিলেন ভারত ও আন্তর্জাতিক অর্থনীতি রাজনীতি সম্পর্কে।......" তিনি লিখেছেন......"পঞ্চাশের দশকে জলপাইগুড়ি জেলার ডুয়ার্স ও দার্জিলিং জেলার তরাই অঞ্চলে সম্পূর্ণ প্রতিকূল পরিবেশে চা বাগিচা শ্রমিকদের মধ্যে সংগঠন গড়ে তোলার কাজে যখন হাত "দেওয়া হোল, ননী ভট্টাচার্য ছিলেন তার পুরোভাগে...(সঞ্জীব সরকার, স্মৃতির সরণি বেয়ে, 'দাবী' পত্রিকা, ১৯৯৫, পৃঃ ৪৩)। ১৯৯৩ সালে তাঁর জীবনাবসান হয়।

পীযূষকুমার মুখোপাধ্যায়

বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী। আলিপুরদুয়ার শহরে, ১৯৩৮ সনে নবগঠিত মহকুমা কংগ্রেসের প্রথম সম্পাদক। ১৯৪২ সালের সংগ্রামে কালচিনি এলাকার দায়িত্ব ছিল তাঁর ওপরে। বিদ্রোহ শেষে, ১৯৪৩ সনে তিনি আলিপুরদুয়ার টাউন কংগ্রেস কমিটির প্রথম সভাপতি হলেন। পরবর্তীকালে কংগ্রেস দলের প্রার্থী হিসেবে বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং সভার ডেপুটি-স্পিকারের পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন।

তথ্যসূত্র : উল্লিখিত পত্রিকা ছাড়া ব্যক্তিগতভাবে অধ্যাপক সুবীর ঘোষ ও অর্ণব সেনের কাছে কৃতজ্ঞ।

পরিশিষ্ট

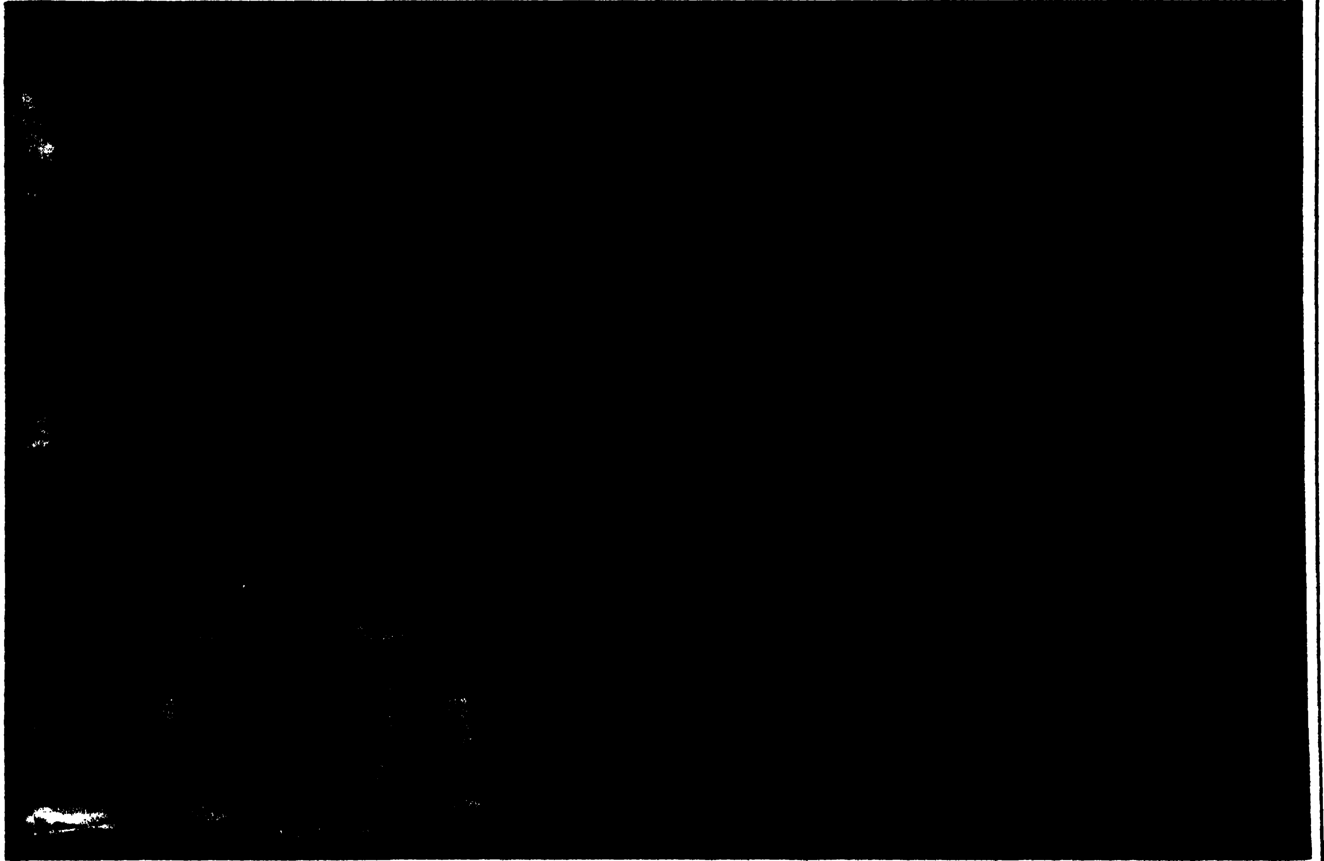
যে সমস্ত গ্রন্থ, পত্রিকা, পুস্তিকা থেকে তথ্য পেয়েছি।

১। জলপাইগুড়ি জেলা শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ।
২। চারুচন্দ্র সান্যাল স্মারক গ্রন্থ
৩। 'মধুপর্ণী' জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা।
৪। 'কিরাতভূমি' জলপাইগুড়ি ১২৫ তম সংখ্যা।
৫। পরিতোষ দত্ত সম্পাদিত 'করতোয়া থেকে তিস্তা'।
৬। CPI(M) কর্তৃক প্রকাশিত 'সুবোধ সেন' প্রসঙ্গে।
৭। সুনীতিবালা বালিকা বিদ্যালয়ের ১২৫ তম জন্মবার্ষিকী সংখ্যা।
৮। নির্মল বসু প্রণীত 'খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত'।
৯। ফরওয়ার্ড ব্লক জলপাইগুড়ি শাখা কর্তৃক প্রকাশিত 'নির্মল বসুর প্রয়াণ পঞ্জিকা'।
১০। গণেশচন্দ্র রায় (দৈলাদা) শতবার্ষিকী স্মারক পত্রিকা।
১১। মানসী পত্রিকা (বসন্ত সংখ্যা ১৩১৯)।
১২। অতন্দ্রিলা পত্রিকা।
১৩। জনমত পত্রিকা (শারদীয়া)
১৪। উত্তরবঙ্গ সংবাদ।
১৫। বীরেন দত্তর রচনাবলী।
১৬। দুর্গাচরণ সান্যাল লিখিত 'বাঙালার সামাজিক ইতিহাস'।
১৭। উপেন্দ্রনাথ বর্মণ লিখিত 'রাজবংশী প্রবাদ, প্রবচন এবং হেঁয়ালি'।
১৮। উমেশ শর্মা লিখিত 'জলপাইগুড়ির খানবাহাদুর রায়বাহাদুর'।
১৯। খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রণীত 'আর্য সভ্যতার সন্ধানে'।
২০। কোচবিহারের ইতিহাস : খানচৌধুরী প্রণীত।
২১। সুখবিলাস বর্মা প্রণীত : ভাওয়াইয়া।

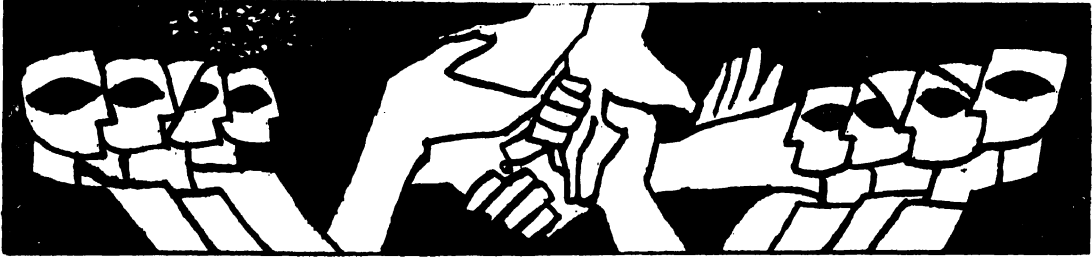
এছাড়া ব্যক্তিগতভাবে পত্রিকা, পুস্তক, তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন, তাঁরা হলেন—

(১) অরুণ নন্দী। (২) দিলীপ দাস। (৩) দীপককৃষ্ণ ভৌমিক। (৪) সমরেন্দ্রদেব রায়কত। (৫) প্রণত বসু। (৬) গৌতম গুহরায়। (৭) শৌভিক কুণ্ডা। (৮) সুশান্ত নিয়োগী। (৯) নিখিল ঘটক। (১০) মৃকলেশচন্দ্র সান্যাল। (১১) সুনীল চক্রবর্তী। (১২) মানস বসু। (১৩) মানবেন্দ্র সেনগুপ্ত। (১৪) বৃন্দ বাগচী। (১৫) স্ত্রী নিভারানী দত্তসহ বীরেন দত্তর পরিবারবর্গ। (১৬) শঙ্করকুমার মালাকার প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। এই ঋণ অপরিশোধ্য, তবুও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

লেখক ❑ কবি ও গল্পকার



জলপাইগুড়ির বেত ও বাঁশের কাজ



শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়

মেঘের গায়ে জেলখানা : বক্সাদুয়ার

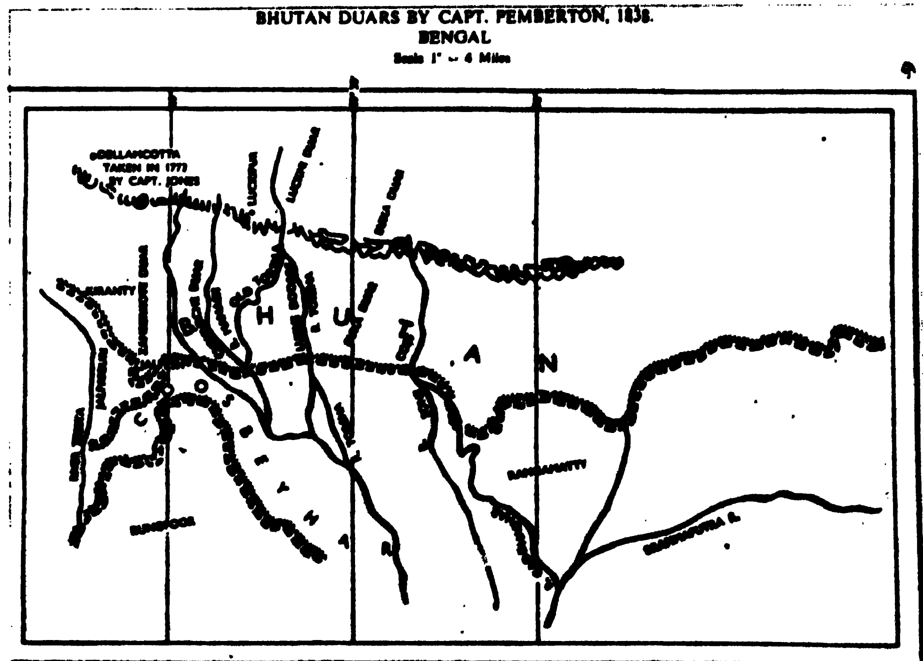
প্রান্তিক উত্তর বাংলার ইতিহাসে বক্সাদুয়ার নিম্ন হিমালয়ের সিঞ্চুলা পর্বতমালায় অবস্থিত। বক্সাদুয়ার প্রাচীনকাল থেকে মধ্য ও পশ্চিম ভুটান এবং তিব্বতের সঙ্গে বাংলার বাণিজ্যের অন্যতম প্রধান পথ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। ভোট শব্দ 'পাশাখা' থেকে উদ্ভূত 'বক্সা' ভুটানে প্রবেশ ও নির্গমনের দ্বার বা দুয়ার হিসেবে বক্সাদুয়ার নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। অবশ্য ওয়ারেন হেস্টিংসের আত্মীয় ক্যাপ্টেন স্যামুয়েল টার্নারের মতে 'বক্‌শিশদুয়ার' নাম থেকে 'বক্সদুয়ার' নামের উৎপত্তি। নিম্ন হিমালয়ের পাদদেশে ভারত-ভুটান সীমান্তে পশ্চিমে তিস্তা নদী থেকে পূর্বে ধানসিরি নদী পর্যন্ত গভীর অরণ্যময় ভূ-ভাগ ভুটানে প্রবেশ ও নির্গমনের ১৮টি প্রবেশপথের জন্য প্রাচীনকাল থেকে আঠারোদুয়ার বা দুয়ার নামে পরিচিত ছিল। তিস্তা নদীর পূর্ব তীর থেকে মানস নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ৮০ মাইল লম্বা ও ১০ থেকে ৩০ মাইল চওড়া ভূখণ্ড কোম্পানি আমল থেকে বেঙ্গল-ডুয়ার্স বা ওয়েস্টার্ন ডুয়ার্স নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। অসম-ডুয়ার্স বা ইস্টার্ন ডুয়ার্সের সীমা ছিল মানস থেকে ধানসিরি নদী। পশ্চিম ডুয়ার্স বা বেঙ্গল-ডুয়ার্সের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পথ ছিল বক্সাদুয়ার। বক্সাদুয়ার দিয়ে ভুটানের পূর্বতন রাজধানী পুনাখা ও তিব্বত সীমান্তে অবস্থিত চুম্বী ভ্যালিতে পৌঁছনো সহজসাধ্য হওয়ায় প্রাচীনকাল থেকে এই পথে পূর্বতন কোচবিহার রাজ্য ও রংপুরের সঙ্গে মধ্য ও পশ্চিম ভুটান সহ তিব্বতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বক্সাদুয়ার দিয়ে প্রাচীনকাল থেকে মধ্য ও পশ্চিম ভুটান এবং তিব্বত থেকে ক্ষুদ্রকায় অশ্ব, পশম, চামরীপুচ্ছ, মৃগনাভি, গণ্ডারের খড়্‌গ, চীনা রেশমি বস্ত্র, বনৌষধি, মধু, মোম, কমলা, গজদন্ত, এণ্ডি কাপড়, মূল্যবান পাথর, ভোট কম্বল প্রভৃতি আমদানি হত। বাংলা থেকে রপ্তানি হত নীল, লবঙ্গ, দারুচিনি, কর্পূর, গুগ্‌গুল, তামাক প্রভৃতি। বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছাড়াও প্রথম ভুটান যুদ্ধের পূর্বে ও পরে কয়েক শতাব্দীব্যাপী কোচবিহার-ভুটান বিরোধে বক্সাদুয়ারের সামরিক গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে ভুটানরাজ বক্সাদুয়ার দিয়ে



বক্সা দুর্গ — *ছবি : গোপাল মণ্ডল*

কোচবিহার রাজ্য আক্রমণ করলে কোচ রাজা ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শরণাপন্ন হয়। ওয়ারেন হেস্টিংস ক্যাপ্টেন জোন্স-এর নেতৃত্বে চার কোম্পানি সৈন্য ও দুটি কামান পাঠান। জোন্স ভুটানিদের দুয়ার অঞ্চল থেকে বিতাড়িত করে ডালিমকোট, চেচাখাতা ও বক্সা দুর্গ দখল করেন। সন্ত্রস্ত ভুটানরাজ তিব্বতের শরণাপন্ন হলে তিব্বতের মধ্যস্থতায় ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দের ২৫ এপ্রিল এক চুক্তির মাধ্যমে প্রথম ভুটান যুদ্ধ শেষ হয়। ভুটান ও কোচবিহারের বিরোধের সুযোগে ওয়ারেন হেস্টিংস কোম্পানির ব্যবসায়িক স্বার্থ মাথায় রেখে ডুয়ার্সে ভুটানের আধিপত্য মেনে নেন। তিব্বতের সঙ্গে বাণিজ্যে উদ্‌গ্রীব হেস্টিংস ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে জর্জ বোগলের নেতৃত্বে কোম্পানির প্রথম মিশন বক্সাদুয়ার দিয়ে তিব্বতে পাঠান। ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দে বোগল সাহেবের সহযাত্রী ডাঃ আলেকজান্ডার হ্যামিল্টন ও ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দে ক্যাপ্টেন স্যামুয়েল টার্নারের নেতৃত্বে কোম্পানির মিশন বক্সাদুয়ার দিয়ে ভুটানে প্রবেশ করে পুনাখা ও তিব্বতে পৌঁছায়।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বক্সাদুয়ারসহ সমগ্র ডুয়ার্স ভুটানের নিয়ন্ত্রণে থাকলেও, ভুটানি সৈন্যদের ক্রমাগত হানাদারি ও সীমান্ত বিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশ সরকার ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে স্যার অ্যাসলে ইডেনকে ভুটানে পাঠায়। ইডেনের ভুটানদৌত্য চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয় এবং ইডেন ভুটানে লাঞ্ছিত হন। ক্ষুব্ধ ব্রিটিশ সরকার ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দের ১১ নভেম্বর এক ঘোষণার দ্বারা বক্সা, ডালিমকোট ও দেওয়ানগিরির (অসম-ডুয়ার্স) পার্বত্য দুর্গসহ সমগ্র ডুয়ার্স অধিগ্রহণ করলে দ্বিতীয় ভুটান যুদ্ধ শুরু হয়। ওই বছর ৭ ডিসেম্বর কর্নেল ওয়াটসনের নেতৃত্বে ব্রিটিশ সৈন্যরা বক্সা দুর্গ দখল করে। বক্সা দুর্গে একটি চীনা কামান পাওয়া যায়। বক্সার প্রাচীন ভুটানি দুর্গ অধিকার করে ব্রিটিশ সরকার ভুটানি সৈন্যদের ওপর নজরদারির জন্য স্থায়ী সেনানিবেশ তৈরির কাজ শুরু করে।



BHUTAN DUARS BY CAPT.
PEMBERTION 1838
BENGAL
Scale 1" = 4" Miles

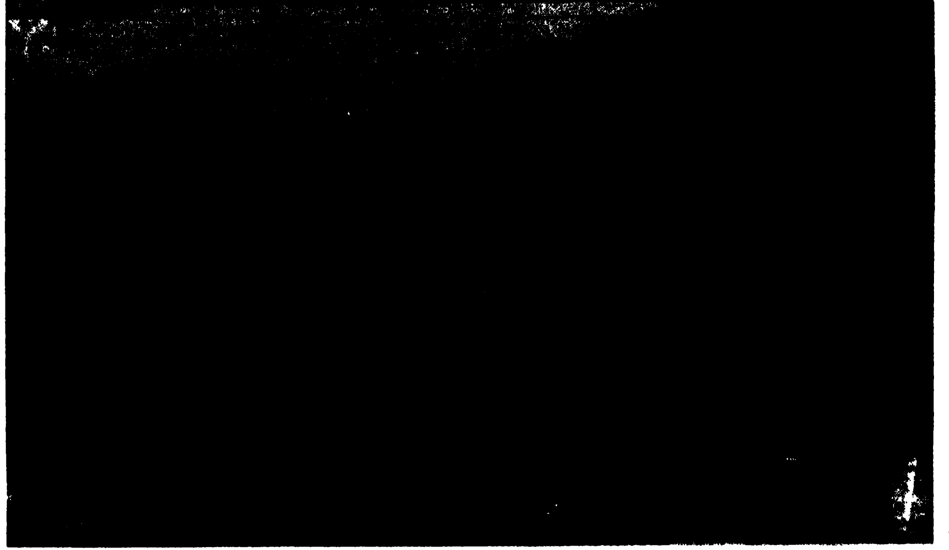
A map of old Bhutan, Coochbehar, Rangpur and Jalpaiguri drawn by Pemberton in 1838 same as Rennel's Map of 1773

দুর্গের (২৬০০ ফুট) তিনদিকের পাহাড়ে গড়ে ওঠে তিনটি নজরদারি চৌকি—(১) নর্থ-ওয়েস্ট পিকেট (২৭৫০ ফুট), (২) ম্যাগডালা হিল পিকেট (২৭০০ ফুট) ও (৩) কনসিল্ড হিল পিকেট (২৩০০ ফুট)। ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দের ১১ নভেম্বর বক্সার অদূরে সিঞ্চুলা পাহাড়ের ভারত-ভুটান সীমান্তে 'সিঞ্চুলা চুক্তি' স্বাক্ষরের মাধ্যমে দীর্ঘস্থায়ী ও রক্তাক্ত দ্বিতীয় ভুটান যুদ্ধ শেষ হয়।

ডুয়ার্সে ব্রিটিশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ডুয়ার্স অঞ্চলকে পূর্বদুয়ার (ইস্টার্ন ডুয়ার্স) ও পশ্চিমদুয়ার (ওয়েস্টার্ন ডুয়ার্স) অঞ্চলে ভাগ করা হয়। ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে পূর্বদুয়ারকে অসমের গোয়ালপাড়া জেলার সঙ্গে যোগ করা হয়। পশ্চিমদুয়ার অঞ্চলকে তিনটি তহশিলে ভাগ করা হয়—(১) ময়নাগুড়ি বা সদর তহশিল, (২) বক্সা তহশিল ও (৩) ডালিমকোট তহশিল। ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে ডালিমকোট তহশিল দার্জিলিং জেলার সঙ্গে সংযুক্ত হয়। ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমদুয়ার জেলা গঠিত হলে ১৮৬৭ থেকে ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বক্সাদুয়ার মহকুমার মর্যাদা পায়। ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দ ১ জানুয়ারি পশ্চিমদুয়ার জেলার সঙ্গে রংপুর জেলার জলপাইগুড়ি মহকুমা যোগ করে জলপাইগুড়ি জেলা গঠন করা হয়। জেলা সদর ময়নাগুড়ি থেকে জলপাইগুড়িতে ও মহকুমা সদর বক্সা থেকে ফালাকাটায় স্থানান্তরিত করে সদর মহকুমা ও ফালাকাটা মহকুমা গঠন করা হয়। আবার ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে মহকুমা সদর ফালাকাটা থেকে বক্সায় স্থানান্তরিত করে মহকুমার নতুন নামকরণ হয় বক্সা (ভক্সা) মহকুমা। ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে মহকুমা সদর বক্সা থেকে স্থায়ীভাবে আলিপুরদুয়ার শহরে স্থানান্তরিত হয়। দ্বিতীয় ভুটান যুদ্ধের অন্যতম নায়ক ও পরবর্তীকালে বক্সা প্রথম এক্সট্রা অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার কর্নেল হেদায়েত আলি খানের বীরত্বের স্বীকৃতি হিসেবে মহকুমার নামকরণ হয় আলিপুরদুয়ার মহকুমা। ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে বনদপ্তরের বক্সা বিভাগীয় অফিস বক্সাদুয়ারে স্থাপন করা হয়। ১৯০১ থেকে ১৯১০ সালের মধ্যে কোচবিহার স্টেট রেলওয়ে বক্সা রোড পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। বক্সাদুয়ার আবার ইতিহাসের পাদপ্রদীপে আসে বর্তমান শতাব্দীর তিরিশের দশকে। দুর্ভেদ্য বক্সা-দুর্গ ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে চিরস্থায়ী আসন করে নেয়।

ভারতের মুক্তি সংগ্রামে বক্সা বন্দীশিবির :

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে বক্সা বন্দীশিবির একটি উত্তাল অধ্যায়ের স্মৃতি বহন করে চলেছে। এই শতাব্দীর প্রথমার্ধে ব্রিটিশ শাসনবিরোধী আন্দোলনে বাংলার যুবসমাজ উত্তাল হয়ে ওঠে। অনুশীলন সমিতি, যুগান্তর দল, বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স প্রভৃতি বিপ্লবী সংগঠনের ধারাবাহিক সশস্ত্র সংগ্রাম অবিভক্ত বাংলার সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে তীব্র করে তোলে। তবু



বক্সা বন্দিশিবিরে বন্দিদের সেল-এর একাংশ

১৯৩০ সালেই চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, পুলিশ কমিশনার টেগার্টের প্রাণনাশের চেষ্টা, লোম্যান হত্যা ও সর্বোপরি রাইটার্সের অলিন্দ যুদ্ধ ইত্যাদি ঘটনায় মুক্তিকামী সাধারণ মানুষের মধ্যে এই বিপ্লবী দলগুলির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। উদ্বিগ্ন ব্রিটিশ সরকার বিপ্লবী সংগঠনগুলির নেতা ও সক্রিয় কর্মীদের সাধারণ মানুষের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করার প্রক্রিয়া শুরু করে। পরাধীন ভারতে স্বাধীনতা সেনানীদের সাধারণ মানুষের কাছ থেকে দূরে রাখার জন্য সাধারণ কয়েদখানা (Jail) ও দণ্ড উপনিবেশ (Penal Settlement) ছাড়াও দূর বিদেশে নির্বাসনে পাঠাবার ব্যবস্থা থাকলেও এবার প্রয়োজন হয় বন্দী শিবিরের (Detention Camp)। বাংলাদেশে বহরমপুর, হিজলি ও বক্সা—এই তিনটি বন্দীশিবিরের মধ্যে প্রথম খোলা হয় বক্সা বন্দীশিবির। ১৯৩০ সালের এপ্রিল মাসে Bengal Criminal Law Amendment আইনটি পুনরায় জারি করে ইংরেজ সরকার একই সঙ্গে দেশের সর্বত্র হানা দিয়ে বিপ্লবীদের আটক করে। প্রান্তিক উত্তর-বাংলার ভারত-ভুটান সীমান্তের দুর্গম অরণ্যবেষ্টিত বক্সা সেনানিবাসটিকে সংস্কার করে বন্দীশিবির খোলা হয় ১৯৩০ সালে। বিনা বিচারে অন্তরীণ হন অনুশীলন সমিতি, যুগান্তর দল, বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স প্রভৃতি বিপ্লবী দলের নেতৃস্থানীয় দেড়শো বিপ্লবী। নিম্ন হিমালয়ের এই দুর্গম বন্দীশিবির খুব তাড়াতাড়ি সারা ভারতে কুখ্যাতি অর্জন করে। 'স্থানটি সত্যই অতি দুর্গম। দুর্গটি একটি পাহাড়ের মাথায় অবস্থিত ছিল। আর চতুর্দিক ছিল ঘন অরণ্যে বেষ্টিত। রাত্রে ঘরে শুয়ে হায়েনার ডাক শোনা যেত। মাঝে মাঝে বাঘের ডাকও। আর শোনা যেত ঝরণার অবিরাম ঝরঝর শব্দ। বন্দীশালার একদিকে উঁচু প্রাচীর। আর প্রায় তিনদিকে দুশো-আড়াইশো ফিট খাদ। তাও আবার কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। মাঝে মাঝে উচ্চ মঞ্চে বন্দুকধারী প্রহরী।' বক্সার দুর্ভেদ্য দুর্গও দমাতে পারেনি বন্দী বিপ্লবীদের সুদৃঢ় মনোবলকে। ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের (১৯৩১) পঁচিশে বৈশাখ বক্সা বন্দীশিবিরের মধ্যে কবিগুরুর সত্তরতম জন্মজয়ন্তী পালন করেন বন্দী বিপ্লবীরা। অভিনীত হয় কবির 'শেষবর্ষণ' নাটক। জন্মদিনের অভিনন্দন জানিয়ে কবিকে চিঠি পাঠান বন্দীরা। দার্জিলিঙে বিশ্রামরত

প্রত্যভিনন্দন

বক্সা দুর্গস্থিত রাজবন্দীদের প্রতি

নিশীথেরে লজ্জা দিল অন্ধকারে রবির বন্দন।
পিঞ্জরে বিহঙ্গ বাঁধা, সঙ্গীত না মানিল বন্ধন।
ফোয়ারার রন্ধ্র হোতে
উন্মুখর ঊর্দ্ধস্রোতে
বন্দী বারি উচ্চারিল আলোকের কী অভিনন্দন॥

মৃত্তিকার ভিত্তি ভেদি' অঙ্কুর আকাশে দিল আনি'
স্বসমুত্থ শক্তিবলে গভীর মুক্তির মন্ত্রবাণী।
মহাকাল রুদ্রাণীর
কী বর লভিল বীর,
মৃত্যু দিয়ে বিরচিল অমর্ত্ত্য নরের রাজধানী॥

"অমৃতের পুত্র মোরা" কাহারা শুনালো বিশ্বময়!
আত্মবিসর্জ্জন করি' আত্মারে কে জানিল অক্ষয়!
ভৈরবের আনন্দেরে
দুঃখেতে জিনিল কে রে,
বন্দীর শৃঙ্খলছন্দে মুক্তের কে দিল পরিচয়॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩ জ্যৈষ্ঠ
১৩৩৮

দার্জি

অভিভূত কবি প্রত্যভিনন্দন জানিয়ে লিখে পাঠালেন—"অমৃতের পুত্র মোরা-কাহারা শোনাল বিশ্বময়। আত্মবিসর্জন করি আত্মারে কে জানিল অক্ষয়।"

১৯৩১-এর ১৬ সেপ্টেম্বর হিজলি জেলে অন্তরীণ নিরস্ত্র বিপ্লবীদের উপর গুলি চললে প্রাণ হারান সন্তোষ মিত্র ও তারকেশ্বর সেনগুপ্ত। সপ্তাহব্যাপী অনশন করে প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছিলেন বক্সায় বন্দী বিপ্লবীরা। দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকের প্রাক্কালে ১৯৩১ এর অক্টোবরে গান্ধিজির বিশেষ বার্তা নিয়ে বক্সায় এসে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত বৈঠকে বসেছিলেন বন্দী বিপ্লবীদের সঙ্গে। এই বন্দীশিবিরে বসেই ত্রৈলোক্যনাথ (মহারাজ) তাঁর 'গীতায় স্বরাজ' গ্রন্থের কিছু অংশ শেষ করেন।

১৯৩৩-এর শীতে দুর্গম অরণ্যাবেষ্টিত বক্সা বন্দীশিবির থেকে পালিয়ে অনুশীলন সমিতির সভ্য জিতেন গুপ্ত ও কৃষ্ণপদ চক্রবর্তী বাংলার অমৃতের পুত্রদের অদম্য মনোবলের পরিচয় দেন। ১৯৩৭ পর্যন্ত খোলা ছিল প্রথম পর্যায়ের বন্দীশিবির। বিয়াল্লিশের ভারত ছাড়ো আন্দোলনের উত্তাল পটভূমিকায় আবার খোলা হয় এই দুর্গম বন্দীশিবির। ১৯৪১ সাল থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত এই বন্দীশিবিরে আটক ছিলেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের অসংখ্য সেনানী।

স্বাধীন ভারতবর্ষে ১৯৪৯ সালে কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষিত হলে নিরাপত্তা আইনে বহু কমিউনিস্ট কর্মীকে গ্রেপ্তার করে বক্সা বন্দী শিবিরে রাখা হয়। এই বন্দীশিবির চালু ছিল ১৯৫১ পর্যন্ত।

স্বাধীনতার ৫৩ তম বার্ষিকীতে আমরা বিনম্রচিত্তে স্মরণ করি সেই সব অমৃতের পুত্রদের যাঁদের বহু ত্যাগ এবং অবিরাম সংগ্রামের ফলে মাতৃভূমির এই স্বাধীন-আকাশ, মাটি, আলো।

বক্সা বন্দিশিবিরে অন্তরীণ বিপ্লবী

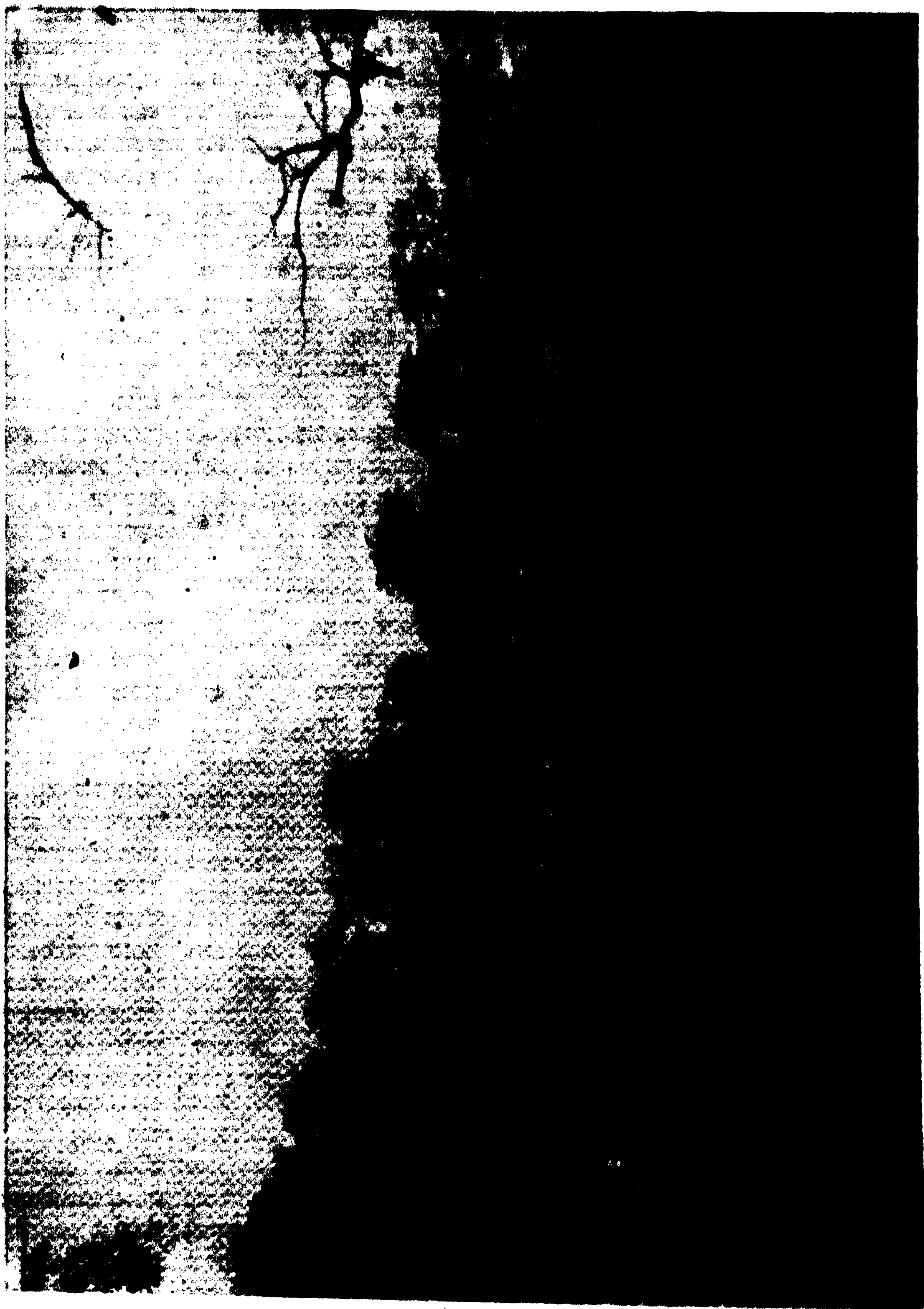
১৯৩০-৩৭ ও ১৯৪১-৪৬

অমলেন্দু দাশগুপ্ত
অশ্বিনী গাঙ্গুলি
অরুণচন্দ্র গুহ
অভীন্দ্রমোহন রায়
অনিলচন্দ্র রায়
অমূল্য মুখোপাধ্যায়
অমর চট্টোপাধ্যায়
অমর বসু
অমূল্যচন্দ্র অধিকারী
অনন্ত দে
ডঃ অবলা কর
অধীর বন্দ্যোপাধ্যায়
অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়
অনন্ত দেব
অরুণ দাশগুপ্ত
অমর বন্দ্যোপাধ্যায়
অনুকূল মুখোপাধ্যায়
অমরকৃষ্ণ ঘোষ

অনিল দত্ত
অতীন্দ্রনাথ বসুঠাকুর
অসিত ঘোষ
অমিয়কুমার রায়
অমর চক্রবর্তী
অমিয়ভূষণ মণ্ডল
অমূল্য দাশগুপ্ত
অলক চক্রবর্তী
অসিত ঘোষ
অর্ধেন্দু চক্রবর্তী
অমূল্য লাহিড়ী
অমিয় সান্যাল
অগম দত্ত
অমল নন্দী
আশুতোষ কাহালী
আব্দুল রাজ্জাক খাঁ
আসরাফউদ্দিন চৌধুরি
আনন্দকিশোর মজুমদার

আশুতোষ পাল
ইন্দ্রচন্দ্র নায়ার
উপেন দাস
উপেন সাহা
উমাপদ চক্রবর্তী
উপেন্দ্রনাথ রায়
কালীমোহন রায়
কৃষ্ণপদ চক্রবর্তী
কৃষ্ণ লাহিড়ী
কেদারেশ্বর সেনগুপ্ত
কালীমোহন সেন
কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
কালীপদ গুহরায়
কালীদাস সাহারায়
কানাই রুদ্র
কালীচরণ ঘোষ
কানাই দাস
কিরণ দাস
কমলেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
কেশবচন্দ্র গুহ
কেশবচন্দ্র মিত্র
কান্তি চট্টোপাধ্যায়
কানাই বন্দ্যোপাধ্যায়
কালীপদ সরকার
কেদার সাহা
কোহিনুর ঘোষ
ক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
ক্ষিতীশ কুণ্ডু
ক্ষিতীশ চক্রবর্তী
ক্ষিতীশচন্দ্র বসু
ক্ষিতীশ চৌধুরি
ক্ষিতীশচন্দ্র দেব
খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত
গোপাল হালদার
গোপাল মুখোপাধ্যায়
গোপীনাথ মজুমদার
গোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
গণেশ সান্যাল
গোপাল গুপ্ত
গোবিন্দ কর
চিরঞ্জীব মিত্র
চিত্ত দত্ত রায়
চিত্তরঞ্জন দাস
চন্দ্রনাথ সাহা

চারু রায়
চারু চৌধুরি
ডাঃ জ্যোতির্ময় শর্মা
জানকী রায়
জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী
জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার
জিতেন গুপ্ত
জগদানন্দ বাজপেয়ি
জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ
জীবনলাল চট্টোপাধ্যায়
জ্যোতিষচন্দ্র জোয়ারদার
জীবন মাইতি
জগদীশ মজুমদার
জগদীশ চক্রবর্তী
জগন্নাথ মজুমদার
জুলু সেন
জ্যোতিষচন্দ্র মজুমদার
ত্রিদিব চৌধুরি
তরণীভূষণ সোম
তপনকুমার গাঙ্গুলি
তারাপ্রসাদ চক্রবর্তী
তারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
তারাপদ চক্রবর্তী
মহারাজ ত্রৈলোক্যমোহন চক্রবর্তী
দক্ষিণা মিত্রমজুমদার
দুর্গেশ ভট্টাচার্য
দেবেন্দ্র করগুপ্ত
দেবজ্যোতি বর্মণ
দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ
দেবকুমার ঘোষ
দীনেশচন্দ্র দাস
দেবব্রত রায়
দক্ষিণারঞ্জন মিত্র
ধীরেন দাশগুপ্ত
ধূর্জটি নাগ
ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
ধীরেশচন্দ্র রায়
ধীরেন দত্ত
ধীরেন বন্দ্যোপাধ্যায়
ধীরেন নিয়োগী
নরেন্দ্রমোহন সেন
নৃপেন মজুমদার
নরেশচন্দ্র সোম
নরেন দাস



বক্সা দুর্গ। সৌজন্যে বক্সা টাইগার রিজার্ভ

ননী নাগ
নিখিল দাস
নয়নাঞ্জন দাশগুপ্ত
নিশিকান্ত গাঙ্গুলি
নগেন দত্ত
নরেন কর
নলিনী গুহ
নরেন দাস
নীরঞ্জীব রায়
নলিনীকান্ত দাশগুপ্ত
নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়
নলিনী বাগচী
ননী ভট্টাচার্য
নগেন্দ্রশেখর চক্রবর্তী
নরেন্দ্রনাথ সরকার
নিকুঞ্জ সেন
নিত্যগোপাল রায়
নিতাই কুন্ডু
যতীন রায়
যশোদারঞ্জন চক্রবর্তী
যতীন রক্ষিত
যতীন ভট্টাচার্য
যামিনী রায়
যতীন দাশগুপ্ত
যামিনী পাল
যুগল দত্ত
রবীন্দ্রনাথ সিকদার
রমেশচন্দ্র আচার্য
রাধিকা কর
রবীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত
রবি ভট্টাচার্য
রসিক দাস
রবি সেন
রবি বোস
রাখাল ঘোষ
রসময় শূর
রাধিকা গাঙ্গুলি
রঞ্জিত সরকার
রেবতী বর্মণ
রণেন গোস্বামী
ললিত বর্মণ
লাল্টু সেন
শ্রীমন্ত চট্টোপাধ্যায়
শুভময় শূর
শান্তিময় রায়
শ্যামানন্দ সেন
শৈলেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত
শান্তিময় দত্ত
শিশির শ্যামরায়
শঙ্কর দস্তিদার
শুভময় দত্ত
শশধর ঘোষ
শরৎ দত্ত
শশধর আচার্য
শশাঙ্ক চৌধুরি
শান্তিভূষণ সেন
শচীন দাশগুপ্ত
শ্রীমন্ত ভট্টাচার্য
সুরেশচন্দ্র দাস
সুবীর বসু
স্বদেশরঞ্জন নাগ
সন্তোষ দত্ত
সুধাংশু মুখোপাধ্যায়
সুধীর রায়চৌধুরি
সন্তোষ গাঙ্গুলি
সুরপতি চক্রবর্তী
সৌরভ ঘোষ
সুধাংশু চৌধুরি
সত্য গুপ্ত
সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ
সুশীল সরকার
সুশীলচন্দ্র দেব
সুরেন রায়
সতীশ ঠাকুর
সুধীরকুমার আর্য
সুরেশ দাস
স্বদেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
সুকুমার ভৌমিক
সরোজকুমার আচার্য
সতীশচন্দ্র ঘোষ
সরলকুমার সেন
সুধাংশু ভট্টাচার্য
সুনীল ঘোষ
সমর গুহ
সুরপাণি চক্রবর্তী
সুরাজ রায়
সুখময় চাকলাদার
সত্যরঞ্জন বক্সী
সুনীল দাস
সুবোধ বল
সুধীর রায়চৌধুরি
সুবীর আইচ
সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়
সুশীল ঘোষ
সত্যপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়
সতীশ সরকার
সতীভূষণ সেন
সুবীর নন্দী
সুখময় চক্রবর্তী
সন্তোষ চক্রবর্তী
সতীশচন্দ্র পাকড়াশি
সতীন্দ্র রায়
সুশীল রায়
সুবীর কুশারী
সন্তোষ পাল
হীরালাল দাশগুপ্ত
হেমচন্দ্র ঘোষ
হরিদাস দত্ত
হরিনারায়ণ চন্দ্র
হরিকুমার চক্রবর্তী
হেরম্ব মুখোপাধ্যায়
পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত
পূর্ণচন্দ্র দাস
প্রমোদ দাশগুপ্ত
প্রতাপচন্দ্র রক্ষিত
প্রতুল ভট্টাচার্য
প্রতুল চৌধুরি
প্রভাংশু ধর
প্রতুল দেব
প্রভাস রুদ্রলাহিড়ি
প্রশান্ত সমাদ্দার
প্রমথেশ ভৌমিক
পঞ্চানন চক্রবর্তী
পান্না মিত্র
প্যারী দাস
পূর্ণেন্দু সেনগুপ্ত
পৃথ্বীশ বসু
প্রিয়রঞ্জন সেন
পরেশ মৈত্র
প্রফুল্ল ঘোষ
প্রফুল্ল পাল
প্রফুল্ল চট্টোপাধ্যায়
প্রফুল্ল রায়চৌধুরি
প্রিয়নাথ গাঙ্গুলি
প্রভাত চক্রবর্তী
প্রভাত চন্দ্র লাহিড়ি
প্রভাত মজুমদার
প্রফুল্লচন্দ্র ত্রিপাঠী
প্রভাতকুসুম ভাদুড়ি
পরেশচন্দ্র গুহ
পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রতাপ মজুমদার
প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলি
প্রফুল্ল গুপ্ত
ফণীন্দ্রকিশোর আচার্য
ফণীভূষণ মজুমদার
ফণী চট্টোপাধ্যায়
বিনয়জীবন ঘোষ
বিজয় দত্ত
বীরেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি
বিমল রায়চৌধুরি
বিনয় রায়
বরোদা চক্রবর্তী
বীরেন নিয়োগী
বেণু রায়
বিনোদ মজুমদার
বিনোদ চৌধুরি
বিরাজ রায়চৌধুরি
বাদল গুপ্ত
বীরেন সরকার
বিনোদ চক্রবর্তী
বিধুভূষণ সেন
বাদল চট্টোপাধ্যায়
বিরাজ রায়চৌধুরি
বটকৃষ্ণ মিশ্র
বিভূতি গাঙ্গুলি
বিনয় সেন
বিনোদ কাঞ্জিলাল
বাসুদেব দত্ত
বিশ্বনাথ দুবে
বিজয় আইচ
বাণী বাগচি
বীরেশ্বর ঘোষ
বীরেন বন্দ্যোপাধ্যায়
বঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
বিভূতি ঘোষ
বীরেন কুশারী
ব্রজেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী
বীরেন্দ্রচন্দ্র গাঙ্গুলি

ব্রজেন্দ্র ব্রহ্ম
বিমল নন্দী
বিষ্ণু চট্টোপাধ্যায়
ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত
ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিতরায়
ভূপতি মজুমদার
ভবেশচন্দ্র নন্দী
ভূপতি ঘোষ
ভাইসাহেব
ডঃ ভূপাল বসু
মহেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
মদনমোহন ভৌমিক
মিহির মুখোপাধ্যায়
মণীন্দ্র ঘোষ
মলিনচন্দ্র সেন

মোনা ঘোষ
মণি চৌধুরি
মণীন্দ্রকিশোর রায়
মাখন চন্দ্র পাল
মণীন্দ্র চক্রবর্তী
মণি সিংহ
মণি গুপ্ত
মনোরঞ্জন ধর
মহেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
মনোরঞ্জন চক্রবর্তী
মন্মথ গাঙ্গুলি
মহাদেব সরকার
মন্মথ সরকার
মোহিনী চৌধুরি
মনোরঞ্জন গুপ্ত

মহেশ্বর মল্লিক
মনোরঞ্জন ঘোষ
মোহিত আইচ
মহীতোষ নন্দী
রামসুরত সিং
শ্যামাপ্রসাদ ভট্টাচার্য
শরৎ মিশ্র
শিবনাথ হোড়
সতীশ পাকড়াশি
সত্যেন মজুমদার

সীতারাম সিং
সুকুমার সেনগুপ্ত
সমর গুপ্ত
সমর রায়চৌধুরী
কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়
নিতাই নুনিয়া
হরিপদ চট্টোপাধ্যায়

[বিভিন্ন তথ্যসূত্র ঘেঁটে বক্সা বন্দীশিবিরে যাঁরা বন্দী ছিলেন, তাঁদের নাম সংগ্রহ করা হয়েছে। এতদ্ সত্ত্বেও যদি কারও নাম বাদ পড়ে যায় তার জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত]

১৯৪৯ সালে কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনি ঘোষিত করা হলে বহু কমিউনিস্ট কর্মীকে গ্রেপ্তার করে বক্সা বন্দীশিবিরে রাখা হয়। এই বন্দীশিবির চালু ছিল ১৯৫১ পর্যন্ত। বন্দী কমিউনিস্ট কর্মীদের মধ্যে ছিলেন :

অজিত গাঙ্গুলি
অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্য
অরুণ সেন
অবনী মুখোপাধ্যায়
অবনী লাহিড়ি
অরুণ মিত্র
অনিল সরকার
অমিতাভ সেনগুপ্ত
অজিত নিয়োগী
অরুণ সান্যাল
আব্দুল হালিম
আব্দুর রেজ্জাক খাঁ
ডাঃ এ.এম. ও.গনি
ডাঃ কনক কাঞ্জিলাল
কালী বন্দ্যোপাধ্যায়
কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়
কিশনলাল মাকারিয়া
কিশোরীমোহন পাত্র
কুমুদ বিশ্বাস
কুমেশচরণ লাহিড়ি
কালীপদ সেনগুপ্ত
কালীচরণ ঘোষ
খেতনারায়ণ মিশির
ক্ষিতীশ রায়চৌধুরী
খগেন রায়চৌধুরি
গিরিজা মুখোপাধ্যায়
সাংবাদিক সৌরী ঘটক

চিন্মোহন সেহানবীশ
চিন্ময় পাল
চিত্তরঞ্জন ভট্টাচার্য
চারু মজুমদার
জহিরুল হক
জগদীশ পালিত
জ্যোতির্ময় নন্দী
ধরণী গোস্বামী
নারায়ণ চৌবে
নিরঞ্জন সেন
নৃপেন বসু
নীরদ চক্রবর্তী
পরিমল ঘোষ
কবি পারভেজ শাহিদী
প্রভাত নাগ
প্রশান্ত বসু
প্রশান্ত শূর
পরেশ সেন
যামিনী সাহা
যদুগোপাল সেন
ব্রজ নিয়োগী
বিজয় মোদক
বিজয় পাল
বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরি
বিমলানন্দ মুখার্জি
ব্রজগোপাল ঘোষ
মানিক সরকার

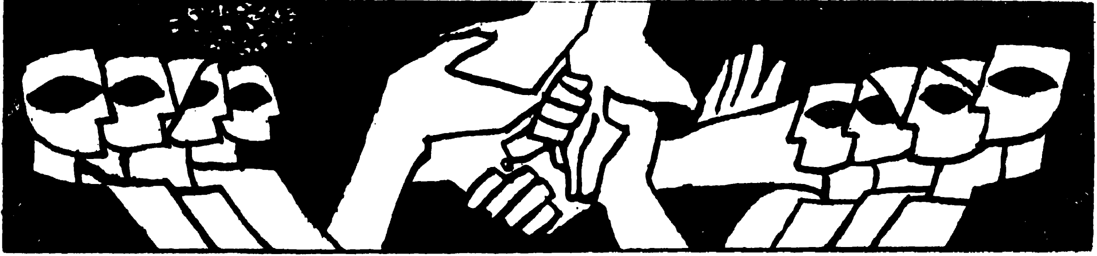
বক্সা বন্দীশিবির সম্পর্কিত পুস্তক তালিকা

(১) **জীবনস্মৃতি**—ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী (মহারাজ)
প্রকাশক : বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-১২
(২) **আত্মস্মৃতি**—ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী
(৩) **গীতায় স্বরাজ**—ঐ
(৪) **জেলে ত্রিশ বছর ও ভারতের বিপ্লব সংগ্রাম**—ঐ
প্রকাশক : অনিলচন্দ্র ঘোষ
প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরি
১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা-১২
(৫) **বিপ্লবীর জীবনদর্শন**—প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী
প্রকাশক : রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস
১৫/২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-১২
(৬) **বক্সা ক্যাম্প**—অমলেন্দু দাশগুপ্ত
প্রকাশক : বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-১২
(৭) **ডেটিনিউ**—ঐ
(৮) **বাংলায় বিপ্লববাদ**—নলিনীকিশোর গুহ
(৯) **বিপ্লবের পথে**—পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত
(১০) **বক্সার পরে দেউলী**—নিকুঞ্জ সেন
প্রকাশক : রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস
১৫/২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-১২
(১১) **ভারতের সশস্ত্র বিপ্লব**—ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়
প্রকাশক : ঐ

তথ্যসূত্র :
'জীবন স্মৃতি'—ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী
'বক্সা ক্যাম্প'—অমলেন্দু দাশগুপ্ত
'বিপ্লবের পথে'—পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত
'বক্সার পরে দেউলী'—নিকুঞ্জ সেন

কৃতজ্ঞতা : জগন্নাথ মজুমদার, নিখিল দাস, প্রফুল্ল গুপ্ত, ফণীভূষণ মজুমদার।

লেখক ❑ মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক, শিলিগুড়ি



সলিল আচার্য

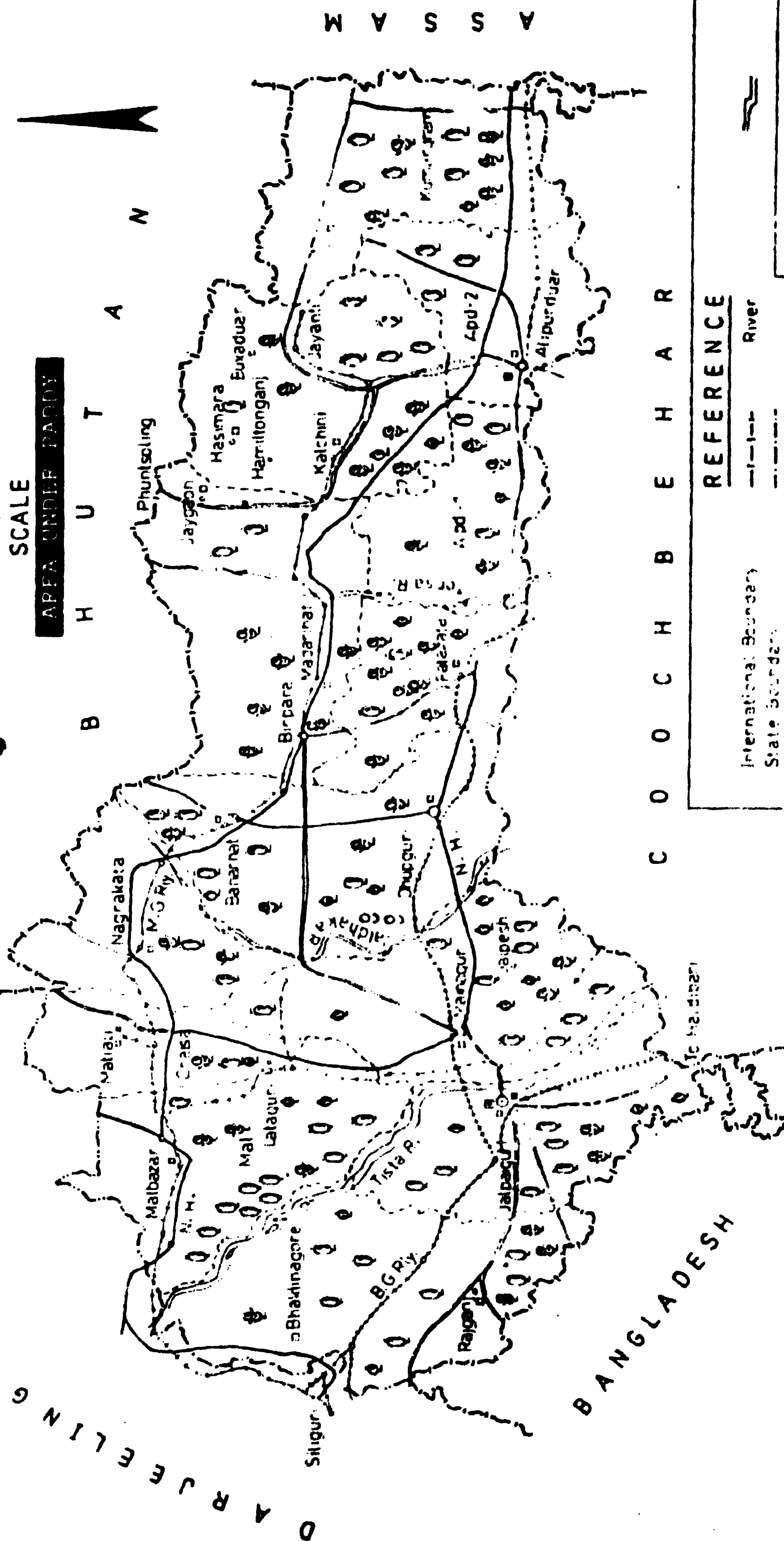
মাটির সহস্র বন্ধনে জড়িয়ে জড়িয়ে......

বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথের দুই বিঘা জমির উপেনরা পলাশজ্বলা এই বাংলায় আজ আর জোতদারের ছলাকলায় জমির মালিকানা হারিয়ে ভগবানের কাছে অভিমানে নালিশ জানায় না, ছুটে যায় অন্যত্র, যেখানে গেলে বিপদে 'সাহারা' পাওয়া যায় সেইখানে। যেখানে সংগ্রামের মধ্যবর্তিতায় দেউটি জ্বলে চেতনার। সেই বাংলার দুটি পাতা একটি কুঁড়ির সবুজ সমুদ্র মন্থন হয়েছিল ১৯৪৭-এর ব্রিটিশ শাসনেই। ডুয়ার্সের হায়হায়পাথার আর মঙ্গলবাড়ির গয়ানাথের খোলানে 'তেভাগা' করতে আসা লড়াই-এ শহিদ হন ১৫ জন গরিব কৃষক আর চা-শ্রমিকেরা। শ্রমিক-কৃষকের মিলিত সংগ্রামের ইতিহাসে এমন নজির পরাধীন ভারতে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। আসলে এই সংগ্রামে ব্রিটিশ মালিকদের লন্ডনে ভাগিয়ে দেবার দায়ও কাজ করেছিল। সে এক ইতিহাসের অনন্য উপাদান। সেই সম্ভবনাময় উর্বরতার ঢেউ প্রতিফলন ঘটিয়েছে কৃষিজমির বুকে, প্রতিফলন ঘটিয়েছে জনজীবনের বিস্তীর্ণ ক্যানভাসে। তারই উত্তরাধিকার প্রবাহিত হচ্ছে আজকের দিনেও।

"দিনের শোবা সুরজরে মোর
রাতের শোবা চান্
হালুয়ার শোবা হাল কৃষি
জমিনের শোবা ধান।"

রাজ্যের উত্তরাংশের আকাশে-বাতাসে মুখরিত 'মাটির মানুষের' মাটির এই ভাওয়াইয়া গান, শুধু গানের জন্য গান নয়। এটা প্রাণের গভীর আর্তি নিয়েই লোককবির কালোত্তীর্ণ সৃষ্টি। 'জমিনের শোভা ধান' অর্থাৎ এই তিনটি শব্দের গভীরেই নিমজ্জিত রয়েছে, কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষের অগ্রগমনের মূল সূত্র। অর্থাৎ আমূল ভূমিসংস্কারের তাৎপর্য।

আমাদের দেশে, আমাদের রাজ্যে, আমাদের জেলায়, সর্বত্রই একটি বিশেষ পশ্চাদভূমি রয়েছে। এই প্রেক্ষাপটের


JALPAIGURI
5 0 5 10 15 Kilometres
SCALE
AREA UNDER PADDY
N
BHUTAN
ASSAM
COOCHBEHAR
BANGLADESH
DARJEELING
Malbazar
Matiali
Nagrakata
Phuntsoling
Jaygaon
Hasimara
Buxaduar
Hamiltonganj
Kalchini
Jayanti
Chalsa
Mal
Banarhat
Birpara
Siliguri
Bhaktinagore
Dhupguri
Jalpaiguri
Rajganj
Alipurduar
Kumargram
Apd-2
Tista R.
B.G.Rly.
M.G.Rly.
N.H.
REFERENCE
International Boundary
State Boundary
District Boundary
Sub-Division Boundary
Block Boundary
District Headquarters
Sub-Division Headquarters
Police Station
River
LEGEND
— Aman Represents 2000 ha.
—Aus 1000 ha.
—Boro 50 ha.



ধান কাটি কাটি ধান : জলপাইগুড়ি জেলা

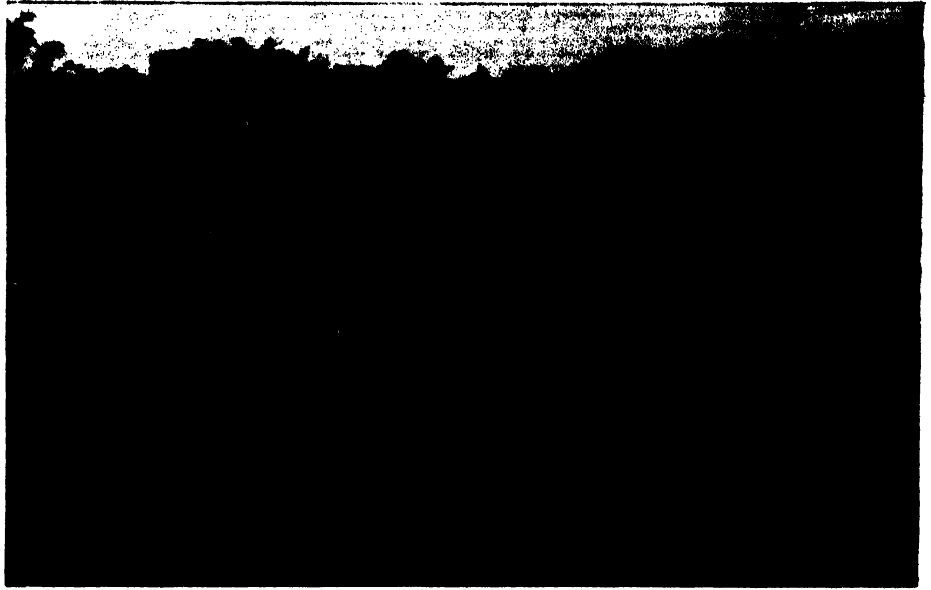
সংক্ষিপ্ত উল্লেখ ব্যতীত কৃষি ও কৃষকের জীবনের রেখাচিত্র আঁকা যায় না। যুগ যুগ বঞ্চিত দারিদ্র্যলাঞ্ছিত 'মূক' থেকে মুখর মানুষগুলোকে চেনা যায় না, জানা যায় না।

সেই পশ্চাদভূমি এঁকেছিলেন তাঁর রচনায় প্রয়াত সর্বভারতীয় কৃষকনেতা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী হরেকৃষ্ণ কোঙার। তিনি বলেছেন : "......সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ত শোষণের কবলিত পশ্চাৎপদ দেশে কৃষিই হল অর্থনীতির প্রধান অংশ এবং কৃষকেরা হল শোষিত জনসমষ্টির ও দেশের শ্রমশক্তির বেশির ভাগ অংশ। আমাদের দেশের কৃষকেরা হল জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৭০ শতাংশ। কৃষিব্যবস্থায় প্রত্যক্ষভাবে সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণী-সম্পর্ক প্রধান হলেও সাম্রাজ্যবাদী, সামন্তবাদী ও একচেটিয়া পুঁজির ত্রিবিধ শোষণেই অত্যন্ত ঘনীভূতভাবে কৃষিব্যবস্থা ও কৃষকের উপর পড়ছে। গ্রাম্য অর্থনীতিও প্রাক্-পুঁজিবাদী অবস্থার মতো আজ আর বিচ্ছিন্ন স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতি নয়। পুঁজিবাদী বাজারের অসম বিলিব্যবস্থা, ফাট্‌কাবাজি ও টাকার প্রাধান্য অর্থনীতিকে তাদের ঘূর্ণির মধ্যে টেনে নিয়েছে। ইংরেজ আমলেই তা শুরু হয়েছিল—দিন দিন তা প্রবল হচ্ছে এবং প্রধানত এরই মাধ্যমে এবং সরকারি পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ ট্যাক্সের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী ও একচেটিয়া পুঁজির চাপ কৃষকদের পিষে মারছে। সামন্ততান্ত্রিক ভিতের উপর এই শোষণের বোঝা গ্রাম্য অর্থনীতিকে করুণ ও বিষাদময় করে তুলেছে। কৃষকদের শোষণ করে পাওয়া ফসল বিক্রি করে প্রচুর মুনাফার সুযোগ বাড়ছে বলে, আধা-সামন্ততান্ত্রিক শোষণেরও তীব্রতা বাড়ছে। এই ঘনীভূত ত্রিবিধ শোষণের জগদ্দল পাথরই কৃষি অর্থনীতিকে পশ্চাৎপদ ও ভঙ্গুর করে রাখছে ; কৃষকের দারিদ্র্য ও দুস্থতা বাড়িয়ে তুলছে। কৃষির এই সঙ্কট দেশের সমগ্র অর্থনীতিকে পিছনদিকে টেনে রাখছে। এরই জন্য খাদ্যসঙ্কট এবং তা সমস্ত সাধারণ মানুষ, শ্রমিক-কর্মচারী প্রভৃতিকে আঘাত করছে ও শিল্পজগতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। কৃষির ভঙ্গুর অবস্থাই শিল্প বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য ও কাঁচামালের চাহিদা পূরণ করতে পারছে না ; যারা দেশের জনসংখ্যার বেশির ভাগ— সেই কৃষকদের দুঃস্থতাই শিল্পের বাজারের সঙ্কটকে বাড়িয়ে তুলছে ; কৃষকের এই অবস্থাই শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দেশকে পশ্চাৎপদ করে রাখছে। এই জন্যই বলা যায় যে, দেশের সঙ্কটের মূলে রয়েছে কৃষির সঙ্কট। তাই কৃষিতে আধা-সামন্ততান্ত্রিক জঞ্জালকে ঝেঁটিয়ে দূর করা এবং সেই সঙ্গে অন্য দুটি শোষণের নিবৃত্তি ঘটানো জরুরি বিষয়।"

উপরে উল্লেখিত পথে কৃষি ও কৃষকের জীবনযাপনের সাথে লেপ্টে থাকা প্রগাঢ় অন্ধকারে এবং জাতীয় সঙ্কট মুক্তির পথের দিশা পাওয়া যায়। যারই আলোকে আজকের দিনে চলার ছন্দের জীবন্ত প্রতিভায় খুঁজে নিতে অসুবিধের কোনও কারণ নেই। কিন্তু মূল সমস্যা বিরাজ করছে অন্যত্র। শোষকশ্রেণীর প্রতিনিধিরা যতদিন দেশের মসনদ আলো করে দিল্লিতে বসে থাকবেন, ততদিন আমূল ভূমিসংস্কারের মধ্য দিয়ে জাতীয় জীবনের ঘনীভূত সঙ্কটের নিবৃত্তি সম্ভব নয়। বরং যত দিন যাচ্ছে দেশের যা কিছু ভাল তা সবই উবে যাচ্ছে, বিশ্বায়ন, উদারীকরণ আর বিরাষ্ট্রীকরণের প্রবল প্রতাপে। এ ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার করে একচেটিয়া পুঁজি এবং বহুজাতিকের গর্ভে বিলীন হচ্ছে জাতীয় স্বার্থের যাবতীয় উপকরণ। এ দেশের কৃষি, শিল্প বুদ্ধিবৃত্তি, মনন—সবই সঙ্কটের তীব্রতায় পরিব্যাপ্ত। সম্মুখে বিশাল মারণ খাদ।

এই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়েই সীমাবদ্ধতার চাপের মধ্যেও এগিয়ে চলেছে পশ্চিমবঙ্গের জীবনযাপনের চালচিত্র। টানা ২৪ বছর সময়টা নেহাত কম নয়। পাশে আছে সংগ্রামরত মানুষের সংঘবদ্ধতার ধারালো অস্ত্র, 'চেতনা'। তাই প্রতিনিয়ত

কলে-কারখানায়-নগরে-বন্দরে-প্রান্তরে মাঠে-ময়দানে রচিত হচ্ছে সৃজন-উৎসব আবার উল্টো পথের রশিতে হাত বুলোবার শিল্পীদেরও অভাব নেই এখানে। তবুও ২৪ বছর। এরই সঙ্গে আরও ৫ বছরের সংযোজনার প্রক্রিয়া জোরালো হচ্ছে, যদিও এটাই একমাত্র পথ মনে করার কোনও সুযোগ নেই।



আমন ধানে ভরা খেত · জলপাইগুড়ি জেলা

বাংলার মাটি বড়ই উর্বর। রামমোহন, বিদ্যাসাগরের মতো, বিবেকানন্দের মতো মানুষেরা বাংলার মাটিকে উর্বরতা দিয়েছেন। রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্ত সোমেন চন্দরাও দিয়েছেন উর্বরতা আরও অনেকে দিয়েছে, দিচ্ছেন আজও, কালও দেবেন। তাই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ফাঁসির দড়িতে চুম্বনের টিপ এঁকে দিতে ভোলেননি বাংলার দামাল সন্তানরা।.....তাই অনেকে উন্নত চেতনার সূর্যমুখী ফোটে এখানে আজও, ফুটবে কালও। বাংলার উন্নত চেতনা বারবার হাঁক দেয়—সমাজ সভ্যতার শত্রুরা তফাত যাও। এখানে চালের উৎপাদন দেশের মধ্যে সব থেকে বেশি হলেও, ধর্মীয় মৌলবাদের চারাগাছ অচিরেই হলুদ মরা পাতায় ভরে যায়, বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার শক্তি, বিচ্ছিন্নতার শেকড় মাটির গভীরে প্রবেশাধিকার পায় না। প্রতিক্রিয়ার শক্তি যতই জোরদার হোক না কেন, বাংলার জল-মাটি-বাতাসে তারা জীবনের উপাদান পায় না। চেষ্টা চলছে। সর্বত্র। পাশে আছে এক মেরুর বিশ্ব গঠনের মাতব্বর মুরুব্বিরা। বিপদের গভীরতা অবশ্যই এতে বাড়ছে, তবুও মানুষ রক্তের অক্ষরে অগ্রগামিতার বীজমন্ত্র উচ্চারণে পিছুপা নন। মানুষ এগোচ্ছেন। সংগ্রামও এগোচ্ছে। ঐক্য-সংহতি-সম্প্রীতির পরম্পরাকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চলার কাজে ছন্দপতনের বাদ্যি বাজানো বেড়েছে বটে, সতর্কতার সরণি জুড়েও আওয়াজ উঠেছে—জীবন সংগ্রামের অনুকূলে। এখানে জীবনের অন্য নাম সংগ্রাম।

দেশের কৃষক সংগ্রামের ঐতিহ্যের পথ বেয়ে এগোবার কাজ চলছে। কৃষক সংগ্রামের সেই উজ্জ্বল দিনের ত্যাগ, তিতিক্ষা আজ ইতিহাস। সেই ১৯৪৬ সালে অবিভক্ত বঙ্গপ্রদেশের তেভাগার লড়াই, তারও আগে কৃষকদের গাণ্ডী বন্ধের সংগ্রাম, ১৯৬৭, ১৯৬৯ সালের নজির সৃষ্টিকারী ভূমির আন্দোলনের সেই আলোড়ন আজও বুদবুদ তোলে হৃদয়ে। দু-দু-বার যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে, রাজ্য সরকারকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে গ্রাম বাঙ্গলায় যে অভ্যুত্থানের চেহারা নিয়েছিল কৃষক সংগ্রাম, তা গ্রামজীবনে শ্রেণী সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটিয়ে পরবর্তী সময়ে ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার গঠনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিল। চার-চারটি দশক পেরিয়ে এসেও '৬৭, '৬৯-এর কৃষক সংগ্রামের 'তাপ-উত্তাপ' আজও চেতনায় নাড়া দেয়, গণসংগ্রামে। শ্রেণী আন্দোলনে। ঐক্য ও সংগ্রামের বার্তাবাহক হয়ে আজ এগিয়ে চলেছে কৃষক সংগ্রাম, যা কিনা আবাহন জানায়—পলাশের রক্তরেণু মেখে—শুভ বোধের দ্যোতনাকে, সমুদ্রের অযুত তরঙ্গমালায় ফেনিল আজান বয়ে আনে জীবনের নতুন স্পন্দনের আকুতি।

এ দেশে, এমন দিন তো ছিল না। কৃষক শিরদাঁড়া টানটান করে ধনুকের ছিলার মতো মাথা তুলে দাঁড়াবে, আলোড়ন জমা হবে ইতিহাসের উপাদান হিসাবে, তেমন দিন তো ছিল না। দিন ছিল আঁধারের ঘন ঘেরাটোপে আবদ্ধ। দেশ তখন পরাধীন। বিশিষ্ট ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর প্রথম জীবনের বিখ্যাত রচনা 'The Peasantry of Bengal' গ্রন্থে এঁকেছেন সেদিনের হিন্দু-মুসলমান চাষীদের জীবনযন্ত্রণার বস্তুনিষ্ঠ তথ্যচিত্র। বর্ণনা করেছেন চাষীদের উপর শোষণ, পীড়ন, অত্যাচারের মর্মন্তুদ ইতিহাস। দেশ ইংরেজ অধিকারের প্রথম পর্বে এবং পরবর্তী বিভিন্ন পর্যায়ে কৃষককুলের জীবনে শোষণের কঠিন গতিপ্রকৃতি তিনি বিধৃত করেছেন। রমেশচন্দ্র দত্তের মতে, 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে' বাংলার চাষীর যেটা প্রধান সর্বনাশ হয়, তা হচ্ছে জমিতে কৃষকের পুরুষানুক্রমিক রায়তি স্বত্ব বিলোপ করে জমিদারকে জমির মালিকানা স্বত্ব দেওয়া হল এবং এইজন্য এই ঐতিহাসিক কর্নওয়ালিসকেই দায়ী করেছেন। তিনি বললেন : "এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে দেশে যে অবশ্যম্ভাবী ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হল, পৃথিবীর ইতিহাসে তেমন অবস্থা আর কোথাও কখনই ঘটেনি। এই তড়িঘড়ি আইন চালু করার সব দোষ কর্নওয়ালিসের, এর ফলে জমিদার আর তার তাঁবেদারদের অত্যাচার আজও শেষ হয়নি। এর ফলে উর্বরা দেশের প্রচুর ফসলের সঙ্গে প্রচুর খাজনা আদায়ের যে সম্বন্ধ ছিল, তা সম্পূর্ণ নষ্ট হওয়ার সব দায়িত্বও ওই মহামহিম লর্ড সাহেবের উপরই বর্তাবে। যদিও চাষ-আবাদ আজকাল অনেক বেড়েছে, কিন্তু চাষীদের সম্পদ বাড়েনি এককণাও। এদিকে দেশ ভরে গেছে একদল কুঁড়ে বাদশা অপদার্থ জমিদারে—যাঁরা পৈত্রিক সম্পত্তির এক আনা-দু' আনা অংশ শুধু বসে বসে ধ্বংস করে। আজকে আমরা গ্রামের সেই প্রাণচঞ্চল গ্রাম্য সভ্যতার বিন্দুমাত্র খোঁজ পাই না, তার জন্য দায়ী

ওই লর্ড মহোদয়।" ব্রিটিশ যুগের বাঙ্গলার কৃষক সমাজের সম্পর্কে বিশিষ্ট ঐতিহাসিকের ওই মন্তব্য এখানে যুক্ত করার পেছনে একটি অন্যতম কারণ হল ফের দেশকে নতুন আঙ্গিকে পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ করবার প্রক্রিয়া জারী হয়েছে, স্বাধীনতার পাঁচ দশক পরেও। সেই গ্রন্থেই তিনি আরও লিখেছিলেন : "হ্যাঁ, কৃষকদের মধ্যে একটা নতুন জাগরণ এসেছে। দাসত্বের মোহে আচ্ছন্ন যুগ-যুগান্তরের ঘুম ভেঙে গেছে তাদের। আমরা দ্বিধামুক্তভাবে বলছি, আমরা খুশি। এর থেকেই প্রমাণ হচ্ছে যে সাধারণের মাঝে অবস্থার উন্নতি করার একটা প্রবল বাসনা জেগেছে। এমন বাসনা থেকেই স্বাধীন দেশে জাতির অধিকারবোধ আর ব্যক্তিস্বাধীনতার চিন্তা আসে। এ দেশে সমস্যা সমাধানের উপায় চিন্তার এই সবে সূত্রপাত হচ্ছে,.......।"

তেভাগা লড়াইয়ের উল্লেখ করেছি আগেই। এখানে বলা প্রয়োজন ইতিহাসের অপর একটি অধ্যায়ের কথা। কৃষকসমাজের উপর শোষণের মাত্রা অস্বাভাবিক রকমের বৃদ্ধির ফলে সঙ্কটের সৃষ্টি হয়। ব্রিটিশরাজ বাধ্য হয়ে 'ফ্লাউড কমিশন' গঠন করে। সেই কমিশনের বিবেচনায় আসে : "প্রকৃত চাষী যে জমি চষে—তা লাখেরাজ সম্পত্তি (Revenue Free) হোক, অথবা স্থায়িভাবে বা অস্থায়িভাবে বন্দোবস্ত প্রাপ্ত সম্পত্তিই হোক তাদের জমির মালিকানা দিতে হবে এবং সব ধরনের মধ্যস্বত্বভোগীদের স্বত্ব কিনে নেবার জন্য আইন প্রণয়ন করতে হবে।" এই প্রসঙ্গে ফ্লাউড কমিশন গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করেন যে, বর্গাদারদের (আধিয়ার) এই সুবিধা থেকে বাদ দেওয়া সঙ্গত হবে না। এই কমিশন ব্রিটিশ সরকারকে সুপারিশ করেন জমির মালিকের ভাগ হবে এক-তৃতীয়াংশ আর আধিয়াররা ভাগ পাবেন দুই-তৃতীয়াংশ। এই সুপারিশ কৃষক জনতাকে বিশেষ করে বর্গাদারদের ব্যাপকভাবে আলোড়িত করে। ফলশ্রুতিতে দেশ বিভাগের পর ১৯৫০ সালে বর্গাদার আইন প্রবর্তিত হয় এপার বাঙ্গলায়। পরবর্তী সময়ে ১৯৫৩ সালে জমিদারি ক্রয় আইন, ১৯৫৫ সালে পশ্চিমবঙ্গ ভূমিসংস্কার আইন তৈরি হয়। পশ্চিমবঙ্গের ভূমিসংস্কার সংক্রান্ত বিষয়ে দেখা যায় স্বাধীনতার পর থেকেই দিল্লি এবং রাজ্যে অধিষ্ঠিত একই দলের সরকার এ ক্ষেত্রে চরম গলদ পুষে রাখেন, বিশেষ উদ্দেশ্যে। ফলে আইনের ফাঁক-ফোকর দিয়ে সুবিধাভোগীদের উপর হস্তক্ষেপের সুযোগ থাকে কমই। রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবের কথা কারোরই অজানা নয়। ১৯৬৭, ১৯৬৯, এবং পরে ১৯৭৭ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ভিন্ন দৃষ্টিকোণ এক্ষেত্রে প্রযুক্ত হওয়ায় গ্রামীণ জীবনে প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন হয়ে গেছে। অর্থনীতিতে, সামাজিক ক্ষেত্রে তার ইতিবাচক উজ্জ্বল স্বাক্ষর সৃষ্টি হয়েছে। সারা দেশে উদ্বৃত্ত জমি বিলি হয়েছে ৪৪ লক্ষ ৫৯ হাজার একর। এই রাজ্যে জমির পরিমাণ সারা ভারতের শতকরা ৩.৬ ভাগ। কিন্তু সারা দেশ জুড়ে উদ্বৃত্ত জমি যা বিলি হয়েছে তার ২০ ভাগ জমি বিলি হয়েছে শুধু পশ্চিমবঙ্গেই। বণ্টিত জমির অধিকাংশই পেয়েছেন ভূমিহীন তফঃ জাতি ও উপজাতিভুক্ত মানুষ। বামফ্রন্ট সরকারের আড়াই দশকের জমানায় ৪০ লক্ষ বিঘার বেশি জমি সরকারের হাতে এসেছে ভূমিসংস্কারের অবকাশে। প্রায় সাড়ে ২৫ লক্ষ গরিব কৃষকের মধ্যে ৩৩ লক্ষ বিঘা জমি সরকারিভাবে বণ্টিত হয়েছে। আইনের মারপ্যাঁচে ৬/৭ লক্ষ বিঘা জমি গ্রামের গরিব ও ভূমিহীন কৃষক দখলে রেখে আবাদ করে যাচ্ছেন। জোতদারেরা আদালতে চার দেওয়ালের সহায়তায় যে বাধা তৈরি করে, গরিব ভূমিহীন সংগঠিত কৃষকসমাজ লাঙলের ফলায় তাকে নাকচ করে দিয়ে মানবিক ন্যায় বিচারের বাস্তবতা রচনা করেন। বিঘাপ্রতি ২০০০ টাকার ফসল উৎপন্ন হলে ৪০ লক্ষ বিঘা জমিতে প্রতি বছর ৮০০ কোটি টাকার কৃষিপণ্য উৎপাদিত হচ্ছে—ভূমিসংস্কারের ফলে। জোতদারের গোলায় না গিয়ে গরিব কৃষকের চাতালে জমা হচ্ছে, শস্যের সম্ভার। তাই নতুন করে চক্রান্ত তৈরি হচ্ছে, যাতে ফের ওই ফসল ঢুকতে পারে জোতদারের কব্জায়। তাই অধিকার রক্ষার সংগ্রাম সমাগত। বিভেদের ঝোড়ো বাতাস বইয়ে দেবার গভীর ষড়যন্ত্র—এমনি এমনি নয়! প্রসঙ্গত মনে পড়ে ডঃ অশোক মিত্রের সেই কথা : "হৃদয়ের তিক্ততা দিয়ে ইতিহাসের গতিকে ক্ষিপ্রতর করা যায় না, তিক্ততা থেকে নিস্পৃহতা, নিস্পৃহতা থেকে ঔদাসীন্য ঔদাসীন্যের সঙ্গে ওতপ্রোত জড়ানো আন্দোলনের মৃত্যুর অঙ্কুর।......এতবড়ো দেশের একটা-দুটো জায়গায় শ্রেণীশত্রুদের কিছুটা হটিয়ে দিয়ে নিজেদের ব্যূহ রচনা করতে পেরেছি, যে ব্যূহের উপর নির্ভর করে অচিরে অন্যত্র সংগ্রাম বিস্তার করার পরিকল্পনা খসড়া তৈরি করছি, সব কিছুই তো মিথ্যে হয়ে যাবে।"

সমস্যা হল ৮০,০০০ বর্গকিলোমিটার আয়তনের এই রাজ্যে শতকরা ১ থেকে ১.৫ ভাগ জমি পর্বতসঙ্কুলতা নিয়ে বিরাজিত। শতকরা ১০ ভাগ জমি সমুদ্র উপকূলের লবণাক্ত এলাকা, যা কিনা চাষবাসে অনুপযুক্ত। এসব বিভিন্ন কারণে জমির উপর চাপ প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়, নদী ভাঙন, কৃষিজমিতে নুড়িপাথরের আস্তরণ বাৎসরিক বন্যায় প্রতি বছর বাড়ছে, রাজ্যের উত্তরাংশের বেশ কিছু জেলায় আবাদি জমির পরিমাণ কমছে।

পশ্চিমবঙ্গ অনেক অনেক ক্ষেত্রেই মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে অতীত ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারি হিসাবে। এখানকার ভূমিসংস্কার, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, ত্রিস্তর পঞ্চায়েতি ব্যবস্থা, গণতন্ত্রের বিস্তার, ইত্যাদি বিভিন্ন উপাদানের সাযুজ্য নিয়েই এই রাজ্য এগোচ্ছে। সীমাবদ্ধতা অনেক আছে, করণীয় অনেক বাকি, তথাপি অগ্রগতি নিঃসন্দেহে অন্য রাজ্যগুলোকে নতুন পথের সঙ্কেত পৌঁছায় আজকের পশ্চিমবঙ্গ। রাজ্যের কৃষির সাফল্য শিল্পায়নের বাতাবরণ এনে দিয়েছে। অত্যাধুনিক শিল্পের স্থাপনায় বিনিয়োগ বাড়ছে বেশ আশাব্যঞ্জকভাবেই।

পশ্চিমবঙ্গের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সামগ্রিক সাফল্যের নিরিখে কৃষি বিষয়ক আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই রাজ্যের ঐতিহাসিক ও

JALPAIGURI

5 0 5 10 15 Kilometres
SCALE
CROPPING INTENSITY
BHUTAN
DARJEELING
BANGLADESH
COOCHBEHAR
ASSAM
N
Malbazar
Matiali
Nagrakata
M.G.Rly.
Chalsa
N. H.
Mal
Lataguri
Banarhat
Birpara
Madarihat
Phuntsoling
Jaygaon
Hasimara
Buxaduar
Hamiltonganj
Kalchini
Jayanti
Siliguri
Bhaktinagore
B.G.Rly.
Tista R.
Jaldhaka R.
Dhupguri
Falakata
Torsa R.
Alipurduar
Kumargram
Rajganj
Jalpaiguri
Mainaguri
Jalpesh
To Haldibari
REFERENCE
International Boundary
State Boundary
District Boundary
Sub-Division Boundary
Block Boundary
District Headquarters
Sub-Division Headquarters
Police Station
National Highway
Other Roads
River
LEGEND
100 to 150%
150 to 200%

ভৌগোলিক বাস্তবতা এবং এর দ্বারা উৎপন্ন পরিবেশ পরিস্থিতিকে বুঝে নিয়েই এগোনো প্রয়োজন। ফলত পশ্চিমবঙ্গের কৃষিক্ষেত্রের উন্নয়ন বেশ খানিকটা সমস্যাসঙ্কুল এবং জটিলও বটে। যেমন এই রাজ্যের জনঘনত্ব—জনঘনত্বের বিচারে ভারতবর্ষের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ, অথচ দেশের মাত্র ৩ ভাগ জমিতে দেশের ৯ ভাগ মানুষের জন্য খাদ্য জোগাতে হয় এই রাজ্যকে। তার পরেও সমস্যা হল ৮০,০০০ বর্গকিলোমিটার আয়তনের এই রাজ্যে শতকরা ১ থেকে ১.৫ ভাগ জমি পর্বতসঙ্কুলতা নিয়ে বিরাজিত। শতকরা ১০ ভাগ জমি সমুদ্র উপকূলের লবণাক্ত এলাকা, যা কিনা চাষবাসে অনুপযুক্ত। এসব বিভিন্ন কারণে জমির উপর চাপ প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়, নদী ভাঙন, কৃষিজমিতে নুড়িপাথরের আস্তরণ বাৎসরিক বন্যায় প্রতি বছর বাড়ছে, রাজ্যের উত্তরাংশের বেশ কিছু জেলায় আবাদি জমির পরিমাণ কমছে। স্বাভাবিক কারণেই বড় পরিবার ভেঙে ছোট চোট পরিবার গড়ে ওঠার প্রক্রিয়াতেও গ্রাম্যজীবনে কৃষিজমির পরিমাণ কমাচ্ছে। কৃষিজমিতে চায়ের খেত তৈরি হয়েও ব্যাপক পরিমাণে কৃষিজমি গ্রাস করছে। সমাজ-সভ্যতার বিকাশের ধারায় শিল্পের বিকাশের পথ ধরে বেশ কিছু পরিমাণ কৃষিজমি কমছে, যত দিন যাবে ততই এই প্রক্রিয়া আরও শক্তিশালী হবে। তাই কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর প্রশ্নে একটা চ্যালেঞ্জ আমাদের সামনে ফুটে উঠেছে। সেচের প্রয়োজন অনুযায়ী, ব্যবস্থা করবার ক্ষেত্রেও রয়ে গিয়েছে অপ্রতুলতা। এমন একটা বাতাবরণে দাঁড়িয়ে বিগত আড়াই দশক ধরে পশ্চিমবঙ্গে কৃষকসমাজের অনলস শ্রম, প্রচেষ্টা, সংগ্রাম, রাজ্য সরকারের পরিকল্পনা এবং তার বাস্তবায়ন এসবের মাধ্যমেই বাংলা তার মর্যাদাকে দেশের দরবারে সম্মানজনক স্থানে উপনীত করতে পেরেছে। বিশেষ করে কৃষির ক্ষেত্রে রাজ্যের অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন, অবশ্যই দেশবাসীর নজর কেড়েছে। যদিও এখনো করণীয় কম নেই! এ ক্ষেত্রে আত্মতুষ্টির কোনও সুযোগ নেই। সময় এগোচ্ছে, পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিজ্ঞান-প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে আরও এগোবার বিষয়ে কৃষিবিজ্ঞানীদের পরামর্শে গুরুত্ব আরোপের সময় এসেছে। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে—ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক কারণে সমস্যাসঙ্কুল রাজ্যে কেমন করে কৃষির ক্ষেত্রে মাত্র আড়াই দশকে অমন সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হল? সংশ্লিষ্ট মহল থেকে এর উত্তরে যা জানা যায়, তা হল সঠিক সময়ে উন্নত মানের বীজ, সার, সেচ, প্রশিক্ষণ, উপযুক্ত প্রযুক্তি সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে বলেই, কৃষির ক্ষেত্রে 'উন্নয়ন' ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারছে। আর এই নিবন্ধের সূচনাপর্বে আলোকপাতের যে চেষ্টা করা হয়েছে—ভূমিসংস্কারের প্রশ্নে, সেই ভূমিসংস্কারের ফলে প্রকৃত চাষীর হাতে, যে চাষীর ছিল যুগ-যুগান্তরের 'জমির ক্ষুধা' প্রধানত সেই চাষীর হাতে জমির অধিকার সুনিশ্চিত করেই, পশ্চিমবঙ্গ কৃষিক্ষেত্রের উন্নয়নকে ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে নিতে পারছে। একে আরও বেশি সমৃদ্ধ করবার প্রশ্নে ইতিবাচক পদক্ষেপ, আজ সময়ের দাবিতে পর্যবসিত হয়েছে। গ্রামবাঙলা জুড়ে বিদ্যুতের দাবি সেচের জন্য—আজ প্রধান দাবি হয়ে উঠেছে। কৃষিপণ্যের লাভজনক দাম সুনিশ্চিত করা যাচ্ছে না, তাতে উৎপাদন হ্রাসের আশঙ্কা থাকছে। গভীরভাবে ভাবিত করছে সমস্যাটি। অন্যদিকে বিশ্বায়ন, উদারীকরণ এসবের 'মারণ-ধাক্কা' সামলে-সুমলে চলার মতো অর্থনৈতিকভাবে দৃঢ়তারও প্রশ্ন—এরই সঙ্গে সম্পৃক্ত। ভূমিসংস্কারের সাফল্য হিসাবে কৃষকের হাতে পাওয়া জমির অধিকার বজায় রাখার ক্ষেত্রের ত্রুটি-দুর্বলতা দূর করতে সরকার এবং কৃষক সংগ্রামকে আরও বেশি দায়বদ্ধ হতে হচ্ছে, যার চাহিদা শুধু কৃষকের আঙিনাতেই থমকে দাঁড়িয়ে তা নয়। বরং সমাজের অগ্রগামী অংশের সমস্ত মানুষই এতে ভাবিত, চিন্তিত এবং ইতিবাচকতার সন্ধানে পরিব্যাপ্ত বলা যায়। প্রসঙ্গত বলি—রাজা দশরথ মৃগয়ায় গিয়েছিলেন, শিকার মেলেনি সেদিন। ঘুরতে ঘুরতে এসে হাজির হলেন এক নদীর ধারে। তখন অন্ধ মুনির ছেলে সিন্ধু আশ্রমের জন্য নদী থেকে পানীয় জল ভরছিল কলসিতে। শিকারসন্ধানী দশরথের কানে এলো কলসিতে জল ভরবার শব্দ। দশরথ ভাবলেন হয়তো বা হরিণ জল খাচ্ছে নদী থেকে, তারই শব্দ। নিঃশব্দে সুচারু হাতের শব্দভেদী বাণ ছুড়লেন, হরিণের উদ্দেশে। তীরবিদ্ধ হ'ল সিন্ধু। মৃত্যুপথগামী পুত্রের জবানবন্দী থেকে অন্ধমুনি অবগত হলেন ঘটনাক্রম। শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলো মুনিপুত্র সিন্ধু। ক্রুদ্ধ অন্ধমুনি অভিশাপ দিলেন শিকারি রাজাকে। "আমি যেভাবে পুত্রশোকে যন্ত্রণাবিদ্ধ হয়েছি, দশরথ তোমাকেও তেমনিভাবে পুত্র মৃত্যু-শোক ভোগ করতে হবে।" শাপে বর হল দশরথের। অভিশাপ মাথা পেতে নিলেন আশীর্বাদ হিসাবে। তার পরের কাহিনী সবারই জানা আছে। বহু ব্যবহৃত মহাকাব্য রামায়ণের এই ঘটনাটির আশ্রয় নেবার প্রয়োজন হল এই কারণে—রাজ্যে কৃষকসমাজের 'জমির ক্ষুধা' মেটানোর সীমাবদ্ধ ব্যবস্থাটিও অবশ্যই তাঁদের জীবনে আশীর্বাদ হয়ে এসেছে। কিন্তু যখন সংবাদ শিরোনামে আমাদের দেখতে হয়, উচ্চ ফলনশীল টমেটোর আবাদ করতে গিয়ে কৃষক দেনার দায়ে আত্মহত্যা করেছেন, তখন ভাবতে হয় কৃষকের জমিতে অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়ার আশীর্বাদ অভিশাপ হয়ে আসবে না তো? কৃষিপণ্যের বিপণনে আরও বেশি সতর্কতার দাবি উঠেছে। তাই সংশ্লিষ্ট মহলকে সীমাবদ্ধতার মধ্যেও এগিয়ে যাবার 'বীজমন্ত্র' ছড়াবার কাজ গভীরভাবে করতে হচ্ছে। এক্ষেত্রে

রাজ্যের কৃষিক্ষেত্রের এগিয়ে চলার গান তো একক সঙ্গীত নয়, সেই সমবেত সঙ্গীতে গলা মিলিয়েছেন প্রত্যন্ত জলপাইগুড়ি জেলার কৃষকসমাজ। ছোট্ট জেলা। ৬২৪৫ বর্গকিলোমিটারের আয়তন। একদিকে ভুটানের পাহাড়, জঙ্গল, অসম রাজ্য, কোচবিহার জেলা, ওপাশে বাংলাদেশ সীমান্ত। জেলাটির কৃষিজমির পরিমাণ খুব বেশি নেই। বিভিন্ন শস্য উৎপন্ন হয় ২,২৭,৩০০ হেক্টর জমিতে। একই জমিতে বছরে দুটো চাষ হয় ১,৯০,৭৫০ হেক্টরে। একই জমিতে বছরে তিনটে করে ফসল ফলে ১,৭৫,৭৮৯ হেক্টর জমিতে।



JALPAIGURI
[redacted]
SCALE
5 0 5 10 15 Kilometres
N
BHUTAN
ASSAM
COOCHBEHAR
BANGLADESH
DARJEELING
Siliguri
Bhaktinagore
Malbazar
Mal
Lataguri
Matiali
Chalsa
Nagrakata
Banarhat
Birpara
Madarihat
Falakata
Dhupguri
Jalpaiguri
Rajganj
Maynaguri
Jalpesh
To Haldibari
Tista R.
Jaldhaka R.
N.H.
B.G.Rly.
M.G.Rly.
Jaygaon
Phuntsoling
Hasimara
Buxaduar
Hamiltonganj
Kalchini
Jayanti
Alipurduar
Kumargram
REFERENCE
International Boundary
State Boundary
District Boundary
Sub-Division Boundary
Block Boundary
District Headquarters
Sub-Division Headquarters
Police Station
National Highway
Other Roads
Metergauge Rly.Line
River
LEGEND
Oilseed — ▲▲ represents 500ha
Jute — ●● " 400ha
Wheat — ■■ " 500ha

আমাদেরও দায়বদ্ধতা কম-বেশি থেকেই যায়। তাই আয়নায় নিজেদের মুখটাকে ভালভাবে নিরীক্ষণ করা বাতুলতা—এমন অভিমত পাওয়া যায় না মনে রাখা প্রয়োজন—একটু বেচাল হলেই 'বেতাল-তরঙ্গ' ঝমঝমিয়ে আক্রমণ শানাবে।

১৯৭৭ সাল। রাজ্যে এলো বামফ্রন্ট সরকার। সে অনেক কঠিন রক্তময় সংগ্রামময় পথ বেয়েই ক্ষমতায় আসা। পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় জননেতা জ্যোতি বসু মুখ্যমন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেই সেদিন বলেছিলেন : "জনগণই আমাদের শক্তি—এঁরাই আমাদের ক্ষমতায় এনেছেন, আমাদের সর্বশক্তি দিয়ে আমরা জনগণের এই বিপুল আস্থা ও বিশ্বাসের যোগ্য হতে চেষ্টা করবো।" সে সময় ৩৬ দফা কর্মসূচির মাধ্যমে সমাজের সমস্ত অংশের মানুষের সামাজিক-অর্থনৈতিক অধিকার অর্জনের পথকে সুনিশ্চিত করবার জন্য বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করেছিল। উল্লেখ্য, বিশেষ করে সমাজের নিচুতলার মানুষের (আর্থ-সামাজিক প্রশ্নে) জন্য বিশেষ বিশেষ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছিল, যেমনটি আজও চলছে অব্যাহত গতিতে। তারই ছোঁয়ায় রাজ্যজুড়ে সাফল্যের শিল্পমাধুর্যময় আলপনা আঁকার কাজ আজও চলছে ধারাবাহিকভাবে। তারই ফলশ্রুতিতে শস্যের উজ্জ্বল শ্যামল আঁচলে ভরে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের 'সোনার বাংলা'। সোনালি ফসলের প্রচ্ছদপট সৃষ্টি হচ্ছে প্রতিদিন, গোটা রাজ্যজুড়ে। উন্নত চেতনার প্রক্ষেপণ ঘটাচ্ছে, আলোক সম্পাত, শস্যের ফলবতী প্রান্তরে-প্রান্তরে।

রাজ্যের কৃষিক্ষেত্রের এগিয়ে চলার গান তো একক সঙ্গীত নয়, সেই সমবেত সঙ্গীতে গলা মিলিয়েছেন প্রত্যন্ত জলপাইগুড়ি জেলার কৃষকসমাজ। ছোট্ট জেলা। ৬২৪৫ বর্গকিলোমিটারের আয়তন। একদিকে ভুটানের পাহাড়, জঙ্গল, অসম রাজ্য, কোচবিহার জেলা, ওপাশে বাংলাদেশ সীমান্ত। জেলাটির কৃষিজমির পরিমাণ খুব বেশি নেই। বিভিন্ন শস্য উৎপন্ন হয় ২,২৭,৩০০ হেক্টর জমিতে। একই জমিতে বছরে দুটো চাষ হয় ১,৯০,৭৫০ হেক্টরে। একই জমিতে বছরে তিনটে করে ফসল ফলে ১,৭৫,৭৮৯ হেক্টর জমিতে। ১৯৯৭-১৯৯৮ সালের এক পরিসংখ্যান বলছে ফসল উৎপন্ন হয় মোট ২,০৯,৪২৭ হেক্টরে। ওই একই বছরের হিসেবে পাওয়া যায় চাষযোগ্য মোট জমি হচ্ছে, ৪,২৫,৯১৫ হেক্টর। সবুজের সমারোহ বিছিয়ে থাকা জলপাইগুড়ি জেলায় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির প্রশ্নে কিছু তুলনামুলক পরিসংখ্যানের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। উন্নয়নের প্রশ্নে তথ্যই কথা বলছে অগ্রগতির।

বছর	সেচ ব্যবস্থা একরের হিসেব
১৯৭৬—৭৭	৬২২৪০·০
১৯৭৭—৭৮	৬৪৪৮৬·০
১৯৯৮—৯৯	৮৭৭৬২·০

রাসায়নিক সারের ব্যবহার হেক্টর প্রতি কিলোগ্রাম

বৎসর	নাইট্রোজেন	ফসফেট	পটাশ	মোট
১৯৭৬—৭৭	১৫৭·৮৭৬	৩৯·১৫৭	৪৪·৯৩৩	২৪১·৯৬৬
১৯৭৭—৭৮	১৩৪৮·০	৮১০·০	৫৭০·০	২৭২৮·০
১৯৯৮—৯৯	২৪৯৮৪·০	১১৯২২·০	৬৭৬৭·০	৪২৯৭৩·০

❑ আউস ধান ❑

বৎসর	একর	উৎপাদন হাজার মেট্রিক টন হিসাবে
১৯৭৬—৭৭	৫৩৯৬৬·০	৩৫·৯৪১
১৯৭৭—৭৮	৪৬১৩৬·০	২৯·৭৭৪
১৯৯৮—৯৯	১৬৭১০০·০	১১১·৫৬

❑ আমন ধান ❑

বৎসর	একর	উৎপাদন হাজার মেট্রিক টন হিসাবে
১৯৭৬—৭৭	৯১২২৮·০	৬৩·৪০৩
১৯৭৭—৭৮	৮৬৫২৭·০	৬৩·৭৭০
১৯৯৮—৯৯	৪৯৫৫০০·০	২১৩·০০

❑ গম ❑

বৎসর	একর	উৎপাদন হাজার মেট্রিক টন হিসাবে
১৯৭৬—৭৭	৫৯১০১·০	৩৬·৯৫৫
১৯৭৭—৭৮	৬৪৯৫৫·০	৪৩·৫৯৪
১৯৯৮—৯৯	৭৩৭৫০·০	৫৪·৫৭৫

❑ পাট ❑

বৎসর	একর	উৎপাদন হাজার বেল হিসাবে
১৯৭৬—৭৭	৪৪৬৬৫·০	১৫১·৮২
১৯৭৭—৭৮	৪৮১৪৮·০	১২৪·৭৩
১৯৯৮—৯৯	৯৯৭৫০·০	৪১৮·৯৫০

❑ আলু ❑

বৎসর	একর	উৎপাদন হাজার মেট্রিক টন হিসাবে
১৯৭৬—৭৭	৯৬৯৫·০	২০·১৩৭
১৯৭৭—৭৮	১০৫০২·০	২৭·৮৪১
১৯৯৮—৯৯	৫০৮৪০·০	৪০৪·১১৬

❑ ডালশস্য ❑

বৎসর	একর	উৎপাদন হাজার মেট্রিক টন হিসাবে
১৯৭৬—৭৭	১০৩০৯·০	৩·৯৪০
১৯৭৭—৭৮	১৪৬৬৬·০	৪·১৮৭
১৯৯৮—৯৯	১৩৫১২·৫০	৪·৮৭৯

❑ তৈলবীজ ❑

বৎসর	একর	উৎপাদন হাজার মেট্রিক টন হিসাবে
১৯৭৬—৭৭	৯৪৭৫·০	২·৩০৯
১৯৭৭—৭৮	১৬৬৩৫·০	৪·১০৭
১৯৯৮—৯৯	২৮৯৯২৫·৫০	১০·২২৩

❑ সব্‌জি চাষ ❑

বৎসর	একর	উৎপাদন হাজার মেট্রিক টন হিসাবে
১৯৭৬—৭৭	৬০০০·০	২৪·৬৫
১৯৭৭—৭৮	৮০০০·০	৩২·৬০
১৯৯৮—৯৯	১০১৫৯২·৫	৬১৬·৪১৯

রোগ-পোকার ঔষধ বিতরণ বিনামূল্যে

	কীটনাশক			ফাংগাস থেকে গাছ রক্ষায়	
বৎসর	তরল→লিটার	গুড়ো→কেজি	দানাদার কেজি	তরল→লিটার	জলে দ্রবণীয় পাউডার
১৯৭৬—৭৭	১৮৭২৪·০	৯৯৪৭২·০	৯১৭·০	৭৩৪·০	১৪৫৭৯·০
১৯৭৭—৭৮	৯৩৪৫·০	৭৩৮৫৭·০	২৭২·০	৩০৯·০	৩৮৭৬·০
১৯৯৮—৯৯	২২৭৫৫·০	৯০৯০৫·০	৯৫০·০	১২১৮·০	১৮৭৪৯·০

তথ্য কথা বলে

বৎসর	মোট কৃষিযোগ্য জমি	একফসলী জমি (নিট)	ফলনের শতকরা হার
১৯৭৬—৭৭	৮৬৬২২৭·০ একর	৫৫০৮৭৫·০ একর	১৫৭%
১৯৭৭—৭৮	৮৭৪৮৭২·০ একর	৫৫৫৫৫৪·০ একর	১৫৭·৪৭%
১৯৯৮—৯৯	১০৮৭২৫৫·০ একর	৯২৯৮৭৫·০ একর	২০৫%

* ২০৫%-এর হারে আরও ·৫% থেকে ·৬% বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে আলোচ্য সময়ে।

উপরের দেওয়া বিভিন্ন তথ্য থেকেই আমাদের ধারণা স্পষ্ট হয় যে, রাজ্যে কৃষিক্ষেত্রে যে অভূতপূর্ব উন্নয়ন ধারাবাহিকভাবে বাড়ছে, মাটিতে অম্লের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি থাকা সত্ত্বেও, বিভিন্ন প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা থাকা সত্ত্বেও প্রত্যন্ত জেলা জলপাইগুড়ির এক্ষেত্রে অগ্রগতি অবশ্যই সম্মানজনক। জমিতে সেচ, জৈব ও রাসায়নিক সারের ব্যবহার। উন্নত বীজ, কীটনাশকের ব্যবহার, মাটি পরীক্ষা করিয়ে চাষের কাজে হাত দেওয়া বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ইত্যাদি এমন অসংখ্য উপাদানের সমাহারই—জেলার সম্মান বাড়াচ্ছে। একই জমিতে একই মরসুমে একই সব্জির একাধিকবারের চাষ অতি সাম্প্রতিক বিষয়, সাফল্য ব্যাপক। কৃষক দু'টো পয়সার মুখ দেখেছেন। গ্রামীণ জীবনে আর্থ-সামাজিক ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। এর প্রভাব পড়ছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, সংস্কৃতিচর্চার আঙিনায়, গ্রামীণ মানুষের ক্রমক্ষমতা বৃদ্ধির চালচিত্রে।

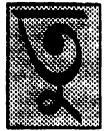
কৃষি বিভাগের কর্মীদের সঙ্গে পঞ্চায়েত এবং কৃষক সমিতির যোগ কাজের গতি বাড়িয়েছে। ত্রুটি-দুর্বলতার শেষ নেই, কিন্তু এঁদের শ্রম রাজ্যের কৃষি উৎপাদনে নতুন মাত্রা দিয়েছে যা কিনা অতি বড় শত্রুরাও স্বীকার করতে বাধ্য হয়। বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের দ্বারা কৃষক পরিবারের সদস্যদের চাষের কাজে আরও বেশি সক্ষম করে তোলা হয়েছে। কৃষিঋণের মধ্য দিয়ে কৃষিতে পুঁজির প্রয়োজনীয় প্রয়োগ বেড়েছে। এখন বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থাও ব্যবসায়িক কারণে প্রযুক্তির ব্যবহারে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। রাজ্য সরকারের কৃষি দপ্তর—উন্নত প্রথায় চাষ, সঠিকভাবে রোগপোকা দমন, শত্রুপোকা, মিত্রপোকা চেনাবার প্রকৌশল, সারের ব্যবহার, কীটনাশকের ব্যবহার, সেচের জলের সঠিক ব্যবহার, কম খরচে পাম্প সেটের ব্যবহার, একফসলি জমিকে তিন ফসলি জমিতে পরিণত করে লাভবান হবার প্রশিক্ষণ। একই চাষে নয়, বিভিন্ন ধরনের চাষের দ্বারা জমির উর্বরতা বাড়িয়ে লাভবান হবার পথ, ইত্যাদি বিভিন্ন খুঁটিনাটি অথচ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নিয়মিত বিশেষজ্ঞদের দ্বারা প্রশিক্ষণদের ব্যবস্থা করছে। এসব বিভিন্ন বিষয় মিলিয়েই অগ্রগতি সূচিত হয়েছে। সম্প্রতি জলপাইগুড়ি জেলার বেশ কিছু ব্লকে কৃষিতে পুঁজির অনুপ্রবেশ বাড়ছে অকৃষকদের দ্বারা। জমি লিজ নিয়ে উচ্চফলনশীল আবাদের আশাপ্রদ প্রবাহ সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য এই পদ্ধতিতে সবটাই ভাল, কোনও নেতিবাচকতা নেই তা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মহল মনে করছেন, তা নয়। জলপাইগুড়ি জেলার সব্জি এখন গোটা বছর জুড়েই অসম, সিকিম, দিল্লি, পাটনা ইত্যাদি অনেক জায়গায় নিয়মিতভাবে রপ্তানি হচ্ছে। সব্জি পাঠাবার বাক্সের ছোট ছোট কারখানা প্রতিদিন সংখ্যায় বাড়ছে। জমিকে কেন্দ্র করে সারা বছর কর্মসংস্থানের পরিমাণ অনেকটাই বেড়েছে। হিমঘরের সংখ্যা বাড়ছে। স্পন্দন জেগে উঠেছে প্রতিটি ব্লকের গ্রামীণ এলাকা। সমস্যা অনেক। কিন্তু সম্ভাবনাও কম নয়। জেলায় কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপনার পরিস্থিতি এখন বর্তমান। সরকারি, বেসরকারি উদ্যোগ এতে যুক্ত করে কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে। অন্যদিকে, সম্ভাবনাকে কাজে না লাগাতে পারার যন্ত্রণাও বাড়ছে। বাড়ছে কোনও কোনও ক্ষেত্রে হতাশা। এই হতাশা থেকে প্রতিক্রিয়ার শক্তি, সমাজ-সভ্যতাকে পিছু টানবার চেষ্টা করছে। এর সুযোগ নিতে চাইছে বিদেশি বলদর্পী শক্তি। দেশের বর্তমান অর্থনীতির টানেও সম্ভাবনা উবে যাচ্ছে। উন্নয়ন আরও উন্নয়নের যে বাতাবরণ রয়েছে এতদঅঞ্চলে, রাজ্যের সর্বত্র তাকে কলুষিত করার প্রক্রিয়ায় মদত জুগিয়ে যাচ্ছে দিল্লিশাহি, ফলে সংহতি-সম্প্রীতি-ঐক্য-সংগ্রাম, উন্নয়নের পথে কাঁটা বিছিয়ে দেবার কাজ চলছে। এ ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের ভূমিকা নিয়েও দেশপ্রেমিক, উন্নয়নকামী মানুষেরা অকাট্য যুক্তিজাল বিস্তার করছেন; তথাপি শ্রেণীস্বার্থেই ওসব চলছে, চলবেও! কাজেই রাজ্য সরকারের জনমুখী দৃষ্টিভঙ্গিকে সাথী করে, এগিয়ে চলার পথকে, পথ চলার উপযুক্ত করে নিতে দায়বদ্ধতার বিষয়টি অবশ্যই নতুন মাত্রা পেতে চায়। এটাই সময়ের দাবি। শস্যের সবুজ সোনালি মলাটে গ্রাম্য পরিবেশকে ভরিয়ে দিতে হলে যেতে হবে আমূল ভূমিসংস্কারের কঠিন পথে; তারই অনুসারী হয়ে উন্নয়ন, ঐতিহ্য-পরম্পরার বিষয়কে গুরুত্ব দেবার সময় এসেছে। বিভেদের রক্তাক্ত আঙিনায় নয়, মৈত্রীর পারস্পরিকতায় আনতে হবে সেই দিন, যে দিনের স্বপ্ন বুকে হাঁটছে লক্ষ জনতা। তাই জীবনের জন্য সংগ্রামই শেষ কথা, জীবনের জন্য সৃষ্টিই শেষ কথা। যে কৃষক মাটির কানভ্যাসে লাঙলের তুলি দিয়ে আঁকেন শস্যের সম্ভার—তাঁকেই আঁকতে হবে সেই মাটিতে জীবন জয়ের গান, পাশে আছেন লক্ষ জনতা। সেই সংগ্রামরত জীবনের মিছিল নীলাকাশে দুহাত উঁচিয়ে আহ্বান দেয়: তোমরা যখন সূর্যের রং মুছে দিতে চাইছো, আমরা তখন বৃষ্টিধোয়া আকাশ জোড়া রামধনু রং ছড়াই। তোমরা যখন ঝড়ের মাঝে ঘূর্ণিতে ভাসাতে চাইছো, আমরা তখন মাটির সহস্র বন্ধনে জড়িয়ে থাকি। ভয় পাই না তোমাদের, আমরা পৃথিবীর মানুষ। আমাদের দু'হাতে ফোটে কৃষ্ণচূড়া, আবার সেই হাতেই বাজাই নক্ষত্র জয়ের দামামা। গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে উচ্চকিত হয়: মানুষেরা আলোর পথেই চলে। প্রতিদিন আরও বেশি এগিয়ে এগিয়ে আর পশুরা আঁধারে ফেরে প্রতি রাতে কোটরে, বিবরে।

লেখক ❑ সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক

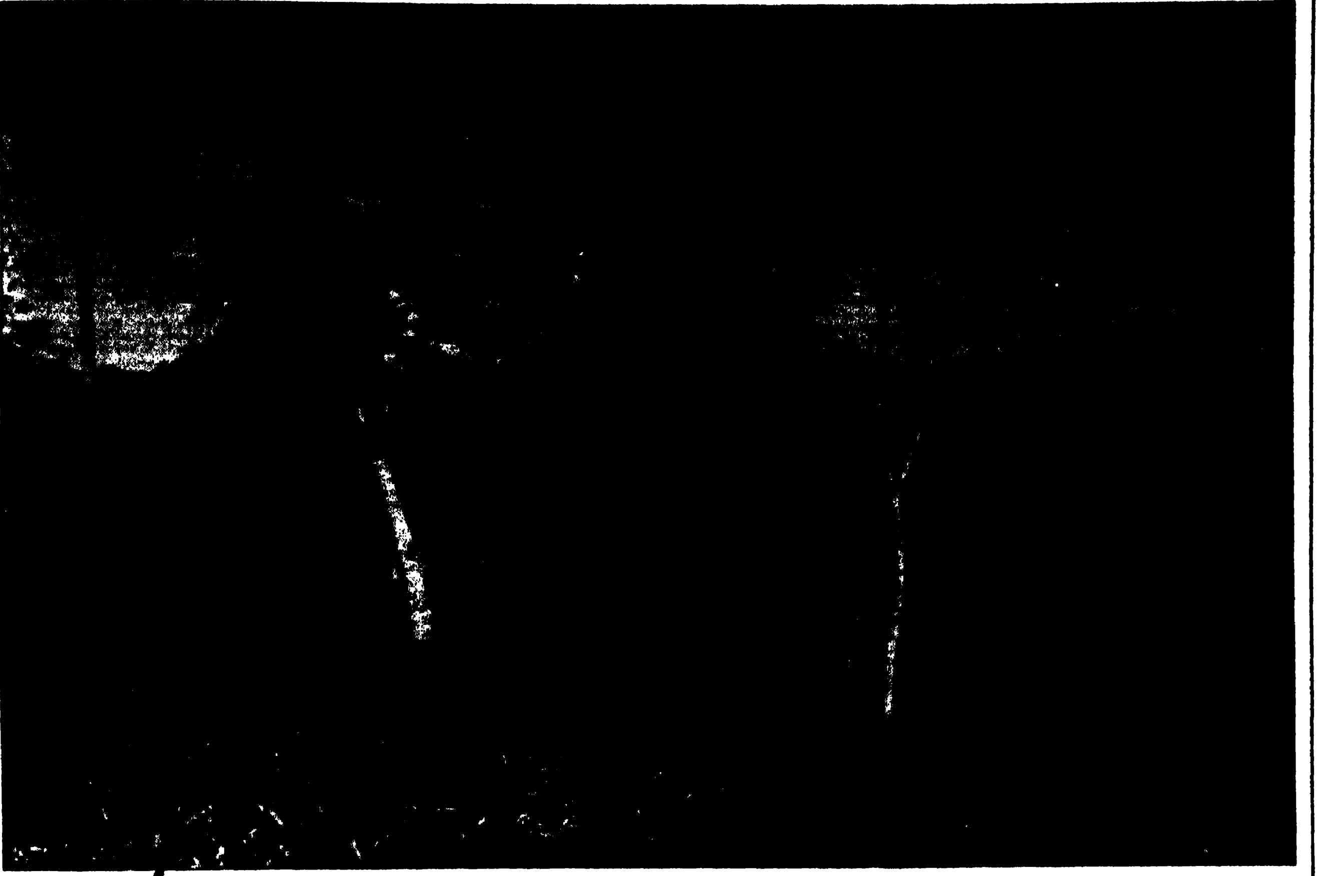


চণ্ডীদাস লাহিড়ী

বাণিজ্যিক ঐতিহ্যে জলপাইগুড়ি



তুষারধবল উত্তুঙ্গ গিরিরাজ হিমালয়, শ্বাপদ-সঙ্কুল আদিম অরণ্য সবুজ গালিচায় ঢাকা চা-বাগিচা ও প্রান্তর, অসংখ্য দুরন্ত নদী ও অনামা ঝর্ণাবেষ্টিত জেলা জলপাইগুড়ি ইতিহাসের কালের বিচারে নেহাতই অর্বাচীন। কিন্তু জেলার কিছু জনপদ ও নদীর নামের তাৎপর্য ও তার ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এই জেলার প্রাচীনত্ব ও তার সুপ্রাচীন বাণিজ্যিক ঐতিহ্যের প্রতি সুনির্দিষ্ট ইঙ্গিত বহন করে। জেলা সংক্রান্ত অন্যান্য আনুষঙ্গিক প্রাচীন উপাদানগুলিও ওই ইঙ্গিতের অনুসারী ও পরিপূরক। বর্তমান জলপাইগুড়ি জেলা সুপ্রাচীন কালে পুণ্ড্রবর্ধন, পরবর্তীকালে বরেন্দ্রভূমি, মোঘল আমলে বরিন্দ এবং ব্রিটিশ আমলে অবিভক্ত বাঙলার রাজশাহী ডিভিশনের, যা সাধারণ মানুষের কাছে উত্তরবঙ্গ নামে পরিচিত, প্রধান কার্যালয় ছিল। এই বরিন্দের উত্তরে হিমালয়ের তরাই পর্বতসানুর অস্বাস্থ্যকর জলীয় নিম্নভূমিতে জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও পূর্ণিয়া জেলায় অংশ বিশেষ। এই অংশ ছিল বিরল বসতিপূর্ণ। ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে ও পর্বে এই অঞ্চলের ঐতিহাসিক সত্তার রাষ্ট্রনৈতিক ও প্রশাসনিক রূপান্তর ঘটেছে বারবার নানাভাবে। পৌরাণিক যুগে বাঙলার উত্তরভাগ, পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির কোটিবর্ষ বিষয়টি, পূর্বভারতের সুবিস্তৃত ও বিখ্যাত প্রাগ-জ্যোতিষপুর, সাম্রাজ্যের অংশ ছিল। পরবর্তীকালে, পূর্বাঞ্চলের শক্তিশালী কামরূপ সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত হয়। ষোড়শ শতাব্দীর সূচনায় কোচবিহার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই অঞ্চলটি কোচবিহার রাজ্যের অন্তর্গত হয় কিন্তু মধ্যযুগীয় ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে কোচবিহার রাজবংশেরই এক ঘনিষ্ঠ শাখা "দেব রায়কত" উপাধিধারী রাজার অধীন বৈকুণ্ঠপুর স্বতন্ত্র রাজ্য হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে ভারতীয় ইতিহাসের মূল ধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আঞ্চলিক ইতিহাসের পাদপ্রদীপে স্বকীয়তায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে যার, প্রধান দুর্গ ও রাজধানী ছিল জলপাইগুড়ি। কিন্তু কোম্পানির আমলে বৈকুণ্ঠপুর ব্রিটিশ ভারতের একটি



ধূসর পাহাড়ের পাদদেশে বিস্তীর্ণ সবুজ চা বাগান

পরগনা ও জমিদারিতে (বত্রিশ হাজারী) পর্যবসিত হয় এবং নানা সীমানা ও প্রশাসনিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ১৮৬৯ অব্দের পয়লা জানুয়ারি বর্তমান জলপাইগুড়ি জেলার সৃষ্টি হয় যার, র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ অনুসারে, অঙ্গচ্ছেদ ঘটে স্বাধীনতা প্রাপ্তির মূল্যস্বরূপ।

এই সুপ্রাচীন ঐতিহ্যময় জনপদটির ধূলিধূসরিত অন্ধকারাচ্ছন্ন ইতিহাসরূপী অহল্যার দুর্ভাগ্যক্রমে, এখনও শাপমুক্তি ঘটেনি সম্ভবত কোন শ্রীরামচন্দ্রের আগমন অপেক্ষায়। এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সীমিত পরিসরে জলপাইগুড়ি জেলার বাণিজ্যিক ঐতিহ্যের সন্ধানে এই অঞ্চলের সুপ্রাচীন অতীত ও সাম্প্রতিক অতীত কালের ব্যবসা-বাণিজ্যের অনালোকিত একটা বিশেষ দিক নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনার জন্য এই নিবন্ধের অবতারণা।

স্মরণাতীত কাল থেকে বহির্ভারতীয় দেশগুলির সঙ্গে স্থলপথে ও জলপথে বাঙলা তথা পুণ্ড্রবর্ধন ও বৃহত্তর ভারতের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক লেনদেন প্রচলিত ছিল বাঙলার সুতি ও রেশম বস্ত্র সুদূর মিশর ও রোম দেশ পর্যন্ত রপ্তানি হত। বারেন্দ্রভূমিতে এলাচ ও লবঙ্গের সুবিস্তৃত চাষের প্রচলন ছিল এবং ভারতের অন্যান্য মশলার সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে এশিয়া, মিশর, পূর্ব-দক্ষিণ য়ুরোপে চালান যেত। পুণ্ড্রবর্ধনের ইক্ষু, ইক্ষুজাত দ্রব্য—চিনি ও গুড় দেশে-বিদেশে সুখ্যাত ও সুপরিচিত ছিল। পুণ্ড্রদেশে দুকুল (খুব সূক্ষ্ম) বস্ত্র, ক্ষৌম (একটু মোটা) বস্ত্র, পত্রোর্ণজাত বস্ত্র মগধ ও কার্পাসিক বস্ত্র (অনুমান করা যায় বাণিজ্যিক শিল্পোদ্যোগে) উৎপাদন করা হত এবং প্রচুর পরিমাণে নিয়মিত দেশে-বিদেশে রপ্তানি করা হত। কিরাত দেশে (উত্তরবঙ্গে) খুব উচ্চমানের তেজপাতা পাওয়া যেত এবং সমুদ্রপথে তা রপ্তানিও করা হত বাণিজ্যিক পণ্য হিসাবে। বাঙলার উত্তরে (জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলা) পর্বত সানুদেশের প্রচুর পিপ্পলি উৎপন্ন হত। এই পিপ্পলি ছিল অতি উচ্চমানের যার বিশেষ কদর ও উচ্চ চাহিদা ছিল পাশ্চাত্য দেশগুলিতে। রোমদেশীয় বণিকেরা এর বিশেষ গুণগ্রাহী ছিলেন ও যাবতীয় পিপ্পলির একচেটিয়া খরিদ্দার ছিলেন। এঁদের মারফত ওই পণ্য পাশ্চাত্যের বাজারে পৌঁছাত।

প্রাচীন বাঙলার ব্যবসা-বাণিজ্যের উপকরণ ছিল বাঙলার ভূমিজাত ও শিল্পজাত দ্রব্যাদি। ফলমূল, মাছ ইত্যাদি দ্রুত পচনশীল দ্রব্যাদির আন্তর্জাতিক বা আন্তর্দেশীয় বাণিজ্য সে যুগে সম্ভব ছিল না। তবে গ্রাম-গঞ্জের হাটে ও শহরের বাজারে বা পাশাপাশি গ্রামের সঙ্গে ঠিক এ যুগের মতই ওই সব দ্রব্যের বড় আকারের না হলেও ছোট আকারের ব্যবসা-বাণিজ্য যে চলত একথা অনুমান করে নিতে কোনও অসুবিধা হয় না। প্রাচীন বাঙলার ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া খুবই দুষ্কর। বিদেশি পর্যটক ও ঐতিহাসিকদের লিখিত বিবরণ, শিলালেখ, তাম্রপট, দানপত্র ইত্যাদিতে বিক্ষিপ্ত উল্লেখ বা রাজনির্দেশ থেকে পাওয়া তথ্য থেকে একটা মোটামুটি ধারণা করা সম্ভব। ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত নানা শব্দের প্রচলন প্রাচীন সমাজের দৈনন্দিন জীবনে ছিল। যেমন, হট্ট, হট্টিকা, হট্টিয় গৃহ, হট্টবর, আপণ,

মানপ (তৌলদার = দোকানদার = ছোট ব্যবসায়ী) ইত্যাদি শব্দের বিবরণ থেকে সহজেই অনুমান করে নেওয়া যায় যে প্রাচীন সমাজে ছোট ব্যবসা-বাণিজ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত নানা রাজকর্মচারীর উল্লেখ থেকে ধারণা করা যায় যে ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে রাজকোষে যথেষ্ট অর্থের সমাগমও হত। সুষ্ঠুভাবে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পাদনের জন্য ভারপ্রাপ্ত নানা রাজকর্মচারীর উল্লেখ পাওয়া যায় যেমন হট্টপতি, শৌল্কিক, তরিক ইত্যাদি। এছাড়া ব্যাপার কারন্ডয়, ব্যাপাবান্ড্য ও ব্যাপারায় বিনিযুক্তক নামের রাজপুরুষের উল্লেখ দেখা যায়। এঁদের কাজের বিস্তারিত বিবরণ না পাওয়া গেলেও অনুমান করে নিতে অসুবিধা হয় না যে এইসব রাজপুরুষেরা হাট বাজার, বাণিজ্য শুল্ক, পারঘাটা, খেয়াঘাটের কর এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের তদারকি তথা রক্ষণাবেক্ষণের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন এবং ছোট-বড় নগরগুলিই সাধারণত এইসব ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল।

বাঙলার উত্তরভাগে পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির কোটিবর্ষ ও নব্যাবকাশিকা বণিক ও ব্যবসায়ীদের এক সমৃদ্ধ মিলনকেন্দ্র ছিল। এছাড়াও পুণ্ড্রবর্ধনের এক নাম-না-উল্লেখ করা স্থানে বিপণিমালা শোভিত এক সমৃদ্ধ বাণিজ্য-কেন্দ্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। গ্রাম-গ্রামান্তরের হাটে বাজারে সাধারণত স্থানীয় উৎপন্ন ও নিত্য প্রয়োজনীয় এবং অতি পচনশীল দ্রব্যাদি যেমন শাক, সবজি, মাছ, দুধ ও মিষ্টি দ্রব্যাদির কেনা বেচা চলত। প্রাচীনকালে গুবাক, নারিকেল করতোয়া (তিস্তা) নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে স্বাভাবিক জাত হিসাবে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত এবং শুধু বাঙলাদেশের ভিতরেই নয়, ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে ও বিদেশেও রপ্তানি করা হত। দক্ষিণ ভারতের সমুদ্রের উপকূল বেয়ে বাঙালি বণিকেরা গুজরাত বন্দর পর্যন্ত যে বাণিজ্যসম্ভার নিয়ে যেতেন। তার মধ্যে গুবাক, পান ও নারিকেল বিশেষ উল্লেখযোগ্য পণ্য ছিল যা জলপাইগুড়ি তথা উত্তর বাঙলায় প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত। বাঙালি বণিকেরা গুয়ার বদলে মাণিক্য, পানের বদলে মরকত ও নারিকেলের বদলে শঙ্খ নিয়ে আসতেন। কোম্পানির আমলেও সুপারি বাঙলাদেশের একচেটিয়া ব্যবসা ছিল। বাঙালি বণিকেরা সামুদ্রিক লবণের বিনিময়ে পাথুরে লবণ নিয়ে আসতেন এই তথ্যও পাওয়া যায়। লবণের ব্যবসা খুবই লাভজনক ছিল সন্দেহ নেই। এ কথার সমর্থন পাওয়া যায় যখন দেখা যায় যে কোম্পানির ইংরেজ সওদাগরেরা দেশীয় ব্যবসায়ীদের হাত থেকে ছলে-বলে-কৌশলে লবণের ব্যবসা ছিনিয়ে নিয়ে নিজেদের হাতে কুক্ষিগত করার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে।

প্রাচীন বাঙলার ধন-সম্পদ ও সমৃদ্ধির প্রথম ও প্রধান সূত্র যে বাঙালির বাণিজ্যিক সাফল্য তাতে কোনও সন্দেহ নেই। "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী"র সার্থক রূপায়ণ হয়েছিল প্রাচীন বাঙলায় এবং তার একটা গৌরবজনক অংশীদার ছিল পুণ্ড্রবর্ধন। বরেন্দ্রভূমি অর্থাৎ বাঙলার উত্তরাঞ্চল তথা জলপাইগুড়ি অঞ্চল। রপ্তানিজাত সব পণ্যের বাণিজ্যমূল্য জানার কোনও উপায় নেই। খ্রিস্টীয় প্রথম শতকের গ্রন্থ প্লিনির ইন্ডিকা থেকে জানা যায় যে ভারতবর্ষ থেকে পশ্চিমদেশে শত রেশম ও কার্পাস ইত্যাদি বস্ত্র রপ্তানি হত তার

কিরাত দেশে (উত্তরবঙ্গে) খুব উচ্চমানের তেজপাতা পাওয়া যেত এবং সমুদ্রপথে তা রপ্তানিও করা হত বাণিজ্যিক পণ্য হিসাবে। বাঙলার উত্তরে (জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলা) পর্বত সানুদেশের প্রচুর পিপ্পলি উৎপন্ন হত। এই পিপ্পলি ছিল অতি উচ্চমানের যার বিশেষ কদর ও উচ্চ চাহিদা ছিল পাশ্চাত্য দেশগুলিতে। রোমদেশীয় বণিকেরা এর বিশেষ গুণগ্রাহী ছিলেন ও যাবতীয় পিপ্পলির একচেটিয়া খরিদ্দার ছিলেন। এঁদের মারফত ওই পণ্য পাশ্চাত্যের বাজারে পৌঁছাত।

বার্ষিক মূল্য ছিল (আনুমানিক) এক লক্ষ (স্বর্ণ?) মুদ্রা। এছাড়া, রোমে এক পাউন্ড বা প্রায় আধসের পিপ্পলির দাম খ্রিঃ প্রথম শতকে ছিল ১৫ দিনার অর্থাৎ পনেরোটি স্বর্ণমুদ্রা। এই বিপুল ধনরাশির একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ যে বাঙলার উত্তরাঞ্চলে আসত তা নিঃসন্দেহেই বলা যায়। এই ধনরাশি দুটি বিদেশি মুদ্রা হিসাবে ভারতে আসত। স্বর্ণমুদ্রা দিনার ও রৌপ্য মুদ্রা drachm বা দ্রম্ম। নগদ ছাড়াও বহির্বাণিজ্য পণ্য বিনিময়ের মাধ্যমেও প্রচলিত ছিল যার মাধ্যমে বিদেশি পণ্যও কিছু এদেশে আসত। খ্রিস্টপূর্ব শতকে পৌণ্ড্রদেশ হীরার জন্য বিখ্যাত ছিল এ তথ্য প্রাচীন গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়।

অষ্টম শতকের প্রারম্ভ থেকে বাঙলার সামুদ্রিক বাণিজ্যের রমরমা ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে এবং মুঘল আমলে তো প্রায় সমস্ত সামুদ্রিক বাণিজ্যটাই আরব ও পারস্যদেশীয় বণিকদের হাতে চলে যায় এবং পরে পর্তুগিজ। ওলন্দাজ, দিনেমার, ফরাসি, ইংরেজদের মধ্যে ওই বাণিজ্য হস্তগত করায় কাড়াকাড়ি ও মারামারি লেগে যায়। অষ্টম শতকের গোড়ায় আরবি মুসলমানেরা একে একে সিন্ধুদেশ, স্পেন ও ভারতের অভ্যন্তরে নিজেদের রাষ্ট্রীয় প্রভুত্ব বিস্তারে সক্ষম হয়। এমনকি ভূমধ্যসাগর থেকে ভারত মহাসাগরের দক্ষিণ-পূর্বদিকের দ্বীপগুলিতে রোম ও মিশরদেশীয় বণিকদের আধিপত্য খর্ব করে

আরব বণিকেরা তাদের আধিপত্য বিস্তার করে নেয় দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতক নাগাদ।

আরব আধিপত্যের প্রভাবে সম্ভবত, বাঙলার বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি ও ভারকেন্দ্র স্থলবাণিজ্যের দিকে পরিবর্তত হয় এবং উত্তরাঞ্চলের গিরিবর্ত্মের মধ্য দিয়ে পার্বত্য রাজ্যগুলি ও তার মাধ্যমে চীন ও মধ্য এশিয়া পর্যন্ত প্রবাহিত বাণিজ্যধারাটি অব্যাহত রাখার বিশেষ প্রয়াস পায়। এখানে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে নদীমাতৃক বাঙলাদেশের বণিকেরা সমুদ্রপথে অকুতোভয় ছিলেন এবং তাঁদের বাণিজ্যতরী নিয়ে পৌঁছে যেতেন দেশ-বিদেশের বন্দরে। কিন্তু, পার্বত্য পথে সম্ভবত তাঁরা ততটা পারঙ্গম ছিলেন না, সেজন্য পার্বত্য দেশগুলিতে তাঁদের যাতায়াত খুব উল্লেখযোগ্য ছিল না। তারা উত্তর বাঙলা সংলগ্ন স্থান থেকেই ওই ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনা করতেন বলে অনুমান করা অসঙ্গত হবে না। কোম্পানির আমলে সুদীর্ঘকালের এই বাণিজ্যিক সম্পর্ক, কোম্পানির কর্মচারীদের বিরূপ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক মনোভাবের দরুন ভীষণভাবে ব্যাহত হয় এবং ভারত, তিব্বত ও পরোক্ষভাবে চীনের সঙ্গে বাণিজ্য কার্যত বন্ধ হয়ে যায়। কূটনৈতিক কারণে ১৯৪৯ সাল থেকে ভারত-তিব্বত বাণিজ্য সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যায়।

আরব আধিপত্যের প্রভাবে সম্ভবত, বাঙলার বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি ও ভারকেন্দ্র স্থলবাণিজ্যের দিকে পরিবর্তত হয় এবং উত্তরাঞ্চলের গিরিবর্ত্মের মধ্য দিয়ে পার্বত্য রাজ্যগুলি ও তার মাধ্যমে চীন ও মধ্য এশিয়া পর্যন্ত প্রবাহিত বাণিজ্যধারাটি অব্যাহত রাখার বিশেষ প্রয়াস পায়। এখানে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে নদীমাতৃক বাঙলাদেশের বণিকেরা সমুদ্রপথে অকুতোভয় ছিলেন এবং তাঁদের বাণিজ্যতরী নিয়ে পৌঁছে যেতেন দেশ-বিদেশের বন্দরে। কিন্তু, পার্বত্য পথে সম্ভবত তাঁরা ততটা পারঙ্গম ছিলেন না, সেজন্য পার্বত্য দেশগুলিতে তাঁদের যাতায়াত খুব উল্লেখযোগ্য ছিল না।

রাল্ফ ফিচ নামে জনৈক দুঃসাহসী ইংরেজ বণিক ১৫৮৪ খ্রিঃ অব্দে ১৮০টি নৌকা বোঝাই বাণিজ্যিক পণ্য নিয়ে আগ্রা থেকে এলাহাবাদ, বেনারস, পাটনা ও মালদা হয়ে নদীপথে কোচবিহার পৌঁছান। উত্তর বাঙলায় তাঁর আসার মূল উদ্দেশ্য ছিল বাঙলা-তিব্বত বাণিজ্যিক অবস্থা ও ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত সমীক্ষা ও সরেজমিনে তদন্ত করা। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, ১৭৬৫ খ্রিঃ অব্দে বাঙলার দেওয়ানি পাওয়ার পর, কোম্পানির শ্রীবৃদ্ধির স্বার্থে ভোটানের মারফত তিব্বতের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক পুনরুজ্জীবিত করার জন্য কোম্পানি বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং জর্জ বোগলের নেতৃত্বে প্রথম ব্রিটিশ বাণিজ্যিক প্রতিনিধি দল তিব্বতে পাঠান। সেই সময় তিব্বতে কাশ্মীরি ব্যবসায়ীদের বিশেষ প্রাধান্য ছিল বলে বোগলের বিবরণ থেকে জানা যায়। তিব্বতে অ-তিব্বতীদের প্রবেশাধিকার বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত থাকলেও সম্ভবত ভারতীয় বণিক এবং তীর্থযাত্রীদের প্রবেশাধিকার ছিল কিন্তু বাঙলাদেশে কোম্পানির উপস্থিতি ও তাদের আগ্রাসন নীতি তিব্বতি সরকারকে ইংরেজ ও তাদের ভারতীয় প্রজা সম্পর্কে অত্যন্ত সন্দেহপ্রবণ ও সন্ত্রস্ত করে তোলে। ফলে তিব্বতে ভারতীয়দের প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রিত ও নিষিদ্ধ করা হয়। সেই সময় তিব্বত-চীন বাণিজ্যে কাশ্মীরি বণিক ব্যবসায়ীরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন। বাঙলা, বেনারস, করমণ্ডল, কাশ্মীর এবং নেপালে কাশ্মীরি ব্যবসায়ীদের স্থায়ী প্রতিনিধি ছিল যাঁরা ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বাণিজ্যিক পণ্য ক্রয় করে লাসার বাজারে পাঠিয়ে দিতেন প্রধানত চীনা ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বাণিজ্যিক লেনদেন করার জন্য। কাজটা খুবই কঠিন ছিল সন্দেহ নেই। বোগলের বিবরণ থেকে জানা যায় যে তিব্বতের বাণিজ্যের সিংহভাগই ছিল চীনের সঙ্গে এবং ওই বাণিজ্য পরিচালিত হত কাশ্মীরি বণিক, তিব্বতের অধিবাসী ও লামাদের প্রতিনিধিদের মারফত। লামাদের প্রতিনিধিরা সাধারণত চীনদেশের সেলিং পর্যন্ত এবং প্রয়োজনে পিকিং পর্যন্ত পণ্য দেওয়া-নেওয়া করতেন।

পার্বত্য বাণিজ্য জলপাইগুড়ি ও সংলগ্ন অঞ্চলগুলির পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল ; কারণ, তিব্বত-চীন বাণিজ্য ভোটান মারফত সংঘটিত হত এবং ভোটানের সঙ্গে যোগাযোগের পাঁচটি দ্বার বা বাণিজ্য পথ এই জেলার মধ্য দিয়েই বিস্তৃত। এইখানেই বিভিন্ন কেন্দ্রে সমতলের বাণিজ্যিক পণ্য বিনিময় ও আদান প্রদান করা হত। মোরাং-এর মধ্য দিয়ে সমতলের পণ্য নেপালে নিয়ে যাওয়ার একটা বিকল্প পথ থাকলেও ওই পথ অপেক্ষাকৃত দুর্গম ছিল বলে কম ব্যবহার করা হত। বাঙলা-তিব্বত বাণিজ্যে বাঙালি বণিকদের ভূমিকা মোটামুটিভাবে সমতল অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত বলে অনুমান করা যায়। পাহাড়ি পথে পণ্য দেওয়া-নেওয়ার কাজটা সম্পন্ন হত ভোটানি বণিক ও তাদের সহযোগীদের দ্বারা। তাঁরাই এই অঞ্চলের যাবতীয় বাণিজ্যিক পণ্য ভোটানের পথে তিব্বত পর্যন্ত এবং প্রয়োজনে তারও পরে চীনের বাজারে পৌঁছে দিতেন। তবে, বাঙলার কিছু পণ্য নেপালের মুক্তিনাথের পথেও তিব্বতে রপ্তানি হত যার পরিমাণ খুবই কম ছিল।

জর্জ বোগলের (হেস্টিংসের পাঠানো প্রথম ইংরেজ বাণিজ্যিক দলের প্রধান) বিশদ বিবরণ থেকে তিব্বত-চীন বাণিজ্য সম্বন্ধে নানা তথ্য জানা যায়। চীনা বণিকেরা নিম্নমানের চা, বিচিত্র ও নানা ধরনের বুটিদার রেশমি কাপড়, পেলঙ-এর রুমাল, রেশমি সুতো, লোমবিশিষ্ট বিশেষ ধরনের পশু চামড়া, চীনা মাটির বাসন, পেয়ালা-পিরিচ, গেলাস, নস্যির বাক্স, ছুরি-কাঁচি, রৌপ্যমুদ্রা এবং তামাক নিয়ে আসতেন এবং তার বিনিময়ে সোনা, মুক্তো, প্রবাল, শেল, চওড়া কাপড় ও সর্বোপরি বাঙলার বস্ত্র চীনে নিয়ে যেতেন। এই বাণিজ্যের সঙ্গে কাশ্মীরি বণিক ও পাঞ্চেন লামার প্রতিনিধিরাও যুক্ত থাকতেন। তিব্বতে নিযুক্ত ভারতীয় ব্যবসায়ীরাও চীনা দ্রব্য খরিদ করে বাঙলায় ও ভারতের নানা প্রান্তে পাঠাতেন। এছাড়া, ভোটানিরাও তাদের দেশের চাল, লোহা, মোটা ও নিম্নমানের পশম বস্ত্র ও কিছু মুঙ্গিতের বদলে চা, পার্বত্য লবণ, পশম ও ভেড়ার চামড়া এবং আরও কিছু চীনা সামগ্রী নিয়ে আসতেন এবং ওইগুলি বিক্রয়ের জন্য জলপাইগুড়ির মধ্য দিয়ে রংপুর পর্যন্ত যেতেন। তাঁরা ওয়ারেন হেস্টিংসের কাছ থেকে, রাজনৈতিক অবস্থাকে কাজে লাগিয়ে, জলপাইগুড়ি-রংপুর-এর মধ্য দিয়ে কলকাতা পর্যন্ত বিনা শুল্কে, নিরুপদ্রবে অবাধ বাণিজ্যের প্রতিশ্রুতি আদায়ে সমর্থ হন। তার ফলে, ভোটানী বণিকেরা সরকারি খরচে রাত্রিবাস, দোভাষী ও পণ্য বাহকের সুবিধা ইত্যাদি পাওয়ার অধিকারী হন। ভোটানিরা বাঙলা থেকে পণ্যের বিনিময়ে অথবা নগদ মূল্যে বাঙলা থেকে মোটা ভারী পশম বস্ত্র ও লবণ নিয়ে যেতেন নিজেদের ব্যবহারের জন্য।

নদীবহুল উত্তরবঙ্গ তথা জলপাইগুড়ি জেলায় রেলপথ ও সড়ক যোগাযোগের প্রসার ও উন্নয়নের পূর্বে বনজাত কাঠ, বাঁশ, ঘর ছাওয়ার শন ও খড়, মাটির বাসন, তুলা, পাট, তামাক ইত্যাদি বিবিধ পণ্যের পরিবহণের সহজতম উপায় ছিল নদীপথ। ডাঃ ফ্রান্সিস হ্যামিলটন বুকাননের রংপুর জেলার বিবরণ (১৮১০ অব্দ) থেকে জানা যায় যে তিস্তা নদীর উজানে জলপাইগুড়ি থেকে প্রায় তিরিশ ক্রোশ (ষাট মাইল) উত্তরে রংঢং জঙ্গল থেকে কাটা বড় বড় গাছ কোম্পানির সীমানার প্রায় ১০/১২ মাইল পর্যন্ত স্রোতে ভাসিয়ে আনা হত। সেখান থেকে নৌকা চলাচলের ব্যবস্থা ছিল। খরার সময় পাহাড়পুর (জলপাইগুড়ি শহরের ৩/৪ মাইল উত্তরে) পর্যন্ত দেড়শো মণের নৌকা ও বর্ষার সময় এক হাজার মণের নৌকা চলাচল করত।

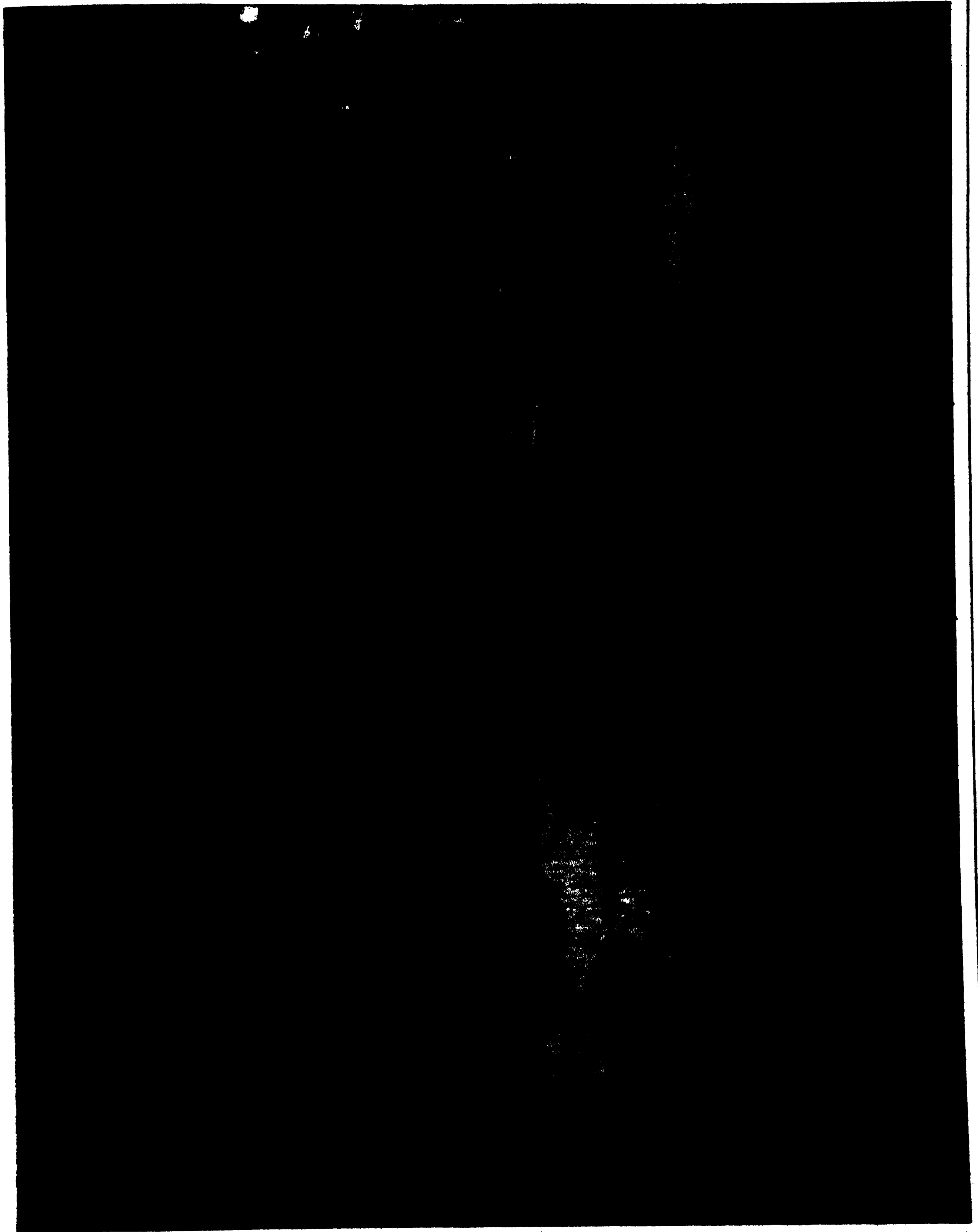
১৮৭৫ সালের নভেম্বর থেকে ১৮৭৬ সালের ফেব্রুয়ারি (শুখা মরসুমের মাত্র চার মাস সময়) পর্যন্ত জলপাইগুড়ি জেলার জলপথে বাণিজ্যিক আমদানি-রপ্তানির এক সরকারি বিবরণ অনুসারে পণ্যগুলিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম শ্রেণীতে (সম্ভবত এই ধরনের শ্রেণীকরণ বস্তুটির রপ্তানি গুরুত্ব নির্দেশ করে) রাখা হয়েছে পাট ও তামাক এবং ওইগুলি ওজন হিসবে নথিভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও অন্য বস্তু ছিল যা বিশদ বিবরণ দেওয়া নেই। মোট রপ্তানির পরিমাণ ৫০,৫৪০ মন অথবা ১৮৫০ টন যার মধ্যে পাট ৪৭ শতাংশ অর্থাৎ ২৩,৭৫৩.৮০ মন বা ৮৬৯.৫০ টন। তামাক ২১,৭৩২.২০ মন বা ৭৯৫.৫০ টন এবং অন্যান্য পণ্য দশ শতাংশ অর্থাৎ ৫০৫৪.০০ মন অথবা ১৮৫.০০ টন। এই পণ্যের মধ্যে চালের/ধানের কোনও স্পষ্ট উল্লেখ নেই। ওই সময় মোট আমদানির পরিমাণ ১৭,৭৭০ মন অথবা ৬৫০ টন। আমদানির-রপ্তানির পরিমাণের অনুপাত ১ : ৩ অর্থাৎ যত পরিমাণ আমদানি হয়েছে ওজন হিসাবে, তার প্রায় তিন গুণ রপ্তানি হয়েছে এবং বিশেষ উল্লেখ করা যেতে পারে যে ওজন খাতে ৮০ শতাংশ রপ্তানি পণ্য লবণ যার আর্থিক মূল্য নিঃসন্দেহে খুবই কম।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে শুধুমাত্র কাঠের উল্লেখ করা হয়েছে যা নথিভুক্ত হয়েছে বোঝাই নৌকার সংখ্যার ভিত্তিতে। নৌকা সম্পর্কে বিশদ বিবরণ দেওয়া নেই। তবে অন্য একটা বিবরণ থেকে জানা যায় যে খরার সময় তিস্তা নদীতে ১৫০ (দেড়শো) মন বহনযোগ্য নৌকা স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করতে পারত। বিবরণে জানা যায় যে ১৩১০টি নৌকা বোঝাই কাঠ ওই সময় জেলার বাইরে রপ্তানি করা হয়। কিন্তু কাঠের ব্যবসায়িক লেনদেনের হিসাবমত ওই কাঠের পরিমাপ কত কিউবিক ফিট ছিল অথবা কত মোট ওজন ছিল তার কোনও উল্লেখ নেই। তবে পরোক্ষভাবে আনুমানিক হিসাবে বলা যায় রপ্তানির পরিমাণ কম বেশি ১,৯৬,৫০০ মন হতে পারে। এই দ্বিতীয় শ্রেণীতে আমদানি হয়েছে মাত্র ৭৯৯০ টি নারিকেল যার আমদানি মূল্য টাকার অংকে অকিঞ্চিৎকর বলে অনুমান করা যেতে পারে। যার অর্থ হল প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর পণ্য খাতে রপ্তানির অর্থমূল্য আমদানির অর্থমূল্যকে বহুগুণ ছাড়িয়ে গেছে।

তৃতীয় শ্রেণীতে দ্রব্যগুলিকে আর্থিক মূল্যের ভিত্তিতে নথিভুক্ত করা হয়েছে। মাত্র ৮৫ টাকার নানা ধরনের স্থানীয় দ্রব্য রপ্তানি করা হয়েছে এবং আমদানি করা হয়েছে ২০,৬৫৮ টাকার পণ্য যার মধ্যে ইউরোপীয় সুতিবস্ত্র ৮৪ শতাংশ। রপ্তানিকৃত পণ্যের মধ্যে ভোটানী ও তিব্বতি দ্রব্য থাকাটা অস্বাভাবিক নয় যদিও সে সম্পর্কে বিশদ কিছু জানা যায়নি।

স্বল্পকালীন এই আমদানি-রপ্তানির বিবরণ থেকে জেলার অর্থনীতির তথা ব্যবসা-বাণিজ্যের কৃষিনির্ভরতা খুবই স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। এছাড়া বনজ সম্পদের উল্লেখ করা যেতে পারে যা সেই সময়কার বাণিজ্যের বেশ একটা বড় অংশ দখল করেছিল। জেলার মানুষদের, সম্ভবত মধ্যবিত্তদের, মধ্যে ইউরোপীয় সুতিবস্ত্রের জনপ্রিয়তা ও তার বর্ধিত চাহিদা লক্ষ করা যায়। এবং একথাও নিঃসন্দেহে অনুমান করা যায়, যে স্থানীয় কুটিরশিল্পজাত সুতিবস্ত্র রপ্তানিযোগ্য উদ্বৃত্ত ও চাহিদা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি।

জেলা গঠনের দুদশকের মধ্যেই পাট ও তামাক এই দুটি কৃষিজাত পণ্য ও কাঠের সঙ্গে যুক্ত হয় একমাত্র বৃহদায়তন বাগিচা শিল্পজাত পণ্য চা যা তৎকালীন সময়ে পুরোটাই ছিল রপ্তানিনির্ভর। উপরোক্ত বিবরণ ছাড়াও সরকারি নথিপত্রে জেলা গঠনের প্রাথমিক অবস্থায় যে সব দ্রব্য আমদানি-রপ্তানি করা হত তার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় যদিও ওইসব দ্রব্যের আমদানি-রপ্তানির সঠিক পরিমাণ বা তার অর্থমূল্য সম্পর্কে বিবরণ থেকে কিছু জানা যায় না তবে, তার থেকে ওই সময়ে জেলার সামগ্রিক চাহিদা ও যোগান (উৎপাদনের



জলদাপাড়া অভয়ারণ্য। একসময় কাঠ রপ্তানি ছিল এই জেলার প্রধান বাণিজ্য

ছবি : প্রণব বসু

প্রকৃতি ও পরিমাণ ইত্যাদি) সম্পর্কে, জেলার ব্যবসা-বাণিজ্যের গতি-প্রকৃতি, জেলার বাণিজ্যিক আমদানি-রপ্তানিযোগ্য উদ্বৃত্ত পণ্যেরও আমদানিযোগ্য পণ্যের চাহিদার একটা আভাস অন্তত পাওয়া যায়। বিবরণ থেকে জানা যায় যে সরিষা, তৈলবীজ, সুপারি, তুলো, লাক্ষা, তিলবীজ, ভোটিয়া কম্বল ও ঘোড়া, চামর, ঘি, মোম, কস্তুরী, পাট, শাল কাঠ (রেলওয়ের জন্য স্লিপার তৈরির প্রয়োজনে), তামাক প্রভৃতি দ্রব্য বিপুল পরিমাণে রপ্তানি করা হত। পরিবর্তে পিতলের বাসনপত্র, লবণ, ভোজ্যতেল, সুতিবস্ত্র, মশলা, নারিকেল, রুদ্রাক্ষ, চিনি, গুড় প্রভৃতি পর্যাপ্ত পরিমাণে আমদানি করা হত।

এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে জেলা গঠনের পূর্বে ডুয়ার্সে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও ভোটানের দৌরাত্ম্যে ডুয়ার্সের জন জীবন ও অর্থব্যবস্থা প্রায় ভেঙে পড়েছিল। কিন্তু ব্রিটিশের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের ফলে ডুয়ার্সে তথাকথিত ব্রিটিশ শান্তি নেমে আসে এবং বিরল বসতিপূর্ণ ডুয়ার্সে কৃষি উৎপাদনে উদ্বৃত্ত দেখা দেয় এবং সাময়িকভাবে উদ্বৃত্ত শস্য রপ্তানি করাও সম্ভব হয়। এসব সত্ত্বেও আমদানিকৃত দ্রব্যের মোট আর্থিক মূল্য রপ্তানিকৃত দ্রব্যের মোট অর্থমূল্য অপেক্ষা অনেক বেশি হওয়ায়, তৎকালীন এক ডেপুটি কমিশনারের মতে, জেলাতে সাধারণভাবে অর্থের কোনও সঞ্চয় গড়ে ওঠেনি। সম্ভবত এই ইঙ্গিত ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের প্রতি।

জেলার আমদানি নির্ভরতার প্রধান সম্ভাব্য কারণ হিসাবে বলা যায় : জেলার রপ্তানিযোগ্য দ্রব্যের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ ভোটান থেকে আমদানি করা হত যার মধ্যে তিব্বতি পণ্যও থাকত, এছাড়া রপ্তানি পণ্যের সিংহভাগই ছিল বনজ কাঠ, কৃষিজাত পাট ও তামাক এবং পরবর্তীকালে চা ; কারণ স্থানীয় অধিবাসীদের কুটির শিল্পজাত বস্ত্রাদি স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে বাণিজ্যিক উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করতে পারেনি। সেই সময়ের রপ্তানি বাণিজ্যে কৃষিনির্ভরতা ও আমদানি-নির্ভরতা জলপাইগুড়ি বাণিজ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্যও উপাদান হয়ে দাঁড়ায়। ১৯১১ সনের জেলা গেজেটিয়ারের পরিসংখ্যান অনুসারে ৮৯ শতাংশেরও বেশি মানুষ কৃষিনির্ভর ছিল।

দি স্ট্যাটিসটিক্যাল রিপোর্টার পত্রিকার ১৮৭৬ সালের মার্চ মাসে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে জলপাইগুড়ি জেলার তামাক ব্যবসা সম্পর্কে কিছু তথ্য জানা যায়। জলপাইগুড়ি জেলার তামাকের সবচেয়ে বড় ব্যস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ বাজার ছিল বয়রা (Baura)। এই বাজারে খুবই উৎকৃষ্ট মানের তামাকের বেচাকেনা ছিল। পাটের বস্তায় মুখ খোলা অবস্থায় তামাক চালান করা হত। রংপুর জেলার ঘোড়ামারায় জনৈক স্কটল্যান্ডবাসী এই ব্যবসা করতেন। তাঁর কাছ থেকে জানা যায় যে রায়তগণ (অধিকাংশই মুসলমান) ছোট ছোট জমিতে তামাক চাষ করত এবং উৎপাদনের সবটুকুই পাইকারদের কাছে বিক্রি করে দিত। পরবর্তী ধাপে পাইকাররা মহাজনদের কাছে পাইকারি দরে সমস্ত তামাক বিক্রি করে দিত। বিভিন্ন জাতের নানা গুণমানের তামাকের চাষ হত এই অঞ্চলে। হাটে আসার পর যাচাই করে সেখানেই তার জাত ও শ্রেণীবিভাগ করা হত তার গুণমান বিচার করে এবং প্রত্যেক জাতের ও শ্রেণীর পৃথক নামকরণ করা হত। এই ব্যবসায়ে আরাকানীদের সংখ্যাধিক্য ছিল এবং সেই সুবাদে এই ব্যবসার উপর তাদের আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণ অবিসংবাদিত ছিল। জলপাইগুড়ির তামাক গুণমানে এতই উঁচুমানের ছিল যে সম্পূর্ণ তামাকই বর্মামুলুকে চালান হয়ে যেত যা দিয়ে পৃথিবী বিখ্যাত বর্মাচুরুট প্রস্তুত করা হত। একটা চটের বস্তায় সাধারণত ১৩০ পাউন্ড শুকনো তামাক পাতা বস্তাবন্দী করে বাউরা বাজার থেকে নৌকায় করে গোয়ালন্দ পাঠানো হত। তারপর সেখান থেকে রেলপথে কলকাতায় পৌঁছাত। আঠারো দিনের এই যাত্রাপথে তামাকের মোট ওজনে ছয় থেকে দশ শতাংশ ঘাটতি হত।

জলপাইগুড়ির তামাক গুণমানে এতই উঁচুমানের ছিল যে সম্পূর্ণ তামাকই বর্মামুলুকে চালান হয়ে যেত যা দিয়ে পৃথিবী বিখ্যাত বর্মাচুরুট প্রস্তুত করা হত। একটা চটের বস্তায় সাধারণত ১৩০ পাউন্ড শুকনো তামাক পাতা বস্তাবন্দী করে বাউরা বাজার থেকে নৌকায় করে গোয়ালন্দ পাঠানো হত। তারপর সেখান থেকে রেলপথে কলকাতায় পৌঁছাত।

উনবিংশ শতাব্দীর আটের দশক থেকে ডুয়ার্সে শ্রমনিবিড় চা শিল্পের সম্প্রসারণের দরুন বহিরাগত আদিবাসী শ্রমিকের সংখ্যা ডুয়ার্সে জ্যামিতিক প্রগতির হারে বৃদ্ধি পায়। ফলে জেলায় উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্যে ঘাটতি দেখা দেয় এবং নিকটবর্তী দিনাজপুর জেলা থেকে খাদ্যশস্য আমদানি আবশ্যক হয়ে পড়ে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে উভয় জেলার সেই ট্র্যাডিশন এখনও বজায় আছে। এছাড়া চা বাগিচাগুলিতে জ্বালানি অর্থাৎ কাঠের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় স্থানীয় যোগান দ্বারা তা মেটানো সম্ভব হচ্ছিল না। জ্বালানি হিসাবে কাঠের চেয়ে কয়লা নানা কারণেই অনেক সুবিধাজনক। ইতিমধ্যে কয়লা পাওয়া যায় এমন অঞ্চলের সঙ্গে রেলপথের সংযোগ ঘটায় রাণীগঞ্জ অঞ্চলের কয়লা। জেলায় আমদানি বাণিজ্যে একটু নতুন সংযোজন হিসাবে দেখা দিল। পার্শ্ববর্তী রাজ্য অসম থেকেও কিছু কয়লা আমদানির ব্যবস্থা হয়। জেলা গঠনের সমসাময়িক কালে জলপাইগুড়ি জেলার ব্যবসায়ের যে লিপিবদ্ধ বিবরণ পাওয়া

যায় তাকে অনুসরণ করে অনুমান (লিপিবদ্ধ বিবরণের অভাবে) করলে ভুল হবে না যে এই জনপদটির পরবর্তীকালে ব্যবসা-বাণিজ্যের সিংহভাগই যুক্ত ছিল ঢাকা ও সিরাজগঞ্জের মাধ্যমে পূর্ববাঙলার অন্যান্য শহর, গ্রাম, গঞ্জ ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের সঙ্গে। শাল কাঠ, তামাক ও পাট ছাড়াও তুলো, সরষে, কাঁচা চামড়া জলপথে পূর্ব বাঙলায় চালান যেত। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে চা শিল্প প্রতিষ্ঠার পূর্বে ডুয়ার্সে তুলো চাষের প্রচলন ছিল গারো ও মেচদের মধ্যে। ভোটান পাহাড় সংলগ্ন ঘাসের জঙ্গলেও উচ্চভূমিতে তুলোর চাষ হত। কিন্তু ওই অঞ্চলগুলিতেই চা চাষের ক্রমসম্প্রসারণের ফলে তুলো চাষের ক্রমবিলুপ্তি ঘটে। এ তথ্য জানা যায় ডি এইচ ই সান্ডারের সেটেলমেন্ট সংক্রান্ত রিপোর্ট (১৮৯৫) থেকে। ওই সময় বাওরা (Baura) ছিল জলপাইগুড়ির ব্যস্ততম বাণিজ্যিক কেন্দ্র।

উজান নদীপথে ঢাকা ও ফরিদপুর থেকে প্রধান আমদানি দ্রব্য ছিল মাটির রান্নার বাসনপত্র, নারিকেল, গুড় এবং কিছু ডাল। ভোটানের সঙ্গে পাঁচটি বাণিজ্য পথের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। হাতির দাঁত, মোম, পশম, কস্তুরী, গণ্ডারের শিং, সুতিবস্ত্র, এন্ডির কাপড়, কম্বল, মধু, বিক টী ইত্যাদি ভোটান থেকে স্থানীয় মহাজনদের কাছে পাঠানো হত নগদ (টাকার) মূল্যে অথবা বিনিময় প্রথার মাধ্যমে। এখান থেকে ভোটানে রপ্তানি হত তামাক, সুপারি, ইউরোপীয় সুতিবস্ত্র, চাল ও লবণ। এই ডুয়ার্স অঞ্চলের মাধ্যমেই প্রাচীনকালে প্রচুর পরিমাণে পশম ও পশমবস্ত্র ভোটান, তিব্বত ও মধ্য এশিয়া থেকে ভারতে আমদানি হত। অর্থাৎ পশম ও পশমজাত বস্ত্রের চিরাচরিত বহির্বাণিজ্যে ডুয়ার্সের (জলপাইগুড়ির নামের মধ্যেও এই ইঙ্গিত পাওয়া যায়) গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না।

জেলার যাবতীয় চা ও কাঁচা পাট রপ্তানি করা হত কলকাতায়। সেখানে চা নিলামের মাধ্যমে হাত বদল হয়ে লন্ডনের বাজারে চালান হয়ে যেত। আবার পাট চালান যেত কলকাতায় এবং সেখান থেকে হুগলি নদীর উভয় পারের চটকলগুলিতে। এছাড়াও কিছু পাট অবশ্য রেলের মাধ্যমে হলদিবাড়ি (কোচবিহার জেলায়) ও ডোমারে রপ্তানি করা হত। জলপাইগুড়ি জেলায় অতি বৃষ্টির দরুন বাড়ির ছাদ তৈরি করার জন্য ঢেউ খেলানো টিনের প্রচলন ছিল খুব বেশি। সেজন্য প্রচুর পরিমাণে ওই টিন জলপাইগুড়িতে আমদানি করা হত।

শ্রমজীবী ওরাওঁদের চা-পাতা সংগ্রহ

আবহমান কাল ধরে সমগ্র পুণ্ড্রবর্ধন তথা বরেন্দ্রভূমির অংশ হিসাবে জলপাইগুড়ি অঞ্চলের (পরবর্তীকালের জেলা) ব্যবসা-বাণিজ্য বাঙলা, কামরূপ, নেপাল, ভোটান, সিকিম, কাশ্মীর ও ভারতের অন্যান্য রাজ্যের সীমানা ছাড়িয়ে সুদূর রোম, মিশর, মধ্য এশিয়া, তিব্বত ও চীন পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। নানা বিক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক উপাদানের ভিত্তিতে, এ কথা অনুমান করলে কোনরকম অত্যুক্তি হবে না বলেই মনে হয়।

সূত্রনির্দেশ

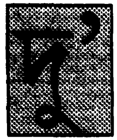
১। নীহাররঞ্জন রায়—বাঙালীর ইতিহাস (আদি পর্ব) প্রথম খণ্ড।
২। পরিতোষ দত্ত—জলপাইগুড়ির নাম রহস্য : মধুপর্ণী, জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা, ১৩৯৪।
৩। ডঃ চণ্ডীদাস লাহিড়ী—জলপাইগুড়ি জেলার ব্যবসা-বাণিজ্য; প্রাগুক্ত।
৪। ডঃ প্রণবকুমার ভট্টাচার্য—ইতিহাসের উপাদানের পটভূমিকায় জলপাইগুড়ি : প্রাগুক্ত।
৫। Origin And Development of Bengali Language—Dr. Suniti Kumar Chatterjee.
৬। W.W. Hanter—A Statistical Account of Bengal. Vol X.
৭। D.H.E. Sunder—Survey And Settlement of the Western Duars.
৮। J.F. Grunning—Bengal District Gazetteers, Jalpaiguri.
৯। A.Mitra—District Hand Book. Census 1951.
১০। Phanindra Nath Chakrabarti—Tibetan Trade And Commerce : The Historical Review. Vol. II, Number II.

লেখক ❑ অধ্যাপক ও প্রাবন্ধিক



ক্ষুদিরাম রাউৎ

নৈঃসর্গিক জলপাইগুড়ির অর্থনৈতিক প্রতিশ্রুতি



দু' দশক, দু'দশক কেন, তারও বেশি, প্রায় আড়াই দশক আগে প্রথম দেখা জলপাইগুড়ি। চাকরিসূত্রে আসা। সেই প্রথম উত্তরবঙ্গ। শিলিগুড়ি নেমে জলপাইগুড়ি হয়ে কোচবিহার। বাসে যেতে যেতে দেখা। জলপাইগুড়ি জেলা। জলপাই মোড়, তিনবাত্তি, ফুলবাড়ি, ফালাকাটা, তালমা, দশদরগা, রাণিনগর, জলপাইগুড়ি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, তিস্তা ব্রিজ, দোমুহনী, বার্নিশঘাট, ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়ি, ফালাকাটা। তারপর হিন্দুস্থান মোড়ের পথে কিছুদূর এগিয়ে জলপাইগুড়ির শেষ সীমানা। জলপাইগুড়ি দেখা। এক ঝলক। জানালার ফাঁক দিয়ে। বাংলো টাইপের বাড়ি, কাঠের দেয়াল, টিনের ছাউনি, সামনে ছড়ানো বেড়া চারপাশে, দেয়াল ঘেঁষে সুপারির সারি। দীর্ঘকান্ত চিকন দেহের মাথায় ছাতার মতো পাতার নীচে কাঁদি কাঁদি সুপারি। তারই ফাঁক দিয়ে দূরে উদাস চোখে বিঁধে যায় নীলাকাশ ছুঁয়ে থাকা পাহাড়। জানতাম না সেদিন ওই পাহাড়টার নাম ভুটান পাহাড়। মাসটা ছিল সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি। সময়টা গড়ানো দুপুর। তখন উদ্ভিন্ন যৌবন। কুমার মনের ওপর কুমারী উত্তর ফেলেছিল দুর্নিবার মায়াবী ছায়া-পাহাড় বনের মোহিনী মেদুরতা। শাস্ত্রে উপেক্ষিতা উত্তর। আমি কিন্তু বাঁধা পড়লাম সেই উপেক্ষিতার উলঙ্গ প্রেমে।

তিস্তার বিস্তার, জলঢাকার জলাধার মুহূর্তে বিছিয়ে দিল আমার দিদৃক্ষু মনের ওপর মোহের আবেশ। পথশ্রমের ক্লান্তি, রাত্রিজাগরণের বিড়ম্বনা দিয়ে গিয়েছিল বনানী প্রেমে, বেগবতী পাহাড়ি জননীর ভরা-যৌবনা মেয়েদের উদ্দাম স্রোতের টানে। আপন মনে বাসে বসে বসেই সেদিন বলেছিলাম—তোমাকে যারা বলে উপেক্ষিত, তারা নিন্দুক, সত্যের বেসাতি করে বলে বঞ্চিতা। জলপাইগুড়ি, আমি তোমাকে ভালবাসি। তুমি রূপসী, তোমার প্রতিটি নদীর চর রূপসা নদীর চর। রূপসা আমার কল্পরাজ্যে, আভ্র যৌবন না-ছুঁই সময়ের সাথী। সে অনিন্দিতা। তুমি তারই দোসর।



জলপাইগুড়ি জেলার মানচিত্র

নৈঃসর্গিক প্রাচুর্যে তুমি অকল্পনীয়া। জলপাইগুড়ির খণ্ডাংশ দেখে এ আমার মনের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া। সে ছিল দক্ষিণ থেকে আসা আমার প্রথম প্রেমের কথা।

তখনও এল আর পি দেখিনি। দেখিনি সেবক কিংবা বারবিশা অথবা জয়পা। কিংবা জিপে করে যাইনি বীরপাড়া চা-বাগানের পাশ দিয়ে হাসিমারা বা দলসিংপাড়া। সিকি দেখায় নিজেকে হারিয়েছিলাম। পুরো দেখায় ঘটে গেল অতলান্ত নিমগ্নতা। সৌন্দর্যের পাথারে সে এক অবিশ্বাস্য বিলীনতা। সে ছিল শুধু স্বপ্ন দেখার দিন। সবুজের হাতছানিতে হারিয়ে যাবার সময় মধুময়। এমনি করেই কেটে গিয়েছিল একটি দশক। সবুজ প্রকৃতি, নদী, পাহাড়, চা-বাগান, ঋতুতে ঋতুতে কী বিচিত্র মোহময় আবেশে ভরে দিত আমাকে। তারপর দিদৃক্ষু মনে ফেরা। চলে গিয়েছিলাম বুকে নিয়ে যক্ষপ্রিয়ার স্মৃতি। দক্ষিণে এসেছে বর্ষা। ব্যথিত অন্তরে বেজে উঠেছে ব্যাকুল বাঁশরি। ভাবিনি আবার ফিরে আসতে হবে এখানে। তাও অতিক্রান্ত যৌবনে ; বার্ধক্যে পা রেখে। সেই স্বপ্নবিভোরতা, সেই কাজল কালো চোখের পরে চোখ রেখে সময় কাটিয়ে দেবার সময় এখন নয়। আসতে হল, এলাম। এলাম বলেই এই পোড়ো বেলায় বসে নৈঃসর্গিক জলপাইগুড়ির অন্দরে খুজে বেড়াচ্ছি কোথায় কতটুকু আছে তার অর্থনৈতিক প্রতিশ্রুতি। এ অন্বেষণ এ জন্যেই, প্রকৃতি যতই মাধুর্যময়ী-ই ও হোক যদি তার পাশাপাশি উদরপূর্তির ব্যবস্থা না থাকে তা হলে সে মধু অল্পদিনের মধ্যেই গরলে পরিণত হতে বাধ্য। নিউ জলপাইগুড়ি থেকে নিউ আলিপুরদুয়ার, গাজোলডোবা থেকে বারবিশা যে দিকেই তাকাই না কেন মাধুরী বিলিয়ে দিয়ে আছে প্রকৃতি। তবু কেন এর বনে-বনান্তরে চলতে গেলে গা ছমছম্ করে, কোনও বিষধর সাপ কিংবা ভয়াল কোনও বন্যপ্রাণীর ভয়ে নয় ; বিভীষিকাময় একদল মানুষের বর্ণনাতীত হিংস্রতা শ্বাপদসংকুলতাকে অতিক্রম করে গেছে।

—কী হলো কাঁপছ কেন?

—না, কিছু না।

—কিছু না তো অমন নড়ছে কেন শরীর?

—অদৃশ্য এক দত্যি যেন সাঁড়াশি দিয়ে আস্ত গলায় চেপে ধরেছে।

—কই কেউ নেই তো?

—না, আছে। ওই রোদের ঝিলমিলের মধ্যে দিয়ে ছুটে যাচ্ছে, পেছনে ছড়িয়ে দিল হিমেল অন্ধকার। তুমি দেখতে পাচ্ছ না? আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, স্পষ্ট........। চলতে চলতে পড়ে যায় মানুষটা। হাঁটু ঝেড়ে উঠে দাঁড়ায়, এদিক-ওদিক তাকায় চারপাশে, কেউ কোথাও নেই ধারেকাছে, তবে এতক্ষণ কথা বলছিল কার সঙ্গে?

কারুর সঙ্গে নয় ; নিজের সঙ্গে নিজে। পথচলতি মানুষ অন্তরে-বাহিরে দ্বিধাবিভক্ত। নিজের সঙ্গে নিজের ছায়ার দ্বন্দ্ব। মানুষ আজ আর নেই মানুষে। তাই তো চলা থেমে যায়। হুমড়ি খেয়ে পড়ে ধড়ফড়িয়ে উঠে পালাতে চায়। ঝিকিমিকি রোদ চোখের সামনেই বদলে যায় হিমেল অন্ধকারে। আর সেই অন্ধকারে ফিসফাস শব্দ। তারপর নিশ্চুপ। তরল কী যেন একটা গড়িয়ে এসে পায়ে লাগে। তরতাজা মানুষটার চোখ বুজে আসে। রক্ত। কী রক্ত। তরতাজা মানুষের শেষবার্তি ব্যর্থ চেষ্টায় মিলিয়ে যাওয়া বেদনা মেশানো রক্ত। দগদগে লাল। বিষণ্ণ জমাট। ঠিক আগের মুহূর্তে চুঁইয়ে আসা রক্ত। পায়ের পাতা ভিজছে। ভিজছে মাটি। মিইয়ে পড়ছে মন। মানুষ।

কিন্তু কেন?

প্রকৃতি। যে দিকেই তাকাই তোমার দুকুলপ্লাবী মাধুরী। আমি তোমার রূপে বিহ্বলহৃদয়, নির্বাক, নীরব দর্শক। এমনি করেই তো

কেটে গেছে দিন। চোখের তৃপ্তির বিরুদ্ধে আজ বিদ্রোহী উদর। উদরান্নের সংস্থান না করে কেবল-ই নন্দিত দৃষ্টিস্তুতি। না। অর্থোপার্জনের উপায় খুজতে হবে। নচেৎ দৃষ্টিনন্দন প্রকৃতির বুকে দাবানল অনিবার্য। তাই এই অন্বেষণ। অর্থনৈতিক সম্ভাবনার খোঁজ, একজনের নয়, অনেকের। সারা জেলায়। কোনও এক সময়ের জন্য নয় ; সর্বকালের সকল স্তরের জেলাবাসীর জন্যে এই খোঁজ। নৈঃসর্গিক জলপাইগুড়ির অর্থনৈতিক প্রতিশ্রুতির রূপরেখা নির্ণয়।

এত যার প্রাকৃতিক সম্পদ অর্থনৈতিক দিক থেকে সে কি পিছিয়ে থাকতে পারে? পারে না। তবে কেন দিকে দিকে এত অভিযোগ, অনুযোগ—সারা উত্তরবঙ্গের সঙ্গে জলপাইগুড়িরও অর্থনৈতিক দুরবস্থা বর্ণনাতীত।

অভিযোগ, অনুযোগ, ক্ষোভ বা অভিমান যাই-ই বলা হোক না কেন বক্তব্যটি কতদূর সত্য তা এর অর্থনৈতিক অবস্থার ও সম্ভাবনার দিকটি অনুপুঙ্খ খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্তে আসা একান্ত জরুরি।

জলপাইগুড়ির লোকসংখ্যা প্রায় ৩২ লক্ষ। এ জেলার শিক্ষার হার ৪৮ শতাংশ। জেলাটি নদীবিধৌত। ছোটবড় প্রায় পঞ্চাশটি নদী জেলার ওপর দিয়ে প্রবাহিত। শীত-গ্রীষ্মে বিস্তীর্ণ বালুচর ঘোষণা করে নদীগুলোর দৈন্য। বর্ষায় প্রবল প্রতাপশালী ঐরাবতও এদের বুকে খড়কুটোর মতো ভাসে। এ হেন ভয়ালসুন্দর জেলাটির অনেকটা জায়গা জুড়ে আছে তরাই বনাঞ্চল।

উত্তরে ভুটান পাহাড়, দক্ষিণে বাংলাদেশের সীমানা। অস্থিরতা দুপাশে না হোক্ অন্তত একপাশের মানুষের নিত্যসঙ্গী, এটা যেমন সত্যি, তেমনই সীমানাজনিত কারণেই এদের বাড়তি কিছু আর্থিক সুযোগ-সুবিধা লাভের সম্ভাবনাও একেবারে উড়িয়ে দেওয়া অসম্ভব।

প্রাকৃতিক এবং ভৌগোলিক কারণে এদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে প্রধান অন্তরায় কর্মঠ হয়ে না ওঠা। এখানকার নদীগুলোর মতো যুবশক্তি—কী নারী অথবা পুরুষ অর্থনৈতিক উন্নতির পথে বড়রকমের ঝুঁকি নিতে নারাজ। দু-একবারের চেষ্টায় যদি ফলপ্রসূ না হয় তাহলে চিরতরে ওই পথ পরিত্যাগ করতে একটু সময় নেন না



প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অনন্য চাপরামারি

জলপাইগুড়ির লোকসংখ্যা প্রায় ৩২ লক্ষ। এ জেলার শিক্ষার হার ৪৮ শতাংশ। জেলাটি নদীবিধৌত। ছোটবড় প্রায় পঞ্চাশটি নদী জেলার ওপর দিয়ে প্রবাহিত। শীত-গ্রীষ্মে বিস্তীর্ণ বালুচর ঘোষণা করে নদীগুলোর দৈন্য। বর্ষায় প্রবল প্রতাপশালী ঐরাবতও এদের বুকে খড়কুটোর মতো ভাসে। এ হেন ভয়ালসুন্দর জেলাটির অনেকটা জায়গা জুড়ে আছে তরাই বনাঞ্চল। উত্তরে ভুটান পাহাড়, দক্ষিণে বাংলাদেশের সীমানা।

যুবক-যুবতীরা। অবশ্য তপশিলি, আদিবাসী অধ্যুষিত হওয়ার কারণেও এর পিছিয়ে পড়াটা অন্যতম কারণ হিসেবেও চিহ্নিত।

যা হোক্ উল্লিখিত প্রেক্ষাপটে দেখা যাক্ অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে জলপাইগুড়ির অবস্থান পরিবর্তনের সুযোগ আছে কি না।

বনবাগিচা আর প্রাকৃতিক সম্পদের খনি যেহেতু এ জেলা। এ তিনটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিল্প গড়ে ওঠার নিহিত কারণ জেলার অর্থনৈতিক উন্নয়ন।

অর্থপিপাসু মানুষ যেমন জগৎজোড়া তেমনই প্রকৃতিপ্রেমী ভ্রমণ-পিপাসু মানুষের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। গরুমারা, চাপড়ামারি, খুট্টিমারি, হলং, রাজাভাতখাওয়া প্রভৃতি বিগত বন, বনবাংলো রয়েছে এ জেলায়। এ সব জায়গায় আসা ও থাকার জন্যে শহুরে মানুষ পাগল। সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগে ভ্রমণ পরিকাঠামো গড়ে তুললে ভ্রমণ শিল্পে রূপান্তরিত হতে পারে এখানে। এতে ছোটবড় গাড়ির ব্যবসা যেমন বাড়বে তেমন ভ্রমণকারীদের সহায়ক ছোটবড় হোটেল-মোটেল প্রভৃতি নানাধরনের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার ফলে বহু যুবক-যুবতীর নিযুক্তি ঘটবে এই প্রকরণে।

চা-শিল্প তো জেলার আদি শিল্প। একে আরও উন্নততর করার সুযোগ খুঁজে দেখা যেতে পারে। যে জন্যে এ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত শ্রমজীবী মানুষের উপযুক্ত শিক্ষা দরকার। ডুয়ার্সে শুরু হয়েছে তার উদ্যোগ।



জলপাইগুড়ির ঐতিহ্য : বেতের তৈরি চেয়ার, টেবিল *ছবি : শৌভিক ঘোষ*

কাঠ ও বেতের আসবাবপত্রের ওপর মানুষের আকর্ষণ চিরকালের ; ধনবানদের কাছে তার তীব্রতা অনেক বেশি। এ চাহিদা মেটাতে জোগানের ক্ষেত্রে জেলার যুবসম্প্রদায় নারীপুরুষ নির্বিশেষে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে। এ গেল ছোট ছোট শিল্প ছোট ছোট কাজের কথা। মাঝারি ও বড় শিল্পের সূচনা শুরু হয়েছে এ জেলায়। তিনবাত্তি মোড় থেকে জলপাইগুড়ি জেলা শহর পর্যন্ত, ঘুঘুমালি থেকে গণ্ডীর মোড় ইস্টার্ন বাইপাস জুড়ে রাস্তার দুপাশের পরিবর্তন সহজেই অনুমেয় দ্রুত শিল্পায়নের পথে জেলা কত এগিয়ে যাচ্ছে। রানিনগর, ডাবগ্রাম প্রভৃতি শিল্পবিকাশে কেন্দ্রে এসেছে কোকাকোলা, তিস্তা অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেডের মতো কারখানা।

করতোয়া নদীর তীরে চিমনির ধোঁয়া বেরুচ্ছে মিলেনিয়াম সিমেন্ট ফ্যাক্টরির। বেশ কিছু সংখ্যায় হচ্ছে রাসায়নিক কারখানা। এ ছাড়া হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালসের অনুসারী শিল্পের বিকাশ ঘটতে চলেছে এ জেলায় অদূর ভবিষ্যতে। স্তব্ধ প্রান্তরে কলকারখানার ভেঁপুর শব্দে মুখর হয়ে ওঠার প্রস্তুতিপর্ব চলছে পুরোদমে। ওপিমল অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটসের মতো শিল্পপতিরা পা বাড়িয়েছেন জেলায় ভেষজ দ্রব্যনির্ভর শিল্প গড়ে তোলার কাজে। সূচনা হলে শেষ আছে প্রকৃতির নিয়মেই। এক ওপিমল এসেছে, দলে দলে আসবেন আরও কত মলেরা তাদের মলমাদল বাজিয়ে। শিল্পহীন জলপাইগুড়ি জেলা শিল্পসমৃদ্ধ জলপাইগুড়ি জেলায় পরিণত হতে আর বেশি দেরি নেই।

এ কাজে এগিয়ে আসতে হবে বহিরাগতদের সঙ্গে এ জেলার শিল্পোদ্যোগীদের ; আর সে বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা হবে জেলার যুবক-যুবতীদের।

বনের স্নিগ্ধ ছায়ায় বসে বাজানো বাউদিয়ার বাঁশের বাঁশিতে প্রাকৃতিক প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর হৃদয়স্পন্দনে এবার বেজে উঠুক নতুন দিনের আহ্বান-সগর্জে বাজুক কারখানায় কারখানায় যোগদান মুহূর্তে সময়সূচি তীব্র শব্দের ভেঁপু।

সৌন্দর্য কীভাবে অর্থনীতির পথপ্রদর্শক হতে পারে একটা উদাহরণ নিয়ে দেখা যাক। জলপাইগুড়ি সদরের অদূরে দোমহনী গ্রাম। সুবিস্তৃত নদী তিস্তার কোলে গ্রামটি। ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর দীর্ঘ তিস্তা-জল্পেশ সেতু। কিছুটা দূরে রেলওয়ে ব্রিজ। এই রেলওয়ে ব্রিজের পাশে শতিনেক একর জমি আলিঙ্গন করে আছে তিস্তার চরভূমি। শীতে জলশূন্য তিস্তার বুকে বালুকা বেলার বিষণ্ণতা, বর্ষায় প্লাবন-হানা রুদ্রবীণার অহর্নিশ তান। দূরে নদীর উৎস-পথে আকাশ যেখানে নেমে এসেছে দিগন্ত ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে ভুটান পাহাড়, পাশে বনভূমি। এই জমিটিতে যদি গড়ে তোলা যায় একটি পরিবেশ নিয়ন্ত্রিত পর্যটন কেন্দ্র, কেমন হবে?

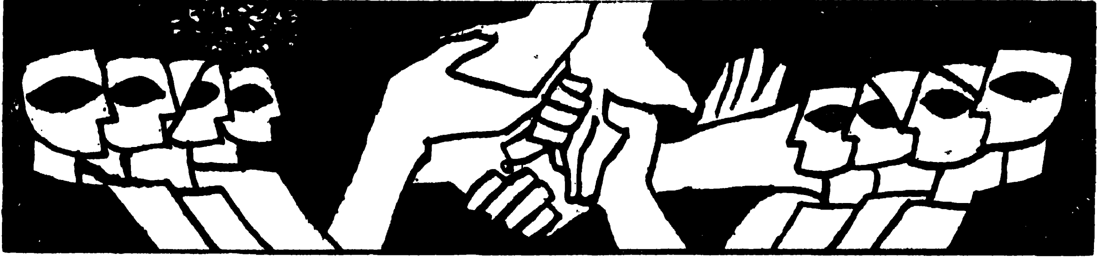
পর্যটনকারীর চোখে তৃপ্তি তো সুনিশ্চিত, স্থানীয় মানুষের উদর-পূর্তির একটা উপায় খুলে যাবার সম্ভাবনা অস্বীকার করবেন কে?

মনোরম পরিবেশ জলপাইগুড়ির উপকণ্ঠে ময়নাগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত দোমহনী গ্রাম পঞ্চায়েত-১-এর অধীন এ অঞ্চলটি। যদি গড়ে ওঠে পর্যটন কেন্দ্র জলপাইগুড়ির অর্থনীতিতে ঘটে যেতে পারে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন।

বেশি দূরে নয়, মাত্র ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার দূরে আছে গরুমারা জাতীয় উদ্যান। একটু এগুলেই চালসা-মালের মতো মনোরম পাহাড়তলি। দিগন্ত ছড়ানো চা-বাগিচা জুড়িয়ে দেয় চোখ, প্রাণের সে কী প্রশান্তি নিয়ে যায় অনাস্বাদিত এক জগতে।

আরও কত বনবাংলো—চাপড়ামারি, মূর্তি, নিলপাড়া, চিলাপাতা, কোদালবস্তি, কুঞ্জনগর, ভুটানঘাট, জয়ন্তী, রাজাভাতখাওয়া, বক্সাদুয়ার প্রভৃতি। এই দোমহনীকে কেন্দ্র করে প্রতিদিন অসংখ্য বাস ছেড়ে যেতে পারে ভ্রমণবিলাসী-প্রকৃতিপ্রেমী মানুষদের নিয়ে। এঁদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করতে এখানে গড়ে উঠতে পারে পর্যটন আবাস, হোটেল-মোটেল নানাকিছু। এই স্নিগ্ধ পরিবেশে নদীর স্রোতের পাশে জনস্রোতের আলিঙ্গিত প্রবাহে বয়ে যেতে পারে অর্থনীতির উন্নয়নমুখী স্রোত। ভাবতে কেমন লাগে নদীর পাশে বসে আছি বাংলোয়, মন চাইল ঘুরে আসি একটু বনে যেখানে চরে বেড়াচ্ছে হরিণ, বাইসন, ঝোপের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে গণ্ডার। হাতির পিঠে চড়ে চলে যাচ্ছি বনের ভেতর দিয়ে দুলকি চালে। কেমন লাগে। এখানে আধুনিক ছেলেমেয়েরা খুঁজে পাবেন সপ্তপদীর রীনা ব্রাউনের দিব্যেন্দু'র "এ পথ যদি না শেষ হয়"-র এমন পিপাসা মেটানোর পরিবেশ। সৌন্দর্যকে সামনে রেখে সঞ্চয়ের সাধনায় যাঁরা রাতদিন নিমগ্ন তাঁদের জন্যও রয়েছে অপূর্ব সুযোগ। অগণিত পর্যটকদের চাহিদা মেটাতেই গড়ে উঠবে দোকানপাট, রেস্তরাঁ, বাড়বে যানবাহন চলাচল—প্রতিনিয়ত হাতছানি—"এ পথ যদি না শেষ হয়"। অফুরান সৌন্দর্যের পটভূমিতে অর্থনীতির এমন মেলবন্ধন গড়ে তোলার সুযোগ নিতে শুধু সচেতন জলপাইগুড়িবাসী কেন, তার বাইরের আগ্রহী মানুষেরাও উৎসাহিত বোধ করবেন এটাই প্রত্যাশিত।

লেখক ❑ অতিরিক্ত জেলাশাসক (উন্নয়ন), জলপাইগুড়ি ও অতিরিক্ত কার্যনির্বাহী আধিকারিক, জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ।

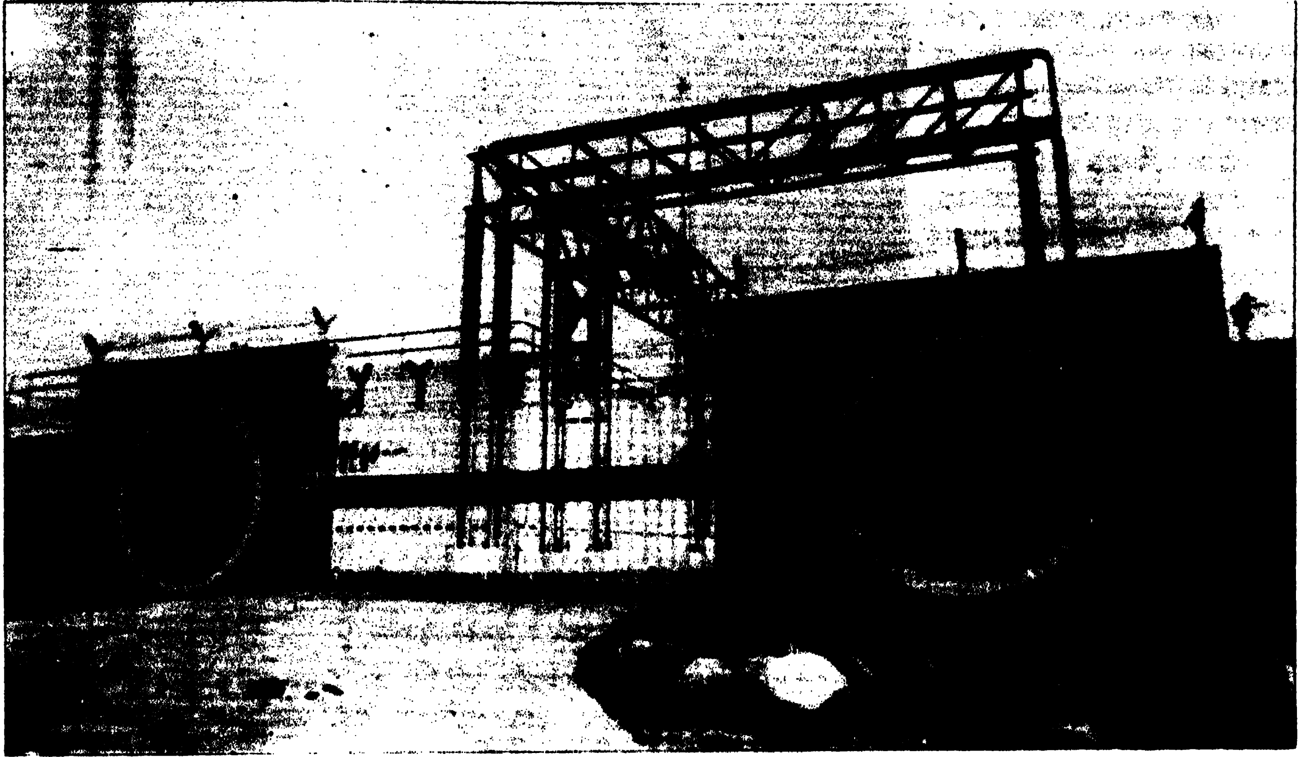


সুব্রত গুপ্ত

জলপাইগুড়ি জেলার শিল্প সম্ভাবনা

আয়তন এবং জনসংখ্যার বিচারে জলপাইগুড়ি জেলা উত্তরবঙ্গের সবচেয়ে বড় জেলা। এই জেলার আয়তন ৬২৪৫ বর্গকিলোমিটার। জেলাটিকে প্রশাসনিক দিক দিয়ে ২টি মহকুমা, ১৩টি পঞ্চায়েত সমিতি, ১৬টি থানা, ৩টি পৌরসভা এবং ১৪৮টি গ্রাম পঞ্চায়েতে ভাগ করা হয়েছে। বর্তমানে জলপাইগুড়িতে শিল্পায়নের প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। জেলার কয়েকটি স্থানে নতুন নতুন শিল্প স্থাপিত হচ্ছে। জেলার পূর্বদিকে রয়েছে অসম রাজ্য, দক্ষিণে কোচবিহার জেলা এবং উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিমে রয়েছে দার্জিলিং জেলা। এছাড়াও জলপাইগুড়ির উত্তর ও উত্তরপূর্বে এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমে রয়েছে প্রতিবেশী দুই রাষ্ট্র ভুটান এবং বাংলাদেশ। জলপাইগুড়ি জেলার মধ্য দিয়ে জাতীয় সড়ক ৩১ সি এবং ৩১ বিস্তৃত হয়ে অসমে প্রবেশ করেছে। স্বভাবতই জলপাইগুড়ি অসম-সহ উত্তরপূর্ব ভারতের অন্যান্য রাজ্য এবং ভুটানের মধ্যে অন্যতম যোগসূত্র হিসাবে কাজ করছে। জেলার রাজগঞ্জ ব্লকের ফুলবাড়ি সীমান্ত দিয়ে ভারত, বাংলাদেশ এবং নেপালের মধ্যে বাণিজ্য চলে।

১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুসারে জলপাইগুড়ি জেলার লোকসংখ্যা ২৮ লক্ষ ৫৪৩ জন। এর মধ্যে ১৬.৩৬ শতাংশ শহরাঞ্চলে বাস করেন। মোট জনসংখ্যার ৩১.৫২ শতাংশ শ্রমজীবী মানুষ। জেলার অধিবাসীরা মূলত কৃষি এবং চা বাগানে যুক্ত আছেন। জেলার মোট আয়তনের প্রায় ২০ শতাংশ চা বাগান এবং ২৬ শতাংশ বনভূমি দখল করে আছে। জলপাইগুড়ি জেলাকে 'মিনি ভারতবর্ষ' বলা যায়। এখানকার জনবিন্যাসের দিকে যদি তাকানো যায় তাহলে দেখা যাবে একদিকে পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত মানুষরা যেমন রয়েছেন, তেমনই অন্যদিকে এখানকার আদি-বাসিন্দা রাজবংশী, আদিবাসী সম্প্রদায় যেমন—মেচ, রাভা, সাঁওতাল প্রমুখেরাও রয়েছেন। এছাড়াও জেলার জনসংখ্যার বেশ কিছুটা অংশ জুড়ে রয়েছেন নেপালি এবং মধ্য ও উত্তর-ভারত



জলপাইগুড়ির রানীনগরে একটি বহুজাতিক সংস্থার শিল্প কারখানা

থেকে আগত মানুষরা। এঁরা ১০০ বছর আগে জলপাইগুড়িতে যখন বিভিন্ন চা বাগান তৈরি হচ্ছিল, তখন এই শিল্পের শ্রমিক হিসাবে কাজ করতে এসে এখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।

> **নাতিশীতোষ্ণ ও দূষণমুক্ত আবহাওয়া জলপাইগুড়িতে ইলেকট্রনিক্স এবং কমপিউটার সফট্‌ওয়্যার শিল্প স্থাপনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। এই শিল্পের জন্য দক্ষ ও পেশাদার লোকেরও অভাব হবে না। কারণ পাশেই রয়েছে শিলিগুড়ি। এখানে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার সুযোগ রয়েছে। তাছাড়া জলপাইগুড়িতেও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট তো রয়েছেই।**

যদিও জলপাইগুড়ি জেলা শিল্পে ততটা উন্নত নয়, তবুও জেলার অবস্থান, এর 'কসমোপলিটন' প্রকৃতি, সহজলভ্য জমি এবং প্রচুর চা বাগানের উপস্থিতি জেলাতে শিল্প স্থাপনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। রাজ্য সরকারও জেলায় শিল্পায়নের দিকে বিশেষ নজর দিয়েছে। জেলার শিল্পে পশ্চাৎপদ অবস্থার কথা চিন্তা করেই সরকার শিল্প বিকাশ কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে জলপাইগুড়িতে শিল্পায়নে একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে চাইছেন।

(২) শিল্পায়নের সম্ভাবনা

জলপাইগুড়িতে সবজি ও ফল উৎপাদনের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে জমি রয়েছে। উত্তরবঙ্গে বৈচিত্র্যপূর্ণ কৃষির অনুকূল আবহাওয়ার জন্যে এখানকার জেলাগুলিতে নানারকম ফল ও সবজি উৎপন্ন হয়। শীতের স্থায়িত্ব বেশি হওয়ার দরুন এখানে আনারসের উৎপাদনও বেশি পরিমাণে হয়। জলপাইগুড়িতে তাপমাত্রা যেহেতু তুলনা-মূলকভাবে কম, তাই টমেটো এবং আলু এই দুটি এখানকার খুব জনপ্রিয় ফসল। তাছাড়া বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ যেহেতু এখানে বেশি, তাই কাঁঠালও জলপাইগুড়িতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

জলপাইগুড়িতে কৃষি উৎপাদনের হার বেশি হওয়ার দরুন কৃষি-ভিত্তিক বিভিন্ন শিল্প জলপাইগুড়িতে গড়ে উঠেছে। জলপাইগুড়িতে চালের উৎপাদন প্রায় ৩০৬২ লক্ষ মেট্রিক টন। ফলস্বরূপ এখানে অনেক চালের কল রয়েছে। তাছাড়া ধান এবং তুষ থেকে উৎপন্ন বিভিন্ন নিষ্কাশিত পরিশোধযোগ্য বস্তু এবং পশুখাদ্য কেন্দ্রিক বিভিন্ন কৃষিভিত্তিক শিল্পও জলপাইগুড়িতে গড়ে উঠেছে। এছাড়া টমেটো, সবজি প্রক্রিয়াকরণ, ফল সংরক্ষণ এবং প্রক্রিয়াকরণ, আদাজাত বিভিন্ন শিল্পের সম্ভাবনাও এখানে প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। এককথায় কৃষিভিত্তিক এবং ফল প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে জলপাইগুড়ি অগ্রণী ভূমিকা নিতে পারে। ফল প্রক্রিয়াকরণ শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে

যেতে হলে চাই ফল ও অন্যান্য সবজি সংরক্ষণের জন্য হিমঘর। প্রতিবছরই জেলায় সংরক্ষণের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকায় প্রচুর ফসল নষ্ট হয়।

এছাড়াও জেলাতে ১৮১ টি প্রতিষ্ঠিত চা বাগান রয়েছে। এছাড়া ছোটখাটো আরও ১০০-টির মতো নতুন চা বাগানও আছে। ফলস্বরূপ চা শিল্পেও জেলা বেশ এগিয়ে। ১৯৯৮ সালের একটি পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে জেলায় চা উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১৮৫০ কেজি। তবে জলপাইগুড়িতে একটি চা নিলাম কেন্দ্রের খুব দরকার। চা নিলাম কেন্দ্র হলে জলপাইগুড়ির চা শিল্পপতিরা তাদের উৎপন্ন চায়ের জন্য আরও বেশি দাম পাবেন।

নাতিশীতোষ্ণ ও দূষণমুক্ত আবহাওয়া জলপাইগুড়িতে ইলেকট্রনিক্স এবং কমপিউটার সফট্‌ওয়্যার শিল্প স্থাপনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। এই শিল্পের জন্য দক্ষ ও পেশাদার লোকেরও অভাব হবে না। কারণ পাশেই রয়েছে শিলিগুড়ি। এখানে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার সুযোগ রয়েছে। তাছাড়া জলপাইগুড়িতেও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট তো রয়েছেই।

বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত ফাঁসখাওয়াতে ডলোমাইট উত্তোলন *ছবি : প্রণবেশ সান্যাল*

প্রস্তুতকারক শিল্পের মধ্যে—সিমেন্ট, প্লাস্টিক, চামড়া প্রক্রিয়াকরণ শিল্প, ছোট ইস্পাত কারখানা, যন্ত্র প্রস্তুতকারক সংস্থা ইত্যাদি স্থাপনের কথা ভাবা যেতে পারে। জল এবং বিদ্যুতের প্রাচুর্য এবং সারা ভারতের সঙ্গে সড়ক এবং রেলপথে যোগাযোগের সুবিধার জন্য এইসব শিল্পের সম্ভাবনা জলপাইগুড়িতে প্রচুর পরিমাণে রয়েছে।

১৫৪ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত রানীনগর শিল্পবিকাশ কেন্দ্রে ৬৬ একর জমি শিল্প স্থাপনের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে। এর মধ্যে ৪৮ একর জমি ১৮টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। তখনও ১৮ একর জমি বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বন্টনের জন্য রেখে দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের আবাসনের জন্য ৬১ একর জমি রেখে দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৫৫ একর জমি ইতিমধ্যেই শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে।

জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের চা বাগানগুলির জন্য সংশ্লিষ্ট শিল্পসমূহের একটা ভাল বাজার তৈরি হতে পারে।

জলপাইগুড়িতে ক্ষুদ্রশিল্প এবং হস্তশিল্পেরও প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তরবঙ্গের হস্তশিল্প খুবই প্রসিদ্ধ। এই শিল্পে নিযুক্ত কারুশিল্পীরাও আজ স্ব-নির্ভর হয়ে উঠেছেন। জলপাইগুড়ির কারুশিল্পের মধ্যে শীতলপাটি, বাঁশের কাজ, বেতের কাজ, কাঠের কাজ, মাটির তৈরি বিভিন্ন শিল্প, হাতে তৈরি পুতুল, ধাতুর তৈরি বিভিন্ন দ্রব্য, ডোকরা, মাদুর উলের কার্পেট প্রভৃতি বিখ্যাত।

(৩) শিল্পবিকাশ কেন্দ্রের ভাবনা

রাজ্য সরকার জেলাতে শিল্পায়নের লক্ষ্যে ডাবগ্রাম, রানীনগর এবং আসাম মোড়ে ৩টি শিল্পবিকাশ কেন্দ্র স্থাপন করেছে। এছাড়াও ফাটাপুকুরে ১১০০ একর জমির উপর আরও একটি বড় শিল্পবিকাশ কেন্দ্র গড়ে উঠছে। প্রথম পর্যায়ে পশ্চিমবঙ্গ শিল্প পরিকাঠামো উন্নয়ন নিগম এখানকার ৩৪১ একর জমি অধিগ্রহণ করেছে।

ডাবগ্রামের শিল্প বিকাশ কেন্দ্রটি শিলিগুড়ির খুব কাছেই। পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্রশিল্প নিগমের দ্বারা তৈরি ১০৬ একর জমির উপর নির্মিত এই শিল্প বিকাশ কেন্দ্রের ১০২ একর জমি শিল্প স্থাপনের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে। এরই মধ্যে ৯৮ একর জমি ২৫টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। এখানে প্রতিষ্ঠিত শিল্পগুলির মধ্যে রয়েছে শিল্পের জন্য ব্যবহৃত অক্সিজেন নির্মাণের কারখানা, ঢেউ খেলানো টিন তৈরির কারখানা, ব্যাটারি তৈরির কারখানা, গাড়ির যন্ত্রাংশ তৈরির কারখানা, ফল প্রক্রিয়াকরণ শিল্প, চামড়া ও জুতো তৈরির কারখানা প্রভৃতি।

১৫৪ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত রানীনগর শিল্পবিকাশ কেন্দ্রে ৬৬ একর জমি শিল্প স্থাপনের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে। এর মধ্যে ৪৮ একর জমি ১৮ টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। তখনও ১৮ একর জমি বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বন্টনের জন্য রেখে দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের আবাসনের জন্য ৬১ একর জমি রেখে দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে




JALPAIGURI

5 0 5 10 15 Kilometres

SCALE

INDUSTRIAL AREA

N

BHUTAN

ASSAM

COOCH BEHAR

DARJEELING

BANGLADESH

Malbazar
Matiali
Nagrakata
M.G.Rly.
N. H.
Chalsa
Mal
Lataguri
Banarhat
Birpara
Madarihat
Phuntsoling
Jaygaon
Hasimara
Buxaduar
Hamiltonganj
Kalchini
Jayanti
Kumargram
Bhaktinagore
Siliguri
B.G.Rly.
Tista R.
Jaldhaka
Dhupguri
Falakata
Torsa R.
Apd
Apd-2
Alipurduar
Maynaguri
Jalpesh
Rajganj
Jalpaiguri
To Haldibari

WBSIC Industrial Estate At Ektiasal For SSI Units

WBIIDC Industrial Growth Centre At DABGRAM

WBSIC Industrial Estate At Dabgram For SSI Units

WBIIDC Industrial Growth Centre At Raninagar

WEBEL Electronics Industries Growth Centre At Assam More

REFERENCE

International Boundary
State Boundary
District Boundary
Sub-Division Boundary
Block Boundary
District Headquarters
Sub-Division Headquarters
Police Station
National Highway
Other Roads
River

LEGEND

Agro Based
Forest Based
Animal Husbandry Based
Textile Based
Building Materials & Ceramics Based
Engineering Based

৫৫ একর জমি ইতিমধ্যেই শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। রানীনগর শিল্প বিকাশ কেন্দ্রে বিদ্যুতের একটি সাব-স্টেশন রয়েছে। এখানে প্রতিষ্ঠিত শিল্পগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : পাঁউরুটি, কেক, প্যাকেট আটা, মিনারেল ওয়াটার, পাটের ব্যাগ, মিটল পাইপ এবং পিভিসি দ্রব্য। রানীনগরে দি ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন এবং কোকাকোলা তাদের বটলিং প্ল্যান্ট স্থাপন করেছে।

জলপাইগুড়ি শহরের খুব কাছেই ওয়েবেল ২০ একর জমির উপর একটি ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স স্থাপন করেছে। এখানে ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রিক্যাল এবং কম্পিউটার শিল্পের বিকাশ ঘটবে। এই কমপ্লেক্সে ৮ হাজার বর্গ কিমি জুড়ে ২টি শেড ইতিমধ্যেই নির্মাণ করা হয়ে গেছে। বর্তমানে এখানে একটি ট্রান্সফরমার প্রস্তুতকারক সংস্থা তাদের কাজ শুরু করেছে।

ফাটাপুকুর শিল্প বিকাশ কেন্দ্রে মূলত ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোগীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। তবে বৃহৎ শিল্পোদ্যোগীদেরও কিছু কিছু জমি দেওয়া হবে। এখানে পরিকাঠামো হিসাবে পাওয়ার প্ল্যান্ট, বিদ্যুতের সাব-স্টেশন, গুদাম এবং অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের জন্য রাস্তা নির্মাণ করা হবে। ফাটাপুকুর জাতীয় সড়কের ধারে এবং জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়ির মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত হওয়ার দরুন এখানে শিল্প বিকাশের প্রভূত সম্ভাবনা থাকছে।

(৪) ক্ষুদ্রশিল্পসমূহ

আগেই আলোচনা করা হয়েছে সরকার ক্ষুদ্রশিল্পে কর্ম-বিনিয়োগের কথা চিন্তা করে এই শিল্পের বিকাশে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে, নিচে একটি তালিকা দেওয়া হল। এখান থেকে জেলার ক্ষুদ্রশিল্প সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যাবে।

সারণি—১

জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন ক্ষুদ্রশিল্প

শিল্পের নাম	ইউনিট
১। ফুড প্রোডাক্টস	৩০৫
২। ঠাণ্ডা পানীয় তামাক ইত্যাদি	১৭৫
৩। উল, সিল্ক, কৃত্রিম তন্তু	৭৫
৪। পাটের তৈরি ব্যাগ ইত্যাদি	৬২
৫। তৈরি জামাকাপড়	২৭৫
৬। কাঠ শিল্প	৩৪২
৭। কাগজ ও ছাপাখানা	১১৪
৮। চর্ম শিল্প	২৫
৯। রাবার, মোম, প্লাস্টিক	৮৫
১০। কেমিক্যাল প্রোডাক্টস	১২৫
১১। সিমেন্টের রিং ডলোমাইট পাউডার	১০৫
১২। বেসিক মেটাল ইন্ডাস্ট্রিজ	২৫
১৩। কৃষির সরঞ্জাম, বাসনপত্র, লোহার গ্রিল ইত্যাদি	২৯০
১৪। মেশিনারি এবং পার্টস	৭৫
১৫। পিভিসি পাইপ	৫৫
১৬। বাস বডিবিল্ডিং	২৫
১৭। অন্যান্য	১১৬৮
১৮। রিপেয়ারিং	৮৪৫
১৯। হস্তশিল্প	৫৬৫

ক্ষুদ্রশিল্পের বিকাশে জেলা শিল্প কেন্দ্র একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এখান থেকেই সব দিক খতিয়ে দেখে 'দূষণমুক্ত শিল্প' এই মর্মে শংসাপত্র দেওয়া হয়। এছাড়া ক্ষুদ্রশিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির অগ্রগতি পর্যালোচনা করে জেলা শিল্প কেন্দ্র সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলিকে ভরতুকিও দেয়। গত ৩ বছরে যেসব ক্ষুদ্রশিল্প সংস্থাকে স্থায়ী নিবন্ধীকরণ শংসাপত্র দেওয়া হয়েছে, তাদের একটা তালিকা সারণি—২ তে দেওয়া হল।

সারণি—২

গত ৩ বছরে স্থায়ী নিবন্ধীকৃত ক্ষুদ্রশিল্প সংস্থার সংখ্যা

বছর	স্থায়ী নিবন্ধীকৃত ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থার সংখ্যা	মোট বিনিয়োগ (লক্ষ টাকায়)	কর্মসংস্থান হয়েছে
১৯৯৭-৯৮	৯৮	৩৬৮	৭১৩
১৯৯৮-৯৯	৯১	৩৫৯	৯৪৮
১৯৯৯-২০০০	৬৯	২৩৫	৫৮৩

হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যাল প্রকল্পের অনুসারী শিল্প হিসাবে প্লাস্টিক শিল্পের প্রসারে জলপাইগুড়ি জেলা শিল্প কেন্দ্র কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছে। গত ১লা জানুয়ারি ২০০০ থেকে ৩০ শে নভেম্বর ২০০০ পর্যন্ত এ কাজের অগ্রগতি কতখানি হয়েছে তা সারণি—৩-এ বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হল।

সারণি—৩

হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালের অনুসারী শিল্প হিসাবে গড়ে ওঠা প্লাস্টিক শিল্প (১. ১. ২০০০—৩০. ১১. ২০০০)

স্থায়ীভাবে নিবন্ধীকৃত	:	৫টি
কর্মসংস্থানের সুযোগ	:	৫৭টি
মেশিন কেনার জন্য বিনিয়োগ (লক্ষ টাকায়)	:	৪৪টি
নিবন্ধীকরণের জন্য প্রস্তাব	:	৭টি
কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা	:	৫১টি
মেশিন কেনার জন্য বিনিয়োগের সম্ভাবনা (লক্ষ টাকায়)	:	৫৩.৫৬টি

বিকল্প শক্তির উৎস হিসাবে জাতীয় প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত গোবর গ্যাস প্রকল্প রূপায়ণের নোডাল সংস্থা হিসাবে জেলা শিল্প কেন্দ্র কাজ করছে। এই প্রকল্পে গত ৩ বছরের অগ্রগতি সারণি—৪-এ দেওয়া হল।

সারণি—৪

গত ৩ বছরে গোবর গ্যাস প্রকল্পের সাফল্যের খতিয়ান

(ক) ১৯৯৭-৯৮

১। লক্ষ্যমাত্রা — ৩৪৬ টি
২। লক্ষ্যপূরণ — ৩০২ টি
৩। ভরতুকি প্রদান — ৬ লক্ষ ২ হাজার ৩০০ টাকা
৪। টার্ন কি ফি পেমেন্ট — ১ লক্ষ ২০ হাজার ৫০০ টাকা

(খ) ১৯৯৮-৯৯

১। লক্ষ্য — ৩৫০ টি
২। লক্ষ্যপূরণ — ১৪৯ টি
৩। ভরতুকি প্রদান — ৩ লক্ষ ৪২ হাজার ৭০০ টাকা
৪। টার্ন কি ফি পেমেন্ট — ৭৪ হাজার ৫০০ টাকা

(গ) ১৯৯৯-২০০০

১। লক্ষ্য — ৩৩৮ টি
২। লক্ষ্যপূরণ — ৮৯ টি
৩। ভরতুকি প্রদান — ১ লক্ষ ৯৩ হাজার ২০০ টাকা
৪। টার্ন কি ফি পেমেন্ট — ৪২ হাজার টাকা।

জলপাইগুড়ি জেলার আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প হল প্রধানমন্ত্রীর রোজগার যোজনা। এই প্রকল্পে স্ব-নিযুক্তির লক্ষ্যে যাদের বার্ষিক আয় ৪০ হাজার টাকার নিচে এবং যাদের বয়স ১৮ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে (তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতি সম্প্রদায়-ভুক্ত যুবক-যুবতীদের ক্ষেত্রে এই বয়সসীমা ৪০ বছর) তাদের সহায়তা করা হয়ে থাকে। এই প্রকল্পে জলপাইগুড়ি জেলার অগ্রগতি সারণি—৫-এ দেখানো হল।

সারণি : ৫

গত ৩ বছরে জলপাইগুড়িতে প্রধানমন্ত্রী রোজগার যোজনা প্রকল্পে কাজের খতিয়ান

বছর	লক্ষ্যমাত্রা	প্রেরিত প্রকল্প-সমূহ	মঞ্জুরিকৃত প্রকল্পসমূহ	মঞ্জুরিকৃত অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে এমন প্রকল্পের সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	প্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্রশিল্পের সংখ্যা	প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উপভোক্তার সংখ্যা	কর্মসংস্থান হয়েছে
১৯৯৭-৯৮	৯০০	৫৯৭	১৪৪	১৪১	৭১	৪১	১৪৪	৮২
১৯৯৮-৯৯	৯০০	৫৮১	১৩৫	১০০	৫০	১০০	১০৯	২০০
১৯৯৯-২০০০	৮২০	৫৮৬	১০৭	৮২	৪০	৮২	৯৬	১৬৪

❑ জলপাইগুড়ির সামগ্রিক শিল্প সম্ভাবনা নিচে সারণি ও রেখাচিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হল।

প্রতিষ্ঠিত বড় এবং মাঝারি শিল্প :

(ক) চা কারখানা — ১৫৩
(খ) পাতলা কাঠ চেরাই কারখানা — ২

অন্যান্য :

(ক) মেসার্স শরৎ টিউব লিমিটেড।
(খ) মেসার্স সত্যদীপ পলিপাইপস লিমিটেড।
(গ) মেসার্স কুসুম আইরন ও স্টিল।
(ঘ) মেসার্স ক্যাবসনস ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড।
(ঙ) মেসার্স হলদিয়া প্রেসিসন ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি।
(চ) মেসার্স পারফেক্ট এয়ার প্রোডাক্টস।
(ছ) মেসার্স হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড।
(জ) মেসার্স চাঙ্গিয়া ফুড প্রোসেসিং কোম্পানি।
(ঝ) মেসার্স সুন্দরবন ফার্টিলাইজার লিমিটেড।
(ঞ) মেসার্স শিলিগুড়ি ফ্লাওয়ার মিলস্ লিমিটেড।
(ট) মেসার্স নরদান ফ্লাওয়ার মিলস্ লিমিটেড।
(ঠ) মেসার্স ফালাকাটা ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড।
(ড) মেসার্স পাহাড়িমাতা ফ্লাওয়ার মিলস্।

অনুমোদিত প্রকল্প :

নাম	উৎপন্ন দ্রব্য	বিনিয়োগ (কোটিতে)	নিয়োগ
১। সত্য পেপার প্রোডাক্ট প্রাঃ লিঃ	কাগজ/বোর্ড	২.১৫	৮৯
২। প্রণামী পেপারস প্রাঃ লিঃ	ঐ	২.৮০	৮৩
৩। সঞ্জয় কুমার আগরওয়ালা	লোহার রড	—	—
৪। শিবশক্তি ফেরো প্রোডাক্টস প্রাঃ লিঃ	মাইল্ড স্টিল ইংগটস	০.৭০	৩৬
৫। রমিন্দ্র সিং	ঐ	০.৭৬	৩২
৬। মাদোরা উডক্রাফটস অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাঃ লিঃ	পার্টিকিল বোর্ড	০.৮৩	১৪৩
৭। হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড	ইন্ডাস্ট্রিয়াল মনোকারবক্সিলিক	১২.০০	৫১
৮। ফ্লাগন ব্রিওয়ারিজ প্রাঃ লিঃ	বিয়ার	২.৮৯	৪৯

নাম	উৎপন্ন দ্রব্য	বিনিয়োগ (কোটিতে)	নিয়োগ
৯। ফেয়ারডিল ডিসটিলারী অ্যান্ড কেমিক্যাল প্রাঃ লিঃ	অ্যালকোহল	১.৭১	৮৬
১০। গঙ্গোত্রী পেট্রো-কেমিক্যালস লিঃ	ফরম্যালডিহাইড	৪.৩৩	৫০
১১। সেভক ট্রেডিং প্রাঃ লিঃ	হুইট অ্যান্ড মেসলিন ফ্লাওয়ার	১.৫১	৫০
১২। ডালুরাম অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাঃ লিঃ	ওয়েস্ট স্ক্রাপ অফ আয়রন অ্যান্ড স্টিল	৩.৯৫	৬৫
১৩। হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড	সিনথেটিক ডিটারজেন্ট	২২.০০	৩০৪
১৪। ডালুরাম অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাঃ লিঃ	ফেরাস ওয়েস্ট অ্যান্ড স্ক্রাপ	৩.৯৫	৯৫
১৫। ডালুরাম অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাঃ লিঃ	রিমস, চ্যানেলস, পিলারস	৩.৯৫	৯৫
১৬। কুসুম আয়রন অ্যান্ড স্টিল লিঃ	ফেরাস ওয়েস্ট অ্যান্ড স্ক্রাপ	৩.৯৫	৯৫
১৭। কুসুম আয়রন অ্যান্ড স্টিল লিঃ	ফেরাস ওয়েস্ট অ্যান্ড স্ক্রাপ	৩.৯৫	৯৫
১৮। মোতিলাল জিন্দল ফ্লুডস্ প্রাঃ লিঃ	আয়রন অ্যান্ড নন-অ্যালয় স্টিল ইংগট	৩.৯৫	৯০
১৯। কুসুম উদ্যোগ লিঃ	পেপার বেসড ডেকোরেটিভ	২.৮৫	৯০
২০। নর্থ ভ্যালি ইস্পাত উদ্যোগ প্রাঃ লিঃ	স্টিল ইংগট	১.২৯	—
২১। ক্যাবসনস্ ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড	এল পি জি বটলিং	৮.৩৫	১৯
২২। নরবেন টি অ্যান্ড এক্সপোর্টস লিঃ দাগা প্লানটেশনস লিমিটেড	টি	৫.১৮	১৪৫
২৩। অ্যান্ড্রিউ ছইল অ্যান্ড কোঃ	মাশরুম	১১.৬৩	১০৯
২৪। সুরেশ ব্রাদার্স অ্যান্ড কোঃ প্রাঃ লিঃ	টি	১.৭৭	৫০
২৫। টেরাই টি কোঃ প্রাঃ লিঃ	টি ব্রেন্ডডিং অ্যান্ড প্যাকেজিং	১.২০	১১০
২৬। অজিত কুমার আগরওয়ালা	টি	২.৬০	২৭০
২৭। ফালাকাটা ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ	হুইট প্রোডাক্টস	১.৭৫	৭০
২৮। ইস্ট ইন্ডিয়ান টিউবস লিঃ	স্টিল ইংগটস	৪.৫১	২৮৬
২৯। গুডরিক গ্রুপ লিঃ	ইনস্টান্ট টি	১২.২০	১২

ক্ষুদ্রশিল্পে অনুদান :

বছর	সাহায্যপ্রাপ্ত ইউনিটের সংখ্যা	অনুদানের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)
১৯৯১-৯২	৪০	১৯.০১
১৯৯২-৯৩	—	—
১৯৯৩-৯৪	২০	৩২.০৬
১৯৯৪-৯৫	৭২	৭৭.৩৭
১৯৯৫-৯৬ (এখন পর্যন্ত)	১১	৪৯.৩৯

বিকাশশীল শিল্পাঞ্চলে ক্ষুদ্রশিল্পের জন্য জমির যোগান :

(ক) শিলিগুড়ি শিল্পাঞ্চল (ডব্লিউ বি এস আই সি)

১। জমি :

(i) **মোট প্লটের সংখ্যা**	৯৪
(ii) **প্রদেয় প্লটের সংখ্যা**	৯২
(ক) দীর্ঘমেয়াদী চুক্তির ভিত্তিতে (৯৯ বছরের জন্য)	৫৯
চালু	২৬
চালু নয়	৩৩
(খ) স্বল্পমেয়াদী চুক্তির ভিত্তিতে (৭ বছরের জন্য)	৩৩
চালু	২৬
চালু নয়	৭
(iii) **ভবিষ্যতে প্রদেয় প্লটের সংখ্যা**	২

২। নির্মিত কারখানার সংখ্যা : ৩৩

(ক) স্বল্পমেয়াদী চুক্তির ভিত্তিতে (১৫ বছরের জন্য ভাড়া)	৩২
চালু	২৪
চালু নয়	৬
উৎপাদন শুরু হয়নি	২
(খ) দীর্ঘমেয়াদি (চালু)	১

(খ) ডাবগ্রাম বিকাশমান শিল্পাঞ্চল

১। ডব্লিউ বি এস আই সি লিমিটেডের দ্বারা উন্নীত—

(ক) মোট প্লটের সংখ্যা	১০০
(খ) প্রদেয় প্লট	৭৪
(i) চালু ইউনিট (দীর্ঘমেয়াদী)	২১
(ii) নির্মীয়মান	৫
(iii) অনির্মীত (চুক্তির পরে)	৪৮
(গ) অবন্টিত প্লটের সংখ্যা (কাঠা প্রতি ৮০০০ টাকা ভাড়া)	২৬

২। ডব্লিউ বি আই আই ডি সি দ্বারা উন্নীত—

নির্ধারিত মোট জমি (একর প্রতি ৩ লক্ষ ৮৫ হাজার)	৯৯ একর
বণ্টিত প্লটের সংখ্যা	২১
শিল্পের জন্য	১৮
(ক) উৎপাদন শুরু হয় নাই	৭
(খ) বন্ধ	১
(গ) চালু	১০
	১৮
বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে	৩

JALPAIGURI



5 0 5 10 15 Kilometres
SCALE
INDUSTRY
N
B H U T A N
DARJEELING
BANGLADESH
COOCHBEHAR
ASSAM
Malbazar
Matiali
Nagrakata
M.G.Rly.
N.F.
Chalsa
Banarhat
Mal
Siliguri
Bhaktinagore
Dabgram
B.G.Rly.
Phuntsoling
Jaygaon
Hasimara
Buxaduar
Hamiltonganj
Birpara
Madarihat
Kalchini
Jayanti
Dhupguri
Falakata
Torsa R.
Apd-1
Apd-2
Kumargram
Alipurduar
Tista R.
To Haldibari
REFERENCE
International Boundary
State Boundary
District Boundary
Sub-Division Boundary
Block Boundary
District Headquarters
Sub-Division Headquarters
Police Station
National Highway
Other Roads
River
LEGEND
Metallurgical
Engineering
Fertilizer
Food processing
Tea Garden Factory
Other Factory

(গ) রাণীনগর শিল্পাঞ্চল
(ডব্লিউ বি আই আই ডি সি দ্বারা উন্নীত)

(i) **শিল্পের জন্য জমির জোগান** ৫৭.৮২ একর
(ক) প্রদেয় জমি ৩২.৪২ " (৯ টি ইউনিটের জন্য)
(খ) ভবিষ্যতে প্রদান করা হইবে ২৫.৪০ একর
(ii) **আবাসনের জন্য মোট জমির জোগান** ৬৩ একর

(এই জমি এস এস আই ইউনিটকে এবং এল পি জি বটলিং প্ল্যান্ট ইন্ডিয়ান অয়েলকে দেওয়া যাইতে পারে)

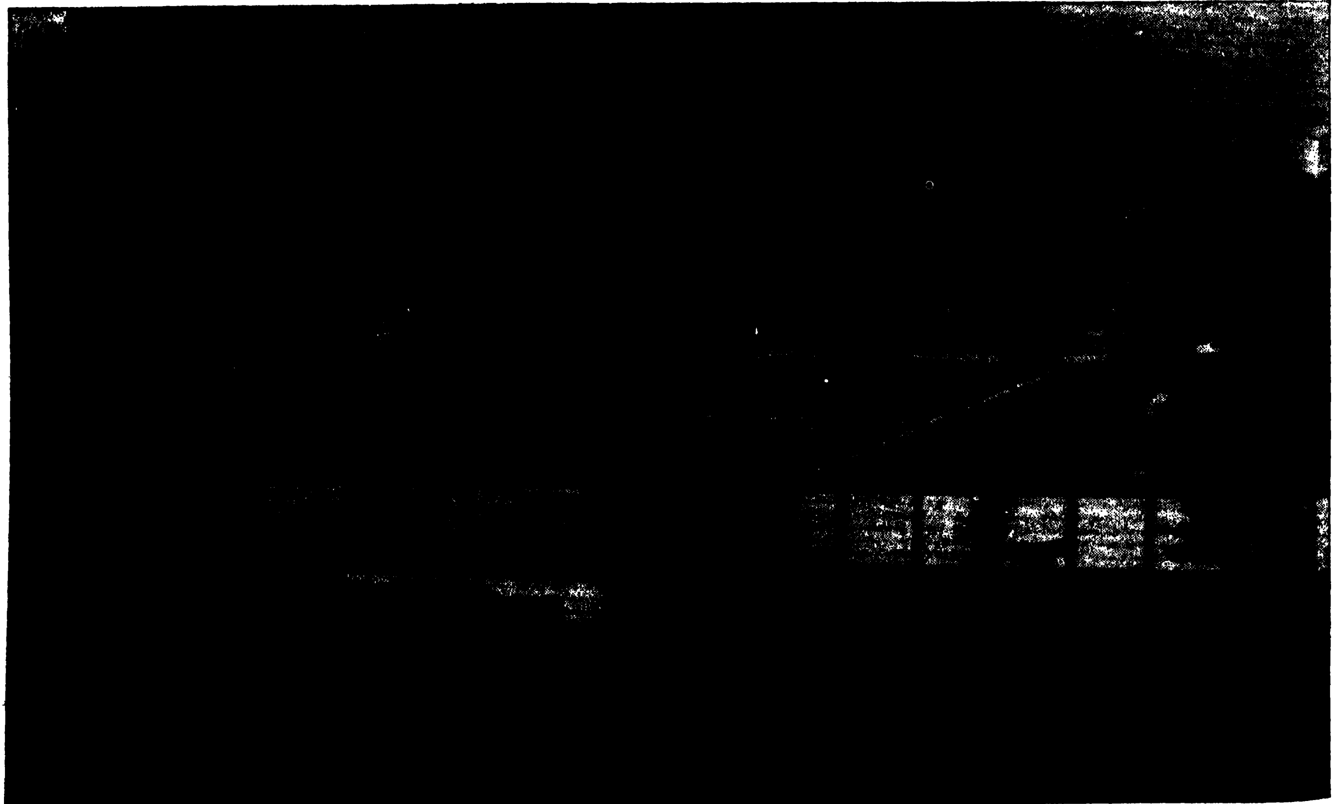
(ঘ) জলপাইগুড়ি শহরের আসাম মোড়ে ওয়েবেল ইলেকট্রনিক্স দ্বারা নির্মিত কারখানা

(ঙ) ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স, আসাম মোড়, **জলপাইগুড়ি**
১নং শেড ৪০০০ বর্গফুট (৪টি ইউনিটের জন্য)
২নং শেড ৪০০০ বর্গফুট (৪টি ইউনিটের জন্য)

জেলার অন্যান্য শিল্প সম্ভাবনাময় অঞ্চলে ক্ষুদ্র—শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় খাস জমির জোগান

১।	**জলপাইগুড়ি গ্রোথ সেন্টার**	মৌজা-খরিজা, শীট নং-৮ প্লট নং-৩৪, ৩৪, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৪, ৪৫, ৪৮, ৬৫, ৬৬, ৬৭ বড় রাস্তার ধারে ও তিস্তা সেতুর সন্নিকটে প্রায় ৪০ একর জায়গা নিয়ে এই অঞ্চল।
২।	**ময়নাগুড়ি**	মৌজা-চরচুড়াভাণ্ডার জলঢাকা নদীর পশ্চিমপাড়ে এবং ময়নাগুড়ি থেকে ৪ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই অঞ্চল। মোট এলাকা প্রায় ৫ একর।
৩।	**ধূপগুড়ি**	শিল্পায়নের জন্য কোনও সরকারি খাস জমি নেই।
৪।	**মালবাজার**	মৌজা-টুনবাড়ি চা বাগান জাতীয় সড়কের পাশে এবং মাল শহরের কাছে সরকারি খাসজমি। মোট এলাকা প্রায় ৪৫ একর।
৫।	**বীরপাড়া**	মৌজা-বীরপাড়া বীরপাড়া শহরের চারিদিকে প্রায় ১০ একরের মতো এই অঞ্চল।
৬।	**এথেলবাড়ী**	সম্প্রতি শিল্পায়নের জন্য কোনও জমি নেই।
৭।	**ফালাকাটা**	সম্প্রতি শিল্পায়নের জন্য কোনও জমি নেই।
৮।	**আলিপুরদুয়ার**	সম্প্রতি শিল্পায়নের জন্য কোনও জমি নেই।
৯।	**চালসা**	মৌজা-সুনগাছি, ৪০ একরের মতো জমি পাওয়া যেতে পারে।.
১০।	**মাদারীহাট**	ডিমডিমা নদীর ধারে ৭৫ একর জমি।

জেলাশাসক, জলপাইগুড়ি



জলপাইগুড়ির রাণীনগরে শিল্প স্থাপনে এগিয়ে এসেছে ইণ্ডিয়ান অয়েল ছবি : শৌভিক ঘোষ

JALPAIGURI

5 0 5 10 15 Kilometres

SCALE

TEA GARDEN

N

BHUTAN

DARJEELING

ASSAM

BANGLADESH

COOCHBEHAR

Malbazar
Matiali
Nagrakata
N.G.Rly.
Chalsa
N.H.
Mal
Latagyri
Barahat
Birpara
Madarihat
Phuntsoling
Jaygaon
Hasimara
Buxaduar
Hamiltonganj
Kalchini
Jayanti
Siliguri
Brakhinagore
B.G.Rly.
Tista R.
Dhupguri
Mainagur
Jalpaiguri
Rajganj
Jalpesh
Falakata
Alipurduar
Kumargram
To Haldibari

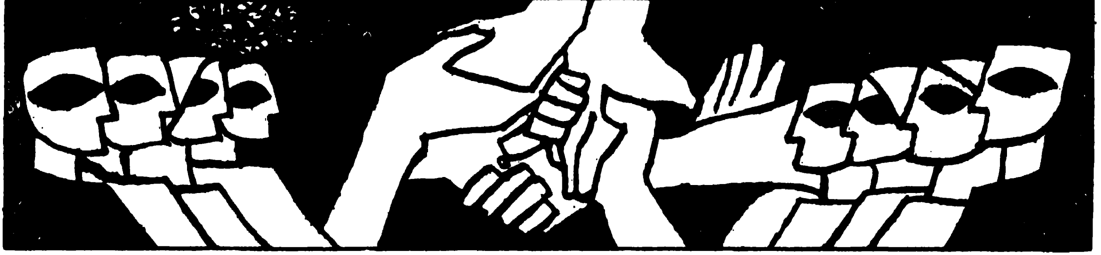
REFERENCE

International Boundary	—|—|—	
State Boundary	— · — · —	River
District Boundary	— — —	
Sub-Division Boundary	- - - - -	
Block Boundary	· · · ·	
District Headquarters	■	
Sub-Division Headquarters	●	
Police Station	□	
National Highway	━━	
Other Roads	——	

LEGEND

Tea Garden

Total number of T.G. in each Block shown in ☐



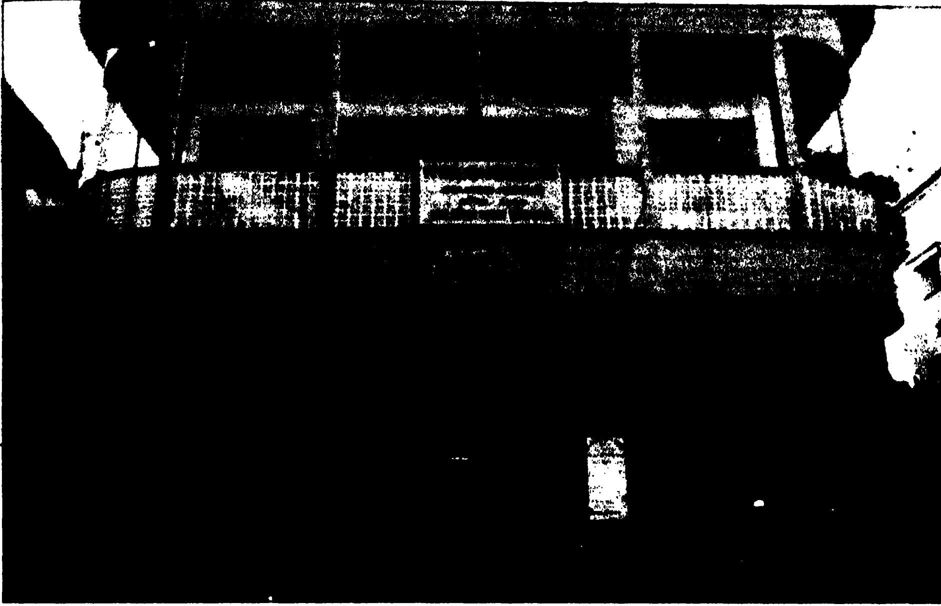
সত্যজিৎ বসু

সমবায় আন্দোলনে জলপাইগুড়ি

সমবায় একটি বিশেষ অর্থনৈতিক আন্দোলন। দেশের বর্তমান ব্যক্তিমালিকানার পাশাপাশি সমবায় ব্যবস্থা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। সমবায় একটি দর্পণ। সমবায় একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রকৃত প্রতিফলনের স্থান। সমবায়ের মাধ্যমেই সবাই মিলে একসঙ্গে কাজ করে তার ফল সবাই মিলে ভাগ করে নেয়। জলপাইগুড়ি জেলা বিভিন্ন সম্প্রদায় ও ভাষাভাষি মানুষের বাসস্থান। এখানে বাস করেন রাজবংশী, মেচ, রাভা, টোটো, নেপালি প্রভৃতি নানা বর্ণের, নানা জাতির মানুষ।

ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় জলপাইগুড়ি জেলায় ব্রিটিশ পুঁজির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে দেশীয় পুঁজিপতিদের কিছু উৎসাহী ব্যক্তি চা-বাগিচা পত্তনে ব্রতী হন। নানা প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে দেশীয় পুঁজি বিনিয়োগে তাদের অগ্রসর হতে হয়। বিশেষ করে কৃষি-নির্ভর এলাকায় স্থানীয় মেচ, রাভা, রাজবংশী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মানুষেরা চা-বাগান পত্তনে নিজেদের যুক্ত করতে পারেনি। ফলে উৎসাহী চা-বাগান পত্তনকারীরা ভিন্ রাজ্য থেকে ওই কাজের জন্য শ্রমিক সংগ্রহ করেন। কেবল জলপাইগুড়ি জেলা নয়, একইরকম ভাবে আসাম ও উত্তর-পূর্ব ভারতেও এই শ্রমিকদের দেখা যায়, যারা প্রধানত মুণ্ডা, ওঁরাও ও সাঁওতাল উপজাতি। পরবর্তীকালে মূল সমাজজীবনের স্রোতের সঙ্গে এরা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়ে। কিন্তু এদের কাজ প্রধানত চা-বাগিচানির্ভর হওয়ায় মূল সমবায় আন্দোলনের সঙ্গে বৃহৎ অংশ যুক্ত হতে পারেনি। চা-বাগিচার কাজের বাইরে এই প্রজাতিদের যাঁরা কৃষির সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন, তারা গ্রামীণ কৃষি উন্নয়ন সমিতির সদস্য অথবা ল্যাম্পস্-এর সদস্য হিসাবে সমবায়ের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন।

১৩০ বছরের পুরোনো জলপাইগুড়ি জেলার অর্থনৈতিক উন্নয়নের ইতিহাস অন্বেষণ করলে দেখা যায় ১৯১১ সালে এই জেলায় প্রথম সমবায় সমিতি নথিভুক্ত হয়েছিল। ওই



জলপাইগুড়ি সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড ছবি : শৌভিক ঘোষ

সময় জেলায় নতুন নতুন চা-বাগান পত্তন হচ্ছে, শ্রমিকেরা চা-বাগানে কাজ করছেন আর জোতদার, ভূস্বামীরা কৃষককে তার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করছেন। এর বিরুদ্ধে কৃষকেরা এখন খুঁজে বেড়াচ্ছেন বাঁচার রাস্তা। ১৯১১ সালে জলপাইগুড়ি সদর থানার বোনাপাড়া গ্রামের নিত্যানন্দ রায় নামে এক কৃষক ১২-১৩ জন কৃষককে সমবেত করে "বোনাপাড়া গ্রাম্য সমবায় ভাণ্ডার" গঠন করেন। ওই বছর ২২ ফেব্রুয়ারি এই সমবায় সমিতি নথিভুক্ত হয়। ওই সময় এই সমিতির মূলধন ছিল মাত্র ১৩৬ টাকা ৫০ পয়সা। ১৯১২ সালে আলিপুরদুয়ার মহকুমায় মহাকালগুড়ি সমবায় সমিতি নথিভুক্ত হয়। এর পর থেকে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত জেলার সমবায় আন্দোলনে প্রবল গতি সঞ্চার হয়। বিভিন্ন গ্রামে এবং ব্লকে গ্রামীণ কৃষি ঋণদান সমিতি গঠিত হতে থাকে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য, ১৯১৬ সালে গঠিত হয় ডাক বিভাগের কর্মচারী ঋণদান সমিতি। সম্ভবত কর্মচারী ঋণদান সমিতির ক্ষেত্রে এটি প্রথম নথিভুক্ত ঋণদান সমিতি। জলপাইগুড়ি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক গঠিত হয় ১৯১৯ সালে। ওই বছর ৬ এপ্রিল এই ব্যাঙ্ক নথিভুক্ত হয়। ওই সময় এর নাম ছিল জলপাইগুড়ি সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ্ ব্যাঙ্কিং ইউনিয়ন। ব্রিটিশ সরকারের নিয়মে ব্যাঙ্কের সভাপতি হন ডেপুটি কমিশনার ডব্লু স্ট্রং। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে ব্যাঙ্কের নাম পরিবর্তন হয় এবং বেসরকারি পরিচালন পরিষদ গঠিত হয়। ১৯১৩ সালে সর্বপ্রথম অকৃষি ঋণদান সমিতি গঠিত হয় জলপাইগুড়ি পিপলস্ কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক নামে।

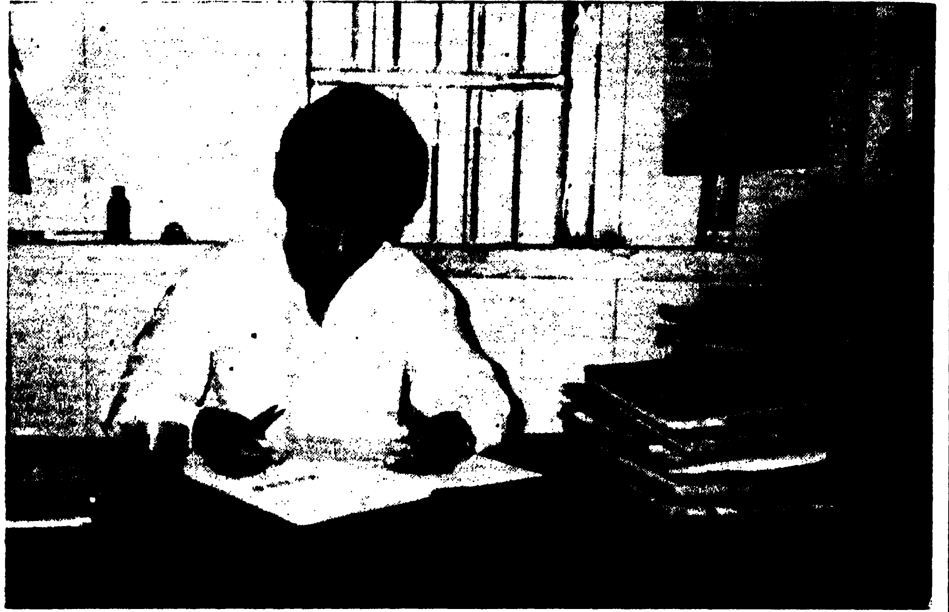
বর্তমানে জলপাইগুড়ি জেলায় দুটি সাব-ডিভিশনের মধ্যে আলিপুরদুয়ার সাব-ডিভিশন কোচবিহার জেলা সমবায় বিভাগ থেকে এবং জলপাইগুড়ি সদর সাব-ডিভিশন জলপাইগুড়ি জেলা সমবায় দপ্তর দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। আলিপুরদুয়ারে গ্রামীণ কৃষি উন্নয়ন ঋণদান সমিতির সংখ্যা ৫৭টি এবং সদর ব্লকে ১৮৩টি। আলিপুরদুয়ার কৃষি ঋণদান সমিতির মাধ্যমে বছরে ২ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা ঋণ কৃষকদের কাছে দেওয়া হয়। আলিপুরদুয়ার সাব-ডিভিশনের আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকে ৭টি, আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকে ১২টি, কুমারগ্রামদুয়ারে ৭টি এবং ফালাকাটা ব্লকে ২৪টি কৃষি ঋণদান সমিতির মাধ্যমে এই টাকা দেওয়া হয়ে থাকে। যে সমস্ত কৃষককে ঋণ দেওয়া হয়, তারা বেশির ভাগই ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক। এদের সংখ্যা প্রায় ৩,৫০০ জন। বিশেষ করে ফালাকাটা ব্লকের কৃষির উন্নয়নের মূলে সমবায় সমিতির ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এখানে বছরে প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা দাদন করা হয়। কৃষিঋণ দাদনের ক্ষেত্রে জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের ধূপগুড়ি, ময়নাগুড়ি, মালবাজার, রাজগঞ্জ ব্লকের কৃষি ঋণদান সমিতিগুলির মাধ্যমে বছরে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের কাছে ঋণ দেওয়া হয় প্রায় ৩ কোটি ১০ লক্ষ টাকা।

কৃষকের কাছে কৃষিঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে সমবায় ব্যবস্থা জেলায় বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। আদায়ের ক্ষেত্রেও আলিপুরদুয়ার সাব-ডিভিশনে আদায়ের পরিমাণ প্রায় ৪৪%, এবং সদর ব্লকে আদায়ের পরিমাণ ৪৫% যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে কৃষকের সচেতনতার জন্য।

উভয় ব্লকেই কিছু গ্রামীণ কৃষি ঋণদান সমিতি নথিভুক্ত থাকলেও তারা কৃষকদের মধ্যে দাদন করতে পারছেন না। এর একটা বড় কারণ সমিতির পরিচালন ব্যবস্থার ত্রুটি। এই বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই রেঞ্জ এ আর সি এস ও কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক যৌথভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যাতে সমিতিগুলোকে চালু করে কৃষকদের মধ্যে প্রয়োজনীয় কৃষি ঋণদান করা হয়। আলিপুরদুয়ারের কৃষি ঋণদান সমিতিগুলির মাধ্যমে কেবলই কৃষক নয়, মহিলাদেরও স্বনির্ভর করার

রাজ্যের কেবল নয়, দেশের মধ্যেও সবচাইতে জনসংখ্যায় ছোট উপজাতি টোটোরা বাস করেন মাদারিহাট ব্লকের টোটোপাড়ায়। এদের মধ্যে গত তিন বছর যাবত গঠিত হয়েছে সমবায় মার্কেটিং কমিটি। তাদের উৎপাদিত ফসল ন্যায্য দাম যাতে আদিবাসীরা পান, সেই দিকে নজর রাখছেন। এই বিষয়ে জেলা আদিবাসী ও উপজাতি উন্নয়ন নিগম প্রয়োজনীয় দেখাশোনার দায়িত্বে আছেন।

কর্মসূচি সফলতার মুখ দেখতে পাচ্ছে। এই রকমই একটি সমবায় সমিতি 'ভাটিবাড়ি কৃষি উন্নয়ন' সমিতিতে দেখলাম দুর্যোগ উপেক্ষা করেও প্রায় ১০০ জন মহিলা স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর সদস্যারা সমবেত হয়েছিল, তাঁদের বিভিন্ন হাতের কাজ দেখাতে, যাঁরা নিজেদের মা সারদা, মাতঙ্গিনী, মঙ্গলচণ্ডী গোষ্ঠী নামে কাজ করছেন। রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের কোচবিহার শাখার ইউনিট ম্যানেজার আশিস ভৌমিক জানালেন, এই ধরনের সমবায় সমিতিতে মহিলারা স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী উৎসাহের সঙ্গে গঠন করছেন। আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রাম তুরতুরিখণ্ড গ্রাম পঞ্চায়েতে বোড়ো, মেচ, নেপালি মহিলারা পশুপালন ও দুধ উৎপাদন করছেন, যার সঙ্গে যুক্ত আছে ৫০টি পরিবার। সমবায় সমিতির মাধ্যমে ফরেস্ট এলাকার বাসিন্দারা এই ধরনের সমবায় সমিতি গঠনে খুব উৎসাহী হচ্ছেন।



জেলার একমাত্র উপজাতি, টোটোপাড়ার গর্ব—ভক্ত টোটো, গ্রামীণ ব্যাঙ্কের ম্যানেজার ছবি : সলিল আচার্য

জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের কৃষি ঋণদান সমিতির মাধ্যমেও মহিলাদের স্বনির্ভর প্রকল্পে ২০০টি গোষ্ঠী গঠিত হয়েছে, যাদের সদস্যারা প্রধানত বিভিন্ন আদিবাসী ও স্থানীয় বাসিন্দা। এরা প্রধানত পশুপালন ও হাতের কাজে নিয়োজিত আছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ময়নাগুড়ির 'খাগড়াবাড়ির কৃষি সমবায় উন্নয়ন সমিতি'। যারা জেলায় প্রথম স্বনির্ভর প্রকল্পের কাজ আরম্ভ করেন। এই প্রকল্পের উদ্বোধন করেছিলেন জেলা সভাধিপতি শ্রীমতি দীপ্তি দত্ত। কৃষিক্ষেত্রে উন্নতির জন্য কৃষকের কাছে কৃষিঋণ ছাড়াও সমবায় ব্যবস্থায় কৃষির উপকরণ দেওয়া হয়ে থাকে। যার পরিমাণ জেলায় প্রায় ৩ কোটি টাকা। এর মধ্যে এ আর ডি বি এবং জলপাইগুড়ি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক দাদন করে থাকেন। যেমন—পাম্পসেট, যন্ত্রচালিত লাঙল ইত্যাদি।

রাজ্যের কেবল নয়, দেশের মধ্যেও সবচাইতে জনসংখ্যায় ছোট উপজাতি টোটোরা বাস করেন মাদারিহাট ব্লকের টোটোপাড়ায়। এদের মধ্যে গত তিন বছর যাবত গঠিত হয়েছে সমবায় মার্কেটিং কমিটি। তাদের উৎপাদিত ফসল ন্যায্য দাম যাতে আদিবাসীরা পান, সেই দিকে নজর রাখছেন। এই বিষয়ে জেলা আদিবাসী ও উপজাতি উন্নয়ন নিগম প্রয়োজনীয় দেখাশোনার দায়িত্বে আছেন। সমবায় সমিতি গঠিত হওয়ার ফলে উপজাতি সদস্যরা ন্যায্য মূল্য পাওয়ার নিশ্চয়তা পাচ্ছেন। জলপাইগুড়ি জেলার আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে গঠিত হয়েছে আদিবাসী উন্নয়ন সমবায় সমিতি, যাকে বলা হয় ল্যাম্পস্। এরা আদিবাসীদের প্রয়োজনভিত্তিক ঋণ এবং কাজের সুযোগ তৈরি করেছেন। উল্লেখযোগ্য সমিতিগুলির মধ্যে মাদারিহাট ল্যাম্পস্, বড়দীঘি ল্যাম্পস্, নাগরাকাটা ল্যাম্পস্ ইত্যাদি খুব ভালো কাজ করছে।

কৃষিপণ্য সংরক্ষণের জন্য জলপাইগুড়ির ধূপগুড়িতে হিমালয়ান হিমঘর সাফল্যের সঙ্গে কাজ করছে। যেখানে আলু সংরক্ষিত হয় পাঁচ মেট্রিক টন। ফালাকাটার আর একটি সমবায় হিমঘর স্থাপনের কাজ আরম্ভ হয়েছে।

ক্রেতা সমবায়ের ক্ষেত্রে জেলায় সর্বপ্রথম নাম করতে হয় কালচিনি কনজুমার্স স্টোরস্-এর। যারা ১৯৬৫ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে ওই এলাকার ক্রেতাদের স্বার্থ দেখছেন। এদের মূলধন প্রায় এক কোটি টাকা। ব্যাঙ্কঋণ ছাড়াই নিজেদের উদ্যোগে এঁরা সমিতি পরিচালনা করেন সম্পূর্ণ রকম বেসরকারি পরিচালন ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে। জেলায় পাইকারি ক্রেতা সমবায় সমিতি আছে একটি এবং সেন্ট্রাল কনজুমার্স আছে একটি। যেটি বেসরকারি নির্বাচিত ডিরেক্টর বোর্ডের দ্বারা পরিচালিত হয়ে আসছে। এখানে প্রাথমিক সদস্যদের মধ্যে জেলার বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামীরা ছিলেন,

কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকেরা নিজেদের পায়ে দাঁড়াবার জন্য সমবায় সমিতি গঠন করে কাজ করছেন। এদের সংখ্যা ১৭৩। এদের জলপাইগুড়ি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের মাধ্যমে বছরে প্রায় দেড় কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হয় বিভিন্ন কাজের জন্য এবং আলিপুরদুয়ার সাব-ডিভিশনেও ঋণ দেওয়া হয় প্রায় এক কোটি টাকা। এরা নানা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন বেসরকারি ব্যবস্থার সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে।

এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫৩ সালে। বর্তমানে এই সমবায় সমিতি জেলার একমাত্র রান্নার গ্যাস সরবরাহের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করছে। বর্তমানে প্রাথমিক ক্রেতা সমবায় সমিতি আছে ৬২টি। যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মেটেলী কনজুমার্স স্টোরস্। চা-বাগান অধ্যুষিত মেটেলী এলাকায় শ্রমিকেরা এই সমবায় সমিতির উপরে নির্ভরশীল। এর ফলে এই এলাকার শ্রমিকেরা মহাজনদের কাছ থেকে কম শোষিত হচ্ছেন।

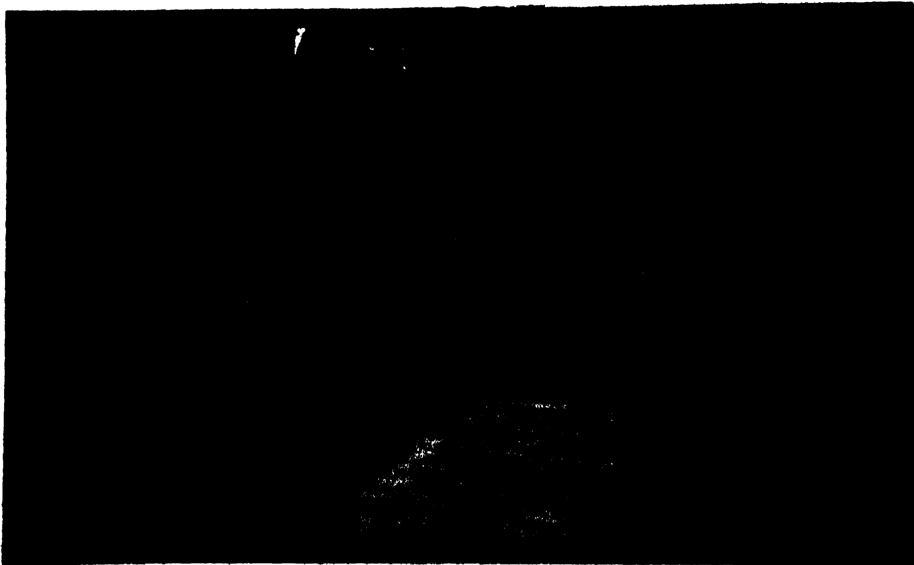
কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকেরা নিজেদের পায়ে দাঁড়াবার জন্য সমবায় সমিতি গঠন করে কাজ করছেন। এদের সংখ্যা ১৭৩। এদের জলপাইগুড়ি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের মাধ্যমে বছরে প্রায় দেড় কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হয় বিভিন্ন কাজের জন্য এবং আলিপুরদুয়ার সাব-ডিভিশনেও ঋণ দেওয়া হয় প্রায় এক কোটি টাকা। এরা নানা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন বেসরকারি ব্যবস্থার সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে।

কর্মচারী ঋণদান সমিতির সংখ্যা ১৫৯। কর্মচারীরা তাদের সমিতির মাধ্যমে সদস্যদের ঋণ দিয়ে থাকেন স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদিতে। অনেক সমিতি আছে, যারা ব্যাঙ্কের সাহায্য ছাড়াই নিজেদের সঞ্চিত আমানত থেকে ঋণদান করে। যেমন— জীবনবীমা কর্মচারী ঋণদান সমিতি, আনন্দ চন্দ্র কলেজ কর্মচারী ঋণদান সমিতি, জলপাইগুড়ি মিউনিসিপাল এমপ্লয়িজ ক্রেডিট সোসাইটি প্রভৃতি। এ ছাড়া ব্যাঙ্কের থেকে ঋণ নেন বছরে প্রায় ২ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা। এই প্রসঙ্গে জলপাইগুড়ি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের মাধ্যমে কর্মচারী ঋণদান সমিতির সদস্যদের গৃহনির্মাণ বাবদ সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ টাকা ঋণ দেবার প্রকল্প সম্প্রতি চালু করা হয়েছে।

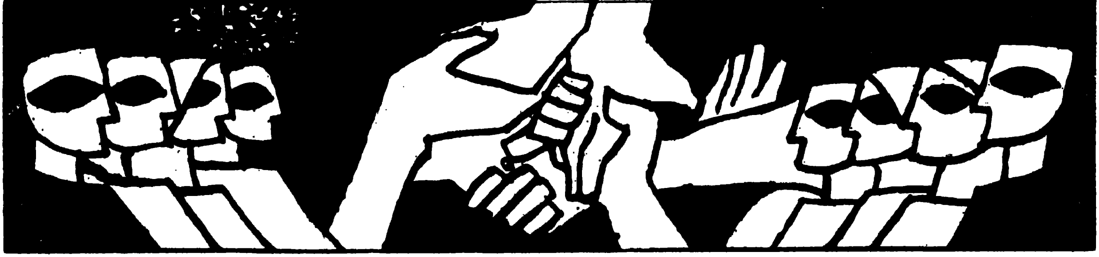
জলপাইগুড়ি মার্কেটিং সমবায় সমিতিগুলির মধ্যে ধূপগুড়ি ও বেলাকোবা ছাড়া কেউ ঠিকমতো কাজ করতে পারছে না। এর কারণ পরিচালন ব্যবস্থার ত্রুটি। সমবায় আন্দোলনে প্রশিক্ষণের গুরুত্ব সর্বাধিক। প্রতিনিয়ত সদস্যদের পরিচালকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া খুবই জরুরি। জলপাইগুড়িতে এই কাজের জন্য একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আছে। যেখানে সারা বছর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে। স্বাধীনতার পূর্ব থেকেই জলপাইগুড়ি জেলার সমবায় সমিতি পরিচালিত হত দার্জিলিং অফিস থেকে। ১৯৬১ সালে এই ব্যবস্থা পরিবর্তিত হয় এবং জলপাইগুড়ি সদর মহকুমা জলপাইগুড়ি থেকে এবং আলিপুরদুয়ার মহকুমা কোচবিহার থেকে পরিচালিত হচ্ছে। এই ব্যবস্থার ফলে জেলার সমবায় আন্দোলন অনেকাংশে ব্যাহত হচ্ছে। এই বিষয়টি নিয়ে ইতিপূর্বে প্রাক্তন সমবায়মন্ত্রী নির্মল বসু উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। যাতে একই জেলার সমবায় সমিতিগুলির অংশ একই সমবায় রেঞ্জের মধ্যে থাকে। কিন্তু সে ব্যবস্থা ফলপ্রসূ হয়নি। জেলা পরিষদের মাধ্যমে এবং রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের উদ্যোগে এই বিষয়টির নিষ্পত্তি হওয়া খুব জরুরি।

কৃষিনির্ভর জলপাইগুড়ি জেলায় সমবায় আন্দোলন কৃষিক্ষেত্রে যতখানি সাহায্য করার প্রয়োজন ছিল, সবটা করতে পারেনি। অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রায় একই রকম অবস্থা। তা সত্ত্বেও রাজ্য সরকারের উদ্যোগে এবং কৃষকের মধ্যে সচেতনতা বাড়ার ফলে জেলার সমবায় আন্দোলন উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করছে। জেলার প্রায় সব সমিতিতেই গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মাধ্যমে পরিচালক পরিষদ গঠিত হয়েছে। জেলায় সরকারি নিযুক্ত পরিচালক নেই বললেই চলে। হিসাব পরীক্ষা শতকরা ৯০ ভাগ সমিতিতে নিয়মিত হয়। সমবায়ের আন্দোলনের আর্থিক লেনদেনের মূল প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক গত চার বছর যাবত ধারাবাহিকভাবে বেড়ে চলেছে। অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে উত্তরবঙ্গের বহু ভাষাভাষি ও ধর্মবর্ণের মানুষের বাসস্থান জলপাইগুড়ি জেলার সমবায় আন্দোলন এগিয়ে চলেছে।

লেখক ❑ জেলার সমবায় আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক ও সাংবাদিক



শীতের মরশুমে ডুয়ার্সের জয়ন্তীতে কমলালেবুর সংগ্রহ *ছবি : সলিল আচার্য*



দীপ্তি দত্ত

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও জলপাইগুড়ির উন্নয়ন

সাল ১৮৬৯। ১ জানুয়ারি। পূর্বতন পশ্চিম ডুয়ার্স জেলা (যার সদর ছিল ময়নাগুড়িতে) এবং ১৮৬৭তে রংপুর জেলার যে ৩টি থানা পশ্চিম ডুয়ার্স জেলার ফৌজদারি প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল (বোদা, সন্ন্যাসীকাটা এবং ফকিরগঞ্জ অর্থাৎ বর্তমান জলপাইগুড়ি)—এই ভৌগোলিক এলাকা নিয়ে গঠিত হল জলপাইগুড়ি জেলা। জেলা সদর হল জলপাইগুড়ি। তখন মহকুমা ছিল ২টি। (১) জলপাইগুড়ি সদর (২) ফালাকাটা। ১৮৭৪ সালে ফালাকাটা থেকে মহকুমা স্থানান্তরিত হল বক্সায় (ভল্কা) এবং ১৮৭৬ সালে সেখান থেকে আলিপুরদুয়ার। নবগঠিত জলপাইগুড়ি জেলাশহর জলপাইগুড়ি বিভাগের স্বীকৃতি পেল ১৯৬৩ সালে। তার আগে এই জেলা যুক্ত ছিল ১৮৬৯ সাল থেকে কোচবিহার বিভাগে, ১৮৭৫ সাল থেকে রাজশাহী কোচবিহার বিভাগে, ১৮৮৩ সাল থেকে রাজশাহী বিভাগে এবং ১৯৪৭ সাল থেকে প্রেসিডেন্সি বিভাগে।

কেমন ছিল জলপাইগুড়ি জেলার চেহারা। উত্তরে ভুটান, দক্ষিণে কোচবিহার, পূর্বে আসাম, পশ্চিম দার্জিলিং এবং বর্তমান বাংলাদেশ। মাঝখানে ৬২৪৫ বর্গ কিমি জুড়ে মনোরম ভূখন্ড জেলা জলপাইগুড়ি।

সে ছিল জল আর জঙ্গলে ভরা। পাহাড়-ঝরা জলে সৃষ্ট অসংখ্য নদী-নালার প্রবাহ এর বুক চিরে চিরে। পাশে বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল। গাঁয়ের মানুষের জীবনযাত্রার আবর্তন কৃষি আর বনকে ঘিরে ; অবশ্যই বাগিচার প্রভাব অনস্বীকার্য। বলতে গেলে জেলার অর্থনীতি আবর্তিত হয়েছে চা-বাগানকে ঘিরেই। তাদের মানুষের সুখদুঃখ হাসি কান্না হর্ষ-বিষাদের গাথায় ভরা জলপাইগুড়ির জীবন।

১৯৪৭-এ দেশ বিভাগের সময় রাজ্যের অন্য প্রান্তের সঙ্গে এখানে এসে মাথা গুঁজেছেন বহু ছিন্নমূল মানুষ। ১৯৭১-এ বাংলাদেশ সৃষ্টির মুহূর্তে শরণার্থীর স্রোতপ্রবাহ ঘটে গেছে আরেকবার এ জেলার ওপর দিয়ে। তাই জলপাইগুড়ির



জলপাইগুড়ি সদর ডাকবাংলো (নবপর্যায়ে) *ছবি : স্বপন সরকার*

জীবনাবর্তন এপার-বাংলা ওপার-বাংলার মানুষের মিলিত জীবন প্রবাহ দিয়েই।

বর্তমান ২টি মহকুমা, ১৬টি থানা, ১৩টি পঞ্চায়েত সমিতি, ৩টি পৌরসভা, ১২টি শহর, ১৪৮টি গ্রাম পঞ্চায়েত, ৫৯৫টি গ্রাম ও ৭৭৪টি মৌজায় ৩২ লক্ষ মানুষের উন্নয়ন ও অবনয়নের কথা জলপাইগুড়ি জেলার কথা।

ধূমল পাহাড় সীমান্তে, পাদদেশে নিস্তরঙ্গ সবুজ সমুদ্রের মাঝ দিয়ে কুমারীর চেরা সিঁথির মতো মসৃণ পথ, দৃষ্টি-নন্দন বন-বাগিচার মাঝে মাঝে বিস্তীর্ণ চরভূমি তিস্তা, তোর্ষা, ডায়না, রায়ডাক, জলঢাকার। বন পাহাড়ের সঙ্গে মিতালি করে ছুটে চলে ডুয়ার্সের রেললাইন। সৌন্দর্যের রানী জলপাইগুড়ি। এর ছায়ায় দাঁড়িয়েই জুড়িয়ে যায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। আপ্লুত হয়ে ওঠে মন। মননের বিস্তার সৌন্দর্যের অনুধ্যানে অনুভূতির গভীরতর প্রদেশে।

১৯৭৭। রাজ্যের ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত বামফ্রন্ট।

১৯৭৮। প্রতিষ্ঠিত হল পঞ্চায়েতী রাজ। নতুন প্রভাতের স্বপ্নে রাতারাতি জেগে উঠল নামহীন গোত্রহীন অন্ধকারে পথ চলা মানুষেরা। ব্রাত্য জীবনের ভালে অঙ্কিত হল ব্রহ্মাণ্ডের তিলক। জেলা প্রশাসনে পালা বদল হল উন্নয়নের ভার এল সাধারণ মানুষের হাতে, নির্বাচিত ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের ওপর। মর্যাদাহীন মানুষেরা পেলেন আত্মমর্যাদা। সমাজজীবনের মূল্যবোধে ঘটে গেল যুগান্তর। যে ছিল ধূলি ধূসরিত সে পেল মানুষের সম্মান। মূল্যবোধের পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে আমরা খতিয়ে দেখছি জলপাইগুড়ির গত তেইশটি বছর।

(বামফ্রন্ট সরকারের প্রধান লক্ষ্য— সুসংহত গ্রামীণ বিকাশ কর্মসূচি। স্ব-নিযুক্তির মাধমে গ্রামীণ দারিদ্র্য, বেকারি আর ক্ষুধার অবসান। নাগরিক পরিষেবা বিস্তৃতির মাধ্যমে উন্নতি নগরজীবনের প্রতিষ্ঠা)।

গ্রামীণ বিকাশের কথা বলতে গেলে প্রথমেই জেলার কৃষির অগ্রগতির কথা বলতে হয়। জেলায় পঞ্চায়েত গঠনের পর কৃষিপণ্যে পদ্ধতিগত পরিবর্তনের ফলে এখন ২/৩ টি ফসল হচ্ছে এবং শাক-সব্জিরও উৎপাদন বৃদ্ধি হয়েছে। আধুনিক চাষ-আবাদের জন্য পাওয়ার টিলার, ট্রাক্টর, স্প্রে মেশিন ইত্যাদির ব্যবহার বেড়েছে। এর ফলে ২৫-২৭ শতাংশ জমি সেচের আওতায় এসেছে। একই সঙ্গে ওয়াটারশেড ডেভেলপমেন্টের কাজ শুরু হয়েছে। কৃষি শ্রমিক, প্রান্তিক চাষীদের মান উন্নয়নে বিভিন্ন পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। পঞ্চায়েত উদ্যোগে স্থানীয় সম্পদ দিয়ে ইন্দিরা আবাস যোজনা তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সার্বিকভাবে কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে মাটি পরীক্ষা, উন্নতমানের বীজ ব্যবহার, উন্নত সেচ ব্যবস্থা, ফসল সংরক্ষণ, আধুনিক বিপণন ব্যবস্থা ইত্যাদির মাধ্যমে জেলায় কৃষির অগ্রগতিতে এক জোয়ার এসেছে।

কৃষির উপর চাপ কমাতে জনগণ যাতে পশুপালনে আগ্রহী হয়, সে ব্যাপারে পঞ্চায়েতও উদ্যোগ নিয়েছে। এর ফলে দুধ, মাংস, ডিম প্রভৃতির উৎপাদন বেড়েছে। তবে চাহিদার তুলনায় এই উৎপাদন এখনও কম। এই উৎপাদন বাড়ানোর প্রয়াস চলছে।



আলিপুরদুয়ার মহকুমা ভূমি ও ভূমিসংস্কার দপ্তর কার্যালয়ের দ্বারোদঘাটন অনুষ্ঠানে প্রদীপ জ্বালাচ্ছেন জলপাইগুড়ির জেলাশাসক পি রমেশকুমার

প্রাণী সম্পদ রক্ষার জন্য পঞ্চায়েত প্রাণী চিকিৎসার ব্যাপারেও উদ্যোগ নিয়েছে।

এরপরই গ্রামীণ বিকাশের কথা বলতে হলে উল্লেখ করতে হয় 'জেলা উন্নয়ন গ্রামীণ সংস্থা'র কথা। এই সংস্থার নানাবিধ প্রকল্প রূপায়ণে সরকারি আধিকারিকদের সঙ্গে পঞ্চায়েত প্রতিনিধিরা ছিলেন বিনিদ্র সহযোগী।

গ্রামীণ বিকাশের কথা বলতে গেলে প্রথমেই জেলার কৃষির অগ্রগতির কথা বলতে হয়। জেলায় পঞ্চায়েত গঠনের পর কৃষিপণ্যে পদ্ধতিগত পরিবর্তনের ফলে এখন ২/৩ টি ফসল হচ্ছে এবং শাক-সব্জিরও উৎপাদন বৃদ্ধি হয়েছে। আধুনিক চাষ-আবাদের জন্য পাওয়ার টিলার, ট্রাক্টর, স্প্রে মেশিন ইত্যাদির ব্যবহার বেড়েছে। এর ফলে ২৫-২৭ শতাংশ জমি সেচের আওতায় এসেছে।

৩০.৯.২০০০ পর্যন্ত এক নজরে উপরোক্ত কর্মসূচিগুলোর সাফল্যের খতিয়ান।

প্রকল্প	সাহায্য প্রাপকের সংখ্যা	অনুদান	ব্যাঙ্কঋণ (লক্ষ টাকায়)
(ক) আই আর ডি পি	১,১৬,১১২	২৩১৯.৪৯	৩৫৮৯.৫৯
(খ) ট্রাইসেম	৯,১৯০	১৩৮.৮৫	—
(গ) ডোকরা	৯২১ (টি দলের মোট সদস্য সংখ্যা ১২,৩৩০	৮৮.৮০	—
(ঘ) এস জে ওঁয়াই	৩৪ (টি দল)	৩.৪০	—

তফসিলি জাতি ও আদিবাসী উন্নয়ন ও বিত্তনিগমের প্রচেষ্টায় গৃহীত প্রকল্প—

পারিবারিক উন্নয়ন প্রকল্প (এস সি পি ও টি এস পি)

জাতীয় তফসিলি জাতি বিত্ত ও উন্নয়ন নিগমের আর্থিক সহায়তাযুক্ত—

স্বনির্ভর আর্থিক উন্নয়ন প্রকল্প (এন এস এফ ডি সি)

জাতীয় সাফাই কর্মচারী পুনর্বাসন প্রকল্প (এন এস এস)

উত্তরবঙ্গ সমবায় সেচ প্রকল্প—

তফসিলি জাতি ও আদিবাসীভুক্ত দরিদ্র কৃষকের জমিতে সেচের সুবিধা দেবার জন্যে কমপক্ষে ১০ জন ক্ষুদ্র প্রান্তিক কৃষকের মালিকানাধীন আনুমানিক ৩০-৩২ বিঘা জমি নিয়ে চিহ্নিত এক একটি সেচ এলাকা।

২০০০-২০০১ সালের জন্যে নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা ৫০০টি প্রকল্প।

রাজগঞ্জ ব্লক	১০টি
সদর ব্লক	১০টি
ময়নাগুড়ি ব্লক	৮০টি
ধূপগুড়ি ব্লক	৮০টি
ফালাকাটা ব্লক	৮০টি
মাল ব্লক	১০টি
মেটেলি ব্লক	১০টি
নাগরাকাটা ব্লক	১০টি
মাদারিহাট ব্লক	১০টি
কালচিনি ব্লক	১০টি
আলিপুরদুয়ার ১নং ব্লক	৭০টি
আলিপুরদুয়ার ২নং ব্লক	৭০টি
কুমারগ্রাম ব্লক	৫০টি
	৫০০টি

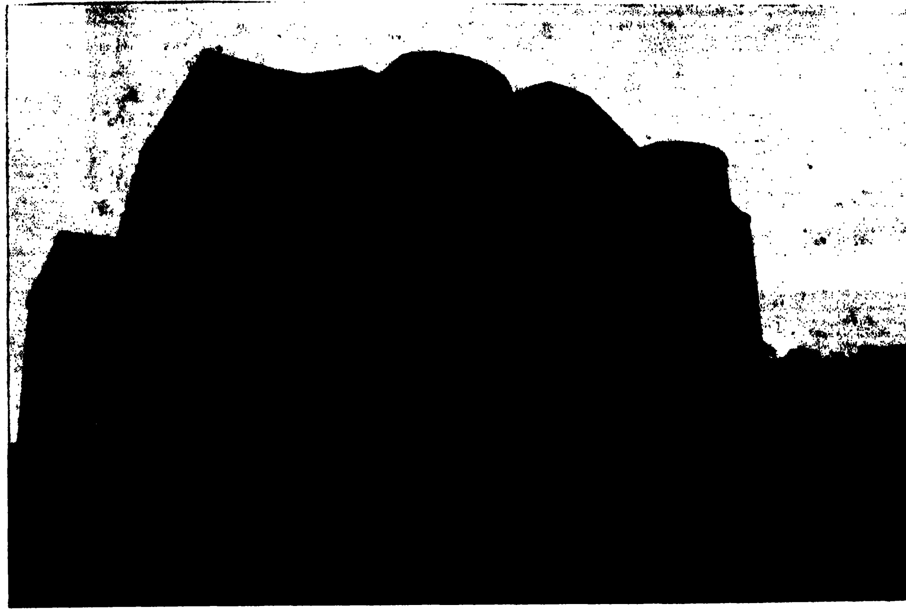
প্রতিটি প্রকল্পের ব্যয় ৪৫,০০০ টাকা। এর মধ্যে নিজস্ব লগ্নী ৮০০০ টাকা, ৬০০০ অনুদান। বাকি ঋণ উপভোক্তাদের তরফে পরিশোধ করবেন রাজ্য সরকার।

এছাড়া তফসিলি জাতি ও আদিবাসীদের জন্য নির্দিষ্ট হাউস ডেয়ারি স্কিম। বছরের যাঁদের পারিবারিক আয় ২২,০০০ টাকার মধ্যে তাঁরা সুযোগ পাবেন এই স্কিমের। এ বছর জেলার ১০টি ব্লকে ৫৩০ জনকে আনা হয়েছে এ স্কিমের আওতায়। লক্ষ্যমাত্রা ১০০০।

এ সরকারের আমলে গ্রামীণ মানুষের কাছে সবচেয়ে বড় অবদান গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন। ১৪৮টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ২১৪৩টি গ্রাম সংসদের প্রতিটিতে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার জন্যে রাজ্য বিদুৎ পর্যদের সঙ্গে গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন উন্নয়ন নিগম, জলপাইগুড়ি বদ্ধ পরিকর। কাজ চলছে পুরোদমে। ১৯৯৯-২০০০ সালের জন্যে জেলার বরাদ্দ ৫.২৫ কোটি। ২০০০-২০০১ সালের জন্যে আরও ৩.৪০ কোটি। বিশ্বায়নের সঙ্গে পরিচিত হতে চান প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষ। এ কর্মযজ্ঞে পিছিয়ে নেই জলপাইগুড়ি।

গ্রামীণ উন্নয়নের পাশাপাশি নাগরিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির দিকেও রয়েছে আমাদের তীক্ষ্ণ নজর। ১৯৮১ সালে শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন সংস্থার প্রতিষ্ঠা ত্বরান্বিত করেছে এই নগরায়ণকে যোগাযোগ পরিকাঠামো বিস্তৃত যেমন হয়েছে দুটি শহরের মধ্যে, তেমনই বাড়িঘর সেতু প্রভৃতি নির্মাণের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে এ সংস্থা।

১৯৯৯ সালে জয়গাঁ উন্নয়ন সংস্থা এ কাজে সহায়ক ভূমিকা পালনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে সৃষ্ট। শহর গ্রামের দূরত্ব কমছে ক্রমশ যেমন আজ জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ির মধ্যে ৫০ কিমির দূরত্বের ব্যবধান খুঁজে বের করা দুষ্কর হয়ে উঠছে ক্রমশ। নিউজলপাইগুড়ি থেকে তিন বাত্তি মোড় হয়ে রানীনগর পর্যন্ত ৪০ কিমি পথ শিল্পায়নের ছোঁয়ায় উজ্জ্বল। আবার তেমনই উজ্জ্বল হচ্ছে ঘোঘোমালি, ৮০ ঘর হয়ে গঙার মোড় পর্যন্ত প্রায় বিশ কিমি পথ শিল্প বিকাশের স্পর্ধিত



জলপাইগুড়ি জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর

ভাবনায়। অবহেলিত, উপেক্ষিত কত কালিমার লেপন এ জেলাটির মুখে ; তা খন্ডন করে দক্ষিণবঙ্গের সঙ্গে সমান স্পর্ধায় প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ জলপাইগুড়ি। এখানে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে হলদিয়া পেট্রো-রসায়ন দ্রব্যের অনুসারী শিল্পের। আসতে শুরু করেছেন বহিরাগত শিল্পোদ্যোগীরা।

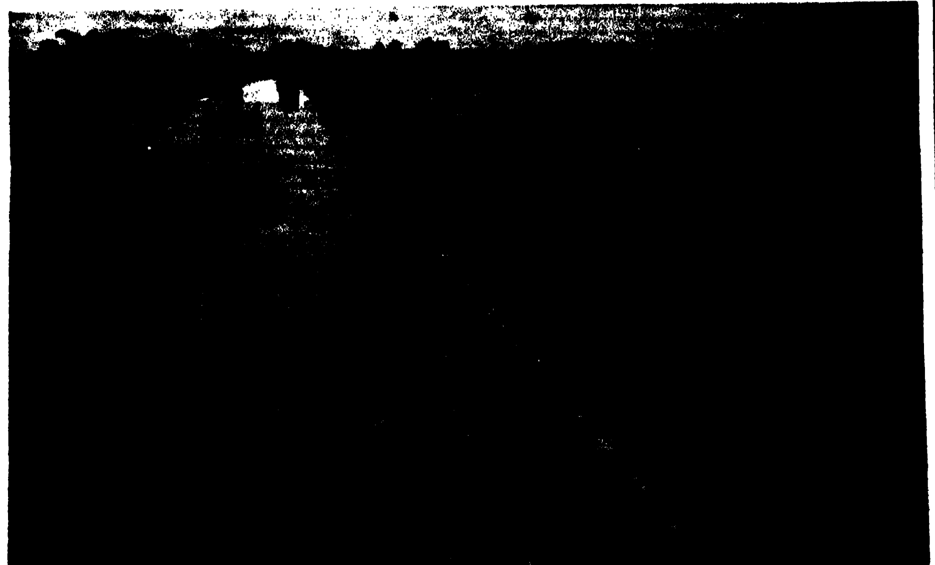
শুধু আর্থিক উন্নয়নের পথেই আমরা ব্যয় করিনি আমাদের সব সময় ; জলপাইগুড়ি শহরের বুকে আমরা গড়ে তুলি ৯০০ আসন বিশিষ্ট শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত সংস্কৃতি মঞ্চ সরোজেন্দ্রদেব রায়কত সংস্কৃতি কলাকেন্দ্র। যা কেবল কলকাতার 'নন্দনে'র সঙ্গে তুলনীয়। সাংস্কৃতিক চর্চা কেন্দ্র হিসেবে নন্দনের স্থান যদি হয় প্রথম নিঃসন্দেহে 'সরোজেন্দ্রদেব সাংস্কৃতিক কলাকেন্দ্রে'র স্থান দ্বিতীয়।

উত্তরের সংহতিকে বিশেষ রাজবংশী, রাভা, মেচ, নেপালি প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর মানুষদের অনুভূতিকে সম্মান জানিয়ে বছর বছর জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে করে আসছি 'ভাওয়াইয়া' উৎসব যা রাজ্যের অন্যান্য উন্নত প্রজাতির মানুষের উৎসবের সমমর্যাদাসম্পন্ন।

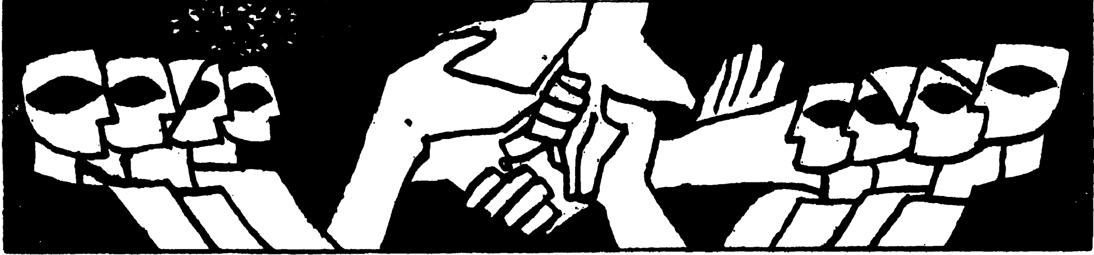
তফসিলি ও আদিবাসীদের আরও কল্যাণার্থে, বর্তমান জীবনের প্রতিযোগিতার মূলস্রোতের উপযোগী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে নাগরাকাটার বনবাগিচার মনোরম পরিবেশে সম্প্রতি শিলান্যাস হয়েছে ৪ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণযোগ্য ৪২০ জন তফসিলি আদিবাসী ছাত্রছাত্রীর আবাসিক কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়। গত ২ বছরে জেলায় শিশুশিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ৭৩৫টি।

ভারতের মুক্তিসংগ্রামে আত্মত্যাগী শহিদদের স্মরণ করে স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তিতে জলপাইগুড়িতে অনুষ্ঠিত হয়েছে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব ; সেই বীর শহিদদের স্মৃতির উদ্দেশে প্রকাশ করেছি আমরা 'বক্সা স্মারক সংকলন'। ঐতিহাসিক বক্সা দুর্গে শহিদদের স্মৃতির উদ্দেশে স্থাপিত স্মারক স্তম্ভ। খোলা হয়েছে বক্সায় ইতিহাস সম্পর্কিত একটি যাদুঘরও। ১৯৭৭-এ গ্রামোন্নয়নের যে ধারা সূচিত হয়েছিল আমূল ভূমি সংস্কারের মধ্য দিয়ে, নিরন্তর প্রয়াসে আমরা চেষ্টা করেছি তাকে ধরে রাখতে। ই এ এস জে আর ওয়াই/ জে জি এস ওয়াই, ইন্দিরা আবাস যোজনার কর্মসূচি রূপায়ণের মধ্য দিয়ে চেষ্টা করেছি তাকে আরও সমৃদ্ধি দান করতে ; তবু আজ জলপাইগুড়ির আকাশে কালোমেঘ। ঘনীভূত হয়ে ঘনীভূততর হচ্ছে কতিপয় বিপথগামী যুবক-যুবতীর মানবতাবিদ্বেষী কাজকর্মে। আমরা বিশ্বাস করি যে এ মেঘ ক্ষণিকের। শুভ বুদ্ধি জাগবেই বিপথগামী ওইসব যুবক-যুবতীদের। জলপাইগুড়ি ফিরে পাবে তার শান্ত জীবন প্রবাহ। সৌন্দর্যের রানী আসীনা থাকবেনই রানীর আসনেই — সাময়িক সকল বাধা-বিপত্তি তুচ্ছ করে জয়ধ্বজা উড়বেই, উড়বে।

লেখক ❑ সভাধিপতি, জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ

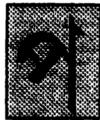


জলপাইগুড়ি জেলাপরিষদ দ্বারা নির্মিত নেওড়া সেতু। দীর্ঘ ১৯৮ মিটার, মোট ব্যয় ১ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা
ছবি : গোপাল চাকী



অলকেশ দাশগুপ্ত

তিস্তা প্রকল্প
জলপাইগুড়ির সেচ সম্ভাবনা ও ভবিষ্যৎ

শ্চিমবঙ্গে প্রবাহিত নদীগুলির মধ্যে গঙ্গা ছাড়া তিস্তাই একমাত্র নদী যা হিমবাহসৃষ্ট এবং শুখা মরশুমেও যার প্রবাহ শুকিয়ে যায় না। বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য জলের উৎস হিসাবে তিস্তা তাই খুবই উপযোগী। তিস্তার জলসম্পদকে যথাযথভাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে স্বাধীনতার পর থেকেই পরিকল্পনাবিদদের চিন্তাভাবনা শুরু হয় কিন্তু কোনো বহুমুখী নদী পরিকল্পনা তৈরি ও তার রূপায়ণের জন্য যেসব সরকারি পন্থা পদ্ধতি আছে তা অতিক্রম করে বাস্তবায়িত হতে পারেনি। ষাটের দশকের মধ্যভাগ থেকে পরিকল্পনাটি রূপায়ণের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে বিশেষ প্রচেষ্টা নেওয়া হয় এবং সরকারি পন্থা-পদ্ধতি অতিক্রম করে সম্পূর্ণ পরিকল্পনাটির একটি অংশমাত্র রূপায়ণের অনুমতি ভারত সরকারের কাছ থেকে পাওয়া যায় ১৯৭৫ সালে। প্রাথমিকভাবে কাজ শুরু হয় ১৯৭৬ সাল থেকে। উল্লেখ করা যেতে পারে 'তিস্তা প্রকল্প' একটি বহুমুখী নদী পরিকল্পনা এবং আর্থিকসঙ্গতি ও প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে পরিকল্পনাবিদরা এটিকে তিনটি পর্বে ভাগ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ তথা উত্তরবঙ্গ কৃষিনির্ভর। একমাত্র কৃষিকার্যের যথাযথ উন্নতির মাধ্যমেই এই এলাকার মানুষের আর্থিক উন্নতি ও খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা আনা সম্ভব। সেচ ব্যবস্থাকে তাই প্রথম পর্বে, জলবিদ্যুৎ উৎপাদনকে দ্বিতীয় পর্বে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র সংযোগকারী খাল খননকে পরিকল্পনার তৃতীয় বা সর্বশেষ পর্বে রাখা হয়।

পরিকল্পনাটির তিনটি পর্ব হল—

১। **প্রথম পর্ব :** উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলার ৯.২২ লক্ষ হেক্টরে সেচ ব্যবস্থা। জেলাগুলি হল দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর (উত্তর ও দক্ষিণ), কোচবিহার ও মালদা।

JALPAIGURI



5 0 5 10 15 Kilometres



SCALE

IRRIGATION STRUCTURE



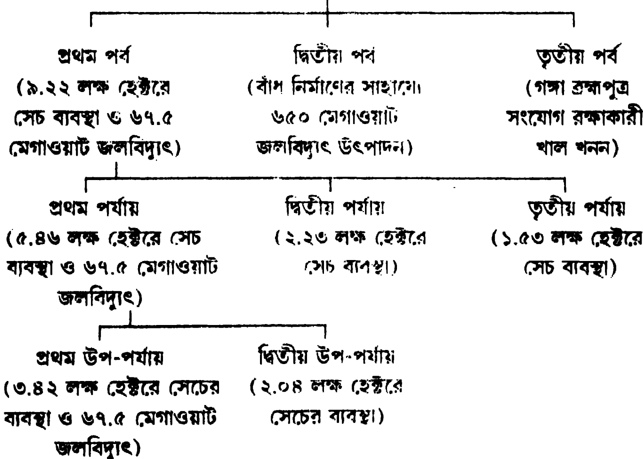
REFERENCE

International Boundary	—·—·—	River	≈
State Boundary	—··—··	Shallow Tubewell	▬ ▬
District Boundary	—·—·—	Deep Tubewell	● ● ●
Sub-Division Boundary	- - - · -	River Lifet	✹ ✹ ✹
Block Boundary	- - - - -	Hand Tubewe..	O O O
District Headquarters	▣		
Sub-Division Headquarters	■		
Police Station	□		
National Highway	——		

তিস্তা-প্রকল্পের প্রথম উপ-পর্যায়ে কাজ শেষ হলেই জেলার সেচ সেবিত এলাকার পরিমাণ বর্তমানের প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যাবে। যার ফলে জেলার সেচ-সেবিত এলাকার আর্থ-সামাজিক চিত্রটাই পাল্টে যাবে বলে আশা করা যায়। কৃষি নির্ভর অঞ্চলে সেচ পরিকল্পনার মাধ্যমে জলসরবরাহ করতে পারলে সেই অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক চিত্র কিভাবে পাল্টে যায় বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম ও পুরুলিয়া জেলা তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

পরিকাঠামোগত অসুবিধা ও আর্থিক সঙ্গতির দিকে লক্ষ্য রেখে প্রথম পর্বকে আবার তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে ৫.৪২ লক্ষ হেক্টরে, দ্বিতীয় পর্যায়ে ২.২৩ লক্ষ হেক্টরে এবং তৃতীয় পর্যায়ে ১.৫৩ লক্ষ হেক্টরে সেচের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

ভারত সরকারের পরিকল্পনা আয়োগ (প্ল্যানিং কমিশন) সবদিক বিবেচনা করে প্রথম পর্যায়কে আবার ২ (দুটি) উপ-পর্যায়ে ভাগ করবার পরামর্শ দেন এবং সেই অনুসারে প্রথম উপ-পর্যায়ে ৩.৪২ লক্ষ হেক্টরে এবং দ্বিতীয় উপ-পর্যায়ে ২.০৪ লক্ষ হেক্টরে সেচ-ব্যবস্থার পরিকল্পনা করা হয়। এক নজরে পরিকল্পনাটি হল—

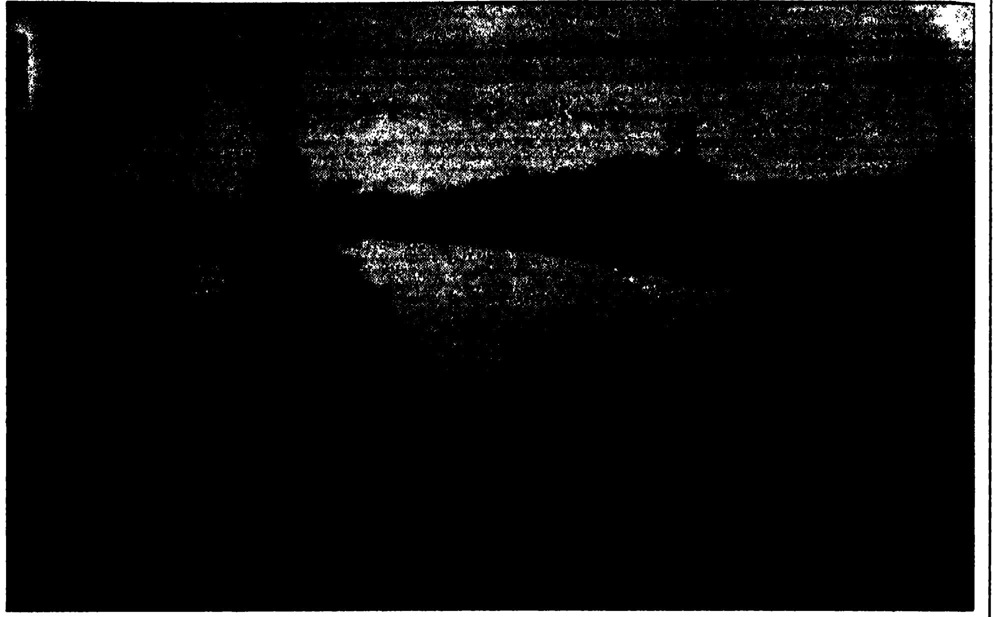


উপরের রেখাচিত্র থেকে এই প্রকল্পের আকার আয়তন সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যায় এবং এটা পরিষ্কার যে এই বিশাল প্রকল্পের একটি ভগ্নাংশে শুধু বাস্তবায়িত করার পরিকল্পনা বর্তমানে গ্রহণ করা হয়েছে। এখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার যে সেচের ব্যবস্থাকে নিশ্চিত করতে বাঁধ (ড্যাম) নির্মাণ করে জলাশয় সৃষ্টি করা খুবই জরুরি। শুধু কপাট বাঁধের (ব্যারেজ) সাহায্যে সমগ্র সেচ এলাকায় শুখা মরসুমে জল সরবরাহ করা সম্ভবপর নয়। তাই দ্বিতীয় পর্বের বাস্তবায়নও খুবই দরকার। ব্যবহারিক কিছু অসুবিধার জন্য দ্বিতীয় পর্বের বাস্তবায়ন নিয়ে কিছুটা সংশয় দেখা দিয়েছে। প্রস্তাবিত দ্বিতীয় পর্বের পরিকল্পনাকে তাই কিছুটা পরিবর্তন করে নতুন রূপ দেওয়া সম্ভব কিনা তা নিয়ে প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান ও চিন্তা-ভাবনা করা হচ্ছে।

বর্তমানে প্রথম উপ-পর্যায়ের কাজ চলছে যার আনুমানিক ব্যয় ১৯৯৫ সালের মূল্য সূচক অনুযায়ী ১১৭৭ কোটি টাকা। বাৎসরিক মূল্য বৃদ্ধির দরুন স্বভাবতই তা আরও কিছুটা বাড়তে পারে। বর্তমানে যে কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে তা অনেক আগেই শেষ হয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু আর্থিক অসুবিধা, জমি অধিগ্রহণে ও নির্মাণ কার্যে আইনগত জটিলতার দরুন যে গতিতে প্রকল্পের কাজ এগিয়ে যাওয়া উচিত ছিল তা সম্ভব হয়নি। সর্বাত্মক চেষ্টা চলছে যাতে কাজের গতি ত্বরান্বিত করা সম্ভব হয়। এই উদ্দেশ্যে জেলাস্তরে বিভিন্ন কমিটি হয়েছে যাতে কোনো কারণে কাজ বন্ধ হয়ে গেলে কারণ খতিয়ে দেখে যত শীঘ্র সম্ভব ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

প্রকল্পটি সম্বন্ধে একটা ধারণা করতে হলে এর মূল কাজগুলি একটু জানা দরকার। প্রকল্পের মূল কাজগুলি হল (১) জলপাইগুড়ি জেলার গাজোলডোবায় তিস্তা নদীর উপর একটি কপাট বাঁধ নির্মাণ যার নাম তিস্তা ব্যারেজ। (২) তিস্তা ব্যারেজের দুধারে দুটি মূলখাল খনন। ডানধারে তিস্তা মহানন্দা সংযোগকারী খাল বা সংক্ষেপে টি. এম. এল. সি.। বামধারে তিস্তা জলঢাকা মূলখাল বা টি. জে. এম. সি.। এই দুটি খালের পুরোটাই জলপাইগুড়ি জেলায় অবস্থিত। অবশ্য টি. এম. এল. সি.-র শাখাখালের কিছু অংশ কোচবিহার জেলায়। টি. এম. এল. সি.-র মূল খালের কাজ শেষ। তার থেকে নেওয়া শাখাগুলো থেকে জলপাইগুড়ি জেলার প্রায় ২০,০০০ হাজার হেক্টরে প্রাক-খারিফ চাষের জন্য জলসরবরাহ করা হচ্ছে। এর ফলে চাষী ভাইদের মধ্যে আমন ফসল সম্বন্ধে নিশ্চয়তা যেমন এসেছে ফলনের পরিমাণও অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে। আর শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন সেচের সাহায্যে যে ফসল ঘরে আসছে তার সম্পূর্ণটাই অতিরিক্ত যেটা আগে পাবার কোনো উপায়ই ছিল না। একটি সমীক্ষা থেকে দেখা যায় যে অতিরিক্ত প্রাক্-খরিফ চায থেকে ওই জেলার নীট আয়ের পরিমাণ প্রায় ২৫ কোটি টাকা ও অতিরিক্ত আমন ফলনের জন্য প্রায় ১০ কোটি। বলা বাহুল্য এর পরিমাণ সমানুপাতিকভাবে বেড়ে যাবে জেলার সেচব্যবস্থা আরও সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে। অন্যান্য জেলা যেগুলি এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত তাদের সম্বন্ধেও একই কথা বলা যায়। তাই বর্তমানে সেচ সম্প্রসারণের জন্য শাখা ও উপশাখা খালের কার্য সমাধা করা অত্যন্ত জরুরি। এর জন্য প্রাথমিক প্রয়োজন হল শাখা ও উপশাখা খালগুলির জন্য জমি অধিগ্রহণ। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে জলপাইগুড়ি জেলায় সেচ ব্যবস্থা প্রয়োজনের


INDEX MAP OF TEESTA BARRAGE PROJECT
S I K K I M
DARJEELING
Kalimpong
D A R J E E L I N G
N E P A L
MAHANANDA R.
Chapra
ISLAMPUR
DALKHOLA
B I H A R
B A N G L A
D E S H



ময়নাগুড়ি ব্লকে ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প : কৃষকের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক *ছবি : সলিল আচার্য*

তুলনায় বর্তমানে অপ্রতুল। বর্তমানে মোট কৃষিযোগ্য জমির মাত্র ১৫ থেকে ২০ শতাংশ জমি ক্ষুদ্র সেচ ও অন্যান্য সেচ ব্যবস্থার সাহায্যে জল পেয়ে থাকে।

তিস্তা-প্রকল্পের প্রথম উপ-পর্যায়ে কাজ শেষ হলেই জেলার সেচ সেবিত এলাকার পরিমাণ বর্তমানের প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যাবে। যার ফলে জেলার সেচ-সেবিত এলাকার আর্থ-সামাজিক চিত্রটাই পাল্টে যাবে বলে আশা করা যায়। কৃষি নির্ভর অঞ্চলে সেচ পরিকল্পনার মাধ্যমে জলসরবরাহ করতে পারলে সেই অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক চিত্র কিভাবে পাল্টে যায় বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম ও পুরুলিয়া জেলা তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলা যা আগে শুষ্ক অঞ্চল বলে পরিচিত ছিল। যেখানে বৃষ্টির অভাবে বছরে একবার ফসল ও অনিশ্চিত ছিল আজ সে সমস্ত অঞ্চলে বছরে দুবার ফসল প্রায় নিশ্চিত। শুধু তাই নয় বিঘা প্রতি ফসলের পরিমাণ আগের থেকে অনেক বেশি। তাছাড়া বলা হয় সেচ পরিকল্পনাগুলির জন্য জেলার আবহাওয়ারও কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। আগের সেই শুষ্কতা অনেকটা কমে গিয়েছে। প্রখর গ্রীষ্মে মাঠের সবুজ ধান জেলার প্রাকৃতিক চিত্রটাই বদলে দিয়েছে। এ কথা ঠিক ভৌগোলিক কারণে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া জেলার সঙ্গে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি জেলার পার্থক্য অনেকটাই। এখানকার বার্ষিক বৃষ্টিপাত অনেক বেশি। অনেকের ধারণা এখানে তাই সেচ-প্রকল্পের তেমন প্রয়োজন নেই। কিন্তু ধারণাটা মোটেই ঠিক নয়। যদিও বার্ষিক বৃষ্টিপাত এখানে খুবই ভালো কিন্তু তা সত্ত্বেও বৃষ্টিপাত সবসময় সমানভাবে না হওয়ায় খরিফ চাষেও মাঝে মাঝে জলের প্রয়োজন হয়। তাছাড়া প্রাক খরিফ চাষের জন্য সেচের জল অপরিহার্য। অসংখ্য নদ-নদী পরিবেষ্টিত জলপাইগুড়ি জেলা। কিন্তু আজ পর্যন্ত ব্যবহারিক প্রয়োজনে কোনো নদীর জলকেই ব্যবহার করা হয়নি। তিস্তার মতো হিমবাহসৃষ্ট নদীর জল সম্পদকে যথাযথভাবে ব্যবহার করে মানুষের কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে তিস্তা প্রকল্পের বাস্তবায়ন তাই অত্যন্ত জরুরি।

তিস্তার বামপারে অবস্থিত তিস্তা-জলঢাকা মূল-খালের কাজ বর্তমানে প্রায় ৭০ শতাংশ হয়েছে। কিছু আইনগত জটিলতা ও রেলওয়ে ক্রসিং কাজের বিলম্বের দরুন বর্তমানে কাজ কিছুটা শ্লথ গতিতে চলছে যা খুব শীঘ্রই কাটিয়ে ওঠা যাবে বলে আশা করা যায়। পর্যায়ক্রমে সমগ্র প্রকল্পটি শেষ হলে জলপাইগুড়ি ও অন্যান্য জেলার সেচ সেবিত এলাকার চিত্রটি যা দাঁড়াবে তা নীচে দেখান হল।

সেচ সেবিত এলাকা (হাজার হেক্টরে)

জেলা	পর্যায়-১		পর্যায়-২	পর্যায়-৩	মোট
	প্রথম উপ পর্যায়	দ্বিতীয় উপ পর্যায়			
দার্জিলিং	১৭	—	—	—	১৭
জলপাইগুড়ি	৬২	—	৮১	—	১৪৩
উত্তর দিনাজপুর	১৯৪	—	—	—	১৯৪
দক্ষিণ দিনাজপুর	১০	১২১	—	৬৫	১৯৬
কোচবিহার	২০	৬১	১৪২	—	২২৩
মালদা	৩৯	২২	—	৮৮	১৪৯
	৩৪২	২০৪	২২৩	১৫৩	৯২২

জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলার সীমানায় ফুলবাড়িতে মহানন্দা নদীর উপর নির্মিত হয়েছে আর একটি বাঁধ যার মাধ্যমে তিস্তা মহানন্দা সংযোগকারী খালের মাধ্যমে তিস্তার জল এনে ফেলা হচ্ছে মহানন্দায়। ব্যারেজের ডানদিক থেকে মহানন্দা মূল খালের মাধ্যমে জল নিয়ে যাওয়া হচ্ছে উত্তর দিনাজপুর জেলার ডাউক নদীতে যেখানে নির্মিত হয়েছে আরও একটি কপাট-বাঁধ। মহানন্দা মূল খালের বেশির ভাগ অংশই নিয়ে যাওয়া হয়েছে দার্জিলিং জেলার মধ্য দিয়ে যার সাহায্যে দার্জিলিং জেলার ১৭ হাজার হেক্টরে সেচ কার্য করা সম্ভব হবে। অন্যান্য মূলখালগুলি যথাক্রমে ডাউকনগর মেন ক্যানাল (ডি. এন. এম. সি.), নাগর ট্যাঙ্গন ক্যানাল ও তার শাখা উপশাখা খালগুলির কাজ শেষ হলে উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদা জেলার বেশ কিছু অংশে সেচের জল পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে। প্রকল্পের প্রথম উপ পর্যায়ের প্রস্তাবিত সেচ

JALPAIGURI

SCALE

5 0 5 10 15 Kilometres



BHUTAN

ASSAM

COOCHBEHAR

BANGLADESH

DARJEELING

Kumargram
Alipurduar
Jaygaon
Phuntsoling
Hasimara
Kalchini
Hamilton ganj
Birpara
Madarihat
Falakata
Torsa R.
Nagrakata
M.G.Rly.
Banarhat
Dhupguri
Jaldhaka
Matiali
Chalsa
Malbazar
Mal
Lataguri
N.H.
Maynaguri
Jalpesh
To Haldibari
Jalpaiguri
Tista R.
Bhaktinagore
B.G.Rly.
Rajganj
Siliguri

REFERENCE

International Boundary
State Boundary
District Boundary
Sub-Division Boundary
Block Boundary
District Headquarters
Sub-Division Headquarters
Police Station
National Highway
Other Roads
Metergauge Rly.Line
River

LEGEND

Silty Loam
Sandy Loam
Clay Loam



২০০০ সালে পাহাড়ী নদীর বন্যায় ভূটান থেকে পলি এসে ঢেকে দিয়েছে সবুজ ধানের খেত ছবি : সলিল আচার্য

৪। মহানন্দা ব্যারেজ সৃষ্ট জলাশয় থেকে শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি এলাকায় পানীয় জল সরবরাহের প্রকল্প বাস্তবায়িত করেছে রাজ্য সরকারের জনস্বাস্থ্য বিভাগ। এর ফলে শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি এলাকার এক বিরাট অংশ উপকৃত হচ্ছে।

একথা অস্বীকার করা যায় না যে বৃহৎ নদী-পরিকল্পনার কিছু কিছু ক্ষতিকারক দিকও রয়েছে। যেমন (ক) জমি-অধিগ্রহণের ফলে কিছু মানুষ কৃষি ও বাস্তুজমিচ্যুত হয় যারা প্রকল্পসৃষ্ট সুযোগ-সুবিধা সরাসরি পায় না। (খ) বাঁধ বা কপাট বাঁধ নির্মাণের ফলে নদীর ভাটির দিকে শুখা মরসুমে জলের প্রবাহ কমে যায় যার ফলে দূষণগত কিছু কিছু সমস্যার সৃষ্টি হয়। (গ) জলাধার বা খাল খননের ফলে কিছু কীট-পতঙ্গ ও বন্যপ্রাণীর বাসস্থান ও যাতায়াতের অসুবিধা সৃষ্টি সম্ভাবনা। অবিমিশ্র সুবিধা কোনো প্রকল্প থেকেই বোধহয় পাওয়া সম্ভব নয়। প্রকৃতিকে শাসন করে মানুষের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে গেলে প্রাথমিকভাবে কিছু কিছু অসুবিধা দেখা দেবে এটাই স্বাভাবিক। তবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে উপরিউক্ত অসুবিধাগুলি বহুলাংশে দূর করা সম্ভব। তার জন্য প্রয়োজন সুচিন্তিত পরিকল্পনা এবং সর্বস্তরের মানুষের সক্রিয় সহযোগিতা। বলা বাহুল্য একমাত্র সুচিন্তিত সেচ পরিকল্পনার উপরেই আমাদের মতো কৃষিনির্ভর দেশে গ্রামের উন্নয়ন বহুলাংশে নির্ভর করে। তাই এর বাস্তবায়নে পরিকল্পনাবিদ, কৃষিবিদ, প্রশাসক ও সংশ্লিষ্ট রাজনীতিবিদদের যেমন ভূমিকা থাকা প্রয়োজন তেমন প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট গ্রামবাসীদের সক্রিয় ভূমিকা যাদের সাহায্য ছাড়া কোনো সেচ-প্রকল্পই যথাযথভাবে রূপায়ণ করা সম্ভব নয়। সরকারের তরফ থেকে সর্বতোভাবে চেষ্টা চলছে এই প্রকল্প সার্থকভাবে রূপায়ণের পথে যে সমস্ত অসুবিধা বা বাধা আছে সংশ্লিষ্ট সর্বস্তরের মানুষের সহযোগিতার মাধ্যমে সেগুলো দূরীভূত করে যত শীঘ্র সম্ভব সেচের জল উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলার প্রস্তাবিত কৃষিযোগ্য জমিতে সরবরাহ করা। উত্তরবঙ্গের যথাযথ উন্নয়নের ক্ষেত্রে সেটা হবে এক বিরাট পদক্ষেপ।

আগেই বলা হয়েছে 'তিস্তা প্রকল্প' একটি বহুমুখী নদী প্রকল্প। সেচের জল ছাড়াও অতিরিক্ত আরও কিছু সুবিধা এই প্রকল্প থেকে পাওয়া যাচ্ছে যার দ্বারা জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গের সাধারণ মানুষ উপকৃত হচ্ছে।

সেবিত এলাকার নক্সা এই সঙ্গে দেওয়া হল যার থেকে উপকৃত অঞ্চলের চিত্রটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। বলা বাহুল্য জেলার কৃষির সম্প্রসারণ ঘটলে অতিরিক্ত যে কর্মদিবসের সৃষ্টি হবে তার পরিমাণ উল্লেখযোগ্য। এর ফলে কৃষি শ্রমিকদের মধ্যে বেকারত্বের সম্ভাবনা অনেকটাই কমে যাবে। ১৯৯৮-৯৯ সাল থেকে আজ পর্যন্ত জলপাইগুড়ি জেলায় প্রাক খরিফ চাষের ফলে প্রায় ২০ লক্ষ কর্মদিবসের সৃষ্টি হয়েছে।

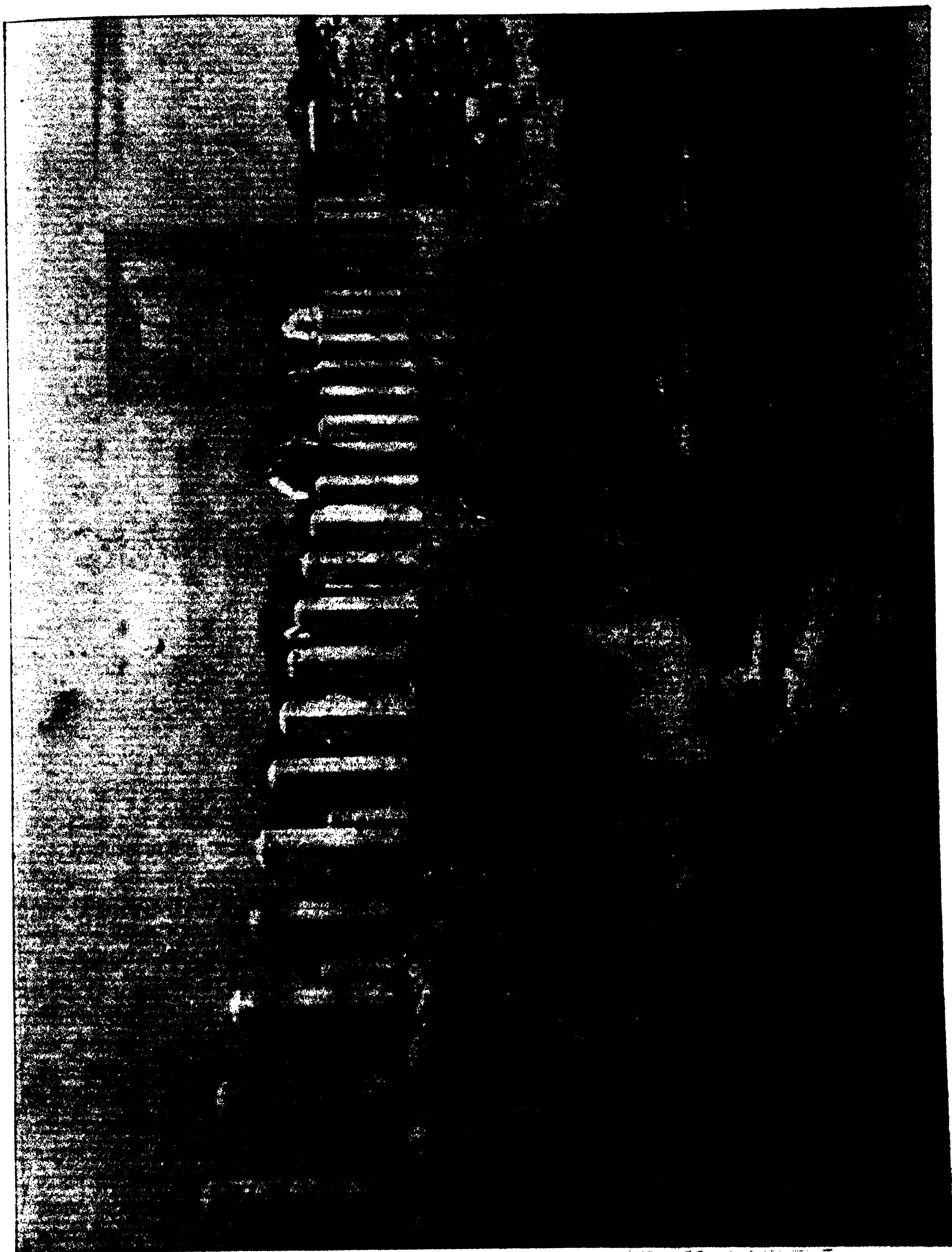
আগেই বলা হয়েছে 'তিস্তা প্রকল্প' একটি বহুমুখী নদী প্রকল্প। সেচের জল ছাড়াও অতিরিক্ত আরও কিছু সুবিধা এই প্রকল্প থেকে পাওয়া যাচ্ছে যার দ্বারা জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গের সাধারণ মানুষ উপকৃত হচ্ছে।

১। মহানন্দা মেন ক্যানালে নির্মিত তিনটি ক্যানাল ফল থেকে ৬৭.৫ মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ তৈরি হবার পরিকল্পনা আছে। পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ পর্যদ বর্তমানে এর থেকে দৈনিক আনুমানিক ২২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ তৈরি করে ন্যাশনাল গ্রিড্-এ সরবরাহ করছে।

২। শুখা মরসুমে জলপাইগুড়ি জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করলা নদীতে জল না থাকার ফলে ওই জেলায় সৃষ্ট জলের অভাব ও পরিবেশ দূষণ সমস্যা গত কয়েক বৎসর যাবৎ অনেকটাই দূরীভূত করা হচ্ছে তিস্তা মহানন্দা লিংক ক্যানাল থেকে করলা নদীতে প্রয়োজনীয় জল সরবরাহ করে। আর্থিক মূল্যে এর বিচার হয়তো সম্ভব নয় কিন্তু এর ফলে পরিবেশ দূষণের হাত থেকে সাধারণ মানুষ কিছুটা স্বস্তি পাচ্ছেন আর তাঁদের দৈনন্দিন প্রয়োজন ও কিছুটা মেটানো সম্ভব হচ্ছে।

৩। শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি নির্মিত তিস্তা-মহানন্দা লিঙ্ক ক্যানাল ও মহানন্দা মেন ক্যানেলের পাড়ের উপর নির্মিত নতুন রাস্তার ফলে জলপাইগুড়ি থেকে ইসলামপুর বা রায়গঞ্জ বা কলকাতার দূরত্ব অনেকটাই কমে গিয়েছে যার ফলে সাধারণ মানুষের সময়ের সাশ্রয় যেমন হয়েছে তেমনি জ্বালানি খরচও কিছুটা কমেছে।

লেখক ❑ মুখ্য বাস্তুকার (নির্মাণ) তিস্তা কপাট বাঁধ প্রকল্প



মাল পঞ্চায়েত সমিতির চাংমারী গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এন আর ই পি-তে নির্মিত খুলনাই নদীতে জাঙ্গাল-বাঁধ

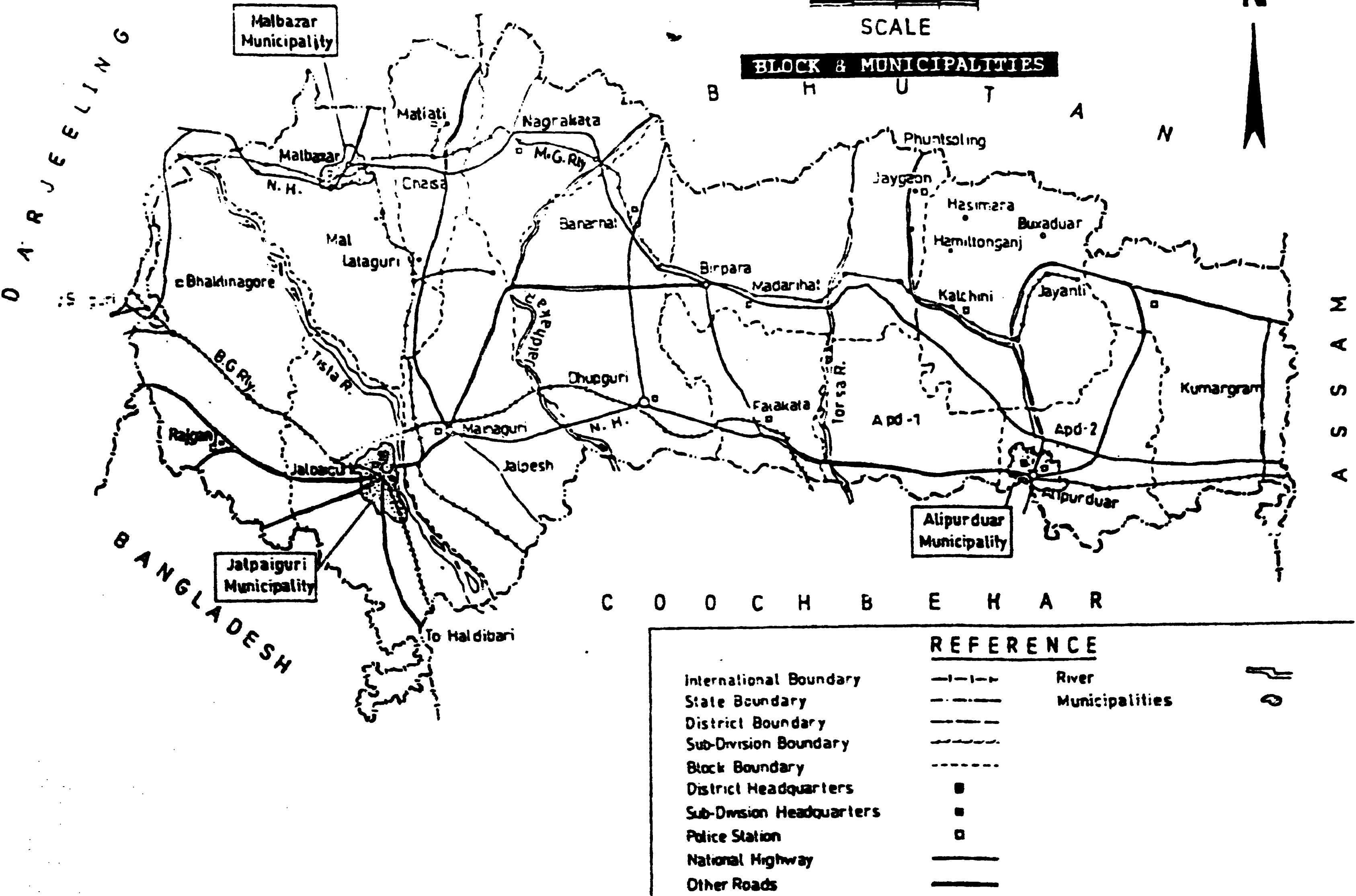


শিবপদ ভৌমিক

জলপাইগুড়ি : নগরায়ণের ধারায় একটি দৃষ্টান্ত

প্রাচীনকালের গ্রাম সভ্যতা গড়ে তুলেছে শহর। গ্রামের উৎপাদিত সম্পদ যাতায়াতের সুবিধাজনক এক-একটা স্থানে নিয়ে যাওয়া হতো বিনিময় বা বিক্রয়ের জন্য। ধীরে ধীরে এই বিনিময় কেন্দ্রগুলি বাণিজ্যকেন্দ্রে রূপান্তরিত হলো। আর সেখানেই গড়ে উঠল শহর। এইভাবে কয়েকটি গ্রামকে কেন্দ্র করে এক-একটি নগর গড়ে উঠল। সেদিন যেমন কয়েকটি গ্রাম একটি শহরকে বাঁচিয়ে রাখত, আজও তেমনি একটি শহর কয়েকটি গ্রামকে বাঁচিয়ে রাখছে। বলা যায় এক-একটি শহর অন্তত চল্লিশ-পঞ্চাশটি গ্রামকে পরিষেবা দিয়ে থাকে। নগর উন্নয়নের ধারায় উন্নয়নশীল বন্দর বা শহরগুলি পৌরাঞ্চলে রূপান্তরিত হয়। আজ দেশের নগর বা পৌরাঞ্চলই দেশের মূল চালিকাশক্তি। আর এই নগরায়ণের ধারা সারা ভারতে যেখানে ২৫.৭১ ভাগ, সেখানে পশ্চিমবঙ্গে ২৭.৪০ ভাগ।

কোনও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বা জাতীয় উৎপাদনের ষাট শতাংশ আসে শহর এলাকা থেকে। শহরগুলি দেশের মূল চালিকাশক্তি হওয়ায় আজকের দেশের মূল কথা হলো গ্রামগুলিকে শহরে উন্নীত করা। আর এটাই দেশের অগ্রগতির মূল লক্ষ্য। তাই আজ ক্রমবর্ধমান নগরজীবনের সমস্যা ও চাহিদা মেটানোই হলো পৌরসভার কাছে মূল চ্যালেঞ্জ। পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতের ধারাবাহিক উন্নয়নের ফলে নগর উন্নয়নের গতিও বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই নগর উন্নয়নের জন্যও একটি নির্দিষ্ট নীতি গ্রহণ করেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। এর প্রধান লক্ষ্য রয়েছে,—(১) ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ, (২) উন্নয়নে ব্যাপক মানুষের অংশগ্রহণ, (৩) দরিদ্র শহরবাসীর জীবনমানের উন্নয়ন, (৪) স্বনিযুক্তি প্রকল্পের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি, (৫) সকলের জন্য নগর পরিষেবা প্রধান, (৬) গ্রাম-শহরের ভারসাম্য রক্ষা, (৭) শহরের জমির উর্ধ্বসীমা নির্ধারণ করে সামগ্রিক জমির সদ্ব্যবহার করা। এই লক্ষে জলপাইগুড়ি জেলার পৌর-উন্নয়নও দ্রুতহারে এগিয়ে চলেছে। ১৮৬৯ সালের ১ জানুয়ারি জলপাইগুড়ি জেলার জন্ম। আর ওই বছরের মধ্যেই জলপাইগুড়ি নগরায়ণের রূপ নিল এবং তখন থেকেই এই শহরে পৌর এলাকা গড়ে তোলবার প্রয়োজনীয়তা


JALPAIGURI
5 0 5 10 15 Kilometres
SCALE
BLOCK & MUNICIPALITIES
N
B H U T A N
A S S A M
C O O C H B E H A R
BANGLADESH
DARJEELING
Malbazar Municipality
Matiati
Nagrakata
M.G.Rly.
Malbazar
N. H.
Chalsa
Banarhat
Phuntsoling
Jaygaon
Hasimara
Buxaduar
Hamiltonganj
Mal
Lataguri
Bhaktinagore
Birpara
Madarihat
Kalchini
Jayanti
B.G.Rly.
Tista R.
Jaldhaka R.
Dhupguri
Falakata
Torsa R.
Apd-1
Kumargram
Apd-2
Rajganj
Jalpaiguri
Mainaguri
N. H.
Jalpesh
Alipurduar
Alipurduar Municipality
Jalpaiguri Municipality
To Haldibari
REFERENCE
International Boundary
State Boundary
District Boundary
Sub-Division Boundary
Block Boundary
District Headquarters
Sub-Division Headquarters
Police Station
National Highway
Other Roads
River
Municipalities

অনুভূত হতে লাগল। ১৮৭৭ সাল নাগাদ জেলায় চা-বাগিচা গড়ে উঠল। এরাও ব্যবসার নগর-কেন্দ্র গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে লাগল। প্রাচীন গ্রিক শহরগুলোর মতো ব্যবসাকে কেন্দ্র করেই শহরগুলি ফুলেফেঁপে ওঠে। তাই শহরের জনসংখ্যাও বেড়ে চলল। ফলে পৌরসভা গড়ে না ওঠা পর্যন্ত 'জলপাইগুড়ি ইউনিয়ন' পৌর প্রশাসনে কাজ করতেন। ধীরে ধীরে ১৮৮৫ সালের ১ এপ্রিল জন্ম নিল জলপাইগুড়ি পৌরসভা। ১৮৮৬-৮৭ সালে এই শহরের জনসংখ্যা ছিল ৭,৯৩৬ এবং করদাতাদের সংখ্যা ছিল ১৩৮৯। প্রথম পৌরসভায় ছিল ১৩ জন সদস্য এবং সকলেই সরকার মনোনীত। চেয়ারম্যান হতেন ডেপুটি কমিশনার এবং ভাইস্-চেয়ারম্যান হতেন সিভিল মেডিক্যাল অফিসার। ১৯১৬ সালে প্রথম নির্বাচিত পৌরপতি ও উপপৌরপতি পৌরসভার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তখন ৭টি ওয়ার্ড থেকে ১৯ জন কমিশনার নির্বাচিত হতেন। ১৯৬৭ সাল থেকে ১৯টি ওয়ার্ড থেকে ১৯ জন পৌর সদস্য নির্বাচিত হন।



কদমতলায় দ্বিতীয় পৌর বাজার

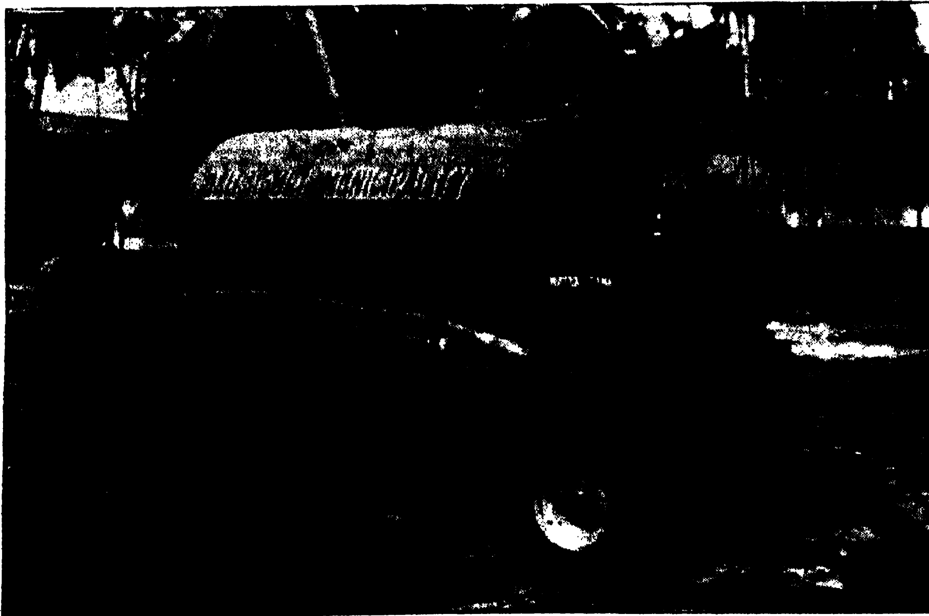
জলপাইগুড়ি পৌরসভার এই ক্রম-উন্নয়নের ধারায় জল সরবরাহ কেন্দ্র, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, রাস্তার বাতি, ময়লা থেকে সার তৈরি, জলনিষ্কাশন ইত্যাদি ব্যবসা চালু হয়েছিল ধীরে ধীরে।

১৮৮৭ সালে দিনবাজারে একটি বাজার স্থাপনের জন্য বৈকুণ্ঠপুরের তদানীন্তন রানী জগদীশ্বরী দেবীকে পৌরসভা অনুমতি দেয়। এরপর ১৯৫৮ সালে সরকারি সাহায্যে আর একটি বাজার গড়ে ওঠে।

শহরের জলনিকাশি ব্যবস্থার সমস্যা শুরু থেকেই। বর্ষায় শহরের ব্যাপক অঞ্চল জলনিমগ্ন থাকত দিনের পর দিন। করলা নদীতে বাঁধ না থাকায় প্রতি বর্ষায় করলার জল শহরকে ভাসিয়ে দিত। জে এফ গ্রুনিং তাঁর রিপোর্টে লিখেছেন : পৌরসভার প্রথম দরকার জলনিকাশি ব্যবস্থার উন্নতি করা এবং গর্ত ও নিচু অঞ্চল ভর্তি করা। কারণ, এইসব গাড্ডা ও নিচু জমিতে বর্ষার জল জমে শহরের জনস্বাস্থ্য বিপর্যস্ত করে তুলছে। শহরের একদিকের জল করলা নদীতে পড়ে এবং অপর দিকের জল রেললাইন বরাবর ধানের খেতে গিয়ে পড়ে। পৌরসভা ১৯৭১-৭২ সালে শহরের চলতি ড্রেনগুলির সংস্কার ও সংরক্ষণের জন্য ৯৫,৪৬৮ টাকা ব্যয় করে।

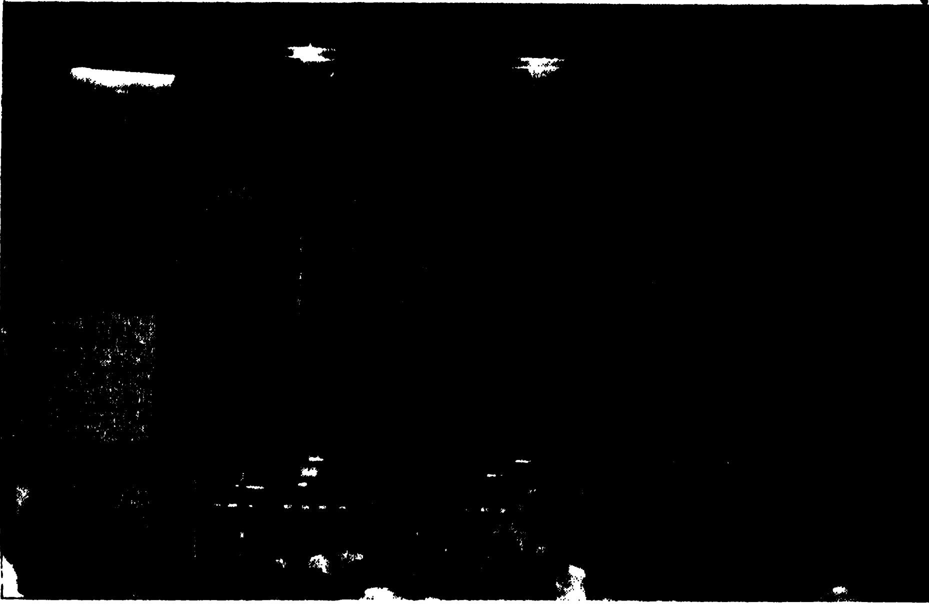
জেলার অপর প্রধান পৌরসভা আলিপুরদুয়ার পৌরসভা ১৯৫৭ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি প্রতিষ্ঠিত হয়। ভুটান, ডুয়ার্স ও অসমের সঙ্গে যোগাযোগ কেন্দ্র হিসাবে এই শহরের গুরুত্ব আগে থেকেই বেড়ে উঠেছে। তাই এই শহরে কাছারি, তহশীল ইত্যাদি যেমন ছিল, তেমনি কোচবিহারের রেলপথ ও রাস্তা দিয়ে বক্সার সঙ্গে আলিপুরদুয়ারের যোগাযোগ ছিল। এছাড়া জলপাইগুড়ি থেকে উত্তর-পূর্বে যোগাযোগের রাস্তাগুলির এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র বলা যায়।

মাল শহরটিও যোগাযোগের সুবিধার জন্য শহরে পরিণত হয়ে উঠেছিল। বেঙ্গল ডুয়ার্স রেলপথের এটি একটি প্রধান রেলওয়ে জংশন স্টেশন। এখান থেকে পূর্বে মাদারিহাট, পশ্চিমে বাগরাকোট, দক্ষিণে বার্নেস জংশন ও লালমণির হাট স্টেশনে যাওয়া যেত। ডুয়ার্সের চা-বাগান এলাকার কেন্দ্রে অবস্থিত বলে মাল শহরের গুরুত্ব যোগাযোগ কেন্দ্র হিসাবে আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া পর্যটন মানচিত্রেও মালবাজার উঠে আসায় মাল পৌর এলাকা অতিরিক্ত মাত্রা পেয়েছে। তাই



সেফটিক ট্যাঙ্ক থেকে যন্ত্রচালিত ময়লা পরিষ্কারের ব্যবস্থা


JALPAIGURI
N
5 0 5 10 15 Kilometres
SCALE
BHUTAN
ASSAM
COOCH BEHAR
BANGLADESH
DARJEELING
REFERENCE
International Boundary
State Boundary
District Boundary
Sub Division Boundary
Block Boundary
District Headquarters
Sub-Division Headquarters
Police Station
National Highway
Other Roads
River
Siliguri
Malbazar
Mal
Matiali
Chalsa
Nagrakata
Banarhat
Birpara
Madarihat
Falakata
Dhupguri
Maynaguri
Jalpaiguri
Rajganj
Jaygaon
Phuntsoling
Hasimara
Hamiltonganj
Kalchini
Jayanti
Kumargram
Alipurduar
Haldibari
N.H. 31 C



নেতাজিপাড়া বাস টার্মিনাস

স্বীকৃতি পেল। স্বাধীনতার পূর্বে মাত্র একটি পৌরসভা ছিল। স্বাধীনতার পর আর একটি পৌরসভা হয়ে নগরায়ণের কাজ স্তব্ধ হয়ে রইল. যদিও আর্থ-সামাজিক কারণেই গ্রাম শহরে উন্নীত হয় এবং যার ফলে হাণ্টারের রিপোর্টকে নস্যাৎ করে জলপাইগুড়ি জেলায় বামফ্রণ্ট সরকারের উদ্যোগে ২টি পৌরাঞ্চল গড়ে উঠল। এখন জেলার মোট জনসংখ্যার (২৮০০৫৪৩) মধ্যে প্রায় পাঁচ লক্ষ লোক পৌরাঞ্চলের অধিবাসী এবং জেলায় কম করেও ১৪টি শহরাঞ্চল গড়ে উঠেছে যা পৌরাঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত এখনও হতে পারেনি।

নগরায়ণের অগ্রগতিতে জেলাও থেমে থাকতে পারেনি। এখনই আর নতুন কোনও পৌরসভার জন্ম না হলেও পৌর এলাকা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে—বৃদ্ধি পাচ্ছে আর্থ-সামাজিক কারণে শহরের জনসংখ্যাও। হিসাবে দেখা যায় জলপাইগুড়ি পৌরসভা শুরু হয়েছিল ১৩ জন কমিশনার নিয়ে যা এখন দাঁড়িয়েছে ২৫ জনে. আলিপুরদুয়ার পৌরসভার বর্তমান সদস্য সংখ্যা হয়েছে ২০ আর মালবাজার পৌরসভার সদস্য সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৯ থেকে বর্তমানে ১৬ জনে।

পশ্চিমবঙ্গের পৌর উন্নয়নের ধারা এই হারে চলতে থাকলে কি করে বলা যাবে পশ্চিমবঙ্গ উন্নয়নে পিছিয়ে আছে! আর এই অভিযোগও কি থাকবে যে দেশের সব উন্নয়নই শহরে হচ্ছে! উন্নয়নের ভারসাম্য রক্ষা করে নগরায়ণের এই অগ্রগতিকে তাই আমাদের স্বাগত জানাতে দ্বিধা নেই।

১৯৮৯ সালে গড়ে ওঠে মাল পৌরসভা। আর প্রথম নির্বাচন হয় ১৯৯৪ সালের মে মাসে।

শিলিগুড়ি কর্পোরেশনের গায়ে থাকায় জেলার ডাবগ্রাম অঞ্চল পৌর কর্পোরেশন এলাকায় উন্নীত হয়ে নগর উন্নয়নের একটা বড় লম্ফন দিয়েছে।

গ্রুনিং-এর রিপোর্ট থেকে জানা যায়. ১৮৬৪ থেকে ১৮৬৯ পর্যন্ত ময়নাগুড়ি ছিল পশ্চিম ডুয়ার্স সদর তহশিলের কেন্দ্রস্থল। পশ্চিম ডুয়ার্সের সঙ্গে রংপুরের তেঁতুলিয়া মহকুমা যোগ করে জলপাইগুড়ি জেলা তৈরি হয় ১৮৬৯ সালে। আর তারপরই ডেপুটি কমিশনার তাঁর শাসনের কেন্দ্রটিকে সরিয়ে নিলেন ময়নাগুড়ি থেকে জলপাইগুড়িতে। এতে জলপাইগুড়ি শহরের কিছু উন্নয়ন হতে থাকলেও ১৮৭৬ সালে হাণ্টার লিখলেন : এই জেলার লোকেরা পুরাপুরি গ্রামেরই লোক। জলপাইগুড়ি সেনানিবাসই (অর্থাৎ বর্তমান জলপাইগুড়ি শহর) একমাত্র জায়গা. যাকে কোনরকমে শহর বলা চলে। জেলা গঠনের পরই শহর হিসাবে জলপাইগুড়ির গুরুত্বের সূচনা। এর আয়তন ও গুরুত্ব বেড়ে চলেছে তখন থেকে। ১৯৪১ পর্যন্ত জলপাইগুড়িই ছিল জেলার একমাত্র শহর। ১৯৫১ সালে আলিপুরদুয়ার জেলা দ্বিতীয় শহররূপে স্বীকৃত পেল। বর্তমান জেলায় ১৪টি শহরের নাম পাওয়া যায়, যার মধ্যে কেবল তিনটিই পৌরাঞ্চলের স্বীকৃতি পেয়েছে। ডাবগ্রাম শিলিগুড়ি কর্পোরেশনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় প্রকৃতপক্ষে জেলার ৪টি অঞ্চল পৌরাঞ্চলে উন্নীত হলো। ফলে জেলার ৫ লক্ষ মানুষ পৌর নাগরিক হিসাবে

লেখক ❑ পৌরপিতা জলপাইগুড়ি পৌরসভা, সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক



জেলখানার সামনে নির্মিত সুলভ শৌচাগার



গোপাল চাকী

জলপাইগুড়ি জেলার পূর্ত দপ্তরের চালচিত্র

এই জেলায় বহু জাতি, বর্ণ, সম্প্রদায়, নানা জনগোষ্ঠীর মানুষের বসবাস থাকায় বিশেষজ্ঞরা বলেন—এটা ভারতবর্ষের ক্ষুদ্র সংস্করণ। এই অঞ্চলের পুরাকীর্তিগুলি যথা, জল্পেশ মন্দির, নলরাজার গড়, চিলাপাতা অঞ্চল, দেবী চৌধুরী, জহুরি তালমা প্রভৃতি। দ্রষ্টব্য স্থানগুলি কোথাও ঘন বনে ঢাকা, কোথাও পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, চা-বাগানের কোল বেয়ে ঝর্না বয়ে যাওয়া—এ সব নিয়েই প্রকৃতির অপূর্ব মেলবন্ধন ঘটেছে এই জেলায়।

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে জমিদার ও 'ব্রিটিশ অত্যাচারে জর্জরিত' বেশিরভাগ লোকই ছিলেন গরিব। এদের বসবাস ও যোগাযোগের জন্য ভাল রাস্তাঘাট ও ব্রিজ, কালভার্ট ছিল না বললেই চলে। নৌকা করে, ভেলায় ও ছোট নদীতে সাতার বা গামছা পরে লোকে যাতায়াত করত, মালপত্র বহন ও বিবাহসহ অন্যান্য অনুষ্ঠানে গরুর গাড়ি ও ঘোড়ার গাড়ি ব্যবহার হত। কৃষিপণ্য যেটুকু উৎপাদিত হত তা বাজারে বিক্রির সুযোগ না থাকায় দারিদ্র্য এই জেলার মানুষের নিত্যসঙ্গী ছিল। ফলে কৃষকদের মধ্যে 'ব্রিটিশবিরোধী ফকির বিদ্রোহ', তেভাগার সংগ্রাম প্রেরণা জোগায় বেঁচে থাকার ও উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করার।

১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার আসার পূর্বে জেলার অবস্থা ছিল ভয়াবহ। হিমালয়ের পাদদেশে জেলার অবস্থিতির ফলে একনাগাড়ে বৃষ্টির ফলে বারে বারে বন্যা, খারাপ যোগাযোগ ব্যবস্থা, কম সংখ্যায় বাজারহাট, এক ফসলি উৎপাদন, কৃষকদের পণ্য পরিবহণের ব্যবস্থা অপ্রতুল, ঘরবাড়ি ভাঙাচোরা, খাদ্যবস্ত্রের কঠিন সমস্যা—এককথায় সঙ্কটময় জীবনযাত্রা ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল দুর্গম। ১৯৭৮ সালে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে উন্নয়ন ও গণতন্ত্রের বিকেন্দ্রীকরণের ফলে জলপাইগুড়ি জেলায় ব্যাপকভাবে নির্বাচিত সদস্যরা মানুষের কল্যাণে ব্রতী হয়। পাশাপাশি রাজ্য সরকারের জনকল্যাণমুখী কর্মসূচির জন্য জেলার ১৩টি ব্লকে কমবেশি রাস্তাঘাটের

N

5 0 5 10 15 Kilometres

SCALE

ROADS

B H U T A N

D A R J E E L I N G

B A N G L A D E S H

C O O C H B E H A R

A S S A M

Siliguri
Bhaktinagore
Malbazar
N. H.
Matiali
Chalsa
Mal
Lataguri
Nagrakata
M.G.Rly.
Banarhat
Birpara
Madarihat
Phuntsoling
Jaygaon
Hasimara
Buxaduar
Hamiltonganj
Kalchini
Jayanti
Kumargram
Apd-2
Apd-1
Alipurduar
Torsa R.
Falakata
Dhupguri
Jaldhaka R.
N. H.
Mainaguri
Jalpesh
Jalpaiguri
Tista R.
B.G.Rly.
Rajganj
To Haldibari

REFERENCE

International Boundary
State Boundary
District Boundary
Sub-Division Boundary
Police Station Boundary
District Headquarters
Sub-Division Headquarters
Police Station
National Highway
Other Roads
Metergauge Rly. Line
Broadgauge Rly. Line
River



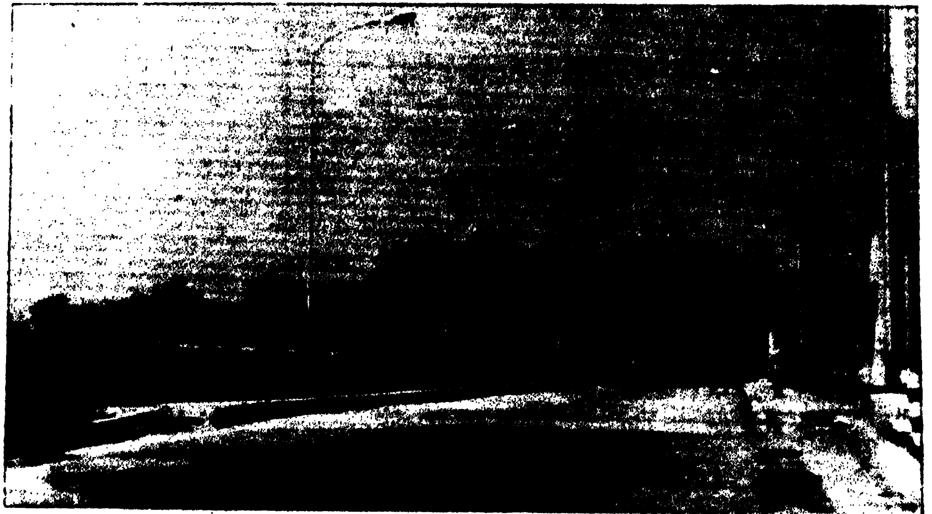
গরুমারা অভয়ারণ্যে প্রশস্ত রাস্তা

ছবি : দ্যুতিমান চন্দ

উন্নয়ন, ব্রিজ-কালভার্ট নির্মাণের ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে। গ্রামগুলির সঙ্গে ব্লক ও জেলা সদরের যোগাযোগ ব্যবহার উন্নতি ঘটায় কৃষকরা কৃষিপণ্য সহজে বাজারে গিয়ে বিক্রি করছে। গ্রামে বাসরুট চালু, ট্যাক্সি, মারুতি, ট্রাক-ভ্যানরিকশা সহজেই গ্রামে প্রবেশ করায় আর্থিক বিকাশ ঘটেছে। গঞ্জ এলাকায় দোকান-বাজার গড়ে উঠেছে। গ্রাম থেকে গরুর গাড়ি প্রায় উঠেই গেছে। দ্রুত যোগাযোগের জন্য মানুষ সাইকেল, স্কুটার, মোটর সাইকেল প্রভৃতি ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছে আর্থিক অগ্রগতির জন্য।

জেলায় কিভাবে রাস্তাঘাটের উন্নতি হয়েছে, ব্রিজ, কালভার্ট, পাকা রাস্তা হয়েছে, কাঠের সেতুর পরিবর্তে পাকা সেতুর উন্নয়ন কিভাবে হল তার চিত্র নিম্নে দেওয়া হল। যা থেকে বোঝা যাবে জেলা পরিষদ পরিকাঠামো উন্নয়নে কতটা গুরুত্ব দিয়েছে এবং জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করতে কতটা সহায়ক হয়েছে, পরিবহণ ব্যবস্থার ব্যাপক প্রসারের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে। কৃষক-শ্রমিক সহ অন্যান্য অংশের মানুষের আর্থিক অগ্রগতিও ঘটেছে বিভিন্নভাবে।

'৭১ সাল পর্যন্ত রাস্তাগুলির মোট দৈর্ঘ্য জেলাপরিষদের হিসাবে ৬৩৪ কি.মি.। পাথর বিছানো রাস্তা ছিল ১৬১ কি.মি. ও পাকা রাস্তা ছিল মাত্র ১৬ কি.মি.। ৬৬টি ছোটবড় কাঠের সেতু ছিল এবং ১৯৭টি কালভার্ট রিং দিয়ে তৈরি। বেশির ভাগ ব্লকের সঙ্গে গ্রামের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল যানচলাচলের উপযুক্ত রাস্তা না থাকায়। বর্তমানে মোট রাস্তার দৈর্ঘ্য ১৫৩৮ কি.মি.-এর মধ্যে মোটর যান চলাচলের যোগ্য রাস্তা প্রায় ১২০০ কি.মি.। এর মধ্যে পাকা রাস্তা



জলপাইগুড়ি শহরে করলা নদীর ওপর নির্মিত সেতু



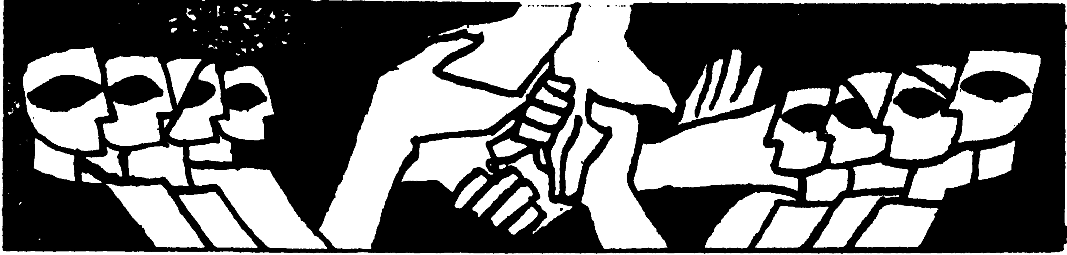
উত্তরবঙ্গে ফুলবাড়ি ঘোষপুকুর বাইপাস (প্রথম পর্যায়)।

তৈরি হয়েছে প্রায় ৬০০ কি.মি.। বারে বারে বন্যার ফলে যে সমস্ত ভাঙন হয় তাতে যোগাযোগের সেতু, কালভার্ট নির্মাণ করা এবং পুরানো কাঠের সেতু ভেঙে নুতন সেতু নির্মাণ—এ পর্যন্ত ১১২০টি সেতু, কালভার্ট পাকা করা হয়েছে। রাস্তাঘাট তৈরি, ব্রিজ, কালভার্ট নির্মাণের ফলে জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে বারো মাস গাড়ি চলাচল করে, ইতিপূর্বে নামমাত্র কয়েকটি রুটে বাস চলাচল করত যার সংখ্যা শতাধিক। বর্তমানে ট্রাক, বাস, মিনিবাস, ম্যাক্সি-ট্যাক্সি মিলে কয়েক সহস্র যানবাহন জেলার সর্বত্র চলাচল করে। পূর্ত ও সড়ক বিভাগ থেকে ৭৫০ কি.মি. রাস্তা মেরামতি বা নুতন করা হয়েছে। সেচ দপ্তরের উদ্যোগে ১২৫টি বাঁধের কমবেশি সংস্কার ও কিছু নুতন বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। এ ছাড়া শতাধিক হাটের শেড নির্মাণ করা হয়েছে। মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়গৃহ নির্মাণ হয়েছে চার শতাধিক। এতে মোট টাকার পরিমাণ হবে কয়েকশত কোটি টাকা। কয়েক লক্ষ শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছে এবং বহু মজুর কাজ পেয়েছে। তাদের আর্থিক সঙ্গতি বেড়েছে। জীবনযাত্রার মানে বিরাট পরিবর্তন এসেছে।

রাজ্য সরকারের জনকল্যাণমুখী কর্মসূচির জন্য জেলার ১৩টি ব্লকে কমবেশি রাস্তাঘাটের উন্নয়ন, ব্রিজ-কালভার্ট নির্মাণের ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে। গ্রামগুলির সঙ্গে ব্লক ও জেলা সদরের যোগাযোগ ব্যবহার উন্নতি ঘটায় কৃষকরা কৃষিপণ্য সহজে বাজারে গিয়ে বিক্রি করছে। গ্রামে বাসরুট চালু, ট্যাক্সি, মারুতি, ট্রাক-ভ্যানরিকশা সহজেই গ্রামে প্রবেশ করায় আর্থিক বিকাশ ঘটেছে।

এত উন্নয়ন সত্ত্বেও একটা প্রচার চলছে এবং বিশেষ মহলের কিছু বুদ্ধিজীবী বলছেন জেলার প্রতি বঞ্চনা, অবহেলা বাড়ছে। প্রকৃতপক্ষে জেলার সরল মানুষেরা বামফ্রন্টের সঙ্গে থেকে জোরকদমে এগিয়ে চলেছে এবং রাজ্য সরকারের প্রতি আস্থা রাখছে। তাতে অবিশ্বাসের বীজ বপণের অবিরাম চেষ্টা চলছে। তবে একথা জোরের সঙ্গে বলা যায় বামফ্রন্ট সরকার গরিবের দরদী বন্ধু হিসাবে উন্নয়ন অব্যাহত রেখেছে। সীমাবদ্ধতার মধ্যে যেটুকু অগ্রগতি ঘটেছে—তাকে পাথেয় করে আগামী দিনে পরিকল্পিত উন্নয়নের উদ্যোগ নিতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

লেখক ❑ কর্মাধ্যক্ষ, পূর্ত স্থায়ী সমিতি, জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ

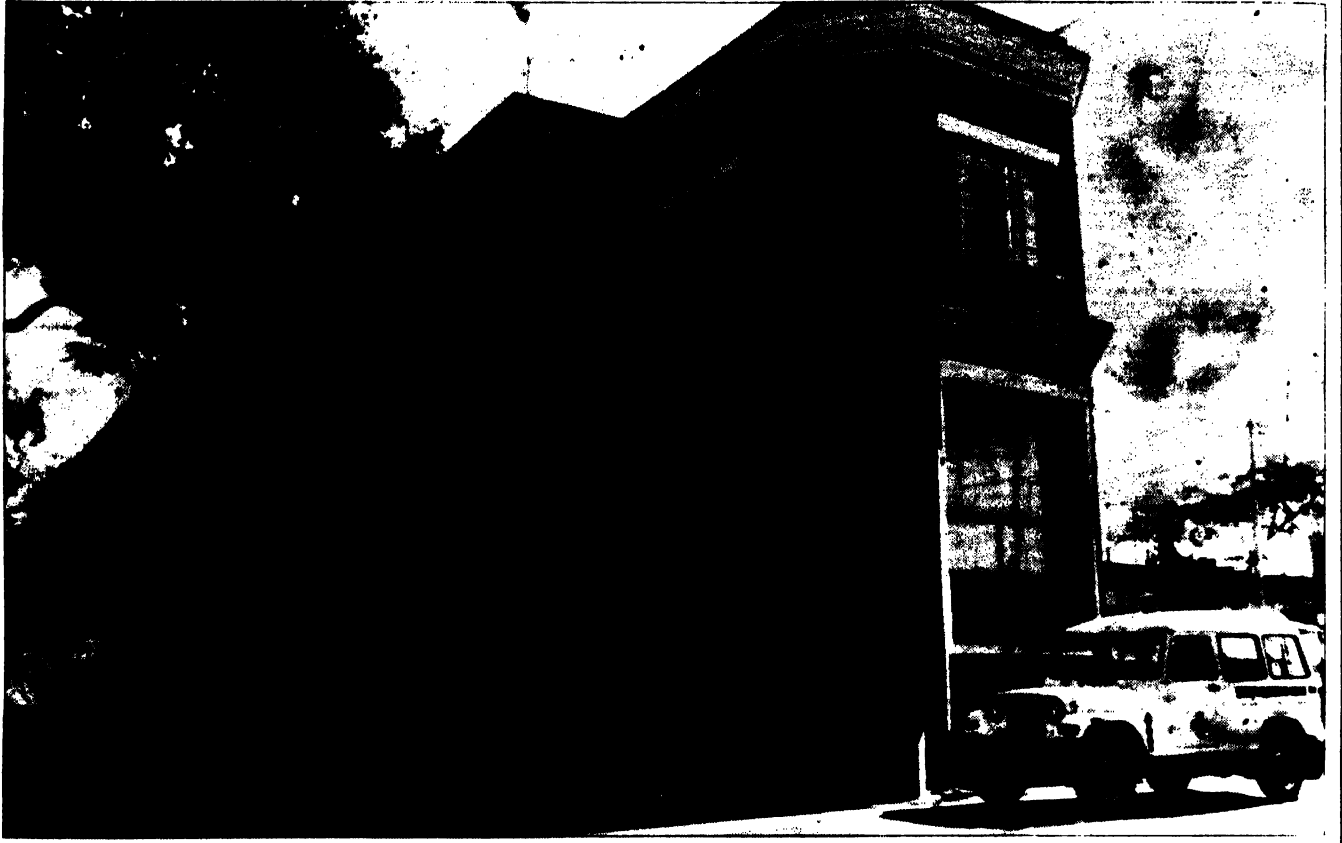


পান্থ দাশগুপ্ত

জলপাইগুড়ি জেলার স্বাস্থ্য পরিষেবা

জেলার জনস্বাস্থ্যের অবস্থা ও স্বাস্থ্য পরিষেবার বিশ্লেষণে, এখানকার ভৌগোলিক ও জাতিগত বৈচিত্র্যের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। শহর ও গ্রামীণ জনসংখ্যার বাইরেও জেলার প্রায় ২২ শতাংশ মানুষ বাস করেন চা-বাগানগুলিতে এবং সামগ্রিক জনস্বাস্থ্যের বিচারেও কতকগুলি জাতিগত ও আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য প্রকট।

সরকারিভাবে এই জেলার পত্তন ১৮৬৯ সালে। দেশের সীমান্ত জেলা হওয়ার কারণে, তৎকালীন বৃটিশ শাসকদের কাছে প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত বিষয় ব্যতীত জেলার অন্যকিছু গুরুত্ব পায়নি। স্বাস্থ্য ছিল পুরোপুরি উপেক্ষিত। ফলে সামগ্রিক জনস্বাস্থ্যের মান ছিল অন্যান্য জেলার তুলনায় অনেক নিচে। ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, ব্ল্যাক ওয়াটার ফিভার, কলেরা প্রভৃতি রোগের প্রকোপ ছিল প্রবল। মৃত্যু হার ছিল অস্বাভাবিক রকম বেশি। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে চা-বাগান তৈরি শুরু হওয়ার সুবাদে এবং বিপুল বনজ সম্পদ-এর সদ্ব্যবহার শুরু হওয়ার কারণে দেশি-বিদেশি পুঁজির বিনিয়োগ শুরু হল এই জেলায়। বিরাট সংখ্যক আদিবাসী মানুষের আগমন ঘটল। জনসংখ্যার জাতিগত বিন্যাস পরিবর্তিত হল। সেইসময় জনস্বাস্থ্যের বিষয়টিও গুরুত্ব দিতে বাধ্য হল তৎকালীন শাসকেরা। জেলার প্রথম ৮ শয্যাযুক্ত সরকারি হাসপাতালের স্থাপনা ১৮৭২ সালে। তবে হাসপাতাল পরিষেবার যথার্থ গুণগত মানোন্নয়ন ঘটে ১৯৩০ সাল থেকে। শহরের বুকে জ্যাকসন মেডিক্যাল স্কুল স্থাপনের পর থেকে। অবিভক্ত বাংলার গোটা উত্তরাঞ্চলে সেই ছিল প্রথম মেডিক্যাল শিক্ষায়তন। এই স্কুল থেকে পাশ করেছেন অনেকেই, পরবর্তীকালে যাঁরা চিকিৎসক বা চিকিৎসা বিজ্ঞানের শিক্ষকরূপে খ্যাত হয়েছেন। শুধু তাই নয়, এই শিক্ষায়তনের একটি বিশেষ পরিচয় এই যে তিরিশ ও চল্লিশের দশকে এই স্কুল ছিল শহর তথা জেলার প্রগতিশীল ও স্বাধীনতাকামী আন্দোলনের অন্যতম কেন্দ্রস্থল। এই স্কুল থেকে পাস করা অনেক



জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতাল *ছবি : শৌভিক ঘোষ*

চিকিৎসকই চাকরি নিয়েছেন জেলার চা-বাগানগুলিতে। এই স্কুলকে কেন্দ্র করে এখানকার চিকিৎসা পরিষেবার মানও বৃদ্ধি পায় বহুগুণ। পরবর্তীকালে সরকারি সিদ্ধান্তে এই স্কুল বন্ধ হয়ে গেলেও, জেলার স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে তা একটা স্থায়ী উন্নয়নের ছাপ ফেলতে সক্ষম হয়েছে।

১৯৪৭-এ স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময় জেলার জনসংখ্যা ছিল ৯ লক্ষ, যার ৪৫ শতাংশ চা-শ্রমিক ও তার পরিবার। আজ যা বেড়ে ৩৩ লক্ষ, যার মধ্যে চা-শ্রমিক ২২ শতাংশ। হাসপাতাল, তার শয্যা সংখ্যা, রোগীর সংখ্যা, জন্ম-মৃত্যু হার প্রভৃতি এবং অন্যান্য পরিসংখ্যানে স্বাস্থ্য-পরিষেবার গুণগত ও পরিমাণগত উন্নতি সহজেই পরিলক্ষিত হয়। তবে সময়ের চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে, নতুন চিন্তার আলোকে, সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগের সংমিশ্রণে, জনস্বাস্থ্যের সমস্যার যথার্থ মোকাবিলা আমরা এখনও করতে পারছি কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে।

সারণি-১

হাসপাতাল (সরকারি ও বেসরকারি) ও শয্যা সংখ্যা

বছর	হাসপাতাল ও ডিসপেনসরির সংখ্যা	শয্যাযুক্ত হাসপাতাল	মোট শয্যা সংখ্যা	জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা
১৮৭২	৩	৩	১২	৮
১৯৪৭	২৪	৪	১৩৬	১০১
১৯৯৮	১০২	৭৮	২৪৭৭	৬১০

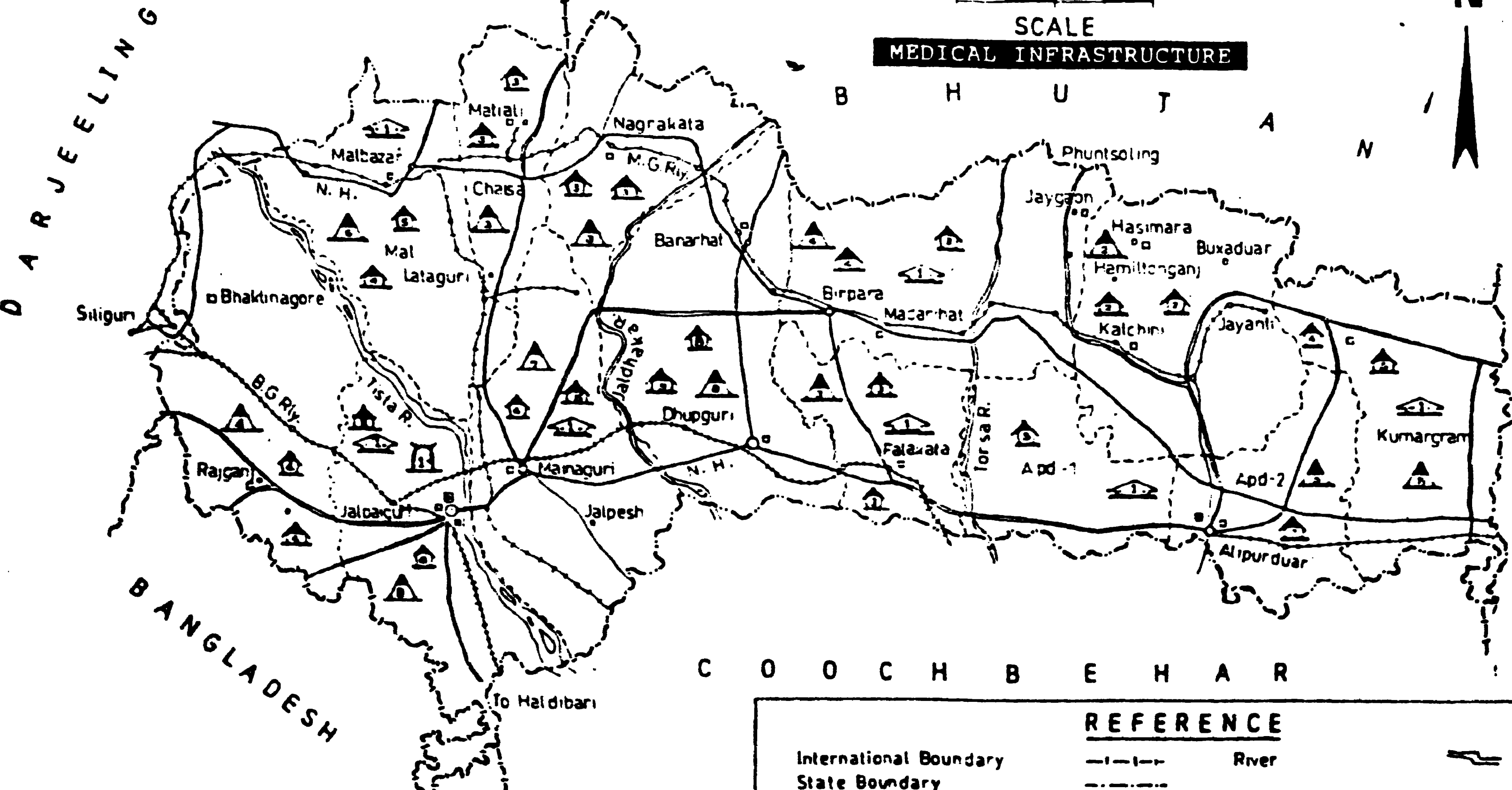
সারণি-২

চিকিৎসা পরিসংখ্যান

বছর	অন্তর্বিভাগ	বহির্বিভাগ
১৮৭২	২২২	৭,১১০
১৯৪৭	২,৮৯৭	১,৩৬,৩৬০
১৯৯৮*	১,০৪,৪২৮*	৮,৭৮,৯৪০*

*শুধুমাত্র জেলা/মহকুমা/গ্রামীণ ও স্টেট জেনারেল হাসপাতাল

উপরোক্ত তথ্যেই পরিষ্কার, যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, স্বাধীনতা পরবর্তীকালে এ পর্যন্ত চিকিৎসা পরিষেবার বিপুল উন্নতি হয়েছে। লক্ষণীয় যে, ১৯৪৭-এর আগে পর্যন্ত চিকিৎসা ব্যবস্থার বৃহৎ অংশ যেখানে চা-মালিক বা অন্যান্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়ন্ত্রণে ছিল, ৪৭ পরবর্তী সময়ে চিকিৎসার প্রধান দায়িত্ব গ্রহণ করল স্বাধীন দেশের সরকার। কল্যাণকামী রাষ্ট্রের প্রতিশ্রুতি রূপায়ণে প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকাতেও তৈরি হল সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র। বর্তমানে দেখতে পাই, জেলার জনসংখ্যার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ, এমনকি চা-শ্রমিকরাও আজ সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বিপুল অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে সরকারি চিকিৎসালয়গুলির আধুনিকীকরণ


JALPAIGURI
5 0 5 10 15 Kilometres
SCALE
MEDICAL INFRASTRUCTURE
N
BHUTAN
DARJEELING
BANGLADESH
COOCHBEHAR
ASSAM
Matiali
Nagrakata
Malbazar
M.G.Rly.
Chalsa
N. H.
Mal
Lataguri
Banarhat
Siliguri
Bhaktinagore
Phuntsoling
Jaygaon
Hasimara
Buxaduar
Hamiltonganj
Birpara
Madarihat
Kalchini
Jayanti
Jaldhaka R.
Dhupguri
B.G.Rly.
Tista R.
Torsa R.
Falakata
Apd-1
Apd-2
Kumargram
Rajganj
Mainaguri
Jalpaiguri
Jalpesh
Alipurduar
To Haldibari
REFERENCE
International Boundary
State Boundary
District Boundary
Sub-Division Boundary
Block Boundary
District Headquarters
Sub-Division Headquarters
Police Station
National Highway
Other Roads
Metergauge Rly.Line
River
LEGEND
Hospital
T B Hospital
Health Centre
Clinic
Despensary

চা-শ্রমিক আন্দোলনে যারা নেতৃত্ব দেন, তারা অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের দাবিকে যতটা অগ্রাধিকার দেন, স্বাস্থ্যের অধিকার ও সামগ্রিক জনস্বাস্থ্য শিক্ষাকে ততটা চিন্তার মধ্যে আনেন বলে মনে হয় না। চা-বাগানের স্বাস্থ্য সুরক্ষা সংক্রান্ত পরিকাঠামোর সম্প্রসারণ বা পরিবর্তনের দাবি বা শ্রমিকদের স্বাস্থ্য চেতনা বাড়ানোর লক্ষ্যে কর্মসূচি গ্রহণ, এটা শ্রমিক আন্দোলনের পরিধির মধ্যেই পড়া উচিত।

হয়েছে। এক্স-রে, প্যাথোলজি ইত্যাদি পরীক্ষা পদ্ধতি, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা প্রভৃতি ক্ষেত্রগুলি সম্প্রসারিত হচ্ছে, জেলা হাসপাতাল ছাড়িয়ে গ্রামীণ কেন্দ্রগুলিতেও। সীমাবদ্ধতা ও জটিলতা সত্ত্বেও জনগণের চাহিদার অনেকটাই পূরণ হচ্ছে সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থার মাধ্যমে। তবে মুশকিল হল চিকিৎসা ব্যবস্থাটাকেই গোটা স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেবে ভুল করেন অনেকেই, অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি, ঝকঝকে হাসপাতাল, নতুন নতুন ওষুধের ব্যবহার ইত্যাদিকেই স্বাস্থ্য ব্যবস্থার আধুনিকীকরণের মানদণ্ড হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। যদিও একথা আজ বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত যে, ভারতের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশে, রোগ প্রতিষেধক কর্মসূচির যথার্থ রূপায়ণই জনস্বাস্থ্যের প্রকৃত মান উন্নয়ন ঘটাতে পারে। কারণ যে সংক্রামক রোগগুলি আমাদের দেশে মৃত্যু ও অসুস্থতার প্রধান কারণ, তা দূর হতে পারে একমাত্র প্রতিষেধক কর্মসূচিগুলির সঠিক প্রয়োগে। আমাদের জেলার ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। নতুন সহস্রাব্দের সূচনাতেও দেখি জেলা হাসপাতালের ৫৫০ শয্যার বেশিরভাগটাই দখল করে থাকেন সংক্রামক ও তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত অসুখের রুগীরা। জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী শিশুবিভাগে ভর্তি হয় প্রধানত আন্ত্রিক, ব্রঙ্কাইটিস ও অপুষ্টিজনিত অসুখের রোগীরা। এছাড়া মেনিঙ্গো-এনকেফালাইটিস, টাইফয়েড, হেপাটাইটিস, ক্রিমি রোগ ও ম্যালেরিয়া বছরের বিশেষ বিশেষ সময়ে সংক্রমণ ঘটায়। সরকারি প্রতিষেধক কর্মসূচির ব্যাপক বিস্তার সত্ত্বেও গ্রামীণ ও চা-বাগানের জনসাধারণের মধ্যে স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত সচেতনতা এখনও দুঃখজনকভাবে কম। ১৯৬০ সালের এক পরিসংখ্যানে বলে—যক্ষ্মা, নিউমোনিয়া, আন্ত্রিক, কুষ্ঠ এবং রক্তাল্পতাজনিত অসুস্থতায় জলপাইগুড়ি জেলা রাজ্যের শীর্ষস্থানে। আজকে অবস্থার উন্নতি ঘটলেও আরও ভালো জায়গায় যাওয়ার সুযোগ রয়েছে।

রাজ্যে বর্তমানে বিশ্বব্যাঙ্কের ঋণীকৃত অর্থে মধ্যমস্তরের হাসপাতালগুলিতে নানা উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের কাজ চলছে। এই ঋণ প্রসঙ্গে কতকগুলি নীতিগত প্রশ্ন উত্থাপিত হলেও, এই অর্থকে কাজে লাগিয়ে, হাসপাতালগুলির কিছু মৌলিক পরিবর্তন আনা সম্ভব হত। কিন্তু পরিকল্পনা ও কাজের সমন্বয়ের অভাবে, এই অর্থ ব্যয়ের উপযুক্ত প্রতিফলন জেলার সামগ্রিক স্বাস্থ্য পরিষেবায় পড়ছে কিনা, তা নিয়ে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীমহলে প্রশ্ন উঠছে। যেহেতু এই প্রকল্পের কাজ এখনও চলছে, তাই বলা দরকার, যেটুকু উন্নয়ন হয়েছে, তা সংহত ও বিস্তৃত করে অর্থের যথার্থ সদ্ব্যবহার প্রয়োজন।

জলপাইগুড়ি জেলার ম্যালেরিয়া আজ এক বহু আলোচিত বিষয়। সংক্রমণ ও মৃত্যুর হারে রাজ্যের শীর্ষে। আমাদের পার্শ্ববর্তী কোচবিহার ও দার্জিলিং জেলার সঙ্গে তুলনা করলেই অবস্থার ভয়াবহতা পরিস্ফুট হয় :

সারণি-৩

১৯৯৭ সালে ম্যালেরিয়া সংক্রমণ

জেলা	ম্যালেরিয়া পজেটিভ	ভাইভ্যাক্স	ফ্যালসি-পেরাম
দার্জিলিং	১০২	৫৬	৪৬
কোচবিহার	৪,০৮৯	৩,৪৬৭	৬২২
জলপাইগুড়ি	১৬,৭০১	১৪,৯৫৪	১,৭৪৭

লক্ষণীয় যে, ফ্যালসিপেরাম ম্যালেরিয়া এক গুরুতর অসুখ, চিকিৎসার অভাবে যার মৃত্যু হার অত্যন্ত বেশী। আরও লক্ষণীয় যে ১৯৯৭ এর তুলনায় ১৯৯৯-এ ম্যালেরিয়ার প্রকোপ জেলায় উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

সারণি-৪

জেলার ম্যালেরিয়া

সাল	ম্যালেরিয়া পজেটিভ	ভাইভ্যাক্স	ফ্যালসি-পেরাম	নথিভুক্ত
১৯৯৭	১৬,৭০১	১৪,৯৫৪	১,৭৪৭	৭
১৯৯৯	৩৯,৩৮৯	২৬,৩০২	১২,৯৮৭	৪২

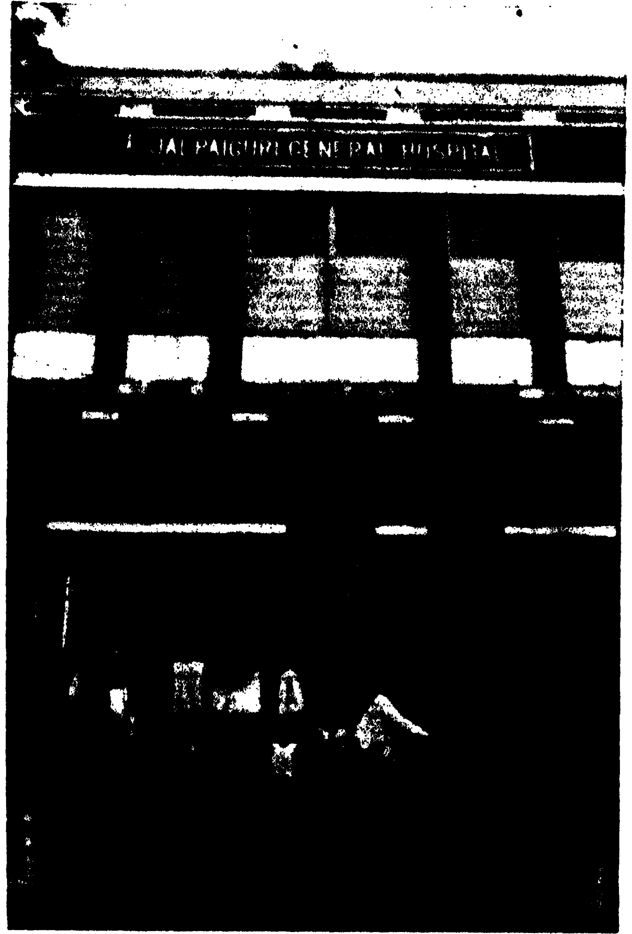
ম্যালেরিয়ার এই ব্যাপক প্রাদুর্ভাব বিশদ গবেষণার দাবি রাখে। তবে কয়েকটি সূত্র উত্থাপন করা যেতে পারে : (১) ডি ডি টি স্প্রে-র কার্যকারিতা আজ প্রশ্নের সামনে। এ স্প্রে যে অঞ্চলে সঠিক প্রয়োগ হচ্ছে। সেখানেও ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কমছে না, এমনটা হামেশাই দেখা যাচ্ছে। তদুপরি পরিবেশে ডি ডি টি-র কু-প্রভাব নিয়েও কথা উঠেছে। (২) ব্যাপকহারে বন উচ্ছেদের ফলে জঙ্গলের মশা নিকটবর্তী জনবসতিতে আশ্রয় নিচ্ছে ও সংক্রমণ ঘটাচ্ছে। (৩) তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পের কয়েকটি ক্যানেল-এ মশার আশ্রয় ও বংশবৃদ্ধির হদিশ পাওয়া গেছে। (৪) সরকারি স্বাস্থ্য বিভাগের বাইরে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির সক্রিয় অংশগ্রহণের অভাব আছে।

জলপাইগুড়ি জেলার ম্যালেরিয়া সংক্রমণ-এর কার্যকারণ নির্ণয়ে এটুকু কথাই শেষ বক্তব্য হতে পারে না। প্রয়োজন, ধারাবাহিক গবেষণা ও কর্মসূচি নির্ধারণ। নতুবা ম্যালেরিয়া আগামী দিনগুলিতেও জেলার জনস্বাস্থ্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে যাবে।

জেলায় যক্ষ্মা-সংক্রমণের হার উল্লেখের দাবি রাখে। ১৯৯৮-এর চিত্র অনুযায়ী, জেলায় চিকিৎসা পাচ্ছে এমন যক্ষ্মা রোগীর সংখ্যা ছিল ৩৫০৫ জন। নতুন রোগী নথিভুক্ত হয়েছেন ৩৮৭২ জন। কিন্তু ওই বছরে চিকিৎসা পূর্ণ করে সুস্থ হয়েছেন মাত্র ৪৫৩ জন। অর্থাৎ অনিয়মিত ও অসম্পূর্ণ চিকিৎসার কারণে স্বাস্থ্যহানি ঘটছে বহু সংখ্যক মানুষের। সংক্রমণ ছড়াচ্ছে আরও অনেকের মধ্যে। তবে, যক্ষ্মা নিবারণে আমাদের জেলায় সাড়ম্বরে DOTS চালু হয়েছে। যার মূল লক্ষ, প্রতিটি রোগীর ওষুধ খাওয়া ও রোগ নির্মূল কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষণের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে। দেশের অন্য কয়েকটি জেলার সাফল্যে আশাবাদী হওয়া যেতে পারে যে, আমাদের জেলাতেও DOTS সাফল্য পাবে।

এক সময় এই জেলায় কুষ্ঠ রোগের উপস্থিতি ছিল রাজ্যের শীর্ষভাগে। কুষ্ঠ কর্মসূচির প্রয়োগ এই রোগ নিয়ন্ত্রণে বড় আকারের সাফল্য এনেছে। রাজ্যে বর্তমানে কুষ্ঠ রোগীর সংখ্যা যেখানে দশ হাজারে ২.৫ জন, আমাদের জেলায় এই হার ১.৫ জন।

জলপাইগুড়ি জেলার স্বাস্থ্যবিষয়ক যে কোনও আলোচনায় চা-শ্রমিকদের অবস্থান নিয়ে বিশদভাবে বলা দরকার। স্বাধীনতা পূর্ববর্তীকালে, চা-শ্রমিকদের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা দূরে থাকুক, জীবন মান ও অধিকার বোধের ন্যূনতম আকাঙ্ক্ষাও জাগ্রত ছিল না। বিক্ষিপ্ত শ্রমিক আন্দোলন ব্যতীত শ্রমিক স্বার্থ সুরক্ষিত করার কোনও সংগঠিত সামগ্রিক প্রয়াস লক্ষ করা যায়নি। ফলে শোষণ ও বঞ্চনা শ্রমিকদের ঠেলে নিয়ে গেছে অশিক্ষা ও অস্বাস্থ্যের অন্ধকার গহ্বরে। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে চা-শ্রমিকরা সংগঠিত হতে থাকে। ফলশ্রুতিতে ১৯৫১ সালে পাশ হয় প্ল্যান্টেশন লেবার অ্যাক্ট। যা শ্রমিকদের জীবনধারণের ন্যূনতম স্বচ্ছন্দ সুনিশ্চিত করবে। প্ল্যান্টেশন অ্যাক্ট অনুযায়ী প্রতি ১৭৫০ শ্রমিক পিছু একজন পাশ করা চিকিৎসক নিযুক্ত হওয়ার কথা। চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য পরিষেবা সংক্রান্ত কতকগুলি নির্দিষ্ট অধিকার শ্রমিকদের দেওয়া হয়। কিন্তু স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রগুলিতে এই আইনের কতটা সুষ্ঠু প্রয়োগ হচ্ছে ও হয়েছে তার অনুসন্ধান প্রয়োজন। কারণ, জেলা হাসপাতালের চিকিৎসা নিতে আসা রোগীদের মধ্যে দেখা যায়, অপুষ্টি, রক্তাল্পতা, যক্ষ্মা ইত্যাদি নানা রোগ ও স্বাস্থ্যহীনতার পুরোভাগে রয়েছে জেলার চা-শ্রমিক ও তাদের পরিবার পরিজনেরা। জন্মনিয়ন্ত্রণ, টীকাকরণ, আন্ত্রিক নিবারণ ইত্যাদি বিষয়গুলিতে ন্যূনতম জ্ঞান যা জেলার পিছিয়ে থাকা গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যেও আছে, তা চা-শ্রমিকদের বৃহদংশের মধ্যে বিস্ময়করভাবে অবর্তমান। স্বাস্থ্য সুরক্ষার মৌলিক ধারণাগুলির অভাবে, ব্যাপক স্বাস্থ্যহানি ঘটছে চা-শ্রমিকদের একটা বড় অংশের। অথচ নতুন সহস্রাব্দের সূচনায় দাঁড়িয়ে এটা আর বলা যাবে না যে শ্রমিকদের অধিকারবোধ গতদিনের মতই তমসাচ্ছন্ন। সংগঠিত আন্দোলন তাদের আর্থিক নিরাপত্তাকে অনেকটা নিশ্চিত করেছে।



জলপাইগুড়ি সাধারণ হাসপাতাল ছবি: কৌশিক ঘোষ

কিন্তু স্বাস্থ্যের এই ভগ্নদশা কেন তা নিয়ে ভাবতে হবে সবাইকেই। চা-শ্রমিক আন্দোলনে যারা নেতৃত্ব দেন, তারা অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের দাবিকে যতটা অগ্রাধিকার দেন, স্বাস্থ্যের অধিকার ও সামগ্রিক জনস্বাস্থ্য শিক্ষাকে ততটা চিন্তার মধ্যে আনেন বলে মনে হয় না। চা-বাগানের স্বাস্থ্য সুরক্ষা সংক্রান্ত পরিকাঠামোর সম্প্রসারণ বা পরিবর্তনের দাবি বা শ্রমিকদের স্বাস্থ্য চেতনা বাড়ানোর লক্ষ্যে কর্মসূচি গ্রহণ, এটা শ্রমিক আন্দোলনের পরিধির মধ্যেই পড়া উচিত।

বিংশ শতাব্দী জুড়ে এই জেলায় চিকিৎসক হিসেবে যাঁরা সুনাম কুড়িয়েছেন তাঁরা শুধু সুচিকিৎসক ছিলেন না, ছিলেন সমাজ কর্মীও। ডাঃ চারুচন্দ্র সান্যাল, ডাঃ অবনী গুহনিয়োগী, ডাঃ ধীরাজমোহন সেন, ডাঃ স্মরজিত বাগচি, ডাঃ শৈলেশ ভৌমিক এবং ডাঃ শচীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রমুখ, আরও অনেকে ছিলেন, যাদের সমাজ শুধুমাত্র চিকিৎসক হিসেবে সম্মান করেন না, মনে রাখেন সমাজ-সংস্কারক রূপেও। একালে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে ধ্যান-ধারণা ও মূল্যবোধের পরিবর্তন হয়েছে অনেক। ধনবাদী সমাজের অবশ্যম্ভাবী নিয়মে, চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য পরিষেবাকে ক্রয়যোগ্য উপাদানরূপে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলছে দেশে দেশে। আমরাও তার ব্যতিক্রম নই। চিকিৎসক রোগীর পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে

জলপাইগুড়িতে বাণিজ্যিক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান অন্যান্য শহরের তুলনায় কম। এটা কোনও নেতিবাচক দিক নয়। নানা ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এই শহর তথা জেলার বেশিরভাগ মধ্যবিত্ত মানুষ এখনও সরকারি হাসপাতালের পরিষেবা গ্রহণ করতে আসেন। বিশেষত ইদানিংকালে জেলার বড় হাসপাতালগুলিতে যে আধুনিকীকরণ ও সম্প্রসারণের কাজ চলছে, তাতে এই প্রবণতা অব্যাহত থাকবে এমনটা আশা করা যেতেই পারে।

যে নির্ভরতা ও মানবিক মূল্যবোধ নিহিত ছিল, আজ তা ক্রেতা-বিক্রেতার সম্পর্কে পরিবর্তিত হতে চলেছে। এই পরিবর্তন নিঃসন্দেহে স্বাস্থ্য পরিষেবার মান উন্নয়নের পরিপন্থী। বিশেষত আমাদের মতো দরিদ্র দেশে।

তবে আমাদের জেলার স্বাস্থ্য পরিষেবার বিষয়ে কতকগুলি রুপালি রেখার উল্লেখ প্রয়োজন। আজকে, কলকাতা সহ সব শহরেই, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ নার্সিংহোমমুখী। জলপাইগুড়িতে বাণিজ্যিক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান অন্যান্য শহরের তুলনায় কম। এটা কোনও নেতিবাচক দিক নয়। নানা ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এই শহর তথা জেলার বেশিরভাগ মধ্যবিত্ত মানুষ এখনও সরকারি হাসপাতালের পরিষেবা গ্রহণ করতে আসেন। বিশেষত ইদানিংকালে জেলার বড় হাসপাতালগুলিতে যে আধুনিকীকরণ ও সম্প্রসারণের কাজ চলছে, তাতে এই প্রবণতা অব্যাহত থাকবে এমনটা আশা করা যেতেই পারে। তবে রাজ্যের প্রান্তিক জেলা হওয়ার কারণে, নানা জটিল রোগের চিকিৎসায়, রোগীকে কলকাতা ছুটতে হলে, তা স্বাভাবিকভাবেই হয় কষ্টসাধ্য। এই অঞ্চলের শীর্ষ চিকিৎসালয়, উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসা পরিকাঠামোর উন্নয়নে যদি আরও দৃষ্টি দেওয়া হয়, তাহলে এই অসুবিধা অনেকটাই দূর করা যেতে পারে।

কৃষ্টি ও সংস্কৃতির শহর জলপাইগুড়িতে সমাজসেবার এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস রয়েছে। সৌভাগ্যের বিষয়, আজকের দিনেও তা অব্যাহত। শহরের গণ্ডি ছাড়িয়ে গ্রামাঞ্চলেও নানা সমাজসেবী সংগঠন কাজ করে চলেছে, যারা স্বাস্থ্য-সচেতনতার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেন। বিভিন্ন ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনগুলি সুনামের সঙ্গে কাজ করে চলেছেন, জেলার নানা প্রান্তে। প্রতিবন্ধী সুরক্ষা, রক্তদান প্রভৃতি কর্মসূচিগুলিতে এদের ভূমিকা খুবই আশাব্যঞ্জক। একটি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে, স্বেচ্ছা-রক্তদান হতে সংগৃহীত রক্তের পরিমাণ, উত্তরবঙ্গে সর্বাধিক। এমনকি উত্তরবঙ্গ মেডিকাল কলেজ থেকেও বেশি। বিভিন্ন রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সমাজসেবী সংগঠনগুলির সচেতন প্রয়াস, এই সাফল্যের উৎসে। স্টুডেন্টস হেলথ হোম, ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে চিকিৎসা-পরিষেবা ও স্বাস্থ্য-চেতনার প্রসারে কাজ করে চলেছে দীর্ঘ কয়েক বছর। চিকিৎসক ছাত্র-শিক্ষক ও অন্যান্য অংশের মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণে এটি একটি জীবন্ত প্রতিষ্ঠান।

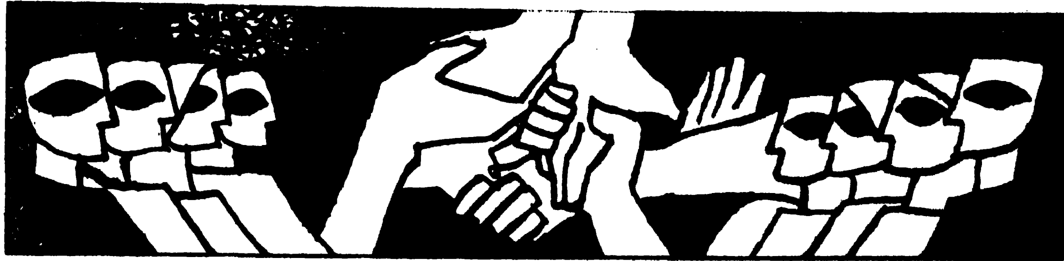
একটি ধারণা চালু আছে, জনস্বাস্থ্য মূলত চিকিৎসকদের বিষয়। জনস্বাস্থ্যের উন্নতি ও অবনতি নির্ভর করে চিকিৎসকদের গুণ ও দোষের উপর। এই ধারণার আশু পরিবর্তন প্রয়োজন। নচেৎ, স্বাস্থ্য সুরক্ষার প্রচারে, সামাজিক উদ্যোগগুলিকে সচেতনভাবে যুক্ত করা যাবে না। চিহ্নিত করা যাবে না, স্বাস্থ্যের সঙ্গে যুক্ত আর্থ-সামাজিক উপাদানগুলিকে। জেলার জন্মলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত, আমরা অনেক এগিয়েছি জনস্বাস্থ্যের নিরিখে। কিন্তু অগ্রগতি আরও ব্যাপক হতে পারত। সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগের যৌথ সমন্বয়ে, আরও বেশি সংখ্যক মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণে, পরিকল্পনার বৈজ্ঞানিকীকরণে, আমরা এগিয়ে যাব আরও উচ্চতায়,—নতুন সহস্রাব্দে এটাই হোক আমাদের শপথ।



জলপাইগুড়ি জেনারেল হাসপাতাল — *ছবি : শৌভিক ঘোষ*

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : (১) ডাঃ গোবিন্দ কুণ্ডু, (২) ডাঃ মন্মথনাথ নন্দী, (৩) শ্রীশৈবাল দাশগুপ্ত, (৪) শ্রীঅনুপম সান্যাল, (৫) ডাঃ মানব ঘোষ, (৬) ডাঃ অমল রায়চৌধুরী।

লেখক ❑ চিকিৎসক ও প্রাবন্ধিক।



অমর চৌধুরী

জলপাইগুড়ি জেলার শিক্ষার রূপরেখা

আমাদের ছেলেবেলায় কয়েকটা জেলা নিয়ে একটা মজার ছড়া আমরা প্রায়ই বলতুম—

'জলপাই ঢাকা
খুলনা পাবনা।'

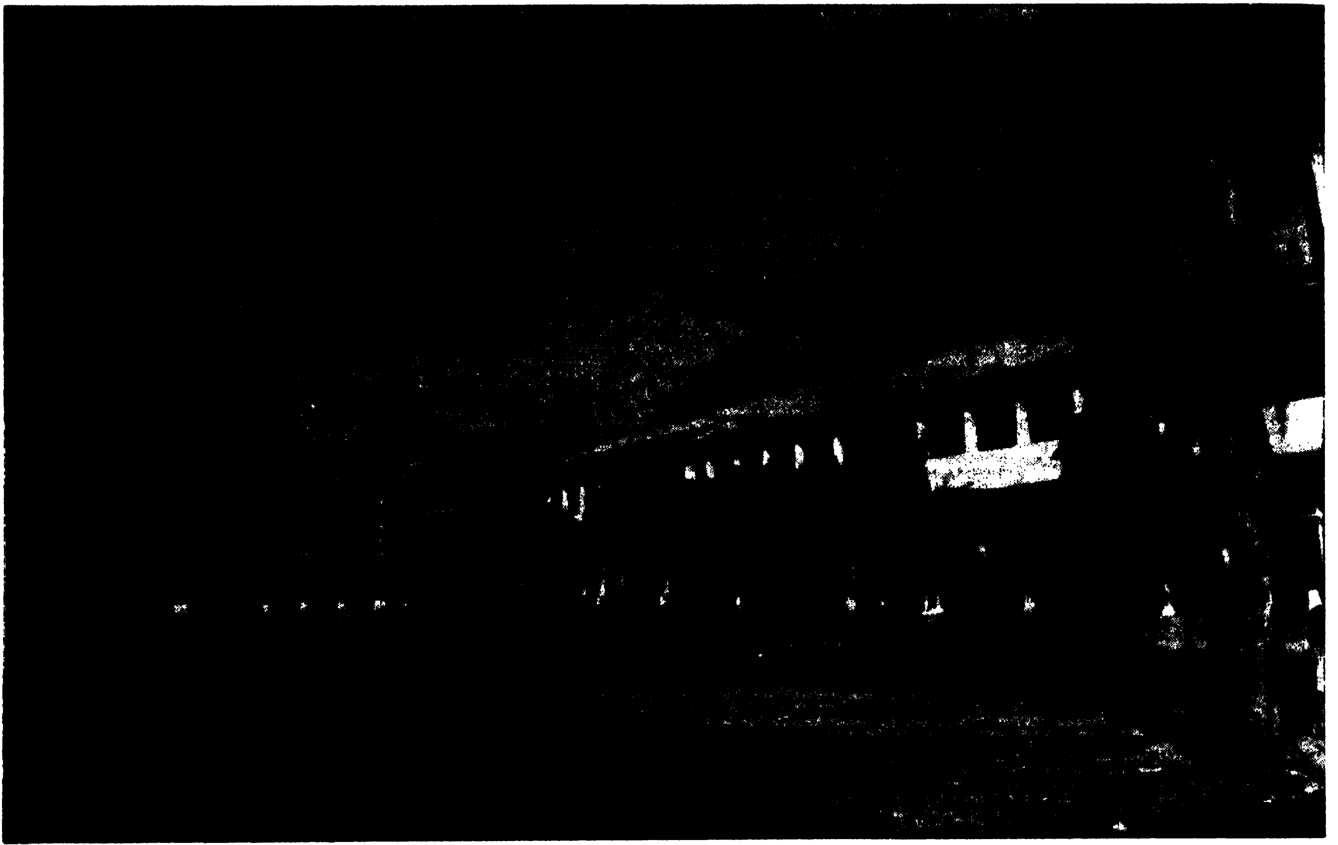
তারপর!

তারপর দেশটা স্বাধীন হল, দেশটা ভাগ হল। আর ছড়াটাও হারিয়ে গেল। তবে এপার বাংলার জলপাইগুড়ি জেলাটা আরও স্পষ্ট হল। আরও কাছে এল। আবার এদিকে রবীন্দ্রনাথের ভোজনবিলাসী দামোদর শেঠের জন্য, 'জলপাইগুড়ি থেকে এনো কৈ জিয়োনো' এ এক নতুন মজা। শুনে মনে হত আমাদের জেলা নিয়ে বিশ্ব কবির ছড়া! একটা গৌরবও অনুভব করতুম।

জলপাইগুড়ি জেলা বয়সের দিক থেকে নিতান্তই অর্বাচীন। ১৮৬৯ সালে এই জেলার জন্ম। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসকদের ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক সড়ক সন্ধানের দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই এই জেলার সৃষ্টি। তাই অচিরেই উত্তর পূর্বাঞ্চলের সীমান্ত ঘেঁষা জেলাটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। তথাকথিত জেলা হিসাবে জলপাইগুড়ি জেলা হিসাবে আত্মপ্রকাশ ঘটার আগে এ অঞ্চলের রাজনৈতিক ইতিহাস কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

'সিঞ্চুলা' সন্ধিসূত্রে ডার্লিং পার্বত্য অঞ্চল থেকে সঙ্কোশ নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ 'ডুয়ার্স' থেকে ভুটান তার অধিকার প্রত্যাহার করে নিলে তিস্তার পশ্চিমতীরের সমগ্র 'ডুয়ার্স'কে ও রংপুরের তেঁতুলিয়া মহকুমাকে সংযুক্ত করে জলপাইগুড়ি জেলার পত্তন হয়। মূল ফকিরাগঞ্জ এলাকাটি কালক্রমে জলপাইগুড়ি সদর শহর বলে পরিচিতি লাভ করে।

জলপাইগুড়ি জেলার জন্মের পর থেকেই তার শিক্ষা বিস্তারের ইতিহাসকে ধরা হয়। রংপুরের সন্নিহিত এবং তার অংশবিশেষ জলপাইগুড়ির সঙ্গে মিশে যাওয়ায় এবং কোচবিহার রাজ্যপাট থাকায় জলপাইগুড়ির শিক্ষা প্রসারের ইতিহাস সেখান থেকেই ধরা উচিত। কিন্তু ভৌগোলিক কারণে ও



জলপাইগুড়ি ফণীন্দ্রদেব উচ্চ বিদ্যালয় — *ছবি : সৌভিক ঘোষ*

অবস্থানগত দিক বিচার করে জেলার সীমানাবদ্ধ এলাকাকে উপজীব্য করে শিক্ষা বিস্তারের একটা রূপচিত্র উপস্থাপিত করা হল। ইতিহাসের তমসা-গুণ্ঠন খোলার মতো অবস্থা নেই এবং তেমন কোনো তথ্যও নেই যা গবেষণার অপেক্ষা রাখে। একথা বলার কারণ এই যে রংপুর মানে রঙ্গপুর নামটাতেই রঙ্গরসে অগ্রগণ্যতা রংপুর সম্পর্কে মেনে নিতে হয়। লোকশ্রুতিতে একথা শোনা যায়, 'রঙ্গপুর থাকি শিখি আইচ্চং নাচনা'। ভারতচন্দ্রের কথাতে যেমন শোনা গিয়েছে।

'আসিয়া বর্ধমান সুন্দর চৌদিকে চান।'

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ভবানী পাঠক, মজনু শাহ দেবী চৌধুরানীর আন্দোলন, সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, ফকির বিদ্রোহ এ অঞ্চলে প্রবল আকার ধারণ করেছিল। বৈকুণ্ঠপুর এলাকায় দেবী চৌধুরানীর বিচরণভূমি ছিল। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র প্রফুল্ল নামের কুলবধূকে দেবী চৌধুরানীতে পরিণত করেন এবং তাঁর শিক্ষক ভবানী পাঠক। তার শিক্ষার মধ্য দিয়ে লেখকের 'অনুশীলন তত্ত্ব' প্রচার লেখকের কল্পনামাত্র নয়। যেহেতু ভবানী পাঠক ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব বলে প্রচারিত সেহেতু তাঁর শিক্ষাদান প্রণালী সম্পর্কে লেখকের কল্পলোক থেকে সরে এসে বিশ্বাসের ভূমিতে পা রাখা যায়। এ কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, জলপাইগুড়ি জেলা সৃষ্টি হবার আগে এ ভূখণ্ডটি কি একেবারে অশিক্ষার অন্ধকারের জাজিমে ঢাকা ছিল?

সব জনপদেই প্রথাগত শিক্ষার পাশাপাশি প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা চলে অর্থাৎ লোকায়ত জীবন থেকে স্বাভাবিকভাবেই একটা অভিজ্ঞতা প্রসূত শিক্ষা চলে। বৃষ্টিবহুল এই জেলা অরণ্য ও নদী দিয়ে ঘেরা। উত্তরে পাহাড়। সব নদীই পাহাড় থেকে নেমে আসে 'কথা কইবার আগে' ফুড়ুৎ করে উড়াল দেয়। সমতলে এসে গা-গতরের কাপড় খুলে একেবারে ছড়িয়ে পড়ে। এ অঞ্চলের লোকগায়ক তাই তার আর্থসামাজিক জীবন বর্ণনায় গেয়ে ওঠে—

'হালুয়ার বৈরী কেল্লা দুব্বা
নদীর বৈরী ফেনা
নারীর বৈরী দুই সতিনী
বিধুয়ার বৈরী টেনা।'*

১৮৫৪ সালে 'উডের ডিসপ্যাচ' বলা হয় তথাকথিত ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য প্রতি জেলায় 'জেলা স্কুল' স্থাপন করা হবে। গ্রান্ট-ইন-এইড অনুসারে বেসরকারি উদ্যোগে সৃষ্টি করা হবে। এই সময় থেকেই স্বাধীনতা আন্দোলন যখন প্রবল হয়ে ওঠে তখন বেসরকারি উদ্যোগে বিদ্যালয় স্থাপনের ইতিহাস সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে ১৯২১-৩০ সালে অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলনের ঝাঁপিয়ে পড়া তরুণ ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাক্ষেত্রে পুনর্বাসন দেওয়ার বিষয়টি ভেবে এবং শিক্ষাবিস্তারের দিকটি মাথায় রেখে সমকালীন কর্মবীরেরা বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তার ঢেউ জেলায় জেলায় আছড়ে পড়ে। জলপাইগুড়ি জেলাও এই মানচিত্রে স্থান করে নেয়।

১৮৭৬ সালে জলপাইগুড়ি জেলা স্কুল স্থাপিত হয়। প্রখ্যাত গবেষক ডঃ চারুচন্দ্র সান্যাল মহাশয়ের বিবরণ থেকে জানা যায় যে

প্রথম প্রতিষ্ঠিত প্রাথমিক বিদ্যালয়টি ১৮৮৩ সালে ফালাকাটায় স্থাপিত হয়। এটি আজ উচ্চতর বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত। দ্বিতীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়টি জলপাইগুড়ি শহরের পাহাড়িপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়। ১৮৮৫ সালে এটি স্থাপিত হয়। নারীশিক্ষার মডেল স্কুল হিসেবে ১৮৭১ সালে 'সদর বালিকা বিদ্যালয়' নামে যে স্কুলের প্রতিষ্ঠা এটিকে শুধুমাত্র বালিকাদের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসেবে ধরা যেতে পারে। এটি আজ জেলার অন্যতম এক বালিকা বিদ্যালয়।

শহরের একমাত্র ওই স্কুলটি পুড়ে যায়। বার কয়েক স্থান বদলের পর বর্তমান স্থানে পাকাপোক্তভাবে গড়ে ওঠে। প্রবীণতার দিক থেকে পরবর্তী বিদ্যালয় স্থাপনের যে ইতিহাস জানা যায় তা হল ১৮৯৩ সালে ফালাকাটায় এম.ই স্কুল (মিডল ইংলিশ) প্রতিষ্ঠা। পরবর্তীতে ময়নাগুড়িতে ১৮৯৫ সালে অনুরূপ একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বর্তমানে দুটি বিদ্যালয়ই উচ্চতর বিদ্যালয়ের গৌরব বহন করছে। ১৯২২ সালে এই জেলার আলিপুরদুয়ারে তৃতীয় বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮৭১ সালে জলপাইগুড়িতে একটি নর্মাল স্কুল স্থাপিত হয়। আজ আর এর কোনো হদিশ খুঁজে পাওয়া যাবে না। তবে উক্ত বিদ্যালয় থেকে পাশ করা বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যে আসার আমার সৌভাগ্য হয়েছিল। ফালাকাটার রায়চেঙ্গা গ্রাম নিবাসী তারিণীচরণ রায় পাটোয়ারী নর্মাল পাশ ছিলেন। বস্তুত তাঁর মতো পণ্ডিত এবং বাংলা ভাষার প্রতি অনুরাগ আমি খুব কম লোকেরই দেখেছি। পরবর্তীকালে জলপাইগুড়িতে গুরু ট্রেনিং স্কুল স্থাপিত হয়। সম্ভবত নর্মাল স্কুল সূত্রে এটির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। এটিই পরবর্তীতে বেসিক ট্রেনিং সেন্টারের পরিণত হয়। কিন্তু ত্রিশ চল্লিশ বছর আগে রিকশাওয়ালারা বেসিক ট্রেনিং স্কুলের নাম শুনলে বলত, গুলটিং স্কুল।

জলপাইগুড়ির রাজপরিবারের নানা বিষয়ে বহু অবদান ছড়িয়ে আছে। বিশেষ করে শিক্ষাক্ষেত্রে এ পরিবারের অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। ১৯২১ সালে ফণীন্দ্র দেব বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের উত্তাল সময়ে একটি স্বাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার ক্ষেত্রে অনুপ্রাণিত হওয়া বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। রাজ পরিবারের প্রসন্নদেব রায়কতও শিক্ষা দরদী ছিলেন। তাঁর নামে নামাঙ্কিত হয়ে আছে জলপাইগুড়ির বালিকা মহা বিদ্যালয়টি।

১৯১৭ সালে জলপাইগুড়ির হাজী মহম্মদ মহসীনের মতো মানুষ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের আকিঞ্চন ধন্য আমিরউল মুলুক মহম্মদ সোনাউল্লা সাহেবের বদান্যতায় সোনাউল্লা হাই স্কুলটি গড়ে ওঠে। বঙ্গবাসী কলেজের মতো এই বিদ্যালয়ে ছাত্রদের ঢালাও প্রবেশ ছিল। দেশভাগের পর উদ্বাস্তু পরিবারের ছেলেরা এখানে পড়ার সুযোগ পেয়েছে। প্রধান শিক্ষক তরণীকান্ত চক্রবর্তীর নামও এখানে উল্লেখ্য। বিস্মৃতপ্রায় এই শিক্ষকের নাম এখনও অনেকেই বলে থাকেন।

নারীশিক্ষা প্রসারে জলপাইগুড়ি শহরে ১৮৭১ সালে প্রতিষ্ঠিত সদর বালিকা বিদ্যালয়ের গোড়াপত্তন হয়। প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগরের নারীশিক্ষা প্রসারের প্রয়াস সুদূর জলপাইগুড়ির অরণ্য পর্বত বেষ্টিত ও তিস্তার তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ এই জনপদে এসে রূপ পেয়েছিল ভেবে আত্মশ্লাঘা অনুভব করতে পারে এই জেলার মানুষ।

জলপাইগুড়িতে একটি চতুষ্পাঠী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। ১৯৩৫ সালে এর প্রতিষ্ঠা হয়। কালের নিয়মে সংস্কৃতচর্চার প্রতি অনীহা ঘটায় এর অবলুপ্তি ঘটলেও অনেকের স্মৃতিতে এই সংস্কৃত শিক্ষার প্রতিষ্ঠানটি জলপাইগুড়ি জেলার প্রাচীন বৈদগ্ধ্যকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

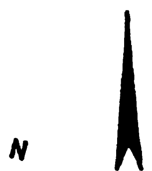
স্বাধীনতা উত্তরকালেই জেলার শিক্ষার প্রসার ঘটলেও পূর্বসূরিদের প্রয়াসকে কখনই ভোলা যায় না। চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে জলপাইগুড়ির একটি উজ্জ্বল অবস্থান লক্ষ করা যায়। জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে ১৯৩০ সালে 'জ্যাকসন মেডিক্যাল স্কুল স্থাপিত হয়। ১৯৫০ সালে এল. এম. এফ কোর্স উঠে গেলে স্কুলটি উঠে যায়। এই স্কুল থেকে পাশ করা ডাক্তারেরা অনেকেই স্বরাজ্যে স্বরাট ছিলেন। আর জলপাইগুড়িবাসীরা এটিকে কেন্দ্র করে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। এখন এখানে ফার্মেসি ট্রেনিং সেন্টার চলছে।

জেলার ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজটি সগৌরবে চলছে। পাশাপাশি পলিটেকনিক ইনসটিটিউটও রয়েছে।

উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে জলপাইগুড়ির অগ্রগতি বামফ্রন্ট সরকারের আমলে দ্রুততর ও বিস্তৃত হয়েছে। জলপাইগুড়ির বাস্তুত পরিবারের বদান্যতায় ১৯৪২ সালে আনন্দচন্দ্র কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়। এ কলেজে একদা বাংলা সাহিত্যের উজ্জ্বলতম ব্যক্তিত্ব এবং সফল অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় অধ্যাপনা করে গেছেন।

এ জেলায় মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রটা পরবর্তী সময়ে সম্প্রসারিত হয়। জেলার দ্বিতীয় কলেজ আলিপুরদুয়ার কলেজ প্রতিষ্ঠার পর আলিপুরদুয়ার মহকুমাটির স্থান উচ্চশিক্ষার মানচিত্রে এলেও মাঝখানে তোর্ষা নদী বহমান থাকায় অসুবিধা রয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে ধূপগুড়ি, ফালাকাটা, বীরপাড়া এবং সদর মহকুমার মাল, ময়নাগুড়িতেও কলেজ হয়েছে। আলিপুরদুয়ারে দ্বিতীয় কলেজ বিবেকানন্দ কলেজ এবং কামাখ্যাগুড়ি অপর একটি কলেজের

JALPAIGURI



REFERENCE

International Boundary	—·—·—·—	River	
State Boundary	—·—·—·—	Law-College	Ⓛ
District Boundary	— — — —	Engineering College	Ⓔ
Sub-Division Boundary	-------	Politechnic Institute	Ⓟ
Block Boundary	- - - - - -	Junior Technical	JT
District Headquarters	■	B. Ed. College	Ⓑ
Sub-Division Headquarters	■	Junior. B.T. Institute	JB
Police Station	▫	Pharmacy Institute	PC
National Highway	——		
Other Roads	——		



Primary School

Other School

College

Madrasa

Figure in symbol represents Number of Primary School, Other School, College & Madrasa.

প্রতিষ্ঠা হয়েছে। আলিপুরদুয়ারে বেসরকারি প্রয়াসে অন্ধদের জন্য একটি বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা এক প্রশংসনীয় উদ্যম বলে উল্লেখ করা যেতে পারে।

প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এ জেলা উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লাভ করেছে। জেলার প্রথম প্রতিষ্ঠিত প্রাথমিক বিদ্যালয়টি ১৮৮৩ সালে ফালাকাটায় স্থাপিত হয়। এটি আজ উচ্চতর বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত। দ্বিতীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়টি জলপাইগুড়ি শহরের পাহাড়িপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়। ১৮৮৫ সালে এটি স্থাপিত হয়। নারীশিক্ষার মডেল স্কুল হিসেবে ১৮৭১ সালে 'সদর বালিকা বিদ্যালয়' নামে যে স্কুলের প্রতিষ্ঠা এটিকে শুধুমাত্র বালিকাদের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসেবে ধরা যেতে পারে। এটি আজ জেলার অন্যতম এক বালিকা বিদ্যালয়। এর অন্তরালে নারীশিক্ষার প্রতি নিষ্ঠায় দৃঢ় প্রয়াতা প্রধান শিক্ষিকা সুনীতিবালা চন্দের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

এই জেলার চা-বাগান অধ্যুষিত ডুয়ার্স অঞ্চলের কিছু মানুষ 'দুটি পাতা একটি কুঁড়ি'র মধ্যে বাস করেও শিক্ষার কথা ভেবেছিলেন। চা-বাগানের বর্তমান অবস্থা থেকে একথা বোঝা যাবে না যে নাট্যচর্চায় রঙ্গরাগে এবং শিশুকণ্ঠে কথার কলি ফোটাতে চা-করেরা কিভাবে এগিয়ে এসেছিলেন। এভাবেই বানারহাট হাইস্কুল, কালচিনি ইউনিয়ন একাডেমি, বীরপাড়া হাইস্কুল এবং সোনাপুর হয়ে আলিপুরদুয়ার যাবার পথে সোনাপুর বি.কে. হাইস্কুল গড়ে উঠেছিল।

জলপাইগুড়ি জেলায় কিছু মিশন স্কুল রয়েছে। আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় এগুলি গড়ে ওঠার পেছনে খ্রিস্টান মিশনারিদের অবদান রয়েছে। আলিপুরদুয়ার মহকুমায় মহাকালগুড়ি মিশন হাইস্কুল, সাঁওতালপুর মিশন হাইস্কুল, কামাক্ষ্যাগুড়ি মিশন হাইস্কুল, ডিমডিমা ফতিমা হাইস্কুল। এই মিশন স্কুল এলাকার মানুষের শিক্ষাগ্রহণে অবশ্যই সহায়ক হয়েছিল। এর কয়েকটি পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অনুমোদিত সিলেবাস অনুসরণ করে থাকে। ফালাকাটার 'রেমন্ড মেমোরিয়াল মিশন স্কুলটি' এর ব্যতিক্রম। এটি সম্পূর্ণত মিশন পরিচালিত নিজস্ব প্রতিষ্ঠান।

বিদেশি শাসক কুলের কেউ কেউ শিক্ষা প্রসারে এ জেলায় বিশেষ অবদান রেখে গেছেন। আলিপুরদুয়ারের মহকুমা শাসক ম্যাক উইলিয়াম সাহেব শিক্ষানুরাগী ছিলেন। তাঁর নামে নামাঙ্কিত আলিপুরদুয়ারের খ্যাতনামা স্কুলটি তার সাক্ষ্য বহন করছে। অধুনালুপ্ত বি.ডি. আর রেল হেডকোয়ার্টার ছিল দোমহনীতে। রেলের জেনারেল ম্যানেজার পলহোয়েল সাহেবের নামে এখানে ১৮৯২ সালে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এটি জেলার প্রথম রেলওয়ে বিদ্যালয়।

এ জেলায় বেশ কিছু হিন্দি মাধ্যম বিদ্যালয় রয়েছে। জলপাইগুড়ি হিন্দি স্কুল, মাড়োয়ারি বালিকা বিদ্যালয়, আলিপুরদুয়ার হিন্দি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, আদর্শ বিদ্যামন্দির, ওদলাবাড়ি, চামুর্চি ভারতীয় পাঠশালা হাইস্কুল, কালচিনি হিন্দি হাইস্কুল, হাসিমারা হিন্দি হাইস্কুল, বীরপাড়া শ্রী মহাবীর হিন্দি হাইস্কুল শ্রীলাল বাহাদুর শাস্ত্রী স্মারক বেঙ্গলি-হিন্দি হাইস্কুল। বাংলা স্কুলগুলির পাশাপাশি এই বিদ্যালয়গুলিও শিক্ষা প্রসারে ভূমিকা পালন করে চলেছে। এখানে উল্লেখযোগ্য স্কুলগুলির কথা বলা হলেও অনুরূপ বিদ্যালয় আরও রয়েছে।

ধূপগুড়ি এলাকায় আশ্রম পরিচালিত দুটি বিদ্যালয় রয়েছে। বিদ্যাশ্রম দিব্যজ্যোতি হাইস্কুল। গান্ধী স্মারক নিধি পরিচালিত বিদ্যালয়টি সুনামের সঙ্গে চলছে। নাথুয়াহাট সরকার সাহায্য আশ্রমিক হাইস্কুল আবাসিক হওয়ায় অনাথ দুঃস্থ ছাত্রদের শিক্ষাগ্রহণের সুবিধা এনে দিয়েছে।

এ জেলায় মাদ্রাসা স্থাপনের একটা ইতিহাসও রয়েছে। এগুলিকে দেশজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা হলেও এগুলি বর্তমান সিলেবাসের আনুকূল্যে সর্বশ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছে। ধূপগুড়ির গাদং সিনিয়ার মাদ্রাসা (আবাসিক), বাঙ্গালি বাজনায় খিদিরপুর রহমানিয়া হাই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা হয় যে সময়ে তখন এখানে শিক্ষার আলো ততটা প্রবেশ করেনি। কাজেই ধর্ম দৃষ্টি নয়, শিক্ষাপ্রসারের ঔদার্য নিয়েই এর প্রতিষ্ঠা হয়। ফালাকাটায় বাদাইটারী উজিরিয়া মাদ্রাসা একটি উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। পরীক্ষার ফলাফল সাংস্কৃতিক চর্চা প্রভৃতিতে এর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে।

জলপাইগুড়ি জেলার মাদারীহাট থানায় টোটোপাড়া গ্রামটি অবস্থিত। পশ্চিমবঙ্গের সব থেকে ক্ষুদ্র জনজাতি টোটো সম্প্রদায়ের বাসভূমি এই গ্রাম। এখানে প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ একটি জুনিয়র হাইস্কুল রয়েছে। টোটো সম্প্রদায়ের নেতা প্রখ্যাত ধনপতি টোটোর নামানুসারে বিদ্যালয়টির নামকরণ হয়েছে।

বিভিন্ন জনজাতি অধ্যুষিত এই জেলার বৈচিত্র্য যেমন রয়েছে তেমনি এলাকার মানুষের মধ্যে সম্প্রীতির বাতাবরণও অনেক দৃঢ়। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়ার মধ্যে একটি মেলবন্ধন ও আশ্চর্য সহনশীলতা লক্ষ করা যায়। ফালাকাটা ব্লকের একটি বিদ্যালয়ের নাম বীরসা বিদ্যাভবন। সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতা তথা ধর্মগুরুর নামে বিদ্যালয়টি মানুষকে মনে করিয়ে দেয় আদিবাসী মানুষের গৌরব স্মরণ কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার নামে সিধাবাড়ী বিদ্যালয়টি মহৎ ব্যক্তিত্বের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা প্রকাশের মহিমাকেই তুলে ধরে।

বিভিন্ন জনজাতি অধ্যুষিত এই জেলার বৈচিত্র্য যেমন রয়েছে তেমনি এলাকার মানুষের মধ্যে সম্প্রীতির বাতাবরণও অনেক দৃঢ়। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়ার মধ্যে একটি মেলবন্ধন ও আশ্চর্য সহনশীলতা লক্ষ করা যায়। ফালাকাটা ব্লকের একটি বিদ্যালয়ের নাম বীরসা বিদ্যাভবন। সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতা তথা ধর্মগুরুর নামে বিদ্যালয়টি মানুষকে মনে করিয়ে দেয় আদিবাসী মানুষের গৌরব স্মরণ কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার নামে সিধাবাড়ী বিদ্যালয়টি মহৎ ব্যক্তিত্বের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা প্রকাশের মহিমাকেই তুলে ধরে।

জলপাইগুড়ি জেলার ভৌগোলিক পরিমণ্ডলটি ভিন্নতর। একদিকে শৈলশ্রেণীর প্রসার, অরণ্যঘেরা অঞ্চল। বর্ষায় খরস্রোতা নদীর উদ্দাম প্রবাহ। এরই মধ্যে জনপদগুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। বন্যায় সেগুলি ভাঙে গড়ে। নদীর সঙ্গে কানামাছি খেলে মানুষেব দিন কাটে। তবু শিক্ষাপ্রসারের মধ্য দিয়ে এইসব জনপদ নিবিড় ঐক্য বন্ধনে বাঁধা পড়েছে। বিভিন্ন জনজাতির বাংলাদেশ থেকে আসা ঘরের ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে বসে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'শিশুশিক্ষা' থেকে আধুনিককালের ছড়ার ছবিতে বর্ণপরিচয়ের প্রথম পাঠ নিয়ে চলেছে। এখানে কখনও ভাষা নিয়ে প্রশ্ন ওঠেনি।

'যখন সকালে
নতুন শিক্ষার্থী লেখে তার বাল্যশিক্ষার অক্ষর
কাননে কুসুম কলি ফোটে,—'

এমনি করেই শাল-সেগুনের অরণ্য ঘেরা জনবসতিগুলিতে কুসুমকলি ফোটা ভোর রোজ হয়।

অনেক তথ্যই সংগ্রহের কারণে বাদ থেকে গেল। কোথাও 'অনাদি অতীতের' নীরবতার কাছে হার মানতে হয়েছে। এ অপূর্ণতার জন্য ক্ষমা চাচ্ছি। লেখক হিসেবে সীমাবদ্ধতা স্বীকার করছি। জলপাইগুড়ি জেলার শিক্ষাবিস্তারের চালচিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে এখানে শুধু বিশিষ্ট ও বৈচিত্র্যপূর্ণ অগ্রগমনকেই তুলে ধরতে চেয়েছি। তাই অসংখ্য মানুষের অসংখ্য প্রয়াস কত প্রতিষ্ঠান গড়ার পিছনে রয়েছে স্বল্প পরিসরে তার উল্লেখ করা সম্ভব হল না। পূর্বতন শিক্ষা রিপোর্ট অনুসারে এখানে একটি পরিসংখ্যান দেওয়া হল। এর সঙ্গে বর্তমান রিপোর্টের সংখ্যা যোগ হলে পরিসংখ্যানটি পূর্ণতা পাবে। জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয় (১৯৯৪ পর্যন্ত) রয়েছে ১৯১২টি। জুনিয়ার হাইস্কুল ৮৪টি, মাধ্যমিক স্কুল ১৩৬টি, উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল ৩৫টি। ১৯৯৪ সালের পর এগুলো সবই বৃদ্ধি পেয়েছে।

লেখক ❑ শিক্ষক আন্দোলনের নেতা, গল্পকার ও প্রাবন্ধিক

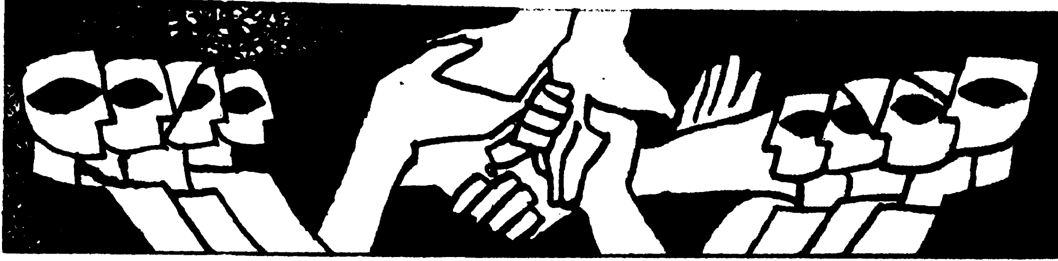
সাহায্য নিয়েছি : 'কিরাতভূমি' জলপাইগুড়ি সংখ্যা ড. চারুচন্দ্র সান্যাল, আলাপচারিতা।

---

* হালুয়া = কৃষিজীবী, কেল্লা দুব্বা = কচি ঘাস, আগাছা, ফেনা = বন্যার ফেনিল জলরাশি, বিধুয়া = বিধবা, টেনা = ছিন্ন জীর্ণ পুরনো কাপড়ের টুকরো।



জলপাইগুড়ি প্রসন্নদেব মহিলা মহাবিদ্যালয় — ছবি : শৌভিক ঘোষ



কল্যাণী দাশগুপ্ত

নারী শিক্ষা ও নারী আন্দোলন

শিক্ষা' তথা 'শিক্ষিতা' আমরা প্রধানত দুইভাবে পেয়ে থাকি। প্রথমত নানা পঠনপাঠনের মাধ্যমে শিক্ষিতা, যেমন প্রয়াতা প্রধানা শিক্ষিকা সুনীতিবালা চন্দ, এম এ, সরস্বতী। দ্বিতীয়ত জীবনের নানা বৈচিত্র্যের মাধ্যমে বাস্তব অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ে শিক্ষিতা— যেমন সুন্দরদিঘির একেবারেই নিরক্ষর বুড়িমা। দুজনকেই খুব কাছ থেকে অনেক দিন ধরে দেখেছি, বুঝেছি শিক্ষা বলতে কী বোঝায়। কিন্তু যেহেতু গতানুগতিক বই পড়ে যা শেখা যায় তাকেই বলা হয় শিক্ষা, তাই জেলার সেই হিসেবটাই লিপিবদ্ধ করতে চেষ্টা করছি।

জলপাইগুড়িতে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে (২১ মাঘ ১৩৪৫/ফেব্রুয়ারি ৩৯) পঠিত মাননীয় চারুচন্দ্রের অভিভাষণ থেকে জানা যায় যে "এ জেলায় শিক্ষিতের সংখ্যা অতি অল্প। শতকরা ৮ জন লিখিতে পড়িতে জানে এবং স্ত্রীলোক শতকরা ১ জন লিখিতে পড়িতে জানে"। অনুমান করি, এই পরিস্থিতি জলপাইগুড়ি জেলার পত্তনকালে অর্থাৎ ১ জানুয়ারি ১৮৬৯। ১৮৯৪ সনের জেলা বোর্ডের এক মন্তব্যে জানা যায় যে "জেলার বালিকাদের জন্য ১৮৮৮ সনে যে দুটি বিদ্যালয়কে তাহারা অনুদান প্রদান করিতেন তন্মধ্যে একটি জলপাইগুড়ি শহরে অপরটি দেবীগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয়"। এই বিদ্যালয়টি জেলায় মেয়েদের জন্য প্রথম প্রাথমিক বিদ্যালয়। এছাড়া শহরে ১৮৭১ সনে গ্রন্থাগার-সহ একটি নর্মাল স্কুল ছিল। ধন্যবাদ সেই জালান দম্পতিকে যাঁদের আগ্রহাতিশয্যে এবং শ্রদ্ধেয় শরৎ পণ্ডিতের সহযোগিতায় এই প্রচেষ্টার শুরু। ছোট্ট একটু সম্ভাবনা। যেন মুঠিভরা শঙ্খের মধ্যে সমুদ্রের কলরোল। ভাবতে বিস্ময় বোধ করি কেমন করে ওই জাতে মুসলমান, ধর্মে ব্রাহ্ম দম্পতি এ রকম একটা বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত নিলেন জলপাইগুড়ির মতো অনগ্রসর শহরে। এমনকি শ্রীমতী জালান শিক্ষিকার কাজও কিছুদিন করেছিলেন। এটি পরে ১৮৭৮ সনে সদর মধ্য বাংলা স্কুলে



জলপাইগুড়ি রাষ্ট্রীয় উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় *ছবি : শৌভিক ঘোষ*

রূপান্তরিত হয়, ১৯১০-এ উচ্চ প্রাইমারিতে, ১৯২০-তে এম ভি স্ট্যান্ডার্ডে, ১৯২৩-এ এম ই স্কুলে পরিণত হয়। অবশেষে ১৯২৫-এর ২৮ জুন বর্তমানের উচ্চ ইংরাজি স্কুলের রূপ পরিগ্রহ করে। এর ভার নিলেন সুনীতিবালা এবং দেবেন্দ্রচন্দ্র চন্দ। এই দম্পতির এখানে আসাকে আসা না বলে আবির্ভাব বললেই সঠিক বলা হয়। এই সদর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় সমস্ত উত্তরবঙ্গের স্ত্রীশিক্ষার দিশারী রূপে ১৩০ বছর অতিক্রম করেছে। এই ক্রমবিবর্তনে কোচবিহারের সুনীতিদেবীর অবদান উল্লেখযোগ্য।

এই স্কুলের সমসাময়িক আরও কতগুলিতে মেয়েরাও পড়ছে—এমন স্কুল ছিল শহরের বাইরে। বোদাপাট গ্রামে ১৮৯২ সালে গুয়াগ্রাম প্রাইমারি স্কুল, চন্দনবাটিতে এম ই স্কুল ছিল ১৯১৫-১৬ সালে, জটেশ্বরে লোয়ার প্রাইমারি স্কুল ছিল ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য। ১৯৮৮ তে দেবীগঞ্জে একটি বালিকা বিদ্যালয় ছিল, ১৯৯৬ সালে জোড়পাকড়িতে এম ভি স্কুলে ছোট ছেলেদের সঙ্গে মেয়েরাও পড়ত। মেটেলিতে ১৯২০ সালে স্থাপিত প্রাইমারি স্কুলটি বর্তমানে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়, যেখানে সহ শিক্ষার ব্যবস্থা। এ সবই ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের কাগজপত্র থেকে প্রয়াতা সুনীতিবালা সংগ্রহ করেছিলেন। আরও কয়েক বছর পেরিয়ে দেখা যায় ১৯২৭ সনে দোমহনী পল হোয়েল এইচ ই স্কুলে সহ-শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। মেয়েদের জন্য অপর মধ্য ইংরাজি স্কুলটি ছিল আলিপুরদুয়ার শহরে ১৯৩৭-৩৮ সনে। কিছু বিপর্যয়ের শেষে ৪৬ সনে মধ্য ইংরাজি স্কুলে পরিণত হয়। বছর দশেক পরে উচ্চ ইংরাজি স্কুলের স্বীকৃতি লাভ করে। বেলাকোবা উচ্চ বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয় ১৯৪৩ সনে ; ৫৭ সন থেকে সহ-শিক্ষার প্রচলন হয় ; ৬০ সনে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়েছে। রাজগঞ্জের মহেন্দ্রনাথ উচ্চ বিদ্যালয়টি হয় ৫১ সালে, এখানেও সহ-শিক্ষার ব্যবস্থা, সন্ন্যাসীকাটা জুনিয়ার হাইস্কুল, নিউ জলপাইগুড়ি জুনিয়ার হাইস্কুল, রানীনগরের যশোধরা জুনিয়ার হাইস্কুল, সর্বত্রই সহ-শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। এছাড়াও মণ্ডলঘাট, গড়ালবাড়ি, খারিজা বেরুবাড়ি, ঘুঘুডাঙা প্রভৃতি স্থানে উচ্চ বিদ্যালয় রয়েছে।

পুনরায় শহরের বালিকা বিদ্যালয়গুলিতে আসা যাক—সে যুগে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি স্ত্রী শিক্ষার মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে। শহরের বিদ্যালয়গুলি সাল হিসাবে লিপিবদ্ধ করছি—১৮৮৫-তে পাহাড়িপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় হল—করল মহম্মদ জান হক চৌধুরী। মুসলমান সমাজও নারী শিক্ষায় আগ্রহী ছিলেন সে যুগেও। সমাজের অবহেলিত শ্রেণীর ছেলেমেয়েরাই এতে অধিক সংখ্যায় পড়ত। যতদূর খবর সংগ্রহ করতে পেরেছি—এটিই প্রথম প্রাথমিক স্কুল শহরের। রাজবাড়ির জগদিশ্বরী পাঠশালাটিও একই সময়ে প্রতিষ্ঠিত হলেও ১৯৪২ সনের ঝড়ে পাঠশালার ঘরটি উড়ে যাবার পর আর গড়ে ওঠেনি। আজিজুল হক সাহেব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আদরপাড়া প্রাইমারি স্কুলটির শতবর্ষ পূর্ণ হয়ে গেল, হল সাবেরিয়া যোগমায়া, জুনিয়ার হাই, সদাগর পট্টি, মারোয়াড়ি বালিকা বিদ্যালয়। ১৯২৬ সনে উমাগতি রায়ের বদান্যতায় রায়কত পাড়ায় স্থাপিত হল উমাগতি বিদ্যামন্দির। ১৯২৮ সনে প্রয়াত মধুসূদন রায়ের বাইরের ঘরে ছোট্ট একটি পাঠশালা স্থাপিত হলো ১০/১২টি মেয়ে নিয়ে—কন্যা বিমলা রায় ও অনুপমা দেবীর (প্রীতিনিধান রায়ের দিদি) উদ্যোগে, তাঁরাই পড়াতেন। সেটি ক্রমে উচ্চ প্রাইমারি, এম ভি, ১৯৩৯ সনে এম ই, ৫৭ সনে স্কুল ফাইনাল এবং ৬৫ সনে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় হল—নাম হল কদমতলা বালিকা বিদ্যালয়। প্রাইমারি অবস্থা থেকে উচ্চতর শিক্ষার ক্রমবিবর্তনে আরও অনেক স্কুলের নাম যুক্ত হতে শুরু হল। ১৯৪৮ সালে নুরমঞ্জিলে রাষ্ট্রীয় বালিকা বিদ্যালয় (১৯৫০-এ ভারতী সেন দশম স্থান পেলেন ম্যাট্রিক পরীক্ষাতে), ৫৪-তে সেন্ট্রাল বালিকা বিদ্যালয়, প্রধানা শিক্ষিকা অনিমা দে-র মানসকন্যা সোনালী বালিকা বিদ্যালয় ১৯৫০-এ, বেগম ফয়জুন্নেসা, ১৯৫৬-তে দেশবন্ধু বালিকা বিদ্যালয়, ১৯৬০-এ অরবিন্দ মাধ্যমিক সহ-শিক্ষা সহ, ১৯৬১-তে দেবনগর কুমুদিনী বালিকা বিদ্যালয়, ১৯৪৮ সনে সতীশ লাহিড়ী মিউনিসিপ্যাল প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রভৃতি। অর্থাৎ শহরে একটা ঢেউ এসেছিল মেয়েদের লেখাপড়া শিখতে হবে-শেখাতে হবে—যার ফলশ্রুতিতে দেখা যায় শুধু শহরে নয় তার আশেপাশেও ছড়িয়ে পড়ল উন্নয়নের ঢেউ, গড়ে উঠল মোহিত নগর টি পি, দেবনগর সতীশ লাহিড়ী, তোড়লপাড়া নেতাজী, কালিয়াগঞ্জ উত্তমেশ্বর ইত্যাদি—এগুলি সবই সহ-শিক্ষার সুযোগ নিয়ে।

১৯৫৫ সাল থেকে জলপাইগুড়ি সমাজ কল্যাণ পর্ষদের শুরু। গ্রামসেবিকাদের মারফৎ গ্রামাঞ্চলে বালোয়ারী সমাজকল্যাণ, মাতৃমঙ্গল, বিভিন্ন ধরনের শিল্পশিক্ষায় মহিলা ও শিশুদের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। সৃষ্টি, শিক্ষা ও কুসংস্কার অপসারণের এক নব চেতনা নিয়ে কখনও ম্যাজিক লণ্ঠন, নাচ, গান, বক্তৃতার মাধ্যমে। রামকৃষ্ণ আশ্রমের উদ্যোগে ধাত্রীবিদ্যা শেখাবার ব্যবস্থা ছিল—এটাও

নারীশিক্ষার আর একদিক। মেয়েরা নার্সিং ট্রেনিং নিচ্ছে, ফার্মেসি ট্রেনিং নিচ্ছে ফার্মেসি ট্রেনিং সেন্টারে।

এবার বলি উচ্চ শিক্ষার কথা। অভিভাবকরা সচেতন হচ্ছেন—মেয়েরা আগ্রহী হচ্ছেন। ১৯৪২ সনে স্থাপিত হল "আনন্দচন্দ্র মহাবিদ্যালয়" সহ-শিক্ষার ব্যবস্থা সহ। ১৯৫১ সনে প্রতিমা বিশ্বাস এখান থেকেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাম্মানিক বিষয়ে প্রথম হলো। ১৯৫৮ সনে বাণিজ্য বিভাগ খোলা হয়। রাত্রে মেয়েরাও বি কম পড়ছেন। ইতিপূর্বে ১৯৫০ সনে "প্রসন্নদেব মহিলা মহাবিদ্যালয়" তৈরি হল রানী অশ্রুমতির অর্থানুকূল্যে। শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষক শিক্ষা মহাবিদ্যালয়ের প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছিল। এই প্রয়োজনের তাগিদে ১৯৫৮ সনে স্থাপিত হল "আনন্দচন্দ্র শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়"। শিক্ষক-শিক্ষিকা উভয়েরই সুযোগ সৃষ্টি হল। আরও ছিল ১৯১৪ সালেই শিক্ষক শিক্ষণ কেন্দ্র, ছোটবেলায় আমরা যাকে বলতাম গুরু ট্রেনিং স্কুল। মেয়েরা এখানে প্রবেশাধিকার পেয়েছিল ১৯৪৯ সনে। ১৯৫০/৫১ সনে এটি হল বেসিক ট্রেনিং স্কুল। ১৯৫৬ সনে জুনিয়ার বেসিক ট্রেনিং কলেজে রূপান্তরিত হল। সে সময়ে গোটা উত্তরবঙ্গে এটিই একমাত্র বেসিক ট্রেনিং কেন্দ্র ছিল। পরে আরও ২/৪টি এই কেন্দ্র গড়ে ওঠে। এসব ছাড়া—এই জেলায় কয়েকটি টোলও ছিল—যেখানে মেয়েরাও পড়াশুনো করত।

তিস্তাপারের জলপাইগুড়ি জেলায় বিস্তীর্ণ ডুয়ার্স অঞ্চল চা বাগিচা অঞ্চল। এক সময় এসব অঞ্চল শুধু দুর্গমই ছিল না—ছিল আক্ষরিক অর্থেই অন্ধকার। শিক্ষার প্রবেশাধিকার ছিল না। কিন্তু এ অবস্থাও বেশি দিন চলতে পারে না—দুরতিক্রম্য বাধা ঠেলে—জল-জোয়ারের প্রবাহে ওই অন্ধকার দূরে ঠেলে আপন তাগিদেই সেসব অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল নানা আন্দোলনের সঙ্গে—শেখবার, জানবার, গড়ার আন্দোলন, শিক্ষার আন্দোলন। তারা জেনেছিল—শিক্ষা আনে চেতনা, চেতনা আনে মুক্তি, সহস্র শোষণ থেকে মুক্তি। ফলে গড়ে উঠল চা-বাগিচা এলাকায় সহ শিক্ষার পুষ্ট স্কুলগুলি—যেমন, ওদলাবাড়ি ১৯৬০-এ, লাটাগুড়ি ১৯৬৫-তে, মালবাজার ১৯৫৯-এ, ডামডিমে ১৯৪৮-এ, চালসা ৬১-তে, নাগরাকাটায় ৫৮তে, চ্যাংমারিতে ১৯৫২ সনে হিন্দি ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হত। ধূপগুড়িতে গড়ে ওঠে ৪০ এ, বেরাতিগুড়িতে ৬৫ সনে, গয়েরকাটা ৬৫-তে, বানারহাট ১৯৪৯ সনে, ১৯৫২ সনে বীরপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়। এ সবই সুনীতিবালা চন্দের প্রবন্ধ থেকে গৃহীত। আরও বহু স্কুলের খবর পাওয়া যাচ্ছে যা স্থানাভাবে উল্লেখ করা যাচ্ছে না। অর্থাৎ এক কথায় বলা যায় ১৯৫০-৫৫ সন থেকেই মেয়েরা লেখাপড়ায় আকৃষ্ট হতে থাকে—শহরবাসী তাদের সমকালীন যুগের সঙ্গে পা মিলিয়ে স্ত্রী শিক্ষার প্রসারে এগিয়ে আসেন। এমন কি টোটোপাড়ায়ও ট্রাইব্যাল ওয়েলফেয়ারের উদ্যোগে স্কুল স্থাপিত হয়েছে।

খ্রিস্টান মিশনারিদের উদ্যোগে বিভিন্ন জায়গায় বহু শিক্ষা বিস্তারের প্রচেষ্টা দেখা যায়—যেখানে মেয়েরাও পড়বার সুযোগ পেয়েছে—যেখানে উপজাতি সমাজের মেয়েরাই প্রধানত ছাত্রী। ইংরাজী, হিন্দি উভয় ভাষাতেই শিক্ষা দেওয়া হয়। অধিকাংশ স্কুলই আবাসিক। মাদ্রাসা স্কুলও ছিল শহরে একটি, জেলায় একাধিক।

১৯২৭ সনে দোমহনী পল হোয়েল এইচ ই স্কুলে সহ-শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। মেয়েদের জন্য অপর মধ্য ইংরাজি স্কুলটি ছিল আলিপুরদুয়ার শহরে ১৯৩৭-৩৮ সনে। কিছু বিপর্যয়ের শেষে ৪৬ সনে মধ্য ইংরাজি স্কুলে পরিণত হয়। বছর দশেক পরে উচ্চ ইংরাজি স্কুলের স্বীকৃতি লাভ করে। বেলাকোবা উচ্চ বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয় ১৯৪৩ সনে; ৫৭ সন থেকে সহ-শিক্ষার প্রচলন হয়; ৬০ সনে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়েছে। রাজগঞ্জের মহেন্দ্রনাথ উচ্চ বিদ্যালয়টি হয় ৫১ সালে, এখানেও সহ-শিক্ষার ব্যবস্থা, সন্ন্যাসীকাটা জুনিয়ার হাইস্কুল, নিউ জলপাইগুড়ি জুনিয়ার হাইস্কুল, রানীনগরের যশোধরা জুনিয়ার হাইস্কুল, সর্বত্রই সহ-শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল।

নারী শিক্ষায় অগ্রণী কয়েকজন মহিলার নাম উল্লেখ করে—এই পর্ব শেষ করছি। আজকের মাতৃস্বরূপা সুনীতিবালা স্কুলের প্রথম ম্যাট্রিক উত্তীর্ণা (১৯২৮) ছাত্রীরা হলেন শ্রীযুক্তা শান্তি রায় (২০ টাকা জলপানি প্রাপ্ত), বীনা চন্দ ও বিমলা সেন। বীনা চন্দ প্রথম বি এ। জেলার আনন্দচন্দ্র কলেজ থেকে প্রথম বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণা সাধনা সেনগুপ্ত, অঞ্জনা সরকার, অনিমা নিয়োগী ও হেমলতা দত্ত। এই শহরের শ্রীমতী অরুণা দত্ত মেডিক্যাল কলেজ থেকে স্বর্ণপদক নিয়ে এম বি পাশ করেন। আশা গঙ্গোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে ও মঞ্জুলা রায় বিজ্ঞানে ডক্টরেট করেছেন। লেখিকা হিসেবে মঞ্জুলিকা দাশের নাম উল্লেখ্য। জেলার প্রথম আইনজীবী দীপ্তিকণা বসু, আলিপুরদুয়ার থেকে কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায় প্রথম এম এস সি। দুর্গম হিমালয় ভ্রমণে ভক্তি বিশ্বাস অগ্রণী—তাঁর নামও উল্লেখ করি।

মেয়েদের লেখাপড়া শেখার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে—পুরুষরা শিক্ষিত হলে সেটা মূলত তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, কিন্তু একটি পরিবারের মা যখন শিক্ষিতা হল—তার প্রকাশ ছড়িয়ে পড়ে গোটা সংসারেই, মা শুধু জন্ম দিয়েই সন্তান বড় করেন না—শিক্ষা

দিয়েও পুষ্ট করেন। নারীরা অর্ধেক আকাশ—তাই মুক্তি আন্দোলনের অঙ্গনে তাদের বিচরণ, কতটা প্রসারী দেখা উচিত। কিন্তু নিশ্চয়ই এই ফিরে দেখা সম্পূর্ণ নয়—আমার অক্ষমতা যাঁদের সর্বসমক্ষে উন্মুক্ত করতে পারল না—তাঁদের সকলের স্মৃতিতে শ্রদ্ধা ও ক্ষমা প্রার্থনা নিবেদন করে স্মরণ করি তাঁদের—যাঁদের কথায় স্মৃতি ও শ্রুতিই আমার অবলম্বন।

প্রথমেই মনে পড়ে প্রয়াতা সুভাষিনী ঘোষের কথা যিনি সেকালের শহরের মহিলাদের রাজনৈতিক গুপ্ত সমিতির ও সেবামূলক আন্দোলনের জননীস্বরূপা। ১৯০৫ সাল থেকেই তাঁর স্বদেশী আন্দোলনের শুরু—শেষ জীবনের বার্ধক্য পর্যন্ত। ইনি কংগ্রেস মহিলা সমিতির প্রথম সভানেত্রী। এঁরই ঘনিষ্ঠ সহকারী প্রয়াতা হেমপ্রভা চন্দ। ইনি স্ত্রী শিক্ষার প্রচারে বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন। ১৯২৭-২৮ সাল নাগাদ নিজগৃহে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের একটা স্কুলও করেছিলেন। প্রয়াতা সুনীতি নিয়োগী অতি পরিচিত নিয়োগীবাড়ীর মেয়ে—১৯২১ সন থেকেই চরকা কাটা, মহিলা সমিতি করা ও সেবামূলক নানা কাজে অংশ নিতেন। ১৯৩৯ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলনে মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকাদের অধিনায়িকা ছিলেন। এর সঙ্গে আরও অনেকের সঙ্গে রায়কত পাড়ার পবিত্রা সরকারও ছিলেন—যিনি পরে অনেক গুপ্ত আন্দোলনেও অংশগ্রহণ করেন, সুভাষিনী ঘোষের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূর সঙ্গে। রায়কত পাড়ার বালবিধবা "বিজ্ঞানী দেবী"—একটি সুপরিচিত নাম। প্রাচীনপন্থী পরিবারের কন্যা হলেও সুভাষিনীদের অনুগামিনী ছিলেন। নানারকম হাতের কাজ, চরকা কাটা প্রভৃতি শিক্ষা দিতেন, মেয়েদের স্বাবলম্বন শিক্ষাও দিতেন এবং পিতার প্রতিষ্ঠিত স্কুল উমাগতি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতাও করতেন। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির জন্মলগ্ন থেকেই তিনি এই সমিতির পৃষ্ঠপোষক এবং কর্মী ছিলেন। অধুনা বিখ্যাত বামপন্থী নেত্রী কনক দাশগুপ্ত (মুখার্জি) জলপাইগুড়ি এলে (১৯৪৩ সনে) ওঁর গৃহেই স্থান নিতেন। এঁদের পূর্বসূরী যাঁরা ছিলেন (১৯০০-০৬ সাল) তাঁদের মধ্যে অন্যতমা শ্রদ্ধেয় প্রীতিনিধান রায়ের মাতা যিনি নারীদের মধ্যে কল্যাণমূলক কাজের প্রেরণাদাত্রী ছিলেন। উষা রায়ও নানা রকম নারী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বাগচী বাড়ীর সৌদামিনী দেবী, বাসন্তী দেবীর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে সাহায্য তুলেছেন, নিজ হাতে চরকা কাটতেন, তাঁত বুনতেন। এঁর সঙ্গে ছিলেন হেমলতাদেবী, জুড়ানী ঠাকুর প্রভৃতি। এবারে—মুসলিম মহিলাদের সংবাদ যেটুকু সংগ্রহ করতে পেরেছি—১৯১৪ সাল আন্দাজ সময়ে বেগম সাহেবা রহিমান্নেসা তৎকালীন মুসলিম মহিলা অগ্রণী বলে বিবেচিত হতেন। নানাভাবে বিপ্লবীদের সাহায্যও করতেন তিনি। লুৎফর রহমান সাহেবের স্ত্রীর নামও উল্লেখযোগ্য।

এল ১৯৩০। স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ারে ঝাঁপিয়ে পড়লেন অনেকেই। কারাবরণ করলেন হীরাপ্রভা সেন, ডাঃ সুধীর বসুর পিসিমা শৈলবালা ঘোষ, চারুচন্দ্র সান্যালের ভগিনী মহামায়াদেবী ও ইন্দুমতী দেবী রাজসাহী জেলে। অরুণা দাশগুপ্তও কলকাতায় কারাবরণ করলেন। মহিলা আন্দোলনে অরুণা দাশগুপ্ত একটি বিশেষ নাম, ১৯২৭-এ তিনি এখানে আসেন। ১৯৩২ সালে কংগ্রেস ও গুপ্ত আন্দোলনের কাজে যে মহিলা এগিয়ে আসেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্যা মহেন্দ্রবালা দেবী, বীণা চৌধুরী, সরযূ সরকার, বাণী ভৌমিক, কুসুমকুমারী ভাদুড়ী, শ্রীযুক্তা মৌলিক। অপ্রকাশ্যে আরও অনেকেই ছিলেন যাঁদের প্রত্যক্ষ সাহায্য ছাড়া সেকালের সেই বিপ্লবীরা সক্রিয় থাকতে পারত না। আর, আমি যাঁদের সব ইতিহাস সংগ্রহ করতে পারলাম না তাঁদের কাছে ঋণী হয়ে রইলাম।

এবার জেলার শহরাঞ্চলের বাইরের এলাকার কথা কিছু উল্লেখ করা যাচ্ছে। দোমহনীতে রেল শ্রমিক নেতা প্রখ্যাত বিমল দাশগুপ্তের মা তৎকালীন গোপন আন্দোলনের বিশেষ সহায়িকা ছিলেন। তাঁর মেয়ে শান্তি ১৯৪৯ সনে কমিউনিস্ট কর্মী হিসাবে কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। বোদার সবিতা নন্দী ৪২-এর আন্দোলনে ধৃত হন। প্রয়াত নির্মল চৌধুরীর সংগ্রহশালা থেকে জানা যায় যে "আলিপুরদুয়ারের অশোকা মুখার্জী, কমলা মুখার্জী, কমলা পাকড়াশী, শশীমুখি গাঙ্গুলী, সুরবালা গাঙ্গুলী, গিরিবালা ব্যানার্জী, জ্ঞানদা বৈষ্ণবী ১৯৪২ সালের আন্দোলনে আলিপুরদুয়ারের অন্যতমা নেত্রী ছিলেন। ফালাকাটা, মাদারিহাট ও কুমারগ্রামেও ৪২-এর আন্দোলনে অনেক মহিলা সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন। এখানেই উল্লেখ করে রাখি তাঁদের কথা যাঁদের আমরা পতিতা বলে অপাংক্তেয় করে রেখেছি। সেই সব মেয়েরাও দেশবন্ধু ও মহাত্মাজি যখন এখানে আসেন তখন দু দফায় একখানি গিনি, বেশ বড় বড় দুটি টাকার তোড়া, এবং কয়েক মন চাল দেশের কাজের জন্য তাঁদের পায়ে নিবেদন করেন।

(দেশবন্ধু স্মৃতি : হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত।)



পঁচাত্তর বছর অতিক্রান্ত সুনীতিবালা সদর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়   *ছবি : শৌভিক ঘোষ*

এবারে আন্দোলনের আর একটি ধারায় পটোত্তলন করা যাক। প্রথমেই পরম শ্রদ্ধায় স্মরণ করি সুনীতিবালা চন্দকে। শহরের নারী জাগরণ ও স্ত্রী শিক্ষার জননীস্বরূপা। নিঃ ভাঃ মহিলা সমিতির সদস্যা সমাজ কল্যাণ পর্ষদ রেডক্রশ কালচারাল ইনস্টিটিউটের সভা ৬২ সালে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রাপ্তা উত্তরবঙ্গের প্রাচীনতম বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষিকা এমনকি কমিউনিস্ট বলে অভিহিত মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি ও পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতির অন্যতম প্রধান যাঁকে আমরা সবাই বলি বড়দিদিমনি। প্রয়াতা অরুণা দাশগুপ্তের কথা আগেও বলেছি—শিক্ষা ও স্বাধীনতার আন্দোলনে তিনিও পথ প্রদর্শিকা। এখানে আর একটি সংগ্রামী জীবনের কথা বলে রাখি— তিনি হলেন আশা চৌধুরী। খুব অল্প বয়সেই সে গোপনে কমিউনিস্ট পার্টির স্টাডি সার্কেলের সম্পর্কে আসে। ১৯৩৯-৪০ সালেই মিছিল এমনকি জনসভায় বক্তব্য রাখার সাহসও দেখিয়েছিলেন। ১৯৩৫ সালের জুন মাসে কলকাতায়, আন্দামান বন্দীমুক্তি আন্দোলন তখন তুঙ্গে, সেই জোয়ারের মিছিলে পুলিশের কর্ডন ভেদ করার 'অপরাধে' আরও ১৯টি মহিলার সঙ্গে ধৃত হন এই শহরের উমা চন্দ ও কল্যাণী চন্দ। নানাধরনের সেবামূলক কাজ যেমন রেডক্রশ ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কিরণ রায়। গ্রামে ও শহরে শিশু ও নারী কল্যাণের জন্য নিরলস প্রচেষ্টায় সন্ধ্যা করের দান অনস্বীকার্য। নেপালি মহিলাদের মধ্যেও স্বদেশিয়ানার প্রকাশ দেখা গিয়েছিল— ১৯৩০ সনে শৈলবালা আইন অমান্য করে কারাবরণ করেছিলেন।



পঞ্চাশ বছর অতিক্রান্ত প্রসন্নদেব মহিলা মহাবিদ্যালয়　　ছবি : শৌভিক ঘোষ

এল ১৯৪১-৪২ সন, এল যুদ্ধ ও মন্বন্তরের তীব্র আঘাত, এল 'ভারত ছাড়ো'র আহ্বান। সারা গ্রাম শহর জুড়ে নানা ধরনের কর্মপ্রবাহ। নতুন ভাবধারা নিয়ে জন্ম নিল মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি, বহু কর্মসূচির তালিকা নিয়ে। নামেই এই সংগঠনের পরিচয়। আত্মরক্ষা অর্থাৎ স্বাবলম্বনের পথ দেখালেন, দুর্ভিক্ষের মোকাবিলা করা—আত্মসম্মান রক্ষার লড়াই, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী স্লোগান রইল সর্বাগ্রে। এই সমিতিই প্রথম একটি মহিলা গণ সংগঠনের রূপ নিল। পুরোভাগে রইল কল্যাণী দাশগুপ্ত, কল্পনা নিয়োগী, অমিয়া নন্দী। মাথার উপরে আশ্রয় হিসেবে রইলেন ব্রজকিশোরী কুণ্ডু, মৃণালিনী তলাপাত্র, আরও অনেক বয়স্ক মহিলারা। এই সমিতির শাখা প্রশাখা ছড়িয়ে পড়েছিল গ্রামাঞ্চলে, চা-বাগান অঞ্চলে, ডুয়ার্সেরও বিভিন্ন জায়গায়। সুন্দরদিঘি অঞ্চলে ছিলেন আমাদের সবার বুড়িমা একজন নিরক্ষর রাজবংশী মহিলা। এই মহিলার চরিত্রের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য সে যুগের সকলের কাছে আদর্শ স্থল ছিল। এই পুণ্যেশ্বরী বর্মনই তেভাগা আন্দোলনে ওই অঞ্চলের নেত্রী। উজানী, মাকড়ি, বৈদ্য এরই শিষ্যা। আর ছিলেন পচাগরের দিদি তিলকতারিণী নন্দী, কন্যা সবিতা পাল তেভাগার জঙ্গী নেত্রী। ১৯৪২-এর আন্দোলনে ছাত্রীদের

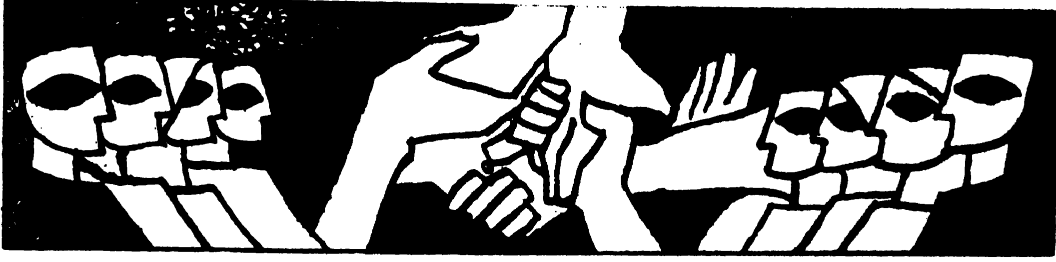
এবার কুলি উচ্চ শিক্ষার কথা। অভিভাবকরা সচেতন হচ্ছেন—মেয়েরা আগ্রহী হচ্ছেন। ১৯৪২ সনে স্থাপিত হল "আনন্দচন্দ্র মহাবিদ্যালয়" সহ-শিক্ষার ব্যবস্থা সহ। ১৯৫১ সনে প্রতিমা বিশ্বাস এখান থেকেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাম্মানিক বিষয়ে প্রথম হলেন। ১৯৫৮ সনে বাণিজ্য বিভাগ খোলা হয়। রাত্রে মেয়েরাও বি কম পড়ছেন। ইতিপূর্বে ১৯৫০ সনে "প্রসন্নদেব মহিলা মহাবিদ্যালয়" তৈরি হল রানী অশ্রুমতির অর্থানুকূল্যে। শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষক শিক্ষা মহাবিদ্যালয়ের প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছিল। এই প্রয়োজনের তাগিদে ১৯৫৮ সনে স্থাপিত হল "আনন্দচন্দ্র শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়"।

১৯৪২-এর আন্দোলনে ছাত্রীদের একটি বিরাট অংশ আগস্টের আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ৯ আগস্টের মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন তারা ব্যানার্জি, উমা দাশগুপ্ত প্রভৃতি। ৪৬-এ ফরোয়ার্ড ব্লকের সক্রিয় কর্মী ছিলেন অরুণা সান্যাল। এই বিশেষ প্রতিভাসম্পন্না অরুণা অকালেই মারা যায়। সুশীলা ঘোষ বোলপুরে ধৃত হন আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে যোগাযোগের অপরাধে। ডেঙ্গুয়াঝাড়ের মাইলী ছেত্রী—মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সদস্যা, কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থক শ্রমিক আন্দোলনের নেত্রী, ১৯৪৪ সনে পুষ্টিহীনতার শিকার হয়ে হাসপাতালে প্রাণত্যাগ করেন। ১৯৪৮ সনের মার্চ মাসে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতিকে বেআইনি ঘোষণা করা হয়।

একটি বিরাট অংশ আগস্টের আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ৯ আগস্টের মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন তারা ব্যানার্জি, উমা দাশগুপ্ত প্রভৃতি। ৪৬-এ ফরোয়ার্ড ব্লকের সক্রিয় কর্মী ছিলেন অরুণা সান্যাল। এই বিশেষ প্রতিভাসম্পন্না অরুণা অকালেই মারা যায়। সুশীলা ঘোষ বোলপুরে ধৃত হন আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে যোগাযোগের অপরাধে। ডেঙ্গুয়াঝাড়ের মাইলী ছেত্রী—মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সদস্যা, কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থক শ্রমিক আন্দোলনের নেত্রী, ১৯৪৪ সনে পুষ্টিহীনতার শিকার হয়ে হাসপাতালে প্রাণত্যাগ করেন। ১৯৪৮ সনের মার্চ মাসে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতিকে বেআইনি ঘোষণা করা হয়। তারপর ১৯৬০-এ শহরে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির অংশবিশেষ পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতি নামে আবার আত্মপ্রকাশ করেন। এর নেতৃত্বে রয়েছেন রাণু চক্রবর্তী, শোভা হোড়, আলো বসু, কল্যাণী দাশগুপ্ত প্রভৃতি। এই সমিতি কর্তৃক উত্তরবঙ্গের প্রথম মহিলা সমবায় সমিতি স্থাপিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতির অপর অংশ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি নামে পরিচিত। তার নেতৃত্বে বর্তমানে শচী সরকার, মিনতি সেন, রীতা মিত্র, জয়ন্তী চক্রবর্তী, নির্মলা মিত্র, মীরা নিয়োগী এবং আরও অনেক কর্মী মহিলাদের সর্বপ্রকার দাবির স্লোগান নিয়ে আন্দোলন করে থাকে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য জেলার তেভাগা আন্দোলন কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে। অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্গত সেকালের বোদা পচাগরের সুন্দরদিঘি অঞ্চলে অপূর্ব সাহসিকতা নিয়ে মেয়েরা পুলিসের মুখোমুখি হয়েছিল। কত যে অত্যাচারের মুখোমুখি হতে হয়েছিল মেয়েদের তার জন্য আলাদা এক অধ্যায় সৃষ্টি করা যায়। ডুয়ার্স পিছিয়ে থাকেনি। তেভাগা কায়েম করতে গিয়ে ১৯৪৭ সনের ১ মার্চ ও ৪ এপ্রিল চালসার গয়াবাড়ি অঞ্চলে খুনী দেওয়ানির খোলানে মাথাচুলকাইতে পুলিশের গুলিতে দুই দিনে প্রাণ দিল, ১৯ জনের সঙ্গে ৫ জন মহিলা ও একজন ১৩ বছরের কিশোর। আধিয়ার আন্দোলনের পরবর্তী তেভাগা আন্দোলন সমস্ত বাংলাদেশের কৃষক সমাজের এমন এক আন্দোলন যা আজকের ভূমিসংস্কারের মূল সূত্র বললেও অত্যুক্তি হয় না। এ আন্দোলনের জন্মভূমি জলপাইগুড়ি তথা আজকের উত্তরবঙ্গ। সেই উত্তাল জলতরঙ্গের প্রবাহে ইংরাজ সরকার পর্যন্ত ভীত, সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল ফসলের আন্দোলন নিয়ে শুরু হলেও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম এর অন্যতম চরিত্র ছিল। তাই বোদা পচাগর দেবীগঞ্জের কৃষক সমাজ এবং ডুয়ার্সের শ্রমিক কৃষক একই ঝাণ্ডার নিচে একই ধ্বনি নিয়ে এই সংগ্রাম শুরু করে যেখানে কৃষক শ্রমিক মহিলা সমাজ মিলিতভাবে মুখোমুখি হয়েছিল ইংরাজ পুলিশ বাহিনীর। ডুয়ার্সের এইসব আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন মদেশিয়া শিয়া ওঁরাওনী পেকো, ছোটন এবং আরও অনেকে। যমুনা ওঁরাওনী অত্যন্ত বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত নানা আন্দোলনের লড়াকু সৈনিক ছিলেন।

আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামোয় অনগ্রসর শহরের আরও পিছিয়ে থাকা মহিলাদের ছোট-বড় নানা সংগ্রামের ইতিহাস আজ সামান্য মনে হলেও সে যুগে এইগুলি কত যে সাহসিকতা এবং আন্তরিকতার প্রকাশ ছিল তা আজকে বোঝা শক্ত। কী নির্যাতন এই সব মহিলাদের সহ্য করতে হয়েছে—যেমন করেছে ভাগ্য মণ্ডল, সরযূদি, পেন্টুর মা এবং আরও অনেকের সঙ্গে সুমতিবালা দাশগুপ্তও। অশেষ নির্যাতন সত্ত্বেও এঁরা সবাই সমিতিকে কোনোদিনও ছেড়ে যাননি। এমনিধারা কত চরিত্রই যে নজরে এসেছে। আন্দোলন তো আজও অব্যাহত নব পর্যায়ে। ধীরে ধীরে আন্দোলনের ধারা বদলের সঙ্গে সঙ্গে জোয়ার এসেছে মহিলা আন্দোলনে, মহিলারা বুঝতে পারেন—অবরোধের অন্তরালে আর নয়। ভাতের হাঁড়ির মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে শোষণের যন্ত্র, আকাশ-ছোঁয়া দ্রব্যমূল্য, বেকারি, অর্জিত স্বাধীনতা বিক্রিত হবার আশঙ্কা, বিচ্ছিন্নতাবাদ প্রভৃতি নানা সংকটের মূল উৎপাটনে কর্মভারপীড়িতা মহিলা সমাজের দায়বদ্ধতা ক্রমবর্ধমান-বিশ্রামের নেই অবকাশ। নারী তার আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে স্বাধিকার প্রাপ্তির লড়াইতে আজও অক্লান্ত। আমি এ লড়াইয়ের একজন সৈনিক মাত্র। আমার তো বন্দরের কাল শেষ হয়ে এল। যাঁরা উহ্য রইলেন—যাঁরা তাঁদের বর্তমানকে উৎসর্গ করেছিলেন অনাগত ভবিষ্যৎকে সেই সব পূর্বসূরীদের সংগ্রাম ব্যর্থ হয়নি—তাঁরা রইলেন দিনের বেলার তারার মতো।

লেখক ❑ জেলার প্রগতিশীল নারী আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক ও প্রাবন্ধিক।



বীরেশ সিকদার

সাক্ষরতা আন্দোলনে জলপাইগুড়ি

'সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা'—সাক্ষর সমাজ গঠনের মূল শর্ত। তাই রাষ্ট্রসংঘের ডাকে ১৯৯০ সালটি পালিত হয়েছিল আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা বর্ষ হিসাবে। ধ্বনিত হয়েছিল ২০০০ সালের মধ্যে সকলের জন্য শিক্ষা। এর আগেও বিশ্বজুড়ে দেশে দেশে নিরক্ষরতা দূরীকরণের নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল, এখনও গ্রহণ করা হচ্ছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্তির পর বিভিন্ন দেশে সাক্ষরতার সংগ্রাম নতুন মাত্রা লাভ করে। ইউনেস্কো ঘোষণা করল—প্রথাগত শিক্ষার সঙ্গে প্রথাবহির্ভূত শিক্ষার ব্যবস্থা চলবে। একদিকে প্রথাগত শিক্ষার মাধ্যমে নিরক্ষরতার উৎসমুখ বন্ধ করা, অন্য দিকে প্রথাবহির্ভূত শিক্ষার মাধ্যমে নিরক্ষর মানুষকে সাক্ষর করা। ১৯৬৫ সালে ঘোষিত হলো ৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উদ্‌যাপন করা হবে। প্রতি বছর আমাদের দেশেও ৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উদ্‌যাপন করা হচ্ছে। কোথাও আনুষ্ঠানিক আবার কোথাও কার্যকর ভূমিকা পালন করা হয়।

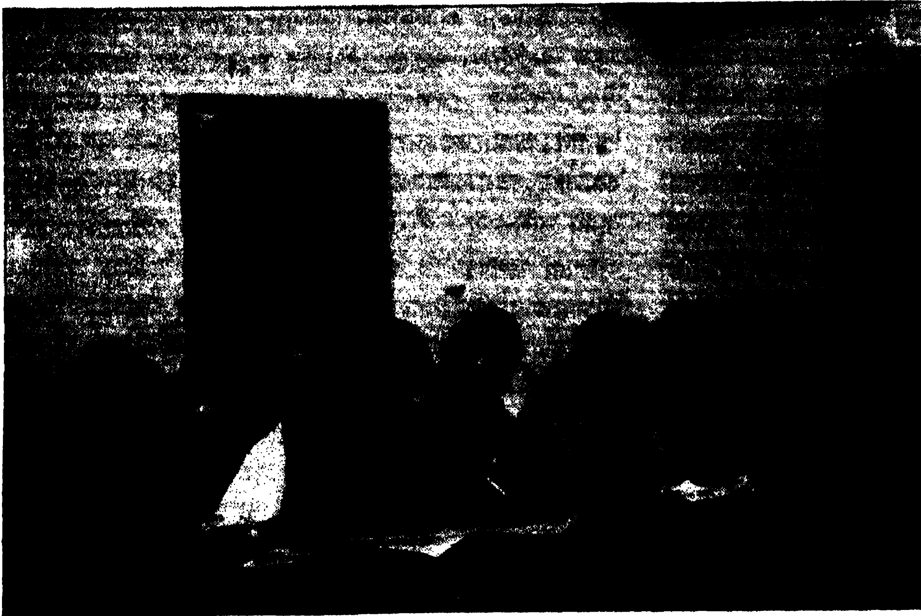
সাক্ষরতার আন্দোলন কোনও কোনও দেশে সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছে আবার ধনতান্ত্রিক-সামন্ততান্ত্রিক-ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে সাক্ষরতার আন্দোলন গুরুত্ব পায়নি। আমাদের দেশেও সরকারি বা বেসরকারিভাবে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হলেও তা কার্যকরী হয়নি। আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘকাল শিক্ষার বিষয়টি অবহেলিত ছিল। আশির দশক থেকে শিক্ষার বিষয়টি গুরুত্ব পেলেও সাক্ষরতার আন্দোলনে জেলাগতভাবে অসম বিকাশ রয়েছে। সাক্ষরতা আন্দোলনে গতি বাড়াতে ১৯৮৭ সালের ৮ সেপ্টেম্বর গঠিত হয় বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতি। জেলা সাক্ষরতা প্রসার সমিতির পরিপূরক একটি সংগঠন হিসাবে কাজ করছে বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতি। আমাদের জেলাতে এই সংগঠন সম্প্রতি গড়ে উঠেছে।

১৯৯৪ সালের ১২ জানুয়ারি ৯ থেকে ৪৫ বয়সী ৮ লক্ষ ১৮ হাজার ৬৮৮ জন নিরক্ষর মানুষকে সাক্ষর করার লক্ষ্যে আমাদের জেলায় ১৪৫০৮ টি কেন্দ্র চালু হয়। পড়ুয়ার

সাক্ষরতা আন্দোলনে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সামিল করেছেন জলপাইগুড়ি জেলা সাক্ষরতা প্রসার সমিতি

সংখ্যা ছিল ৫,৪৮,৯৫১। দেড় বছর পর ১৯৯৫ সালের ২১ জুন বহির্মূল্যায়নে অংশ নেন ৩,৩৩,৫৬৩ জন পড়ুয়া। সফল পড়ুয়ার সংখ্যা ২,০৪৩৫৬। সাক্ষরতার আন্দোলন যে উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে শুরু হয়েছিল বিভিন্ন কারণে সেই আন্দোলন ধরে রাখা যায়নি। আমাদের জেলায় সাক্ষরতার হার ৪৭% শতাংশ। এই হার আরো বাড়াতে হবে। আর এর জন্য এই মুহূর্তে আমাদের করণীয় কাজ হলো—গ্রাম সংসদভিত্তিক নিরক্ষর মানুষের সংখ্যাগত সাক্ষরতা কেন্দ্র ক-টি চলছে ও সাক্ষরোত্তর কর্মসূচির কাজ চলছে কিনা—প্রভৃতি সুনির্দিষ্ট তথ্য সংগ্রহ করা। পঞ্চায়েতি ব্যবস্থাকে এক্ষেত্রে কাজে লাগানো যেতে পারে। দুঃখের সঙ্গে উল্লেখ করতে হচ্ছে যে—শিক্ষাসংক্রান্ত বা সাক্ষরতার বিষয় আলোচ্যসূচিতে নির্দিষ্টভাবে না রেখে সাধারণভাবে বিধিবিষয় নিয়ে আলোচনার সময় কখনও কখনও সাক্ষরতার বিষয়ে আলোচনা হয়ে থাকে। আসলেই যথাযথ গুরুত্ব পাচ্ছে না। কাজটা কঠিন এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। বিনা পয়সার কাজ কতদিন করা যায় বা ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো প্রভৃতি নানাবিধ কথা শোনা যায়। আর এই কঠিন কাজটাই আমাদের করতে হবে—সকলকে উদ্বুদ্ধ করে একসঙ্গে চলতে হবে।

সাক্ষরতার ধারণাটা সকলের কাছে স্পষ্ট নয়। কেউ কেউ মনে করেন—কোনরকমে নিরক্ষর নামটি ঘোচানো। কেবলমাত্র নাম লিখতে পারাকে সাক্ষর বলা যাবে না। সাক্ষরতা সচেতনতা



সাক্ষরতা আন্দোলনে এগিয়ে এসেছেন মহিলারাও

সক্ষমতা এই তিনের সমাহার সাক্ষরতা আন্দোলন। আমরা তো স্বনির্ভর বিচারশীল মানুষ চাই। যে মানুষ বুঝবে ধর্মীয় উন্মাদনা, বিচ্ছিন্নতাবাদ, প্রাদেশিকতা, জাতিভেদের মাধ্যমে শ্রমজীবী মানুষের ঐক্যে ভাঙন তৈরি হচ্ছে। অন্ধ বিশ্বাসের শিকার হবেন না। শ্রেণীশোষণটা বুঝবেন। ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, বুঝবেন। শত্রু-মিত্র চিনবেন। এ ক্ষেত্রে গণ-শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

গণশিক্ষার আন্দোলনের অভূতপূর্ব সাফল্য দেখিয়েছে—সোভিয়েত, চীন, ভিয়েতনাম, কিউবা প্রভৃতি দেশসমূহ। ভিয়েতনাম ১৯৫৪ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর ৪ বছরের মধ্যে পরিপূর্ণ সাক্ষর দেশ হিসাবে পরিণত হয়। ১৯৫৯ সালে কিউবা স্বাধীন হওয়ার পর মধ্যে ছবছরের মধ্যে ৯৬ শতাংশ মানুষকে সাক্ষর করে নতুন ইতিহাস তৈরি করে। আমাদের দেশের কেরল রাজ্য আমাদের সামনে নতুন আশার আলো জাগাতে পেরেছে। সাক্ষর রাজ্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। আর আমাদের রাজ্যের মেদিনীপুর, বর্ধমান জেলা, যদি সাক্ষরতা আন্দোলনে সাফল্য আনতে পারে তবে আমাদের জেলাই বা পিছিয়ে থাকবে কেন! আমাদের জেলায় বাড়তি সুবিধা হলো এ বছর থেকে এখানে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু হলো। নিরক্ষরতার উৎসমুখ বন্ধ করার ক্ষেত্রে এই কার্যক্রম সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করবে। তবে এই কাজে জনগণের অংশগ্রহণ অপরিহার্য

আর অপেক্ষা নয়, নতুন উদ্দীপনা নিয়ে কার্যকর ভূমিকা পালনের মধ্য দিয়ে সাক্ষরতা আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাই। আমাদের জেলাতে ছয় লক্ষাধিক নিরক্ষর মানুষকে সাক্ষর করার কাজে হাত লাগাই। সরকারি-বেসরকারি সংগঠন, স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সহ অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবীকে এই কাজে এগিয়ে আসতে হবে। আমরা যারা লেখাপড়া শিখেছি, তাদের দায়িত্ব নিরক্ষর মানুষদের লেখাপড়া শেখানো। নইলে কবির ভাষায় বলতে হয়—

সাক্ষরতার আন্দোলন যে উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে শুরু হয়েছিল বিভিন্ন কারণে সেই আন্দোলন ধরে রাখা যায়নি। আমাদের জেলায় সাক্ষরতার হার ৪৭% শতাংশ। এই হার আরো বাড়াতে হবে। আর এর জন্য এই মুহূর্তে আমাদের করণীয় কাজ হলো—গ্রাম সংসদভিত্তিক নিরক্ষর মানুষের সংখ্যাগত সাক্ষরতা কেন্দ্র ক-টি চলছে ও সাক্ষরোত্তর কর্মসূচির কাজ চলছে কিনা—প্রভৃতি সুনির্দিষ্ট তথ্য সংগ্রহ করা।

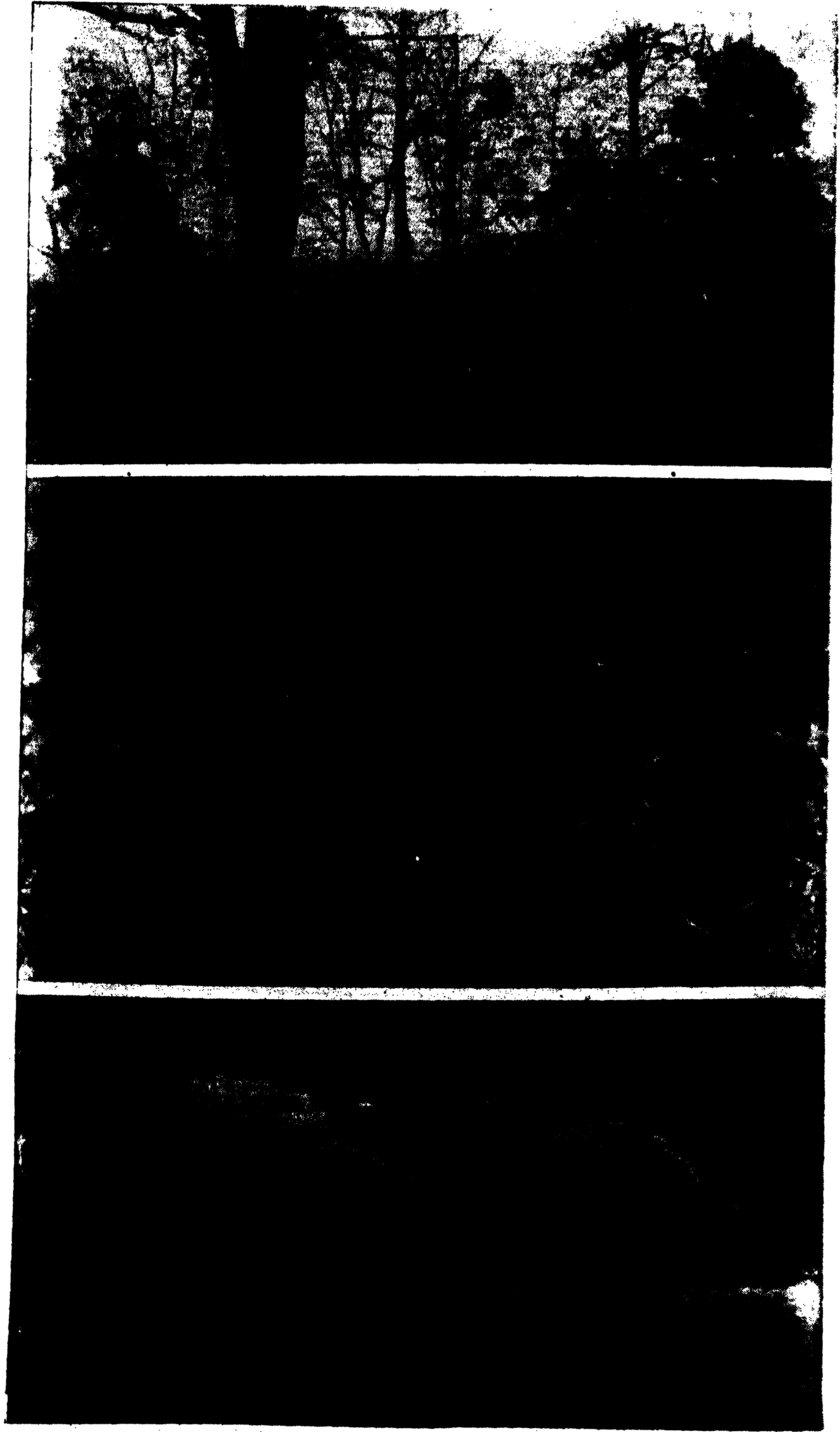
যারে তুমি নীচে ফেল
সে তোমাকে বাঁধিবে যে নীচে
পশ্চাতে রেখেছ যারে
সে তোমাকে পশ্চাতে টানিছে।

কবির কথা স্মরণে রেখে আমরা সবাই মিলে সাক্ষরতা আন্দোলনকে সফল করে তুলি।

লেখক ❑ শিক্ষা আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক ও প্রশিক্ষক

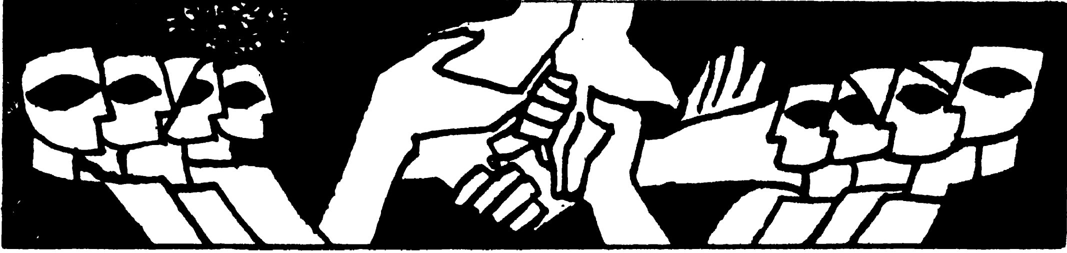


সাক্ষরতা আন্দোলনে জেলার অন্য ভাষাভাষীরাও পিছিয়ে নেই



উপরে : জলদাপাড়ায় বাইসনের পাল, মধ্যে : গরুমারায় চিতা শাবক, নীচে : জলদাপাড়ার গন্ডার

চিত্র : নীরজ সিংহল ও প্রণব বসু

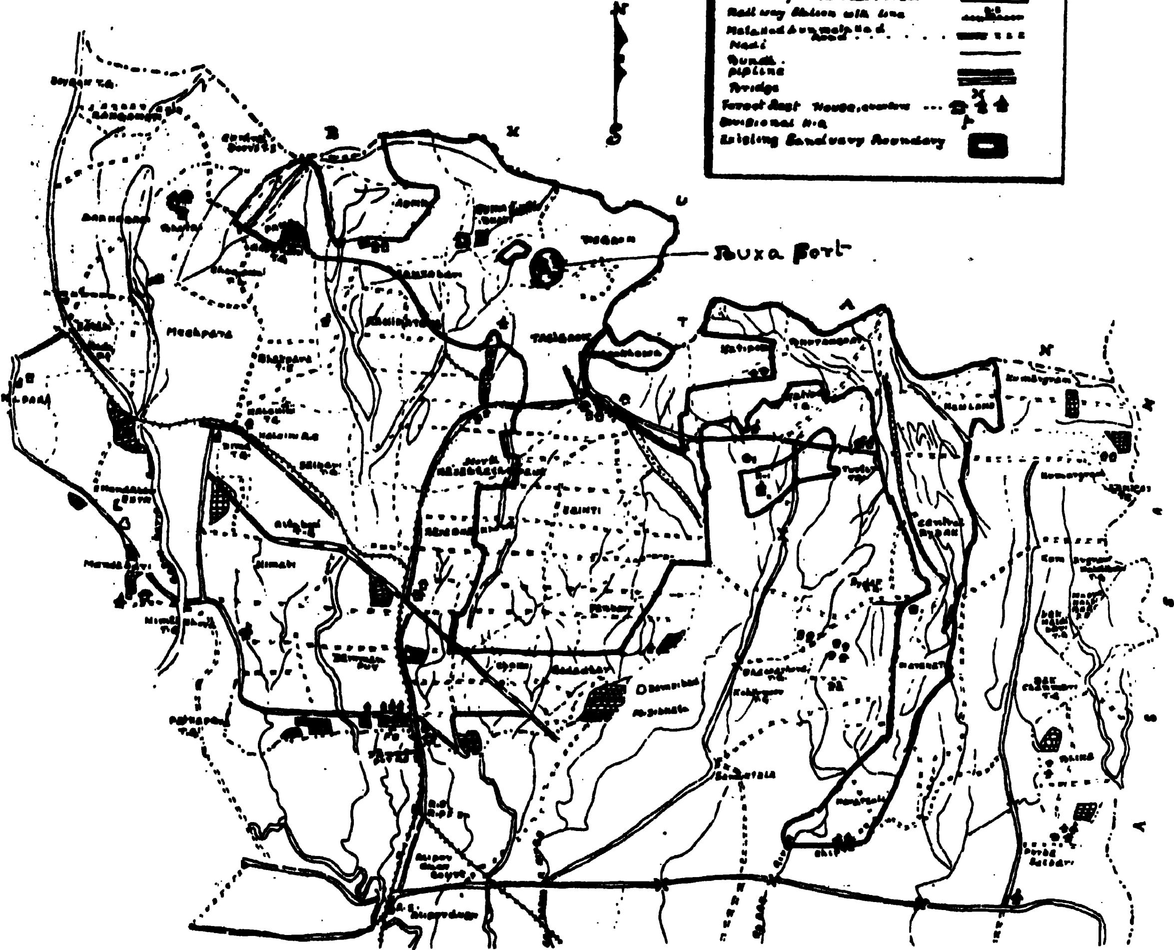


যোগেশচন্দ্র বর্মণ

জলপাইগুড়ি জেলার বন ও বন্যপ্রাণী

নৈসর্গিক মানচিত্রে জলপাইগুড়ি জেলা শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, সারা ভারতবর্ষের মধ্যেই এক অনন্য স্থান অধিকার করে আছে। উত্তরে ধ্যানগম্ভীর পর্বতাঞ্চল, পাদদেশে ডুয়ার্সের শ্যামল বনানী, চা বাগান, আর জনপদ। সবুজের এই বর্ণময় প্রান্তরে প্রতিনিয়ত ধ্বনিত হচ্ছে পাখির কুজন, স্বপ্নভাঙা নির্ঝরিনীর কলোচ্ছ্বাস, বন্যপশুর চকিত আনাগোনার পদশব্দ।

বন ও বনজ সম্পদ সমৃদ্ধ জলপাইগুড়ি জেলার অধিবাসীরা গর্ববোধ করতে পারেন। ভৌগোলিক আয়তনের তুলনায় এখানে অরণ্যের পরিমাণ ২৭%। সারা ভারতে এই পরিমাণ মাত্র ১৯.৪% এবং পশ্চিমবঙ্গে ১৫.১৮%। বিশাল এই অরণ্য ভাণ্ডারের অন্তর্ভুক্ত হল : বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্প, গরুমারা জাতীয় উদ্যান, জলদাপাড়া ও চাপড়ামারি অভয়ারণ্য, বৈকুণ্ঠপুর ও জলপাইগুড়ি সংরক্ষিত বনাঞ্চল। এই অরণ্য ভাণ্ডারকে সঞ্জীবিত করেছে অনেকগুলি খরস্রোতা নদী। সংকোশ, রায়ডাক, কালজানি, তোর্সা, মুজনাই, গিলাণ্ডি, জলঢাকা, তিস্তা, করতোয়া, মেচি, মহানন্দার প্রাণস্পর্শে স্নাত, আর্দ্র এবং উর্বরা এখানকার জমি। শাল, শিশু, শিমূল, শিরিষ, চিকরাশি, বহেরা, টুন, চাপ, সেগুন, গামার, পানিসাজ ইত্যাদি অনেক প্রজাতির মূল্যবান গাছে এই বনাঞ্চল সমৃদ্ধ। বিশাল জীববৈচিত্র্যের সমাহার এখানে। নানান বৃহৎ ও ক্ষুদ্র স্তন্যপায়ী, মাংসাশী, তৃণভোজী, ও সরীসৃপ প্রাণীদের বাসভূমি এই অরণ্য। বাঘ, চিতা, হাতি, একশৃঙ্গী গন্ডার, বাইসন, গৌর, Barking Dear, সোনার হরিণ, Spotted Dear, শৃগাল, বন্যবরাহ, বনরুই, বনবিড়াল, সম্বর, বাঁদর নানা সরীসৃপ ও বহু পাখি—যথা টিয়া, ময়না, ময়ূর, ও বহু ধরনের প্রজাপতি ও কীটপতঙ্গ—আরও অসংখ্য প্রাণীর প্রাণছন্দে চঞ্চল এই বাসভূমি।



বক্সা টাইগার রিজার্ভ মানচিত্র

বিশাল এই বনসম্পদ রক্ষা করা কেবলমাত্র সরকারের একক প্রচেষ্টায় সম্ভব নয়। আশার কথা, গত কয়েক বছরের নিরলস প্রচেষ্টার ফলে আমাদের রাজ্যে বন ও বনসৃজনে অসাধারণ সাফল্যের নজির গড়ে উঠেছে। যৌথ বন পরিচালন ব্যবস্থায় এখানে শরিক অনেকগুলি বন সুরক্ষা ও পরিবেশ উন্নয়ন সমিতি। কাঠ ও জ্বালানির ক্রমান্বয়ে ঊর্ধ্বগতি, এই জঙ্গলকে আকর্ষনীয় করে তুলেছে অসাধু ব্যবসায়ী ও দুষ্কৃতকারীদের কাছে। দরিদ্র মানুষদের প্ররোচিত করছেন এঁরা। সেজন্য বন সন্নিহিত এলাকার মানুষদের সাথী করেই এই সম্পদকে রক্ষা করতে হবে। সমস্যার মোকাবিলায় গ্রামবাসীদের আর্থিক পুনর্বাসন প্রয়োজন। সমিতির সদস্যরা বন রক্ষা করার জন্য বেশ কিছু আর্থিক সুবিধা পান। প্রকল্প সহায়তা করা হয় বেশ কিছু কাজকর্মে। যেমন— কৃষি খামার, বন, ফল বাগান, সব্জী বাগান, রেশমকীট ও গবাদি পশুর খাদ্য উপাদন, ক্ষুদ্র সেচ ও পানীয় জলের ব্যবস্থা ইত্যাদি। ইতিমধ্যেই ফালাকাটা ও মাদারিহাটে সারি বন বিক্রয়লব্ধ অর্থ থেকে স্থানীয় গ্রামবাসীদের প্রাপ্য টাকা দেওয়া হয়েছে। সরকারের এই আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি জেলায় বৃক্ষের আচ্ছাদন বৃদ্ধি পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯৮৮ থেকে ১৯৯৭ সালের মধ্যে ১৬০১ বর্গ কিলোমিটার বনাঞ্চল (বন খামার সহ) বৃদ্ধি পেয়েছে ১৬৮২তে। অর্থাৎ বৃদ্ধি ৮১ বর্গ কিলোমিটার। এই তথ্য ভারত সরকারের মহাকাশ বিজ্ঞান গবেষণা সংস্থা (ISRO)-র সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত।

সংরক্ষিত এলাকার বাইরেও ব্যাপক বনসৃজনের জন্য সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি রূপায়িত হচ্ছে। গ্রামাঞ্চলে এই পরিকল্পনা রূপায়ণ করবেন জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ আর শহরাঞ্চলে বিভিন্ন পৌরসভা। সারিবন, বনখামার, বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ ও অন্যান্য উন্মুক্ত স্থানে ব্যাপক বনসৃজনের মাধ্যমে এই কর্মসূচি সফল করা সম্ভব। সঠিকভাবে এই পরিকল্পনা কার্যকর হলে এলাকার কাঠকলগুলিতেও উপযুক্ত চাহিদার জোগান সম্ভব হবে। জ্বালানির সমস্যাও অনেকাংশে সুরাহা হবে।



জলদাপাড়া অভয়ারণ্যে বাচ্চাদের নিয়ে হস্তী জননী

জেলাতে জৈব বৈচিত্র্য ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণেও অনেকগুলি যুগান্তকারী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। যেমন—

১। আসাম থেকে গন্ডার নিয়ে এসে জলদাপাড়া ও গরুমারার গন্ডার প্রজাতির জিনগত (জেনেটিক) উন্নয়ন।

২। মণিপুর থেকে সম্বর হরিণ নিয়ে এসে জলদাপাড়া ও গরুমারা জঙ্গলে পুনর্বাসন।

৩। অসুস্থ ও পথভ্রষ্ট বন্যপ্রাণী উদ্ধার করে চিকিৎসা করা এবং মুক্তাঞ্চলে পুনর্বাসিত করা। জলপাইগুড়ির খয়েরবাড়িতে এই লক্ষ্যে গড়ে উঠছে একটি বিশাল Rescue Centre-I

৪। মূর্তি বনাঞ্চলে গড়ে উঠেছে ঘড়িয়াল প্রজনন কেন্দ্র।

৫। উত্তরপ্রদেশ থেকে এনে ছাড়া হয়েছে বড়শিঙ্গা প্রাণী।

সংরক্ষণের প্রয়াসের ফলে জেলাতে বন্যপ্রাণীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। নীচের পরিসংখ্যানে এই তথ্য প্রমাণিত—

নাম	বৎসর	গরুমারা	জলদাপাড়া	বক্সা	মোট
গণ্ডার	১৯৯৮	১৯	৪৯	—	৬৯
হাতি	২০০০	২৯	৪৮	১১১	১৮৮
বাঘ	১৯৯৯	—	১২	৩৩	৪৫

অরণ্যপ্রাণী সংরক্ষণে সাফল্য যেমন আছে তেমন সংঘাতের সমস্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। মনে রাখা প্রয়োজন যে ৫০ বছর

সংরক্ষিত এলাকার বাইরেও ব্যাপক বনসৃজনের জন্য সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি রূপায়িত হচ্ছে। গ্রামাঞ্চলে এই পরিকল্পনা রূপায়ণ করবেন জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ আর শহরাঞ্চলে বিভিন্ন পৌরসভা। সারিবন, বনখামার, বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ ও অন্যান্য উন্মুক্ত স্থানে ব্যাপক বনসৃজনের মাধ্যমে এই কর্মসূচি সফল করা সম্ভব। সঠিকভাবে এই পরিকল্পনা কার্যকর হলে এলাকার কাঠকলগুলিতেও উপযুক্ত চাহিদার জোগান সম্ভব হবে। জ্বালানির সমস্যাও অনেকাংশে সুরাহা হবে।

JALPAIGURI

5 0 5 10 15 Kilometres

SCALE

AREA UNDER FOREST

N

BHUTAN

DARJEELING

BANGLADESH

COOCHBEHAR

ASSAM

Siliguri
Bhaktinagore
Rajganj
Jalpaiguri
Malbazar
N. H.
Matiali
Chalsa
Mal
Lataguri
Tista R.
B.G.Rly.
Nagrakata
M.G.Rly.
Banarhat
Maynaguri
Jaldhaka
Dhupguri
Jalpesh
To Haldibari
Birpara
Madarihat
Falakata
Phuntsoling
Jaygaon
Hasimara
Hamiltonganj
Buxaduar
Kalchini
Jayanti
Torsa
Apd-1
Apd-2
Alipurduar
Kumargram

REFERENCE

International Boundary
State Boundary
District Boundary
Sub-Division Boundary
Block Boundary
District Headquarters
Sub-Division Headquarters
Police Station
National Highway
Other Roads
River
Forest 

আগের তুলনায় আজ আমাদের অরণ্যে হাতির সংখ্যা অনেক কম। কিন্তু অরণ্যের সংকোচন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও অরণ্যের পাশে বসতি স্থাপনের জন্য মানুষ ও বন্যহাতি আজ অতীতের চেয়ে অনেক বেশি মুখোমুখি হচ্ছে। হাতির পক্ষে জীবনযাত্রায় পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। কিন্তু মানুষ তো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব এবং তারা নিজেদের ঘর বানাতে পারে, খাদ্য তৈরি করতে পারে এবং প্রকৃতির নিজের প্রয়োজনে কিছুটা নিয়ন্ত্রণও করতে পারে। সেজন্য সে যদি তার জীবনযাত্রার পদ্ধতিকে সামান্য পরিবর্তন করে, তবে এই অবাঞ্ছিত সংঘাত নিশ্চয়ই কমে আসবে।



জলদাপাড়ায় সম্বর হরিণ

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে বন্যহাতি অধ্যুষিত এলাকার মানুষ যদি নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তবে মানুষ ও হাতির সংঘাত অনেক কমে যাবে।

১। চা বাগানের ধারে বিশেষ করে বাসস্থানের কাছে বৈদ্যুতিক তারের বেড়া দেওয়া বা গভীর পরিখা খনন করা। যাতে বন্যহাতি সহজে মানুষের বাসস্থানে প্রবেশ করে মানুষের ক্ষতি না করতে পারে।

২। হাতির স্বাভাবিক চলাচলের পথে বাসস্থান না স্থাপন করা। তাহলে বন্যহাতির দ্বারা মানুষের বাসস্থানের ক্ষতি কমে আসবে।

৩। বনের ধারে কাঁচা ঘরের মধ্যে হাতির প্রিয় খাদ্য গুদামজাত না করা। যাতে খাদ্যের লোভে হাতি ঘর ধ্বংস না করে। এই প্রিয় খাদ্যের মধ্যে আছে ধান, ভুট্টা, কলা, হাঁড়িয়া ইত্যাদি।

৪। হাতি-অধ্যুষিত বনের একেবারে ধারে হাতির খাদ্যজাতীয় কৃষিজ পণ্য রোপণ না করা। যাতে খাদ্যের সন্ধানে গ্রামে হাতির অনুপ্রবেশ কমে যায়।

৫। অধিক রাত্রে বনভূমির পাশ দিয়ে একলা অন্ধকারে না যাওয়া। যাতে অজানিতভাবে মানুষ হাতির একেবারে কাছে গিয়ে না পড়ে।

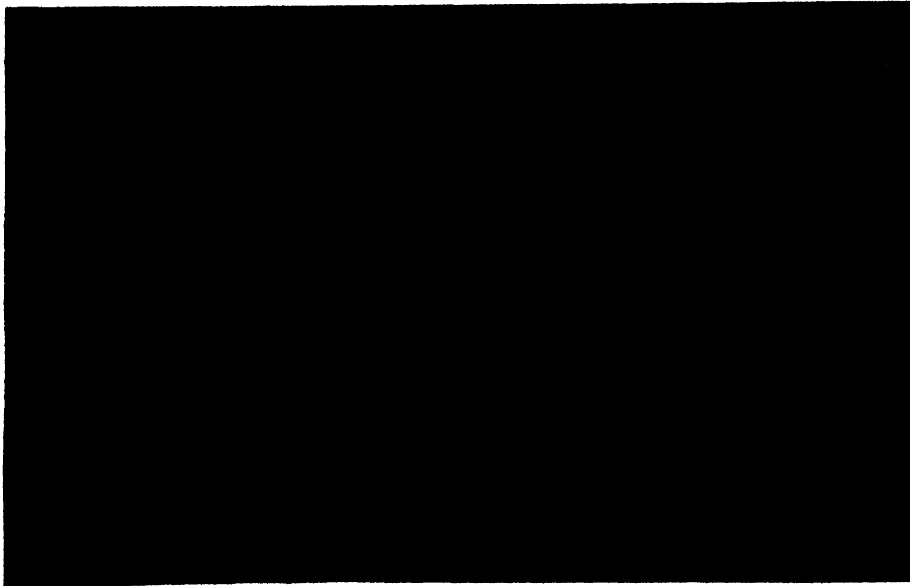
৬। অরণ্যকে অবৈধভাবে কর্তন করে হাতির নিরাপদ বাসস্থানকে বিপর্যস্ত না করা। যাতে হাতি বাধ্য হয়ে আশ্রয়ের জন্য এক অরণ্য থেকে অন্য অরণ্যে যাতায়াত না করে।

৭। বন্যহাতিকে অকারণে তীর বা বর্শা দিয়ে আঘাত করে তাকে খেপিয়ে না তোলা। যাতে হাতির মনে মানুষের প্রতি আক্রোশ না জন্মায়।

মনে হয়, উপরোক্ত পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করলে এই সমস্যার বহুলাংশে সমাধান সম্ভব।

জলপাইগুড়ি জেলায় বনবিভাগের মৃত্তিকা সংরক্ষণ শাখার উদ্যোগে নদীর জলবিভাজিকায় ভূমি সংরক্ষণের পরিকল্পনা রূপায়িত হচ্ছে। প্রধানত তিস্তা, তোর্সা, মহানন্দা, রায়ডাক, কালজানি, জলঢাকা ও ডায়না নদীর তীরবর্তী অঞ্চল এই শাখার কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত।

বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্প আমাদের জেলায় বনজ সম্পদের একটি সমৃদ্ধ অঞ্চল। এই এলাকার জৈব বৈচিত্র্য রক্ষার্থে আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের সহায়তায় রূপায়িত হচ্ছে একটি বিশাল কর্মকাণ্ড। বন বৃদ্ধির যে কোনও পরিকল্পনার সঙ্গে বন সংলগ্ন দরিদ্র জনগণের আর্থ সামাজিক বিকাশ অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। সেজন্য প্রয়োজনে জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা যাচাই করা এবং স্থানীয় ভিত্তিতে স্থানপোযোগী পরিকল্পনা রচনা করা। এটা সম্ভব কেবলমাত্র অনু পরিকল্পনার মাধ্যমে। বক্সা অঞ্চলে বনজ সম্পদের সংরক্ষণ ও বিকাশের প্রক্রিয়ায় জনগণের সক্রিয় অংশ গ্রহণ সুনিশ্চিত



জলদাপাড়া অরণ্যে গণ্ডার



গরুমারা অরণ্যের চিতাবাঘ

করতে বনকর্মচারী ও স্থানীয় জনগণ পারস্পরিক আলোচনায় বসছেন। উদ্দেশ্য—প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারের ক্ষেত্রে পরস্পরবিরোধী প্রয়োজনের সামঞ্জস্য বিধান করা।

অনুপম নিসর্গের জন্য জলপাইগুড়ি জেলাতে Eco-tourism বা পরিবেশ পর্যটনেরও সম্ভাবনা অসীম। বনদপ্তরের উদ্যোগে গড়ে উঠেছে অনেকগুলি প্রকৃতি বীক্ষণ কেন্দ্র বা Nature Interpretation Centre যেমন লাটাগুড়ি, মূর্তি, রাজাভাতখাওয়া ইত্যাদি স্থানে। সরকারি ও বেসরকারি উভয় উদ্যোগে আরও কিছু পরিকাঠামো নির্মাণ করলে পর্যটন শিল্পে এক নতুন দিশা উন্মুক্ত হবে। বহু মানুষ এই শিল্পে জীবিকা নির্বাহ করতে পারবেন।

জলপাইগুড়ি জেলার অরণ্য ও অরণ্য সম্পদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা এবং উন্নয়নের জন্য আমাদের তরফে বিভিন্ন কর্মসূচি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করলাম। সবশেষে জেলার অধিবাসীদের কাছে আমি একটি আবেদন করতে চাই। প্রকৃতির অকৃপণ দানে এই সম্পদের জন্য আমরা গর্বিত। পূর্বসূরীরা আমাদের জন্য একে রক্ষা করে গেছেন। আসুন, সবার সম্মিলিত প্রয়াসে এই সম্পদের রক্ষা আমরা সুনিশ্চিত করি—আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য।

লেখক ❑ মন্ত্রী, বনবিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, শিক্ষক ও প্রাবন্ধিক।

ভারতীয় বন্য মহিষ

ছবি : সুব্রত পালচৌধুরী

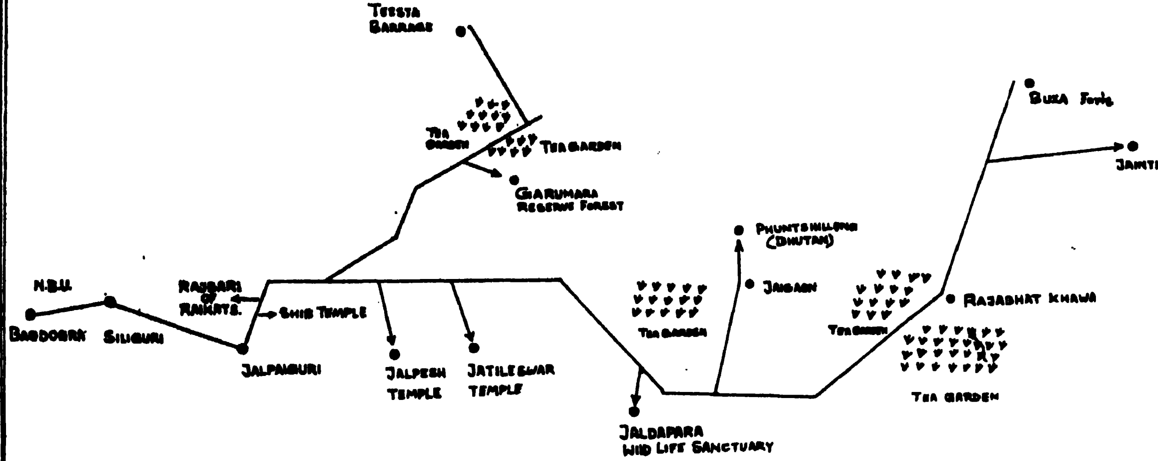


কৌস্তুভ তরফদার

পর্যটনে জলপাইগুড়ি জেলা

জলপাইগুড়ি জেলা হল পর্যটকদের তীর্থক্ষেত্র। কী নেই এখানে? পাহাড়, ঝরণা, জঙ্গল, নদী—প্রকৃতি সবকিছু উজাড় করে দিয়েছে এই জেলায়। একদিকে গা-ছম্‌ছম্‌ করা অরণ্য, অন্যদিকে চা-বাগানের সবুজ গালিচা। ডুয়ার্সের মন ভোলানো রূপ আপনাকে পাগল করে তুলবেই। জলপাইগুড়ির ওপর দিয়ে বয়ে গেছে নাম-ঠিকানাহীন অনেক পাহাড়ি নদী। জেলার পশ্চিম সীমান্তে মহানন্দা আর পূর্বে সঙ্কোশ। উত্তর বাংলার সবচেয়ে বড় নদী তিস্তা জলপাইগুড়ির বুক চিরে কখনও শহরের পাশ দিয়ে কখনও বা গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে আবার কখনও বা সড়ক-রেলপথের পাশ দিয়ে তিরতির করে বয়ে চলেছে। তিস্তা ছাড়াও জলপাইগুড়ির অন্যতম নদীগুলি হল—তোর্সা, জলঢাকা, রায়ডাক, কালজানি ইত্যাদি। জলপাইগুড়ির জেলার প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের মতোই এখানে বৈচিত্র্যপূর্ণ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানুষের সহাবস্থান লক্ষ করা যায়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—সাঁওতাল, ওঁরাও, মুণ্ডা, মেচ, রাভা প্রভৃতি। পৃথিবীর অন্যতম বিরল জনগোষ্ঠী টোটো সম্প্রদায়ের বাসও এই জলপাইগুড়ি জেলাতে। এইসব বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর লোকসংস্কৃতিও বৈচিত্র্যে ভরা। আজও উত্তরবঙ্গের আকাশে-বাতাসে ভাওয়াইয়ার সুর ভাসে। এছাড়া মেচ, রাভা আদিবাসী প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর নিজস্ব নৃত্য ও গান জলপাইগুড়ি জেলার লোকসংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে। ভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যেও এরা দীর্ঘকাল ধরে একাত্ম হয়ে বসবাস করছেন। জেলার বিভিন্ন উৎসবে এরা একই সঙ্গে অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। শতাব্দী প্রাচীন জল্পেশ জটিলেশ্বর, বটেশ্বর, পুরাতন মসজিদ, মজিদখানা প্রভৃতির সমন্বয় দেখা যায় এই জেলায়। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যই জলপাইগুড়ি জেলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে থাকার যে সরকারি ব্যবস্থা আছে তা এই লেখায় জানানো হল। এছাড়া শিলিগুড়িতে কয়েকটি বেসরকারি সংস্থা জলপাইগুড়ির বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রে থাকার



ব্যবস্থা করেছে। এরা প্যাকেজ ট্যুরের ব্যবস্থাও করে। আরও একটি বিষয় প্রতি বৃহস্পতিবার গরুমারা, চাপরামারি, জলদাপাড়া অভয়ারণ্য বন্ধ থাকে।

গরুমারা : জলপাইগুড়ি শহর থেকে দূরত্ব ৫০ কিমি। ১৯৪৯ সালে অভয়ারণ্য হিসাবে ঘোষিত হয়েছে। গরুমারা বাংলোর সামনে বা আরও একটু গভীরে যাত্রাপ্রসাদ ওয়াচ টাওয়ার থেকে নীচে মূর্তি নদীতে জল খেতে আসা হাতির পাল, গণ্ডার, লেপার্ড, হরিণ, বাইসন ইত্যাদির দেখা মিলতে পারে। তাছাড়া নানারকম অর্কিড, পাখি, প্রজাপতি তো রয়েছেই। এখানে বনবিভাগের একটি বাংলো রয়েছে। ২টি ঘর (৪ শয্যাবিশিষ্ট)। প্রতিটি ঘরের প্রতিদিনের ভাড়া ১৫০ টাকা। গরুমারাতে হাতির পিঠে চড়ে জঙ্গল ভ্রমণের ব্যবস্থা আছে।

চাপরামারি : জলপাইগুড়ি শহর থেকে দূরত্ব ৬৫ কিলোমিটার। এখানে বনবিভাগের একটি বাংলো রয়েছে। বাংলোর বারান্দাতে বসেই কয়েক হাত দূরে অবস্থিত জলাশয়ে জল খেতে আসা বিভিন্ন বন্যজন্তুর দেখা মিলতে পারে। বাংলোতে ২টি ঘর (৪ শয্যাবিশিষ্ট)। প্রতিটি ঘরের প্রতিদিনের ভাড়া ১৫০ টাকা।

গরুমারা ও চাপরামারি বুকিং-এর জন্য যোগাযোগ করতে হয় :

বিভাগীয় বনাধিকারিক, বন্যপ্রাণী শাখা (২)

অরণ্যভবন, জলপাইগুড়ি, দূরভাষ : (০৩৫৬১) ২৪৯০৭

বর্ষাকালে গরুমারা ও চাপরামারি অভয়ারণ্য ১৬ জুন থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বন্ধ থাকে। এছাড়া গরুমারা ও চাপরামারিতে 'ডে ভিজিটের'ও ব্যবস্থা আছে। এর জন্য প্রয়োজনীয় অনুমতি লাটাগুড়ির প্রকৃতি পরিচিতি কেন্দ্র থেকে পাওয়া যায়। জলপাইগুড়ি বা শিলিগুড়ি থেকে বাসে চালসা বা লাটাগুড়িতে নেমে সেখান থেকে গাড়ি ভাড়া করে গরুমারা ও চাপরামারি অভয়ারণ্যের গভীরে ঢুকতে হয়।

জল্পেশ : লাটাগুড়ি থেকে ময়নাগুড়ি হয়ে বাসে বা গাড়িতে আসা যায় ভোটপট্টি। এখান থেকে ৪ কিমি দূরে অবস্থিত বিখ্যাত জল্পেশ শিবমন্দির। মন্দিরটি ১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দে কোচ রাজা প্রাণনারায়ণ নির্মাণ করেন। এখানে ফাল্গুন মাসের শিবচতুর্দশীতে বিরাট মেলা বসে।

মূর্তি : মূর্তি নদীর তীরে ছবির মতো বানানো একটি বাংলো। খুব কাছেই গরুমারা ও চাপরামারি অভয়ারণ্য। বাংলোতে মোট ৬টি ঘর আছে। ২টি শয্যাবিশিষ্ট শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘর। এই ধরনের প্রতিটি ঘরের ভাড়া ১০০০ টাকা। আর ২টি দ্বিশয্যাবিশিষ্ট সাধারণ ঘর। এই ধরনের প্রতিটি ঘরের ভাড়া ৬৫০ টাকা। এছাড়া এখানে বাঙ্কারের সুবিধাসহ আরও ২টি ঘর আছে। প্রতিটি ঘরে ৪টি বাঙ্কার আছে। প্রতিটি বাঙ্কারের ভাড়া ১০০ টাকা। একসঙ্গে ৪টি বাঙ্কার নিলে এই ভাড়া পড়বে ৩৫০ টাকা। মূর্তি বাংলোয় বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করতে হবে :

(১) ম্যানেজিং ডিরেক্টর, পশ্চিমবঙ্গ বন উন্নয়ন নিগম

৬-এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলকাতা-১৩ (অষ্টম তলা)

দূরভাষ : (০৩৩) ২৩৭-০০৬০, ২৩৭-০০৬১।



গরুমারা বনবাংলো *ছবি : দ্যুতিমান চন্দ*

(২) ট্যুরিস্ট ইনফরমেশন সেন্টার, পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন উন্নয়ন নিগম,

হিলকার্ট রোড, শিলিগুড়ি

দূরভাষ : (০৩৫৩) ৫১১-৯৭৪, ৫১১-৯৭৯।

চালসা : জলপাইগুড়ি শহর থেকে দূরত্ব ৫৭ কিমি। শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ি এই দুটো জায়গা থেকেই বাসে চালসায় আসা যায়। চালসার পাহাড়ের টিলার উপর পূর্ত বিভাগের ২টি বাংলো আছে। একটি কাঠের। অন্যটি সদ্য তৈরি হয়েছে। বাংলোর বারান্দায় বসে নীচে প্রবাহিত কূর্তি নদী ও পাহাড়ের ধাপে ধাপে উঠে যাওয়া সবুজ গালিচার মতো চা-বাগিচা দেখতে দারুণ লাগে। ২টি বাংলোতে মোট ঘরের সংখ্যা ৪টি। ভাড়া মাথাপিছু প্রতিদিন ৯০ টাকা। বুকিং-এর জন্য লিখতে হবে :

নির্বাহী আধিকারিক

নাগরাকাটা নির্মাণ বিভাগ (পূর্ত বিভাগ)

মাল, জলপাইগুড়ি

দূরভাষ : (০৩৫৬২) ৫৫১২৯

চালসা থেকে বাসে পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে মেটেলি এবং দার্জিলিং জেলার সামসিঙ-এ যাওয়া যায়।

মালবাজার : জলপাইগুড়ি শহর থেকে দূরত্ব ৬৫ কিমি। এখানে পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন উন্নয়ন নিগমের একটি পর্যটন আবাস রয়েছে। নামটি ভারি সুন্দর—মেঘমল্লার। এখানে দ্বিশয্যাবিশিষ্ট ১০টি ঘর আছে। এর মধ্যে ২টি বাতানুকূল ঘর। এর ভাড়া ঘরপিছু ৭০০ টাকা। বাতানুকূলহীন ঘরগুলির প্রতিদিনের ভাড়া ঘরপিছু ৪৫০ টাকা। এছাড়া মেঘমল্লারে ৯ শয্যাবিশিষ্ট ডরমেটরিও রয়েছে। ডরমেটরিতে মাথাপিছু ৯০ টাকা পড়ে। মালবাজারকে কেন্দ্র করে গরুমারা, চাপরামারিসহ ডুয়ার্সের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে দেখা যায়। শিলিগুড়ি থেকে বাসে সেবক হয়ে মালবাজার আসা যায়। তাছাড়া জলপাইগুড়ি থেকেও গরুমারা জঙ্গলের ভিতর দিয়ে বাসে মালবাজার আসা যায়। মালবাজার পর্যটন আবাসে বুকিং-এর জন্য লিখতে হবে :

(১) ট্যুরিস্ট পয়েন্ট, ৩/২ বিবাদী বাগ, কলকাতা-১

দূরভাষ : (০৩৩) ২৪৮-৮২৭১, ২৪৮-৮২৭২, ২৪৮-৮২৭৩।

(২) ট্যুরিস্ট ইনফরমেশন সেন্টার, হিলকার্ট রোড, শিলিগুড়ি

দূরভাষ : (০৩৫৩) ৫১১৯৭৪, ৫১১৯৭৯।

(৩) মেঘমল্লার ট্যুরিস্ট লজ, মালবাজার

দূরভাষ : (০৩৫৬২) ৫৫১৮৩।

কাঠামবাড়ি : জলপাইগুড়ি শহর থেকে প্রায় ৫০ কিমি। বাসে যাওয়া যায়। কাঠামবাড়ি জঙ্গলের কাছেই বনবিভাগের বাংলো। ২টি ঘর। ভাড়া ঘরপিছু দৈনিক ১০০ টাকা। জলপাইগুড়ি থেকে বাসে যাওয়া যায়।

ওদলাবাড়ি : জলপাইগুড়ি শহর থেকে প্রায় ৯০ কিমি। এখান থেকে তিস্তা ব্যারেজ খুব কাছে। এখানে বনবিভাগের একটি বাংলো রয়েছে। ২টি ঘর এবং ৪ শয্যাবিশিষ্ট এই বাংলোর ভাড়া প্রতিদিন ঘরপিছু ১০০ টাকা। শিলিগুড়ি এবং জলপাইগুড়ি দুটি জায়গা থেকেই বাসে ওদলাবাড়ি যাওয়া যায়।

আমবাড়ি : নিউ জলপাইগুড়ি থেকে হলদিবাড়িগামী ট্রেনে উঠে আমবাড়ী ফালাকাটা স্টেশনে নেমে একটু এগোলে আমবাড়ি বনবাংলো। ২টো ঘর। প্রতিটি ঘরের ভাড়া প্রতিদিন ৫০ টাকা। আমবাড়ি থেকেও তিস্তা ব্যারেজ কাছে।

বোদাগঞ্জ : জলপাইগুড়ি শহর থেকে ২৫ কিমি দূরে শিকারপুরে জঙ্গলের কাছে বোদাগঞ্জ বনবাংলো। ২টো ঘর। ভাড়া প্রতিদিন মাথাপিছু ৫০ টাকা।

এই চারটি বনবাংলো বুকিং-এর জন্য লিখতে হবে :

বিভাগীয় বনাধিকারিক

বৈকুণ্ঠপুর বিভাগ

হসপিটাল মোড়, শিলিগুড়ি

দূরভাষ : (০৩৫৩) ৪৩৬৪৩৬

খুট্টিমারি : জলপাইগুড়ি শহর থেকে দূরত্ব ৭০ কিমি। গয়েরকাটা থেকে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে খানিকটা পথ গেলে খুট্টিমারি বনবাংলো। ২টো ঘর। ভাড়া প্রতিদিন ঘরপিছু ১০০ টাকা। বুকিং-এর জন্য যোগাযোগ করতে হবে :

বিভাগীয় বনাধিকারিক

জলপাইগুড়ি বিভাগ, অরণ্যভবন, জলপাইগুড়ি

দূরভাষ : (০৩৫৬১) ৩২০১৬

মাদারিহাট : বিখ্যাত জলদাপাড়া অভয়ারণ্যে প্রবেশের মুখেই মাদারিহাট শহর। এখানে পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন উন্নয়ন নিগমের একটি পর্যটন আবাস রয়েছে। নাম জলদাপাড়া ট্যুরিস্ট লজ। এখানে ১০টি

দ্বিশয্যাবিশিষ্ট ঘর রয়েছে। প্রতিটি ঘরের ভাড়া ৭৫০ টাকা। এছাড়া ১৩টি শয্যার ডরমেটরিও রয়েছে। ডরমেটরিতে মাথাপিছু ৮০ টাকা পড়ে। জলদাপাড়া ট্যুরিস্ট লজের সঙ্গেই ৬টি দ্বিশয্যাবিশিষ্ট কটেজ রয়েছে। প্রতিটি কটেজের ভাড়া দৈনিক ৫০০ টাকা। ট্যুরিস্ট লজে খাওয়ার ব্যবস্থাও আছে। বুকিং-এর জন্য যোগাযোগ করতে হবে :

(১) ট্যুরিস্ট পয়েন্ট, ৩/২ বিবাদী বাগ, কলকাতা-৭০০ ০০১
দূরভাষ : (০৩৩) ২৪৮-৮২৭১, ২৪৮-৮২৭৩।

(২) ট্যুরিস্ট ইনফরমেশান সেন্টার
হিলকার্ট রোড, শিলিগুড়ি
দূরভাষ : (০৩৫৩) ৫১১-৯৭৪, ৫১১-৯৭৯।

(৩) জলদাপাড়া ট্যুরিস্ট লজ
মাদারিহাট
দূরভাষ : (০৩৫৬৩) ৬২২৩০।

মাদারিহাটে পশ্চিমবঙ্গ বন উন্নয়ন নিগমের একটি বাংলো রয়েছে। এই বাংলোটিতে মোট ৪টি ব্লক রয়েছে।

'এ' ব্লক ভি আই পি-দের জন্য। 'বি' ব্লকে ২ শয্যাবিশিষ্ট একটি ঘরের প্রতিদিনের ভাড়া ২০০ টাকা। 'সি' ব্লকে ৪ শয্যাবিশিষ্ট একটি ঘরের প্রতিদিনের ভাড়া ২৫০ টাকা এবং 'ডি' ব্লকে ৪ শয্যাবিশিষ্ট একটি ঘরের প্রতিদিনের ভাড়া ২৫০ টাকা। এই বাংলোতে বুকিং-এর জন্য যোগাযোগ করতে হবে :

ডিভিসনাল ম্যানেজার, শ. মিলিং ডিভিসন, হাকিমপাড়া
জলপাইগুড়ি
দূরভাষ : (০৩৫৬১) ৩০৯৪৫।

জলপাইগুড়ি থেকে বাসে মাদারিহাট যাওয়া যায়। মাদারিহাট থেকে ৭ কিমি ভিতরে জঙ্গলের গভীরে হলং-এ যাওয়ার জন্য গাড়ি ভাড়া পাওয়া যায়।

হলং : মাদারিহাট থেকে ৭ কিমি ভিতরে গভীর জঙ্গলের মধ্যে জলদাপাড়া অভয়ারণ্যের মধ্যে হলং বাংলো। এখানে বসে সামনে নুন খেতে আসা বিভিন্ন বন্যজন্তুর দেখা মেলে। তাছাড়া বাংলোর সামনে থেকে প্রতিদিন সকালে হাতির পিঠে চড়ে জঙ্গলে ঘোরানো হয়। হাতির পিঠে চড়ে জঙ্গলে ঘোরার অভিজ্ঞতা কিন্তু দারুণ রোমাঞ্চকর। ভাগ্য ভাল থাকলে কয়েক হাত দূর থেকে গণ্ডার, বাঘ, বন্যহাতি, লেপার্ড, হরিণ ইত্যাদির দেখা মিলতে পারে। হাতির পিঠে চড়ার জন্য মাথাপিছু ৭০ টাকা করে লাগে। মাদারিহাট পর্যটন আবাসে যাঁরা থাকবেন, তাঁরাও হলং-এ এসে হাতির পিঠে চড়ে জঙ্গল ঘোরার রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হবেন না। শুধুমাত্র মাদারিহাট পর্যটন আবাসে জানালেই হবে।

হলং-এ ৬টি দ্বিশয্যাবিশিষ্ট ঘর আছে। এরমধ্যে ৩টি ঘরের সংরক্ষণ হয় কলকাতা থেকে। বাকি ৩টি ঘরের সংরক্ষণ হয় শিলিগুড়ি থেকে। দ্বিশয্যাবিশিষ্ট প্রতিটি ঘরের দৈনিক ভাড়া ৫৭৫ টাকা। এরসঙ্গে আবশ্যিকভাবে রাতের খাবার এবং পরের দিনের সকালের জলখাবারসহ মাথাপিছু ১১০ টাকা পড়ে। হলং পর্যটন আবাসে বুকিং-এর জন্য যোগাযোগ করুন :

(১) ট্যুরিস্ট পয়েন্ট, ৩/২ বিবাদী বাগ, কলকাতা-১
দূরভাষ : (০৩৩) ২৪৮-৮২৭১, ২৪৮-৮২৭৩।

(২) ট্যুরিস্ট ইনফরমেশন সেন্টার, হিলকার্ট রোড, শিলিগুড়ি
দূরভাষ : (০৩৫৩) ৫১১-৯৭৪, ৫১১-৯৭৯।

জলদাপাড়া অভয়ারণ্য ১৬ জুন থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত খোলা থাকে।

টোটোপাড়া : মাদারিহাট থেকে একটি রাস্তা টোটোপাড়ায় চলে গেছে। মাদারিহাট থেকে টোটোপাড়ার দূরত্ব ২২ কিমি। পাহাড়ের কোলে অবস্থিত এই টোটোপাড়াতেই বাস করেন পৃথিবীর অন্যতম আদিম জনগোষ্ঠী টোটোরা। টোটোপাড়ায় অনগ্রসর শ্রেণীর কল্যাণ বিভাগের একটি থাকার জায়গা রয়েছে। উৎসাহী কেউ এখানে থাকতে চাইলে অনগ্রসর শ্রেণীর কল্যাণ বিভাগের প্রকল্প আধিকারিকের সঙ্গে জলপাইগুড়িতে যোগাযোগ করতে পারেন।

দূরভাষ : (০৩৫৬১) ৩০৯১৭।

শিলিগুড়ি থেকে টোটোপাড়ায় যাওয়ার সরাসরি বাস আছে।

বড়ডাবরি : হাসিমারার কাছে বড়ডাবরিতে একটি যুব আবাস রয়েছে। এখানে ১৪টি শয্যা রয়েছে। মাথাপিছু প্রতিদিনের ভাড়া ১০ টাকা। বুকিং-এর জন্য যোগাযোগ করতে হবে :

ট্যুরিস্ট ব্যুরো, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, হিলকার্ট রোড, শিলিগুড়ি
দূরভাষ : (০৩৫৩) ৫১১-৯৭৪, ৫১১৯৭৯।

আলিপুরদুয়ার শহর থেকে বড়ডাবরির অতিথি নিবাসের দূরত্ব প্রায় ২৫ কিমি। চারদিকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা এই অতিথি নিবাসে থাকবার জন্য দ্বিশয্যাবিশিষ্ট ২টি ঘর আছে। প্রতিটি ঘরের ভাড়া প্রতিদিনের জন্য ১৫০ টাকা।



গরুমারা ওয়াচটাওয়ার। গণ্ডারের দল এই পথ দিয়ে নীচে জল খেতে যায় — *ছবি : দ্যুতিমান চন্দ*



চাপড়ামারি বনবাংলো ছবি : দ্যুতিমান চন্দ

বড়ডাবরি থেকে জলদাপাড়া অভয়ারণ্যেও ঘুরতে যাওয়া যায়।

নিলপাড়া : চারিদিকে চা বাগান এবং সবুজ বনানীতে ঘেরা নিলপাড়া অতিথি নিবাসের দূরত্ব আলিপুরদুয়ার থেকে প্রায় ২৫ কিমি। এই অতিথি নিবাসে পর্যটকদের থাকার জন্য দ্বিশয্যাবিশিষ্ট ২টি ঘর আছে। প্রতিটি ঘরের ভাড়া প্রতিদিনের জন্য ১৫০ টাকা।

চিলাপাতা : চারিদিকে ঘন অরণ্যে ভরা এবং নল রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষের কাছে অবস্থিত। চিলাপাতা অতিথি নিবাসের দূরত্ব আলিপুরদুয়ার থেকে প্রায় ২০ কিমি। এখানে থাকবার জন্য ২টি ঘর আছে। যার প্রতিদিনের ভাড়া ১৫০ টাকা।

কোদালবস্তি : চিলাপাতা অরণ্যের মাঝে অবস্থিত কোদালবস্তি অতিথি নিবাসের দূরত্ব আলিপুরদুয়ার শহর থেকে প্রায় ২২ কিমি। এখানে পর্যটকদের থাকার জন্য একটি ঘর আছে। যার প্রতিদিনের ভাড়া ১০০ টাকা।

পর্যটকদের উপরোক্ত অতিথি নিবাসের বুকিং-এর জন্য লিখতে হবে :

বিভাগীয় বন আধিকারিক
কোচবিহার বন বিভাগ
পোঃ ও জেলা : কোচবিহার, পিন-৭৩৬১০১।

দূরভাষ : (০৩৫৮২) ২২৪৮৫, ২২৯১৯।

উপরিউক্ত পর্যটক নিবাসগুলিতে যেতে হলে নিজস্ব গাড়ির ব্যবস্থা করতে হবে। গাড়ির ব্যবস্থা আলিপুরদুয়ার বা হাসিমারা থেকে করা যায়। জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার থেকে হাসিমারা বাসে যাওয়া যায়। জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার থেকে হাসিমারার দূরত্ব ৭৫ কিমি ও ২৫ কিমি।



চাপড়ামারি বনবাংলোর সামনে জলাশয়। বন্যজন্তুরা এখানে জল খেতে আসে ছবি : দ্যুতিমান চন্দ

কৃষ্ণনগর : জলপাইগুড়ি থেকে ৭০ কিমি দূরে ফালাকাটার কাছে নতুন গড়ে ওঠা এই পর্যটন কেন্দ্রটি ধীরে ধীরে পর্যটক মহলে খুবই জনপ্রিয় হচ্ছে। চড়ুইভাতি বা সারাদিন কাটানোর পক্ষে জায়গাটি আদর্শ। এখানে একটি মৃগদাব আছে।

ভুটানঘাট : সামনে দিয়ে বয়ে চলেছে রায়ডাক নদী। নদী পেরোলেই ভুটান। ভুটানঘাটের বনবাংলোয় বসলে সামনে সবুজ পাহাড় আর তিরতির করে বয়ে চলা নদী। এই নদীতে মাঝে মাঝেই হাতির পাল জল খেতে এবং স্নান করতে আসে। ভুটানঘাটের বনবাংলোয় দ্বিশয্যাবিশিষ্ট ৩টি ঘর আছে। প্রতিটি ঘরের প্রতিদিনের ভাড়া ১৫০ টাকা। ভুটানঘাটে যেতে হলে আলিপুরদুয়ার শহর থেকে গাড়ি ভাড়া করে নিতে হবে বা ময়নাবাড়ি পর্যন্ত বাসে গিয়ে ৮ কিমি পথ ট্রেকিং করে যাওয়া যায়। আলিপুরদুয়ার থেকে ভুটানঘাটের দূরত্ব ৪৫ কিমি।

জয়ন্তী : আলিপুরদুয়ার শহর থেকে ৩০ কিমি দূরে নদী, পাহাড় আর জঙ্গলে ঘেরা ছোট্ট গ্রাম জয়ন্তী। এখানে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের ছবির মতো একটি বাংলো রয়েছে। জয়ন্তী নদীর তীরেই বাংলোটি। এখানে ৩টি দ্বিশয্যাবিশিষ্ট ঘর ও ১টি ৬ শয্যাবিশিষ্ট ডরমেটরি আছে। ভাড়া জনপ্রতি প্রতিদিন ৫০ টাকা। তাছাড়া বনবিভাগের পক্ষ থেকে খুব শীঘ্রই এখানে ৬ শয্যাবিশিষ্ট একটি

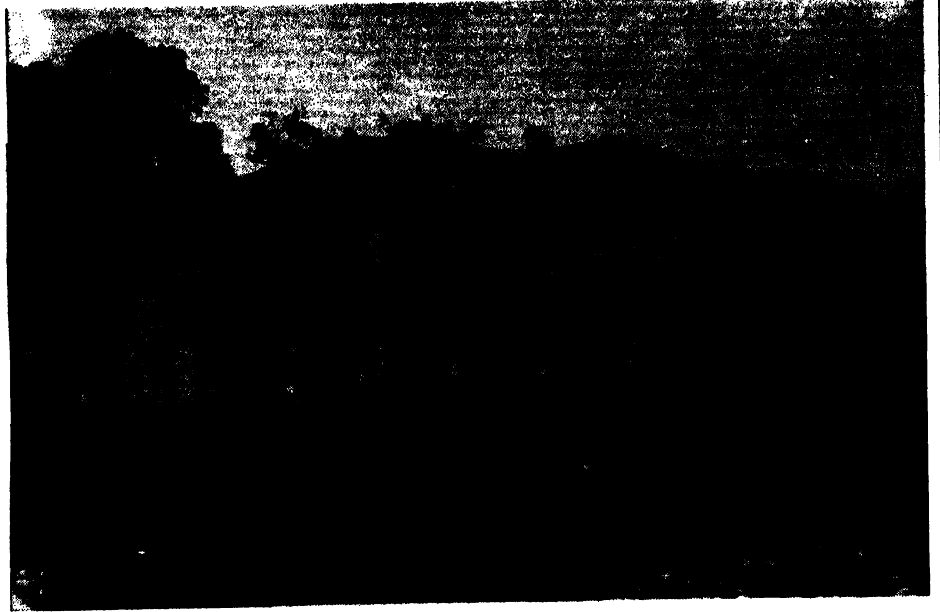
ডরমেটরি চালু করা হবে। আলিপুরদুয়ার থেকে সকাল ৭টায় এবং দুপুর ২টায় একটি বাস জয়ন্তীতে আসে। বুকিং-এর জন্য যোগাযোগ করতে হবে :

নির্বাহী আধিকারিক,

জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর, ক্লাব রোড, জলপাইগুড়ি

দূরভাষ : (০৩৫৬১) ৩০৬৫৯

জয়ন্তী মহাকাল : জয়ন্তী থেকে গা শিরশির করা গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পায়ে হেঁটে ৫ কিমি গেলে জয়ন্তী মহাকালে পৌঁছে যাওয়া যায়। পথে পড়বে কয়লা ও গন্ধকের পাহাড়। তাছাড়া পথের সঙ্গী পাহাড়ি ঝোরা তো আছেই। পাহাড়ের চূড়ায় মহাকাল মন্দির। শেষ আধ কিমি খুব খাড়া পথ। চুনা পাথরের মাথায় তিনটি প্রাকৃতিক গুহা। গুহার মাথা থেকে অবিরাম জল পড়ে চুন কণা বছর বছর ধরে জমে নানা মূর্তির আদল নিয়েছে।



রাজাভাতখাওয়া বনবাংলো — *ছবি : প্রতাপ সিংহ*

বক্সাদুয়ার : ঐতিহাসিক বক্সাদুয়ারে পৌঁছতে হলে সান্তলাবাড়ি থেকে ৫ কিমি পাহাড়ি পথ হেঁটে অতিক্রম করতে হয়। প্রায় ২ হাজার ৬০০ ফুট উঁচুতে অবস্থিত বক্সাদুয়ারে স্থানীয় ইকো ডেভেলপমেন্ট কমিটির পরিচালনায় ১৬ শয্যাবিশিষ্ট একটি ডরমেটরি আছে। ভাড়া প্রতিদিন জনপিছু ৩০ টাকা। অতিরিক্ত পয়সা দিলে পরিচালন কমিটি খাওয়ার ব্যবস্থাও করে। বক্সাদুয়ারে বনবিভাগের একটি বাংলোও রয়েছে। এখানে ২টি ঘর আছে। ১০ শয্যাবিশিষ্ট এক-একটি ঘরের ভাড়া প্রতিদিন ১৫০ টাকা।

বারবিশা শিলবাংলো : আলিপুরদুয়ার শহর থেকে ৪৫ কিমি দূরে জঙ্গলের একপ্রান্তে বনবিভাগের এই বাংলোটি। ২টি ঘর আছে। দ্বিশয্যাবিশিষ্ট এক-একটি ঘরের প্রতিদিনের ভাড়া ১৫০ টাকা। আলিপুরদুয়ার থেকে বারবিশা বাসে যাওয়া যায়।

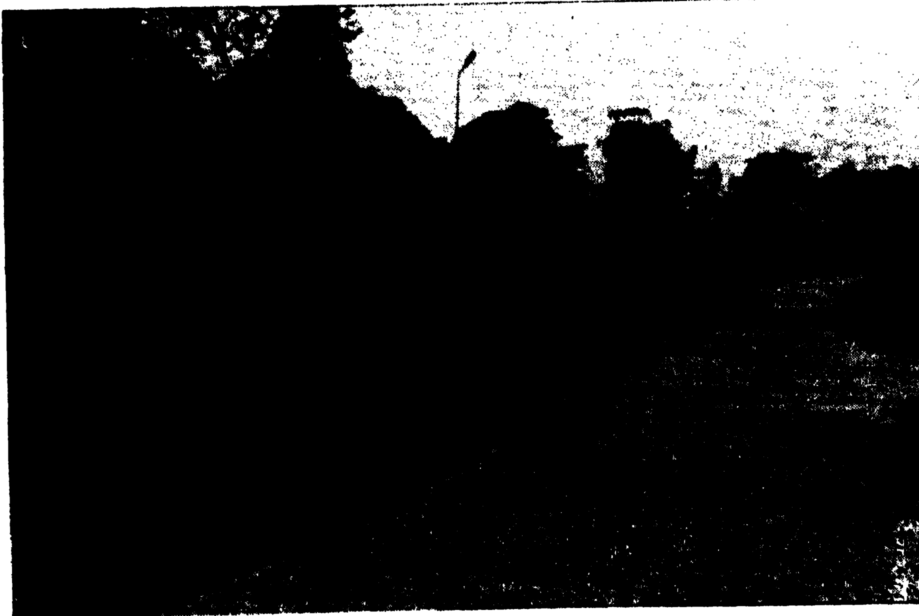
কুমারগ্রাম রেস্ট হাউস : আলিপুরদুয়ার শহর থেকে ৬৫ কিমি দূরে অসম, ভুটান সীমান্তে কুমারগ্রাম। সামনেই বয়ে চলেছে সঙ্কোশ নদী। কুমারগ্রামে বনবিভাগের ২ শয্যাবিশিষ্ট একটি বাংলো রয়েছে। এখানে প্রতিটি ঘরের প্রতিদিনের ভাড়া ১৫০ টাকা। কুমারগ্রাম থেকে কিছুটা এগোলেই কালিখোলা। সঙ্কোশ নদীর তীরে দারুণ পিকনিক স্পট। নদীর ওপারে ভুটান পাহাড়। কমলালেবুর বাগান। উপরোক্ত বনবাংলোগুলিতে থাকতে হলে যোগাযোগ করতে হবে :

ডেপুটি ফিল্ড ডিরেকটর

বক্সা টাইগার রিজার্ভ (ইস্ট)

আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি

দূরভাষ : (০৩৫৬৪) ৫৬০০৫।

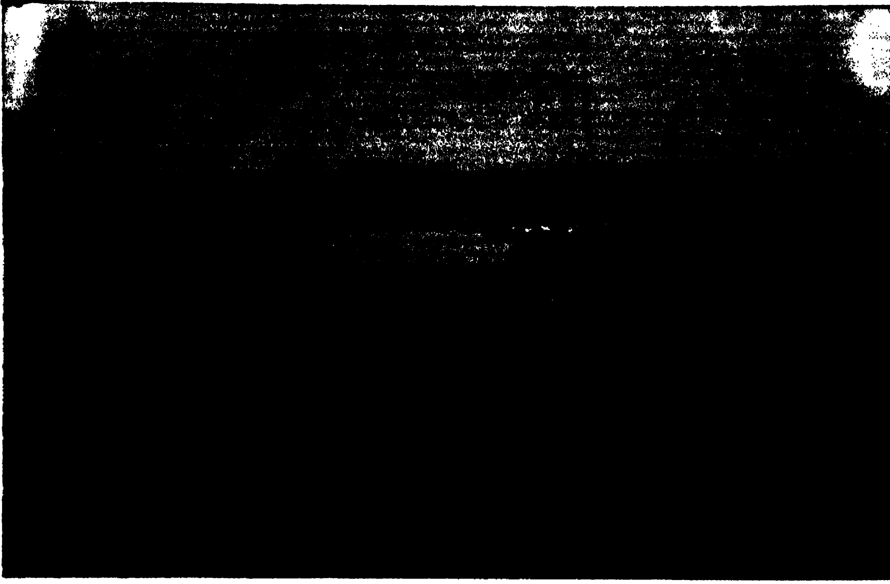


মাল উদ্যান — *ছবি : প্রণবেশ সান্যাল*

রাজাভাতখাওয়া : আলিপুরদুয়ার থেকে বক্সাদুয়ার যাওয়ার পথে পড়ে রাজাভাতখাওয়া। এখানে বনবিভাগের একটি প্রকৃতি বীক্ষণ কেন্দ্র আছে। চারিদিকে জঙ্গলে ঘেরা রাজাভাতখাওয়ায় ২টি বাংলো আছে।

লিও হাউস : ৩টি ঘরে মোট ৬টি শয্যা আছে। প্রতিটি ঘরের জন্য প্রতিদিনের ভাড়া ১৫০ টাকা।

টাইগারলজ : এখানে দ্বিশয্যাবিশিষ্ট ২টি ঘর আছে। প্রতিটি ঘরের প্রতিদিনের



ময়নাগুড়ির দোমোহনিতে প্রস্তাবিত ইকোট্যুরিজম পার্ক   *ছবি : উৎপল মণ্ডল*

ভাড়া ১৫০ টাকা। আলিপুরদুয়ার থেকে রাজাভাতখাওয়ার দূরত্ব মাত্র ১৫ কিমি। জয়ন্তীগামী বাসে উঠে পথে রাজাভাতখাওয়ায় নেমে পড়তে হবে। তাছাড়া শিলিগুড়ি থেকে ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসে উঠে রাজাভাতখাওয়া স্টেশনে নামলেও হয়।

রায়মাটাং : নদী-পাহাড়ে ঘেরা অপরূপ প্রাকৃতিক পরিবেশে রায়মাটাং বনবাংলো। আলিপুরদুয়ার থেকে ৪৫ কিমি। আলিপুরদুয়ার থেকে গাড়ি ভাড়া করে বা কালচিনি অবধি বাসে এসে সেখান থেকে গাড়ি ভাড়া করলে রায়মাটাং বনবাংলোয় পৌঁছানো যায়। এখানে দ্বিশয্যাবিশিষ্ট ২টি ঘর আছে। প্রতিটি ঘরের প্রতিদিনের ভাড়া ১৫০ টাকা।

নিমাতি : আলিপুরদুয়ার থেকে ১৫ কিমি। বাসেই যাওয়া যায়। নিমাতিতে দ্বিশয্যাবিশিষ্ট ২টি ঘর আছে। ভাড়া প্রতিদিন ঘরপিছু ১৫০ টাকা। উপরে উল্লিখিত বাংলোগুলিতে থাকার জন্য যোগাযোগ করতে হবে :

ডেপুটি ফিল্ড ডিরেক্টর
বক্সা টাইগার রিজার্ভ (ওয়েস্ট)
আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি
দূরভাষ : (০৩৫৬৪) ৫৫১২৯।

পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন উন্নয়ন নিগম পর্যটকদের সুবিধার জন্য ডুয়ার্সে প্যাকেজ ভ্রমণের ব্যবস্থা করে। সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে জুনের দ্বিতীয় সপ্তাহ অবধি এই প্যাকেজ ট্যুর চলে। এই সময় প্রতি শনিবার দুপুর ১২টায় শিলিগুড়ির হিলকার্ট রোডের ট্যুরিস্ট অফিসের সামনে থেকে একটি বাস ছাড়ে। বাসটি মালবাজার হয়ে জলদাপাড়া যায়। পথে গরুমারা অভয়ারণ্যের ভিতরে ঢুকে যাত্রাপ্রসাদ ওয়াচ টাওয়ার থেকে। ভাগ্য ভালো থাকলে গণ্ডার, হাতি, বাইসন, নাম না জানা অনেক পাখি ইত্যাদির দেখাও মিলতে পারে। রাতে হলং পর্যটন আবাসে থাকা। পরের দিন ঐতিহাসিক জল্পেশ মন্দির হয়ে বাসটি বিকালে শিলিগুড়িতে ফিরে আসে। ডুয়ার্সের নৈসর্গিক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতে দেখতে এই বাস ভ্রমণের অভিজ্ঞতা কিন্তু দারুণ। কোনও সন্দেহ নেই। থাকা-খাওয়াসহ এই ২ দিনের প্যাকেজ ট্যুরে প্রত্যেকের পড়ে ১১০০ টাকা। এই টাকার মধ্যেই সকালে হাতির পিঠে চড়ে গভীর জঙ্গলে ঘোরার ব্যবস্থাও থাকছে। এই প্যাকেজ ট্যুরে ১২ জন একসঙ্গে যেতে পারেন। এর মধ্যে ৬টির বুকিং হয় কলকাতা থেকে আর বাকি ৬টির বুকিং হয় শিলিগুড়ি থেকে।

এই প্যাকেজ ট্যুরের জন্য যোগাযোগ করতে হবে :

(১) ট্যুরিস্ট পয়েন্ট, ৩/২ বিবাদী বাগ, কলকাতা-১
দূরভাষ : (০৩৩) ২৪৮-৮২৭১, ২৪৮-৮২৭৩।

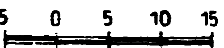
(২) ট্যুরিস্ট ইনফরমেশন সেন্টার, হিলকার্ট রোড, শিলিগুড়ি
দূরভাষ : (০৩৫৩) ৫১১-৯৭৪, ৫১১-৯৭৯।

শিলিগুড়ি থেকে ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসে চড়ে আপনি একটি রোমাঞ্চকর ট্রেন ভ্রমণের অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় করতে পারেন।



পাহাড়ের কোলে অপরূপ চা-বাগান

JALPAIGURI





REFERENCE



ট্রেনটি শিলিগুড়ি ছেড়ে সেবক হয়ে কখনও পাহাড়ের পাশ দিয়ে কখনও বা নদীর বুক চিরে আবার কখনও বা গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যায়। ট্রেনটি চাপরামারি, চালসা, সমগ্র ডুয়ার্স ছুঁয়ে রাজাভাতখাওয়া হয়ে আলিপুরদুয়ারে পৌঁছোয়। ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস আলিপুরদুয়ার থেকে ভোর সাড়ে ৫টায় এবং শিলিগুড়ি থেকে বিকাল ৪টায় ছাড়ে। আলিপুরদুয়ার থেকে শিলিগুড়ি যেতে সময় লাগে ৪ ঘণ্টা।

আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি শহরে জেলাপরিষদ, পৌরসভা, পূর্ত বিভাগ, মৎস্য বিভাগ, সেচ বিভাগ প্রভৃতি সংস্থার বাংলো রয়েছে। কম খরচে মধ্যবিত্তদের থাকার উপযোগী এইসব বাংলো।

বেশিরভাগ বাংলোতে খাওয়ার কোনও ব্যবস্থা থাকে না। তবে বাজার করে দিলে বাংলোর চৌকিদার রান্না করে দেয়।

শিয়ালদহ থেকে দার্জিলিং মেলে বা কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেসে নিউজলপাইগুড়িতে নেমে শিলিগুড়ি হয়ে জলপাইগুড়ি পৌঁছানো যায় বা সরাসরি জলপাইগুড়ি স্টেশনেও নামা যায়। তিস্তা-তোর্সা এক্সপ্রেস, কামরূপ এক্সপ্রেস, সরাইঘাট এক্সপ্রেস, কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস প্রভৃতি ট্রেনে সরাসরি জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন বা আলিপুরদুয়ারে নামা যায়। এছাড়া কলকাতা-জলপাইগুড়ি বা কলকাতা-আলিপুরদুয়ার সরাসরি বাস (রকেট) সার্ভিস তো আছেই।

শিয়ালদহ / হাওড়া থেকে ছাড়া নিউজলপাইগুড়িমুখী ট্রেনের সময়সারণি

ট্রেনের নাম	ছাড়ার সময় শিয়ালদহ / হাওড়া	পৌঁছোনোর সময় নিউজলপাইগুড়ি
৩১৪৩ আপ দার্জিলিং মেল	সন্ধ্যা ৭টা ১৫ মি. (শিয়ালদহ)	সকাল ৮টা ১৫মি.
৫৯৫৯ আপ কামরূপ এক্সপ্রেস	বিকাল ৩টে ২৫মি. (হাওড়া)	ভোর ৫টা ৩০মি.
৫৬৫৭ আপ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস	সকাল ৬টা ২৫মি. (শিয়ালদহ)	সন্ধ্যা ৬টা ১০মি.
৩১৪১ আপ তিস্তা-তোর্ষা এক্সপ্রেস	দুপুর ১টা ৪০মি. (শিয়ালদহ)	ভোর ৪টে ১৫মি.
৩০৪৫ আপ সরাইঘাট এক্সপ্রেস (মঙ্গল, বুধ, শনি)	রাত ১০টা (হাওড়া)	সকাল ৯টা ২৫মি.
৩১৪৭ আপ উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস (সোম, বুধ, শুক্র)	রাত ৯টা ১৫মি. (শিয়ালদহ)	সকাল ১০টা ৪০মি.
৩১৪৯ আপ কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস (মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি)	রাত ৯টা ১৫মি. (শিয়ালদহ)	সকাল ১০টা ১০মি.

নিউজলপাইগুড়ি থেকে ছাড়া শিয়ালদহ / হাওড়ামুখী ট্রেনের সময়সূচি

ট্রেনের নাম	ছাড়ার সময় নিউজলপাইগুড়ি	পৌঁছোনোর সময় শিয়ালদহ / হাওড়া
৩১৪৪ ডাউন দার্জিলিং মেল	সন্ধ্যা ৭টা ২০মি.	সকাল ৮টা ৪৫মি. (শিয়ালদহ)
৫৯৬০ ডাউন কামরূপ এক্সপ্রেস	বিকাল ৪টে ৪৫মি.	সকাল ৬টা ৩০মি. (শিয়ালদহ)
৫৬৫৮ ডাউন কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস	সকাল ৮টা	রাত ৮টা ৩৫মি (শিয়ালদহ)
৩১৪২ ডাউন তিস্তা-তোর্ষা এক্সপ্রেস	বিকাল ৩টা ৪৫মি.	ভোর ৬টা ৩৫মি. (শিয়ালদহ)
৩০৪৬ ডাউন সরাইঘাট এক্সপ্রেস (সোম, বৃহস্পতি, শুক্র)	সন্ধ্যা ৬টা ০৫মি	ভোর ৬টা (হাওড়া)
৩১৪৮ ডাউন উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস (মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি)	সন্ধ্যা ৬টা ৪৫মি.	ভোর ৬টা ৪০মি. (শিয়ালদহ)
৩১৫০ ডাউন কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস (বুধ, শুক্র, রবি)	সন্ধ্যা ৬টা ৪৫মি	ভোর ৬টা ৪০মি. (শিয়ালদহ)

বিঃ দ্রঃ—দার্জিলিং মেল ও কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস নিউজলপাইগুড়ি অবধি যায়। উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসের গন্তব্য নিউকোচবিহার পর্যন্ত। বাকি ট্রেনগুলি জলপাইগুড়ি জেলার অন্য মহকুমা শহর আলিপুরদুয়ারে দাঁড়ায়।

কলকাতা-বাগডোগরা উড়ানের সময়সূচি

উড়ানের নম্বর	ছাড়ার সময় কলকাতা	পৌঁছোনোর সময় বাগডোগরা
আই সি-৭২১ (ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স) (সোম, বুধ, শুক্র)	সকাল ১১টা ০৫মি.	দুপুর ১২টা ১০মি.
৯-ডব্লু-৬১৭ (জেট এয়ারওয়েজ) (সোম, মঙ্গল, শনি)	দুপুর ২টা ৪০মি.	দুপুর ৩টা ৪০মি.

বাগডোগরা-কলকাতা উড়ানের সময়সূচি

উড়ানের নম্বর	ছাড়ার সময় বাগডোগরা	পৌঁছোনোর সময় কলকাতা
আই সি-৭২২ (ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স) (সোম, বুধ, শুক্র)	দুপুর ১২টা ৪০মি.	দুপুর ১টা ৩৫মি.
৯-ডব্লুউ-৬১৮ (জেট এয়ারওয়েজ) (সোম, মঙ্গল, শনি)	বিকাল ৪টা ১০মি.	বিকাল ৫টা ১০মি.

তথ্যসংগ্রহ সহযোগিতায় : বরুণকুমার সাহা, সমর চট্টোপাধ্যায়, সুশীল রায় ও সিদ্ধার্থ মজুমদার।

লেখক ❑ পূর্বতন জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক, জলপাইগুড়ি।



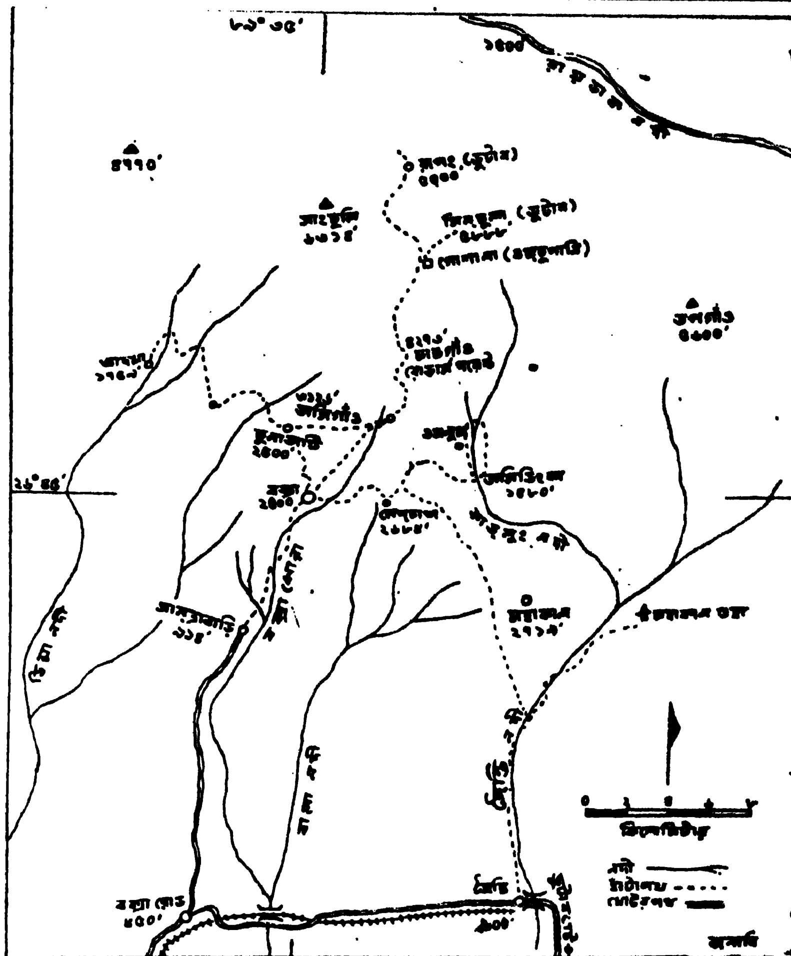
জগন্নাথ বিশ্বাস

রূপময় জলপাইগুড়ি

রূপময় জলপাইগুড়ি। হিমালয়ের পাদদেশে পূর্ব-পশ্চিমে অনেকখানি লম্বা এই জেলাটি। উত্তর দিক জুড়ে মাঝে মাঝে গেরুয়া ছোপ দেওয়া নীল পাহাড়ের শ্রেণী। নীচে নদীনালা ও ঝোরা দিয়ে খণ্ডিত বনভূমি। তরাই বা ডুয়ার্সের বিখ্যাত জঙ্গল। নানা প্রজাতির গাছপালা ও বন্যপ্রাণীর আবাস, জীববৈচিত্র্যে ভরা। পূর্ব হিমালয়ের উদ্ভিদ বৈচিত্র্য পৃথিবী বিখ্যাত। এই অঞ্চলের আর্দ্রতা খুব বেশি, তাই এখানে যতরকমের উদ্ভিদ প্রজাতি দেখা যায় তেমনটি অন্য কোথাও দেখা যায় না। উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরা এই অঞ্চলে চার হাজার সপুষ্পক উদ্ভিদ প্রজাতির সন্ধান পেয়েছেন। এছাড়া পেয়েছেন দুশো পঞ্চাশ প্রজাতির ফার্ন। তাছাড়া এ অঞ্চলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল বৈচিত্র্যময় অর্কিড পরিবারের বিভিন্ন প্রজাতির সমাবেশ। আর আছে পাখি। ভারতের প্রায় বারোশো প্রজাতির পাখির মধ্যে প্রায় চারশো প্রজাতির দেখা মেলে এই জেলায়।

এসবের হদিশ পেতে হলে জেলাটি আগে একটু দেখে নিতে হয়। জলপাইগুড়ি শহর থেকে বাসে শিলিগুড়ি। সেবক ব্রিজ পার হয়ে ডামডিম, মাল, গরুবাথান। তারপর চালসা। এখান থেকে নানা জায়গায় যাওয়া যায়। চালসা থেকে ১৫ কিলোমিটার দক্ষিণে গরুমারা অভয়ারণ্য। আর একটু দক্ষিণে লাটাগুড়ি, ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়ি ও গয়েরকাটা। চালসার উত্তরে মেটেলি, সামসিং। আর একটা পথে খুজিয়া মোড় হয়ে ঝালং ও জলঢাকা। একটু পূবে এগিয়ে বানারহাট থেকে সামচি। তারপর বিন্নাগুড়ি, বীরপাড়া, লংকাপাড়া, মাদারীহাট, হাসিমারা, জলদাপাড়া অভয়ারণ্য, জয়গাঁ, ফুন্টশোলিং (ভুটান), রাজাভাতখাওয়া, আলিপুরদুয়ার। রাজাভাতখাওয়া থেকে উত্তরে বক্সা ও জয়ন্তী পাহাড় মাত্র ১৫ ও ২০ কিলোমিটার দূরে। পূবে রাস্তা গিয়ে ঠেকেছে রায়ডাক নদীর ধারে ভুটান ঘাটে। তারপরই ভুটান ও আসাম সীমান্ত।

এই যে এতগুলো জায়গার নাম এক নিঃশ্বাসে বলে জলপাইগুড়ি জেলার পশ্চিমপ্রান্ত থেকে পূর্ব প্রান্তে এসে ঠেকলাম, এর দু'ধারেই ছড়িয়ে রয়েছে রূপময় জলপাইগুড়ি। বাসে এবং হাঁটা পথে এর সৌন্দর্যকে উপভোগ করতে হয়।



জলপাইগুড়ির বিভিন্ন পথনির্দেশ।

পশ্চিমবঙ্গের উত্তর সীমান্তে তরাই অঞ্চল ডুয়ার্স নামে পরিচিত। পাহাড়, নদী, ঝর্ণা, গভীর অরণ্য ও সবুজে সম্মোহিত দিগন্তবিস্তৃত চা বাগানগুলো এ অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য। এখানে রয়েছে ভেষজ গুল্মের অফুরন্ত ভাণ্ডার। শতমূলী, সর্পগন্ধা, পিপুল, আমলকী, বহেরা, রিঠার একচ্ছত্র সাম্রাজ্য। অসংখ্য পাখি, প্রজাপতি, কীটপতঙ্গ। ১৮৯৫-৯৬ সালে এ অঞ্চল জরিপ করেছিলেন ডি.এইচ.ই সান্ডার সাহেব। তার ওই সার্ভে রিপোর্ট ডুয়ার্স সংক্রান্ত একটি মূল্যবান দলিল। শুধু জমির জরিপ নয়, ডুয়ার্সের নিসর্গ চিত্র, জীবজন্তু ও মানুষের কথাও উল্লেখ করেছেন বিস্তৃতভাবে। সিঞ্চুলা পাহাড়ের সৌন্দর্য এবং বক্সা পাহাড়ের চমৎকার বর্ণনা রয়েছে এতে। এক জায়গায় তিনি লিখেছেন : "ডুয়ার্সের জঙ্গলের প্রকৃষ্টতম ধারণা পাওয়া যায় বছরের যে কোনও সময় আলিপুরদুয়ার-বক্সা, রাস্তাটি ধরে গেলে। দুদিকে দীর্ঘকায় শাল, সিজ, চাপ, সিদা ইত্যাদির ছায়া ঢাকা ওই রাস্তাটি। রাস্তায় জংলি মুরগি খাবার খুঁটে বেড়াচ্ছে। এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রাস্তা ভরে বর্ণাঢ্য প্রজাপতিদের মেলা। হঠাৎ হরিণ, বাঘ ও হাতির দেখাও মিলতে পারে।" আজ এত বছর পরেও রাস্তাটির কিয়দংশ সেই একই রকম আছে।

বস্তুত ডুয়ার্সের বিস্তীর্ণ এলাকার পশ্চাদ্‌ভূমি বা ব্যাকগ্রাউন্ড বলা যায় ভুটান পাহাড়। আয়তনে ডুয়ার্স ৪,৭৫০ বর্গ কিলোমিটার। ১,২৫০ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে নিবিড় অরণ্য। ১৫২ টি চা বাগান ডুয়ার্সের বুকে, যার বেশিরভাগই পড়েছে জলপাইগুড়ি জেলায়।

ডুয়ার্সের লোভনীয় দ্রষ্টব্যস্থল বলা যায় বক্সা ও জয়ন্তী। একদা আলিপুরদুয়ার থেকে জয়ন্তী পর্যন্ত রেলপথ ছিল গভীর জঙ্গলের ভিতর দিয়ে। রেলপথটি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এখন যাতায়াত বাসে। জয়ন্তীর আকর্ষণ পাহাড়, অরণ্য, নদী। অসামান্য নিসর্গ চিত্র। জয়ন্তী থেকে হাঁটাপথে যাওয়া যায় মহাকাল মন্দিরে। পাশেই কয়েকটি অন্ধকার গুহা। মোমবাতি নিয়ে ঢুকলেই দেখা যায় আশ্চর্য দৃশ্য। চুন আর জল মিশে হাজার হাজার বছর ধরে এই সব আশ্চর্য দৃশ্য সৃষ্টি হয়েছে। দেখতে জলের ফোঁটার মতো নরম অথচ কঠিন প্রস্তরীভূত সব আকৃতি। ফাঁকা সুড়ঙ্গের দেওয়াল আর ছাদ চুঁইয়ে পড়ছে জল। বেশিরভাগ জলই গড়িয়ে চলে যায়। তবু তিলার্ধ যে চুণের গুঁড়ো দেয়ালের গায়ে আর ছাদে লেগে থাকে তাই তিলতিল করে জমা হয়ে নানা কঠিন আকৃতি নেয়। উপর থেকে ঝুলতে ঝুলতে যেগুলো বাড়ছে তাদের নাম স্ট্যালাকটাইট। মাটির উপর ফোটা ফোঁটা জল পড়ে যেগুলো ধীরে ধীরে উঁচু হয়ে উঠছে

তাদের নাম স্ট্যালাক্‌মাইট। এই আশ্চর্য গুহাগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তদারকির অভাবে।

জয়ন্তী থেকে লেপচাখা হয়ে যাওয়া যায় বক্সা পাহাড়ে। নতুবা জয়ন্তীর আগেই বক্সা রোডে নেমে সান্ত্রাবাড়ি হয়ে হাঁটাপথে বক্সাদুয়ার। এখান থেকে অনেকগুলো ট্রেকিং রুট আছে। চুনাভাটি, ডাসিগাঁও, রূপং, লেপচাখা, ওসেলুম, তাসিডিংকা, কাত্‌লুং নদী এবং জলপাইগুড়ি জেলার সর্বোচ্চ পাহাড় তপগাঁ (৫,৬০০ ফুট)। তাছাড়া বক্সাদুয়ারে আছে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অনেকেই যেখানে বন্দী ছিলেন সেই বন্দীশালা। এখন এই বিশাল বন্দীশালার অধিকাংশই প্রায় ভগ্নস্তূপ।

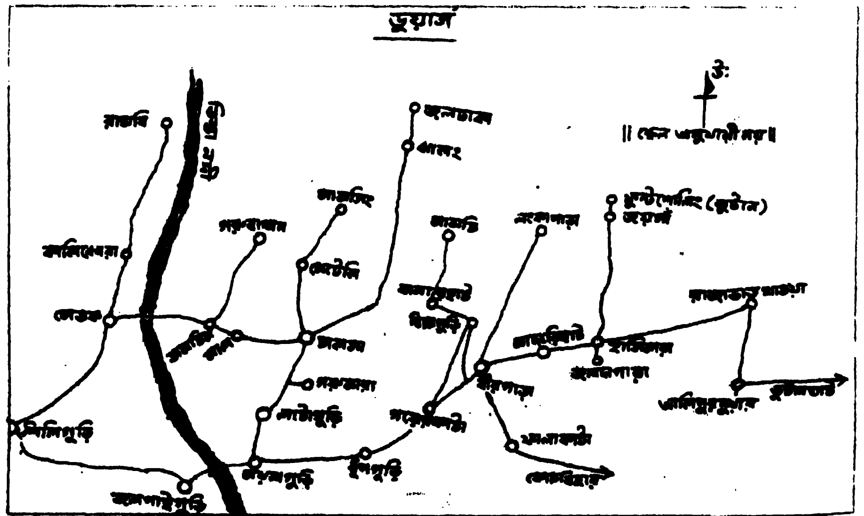


জলপাইগুড়ির চা বাগান : সবুজে আর নীলে মেশামেশি

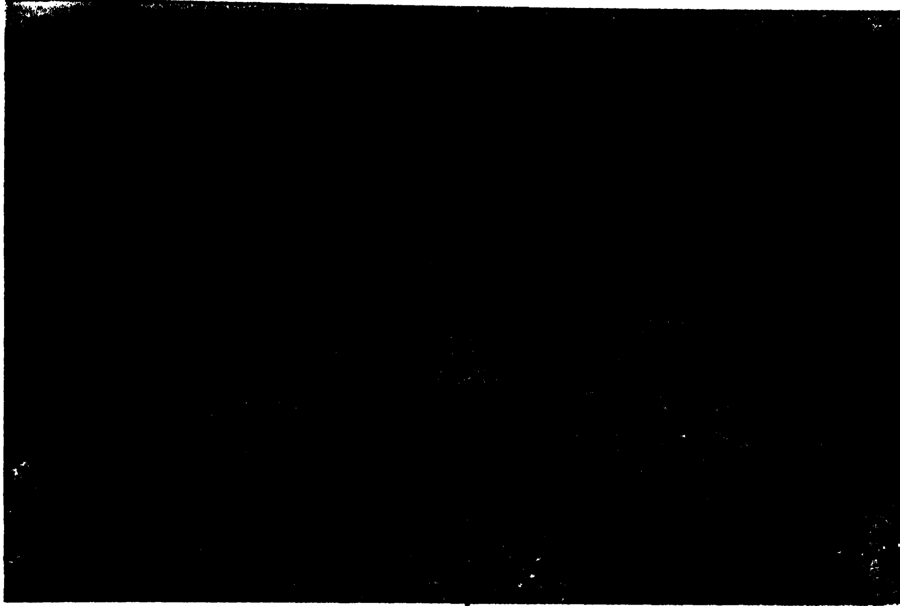
ডুয়ার্সের লোভনীয় দ্রষ্টব্যস্থল বলা যায় বক্সা ও জয়ন্তী। একদা আলিপুরদুয়ার থেকে জয়ন্তী পর্যন্ত রেলপথ ছিল গভীর জঙ্গলের ভিতর দিয়ে। রেলপথটি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এখন যাতায়াত বাসে। জয়ন্তীর আকর্ষণ পাহাড়, অরণ্য, নদী। অসামান্য নিসর্গ চিত্র। জয়ন্তী থেকে হাঁটাপথে যাওয়া যায় মহাকাল মন্দিরে। পাশেই কয়েকটি অন্ধকার গুহা। মোমবাতি নিয়ে ঢুকলেই দেখা যায় আশ্চর্য দৃশ্য। চুন আর জল মিশে হাজার হাজার বছর ধরে এই সব আশ্চর্য দৃশ্য সৃষ্টি হয়েছে। দেখতে জলের কৌটার মতো নরম অথচ কঠিন প্রস্তরীভূত সব আকৃতি।

রাজাভাতখাওয়ার ঘন বনের মধ্য দিয়ে শীতের ধূ-ধূ প্রান্তর ডিমা নদী। ডিমা থেকে কালচিনি দীর্ঘ চা বাগান ও অরণ্যবেষ্টিত পথ সত্যিই অপরূপ। ওখান থেকে বেড়াতে চলুন ডুয়ার্সের বনে বনে রায়মাটাং, চিঞ্চুলা, চুয়াপাড়া, পানানদী পেরিয়ে সেন্ট্রাল ডুয়ার্সের রাঙামাটি চা-বাগান। আসুন নিতি রেঞ্জ হয়ে নিমমতি-দোহিনী, নিমতিঝোরা। এখান থেকে যেতে পারেন গড় মেন্দাবাড়ি, চিলাপাতার জঙ্গলে। গড় মেন্দাবাড়িতে নলরাজার গড়ের ভগ্নাবশেষ। ইতিহাস ও কিংবদন্তীর জটাজালে আচ্ছন্ন। ঘোরতর জঙ্গলের ভিতর দিয়ে গাইড ছাড়া যাতায়াত নিরাপদ নয়।

চিলাপাতার জঙ্গল থেকে হাসিমারা, দলসিংপাড়া, তোর্সা চা বাগান পেরিয়ে দেখে আসতে পারেন ফুন্টশোলিং। ওখানে তোর্সা নদী পার হয়ে পশ্চিম দিকে টেটোপাড়া যেতে পারেন। ঘন্টা তিনেকের হাঁটা পথ। সেখান থেকে লংকাপাড়া হয়ে বিখ্যাত মাকরাপাড়া কালী মন্দির। মন্দিরের পিছনেই পাগলি নদী। ওখান থেকে দলমোর হয়ে বীরপাড়া, রেলস্টেশনের নাম দলগাঁ। বীরপাড়া থেকে সোজা সড়ক চলে গেছে তাসাটি হয়ে জটেশ্বর, ফালাকাটা। বাঁ দিকে শিশুবাড়ি, রাঙালিবাজনা হয়ে মাদারীহাট। মাদারীহাটের গায়েই জলদাপাড়া অভয়ারণ্য।



ডুয়ার্স নির্দেশিকা



জয়ন্তীর ডলোমাইট পাহাড় ও নদী

ছবি : প্রণবেশ সান্যাল

বীরপাড়া থেকে জলপাইগুড়ি অভিমুখে প্রথমেই গয়েরকাটা। আঙরাভাসা নদীর ধারে গয়েরকাটা চা বাগান। কাছেই খুঁটিমারি, ডাউকিমারি, গোঁসাইহাট, নাথুয়া। খুঁটিমারিতে মেহগনি, শাল ও সেগুনের ছড়াছড়ি। বানারহাটে দিগন্তবিস্তৃত শুধু চা বাগান। অদূরে ডায়না নদী, দূরে সামচি পাহাড়। ডায়না পেরিয়ে রেডব্যাংক, কেরন, নাগরাকাটা হয়ে চালসা চৌমাথা। চালসা থেকে আঁকাবাঁকা পথে ইংডং হয়ে মেটেলি ও মেঘে ঢাকা সামসিং। আপারটুন্ডু, লোয়ারটুন্ডু ও অপরূপ মূর্তি নদী। চালসা থেকে চাপড়ামারি জঙ্গলের ভিতর দিয়ে জাদুপাহাড়। সেখান থেকে চম্পাগুড়ি হাট, কুর্তি, নয়াসাঁইলি হয়ে থালঝোরা। সেখান থেকে দেখুন সুন্দরা জিতিকে। অতুলনীয় জিতির সৌন্দর্য। আঁকাবাঁকা পথ শেষ হয়েছে জিতি চা বাগানে। পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে জলঢাকা নদী। নদী পার হলেই শিবসু ভুটান, গোলাবাজার। সেখান থেকে নেমে আসুন জোলা ব্রিজ দিয়ে ঝালং পাহাড়ে। নয়তো বিন্দুতে। বিন্দু থেকে বাস পাবেন। ঝালং থেকে রংগোর ভেষজ উদ্যান হয়ে খুমিয়া মোড় দিয়ে চালসা। নয়তো বাতাবাড়ি, ধূপঝোলা হয়ে লাটাগুড়ি, বামনিঝোরা, গরুমারা জাতীয় উদ্যান।

অনেক জায়গার নামই করা গেল না রূপসী ডুয়ার্সের। তবে যদি এবার শুধু একটি জায়গাতেই যেতে চান তবে চলে যান মেটেলি পাহাড়ে। চালসা থেকে মাত্র সাত কিলোমিটার, পায়ে হেঁটেই যান বাসে গুঁতোগুতি না করে। সৌন্দর্য এখানে থরে থরে সাজানো। কদাচিৎ দু-একজন লোক শান্ত চা বাগানের নির্জন বকুল বিছানো পথে হেঁটে চলেছে।

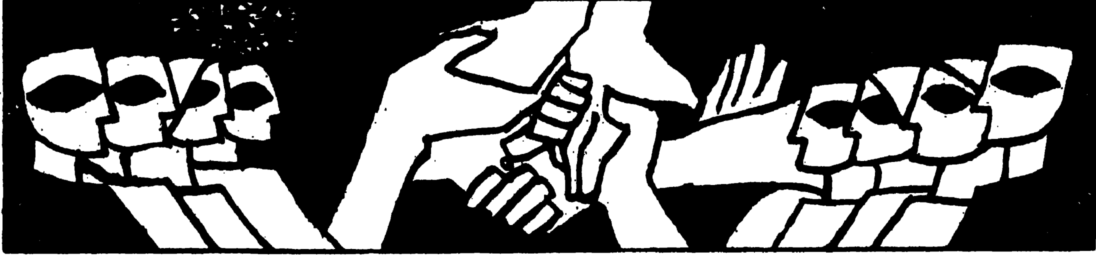
এবার ভুটানঘাট। আলিপুরদুয়ার থেকে লতাবাড়ি পর্যন্ত আড়াই-তিন ঘন্টার বাস ভ্রমণ। এই পর্যন্তই যায় বাস। দোকানে চা খেয়ে তিন কিলোমিটার হেঁটে খরস্রোতা রায়ডাক নদীর ধারে ডাকবাংলো। এখানে এই নদীর দৃশ্য ঘন্টার পর ঘন্টা বসে দেখা যায়। পাহাড় থেকে দুর্দান্ত বেগে নদী নেমে আসছে। উজানে তিন-চার কিলোমিটার দূরে ঝোলানো ব্রিজ পার হয়ে পিপিং খোলা, দু-তিনটি চায়ের দোকান। তিনদিকেই ভুটান। কমলালেবুর মরশুমে প্রচুর জনসমাগম হয়। নদীর পূর্ব পাড়ে কালীখোলা, যমদুয়ার সবই ভুটানের মধ্যে। এখানে তুরতুরী ও হাতিপোতা হয়ে কাইজালি বস্তি দিয়ে হাতি-অধ্যুষিত গা ছমছম করা জঙ্গলের মধ্য দিয়েও আসা যায়। আসুন একবার শীতকালে।

লেখক ❑ কবি, প্রকৃতিবিদ ও প্রাবন্ধিক



ময়নাগুড়ির দোমোহনীতে প্রস্তাবিত ইকোট্যুরিজম পার্ক

ছবি : উৎপল মণ্ডল



সুবোধকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

সম্প্রীতি চেতনায় জলপাইগুড়ি

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চেতনায় জেলার জনগণ

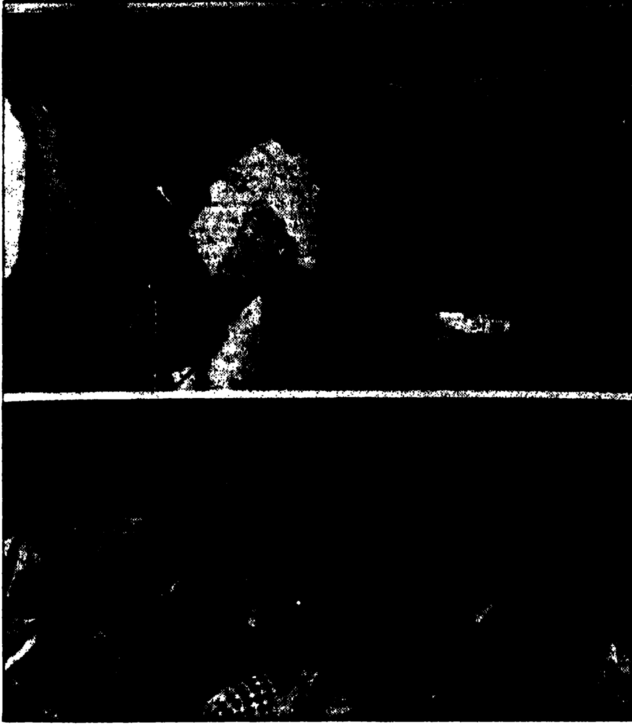
জলপাইগুড়ি জেলা গঠিত হয় ১৮৬৯ খ্রিঃ ১ জানুয়ারি। জন্মের আগেও এই জেলার ভূখণ্ডে মানুষ ছিল, তবে নেহাৎই কম। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে সেই এলাকা ছিল রংপুর (বর্তমানে বাংলাদেশ) প্রশাসনের এক্তিয়ারে। ১৮৬ বছর আগে রংপুর, দার্জিলিং, গোয়ালপাড়া (বর্তমানে অসমে) এবং পূর্ব ও পশ্চিমদুয়ার অঞ্চল ছিল একই প্রশাসনের অধীন।

গভীর বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত, হিংস্র জন্তু-জানোয়ার শঙ্কুল এলাকার শাস্ত্র এবং পুরাণের পরিচয় কিরাতভূমি আর বসবাসকারীরা কিরাত জাতি। মিশ্রণ আর বহিরাগত মানুষের আগমনে, এই জেলায় নানা ভাষা, সংস্কৃতি ও কৃষ্টির, নানারূপ রচিত হয়ে আছে, আদি পর্ব থেকেই। দুর্গম অঞ্চল, অপ্রতুল যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং ইংরেজদের ভিন্নতর দৃষ্টিভঙ্গীই এই জেলার মানুষকে অনুন্নত, দীর্ঘকাল এক অসম্পূর্ণ জীবন ও সমাজে আবদ্ধ রেখেছে। এখন অবশ্য সেই অবস্থাটা আর নেই।

এই জেলার নানা প্রান্তে অভিবাসন শুরু হয়েছিল প্রায় ১৭০ বছর আগে থেকেই। দেশের নানা প্রান্ত থেকে বিভিন্ন জাতি, উপজাতির মানুষজন এই জেলায় এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।

এছাড়াও ব্যাপক অংশের মানুষ দেশভাগের ফলে, নিজ আবাস থেকে বিতাড়িত হয়ে পূর্ববঙ্গ (পূর্ব পাকিস্তান) থেকে এই জেলায় আশ্রয় নিয়েছেন। পরে আবার অসমের 'বঙ্গাল-খেদাও' আন্দোলনের শিকার বহু বঙ্গ-ভাষী মানুষরাও এসেছেন মান ও প্রাণের মায়ায়।

এক কথায় বলা চলে, জলপাইগুড়ি জেলা এক বিচিত্র জেলা। সেই বৈচিত্র্য রয়েছে প্রাকৃতিক পরিবেশে দুর্গম পাহাড়-পর্বত, ভয়াবহ নদ-নদী, গভীর অরণ্য আর অনিশ্চিত জীবনপথে। আর রয়েছে জেলায় বসবাসকারী নানা জনজাতির ভাষা, সাহিত্য, শিল্প সংস্কৃতিতে। রাজবংশীদের ভাওয়াইয়া



তিস্তা-গঙ্গা উৎসবের উদ্বোধন করছেন জলপাইগুড়ির সাংসদ শ্রীমতী মিনতি সেন

আর নদীমাতৃক পূর্ববঙ্গীয়দের, ভাটিয়ালির মেল-বন্ধন ঘটেছে এখানেই।

স্বাধীনতাপূর্ব ইতিবৃত্ত

ইতিহাসের ধূসর অতীতে ১৭৮৩ খ্রিঃ, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে রংপুরের পীরগাছায়, ইজারাদার দেবী সিংহের অত্যাচার পীড়নের বিরুদ্ধে কৃষককুলের সংগ্রাম কাহিনী আছে, তার প্রভাব এই অঞ্চলের কৃষকের উপরেও অবশ্য পড়ে থাকবে। তারপরেও সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, ভবানী পাঠকের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষ এসবু কাহিনীরও সম্ভবত বাস্তব ভিত্তি ছিল।

১৮৭৪ সালে গাজলডোবায় প্রথম চা-বাগিচা স্থাপন এই জেলায়। সাদা কালোর ফারাক দ্রুত অনুভূত হল, বিহার, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ থেকে আগত শ্রমিকদের আর পূর্ববঙ্গ, রংপুর, দিনাজপুর থেকে বিচ্ছিন্নভাবে আগত চা-বাগানের বাবু কর্মচারীদের অত্যাচার, জুলুমের বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্নভাবে হলেও সংগ্রাম আন্দোলন হয়েছে।

রাষ্ট্র যে নীতিতে পরিচালিত সেটাই রাজনীতি, শোষণ-নীতিতে দমন-পীড়ন হাতিয়ার রাষ্ট্র পরিচালকের। কাজেই রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যক্তির সমষ্টির সংঘাত অনিবার্য, ইতিহাসের এই শিক্ষা। মানুষ সংঘবদ্ধ হয় শক্তি সংগ্রহ করে প্রতিকারের আশায়। তাই সম্প্রীতিও গড়ে ওঠে। সেই সম্প্রীতি প্রসারিত হয় শিল্প, সংস্কৃতি ও নানা প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। অতীত দিনের ভূমিকা এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে না গেলে, বোধের ক্ষেত্রে ঘাটতি থেকে যাবে।

১৯২১ সালে জাতীয় কংগ্রেসের শাখা গঠিত হল জলপাইগুড়ি জেলায়। ১৯২২ সালে মাঞ্চেস্টারের কাপড়ের কলকে চ্যালেঞ্জ করে খোলা হল বয়ন বিদ্যালয়। তারও আগে ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ রোধ আন্দোলনের ঢেউ আছড়ে এসে পড়ল এই জেলায়ও। সেইকালে নতুন জনসমাবেশ ঘটছিল। সামাজিক কারণেই শহর এবং গ্রামের মানুষের মধ্যে যে আত্মিক সম্প্রীতির প্রয়োজন ছিল তার বিকাশ অনেক ক্ষেত্রেই হয়ে ওঠেনি।

১৯২০ সালের ২৯ মে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এসেছিলেন, কংগ্রেস সংগঠন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে। তাঁর উদাত্ত আহ্বান সম্প্রীতি, ঐক্য আর সংগ্রামের। সভার সভাপতি জগদিন্দ্রদেব রায়কত। চেতনার বিকাশ ঘটাতে তখন কৃষক ও সাধারণ মানুষের হাতে হাতে প্রচারপত্র বিলি হত। পাঠ করে শোনানো-বোঝানো হত।

খাসমহলের এলাকায় সরকারি ব্যবস্থাপনায় হাট আর চা-বাগিচাগুলি মালিকদের ইজারা দেওয়া হত। কোথাও কংগ্রেসকর্মীদের প্রবেশাধিকার ছিল না। তবুও কৃষক সংগঠন গড়ে তোলার পর, ডুয়ার্সের শ্রমিক-কৃষক-বাবুদের সপ্তাহান্তে মিলন ক্ষেত্র হিসেবে গ্রামীণ চা-বাগিচার ও হাটগুলোর গুরুত্ব ছিল অপরিসীম।

১৯২৫ সালে গান্ধীজি এলেন। আন্দোলনের জোয়ার এল। ইংরেজ আতঙ্কিত। ভাগ কর, শাসন কর, নীতি তাদের শাসন আর শোষণের কৌশল। সে চেষ্টাও হল গোপনে। রায়কত পরিবার কোচবিহার রাজ পরিবারের অংশ। এই পরিবারকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলে, অধিকাংশ অধিবাসীদের সঙ্গে অ-রাজবংশী শহুরে অধিবাসীদের মধ্যে বিভেদ বজায় রাখা সম্ভব হবে। তবে, এই আশা শেষ পর্যন্ত ফলপ্রসূ হয়নি।

গান্ধীজির আগমন কেন্দ্র করে সমগ্র জেলায় বিপুল উদ্দীপনার সৃষ্টি হল। ডাঃ চারুচন্দ্র সান্যাল অধিবেশনের নেতৃত্ব দিলেন। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের বাইরেও তিনি জেলার বিভিন্ন জনজাতির অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব।

১৯৩৯ সালে জেলার বোদা থানার অন্তর্গত ময়দান দিঘিতে জেলার প্রথম কৃষক সমিতির সম্মেলন হল। অভ্যর্থনা কমিটির চেয়ারম্যান অনাথসরণ গৌতম আর সম্পাদক ছিলেন মহীনাথ খাঁ।

শ্রমিক সংগঠন গড়ে ওঠার আগে মূলত জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-কেন্দ্রিক ছিল সাধারণ মানুষের চেতনা বিকাশের ধারা। কর্মসূচি ভিত্তিক সম্প্রীতির চেতনা কখনও গতিলাভ করেছে আবার কখনো হয়তো তা ঝিমিয়ে গেছে। সেইকালে মানুষের চেতনা বিকাশলাভে তীব্রতা এবং ক্ষিপ্রতার বহিঃপ্রকাশ তেভাগা আন্দোলনে।

এই প্রসঙ্গে ১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়ো' আহ্বান ব্যাপক উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে জেলার যুবসমাজকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। গ্রাম-শহর উন্মত্ত হয়ে পড়েছিল সেই আন্দোলনের ধারাপথে।

১৯৪৫ সালে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে ডুয়ার্সের মালবাজার ডাকবাংলোর মাঠে প্রকাশ্য সম্মেলনের মধ্য দিয়ে বাগিচা শ্রমিকদের কেন্দ্রীয়ভাবে ইউনিয়ন গঠিত হল। সম্পাদক দেবপ্রসাদ ঘোষ (পটলবাবু) এবং সভাপতি রতনলাল ব্রাহ্মণ।

তারও অনেক আগে ১৯৩৮ সালে বি. এ. রেলওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন গঠিত হয়েছিল। দেবপ্রসাদ ঘোষ, বাগিচা সংলগ্ন এলাকায়

রেল গ্যাঙ কোয়ার্টারে ঘুরে ঘুরে রেল শ্রমিকদের সংগঠিত করেন এবং সচেতন করে তোলেন। বাগিচা শ্রমিকের সঙ্গে রেলশ্রমিকের সম্পর্ক স্থাপিত হল। সেই পরিচর্যার ফসল লাল শুক্রা, জগন্নাথ ওঁরাও আরো অনেকে।

সম্প্রীতির চেতনায় জেলায় তেভাগা আন্দোলনের তাৎপর্য

অবিভক্ত বঙ্গদেশে তেভাগা আন্দোলন, কৃষক আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সম্প্রীতির নিরিক্ষে। জলপাইগুড়ি জেলায় সেই আন্দোলন আরও তাৎপর্যবহ।

হান্টার তাঁর Statistical Account of Bengal গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, ১৮৭০ সালের আগে দেশে ভূমিহীন কৃষক ছিল না।

জনজাতি, উপজাতিদের নানা পালা-পার্বণে এবং সামাজিক ক্রিয়াকর্মে সমবেত নৃত্য ও সঙ্গীতের প্রাধান্য এমনকি কর্ম-জীবন আলেখ্য হিসেবে, বনে শিকার করতে যাওয়া বা শিকার করা, মাছ ধরতে যাওয়া ও ধরার গান ও নাচ, মেচ রাভা প্রভৃতি মঙ্গোলিয়েড্ গোষ্ঠীর মধ্যে বহুল প্রচলিত। গানে ও নাচে সংঘবদ্ধতার আহ্বান তথা জীবনসংগ্রামেরই ছবি।

১৮৭০ সাল থেকে ওই শতাব্দীর শেষ কাল পর্যন্ত পর পর দুর্ভিক্ষ হল। কৃষককুল ঋণগ্রস্ত হয়ে জমি বিক্রি করতে বাধ্য হল। আর সঙ্গতিসম্পন্ন লোকেরা জমি কিনে ধীরে ধীরে জোতদার হয়ে দাঁড়াল। তৎকালে জেলা নন রেগুলেটেড জেলা। জমির বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে বিভিন্নতা ছিল। জোতদার আর মহাজনের শোষণ অব্যাহত ছিল ফলত কৃষকের ক্ষোভ বিক্ষোভও ছিল।

১৯৩৪-৩৫ সালে স্বাধীনতা আন্দোলনের পাশাপাশি, কংগ্রেসের মধ্যে সি. এস. পি এবং বামপন্থী মার্কসবাদীরাও ছিলেন। জেলার সি. এস. পি'র কমিউনিস্ট সদস্যরা কৃষক সমিতির কাজকে দ্রুত বামপন্থী (C. P. I) আন্দোলনে নিয়ে আসেন।

জেলার তেভাগা আন্দোলনে দুটি ভিন্ন ধারা। প্রথমত বোদা, পচাগড়, দেবীগঞ্জ থানার কৃষক আন্দোলনের অতীত ঐতিহ্য ছিল। বিশেষ করে রংপুর দিনাজপুরের সচেতন কৃষক আন্দোলনের প্রভাব ছিল, ওই অঞ্চলের কৃষক আন্দোলনে। কিন্তু ডুয়ার্সের কৃষক আন্দোলন, ভৌগোলিক, প্রাকৃতিক এবং ভূমি ব্যবস্থার পার্থক্য জনিত কারণে, উল্লেখযোগ্যভাবে গড়ে উঠতে পারছিল না। লক্ষ্য করার বিষয়, ১৯৩৮ সালের রেলশ্রমিক সংগঠন যখন চেতনা সম্পন্ন হয়ে, বাগিচা শ্রমিকদের সংগঠন গড়ার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিল তখন সেই সংহত শ্রমিক সংগঠন কৃষকের আন্দোলনে সম্মুখের সারিতে এসে কৃষকের তেভাগা আন্দোলনকে এক চরম পর্যায়ে নিতে পেরেছিল। ডুয়ার্সের তেভাগার লড়াই পূর্বোক্ত জমির লড়াইয়ের থেকে বিন্দুমাত্র পিছিয়ে ছিল না। কৃষকের জমির লড়াইয়ে প্রাণ দিয়েছেন চা-বাগিচা-শ্রমিক, রেল শ্রমিকও। মাল এলাকায় ৫ জন (১.৩.১৯৪৭) মঙ্গলবাড়ি হাট-মেটেলি এলাকায় ৯ জন (৪.৩.১৯৪৭) ডুয়ার্সের 'সুন্দরদিঘি গ্রামাঞ্চলের' সকলের বুড়িমা-পুণ্যেশ্বরী বর্মণ ওই অঞ্চলের তেভাগা আন্দোলনের স্মরণীয় সাহসী নেতৃত্ব। এখানে ওঁরাও, মুণ্ডা, সাঁওতাল আর রাজবংশী শ্রমিক-কৃষক—কে হিন্দু কে মুসলমান তেভাগার খোলানে, তাঁদের পৃথক চেহারা চিনে নেওয়া ছিল অসম্ভব।

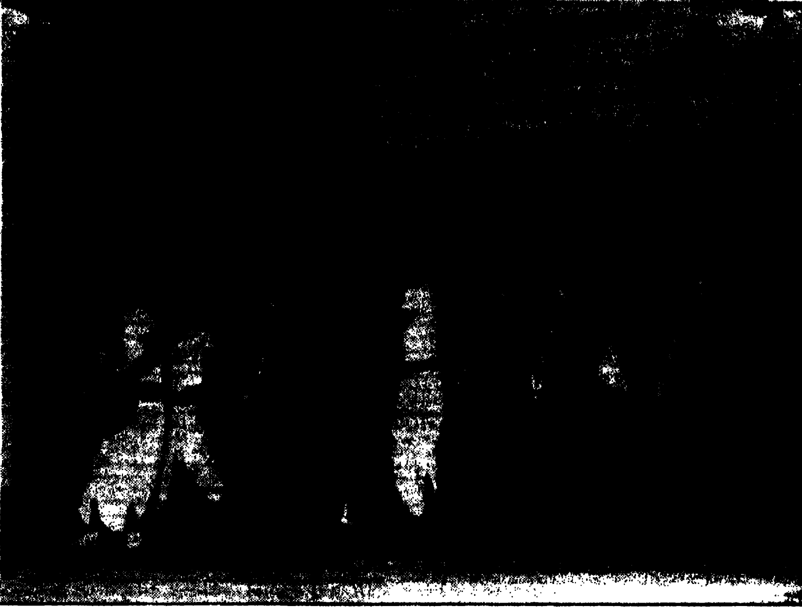
জেলার শ্রমিক বিক্ষোভ-আন্দোলনে সম্প্রীতির প্রশ্নে

অতীতে শিল্প হিসেবে উল্লেখ করবার মতো কিছু ছিল না এই জেলায়। কাজেই শিল্প শ্রমিক বলতে যা বোঝা যায়, তা গড়ে ওঠেনি। আদিবাসীদের কুটির শিল্প ছিল মূলত নিজেদের প্রয়োজন মেটাতে।

শিল্প বলতে একমাত্র চা-শিল্প। ভূমিচ্যুত বাস্তুহারা চা-বাগিচা শ্রমিকরা যতটা না শ্রমিক তার চাইতেও তাঁদের বেশি সম্পর্ক, কৃষিতুল্য চা-গাছের সঙ্গে। কাজেই শ্রমিক মন যেভাবে কলে পড়ে গড়ে ওঠে, এঁদের ক্ষেত্রে তা অর্জন করা কঠিনও বটে। সমাজ, বহির্জগৎ, শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত চা-শ্রমিকরা কলে পড়া ইঁদুরের মতো ছিল। শুধু মৃত্যু, ধ্বংসের অপেক্ষায় কলের মাঝে ঘুরপাক খাওয়া একদল মানুষ, সেই আমলে চা-শ্রমিকরা কেমন



তিস্তা-গঙ্গা উৎসব ২০০১, একটি মিছিল



আদিবাসী নৃত্য।

আলিপুরদুয়ার, কলাড়ী, ফালাকাটা, কালচিনি, কুমারগ্রাম, মাদারীহাট, বীরপাড়া'—(কিরাতভূমি-জলপাইগুড়ি জেলার ১২৫ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে, পৃঃ ১৮১) জেলার প্রত্যন্ত পাহাড়-পর্বত-গভীর বন অঞ্চলের, অধিবাসীদের মধ্যে তিব্বত-চীন পরিবারের আসাম-বর্মা গোষ্ঠীর মেচ, রাভা উপজাতির লোকজন, কৃষি জমিন এলাকার রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষ, চা-বাগিচা ভিত্তিক, সাঁওতাল, ওঁরাও, মুণ্ডা, অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর মানুষ, নেপালি মানুষ জন। এছাড়াও এসেছেন, বাঙালি, বিহারি, মাড়োয়ারি প্রভৃতি। যে সব আদিবাসী এই জেলার লোক-জীবনের বিবর্তন ধারায় কমবেশি প্রভাব বিস্তার করেছে, তারা হল লেপচা, হাজং, ভূমিজ, গাড়ো, চাকমা, ধুপকা, ভুটিয়া, শেরপা, মালপাহাড়িয়া, নাগেশিয়া, কোরা, মাহালি, খোরিয়া প্রভৃতি।

বহু বিচিত্র এই জনসমাবেশে যেমন আছে নানা বৈচিত্র্যময় জাতি, উপজাতি, জনজাতি তেমনই আছে নানা ধর্ম, সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি ভাষা। তবুও তো মানব জীবনযাত্রায় সংগ্রামের বিভিন্ন ধারার মধ্যেও, এক সমন্বয়ের সুর। আর সেই ধারা প্রবাহিত হয়ে আসছে নাচে গানে ছন্দের তালে তালে। প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন ধারার মধ্য দিয়ে, প্রসারিত হচ্ছে সমন্বয়ের সাধনা।

জনজাতি, উপজাতিদের নানা পালা-পার্বণে এবং সামাজিক ক্রিয়াকর্মে সমবেত নৃত্য ও সঙ্গীতের প্রাধান্য এমনকি কর্ম-জীবন আলেখ্য হিসেবে, বনে শিকার করতে যাওয়া বা শিকার করা, মাছ ধরতে যাওয়া ও ধরার গান ও নাচ, মেচ রাভা প্রভৃতি মঙ্গোলিয়েড্ গোষ্ঠীর মধ্যে বহুল প্রচলিত। গানে ও নাচে সংঘবদ্ধতার আহ্বান তথা জীবন-সংগ্রামেরই ছবি।

চা-বাগানের আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজন সহজ সরল জীবন আচরণে অভ্যস্ত। শত দুঃখ কষ্টেও সদাহাস্যময়। এদের ধর্মীয় আচরণে, কর্মজীবনে নানাছন্দের নৃত্য-সঙ্গীত। আবার জীবন সংগ্রামেরও ছবি। ইংরেজ সাহেবদের অত্যাচার, জুলুমের বিরুদ্ধে ক্ষোভ-মাত্রী ভাষায় :

'হামারা দেশমে আকে
হামারা পয়সা খাকে,
আঁখ না দিখানা।'

চা-শ্রমিক লাল শুক্রার কণ্ঠে গান

'চলু কিশান চলু মজদুর
নিকালিনা যাব্ কীরে
লড়াইকে ময়দান।'

জলপাইগুড়ি জেলার খোয়ার ডাঙায় বসবাসকারী কবি দ্বারেন ঈশ্বরারীর বোড়ো ভাষায় একটি কবিতার মর্মবস্তু : 'শোন আমার প্রতিবেশী হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ জৈন আর শিখ খ্রিস্টান এসো, বিভেদ বিবাদ ভুলে দেশের শত্রু বিনাশে আমরা দাঁড়াই। এসো আমার

নির্যাতন, পীড়ন ভোগ করেছে সেসব কাহিনী আজ আর কারো অজানা থাকবার কথা নয়। এই আলোচনায় তা তোলা রইল।

এর মধ্যেও বাগিচা শ্রমিকরা মানুষ হিসেবে বোধ হারিয়ে ফেলেনি। অত্যাচার পীড়নের বিরুদ্ধে ক্ষোভ, বিক্ষোভ হয়েছে। সেসব বিচ্ছিন্ন ঘটনা ভিত্তিক হলেও কখনও কখনও সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ প্রতিরোধ দেখা গেছে। ১৯১৫-১৬ সালের শেষে রাঁচি জেলার টানা ভকত আন্দোলনের ঢেউ এই অঞ্চলেও এসে আছড়ে পড়েছিল। সেই আন্দোলন সাহেব বিরোধী থেকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চেহারা নিয়েছিল। অনেক গবেষকের মতে, সেইকালে জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের আন্তরিক সাহচর্য পেলে, টানা ভগত আন্দোলন দেশের জাতীয়তাবাদী মূল আন্দোলনকে পরিপুষ্ট করতে পারতো।

১৯৪৫ সালে বাগিচা শ্রমিক সংগঠন তৈরি হবার পর থেকে বাগিচা শ্রমিকরাও সংগঠিত হতে থাকে তাদের নিজস্ব সমস্যা ও দাবি-দাওয়া নিয়ে। মালিকপক্ষের অন্যায় জেদ, অত্যাচার এবং অনমনীয় মনোভাবের ফলে শ্রমিকরা বৃহত্তর সংঘবদ্ধ জোট গড়ে তোলে। সংগ্রাম আন্দোলন করে অভিজ্ঞতা আর চেতনার আলোক বর্তিকায় পথ দেখে দেখে চলে তাদের সমাজ চেতনার উন্মেষ ঘটতে থাকে। প্রয়োজনের তাগিদই তাঁদের সম্প্রীতির বাতাবরণ সৃষ্টি করতে বাধ্য করে।

তেভাগা আন্দোলনে, বাগিচা শ্রমিকদের ভূমিকা এবং শ্রমিক চেতনা বিকাশের এক সার্থক ধারা, ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবে, এই জেলার ক্ষেত্রে অনুধাবন যোগ্য।

জেলার বৈচিত্র্যময় শিল্প, সংস্কৃতি, সাহিত্যের সমন্বয় ও অবদান

জলপাইগুড়ি জেলার সৃষ্টিকালে তৎকালীন থানাগুলোকে কেন্দ্র করে জনবিন্যাস ঘটেছিল। এ জেলায় তখন থানা—'বোদা, পচাগড়, দেবীগঞ্জ, তেঁতুলিয়া, পাটগ্রাম, মেটেলি, ক্রান্তি, ডামডিম, মাল,

পড়শীগণ, উঁচু নীচু শিক্ষিত অশিক্ষিত একতার বলে দেশকে গড়ে তুলি।'

আবার দক্ষিণ কামাখ্যাগুড়ি গ্রামের রাভা কবি সুশীল রাভার 'রৌঞ্চিফেতার' (ঝড় উঠছে) কবিতার বঙ্গানুবাদ : 'পাহাড়ের চূড়ার সাথে/পাল্লা দিয়ে/ঢেউয়ের পাহাড় উঠছে/শক্ত হাতে বাগিয়ে ধরো বৈঠা/নতুবা তরী ডুবে যাবে/এই সমুদ্রই পাড়ি দেওয়া কঠিন/ঝড় আসছে ক্ষণে ক্ষণে/কাণ্ডারী হুঁশিয়ার থেকো।'

টোটো কবি, পুরমতি টোটোর কবিতায় পনেরো বছরের কিশোরী মেয়ের মর্মবেদনা, আর্তি।

'আমি গান গেয়ে চলেছি এক দাস প্রজা মেয়ে/আমি এক দুঃখী মেয়ে, বনে বনে কাজ করে খাই/পনেরো বছরের মেয়ে আমি, গান গেয়ে কাজ করি।'

পাহাড় থেকে চা গাছ সমতলে নেমে এল, সঙ্গে এল নেপালি চা-বাগিচা শ্রমিক। পর্যটন ও অন্যান্য কারণে নেপালি মানুষজন, প্রায় সকলেরই পরিচিত। এঁদের সাহিত্য, নাচ-গান দীর্ঘদিনের জাতীয় বৈশিষ্ট্যও বটে। জলপাইগুড়ি জেলায় সেই উন্নত সাহিত্য ও সংস্কৃতি তারা বয়ে এনেছেন। চর্চাও করেন।

রাজবংশী সমাজের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির অবদান সম্প্রীতি চেতনায়

রাজবংশী সমাজের গান ও শিল্প সাধনা গ্রামীণ কৃষি সমাজ ব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত। রাখালিয়া মাহুত বন্ধু, মৈষাল বন্ধুর হৃদয় বিদারক গান শুধু নয় এই জেলার পাহাড়, বন, নদী-গ্রামীণ মানুষের জীবনচর্চার সঙ্গে একাত্মীভূত। ভাওয়াইয়া সঙ্গীত আর আব্বাসউদ্দীনের নাম সমার্থক। তাছাড়া উন্নত মানের কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ নিয়ে ঐশ্বর্যপূর্ণ সাহিত্য ভাণ্ডার। ঠাকুর পঞ্চাননের উপদেশ এই জেলায় শুধু রাজবংশী মানুষের জন্য নয়, সকলের জন্য।

'যদি হই এক
আকাশ পাতাল ঠেক
যদি হই দুই
তুই আর মুই।'

ঐক্য ও সম্প্রীতির ক্ষেত্রে অতীতের সমস্যা

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অগ্রগতিতে অতীতে কোনো সমস্যা সৃষ্টি হয়নি, একথা সঠিক নয়। বিশেষত ক্ষত্রিয় রাজবংশী রাজনীতি এবং মুসলিম রাজনীতি সাধারণ মানুষের ঐক্য ও সম্প্রীতি চেতনায় পিছুটান টেনেছে। সম্প্রদায় ভিত্তিক স্বার্থ রক্ষার দাবি সম্বলিত ক্ষত্রিয় রাজবংশী আন্দোলন প্রকারান্তরে কংগ্রেসের নীতি ও আন্দোলনের বিরোধিতা করে তৎকালীন ফজলুল হক সাহেবের কোয়ালিশন মন্ত্রীসভার প্রতি তাদের সমর্থন জ্ঞাপন করেছে। পরবর্তীতে এই ভ্রান্তি দূর হয়েছিল ১৯৩৮ সালে, আলোচনার মাধ্যমে।

চল্লিশের দশকে শেষের দিকে মুসারফ হোসেনের নেতৃত্বে বিচ্ছিন্নতাকামী মুসলিম আন্দোলন প্রকাশ্য রূপ নেয়। ১৯৩৭ সালের আগে স্থানীয় মুসলিমদের মনে কোনো বিচ্ছিন্নতাবাদী বা মৌলবাদী ভাবধারা সৃষ্টি হয়নি। আঞ্জুমানি-ই-ইসলামিয়া সংগঠনের অবশ্য বিচ্ছিন্নতাবাদী ও মৌলবাদী দৃষ্টিভঙ্গী ছিল। তবে তার প্রভাব মুষ্টিমেয় মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

এই জেলার ঐতিহ্যই এসব সমস্যা সমাধানের হাতিয়ার। অল্পসময়ের মধ্যেই, বিচ্ছিন্নতার ভাবনাকে পর্যুদস্ত করে মানুষকে মূলস্রোতে ফিরিয়ে এনে, জেলায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সামিল করা গেছে। ঠাকুর পঞ্চাননের শিক্ষা ব্যর্থ হয়নি।

শোষণের কায়দাও বদলেছে, তবে আছে, ফলে মানুষের সমস্যাও দূর হয়নি। গরিব আরও গরিব হয়েছে, ব্যাপক মানুষ— দারিদ্র্য সীমার নীচে। তাই সুন্দর সুস্থ জীবনের চাহিদা যেমন আছে তেমনি ক্ষোভ বিক্ষোভও আছে। আবার সেইসব ক্ষোভকে উসকে দেবার মানুষও আছে। সেই সূত্রে নানা প্রশ্নে বিচ্ছিন্নতার জিগির তুলে, ক্ষোভ প্রশমনের পথ দেখানো হয়। ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম খণ্ড খণ্ড হয়ে দুর্বল হলে, আখেরে লাভ হয় শোষণের। তা সেই শোষণ দেশীয় হোক বা বিদেশিই হোক। তবে?

একালের সমস্যা

নানা রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক টানা-পোড়েনের মধ্য দিয়ে, পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষের চেতনা বিকাশের মাধ্যমে একটি বিকল্প ভাবনার সরকার, বামফ্রন্ট সরকার। বামফ্রন্ট সরকার তাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণে তৎপর হল। জোতদারদের অবৈধ জমি উদ্ধার করে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিলি করে, ফসল বৃদ্ধিতে যেমন উৎসাহিত করল, তেমনি কৃষকের আর্থিক সংস্থানের কিছুটা সুরাহা হল। নিয়মিত পঞ্চায়েতগুলির নির্বাচন অনুষ্ঠিত করে। গ্রামীণ মানুষের হাতে ক্ষমতা ও অর্থ তুলে দিল। শিক্ষা, সাক্ষরতা, চিকিৎসা এবং শ্রমদিবস সৃষ্টি করে, গ্রামীণ মানুষের চেহারা অনেকাংশে পাল্টে দিল।

এ যাবৎ সুযোগ সুবিধেগুলো কিছুসংখ্যক মানুষের কুক্ষিগত ছিল—স্বাভাবিকভাবেই সেই শ্রেণীর মানুষজনের স্বার্থে আঘাত লাগায় তারা ক্ষুব্ধ। তাই ষড়যন্ত্র আছে চক্রান্ত আছে। সাধারণ মানুষের ঐক্যে ফাটল ধরাবার প্রয়োজনে, ধর্ম, জাতি, ভাষা সংস্কৃতির বিভিন্নতার সুযোগ নিয়ে, ঐক্যবদ্ধ মানুষের মধ্যে বিভেদ-বিচ্ছেদ গড়ে তোলার প্রচেষ্টাও আছে।



মেচ সম্প্রদায়ের গান

উসকে দেবার মানুষও আছে। সেই সূত্রে নানা প্রশ্নে বিচ্ছিন্নতার জিগির তুলে, ক্ষোভ প্রশমনের পথ দেখানো হয়। ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম খণ্ড খণ্ড হয়ে দুর্বল হলে, আখেরে লাভ হয় শোষণের। তা সেই শোষণ দেশীয় হোক বা বিদেশিই হোক। তবে?

তবে, নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকলে সমস্যার সমাধান হবে না। এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার সংগ্রাম চাই। কে করবে? বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া মানুষগুলো এখনও সভ্য জগতের জটিলতা, বুঝতে শেখেনি। বোঝাবার দায়িত্ব নিতে হবে, যাঁরা ব্যাপারটা বোঝেন তাঁদের। আদিবাসী সমাজের লোকজনের শিল্প সংস্কৃতি নাচ গান সবটাই যৌথ প্রচেষ্টা। অনেক দুঃখকষ্টেও তারা হাসিখুশি সহজ-সরল। নাচ-গান ভালোবাসে। শত কাজ ফেলেও যোগ দেয় খুশিতে নানা অনুষ্ঠানে।

উত্তরখণ্ড/কামতাপুরী আন্দোলন

এই যুগের, বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রচেষ্টায় মূলত রাজবংশী সম্প্রদায়ের কিছু অংশের মানুষের, প্রথমে উত্তরখণ্ড আন্দোলন পরে তা কামতাপুরী আন্দোলন নামে পরবর্তিত হয়ে, বর্তমানে, ক্রমশ হিংসাশ্রয়ী হয়ে উঠছে। কৃষকের জমি দখলের লড়াই আন্দোলনে যাদের সার্থক ভূমিকাও ছিল। তারাই আক্রান্ত হচ্ছেন। অতীত দিনেও ভ্রান্তি ছিল। ভুল সংশোধিত হয়েছে সচেতনতার মধ্য দিয়েই। তবে ভুলের মাশুল তো গুণতে হচ্ছে সাধারণ দরিদ্র মানুষকেই, তাই সচেতনতা প্রয়োজন কৃষকের স্বার্থ রক্ষায়।

আসলে বিচ্ছিন্নতাবাদ আন্দোলনের পেছনে পৃথিবীব্যাপী আন্তর্জাতিক চক্রান্ত কাজ করছে—সাম্রাজ্যবাদীদের মদতে। লক্ষ্য পৃথিবীর বাজার দখল করা, শোষণ ব্যবস্থা এবং সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা কায়েম রাখা ; ভিন্ন আঙ্গিকে। এ ব্যাপারে সাধারণ মানুষের অজ্ঞতা তাদের সাহায্য করে। দেশীয় স্বার্থান্বেষী দালালরা তাদের সহযোগী হয় সুকৌশলে।

ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ দীর্ঘদিন ভারত শাসন ও শোষণ করেছে 'বিচ্ছিন্ন করো, শাসন করো' এই নীতির উপর দাঁড়িয়ে। তার ফলাফল পূর্বপুরুষরা ভোগ করেছেন। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে তুলেছেন, কখনও অহিংসভাবে কখনও সশস্ত্র পথে যেতে হয়েছে ইংরেজের মারমুখী আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে। শেষ পর্যন্ত, দ্বিজাতি তত্ত্বের উপর দেশ ভাগ করে মানুষের মনে বিচ্ছিন্নতার বীজ সংরক্ষণ করে তারা রাজনৈতিক স্বাধীনতা বাস্তবে হস্তান্তরিত করে চলে গেল। দেশের মানুষের কতটা সুরাহা হল দেশ স্বাধীন হবার পর, তা দেশের মানুষই উপলব্ধি করতে পারছেন। দেশের শাসন বদলেছে। শোষণের কায়দাও বদলেছে, তবে আছে, ফলে মানুষের সমস্যাও দূর হয়নি। গরিব আরও গরিব হয়েছে, ব্যাপক মানুষ—দারিদ্র্য সীমার নীচে। তাই সুন্দর সুস্থ জীবনের চাহিদা যেমন আছে তেমনি ক্ষোভ বিক্ষোভও আছে। আবার সেইসব ক্ষোভকে

সরকারি ও বেসরকারি নানা প্রতিষ্ঠানের প্রচেষ্টায়, গ্রামে-গঞ্জে চা-বাগিচায় বনাঞ্চলে যখন এমন অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়, হাজার হাজার মানুষ দূর-দূরান্ত থেকে এসে হাজির হয়। রাতভর নাচে গান গায়। এলাকা মহামিলন ক্ষেত্র হয়ে ওঠে।

তথ্য-সংস্কৃতি দপ্তরের প্রযোজনায় এবং বিভিন্ন বে-সরকারি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় এমন কত অনুষ্ঠান হয় আজকাল। সেসব অনুষ্ঠান উৎসবে পরিণত হয়। জাতি ধর্ম ভাষা সংস্কৃতির প্রভেদ বাধা হয়ে দাঁড়ায় না।

এমনই এক উৎসব চা বাগিচা শ্রমিকদের লোক-সংস্কৃতি উৎসব। সরকারি উদ্যোগে এই উৎসব বছর বছর হয় প্রধানত চা-বাগিচা অধ্যুষিত এলাকায়। তবে উৎসবটিতে কেবলমাত্র নেপালি, ওঁরাও, মুণ্ডা, সাঁওতাল প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর লোকজন, যাঁরা চা-শিল্পের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত, তাঁরাই অংশ নেন না, মেচ, রাভা রাজবংশী সম্প্রদায়ের শিল্পী ও মানুষজন সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। ফলে এলাকা এক মহামিলন ক্ষেত্র হিসেবে পরিগণিত হয়। তিন চার দিন ধরে সর্বস্তরের লোকশিল্পী ও শহরের শিল্পীদের একত্রে অবস্থান ও মেলামেশার মধ্য দিয়ে ব্যাপক ঐক্য সংহতি গড়ে ওঠে। তাই অনুষ্ঠানমঞ্চ ও স্থানটি হয়ে ওঠে মহামিলন মেলা। সম্প্রীতির চেতনায় বিকশিত হয় জেলার সর্বস্তরের শিল্পী ও সাধারণ মানুষজন।

ভাওয়াইয়া সঙ্গীত এখন আর শুধুমাত্র রাজবংশী মানুষের গান নয় এবং উত্তরবঙ্গ, বিশেষত জলপাইগুড়ি, কোচবিহারের গানও নয়। পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গীত জগতে সকলের প্রাণের গান। আজ সেই সঙ্গীত ভারত ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক দরবারেও হাজির হয়েছে। সেই গানে যেমন আছে, উত্তরবঙ্গের প্রকৃতি পরিবেশের গ্রামীণ মানুষজন তেমনই আছে তাদের সংগ্রামের সাক্ষরতার জমির লড়াইয়ের কথা। মানুষকে যা সচেতন করে, উদ্বুদ্ধ করে জীবন সংগ্রামে। এছাড়াও আছে, সমাজ ভাবনার বহু নাটিক গান, যা নাকি মানুষকে সচেতন করে, সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করে।

তিস্তা-গঙ্গা উৎসব, ভাওয়াইয়া-বাউল উৎসব, এমন কত সাংস্কৃতিক উৎসব গ্রাম গ্রামান্তরে পালিত হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ আর উত্তর অঞ্চলের লোকশিল্পীরা সমবেত হন। পরস্পর মেলামেশা, ভাব বিনিময় তা ছাড়াও লোকশিল্পীদের জীবন আর শিল্প নিয়ে কত কথা, সমস্যা ও তার সমাধানের মত বিনিময়ের মধ্য দিয়ে দূরত্বের ব্যবধান ক্ষীণ হয়ে আসছে ক্রমশই।

এসব অনুষ্ঠানের অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে মানুষের সম্প্রীতি চেতনার বিকাশে। বিশেষ করে এই জেলায় যেখানে নানা জাতি উপজাতি বিভিন্ন শিল্পের চর্চা স্বতঃস্ফূর্ত। তাদের শিক্ষা, সমাজ ভাবনা চেতনা-জ্ঞান সবটাই এখনও নাচে গানে ছন্দময় জীবনচর্চা। আবার স্বাভাবিক কারণেই তা পরিবর্তিত হচ্ছে।

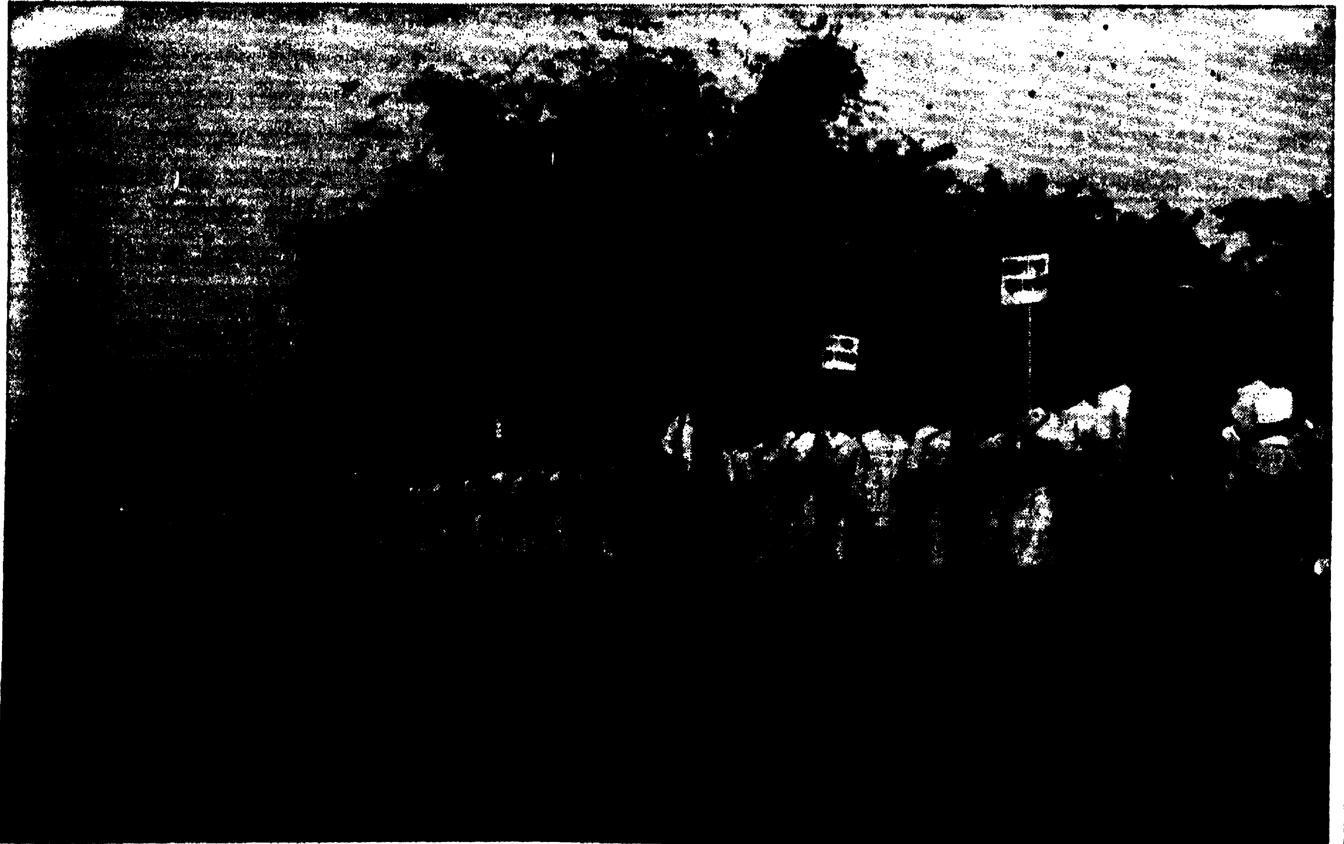
চা-শ্রমিকদের (অবশ্যই অন্যান্য জনজাতিরও) উৎসবমুখীন নানা সংস্কৃতি সম্পর্কে এবং তার গুরুত্ব উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে, এস. এন. চ্যাটার্জি, সম্পাদক, ডুয়ার্স শাখা ভারতীয় চা অ্যাসোসিয়েশন-এঁর মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য।

'With the Santhals, Oraons, and Mundas, hill tribes viz. Subbas, Rais, Mangars, Tamangs, Chettris etc. have been maintaining their distinct origins after having gone through the vicissitudes that their culture was supposed to go being exposed to environment and milieu. Members of these communities have been maintaining a unique culture in tea plantations which can aptly be termed as "Tea Community Culture" the essence of which is "UNITY IN DIVERSITY."

পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ, জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির কঠোর শ্রমের ফসল-এই জেলার 'ভাষা-বিভাষার কবিতা' সম্ভার-সংকলন গ্রন্থটি (১ম প্রকাশ-মে ১৯৯৭)। বইটিতে টোটো, মেচ, রাভা, সাদরী, লিম্বু, রাজবংশী, মুণ্ডা, সাঁওতাল নেপালি ও বাংলা ভাষার কবিদের কবিতা, একই পঙ্‌ক্তিতে বসে পৃথক ভাষার, পৃথক সংস্কৃতি ও আচার আচরণের, জীবনের দুঃখ-বেদনা এবং তা অতিক্রম করার সংগ্রাম মুখরিত জীবন কাহিনী।—এই জেলার ক্ষেত্রে বিষয়টি শ্রমসাধ্য কঠিন অথচ চেতনা বিকাশের হাতিয়ারও বটে। কবিতাগুলির বঙ্গানুবাদ থাকায় অনেকের পক্ষেই কবিতার মর্মবাণী উদঘাটন অনেকাংশেই সহজ। গ্রন্থটির ব্যাপক প্রচার ও প্রসারও প্রয়োজন।

'বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্য সাধন'—এই জেলার মানুষের মূল মন্ত্র আর সেই মন্ত্রসাধনই হোক মানুষের জীবনের জয়গান।

লেখক ❑ প্রাবন্ধিক ও বুদ্ধিজীবী



তিস্তা-গঙ্গা উৎসব ২০০১-এর সুসজ্জিত মিছিল



নির্মল দাস

বিপ্লবতীর্থ বক্সাদুয়ারের আলোকে আজকের সমস্যা ও উত্তরণের পথ

দেশ মাতৃকার শৃঙ্খল মোচনে ফাঁসির মঞ্চে অন্ধকারায় যাঁরা জীবন উৎসর্গ করলেন তাঁরা দেশবাসীর কাছে চিরস্মরণীয়। শহীদ ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, বিনয়, বাদল, দীনেশ, মাস্টারদা সূর্য সেন আত্মত্যাগের ভেতর দিয়ে যে ইতিহাস সৃষ্টি করে গেছেন স্বাধীনতার ইতিহাসে তা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

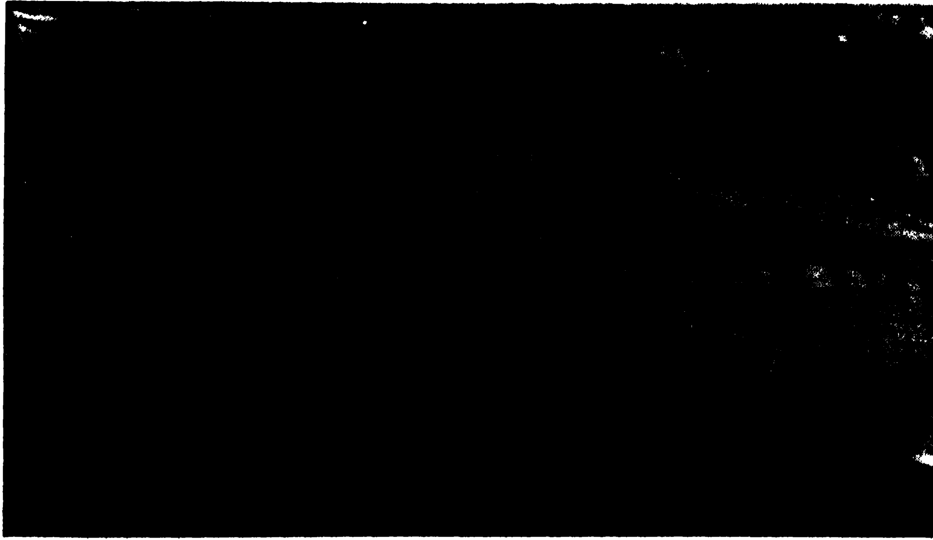
স্বদেশী যুগে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মুক্তি আন্দোলনে অংশগ্রহণ-কারী বিভিন্ন বিপ্লবী গোষ্ঠী জাতীয় আন্দোলনের কমন প্ল্যাটফর্মে জাতীয় কংগ্রেসে যুক্ত থেকে তাদের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন অব্যাহত রেখেছিল।

অর্থনৈতিক সঙ্কট যখন তীব্র আকার ধারণ করল তখন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের গতিপ্রকৃতিরও পরিবর্তন ঘটল। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে নতুন সংযোজন জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে স্বদেশী শিল্প, শিল্প শ্রমিক ও বাণিজ্য ব্যবস্থাকে রক্ষা করার জন্য ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনকে আপামর দেশবাসীর কাছে প্রত্যক্ষভাবে পৌঁছে দেওয়ার জন্য স্বদেশী মন্ত্র উচ্চারিত হল 'বিদেশি পণ্য বর্জন ও স্বদেশী পণ্য গ্রহণের" আহ্বানে, আসমুদ্র হিমাচলব্যাপী স্বদেশী মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ দেশবাসী বিদেশি পণ্য বর্জন এবং বিদেশি দ্রব্যসামগ্রী ধ্বংসের জন্য বহ্ন্যুৎসবে মেতে উঠল। চারণ কবি মুকুন্দ দাস গাইলেন—

"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নে রে ভাই।
দীনদুখিনী মা যে তোদের
তার বেশি আর সাধ্য নাই।"

বিদ্রোহী কবি নজরুলের আহ্বান সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসকদের হৃদকম্পন সৃষ্টি করেছিল।

"কারার ঐ লৌহ কপাট
ভেঙ্গে ফেল কর রে লোপাট
রক্তজমাট শিকল পূজার পাষাণ বেদী।"



অরণ্যছায়ায় বক্সা দুর্গ

'বক্সা ক্যাম্প'-এ তার উল্লেখ করেছেন। বিপ্লবী তাপস, মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীসহ বিভিন্ন দলের ২১ জন বিপ্লবীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। অনুশীলন সমিতির প্রাণপুরুষ বিপ্লবী পুলিন দাসের পর যিনি ইংরেজের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিলেন এবং যিনি 'বক্সা', 'দেউরি', আন্দামানসহ ইংরেজ কারাগারে জীবনের ৩০টি বসন্ত কাটিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন সেই মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী সম্পর্কে তৎকালীন ইংরেজ সরকারের জেল কর্তৃপক্ষ, 'জেল-হিস্ট্রি টিকিটে' লিপিবদ্ধ করেছিলেন "He was one of the leaders of the Revolutionary party, was suspected in forteen murders and dacoities, very dangerous."

ভারতের মুক্তি আন্দোলনের দুটি ধারা। আপসের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন, অপর ধারা সশস্ত্র বিপ্লবের। যাঁরা ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের বিতাড়নের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনের জন্য আত্মবলিদান করেছিলেন। আপসের মাধ্যমে স্বাধীনতাকামীদের নিয়ন্ত্রণের জন্য ইংরেজ আইনিপথে এবং নেতৃত্বের একাংশের সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং তাদের মাধ্যমে প্রভাব বিস্তার করে আন্দোলন দমনের কাজে ক্রিয়াশীল ছিলেন।

সশস্ত্র বিপ্লবীদের দমনের জন্য ইংরেজ সরকার তাদের সভ্যতার আইনিমুখোশ পরিত্যাগ করে নৃশংস এবং বর্বরোচিতভাবে এই আন্দোলনে নিবেদিতপ্রাণ বিপ্লবীদের ফাঁসির মঞ্চে অন্ধকারায় দ্বীপান্তরে শ্বাপদশঙ্কুল অরণ্য-পর্বত পরিবেষ্টিত জনপদ থেকে বহুদূরে বিনা বিচারে বন্দী রেখে বিপ্লবী আন্দোলন ধ্বংস করার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করেছে, যার ইতিহাস আজকের প্রজন্মের যুবক-যুবতীরা অনেকে অবহিত নন।

বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাসে মেঘের গায়ে জেলখানা 'বক্সা', 'দেউরি' এবং আন্দামানের কাহিনী ভারতের অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের প্রতি তথাকথিত সভ্য সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ সরকারের মুক্তিকামী মানুষের আন্দোলন স্তব্ধ করার জন্য, বন্দী রেখে বিপ্লবীদের তিলে তিলে হত্যা করার জন্য পরিকল্পিত চেষ্টার উদাহরণ। সেই স্থানগুলো বিপ্লবতীর্থ হিসেবে দেশবাসীর কাছে আজ নন্দিত-বন্দিত চিরস্মরণীয়।

বিপ্লবতীর্থ বক্সা হিমালয়ের সিনচুলা পাহাড়ে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২৬০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত। ঘন বনানী পরিবেষ্টিত নির্জন পাহাড়ে অবস্থিত এক শৈল ভূমি যেন মেঘের কোলে বিরাজমান আলিপুরদুয়ার শহর থেকে ৩০ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত এই অতি দুর্গম এবং জনপদ থেকে বিচ্ছিন্ন বন্দী শিবিরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ১৯৩০ থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত এবং পরবর্তীকালে ১৯৪২ থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন এলাকার বিশেষ করে অবিভক্ত বাংলার ইংরেজদের চোখে ভয়ঙ্কর বিপ্লবীদের বন্দী করে রেখেছিল। বিপ্লবী আন্দোলনের প্রখ্যাত লেখক অমলেন্দু দাশগুপ্ত ১৯৩০-৩২-এর পরিসরে বক্সা ক্যাম্পে যে সব বিপ্লবীরা বন্দী হয়েছিলেন তাঁর পুস্তক

অমলেন্দু দাশগুপ্ত ইংরেজের চোখে যে ২১ জন বিশিষ্ট বিপ্লবীর কথা বলেছেন তাদের মধ্যে মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী ছাড়া ছিলেন বীরেশ চ্যাটার্জি, অধ্যাপক জ্যোতিষ ঘোষ, রবি সেন, সন্তোষ দত্ত, যতীন রায়, সুরেশ চন্দ্র দাস, জ্ঞান মজুমদার, ভূপতি মজুমদার, প্রতুল গাঙ্গুলি, অরুণ গুহ, ভূপেন দত্ত, জীবন কিশোর রক্ষিত রায়, অনিল রায়, মনোরঞ্জন গুপ্ত, পূর্ণ দাস, সুরেশ ঘোষ, পঞ্চানন চক্রবর্তী প্রমুখ।

অগ্নিযুগের বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাসে লেখকদের মধ্যে অমলেন্দু দাশগুপ্ত ছাড়া মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীর 'জীবনস্মৃতি', প্রতুল গাঙ্গুলির 'বিপ্লবীর জীবন দর্শন', এবং অন্যান্য গবেষকদের বিভিন্ন লেখায় ৯৮ জন বিপ্লবীর বক্সা ক্যাম্পের বন্দী জীবনের ইতিহাস জানা যায়, স্বাধীনতার পূর্বে ১৯৪৬ পর্যন্ত বক্সা বন্দীনিবাস ইংরেজ সরকার চালু রেখেছিল, সবচেয়ে বেশি বিপ্লবীকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল ১৯৪২-এর অগাস্ট বিপ্লব থেকে শুরু করে ১৯৪৬ পর্যন্ত।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেও কংগ্রেস সরকার অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনি ঘোষণা করলে এই দলের অসংখ্য নেতা ও কর্মীদের বক্সা বন্দীনিবাসে ভারত রক্ষা আইনে অন্তরীণ রাখা হয়েছিল। তাঁরা স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসেবে বক্সা জেলে বন্দী না থাকলেও কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হিসেবে বক্সা জেলে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত অন্তরিন ছিলেন। তাই বক্সা ক্যাম্প দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনে উৎসর্গীকৃত প্রাণ বিপ্লবীদের স্মৃতিধন্য শিবির হলেও এদেশের বামপন্থী-আন্দোলনের ইতিহাসে কমিউনিস্ট বন্দীদের বন্দীশিবির হিসাবেও বক্সা সুপরিচিত। যদিও কোনও কোনও লেখক তাঁদের অজ্ঞতাজনিত কারণে স্বাধীনতার পরবর্তীকালে বন্দী কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দকেও স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী বন্দী বলে উল্লেখ করেছেন।

ফাঁসির মঞ্চে অন্ধকারায় যাঁরা জীবনের জয়গান গেয়ে গেলেন তাঁদের আত্মবলিদানের আবেদনের মর্যাদা প্রকৃতপক্ষে পরবর্তীকালে ক্ষমতাপাগল আপসকামী জাতীয় নেতৃত্ব রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছেন,

তাই ব্রিটিশের ফাঁদে পা দিয়ে আজ অবিভক্ত ভারতবর্ষ ত্রিখণ্ডিত, মৌলবাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদ দিকে দিকে মাথা চাড়া দিচ্ছে। ১৯৪৭ সালের ১৫ অগাস্ট দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগ এবং ইংরেজ শক্তির কূটকৌশলের কাছে আত্মসমর্পণ আজকের দেশ এবং দেশবাসীকে বিষম সংক্রান্তির সন্ধিক্ষণে এনে দিয়েছে।

দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সময় আপস বিরোধী-সংগ্রামের মহানায়ক সুভাষচন্দ্র বসু ১৯৪০ সালে বিহারের রামগড়ের মহা সম্মেলনে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে চরমপত্র দেওয়ার কথা বলে জাতীয় নেতৃত্বের উদ্দেশে আসন্ন যুদ্ধের সুযোগে এদেশ থেকে ব্রিটিশ শক্তির পাততাড়ি গোটানোর সম্ভাবনা কাজে লাগানোর জন্য বার বার বলেও সফল হননি। আপস বিরোধী সম্মেলনেই এদেশে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন তীব্রতর করতে এবং শ্রমজীবী মানুষের হাতে ক্ষমতা দখল করতে বিপ্লবী সমাজবাদী আন্দোলনের পত্তন ঘটল ১৯৪০ সালের ১৯শে মার্চ বিহারের রামগড়ে।

সুভাষচন্দ্র জাতীয় নেতৃত্বের ব্যর্থতার মর্মজ্বালায় দগ্ধ হয়ে অবশেষে জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য করে অন্তরিন অবস্থায় নিরুদ্দেশের পথে ব্রিটিশ শক্তির চোখে ধুলো দিয়ে জিয়াউদ্দিনের ছদ্মবেশে কাবুল হয়ে বিদেশে পাড়ি দিলেন এবং বিপ্লবী রাসবিহারী বসু সংগঠিত আজাদ হিন্দ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভারতকে মুক্ত করতে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। সাম্রাজ্যবাদ এবং ধনবাদের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে জার্মান, জাপানকে ভারতের স্বপক্ষে এনে কাজে লাগিয়ে ব্রহ্মদেশের পথে কোহিমায় জাতীয় পতাকা উড়িয়ে আজাদ্ হিন্দ্ বাহিনীর 'দিল্লী চলো' স্লোগান দিয়ে বিশ্বের মানুষের কাছে নন্দিত-বন্দিত হয়ে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করলেন।

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী যুদ্ধে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী জার্মান, জাপানের সহযোগিতার কৌশল গ্রহণের জন্য দেশের সাম্যবাদী আন্দোলনের নেতৃত্ব সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে কটূক্তি করলেও পরবর্তীকালে তাঁরা তাঁদের বক্তব্য থেকে সরে এসে সুভাষচন্দ্র বসুর সমর অভিযানও যে মুক্তি আন্দোলনে বিরাট ভূমিকা নিয়েছিল সেই অবদানের কথা স্মরণ করে নেতাজীকে শতবর্ষের শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে আজাদ হিন্দ বাহিনীর মাধ্যমে স্বদেশী মন্ত্রে দীক্ষিত মুক্তি সেনা শিবিরে জাতীয় সংহতি, ভ্রাতৃত্ববোধ ভারতবাসী নির্বিশেষে—

"মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম
হিন্দু-মুসলমান
মুসলিম তার নয়নমণি হিন্দু তাহার প্রাণ,"

—এই মর্মবাণী এবং ১৯৪৬ সালের নৌবিদ্রোহের মাধ্যমে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যে জাতীয় সংহতি গড়ে উঠেছিল সেই সংহতির বিনাশ হল ১৯৪৬ সালে নোয়াখালির (কলকাতা) সাম্প্রদায়িক ধর্মান্ধ দাঙ্গায়। ধর্মান্ধদের যূপকাষ্ঠে বন্দী হল আমাদের স্বদেশী আন্দোলনের সোনার দিনগুলোর ঐক্যসাধনা আর মাতৃ বন্দনার সমস্ত সাধনা।

চারণকবি গঙ্গাচরণ গাইলেন—

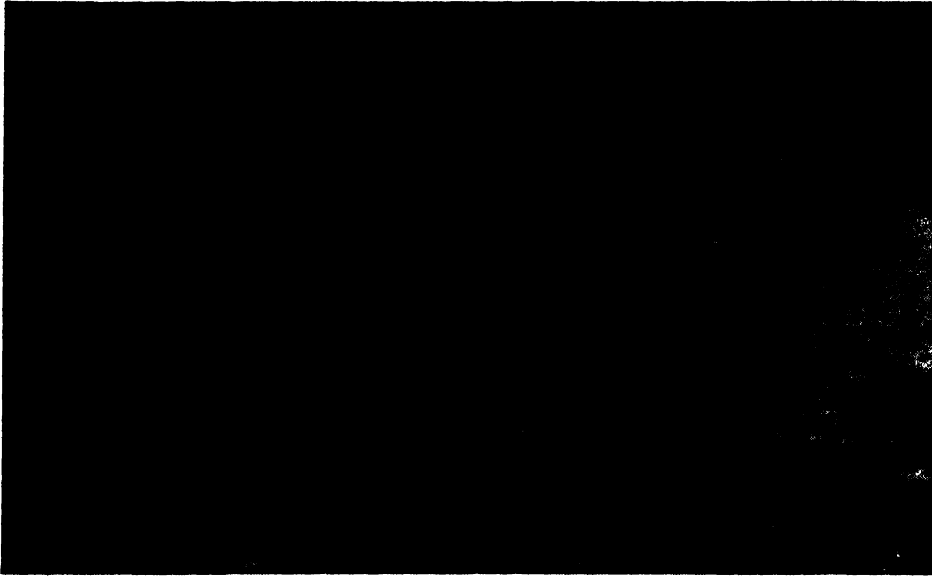
"জিন্না নিল পাকিস্তান
জওহরলালের হিন্দুস্তান
ব্রিটিশ সিংহ করল পলায়ন।"

ভারত, পাকিস্তান এবং পরবর্তীকালে সৃষ্ট এই উপমহাদেশের নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশ এবং দেশবাসী নানা যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত। স্বাধীনতার জন্মকালে যে ধর্মান্ধতা এবং সাম্প্রদায়িকতার বীজ উপ্ত হয়েছিল আজ তা মহীরুহে পরিণত হওয়ার পথে। কোথাও আজ শান্তি নেই, স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি আজ নিঃসন্দেহে অনুপস্থিত, সর্বত্র এর অভাব বিদ্যমান।

স্বাধীনতার ৫৩ বছর পরেও খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের ন্যূনতম অধিকার থেকে দেশের অধিকাংশ মানুষ বঞ্চিত। মাত্র ২০% মানুষের স্বার্থে ৮০% মানুষকে বঞ্চিত করে ভারতের শাসক ধনিক শ্রেণী নতুন করে নিজেদের শাসন শোষণ অব্যাহত রাখার জন্য দেশ বিকিয়ে দিতেও পিছপা নয়, ইতিমধ্যে 'গ্যাট', বিশ্বব্যাঙ্কের মাধ্যমে নানা ঋণগ্রহণের ফলে দেশ ভয়ঙ্করভাবে অর্থনৈতিক বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রেশন, পরিবহণ, কৃষি উন্নয়নের স্বার্থে ভর্তুকিতে সার প্রদান প্রভৃতি সরকারি পরিষেবা যা রাষ্ট্র প্রদান করে থাকে তা বন্ধ হওয়ার মুখে।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেও কংগ্রেস সরকার অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনি ঘোষণা করলে এই দলের অসংখ্য নেতা ও কর্মীদের বক্সা বন্দীনিবাসে ভারত রক্ষা আইনে অন্তরিন রাখা হয়েছিল। তাঁরা স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসেবে বক্সা জেলে বন্দী না থাকলেও কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হিসেবে বক্সা জেলে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত অন্তরীণ ছিলেন। তাই বক্সা ক্যাম্প দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনে উৎসর্গীকৃত প্রাণ বিপ্লবীদের স্মৃতিধন্য শিবির হলেও এদেশের বামপন্থী-আন্দোলনের ইতিহাসে কমিউনিস্ট বন্দীদের বন্দীশিবির হিসাবেও বক্সা সুপরিচিত।

রেল টেলিকমিউনিকেশন, চিনি, দেশরক্ষার জন্য অস্ত্র আমদানি এবং সর্বশেষে হাওলা কেলেঙ্কারিতে দেশের ধনিক শ্রেণীর রাজনৈতিক দলগুলির জাতীয় নেতৃত্ব জেরবার। সংসদীয় ব্যবস্থা ভেঙে পড়বার মুখে, বিশ্বাসযোগ্যতা তলানিতে এসে ঠেকেছে, এ অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন অর্থনীতি, শিল্পনীতি, বাণিজ্য নীতির নামে দেশবাসীর স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে ধনিক-বণিকদের স্বার্থ চরিতার্থ করতে মরিয়া হয়ে পড়েছে। প্রায় ৫ লক্ষ ছোট বড় কল-কারখানা বন্ধ। কালো টাকার অর্থনীতি সরকারি অর্থনীতিকে গ্রাস করেছে।



বক্সা বন্দী নিবাস

শিক্ষাবিদ, রাজনীতিক উপেন্দ্রনাথ বর্মণ এমনকি কোচবিহারের রাজকন্যা গায়ত্রী দেবীও বিভিন্ন লেখা এবং বক্তৃতায় তা উল্লেখ করেছেন।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পেরিয়ে গেলেও কামতাপুরী আলাদা ভাষা বলে আমরা উত্তরবঙ্গের অধিবাসীরা পূর্বে কখনও শুনিনি। যে হতাশাগ্রস্ত রাজনীতিবিদ একদা দেশি ভাটিয়া স্লোগান দিয়ে এই এলাকায় অশান্তির সৃষ্টির চেষ্টা করেছে, যারা পরবর্তীকালে উত্তরখণ্ড আন্দোলন সংগঠন করে সাধারণ রাজবংশী সম্প্রদায়ের আস্থা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছে তারাই উত্তর পূর্বাঞ্চল বিশেষ করে আসামের বিভিন্ন উগ্রপন্থী ব্যক্তি হত্যায় পারদর্শী জঙ্গী গোষ্ঠীর সহযোগিতায় ভাষা, বিভেদ, জাতিদাঙ্গা লাগানোর চেষ্টায় ক্রিয়াশীল। এদের বিভেদের রাজনীতি প্রতিহত করতে একদিকে যেমন পুলিশ এবং সাধারণ প্রশাসনকে আরও সক্রিয় করতে হবে—অপরদিকে সহজ সরল অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া সমাজের অনুন্নত অংশের অধিবাসীদের সঙ্গে রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষকে নিয়মিত রোজগারের সুযোগ প্রদান করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ পরিষেবার উন্নতি করতে হবে। তাদের সংস্কৃতির বিকাশ উত্তরবঙ্গের ভয়াবহ বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের জীবন সুরক্ষার ব্যবস্থা করে বিচ্ছিন্নতাবাদী উগ্রপন্থীরা যাতে তাদের ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষোভ, বিক্ষোভ কাজে লাগাতে না পারে তার জন্য সার্বিক উন্নয়ন আন্দোলন গড়ে তোলা জরুরি।

আমাদের ডুয়ার্স এলাকায় আদিম অধিবাসীদের ভাষা উপভাষার সংখ্যা ২০টির বেশি। তাই ভাষা আমাদের কোনও সমস্যা নয়, পরস্পরের ভাব বিনিময়ের পক্ষে কোনও অন্তরায় নয়। প্রগতিবাদী মানুষ যদি নিরপেক্ষ পরিচ্ছন্ন এবং উন্নয়নকামী প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিভেদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়, হিংসার বিরুদ্ধে হিংসা, সন্ত্রাসের মোকাবিলায় সন্ত্রাসের সৃষ্টি না করে, গণপ্রতিরোধে জাতীয়, আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিক বিভেদকামী শক্তির বিরুদ্ধে শান্তিপ্রিয় মানুষের জয় নিশ্চিত করা যায়। সেই পথেই এগোনো এই মুহূর্তে জরুরি।

ডুয়ার্সে অবস্থিত বিপ্লবতীর্থ বক্সাদুয়ারসহ সাম্রাজ্যবাদী যুগে বিভিন্ন বন্দীশিবির এবং কারাগারে আটক এবং শহীদের মৃত্যুবরণ যাঁরা করেছেন তাঁদের স্বপ্ন সার্থক করার জন্য মৌলবাদের বিরুদ্ধে ধনিক বণিক জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক শাসকদের বিরুদ্ধে মুক্তি আন্দোলনের মুক্তি সেনানীদের উত্তরাধিকার বলে যাঁরা দাবি করেন তাঁদেরকে দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম তথা মানবমুক্তির পথে এগিয়ে যেতে হবে, মানুষের কল্যাণের জন্য নিজেদের উৎসর্গ করতে হবে তবেই স্বদেশী মুক্তিপথিকদের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন সার্থক হবে।

কুখ্যাত হর্ষদ মেহতা জৈনদের হাত ধরে দেশের প্রশাসন যন্ত্রের তথাকথিত ধারক-বাহকরা আমেরিকাসহ ধনিক দেশগুলোর অবাধে মুনাফা লোটা এবং শোষণের স্বর্গরাজ্য গড়ে তোলার জন্য বিদেশি বহুজাতিক কোম্পানিগুলিকে আহ্বান করে স্বদেশী পণ্য উৎপাদকদের সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করে প্রকৃতপক্ষে স্বদেশী পণ্য বর্জন এবং বিদেশি পণ্য গ্রহণের দিকে দেশবাসীকে নিয়ে যাচ্ছে।

এই প্রেক্ষাপটে দেশবাসীকে বিশেষ করে তরুণ সমাজ, যুব সমাজ এবং সংগঠিত বামপন্থী ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক শক্তি, তাদেরকে নতুন উদ্যোগ নিতে হবে যার মাধ্যমে আজকের কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলায় সংগঠন গড়ে তোলা যায়। দেশের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকার যারা, তাদের হতাশাগ্রস্ত করে তোলার জন্য তাদের নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে ফেলার জন্য রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ইলেকট্রনিক মিডিয়া, সেক্স, ভায়োলেন্সের কাহিনী বিরামহীন পরিবেশন করছে সুপরিকল্পিতভাবে। তার বিরুদ্ধে দেশবাসীকেও প্রতিরোধের কথা গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে। শেষ কথা সাম্রাজ্যবাদী, বর্ণবাদী, মৌলবাদীরা কোনও দিন বলে না শেষ কথা বলার অধিকার জনগণের। সেই জনগণকে ইতিহাস নির্ধারিত পথে পরিচালিত করার দায়িত্ব আগামীদিনের মুক্তি আন্দোলনের উত্তরাধিকারী যারা তাদেরকেই নিতে হবে।

অতি সম্প্রতি উত্তরবঙ্গের কিছু কিছু এলাকায় কামতাপুরী ভাষা এবং রাজ্যের দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য মদত্ দিচ্ছে দেশ-বিদেশের অশুভ শক্তির ধারক-বাহকেরা। কোচবিহারের প্রাক্তন মহারাজা নরনারায়ণ, যাঁকে কোচ রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষ বলে সকলেই জানেন—আসামরাজকে তাঁর প্রথম গদ্যে লেখা চিঠিকে বাংলা ভাষার আদি গদ্যরূপ বলে ভাষা গবেষক এবং ঐতিহাসিকরা রায় দিয়েছেন। বিশ্বের ২২ কোটি বাঙালি তা স্বীকার করে নিয়েছেন। রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষরা যে পরস্পরের ভাব বিনিময়ের ভাষা যা দেশীয় এবং রাজবংশী কথ্য ভাষা ব্যবহার করেন তা বাংলা ভাষারই আধুনিক কথ্যরূপ অথবা বাংলার উপভাষা। রাজবংশী সম্প্রদায়ের শিক্ষা সংস্কৃতি আন্দোলনের জনক ঠাকুর পঞ্চানন বর্মা,

লেখক ❑ বিধায়ক, সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক



সুবীর সরকার

জলপাইগুড়ি জেলায় পরিবেশ অবক্ষয় ও সাম্প্রতিক বন্যা

হিমালয় সংলগ্ন জলপাইগুড়ি জেলা আজ পরিবেশ অবক্ষয়ের এক নতুন অধ্যায় সংযোজন করেছে। আজ থেকে মাত্র দেড় শতক আগেও এই জেলার ৯০ শতাংশ অঞ্চল গভীর অরণ্যে আবৃত ছিল। গভীর অরণ্যের আচ্ছাদন এবং মৃত্তিকাস্থিত জৈব আস্তরণ হিমালয় সংলগ্ন পার্বত্য ও সমপ্রায় ভূমির উর্বর মৃত্তিকাকে বৃষ্টি, বায়ু ও প্রবহমান জলের দ্বারা ক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করে এসেছে অনন্তকাল ধরে।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি আপাতদৃষ্টিতে এই জেলার আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার উন্নতির সূচনা করলেও প্রকৃতপক্ষে তার দ্বারাই সূচিত হয়েছিল পরিবেশ অবক্ষয়ের। তথাকথিত উন্নয়নের উষালগ্নেই শুরু হয়েছিল নৃশংস অরণ্য সংহার। মাত্র ৫০ বছরেই অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই ধ্বংস হয়েছিল লক্ষ লক্ষ বছর ধরে প্রকৃতির বুকে লালিত এই জেলার অতি সমৃদ্ধ অরণ্য ভূমির প্রায় ৫০ শতাংশ। অপরিমিত বৃক্ষচ্ছেদনের ফলে এই অঞ্চলের জলচক্রের ভারসাম্য নষ্ট হয়। যে বিপুল পরিমাণ বৃষ্টির জল অরণ্যরাজির সাহায্যে মৃত্তিকায় সঞ্চিত হত তা অরণ্য ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গেই প্রবাহিত হতে শুরু করল ভূপৃষ্ঠস্থ জলধারা (Run-off) রূপে। ফলে শুরু হল মৃত্তিকাক্ষয় ও ধস, বিশেষত জলপাইগুড়ি জেলা সংলগ্ন হিমালয় পর্বতের ঢালে। সাম্প্রতিক গবেষণায় প্রকাশ যে দার্জিলিং ও ভুটান অববাহিকা অঞ্চলে মৃত্তিকা ক্ষয়ের পরিমাণ বছরে ১০০০ থেকে ২০০০ মেট্রিক টন প্রতি হেক্টর থেকে। এই বিপুল পরিমাণ মাটি, বালি ও পাথর নদী অববাহিকার পার্বত্য অঞ্চল থেকে নদীর দ্বারা প্রবাহিত হয়ে জলপাইগুড়ি জেলার সমভূমিতে পৌঁছায়। সমভূমিতে নদী উপত্যকার ঢাল হঠাৎ কমে যাবার জন্য নদীগুলি ক্রমবর্ধমান পলি বহন করতে সক্ষম হয় না। লিস্, গিস্, ডায়না, রেথি, জয়ন্তী এবং ডিমা নদীতে সাম্প্রতিক গবেষণায় প্রকাশ যে ৭০ থেকে ৯০ শতাংশ পলি নদীখাতেই

জমা হয়। ফলে নদীগর্ভ ক্রমে ক্রমেই উঁচু হয়ে যায়। নদীখাতের তির্যকছেদের ক্ষেত্রফল (Cross Sectional Area) হ্রাস পায় এবং বর্ষাকালে প্রবল বর্ষণের সময় বিপুল জলরাশি ও পলি নদী বহন করতে ব্যর্থ হয়, দেখা দেয় বিধ্বংসী বন্যার।

অবৈজ্ঞানিক খনিজ উত্তোলন এবং পরিবেশের উপর তার প্রভাব

পরিবেশ অবক্ষয়ের এই পটভূমিকায় জলপাইগুড়ি জেলার ভুটান সীমান্ত ডলোমাইট উত্তোলন নতুন এক ভয়ঙ্কর অধ্যায়ের সূচনা করেছে। জলপাইগুড়ি জেলার উত্তরে এবং ভুটানের দক্ষিণ সীমান্তে বক্সা শিলাস্তরে সঞ্চিত আছে মূল্যবান ডলোমাইট এবং চুনাপাথর যার আনুমানিক পরিমাণ প্রায় ১৫০০ মিলিয়ন মেট্রিক টন। এর প্রায় এক তৃতীয়াংশ জলপাইগুড়ি জেলার মহাকাল, হাতিপোতা, জয়ন্তী, মেচিয়াখোলা, চুনীয়াঝোড়া, চামুর্চি এবং মাকড়াপাড়া অঞ্চলের ৩০০ বর্গ কি.মি.-এ সঞ্চিত।

১৯৩২ সালে বেঙ্গল লাইম ও স্টোন কোম্পানি এবং ১৯৪৭ সালে জয়ন্তী লাইম কোম্পানি জয়ন্তী ও হাতিপোতা অঞ্চলে সীমিত পরিমাণ খনিজ উত্তোলনের কাজ শুরু করে। উত্তোলন পদ্ধতি ছিল আদিম এবং পরিবেশের উপর তার প্রভাবও ছিল প্রতিকূল। কিন্তু ৭০-এর দশক থেকেই আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্য ও চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়েছিল ব্যাপক অবৈজ্ঞানিক ও বেআইনি উত্তোলন। পরিবেশের উপর এর প্রতিক্রিয়াও ব্যাপক এবং তা ভয়াবহ আকার ধারণ করে। এরপর ৮০-র দশকের শেষ দিকে বক্সা ও জয়ন্তীসহ বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ডলোমাইট উত্তোলন নিষিদ্ধ হয়।

ভারত ভূখণ্ডে অবৈজ্ঞানিক ডলোমাইট উত্তোলন বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গেই তা আরো ব্যাপকাকারে শুরু হল ভুটানের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে। ব্যাপক অরণ্য নিধন, বিস্ফোরক ব্যবহার এবং অবৈজ্ঞানিক উত্তোলন পদ্ধতি পরিবেশ অবক্ষয়ে এক নতুন মাত্রা পেল। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই জলপাইগুড়ি জেলার পরিবেশ এবং অর্থনীতির মূলে আঘাত হানল। লেখক তার গবেষক, ছাত্র এবং বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে একযোগে ১৯৮৫ সালে থেকে বক্সা জয়ন্তী-চামুর্চি-বাগরাকোট অঞ্চলে পরিবেশ অবক্ষয়ের উপর নিরন্তর গবেষণার কাজে যুক্ত। বর্তমান প্রবন্ধে তার কিছু তথ্য আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা হল।

নদীখাতের উচ্চতা বৃদ্ধি : ১৯৮৫ সাল থেকে ১৯৯৯ সালের মধ্যে জলপাইগুড়ি জেলার প্রায় সব নদীখাতেই উচ্চতা বৃদ্ধি হয়েছে ১ থেকে ২.৫ মিটার পর্যন্ত। জলপাইগুড়ি শহরের নিকট তিস্তা নদী ১.০ মিটার, বাগরাকোটে লিস্ নদী ২.৪৯ মিটার, ওদলাবাড়ির নিকট গিস্ নদী ১.৯৮ মিটার, ধূপগুড়ির নিকট জলঢাকা নদী ০.৯ মিটার, ৩১ নং জাতীয় সড়কের কাছে ডায়না নদী ২.০ মিটার, চামুর্চির কাছে রেথি নদী ২.৪১ মিটার, মাদারিহাটের কাছে তোর্সা নদী ০.৮ মিটার, আলিপুরদুয়ারে কালজানি নদী ১.৮১ মিটার, রাজাভাতখাওয়াতে ডিমা নদী ২.৩ মিটার, সান্তারাবাড়ির নিকট বালা নদী ২.৭ মিটার এবং জয়ন্তীতে জয়ন্তী নদীখাত ৩.১ মিটার উঁচু হয়েছে।

নদীর পাড় ভাঙন : নদীখাত উঁচু হবার ফলে বৃদ্ধি পায় নদীর পাড় ভাঙার প্রবণতা। ১৯৯৩ থেকে ১৯৯৯ সালের মধ্যে জলপাইগুড়ি জেলার নদীগুলি বিশেষ করে তিস্তা, লিস্, গিস্,

ভারত ভূখণ্ডে অবৈজ্ঞানিক ডলোমাইট উত্তোলন বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গেই তা আরো ব্যাপকাকারে শুরু হল ভুটানের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে। ব্যাপক অরণ্য নিধন, বিস্ফোরক ব্যবহার এবং অবৈজ্ঞানিক উত্তোলন পদ্ধতি পরিবেশ অবক্ষয়ে এক নতুন মাত্রা পেল। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই জলপাইগুড়ি জেলার পরিবেশ এবং অর্থনীতির মূলে আঘাত হানল।

চেল, ডায়না, রেথি, জলঢাকা, গিলান্ডি, পাগলা, ডিমা, জয়ন্তী, কালজানি, রায়ডাক ইত্যাদি নদীগুলিতে ব্যাপক হারে পাড় ভেঙে নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হয়েছে। যার ফলে শত শত হেক্টর বনভূমি, কৃষিজমি ও চা বাগিচা নষ্ট হয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থার এবং বহু জনপদের। শুধুমাত্র ১৯৯৮ সালে জয়ন্তী নদীতেই প্রায় ১.৫ মিলিয়ন কিউবিক মিটার পলি পড়ে নদীর গতিপথের প্রায় ১২ কিলোমিটার পথ পরিবর্তিত হয়েছে। ফলে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের অমূল্য অরণ্য সম্পদ ও জীববৈচিত্র্যের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে।

নদীখাতের আয়তন বৃদ্ধি : জলপাইগুড়ি জেলার ছোট ও মাঝারি নদীগুলিতে নদীখাতের আয়তন বৃদ্ধি হচ্ছে উদ্বেগজনক হারে। বিগত ১০০ বছরে নদীগুলির খাত ২ থেকে ৪ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। অববাহিকা অঞ্চলে ব্যাপক অরণ্য সংহার, অবৈজ্ঞানিক ডলোমাইট উত্তোলন এবং ভূমিব্যবহারের ফলে এই হার আরও বৃদ্ধি পায়। গত ১৫ বছরে (১৯৮৫-১৯৯৯) জয়ন্তী, লিস্, গিস্, রেথি, ডায়না, ডিমা ও পাগলা নদীর খাতের আয়তন বৃদ্ধি হয়েছে ২ থেকে ৩ গুণ পর্যন্ত। উপগ্রহ থেকে প্রাপ্ত তথ্য এবং ভূমি সমীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ করে লেখক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে পরিবেশে অবক্ষয়ের বর্তমান ধারা অব্যাহত থাকলে আগামী ২০৫০ সাল নাগাদ হিমালয় পাদদেশে ৩ থেকে ১৫ কিলোমিটার দূরবর্তী অঞ্চলে কয়েকটি অতিবৃহৎ সংযুক্ত নদী উপত্যকার (Coalescing Mega-Valley) সৃষ্টি হবে। এর ফলে জলপাইগুড়ি জেলার অতি সমৃদ্ধ চা বাগিচা ও অরণ্য সম্পদের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ চিরদিনের মতো ধ্বংস হবে।

অরণ্য সম্পদ এবং জীববৈচিত্র্যের উপর প্রভাব : উপগ্রহ থেকে প্রাপ্ত তথ্য এবং ভূমি সমীক্ষার ফলাফল থেকে জানা যায় যে গত ৬ বছরে (১৯৯৩-১৯৯৮) এই জেলায় বন্যা সংক্রান্ত কারণে মোট ১৩৪০ হেক্টর অরণ্যভূমি ধ্বংস হয়েছে। প্রায় ৩৫ লক্ষ বৃক্ষ নষ্ট হয়েছে, যার আনুমানিক বাজার মূল্য ২০০০ কোটি টাকার বেশি। জীববৈচিত্র্যের বহু অমূল্য উপাদান ধ্বংস হয়েছে যার প্রকৃত মূল্যায়ন অসম্ভব। ডলোমাইট চূর্ণ অরণ্য-মৃত্তিকার ক্ষারত্বের পরিমাণ বৃদ্ধি করেছে (P^H ৬.০ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৭.৫ হয়েছে জয়ন্তী

স্বাধীনতা-উত্তরকালে জনবসতির চাপ আরও বেশি হতে দেখা গেল। শুরু হল মানুষের নদী উপত্যকা দখল। তিস্তা, তোর্সা, জলঢাকা, রায়ডাক ইত্যাদি স্বাভাবিক খাতে গড়ে উঠল অসংখ্য কৃষিভূমি ও জনবসতি। ফলে নদীর স্বাভাবিক গতিপথে বাধার সৃষ্টি হল। স্বাভাবিক কারণে নদীও তার আপন গতিপথ পুনর্দখল করতে চাইল। শুরু হল এক নতুন অধ্যায়—নদী আর মানুষের মধ্যে এক অসম যুদ্ধ।

অঞ্চলে), ফলে শালজাতীয় বৃক্ষ মাটি থেকে ফস্‌ফেট আহরণ করতে অক্ষম হয়ে মৃত্যুবরণ করছে। জয়ন্তী ও সান্তারাবাড়ি অঞ্চলে ১৯৯৮-৯৯ সালে প্রায় ৬০০০টি গাছের মৃত্যুর হয়েছে এই কারণে, যার বাজার মূল্য ৫ কোটি টাকা। অরণ্যে ভূমিস্থ গুল্মজাতীয় উদ্ভিদের ধ্বংস এই অঞ্চলে উদ্ভিদ ও জীবজগতের খাদ্যচক্রের ভারসাম্য নষ্ট করেছে।

চা বাগিচা এবং কৃষিজমির উপর প্রভাব : বন্যা এবং বন্যা সংক্রান্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগে গত ৮ বছরে (১৯৯১-১৯৯৯) জলপাইগুড়ি জেলায় প্রায় ২১০ হেক্টর চা বাগিচা এবং ৩২০ হেক্টর কৃষিজমি ধ্বংস হয়েছে। এছাড়া ডলোমাইট চূর্ণ মৃত্তিকার ক্ষারত্ব বৃদ্ধি করে চা উৎপাদন এবং তার গুণগত মানকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। কৃষিজমির উর্বরাশক্তি হ্রাস পেয়েছে উল্লেখযোগ্যভাবে।

মৃত্তিকা এবং জলসম্পদের উপর প্রভাব : ডলোমাইট চূর্ণ জলপাইগুড়ি জেলার হিমালয় সংলগ্ন অঞ্চলে মৃত্তিকার ক্ষারত্ব বৃদ্ধি করছে ব্যাপকহারে এবং সেই সঙ্গে মৃত্তিকার জৈব উপাদানের পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। কালচিনি, চামুর্চি, নাগরাকাটা অঞ্চলে কৃষি উপাদানের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা গেছে। ভূপৃষ্ঠ এবং ভূগর্ভস্থ জলে দ্রবীভূত ক্যালসিয়ামের প্রাধান্য জীবজগতের উপর খুবই প্রতিকূল প্রভাব ফেলেছে। কালচিনি, রাজাভাতখাওয়া, জয়ন্তী, চামুর্চি অঞ্চলে জলদূষণ ইতিমধ্যেই উদ্বেগজনক অবস্থায় পৌঁছিয়েছে। এ ছাড়া মৃত্তিকা শুষ্কতার (Edaphic Droughtness) প্রবণতা ঘটাচ্ছে বিভিন্ন স্থানে।

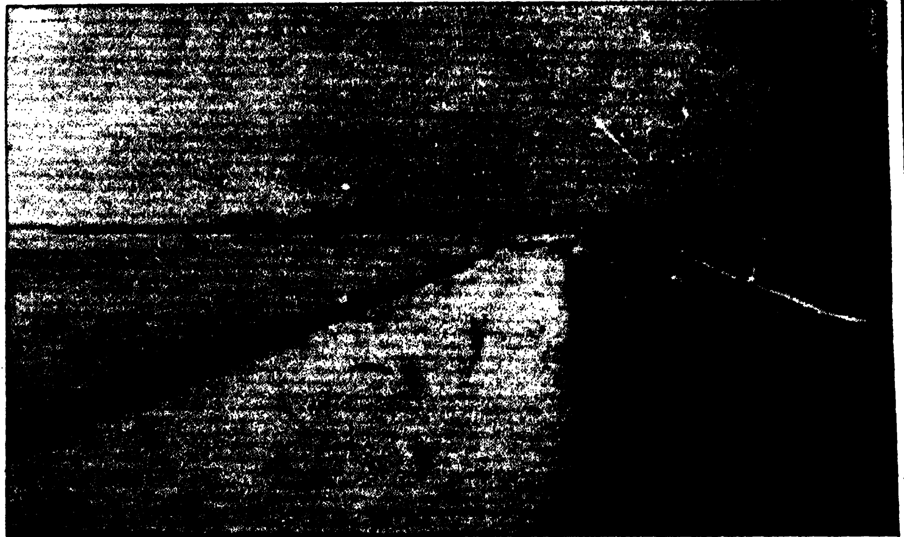
জনস্বাস্থ্যের উপর প্রভাব : কালচিনি, রাজাভাতখাওয়া এবং চামুর্চি অঞ্চলে সাম্প্রতিক অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে কিডনির অসুখ গত কয়েক বছরে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সম্ভবত পানীয় জল ও খাদ্যের মাধ্যমে অতিরিক্ত ক্যালসিয়াম মানবদেহে প্রবেশ করে এই ধরনের অসুখের প্রাদুর্ভাব ঘটিয়েছে।

বন্যার পটভূমিকা : বন্যা এক প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে নদী তার পার্বত্য ও সমতল অববাহিকার মধ্যে শক্তি এবং নদী প্রবাহের ভারসাম্য রক্ষা করে। হিমালয় সৃষ্টির উষালগ্ন থেকেই উত্তরবঙ্গে বা সমপ্রায় ভূমিতে শুরু হয়েছিল বন্যার নিরবচ্ছিন্ন ইতিহাস। হিমবাহ-উত্তর যুগে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মাপের বন্যার নিশ্চিত সাক্ষ্য বহন করছে তিস্তা নদীর পার্বত্য অংশে বিভিন্ন উচ্চতায় অবস্থিত পলল ধাপগুলি। হিমালয় পাদদেশে জলপাইগুড়ির বৃত্তাকার পলল স্তরগুলি লেখকের মতে হিমবাহ-উত্তর যুগের ভয়াবহ বন্যার ফলে সৃষ্ট।

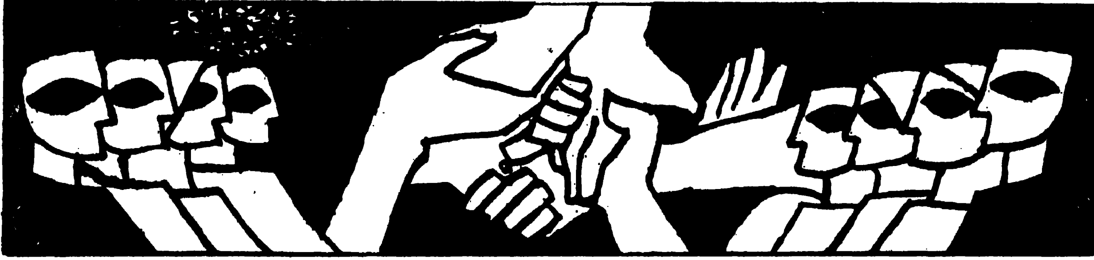
সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গেই জনবসতির ক্রমবর্ধমান চাপ অনুভূত হতে লাগল এই অঞ্চলে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, চা বাগিচা এবং বনসম্পদ হিমালয় সংলগ্ন উত্তরবঙ্গের তথাকথিত উন্নয়নের সূচনা করল। বিধ্বংসী অরণ্য ধ্বংস করে গড়ে উঠতে লাগল নতুন নতুন জনপদ এবং কৃষিভূমি। স্বাধীনতা-উত্তরকালে জনবসতির চাপ আরও বেশি হতে দেখা গেল। শুরু হল মানুষের নদী উপত্যকা দখল। তিস্তা, তোর্সা, জলঢাকা, রায়ডাক ইত্যাদি স্বাভাবিক খাতে গড়ে উঠল অসংখ্য কৃষিভূমি ও জনবসতি। ফলে নদীর স্বাভাবিক গতিপথে বাধার সৃষ্টি হল। স্বাভাবিক কারণে নদীও তার আপন গতিপথ পুনর্দখল করতে চাইল। শুরু হল এক নতুন অধ্যায়—নদী আর মানুষের মধ্যে এক অসম যুদ্ধ। মানুষ তার জীবন ও জীবিকা রক্ষায় নদীর উপর শাসন শুরু করল। তৈরি হল অসংখ্য ডাইক, স্পার বাঁধ ; কিন্তু মানুষের এই ধরনের নদীশাসন খুব ফলপ্রসূ হয়নি। বরং বন্যার ভয়াবহতা এবং বিধ্বংসী রূপকে আরও বৃদ্ধি করেছে।

বন্যার কারণ : হিমালয় সংলগ্ন জলপাইগুড়ি জেলায় সাম্প্রতিক বন্যা সৃষ্টির কারণগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়—

(ক) **অস্থায়ী এবং পরিবর্তনশীল কারণ :** অববাহিকা অঞ্চলে প্রবল বৃষ্টিপাত জলপাইগুড়ি জেলার বন্যার অন্যতম প্রধান কারণ। ১৯৬৮ সালে সিকিমের পার্বত্য অঞ্চলে অবিরাম বর্ষণের ফলে ধস



জলপাইগুড়ি জেলায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ ব্যবস্থা, ভাঙনের স্থানে পুনঃনির্মিত বাঁধ



পবিত্র ভট্টাচার্য

১৯৬৮ সালের বন্যা—ফিরে দেখা

১৯৬৮ সালের ৪ অক্টোবর তিস্তার বাঁধ ভেঙে পাহাড়পুর, বালাপাড়া, সেনপাড়া, ওয়াকারগঞ্জ, রায়কতপাড়া, হাসপাতালপাড়া, সমাজপাড়ায় জল ঢুকে পড়ে। রাত আড়াইটা থেকে পৌনে তিনটের মধ্যে সমস্ত শহর জলে ভেসে যায়।

৪ অক্টোবর বেলা দশটার আগেই তিস্তার জল বিপদসীমা অতিক্রম করেছিল। আর সন্ধ্যা সাতটায় জল বিপদসীমা অতিক্রম করে আরও একফুট ওপরে উঠেছিল। তাছাড়া রংধামালীর বাঁধ লিক্ করেছে ওই শুক্রবার সকাল থেকেই।

জলপাইগুড়ির জেলাশাসক এবং ইরিগেশনের মুখ্য বাস্তুকার এই সমস্ত তথ্যই জানতেন। আমরা শুক্রবার সকালে মণ্ডলঘাটে দেখলাম হাজার হাজার মানুষ ঘরের চালায়, গাছের ডালে আশ্রয় নিয়েছে।

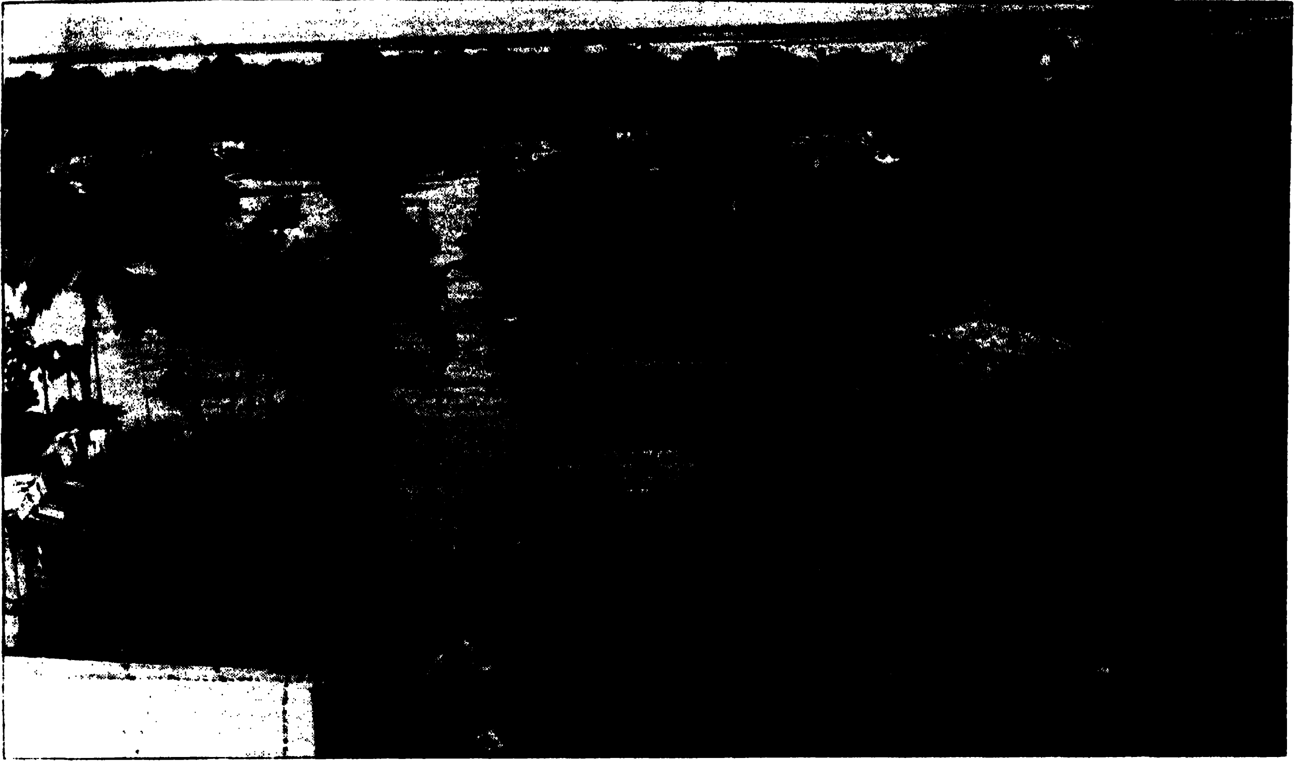
রেলওয়ে সেতু ভেঙে শহরের সঙ্গে মণ্ডলঘাটের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। তখনই আমরা বুঝতে পেরেছিলাম জলপাইগুড়ির বিপদ আসন্ন। জেলাশাসক বা কর্তৃপক্ষ শহরবাসীকে কোনওরকম সতর্ক করলেন না। বাঁধ ভাঙা জল কয়েক মিনিটের মধ্যেই ন-দশফুট হয়ে দাঁড়াল।

শুক্রবার রাত আড়াইটা থেকে শনিবার (৫ অক্টোবর, সেদিন লক্ষ্মীপূর্ণিমা ছিল) রাত ১১টা পর্যন্ত শহর জলের তলায়। রাত ১২টার পর জল নেমে যায়। রবিবার বেলা ১২টা পর্যন্ত শহরে এক বিন্দু খাবার জল নেই।

রায়কতপাড়ার পাশাপাশি আটটি বাড়ি থেকে চোদ্দজন লোক মারা গেছে। কারও বাবা, তিনজনের মা, একজনের স্বামী, দুজনের পুত্র-কন্যা।

ওয়াকারগঞ্জ, সেনপাড়া, পাহাড়পুর, বালাপাড়া, দিনবাজারের মৃত্যুর সংখ্যা হিসেবের বাইরে। এরপর রয়েছে—সমাজপাড়া, পাণ্ডাপাড়া, মহন্তপাড়া।

জলপাইগুড়ি শহরের অন্ততপক্ষে দুই হাজার লোক মারা গেছে। প্রায় পাঁচহাজার গবাদি পশু মারা গেছে। অসংখ্য



১৯৬৮ সালের বন্যা, সমাজপাড়ায় ঘরের চালে ও ছাদের উপর মানুষ *ছবি : মণীন্দ্রনাথ কর্মকারের সৌজন্যে*

বাড়ির ইটের পাঁচিল ভেঙে গেছে। বইপত্রের গায়ে এখনও পলির দাগ রয়েছে। শুধু মৃত্যুই নয় জলপাইগুড়ির সমাজ ভেঙেছে।

মঙ্গলবার (৮ অক্টোবর) সকাল পর্যন্ত সরকারি ত্রাণের কোনও ব্যবস্থা ছিল না। তারপর তা নামেমাত্র শুরু হল, সাহায্যের পরিমাণ কিছুই না বলা চলে।

রবিবার দুপুর থেকে শিলিগুড়ির ছাত্র-যুবসমাজ এবং বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাহায্যের ফলে জলপাইগুড়ির হাজার হাজার লোক জীবন ফিরে পেয়েছে। রবিবার রাত ৮টায় শিলিগুড়ি থেকে যে ত্রাণ এসেছে তার মারফৎ আমরা খাবার জল, মোমবাতি এবং দেশলাই পাই। শিলিগুড়ি যাতায়াতের কোনও ব্যবস্থা ছিল না। এমনকি শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি লাইনের স্টেটবাসগুলো পর্যন্ত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

দোমহনিতে তিস্তা নদীর বাঁধের গা ঘেঁষে এপারে-ওপারে পাকুড় গাছটার আশে-পাশে ২৫০ ঘর বসতি ছিল। লোকসংখ্যা প্রায় দেড় হাজার। সেখানে বাঁধটা ভেঙে ছিল প্রায় তিন ফার্লং জায়গা নিয়ে। বাড়িঘরের কোনও চিহ্ন নেই। সেখানে যে বন্যার আগে বাস করত প্রায় দেড় হাজার মানুষ, এখন দেখলে কেউ বিশ্বাস করতে পারবে না সে কথা। ওই দেড় হাজারের ভেতর প্রাণে বেঁচে আছে সামান্য কিছু লোক। কেউ বা বলেন দেড়শ কেউবা বলেন আড়াইশ। এই ঘনবসতি এলাকাটা একটা মস্ত বিলে পরিণত হয়েছিল। ওই বিলের মধ্যে একটা শুশুক মাঝে মাঝেই ভেসে উঠছিল ওই বানভাসি মানুষগুলোর মতো বাঁচার তাগিদে। অনেকদিন ধরে সেই শুশুকটা মাঝে মাঝেই ডোবা-ভাসার খেলা দেখাত। বেশ কিছুদিন পর শুশুকটার তিন-চারটে বাচ্চা হয়েছিল।

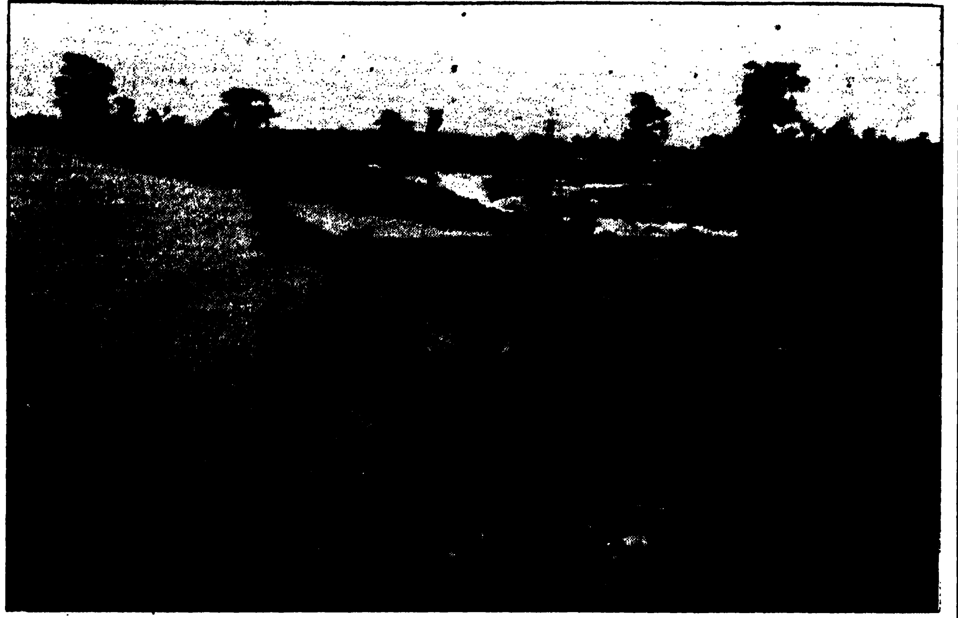
দশ মাসের সন্তানসম্ভবা দোমহনির রমণী কাঠের গুঁড়ি ধরে ভেসে উঠেছিল বোয়ালমারির চরে। জ্ঞান হারিয়ে জ্ঞান ফিরে পাবার পর দেখল একরাশ ভেজা খড়ের উপর সদ্যোজাত শিশু। গ্রামের কয়েকজন বয়স্ক মহিলা তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। খড়, শিশু, আর কিছু অপরিচিত মুখ এক হলেই যিশুর কথা মনে আসে। মনে হয় পৃথিবীটা পাল্টাচ্ছিল। কে বেঁচে, কে মরে জানা ছিল না। সন্তান আর মায়ের যোগসূত্রের নাড়ি কাটা হয়েছে বাখারির ধারালো চাতলা দিয়ে। সেই মহিলা তার শিশুকে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল এগ্রাম থেকে সে গ্রামে।

শুশুকটা বাঁচাতে পারেনি তার বাচ্চাগুলোকে। একদিন শুশুকের অতোগুলো বাচ্চা ভাসল। আর ডুবল না। শুধু ভাসার খেলা দেখিয়ে পঞ্চভূতে মিশে গেল।

মাস কয়েক পর শুরু হল ভাঙা বাঁধের মেরামতির কাজ। দোমহনির ওই অংশের কন্ট্রাক্ট পেলেন একজন মাড়োয়ারি কনট্রাক্টর। নতুন বিল বন্ধ করতে হবে। বিলটা মাটি দিয়ে ভরাট না করলে বাঁধ মেরামতের কোনও অর্থই হবে না। বিল মাটি দিয়ে ভরলে শুশুকটাও চাপা পড়ে। তাতে কিছু এসে যেত না। কিন্তু শুশুকটা মাঝে মাঝে ভেসে ডুবে আশেপাশের বানভাসিদের সঙ্গে একটা আত্মীয়তা পাতিয়েছিল। তাই মস্ত বড় একটা জাল দিয়ে ধরা হল শুশুকটাকে। টেনে হিঁচড়ে ফেলা হল তিস্তাতে। সেই দিনই সন্ধ্যাবেলায় ভেসে উঠল শুশুকটা। আর ডুবল না। বাঁধের কাছে চরটার গায়ে গিয়ে ঠেকে থাকল। ডুবে ডুবে জল খেয়েই যে শুশুক বেঁচে থাকে তারও এতো ঘন ঘন জল বদল পোষাল না। সব মাটি থেকে শেকড় রস শুষতে পারে না। সব জলে শুশুকও ভাসতে ডুবতে পারে না।

রাজপিয়ারি হাতিটাও পারেনি। জীবজন্তু, গাছ-গাছড়া এরা তো প্রকৃতিতে বাঁচে। প্রকৃতির এতো অদল-বদল ওরা সইতে পারে না। কিন্তু রাজপিয়ারি হাতির গল্প তো আর এক কাহিনী।

সেই বিলটা মাটি দিয়ে ভরাট করা হয়েছে। সেই বিলটার উপর ঘর বাঁধা হয়েছে। অবশ্য ওগুলোকে ঘর বলা চলে না। কুড়ি-পঁচিশখানা ডেরা মাত্র। আর ওই সমস্ত এলাকাটা দিয়ে তৈরি হচ্ছে ভারত সেবক সংঘের ছোট ছোট চারচালা টিনের ঘর। ওই বিলটার ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে মৃত্যু আর মৃত্যু। নতুন করে আবার ওই মৃত্যুপুরীতে ঘর বাঁধা হচ্ছে। পূর্ব মণ্ডলঘাটের মাঠ থেকে জল নামল কার্তিকে, আবার জ্যৈষ্ঠ মাসেই জল নদী থেকে ঘরে উঠে এল। সেখানেও ঘর বাঁধা হয়েছে। জলপাইগুড়িতে কি এমন কোনও জায়গা আছে, যেখানে মৃত্যু নেই? পায়ে পায়ে মরণ। পায়ে পায়ে স্মৃতি।



বানারহাট ও চেংমারি স্টেশনের মাঝে ডায়না রেলসেতুর উপর শূন্যে রেললাইন

এই দোমহনি দিয়েই বেঙ্গল-ডুয়ার্সের রেলগাড়ি চা মালিকদের নিয়ে গেছে, ছোটনাগপুর বিহারে মজুর নিয়ে গেছে। আর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রসাদে শিল্পবিপ্লবের ছিটেফোঁটা ছড়িয়ে পড়েছে পাহাড়ে অরণ্যে। তারপর দেশ স্বাধীন হয়েছে। শিল্পায়নের সম্ভাবনা দিবাস্বপ্নের চাইতেও দ্রুত উঠে গেল। সেই স্বপ্ন যে আঙিনায় লালিত হয়েছিল, সেই দোমহানি হল পরিত্যক্ত। পরিত্যক্ত হল স্বপ্ন, শিল্পবিপ্লবের স্বপ্ন। আর তাই আজ একটা পাহাড়ি নদী পারে লক্ষ লক্ষ মানুষকে কুটোর মতো ভাসিয়ে নিয়ে যেতে। ভেসে গিয়ে মরে যাওয়া ছাড়া মানুষ কিছু করতে পারে না। শুশুক কিছু করতে পারে না। রাজপিয়ারি হাতি কিছু করতে পারে না। ফরেস্টের গাছেরা কিছু করতে পারে না।

যে দোমহনি দিয়ে একদিন শিল্পবিপ্লবের বাণী এসেছিল, তারপর যেখান দিয়ে একদিন তিস্তার বন্যা এসেছে। শিল্পবিপ্লবের বীজ থেকে শিল্পায়ন হয় না, হয় তিস্তার বন্যা।

১৯৪৭ সালের ১২ই আগস্ট রেলের ড্রাইভার হারাধন সেন যাত্রীবাহী ট্রেনের ড্রাইভার হয়ে এসেছিলেন লালমনিহাট থেকে দোমহনিতে। এই রেলমেশিন তিনি ঘুরে দেখালেন আমাদের। তিনি দেখালেন এই মেশিনের সবচেয়ে পুরনো কোয়ার্টার। ১৮৯২ সালে তৈরি হয়েছিল এ বাড়িটা। 'সার্ভে অ্যান্ড কোম্পানি'। সার্ভে অফিস। রানিং রুমও বলা হত। এই বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমরা মৃত অজগর সাপের মতো পড়ে থাকা সারি সারি রেললাইনের ওপর দিয়ে হেঁটে এসে মালগুদামের কাছে দাঁড়ালাম।

মরচে ধরা রেললাইনের ভেতর জঙ্গল গজিয়েছে। স্লিপারে উঁই। দূরে ডিসট্যান্ট সিগন্যাল। এক বানে সংসার হারানো আধাখ্যাপা মানুষের মতো দিগন্তকে ভয় দেখাচ্ছে। বিশাল লোহার বিমের একটি গাদাকে ঢেকে দিচ্ছে মাটি। ১৮৯২ সালে তৈরি করা বাড়ির পেছনে ভাঙা বাঁধের ফাঁক দিয়ে মাংসহীন করোটির মতো তিস্তার হাসি।

মনে পড়ল ১৯৫২ সালের বন্যায় যেমন করে বার্নিশের রেলওয়ে জংশন উঠে গেল, চাকরি গেল সুইপার মহাবীর বাসফোরের। ব্যবসা বন্ধ হল দাশরথি মোদকদের।

রেলওয়ের বড় বাবুরা আর কংগ্রেসি নেতারা এসে বলে গেলেন বার্নিশে আর রেলস্টেশন থাকবে না। প্রতি বছরই বার্নিশে বন্যা হবে। আগে কোর্টকাছারি আর শহরকে বাঁচাতে হবে। বার্নিশের কয়েক হাজার মানুষ বানে ভেসে গেলে এমন কী আর হবে। যেমন করে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরদিন থেকে কাতারে কাতারে মানুষ বানের জলের মতো ভেসে এসেছে নিজের বাস্তুভিটা ত্যাগ করে। উদ্বাস্তু শিবির তো রয়েছেই। না হয় আর একটা শিবির খুলে দিলেই হবে।

ত্রাণ শিবির হয়েছিল কিনা জানি না, তবে উদ্বাস্তু হয়েছিল অনেকেই সেটা জানি। তাদের মধ্যে অনেকেই এখন ভিখারি। কৃষিকাজ ছেড়ে দিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে দিয়ে দিনমজুর হয়েছে। ক্ষেত-মজুর হয়েছে। কেউ বা আত্মহত্যা করেছে।

সেই বড় বন্যার কয়দিন পরেই শহরের কাছারির পাশ দিয়ে বাঁধ দেওয়া শুরু হল।

দাশরথি মোদকেরা ঠিকই বলেছিলেন, এপার-ওপার, শহর-গ্রাম। জলপাইগুড়ি, বার্নিশ। সবাইকে নিয়ে বাঁচা। সবাইকে বাঁচাবার বদলে, ভাগ করিয়ে করিয়ে বাঁচানো। মাস্টার-প্ল্যানের কর্মোদ্যোগ নয়। ডিভাইড অ্যান্ড রুলের মাস্টার প্ল্যান।

৮৩ বছরের বৃদ্ধ দাশরথি মোদক একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেছিলেন 'রায়টের পর বড় বানায় গোপালগঞ্জের তেমন কিছু ক্ষতি করতে পারেনি। দুই-একজনের সামান্য কিছু জমি নষ্ট হয়েছিল। সেও খুব সামান্য। আর এমন লক্ষ্মীপূজার আগের দিন রাত্রিতে যে বানা হল, আমাদের লক্ষ্মীকে, নিজেদের জমিকে, তিস্তার জলে ভাসিয়ে দিলাম। ময়নাগুড়ি বি ডি ও অফিস আর জলপাইগুড়ি সেটেলমেন্ট অফিসের খাতায় এখনও গোপালগঞ্জের নামটা লেখা আছে। কিন্তু আগামী সনে আর জের টানবে না। গোপালগঞ্জ আর নেই। মুছে গেছে রেলের অফিসের খাতা থেকে সেই বি ডি আর-এর আমলের পাকা রেলের স্টেশন। খেয়াঘাটের পাড়ের স্টেশন। আগামী সন গোপালগঞ্জের নামও হবে তিস্তা। ওই তিস্তার ব্রিজ না হলে গোপালগঞ্জ কিছুতেই তিস্তা হত না। বড় বানায় (৫২ সনে)



১৯৬৮'র বন্যা. নেতাজী সেতু ভেঙে যাওয়ার পর নির্মিত নতুন সেতু-যোগাযোগ　　ছবি : মণীন্দ্রনাথ কর্মকারের সৌজন্যে

ঘরের মধ্যে এক কোমর জল ছিল মাত্র। আমরা সবাই ঘরের মধ্যে ছিলাম। আর এখন ওই আমগাছটার ওপর চড়ে কোনও মতে প্রাণ বাঁচালাম। মরে যাওয়াটাই ভালো ছিল বাবু।' এই কথাগুলো এক নিঃশ্বাসে বলেই ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন দাশরথি মোদক।

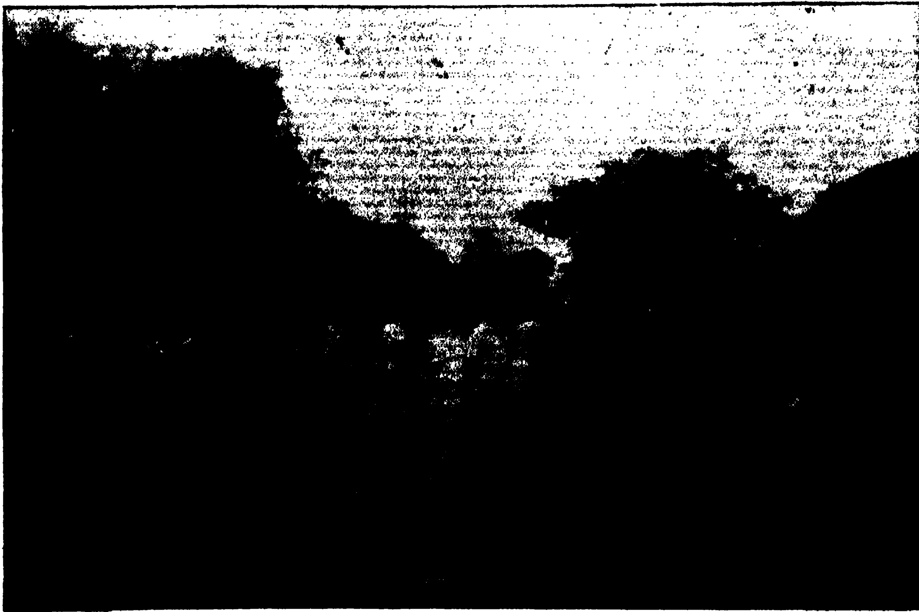
বার্নিশ রেল স্টেশনটা ছিল। আজ নেই। দাশরথি মোদক বলেন, ৫২ সনের বানে গেছে। গোপালগঞ্জ ছিল। আজ নেই। ৬৮ সনের বানে গেছে। তিস্তার পারের বিস্তীর্ণ অঞ্চল গেছে। যাবে। কারণ নদীকে শাসন না করলে নদীই শাসন করবে। উত্তরবাংলায় এখন নদীর শাসন।

দাশরথি মোদক, ননীগোপাল সাহা, ধোবা সাও আর বৃদ্ধা সুখেশ্বরী রায় যেখানে ঘর বেঁধেছে, সেই মাটির উঁচু জায়গাটার ওপর দিয়ে ৫২ সনেও রেলগাড়ি চলত।

৬৮ সনের-বন্যার আগেও দেবেন রায়ের পৌনে তিন হালচাষের জমি ছিল। হালের বলদ ছিল, বাড়ি ছিল। ধানের গোলা ছিল। আর বৃদ্ধা সুখেশ্বরী রায়ের ছিল দেড় হালচাষের জমি। আর মেয়ের জামাই ঘরেন রায়ের ছিল মুদি দোকান। ননীগোপাল সাহা আর ধোরা সাও-এর ছিল ১১ বিঘা আর ৯ বিঘা চাষের জমি। বাড়ি আর হালের বলদ, গাই গরু। এঁদের সকলের মুখে ওই একই কথা ছিল, সামনের বর্ষায় এখানে থাকতে পারব কিনা? এ সনের বানায় যে দুটো নৌকো ছিল সেগুলোও ডুবে গেছে। ভেঙে গেছে। নৌকো থাকলে না হয় পাড়ি দিতাম সাগরের দিকে। বানার সময় তো আর 'পাসপোর্ট' লাগে না।

এই তিস্তায় বন্যা হয়েছে বহুবার, বহুবার সে বন্যা উত্তর বাংলাকে ভাসিয়েছে।

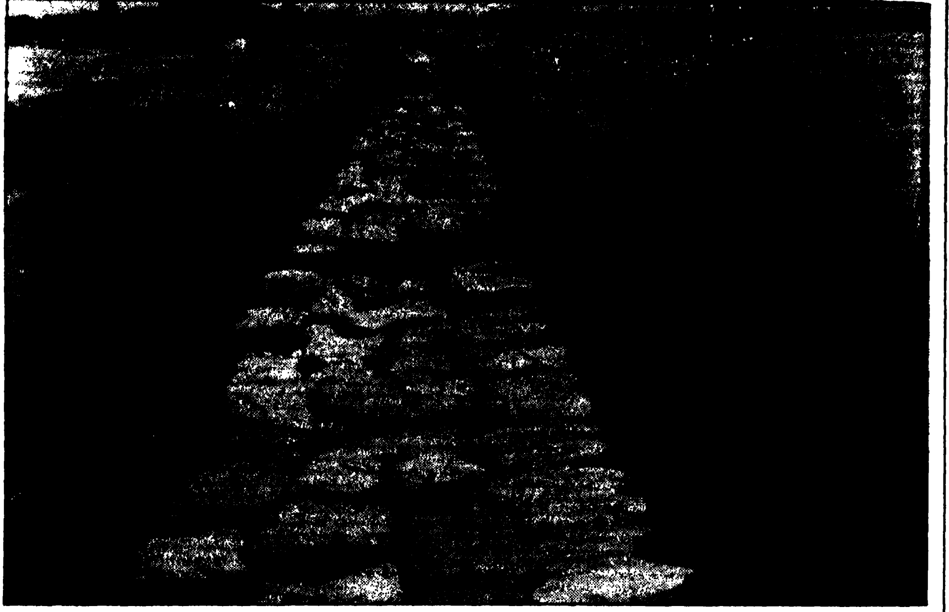
বন্যায় বিধ্বস্ত জলপাইগুড়ি শহর



স্বাধীনতার পর ১৯৫২, ১৯৫৪, ১৯৫৫ ও ১৯৫৬ সালেও তিস্তার বন্যায় ধ্বংসলীলা প্রত্যক্ষ করা গেছে কিন্তু তবুও তদানীন্তন সরকার থেকে তিস্তার বন্যা প্রতিরোধের জন্য কোনও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

১৯৬২ সালের পর অবৈজ্ঞানিক উপায়ে সাড়ে তিন কিলোমিটার প্রশস্ত তিস্তা নদীকে ৫০০ মিটারে বেঁধে ফেলার (তিস্তা সেতু) জন্য বিধ্বংসী বন্যা হল ৪ অক্টোবর ১৯৬৮ সালে। জলপাইগুড়ি শহর ডুবল বাঁধ ভাঙা জলে।

সেই সময় বিশিষ্ট ইঞ্জিনিয়ার কপিল ভট্টাচার্য বহুবার সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন কিন্তু কংগ্রেস সরকার তাতে কর্ণপাত করেনি।

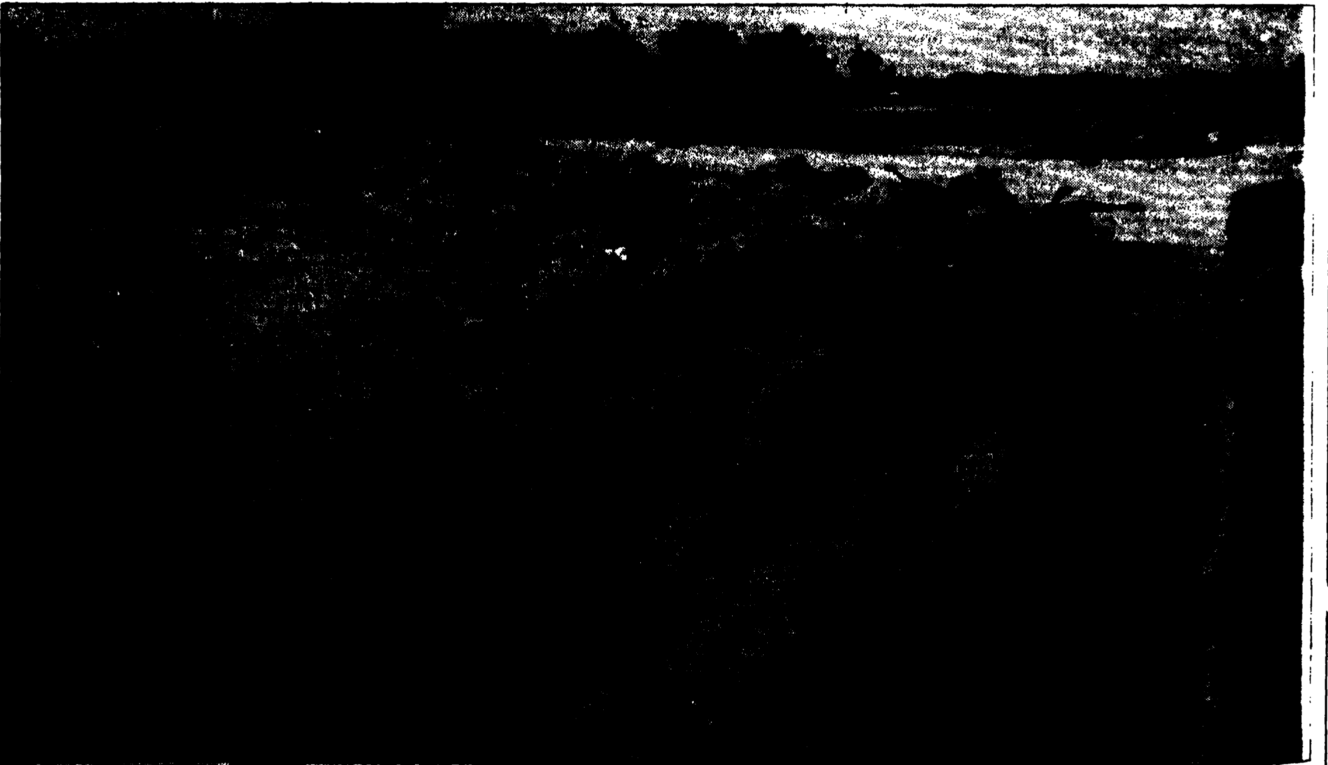


জলপাইগুড়ির বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

তিস্তা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার ছিল নির্বিকার। যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিত্বকালে সেচমন্ত্রী প্রয়াত বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় তিস্তা-তোর্সা-মহানন্দা প্রভৃতি নদীর মাস্টার প্ল্যানের অনুমোদনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি জানান। 'তিস্তা প্রকল্পের অন্যান্য ব্যবস্থার মধ্যে আছে তিস্তা বাজারের কাছে একটি হ্রদ নির্মাণ করে তিস্তা স্রোত থেকে কয়েক হাজার কিউসেক জল ধরে রাখার ব্যবস্থা। ওই কৃত্রিম হ্রদে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থাও সারা উত্তরবঙ্গের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নে সাহায্য করবে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এর আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ না করলে এ কাজে হাত দেওয়া সম্ভব নয়। এ কাজটা সম্পন্ন হলে যেমন বন্যার হাত থেকে উত্তরবঙ্গ বাঁচবে, তেমনই বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রাচুর্যে উত্তরবঙ্গে শিল্প ও কৃষি উভয়েরই বহুল বিকাশের রাস্তা খুলে যাবে।'

জলপাইগুড়ি জেলাকে বাঁচাতে হলে মাস্টার প্ল্যান চাই। এই মাস্টার প্ল্যানই পারে একমাত্র বন্যার হাত থেকে জলপাইগুড়ি জেলা তথা উত্তরবাংলাকে বাঁচাতে।

লেখক ❑ শিক্ষক, সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক



১৯৬৮'র বন্যায় মৃত অসংখ্য গবাদিপশু

ছবি : মণীন্দ্রনাথ কর্মকারের সৌজন্যে



বিকাশকুসুম চৌধুরী

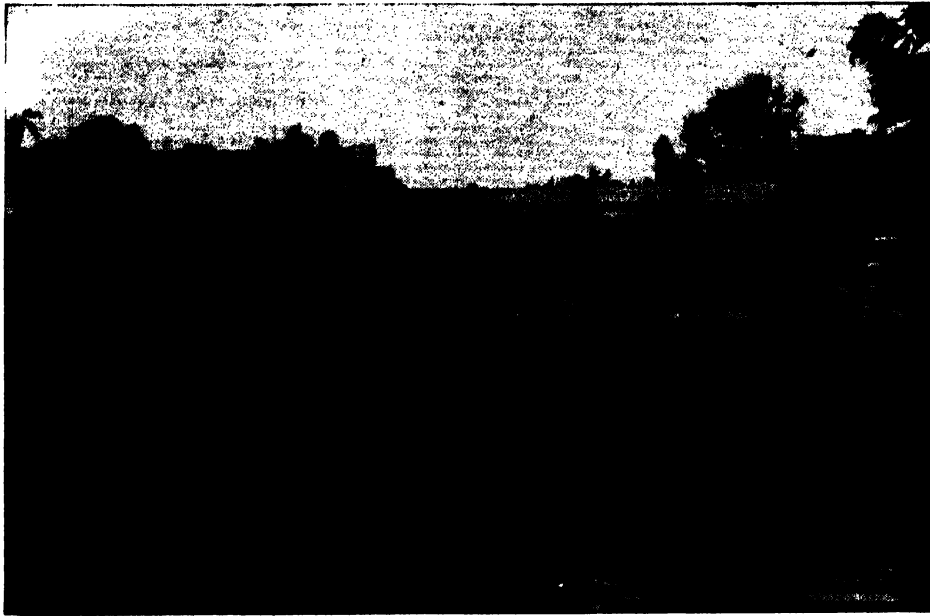
জলপাইগুড়ি জেলায় বন্যার সমস্যা ও তার প্রতিবিধান

উত্তরবঙ্গের ৬টি জেলার মধ্যে দার্জিলিং পার্বত্য এলাকা বাদ দিয়ে জলপাইগুড়ি জেলার ভৌগোলিক অবস্থান সর্ব উত্তরে। এই জেলার বৈশিষ্ট্য এই যে, এর উত্তরসীমা দার্জিলিং জেলার ৮০ কিমি এবং ভুটানের ১৪৪ কিমি, পশ্চিমে দার্জিলিং সীমারেখা হতে পূর্বে আসাম রাজ্যের সীমারেখা পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের মধ্যে ২৫টি নদী জলপাইগুড়ি জেলার মধ্যে উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত। যে নদীগুলি ব্রহ্মপুত্র নদের অববাহিকা অঞ্চল বলে চিহ্নিত। এই নদীগুলি হল—(১) তিস্তা, (২) জলঢাকা, (৩) ঘাটিয়া, (৪) চুয়াপাথাং, (৫) লঙ্গিত / চামুচী, (৬) রেতী, (৭) ডিমডিমা. (৮) সুকৃতি, (৯) পাগলী, (১০) শুকানতিতি, (১১) তিতি, (১২) তোর্ষা, (১৩) হাউর, (১৪) কালজিনি, (১৫) গদাধর, (১৬) গাবুরজিতি, (১৭) বক্সা, (১৮) পানা, (১৯) কালাঝোড়া, (২০) গাঙ্গুটিয়া, (২১) ডিমা, (২২) জয়ন্তী, (২৩) তুড়তুড়ী, (২৪) রায়ডাক, (২৫) সঙ্কোশ।

এই নদীগুলির মধ্যে তিস্তা নদী সিকিম হতে দার্জিলিং জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে জলপাইগুড়ি জেলায় প্রবেশ করেছে আব বাকি নদীগুলি সবই ভুটান থেকে প্রবাহিত।

এই প্রধান নদীগুলির ৯৯টি বড় উপনদী আছে। যেখানে আরও বহুসংখ্যক ছোট ছোট নদীগুলি এসে মিশেছে। জলপাইগুড়ি জেলা ৬২২৭ বর্গ কিমি, এর তুলনায় এত সংখ্যক নদী বৈশিষ্ট্যের দাবি করে।

হিমালয় পর্বতের নিম্ন হিমালয় অঞ্চলে অবস্থিত জলপাইগুড়ি জেলা। উত্তরে ভুটানের পর্বতমালা এবং হিমালয় পাদদেশ অঞ্চলে অবস্থিত এই ডুয়ার্স অঞ্চলে বৃষ্টির আধিক্য বেশি। তাই এখানে এত নদী ও উপনদী। এই কারণে জলপাইগুড়ি জেলায় এত অধিকসংখ্যক চা-বাগান গড়ে উঠেছে এবং বনাঞ্চল সৃষ্টি হয়েছে।



বন্যায় প্লাবিত জলপাইগুড়ি সার্কিট হাউসচত্বর

অস্থিতিশীল করে দিয়েছে। হিমালয় এবং হিমালয় সংলগ্ন এলাকা ভূমিকম্প প্রবণ হওয়ায় এবং হিমালয়ের গঠন প্রকৃতি অনুযায়ী এমনিতেই ভূস্তরে স্থিতিশীলতা অভাব রয়েছে। সেই কারণে মানুষের সৃষ্টি পরিবেশজনিত অবক্ষয়, অতিবৃষ্টির কারণে ভুটানের পাহাড় গাত্রের প্রস্তরখণ্ড (বোল্ডার) ছোট এবং মাঝারী প্রস্তরখণ্ড নুড়ি-পাথর, বালি, অতিবৃষ্টি এবং বন্যার জলে প্রবাহিত হয়ে উপরিউক্ত সমস্ত নদীগুলির খাতে জমে গিয়ে জল বহন ক্ষমতা বৎসরের পর বৎসর কমিয়ে দিয়েছে এবং এই নদীগুলির অবক্ষয় ক্রমবর্ধমান। যে কারণে অতিবৃষ্টির পরিমাণের তুলনামূলকভাবে নদীর নাব্যতা বেশি মাত্রায় কমে যাচ্ছে।

বর্তমানে নদীগুলির পাড় কিছু কিছু জায়গায় সংরক্ষিত আবার কিছু কিছু জায়গায় অসংরক্ষিত। এই কারণে অতিবৃষ্টির সময় অসংরক্ষিত এলাকায় নদী পাড়ের ভাঙন এবং এক নদীর জল উপচে পড়ে আশেপাশের নদীতে প্রবাহিত হয়ে বিস্তীর্ণ অঞ্চল ভাসিয়ে নিয়ে জলপথ, রাস্তাঘাট, বিভিন্ন সেতু, বসতবাড়ি, চা-বাগান এবং বনাঞ্চলের প্রভূত ক্ষতিসাধন করেছে এবং সময় সময় রেললাইনেরও ক্ষতিসাধন করেছে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে জলপাইগুড়িতে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৩২০০ মি.মি. অর্থাৎ ১২৬ ইঞ্চি যা দক্ষিণবঙ্গের কলিকাতা অঞ্চলের প্রায় দ্বিগুণ। এই প্রসঙ্গে গত দশ বছরে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ এইরকম।

১৯৯০—৩৯৭১.০০ মি.মি.—১৫৬ ইঞ্চি
১৯৯১—৫১৪৮.৮০ মি.মি.—২০৩ ইঞ্চি
১৯৯২—৩৩৯২.০০ মি.মি.—১৩৪ ইঞ্চি
১৯৯৩—৪৫২০.০০ মি.মি.—১৭৪ ইঞ্চি
১৯৯৪—২৩৭৬.১৩ মি.মি.—৯৪ ইঞ্চি
১৯৯৫—৩২৫৫.৩০ মি.মি.—১২৮ ইঞ্চি
১৯৯৬—৩১৯৯.০০৪ মি.মি.—১২৬ ইঞ্চি
১৯৯৭—২৮৮৩.৪০ মি.মি.—১১৪ ইঞ্চি
১৯৯৮—৪৭৭৮.১৪ মি.মি.—১৮৮ ইঞ্চি
১৯৯৯—৪২৫৫.৯০ মি.মি.—১৬৮ ইঞ্চি
২০০০—(২৬.৯.২০০০) ৩৯৩১.১০ মি.মি.—১৫৫ ইঞ্চি

এই বৃষ্টিপাতের ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ হয় বর্ষার সময় যেটা উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে প্রতি জুন মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে ধরা হয়।

বন্যার প্রধান কারণ অধিক বৃষ্টিপাতজনিত সমস্যা। জলপাইগুড়ি জেলা যেহেতু হিমালয় পাদদেশ অঞ্চল থেকে শুরু, সেই কারণে এই জেলায় কোচবিহার সীমান্ত এবং বাংলাদেশ সীমান্ত পর্যন্ত ভূ-পৃষ্ঠের এবং নদীখাতের ঢাল অত্যধিক বেশি হওয়ায় বন্যার সময় জল জমার সমস্যাটি গৌন। যেহেতু তিস্তা এবং তার উপনদীগুলি বাদে আর সব নদীগুলি ভুটানের পাহাড়ি অঞ্চলে উৎস, সে কারণে ভুটান এবং ভুটান পাহাড় সংলগ্ন বৃষ্টিপাত, সেখানকার পরিবেশ ভূমিক্ষয়, পাহাড়ি ভূমিধ্বংস, বৃক্ষচ্ছেদন এবং ডলোমাইট আহরণের জন্য পর্বত গাত্রে বিস্ফোরণ এবং তদজনিত সমস্যা। ভুটানের পাহাড়ি অঞ্চলে জনবসতি বৃদ্ধি, রাস্তাঘাট তৈরি, পাহাড়ি এলাকাগুলিকে ভঙ্গুর এবং

গত ১৯৯৮, ১৯৯৯ এবং ২০০০ সালে আগস্ট মাসে জলপাইগুড়ি জেলায় বন্যাজনিত ক্ষয়ক্ষতি বিশেষভাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং রাজ্য সরকার সীমিত ক্ষমতার মধ্যে এই ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সম্যকভাবে পূরণ করার পরেও বন্যার সমস্যার আসল কারণগুলি সমাধানের উপায় হাতে না থাকার ফলে আন্তর্দেশীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার-বিবেচনার অপেক্ষায় রয়েছে। অতি সম্প্রতি ২০০০ সালের আগস্ট মাসে প্রথমদিকে বন্যার ক্ষয়ক্ষতি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে শুধু নদী বাদে ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১৮ কোটি টাকা, যা বর্ষার শেষে আরও বেশি হতে পারে।

বন্যার সময় পাহাড়ের ঢাল থেকে যে সমস্ত প্রস্তরখণ্ড গড়িয়ে নেমে আসে তার সবটাই নদীখাতের মধ্যে জমা হয়। যেগুলি নদীর প্রবাহ ক্ষমতা বা নাব্যতাকে কমিয়ে দেয়। এই প্রস্তরখণ্ড বা বোল্ডারগুলি সরকারের সম্পত্তি বলে বিবেচিত হয়। কিছু কিছু জায়গায় ভূমি ও ভূমিরাজস্ব দপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকলেও জলপাইগুড়ি জেলায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বনদপ্তর এবং বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের নিয়ন্ত্রণাধীন রয়েছে। নদীরখাত উপরিউক্ত কারণগুলির জন্য ভর্তি হয়ে যাওয়ায় সংরক্ষিত অঞ্চলে অর্থাৎ যেখানে নদীর ধারে ঘনবসতি অঞ্চল বা জনসম্পত্তি আছে, সেইসব জায়গায় এই বোল্ডারগুলি নদীর পাড় সংরক্ষণের কাজে লাগে। বন-সংরক্ষণ আইন এবং পরিবেশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিধিনিষেধগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবেশ এবং বনমন্ত্রকের অধীন হওয়ায় ভুটানের পাহাড় থেকে নেমে আসা বোল্ডারগুলি সর্বক্ষেত্রে কিছু বিধিনিষেধের জন্য আহ্বান

করা সম্ভব হয় না। যে কারণে নদীখাতগুলি পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয় না। নদীপাড়গুলি ঠিকমত সংরক্ষণের কাজে আরও বেশি করে যাতে এই প্রস্তরখণ্ডগুলি ব্যবহার করা যায়, সে কারণে জলপাইগুড়ি জেলায় বাস্তব পরিস্থিতি বিচারে ওইসব আইন-কানুনের বিধিনিষেধ শিথিল করার রাজ্যস্তরে চেষ্টা চলছে।

জলপাইগুড়ি জেলায় বন্যাবিধ্বস্ত এলাকার মধ্যে আলিপুরদুয়ার মহকুমায় এই বন্যার সমস্যা সর্বাধিক এবং জর্জরিত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সর্বাধিক। এই বছরে বন্যার পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, এর ধ্বংসাত্মক পরিণতি মোটামুটিভাবে ভুটান সীমান্ত থেকে ৩০ কিমি দক্ষিণ এলাকাতে সর্বাধিক, যেখানে সমগ্র নদীভাঙনে ২৪টি বাঁধের ফাটলের সংখ্যাই হল এই এলাকার মধ্যে।

এই সংক্রান্ত জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি নীচে দেওয়া হল

বাঁধের ফাটল মেরামতের বিস্তারিত বিবরণ এবং চূড়ান্ত পুনর্নির্মাণ ব্যয়ের হিসাব—

ক্রমিক সংখ্যা	বাঁধের নাম	ফাটলের দৈর্ঘ্য	চূড়ান্ত নির্মাণ (ব্যয়)
১।	পানা নদীর বাঁ তীরে রাধারানী বাঁধ	৩০০ মি.	৩০.৭৫ লক্ষ টাকা
২।	তোর্ষা নদীর বাঁ তীরে দলসিংপাড়া বাঁধ	৯৫০ মি.	৯৫.৬০ লক্ষ টাকা
৩।	কালজিনি নদীর বাঁ তীরে নাকাডোলা বাঁধ	১৫০ মি.	১৩.৬০ লক্ষ টাকা
৪।	রায়ডাক নদীর ডানতীরে ধওলা বাঁধ	১৫০ মি.	১৮০.০০ লক্ষ টাকা
৫।	রেতী সুকৃতী নদীর ডানতীরে রেতী সুকৃতি বাঁধ	১৩০০ মি.	৭৮.০০ লক্ষ টাকা
৬।	পাগলী নদীর বাঁ তীরে পাগলী ভুটান বাঁধ	১২৫০ মি.	১০৬.১৫ লক্ষ টাকা
৭।	ডায়না নদীর বাঁ তীরে চেংমারী বাঁধ	৮০০ মি.	১৮০.১১ লক্ষ টাকা
৮।	কালজিনি নদীর ডানতীরে চাপাতলি বাঁধ	১৪৫ মি.	১৪.৫০ লক্ষ টাকা
৯।	তিনিভাঙ্গড়ী নদীর ডানতীরে তিনিভাঙ্গড়ী বাঁধ	২৫০ মি.	২০.১৫ লক্ষ টাকা
১০।	ভালুঝোড়া নদীর ডানতীরে ভালুঝোড়া বাঁধ	৬১০ মি.	৭২.৫০ লক্ষ টাকা
১১।	কালজিনি নদীর বাঁ তীরে দক্ষিণ পাতকাপা বাঁধ	২৫০ মি.	২৫.৫২ লক্ষ টাকা
১২।	হাওড়ী নদীর ডানতীরে হাওড়ী নদীর বাঁধ	২০০ মি.	২২.১০ লক্ষ টাকা
১৩।	পানানদীর বাঁ তীরে শিকারি বাঁধ	১৫০ মি.	৪০.১৫ লক্ষ টাকা
১৪।	রায়ডাক ২নং নদীর ডানতীরে লালচন্দাপুর বাঁধ	২৫০ মি.	২৫.৫০ লক্ষ টাকা
১৫।	রায়ডাক ২নং নদীর ডানতীরে ছোট দলদলি বাঁধ	১৭৫ মি.	৩২.৬৯ লক্ষ টাকা
১৬।	রায়ডাক নদীর ডানতীরে ধওলাঝোড়া ধুলসোডি বাঁধ	১৬০ মি.	৩১.৬০ লক্ষ টাকা
১৭।	রায়ডাক ২নং নদীর ডানতীরে ধনতলি সংরক্ষিত এলাকা বাঁধ	১০০ মি.	৩০.০০ লক্ষ টাকা
১৮।	রায়ডাক ২নং নদীর ডানতীরে খারসলি বাঁধ	৭৫ মি.	১৪.৪৯ লক্ষ টাকা
১৯।	রায়ডাক ২নং নদীর বাঁ তীরে বোলগুড়ী বাঁধ	৫০ মি.	১৫.৬০ লক্ষ টাকা
২০।	তুড়তুরী নদীর ডানতীরে তুড়তুড়ি বাঁধ	১২০ মি.	৯.৬০ লক্ষ টাকা
২১।	তোর্ষা নদীর ডানতীরে জলদাপাড়া বাঁধ	১৫০ মি.	১২.২৫ লক্ষ টাকা
২২।	মুজনাই নদীর বাঁ তীরে নবনগর বাঁধ	৪০ মি.	৩.২০ লক্ষ টাকা
২৩।	বানিয়া নদীর ডানতীরে সেচ প্রকল্প বানিস বসরা গাইড বাঁধ	৫০ মি.	৩০.০০ লক্ষ টাকা
২৪।	জোড়াই সেচ প্রকল্প বাঁধ	২৩৩ মি.	২২.৫০ লক্ষ টন
	মোট	৯৬৮৩ মি.	১১০৬.৪৬ লক্ষ টাকা

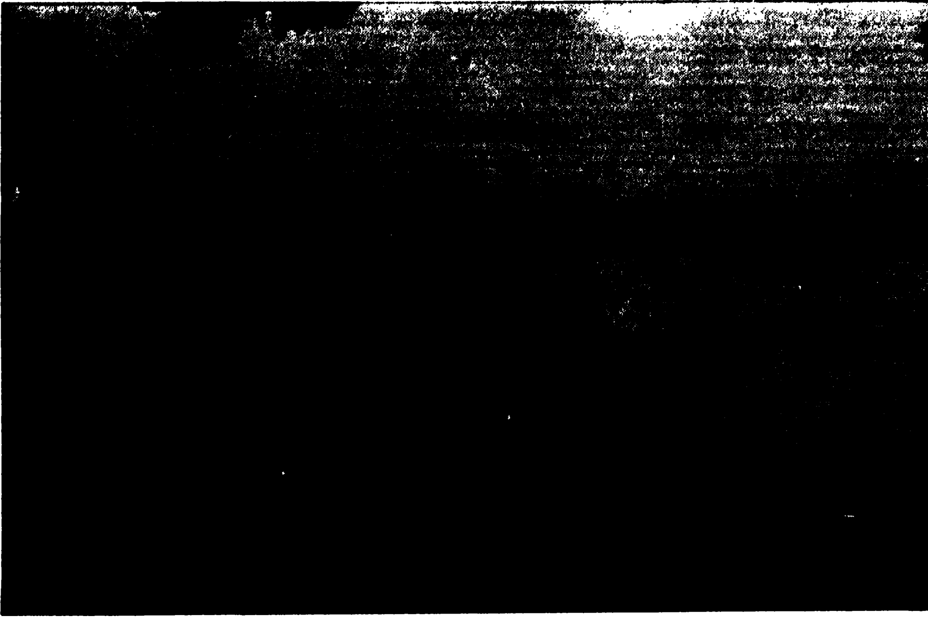
নদীগুলিকে ভুটান সংক্রান্ত সমস্যা বলা হলে এই আলোচনাটি অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে। যদি না তিস্তার সম্বন্ধে কিছু বলা হয়। তিস্তার উৎপত্তি উত্তর সিকিমের ৬৪০০ মি. উচ্চতায় পাহাড়ে। সেবকের কাছে করোনেশন ব্রীজে ১৪৮ কিমি পাহাড়ি এলাকায় প্রবাহিত হওয়ার পর যা জলপাইগুড়ি জেলার সমভূমিতে এসে পড়েছে এবং আরও ৫০ কিমি জলপাইগুড়ি জেলার মধ্যে প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশ সীমান্ত পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র নদীতে পড়েছে।

১৯৬৮ সালের ৪ ও ৫ অক্টোবর তিস্তার বিধ্বংসী বন্যা এবং ভাঙনজনিত জলপাইগুড়ি শহর তথা জলপাইগুড়ি জেলার কয়েক হাজার মানুষের প্রাণহানি, সম্পত্তিহানি এবং তাঁর করুণ কাহিনী জলপাইগুড়ি জেলায় অধিবাসীর মনে এখনও শিহরণ জাগায়। তারপর আরও ২৮ বছর কেটে গেছে। প্রতি বছরই কয়েক লক্ষ কিউসেক জল (এক কিউসেক = ৩৫.২৮৭ কিউসেক) নদী দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে, কিন্তু এর সঙ্গে অদৃশ্যভাবে যে হাজার হাজার টাকা নুড়ি-পাথর এবং বালি এসে নদীখাতে জমে যাচ্ছে এটা অনেক সময় সাধারণভাবে চোখে পড়ে না যদিও এটা ভীষণভাবে সত্যি।

জলপাইগুড়ি জেলার আগে পাহাড়ি এলাকার মধ্যে নদীবাহিত বড় পাথরগুলি (বোল্ডার) অভিক্ষেপ হয়ে যায়। কিন্তু বালিকণা ও নুড়ি-পাথরগুলি বেশিরভাগই জলপাইগুড়ি সমতল অঞ্চলে তিস্তা নদীর খাতে জমে যায়। এই সমস্যাটির পরিচয় পাওয়া যায় গত চার বছরে তিস্তা নদীর জুবিলি পার্ক ও বার্নিশঘাটের মধ্যবর্তী অংশটি পর্যালোচনা করলে। তিস্তা নদীর প্রবহমান ক্ষেত্রফলের পর্যালোচনায় দেখা যাবে।

বৎসর	নদী খাতে জল প্রবাহের ক্ষেত্রফল
১৯৯৬	৪০০২.৬ বর্গ মিটার
১৯৯৯	৩৫৫৬.০ বর্গ মিটার

এই হিসাবে নদী খাতের প্রস্থ হিসাব করলে দেখা যায় প্রতি বছরে ৩.৩ সেমি গভীরতা বালি/পলিবাহিত সমস্যার জন্য কমে যাচ্ছে। যদিও নদীবাহিত বালি এবং পলি জমার সমস্যা ঐকিক নিয়ম হিসাবে



বন্যা প্লাবিত জাতীয় সড়ক

রেললাইনেরও ক্ষতিসাধন হচ্ছে। ভুটান পাহাড় থেকে উৎসারিত নদীগুলির সমস্যা যেটা ভুটান পাহাড়ের বৃষ্টি এবং ডুয়ার্স অঞ্চলের বৃষ্টি প্রায়শ ক্ষেত্রে একসঙ্গে হওয়ার ফলে আলিপুরদুয়ার মহকুমায় বিস্তৃত অঞ্চলের সমস্যাকে কন্টকিত করেছে।

কাজেই ওই সব নদীর অববাহিকা অঞ্চল ভুটানের সঙ্গে কোনও আন্তর্জাতিক সমঝোতা এবং সমাধানসূত্র ছাড়া আশু কোনও সমাধানের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না।

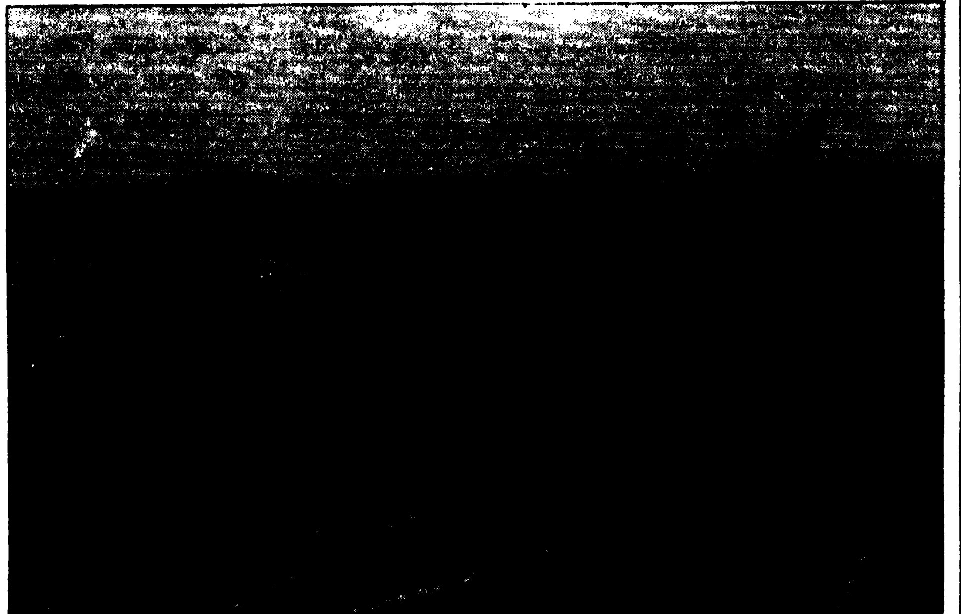
জলপাইগুড়ি জেলার পুরো সমস্যাগুলি, ভৌগোলক অবস্থান এবং বৃষ্টির উপর নির্ভরশীল হওয়ায় আমাদের আশু কর্তব্য হওয়া উচিত জনচেতনা বাড়ানো, নিচু জায়গায় বসবাস না করা, বন্যা শিবির (flood Centre) তৈরি, নদীর ভাঙন রোধে স্থান ও পরিবেশভিত্তিক পরিকল্পনা করা এবং তার বাস্তব রূপায়ণ করা এবং নদীর পাড় বাঁধানোর জন্য, River Training Works-এর জন্য নদীখাত থেকে বোল্ডার বেশি পরিমাণে আহরণের নিয়মকানুন শিথিল করা। এই প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে মনে রাখা দরকার যে বন্যাজনিত সমস্যা সমাধানে অর্থের প্রয়োজন থাকলেও সুষ্ঠুভাবে তা ব্যয়িত নাহলে পুরো অর্থই অপচয় হতে পারে। যদি না সমগ্র পরিকল্পনা ও রূপায়ণ সঠিক এবং জনমুখী না হয়।

লেখক ❑ চেয়ারম্যান, উত্তরবঙ্গ বন্যা নিয়ন্ত্রণ কমিশন।

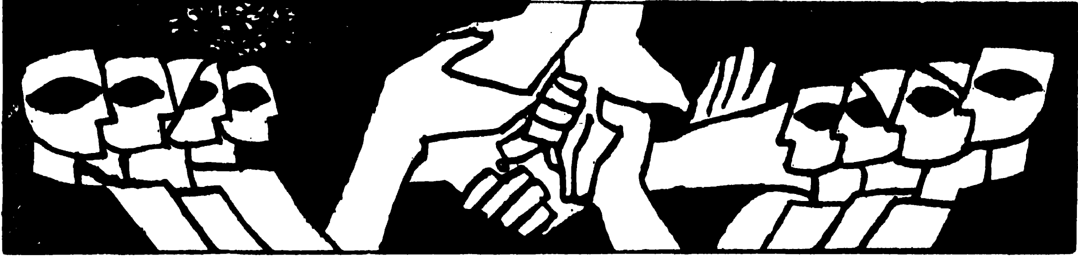
খাটে না, তা সত্ত্বেও শুধুমাত্র এই সমস্যার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য এই হিসাবটি করা হয়েছে।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে প্রকৃতিগত হিসাবে তিস্তা নদীর সমস্যা যেটা জলপাইগুড়ি শহরাঞ্চলকে বিব্রত করছে এবং চিন্তায় ফেলেছে, তিস্তার দুই পাড় প্রায় সবটাই সংরক্ষিত অঞ্চলে পড়ে বলে এই সমস্যার জন্য আশু আশঙ্কিত হওয়ার কারণ নেই, যদি না সিকিম অববাহিকা অঞ্চলে অতিবৃষ্টির সঙ্গে জলপাইগুড়ি জেলার স্থানীয় বৃষ্টি সংযোজিত হয়।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে তিস্তার বাঁ পাড়ের প্রধান উপনদীগুলি যথা—(১) তিস, (২) ঘিস, (৩) জেল, (৪) চেল, (৫) মাল, (৬) নেওড়া প্রভৃতি দার্জিলিং পাহাড় থেকে উৎপত্তি হলেও দার্জিলিং পাহাড়ের এই অংশটি অনেক বেশি স্থিতিশীল হওয়ায় বনাঞ্চল ও চা-বাগান থাকায় অধিক স্থিতিশীল এবং পাহাড়ের ঢাল এবং ভূমিক্ষয় অপেক্ষাকৃত কম। সেইজন্য পাহাড় থেকে নেমে আসা বোল্ডার সমস্যাটি অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু নুড়ি, বালি, পাথর বর্ষার সময় প্রবল জলস্রোতের সঙ্গে প্রবাহিত হয়ে এসে নদীবক্ষে জমে যাওয়া সমস্যাটি ক্রমবর্ধমান। এর ফলে এই সমস্ত উপনদীর খাতগুলির গভীরতা কমে যাচ্ছে এবং প্রস্থে বেড়ে যাচ্ছে। তার ফলে মাল এবং ওদলাবাড়ী শহরে এবং আশপাশের গ্রাম ও লোকালয়ে সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। এর সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বর্ষণের সময় যোগাযোগকারী রাস্তাঘাট ও



জলপাইগুড়ি জেলার বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ ব্যবস্থা



সুবর্ণ দাস

কালের প্রবাহে জলপাইগুড়ি জেলা ঃ গ্রন্থপঞ্জি

যখন সুদুর অতীতে রাঢ়বঙ্গের গাঙ্গেয় উপত্যকা থেকে আর্যগোষ্ঠী নতুন নতুন উপনিবেশ স্থাপনের জন্য চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল, ঠিক সেই সময় থেকেই জলপাইগুড়ির ইতিহাস আরম্ভ। বরেন্দ্রভূমিতে এসে আর্যগণ করতোয়া নদীর অববাহিকায় প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। নবম শতকে হিন্দু সভ্যতার পীঠভূমি হিসাবে করতোয়ার উল্লেখ আছে। বৈদেশিক আক্রমণ ও বৌদ্ধধর্মের জোয়ারে যখন রাঢ় অঞ্চল বিঘ্নিত তখন করতোয়া নদীর উভয় তীরে হিন্দু সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। যবন, চোল প্রভৃতি জাতির বারংবার আক্রমণে সেই সভ্যতাও সেখানে বেশিদিন টিকে থাকতে পারেনি। আর্যগণ যখন এই অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে তখনও এই সমস্ত অঞ্চল অস্ট্রীক, দ্রাবিড় প্রভৃতির বসবাস ছিল। যদিও সংখ্যায় তারা হীন হয়ে পড়েছিল আর তারই সাক্ষ্য হিসাবে বেঁচে রইল মেচ, গারো, টোডো, বোড়ো প্রভৃতি জাতি এবং দুই জাতির সংমিশ্রণে উদ্ভূত কৃষ্টি এবং লোক-সংস্কৃতি। আধুনিক জলপাইগুড়ির গঠনগত নাম বৈকুণ্ঠপুর। ষোড়শ শতাব্দীতে কোচবিহার রাজ্যের প্রত্যন্ত প্রদেশ বৈকুণ্ঠপুরের পশ্চিম সীমানা আরও বিস্তৃত ছিল। কিন্তু কখন যে বৈকুণ্ঠপুরের পশ্চিম সীমানা সংকুচিত হয়ে মহানন্দা নদীর পূর্বতীরে এসে পৌঁছেছিল তা বলা যায় না। কোচ রাজবংশের একটি শাখা রায়কত উপাধি নিয়ে বংশানুক্রমে কোচবিহারের প্রত্যন্ত প্রদেশ শাসন করত এবং কোচরাজার অভিষেকের সময় ছত্রধারণ করত। বৈকুণ্ঠপুর রাজ্য ব্রিটিশ অধিকার কাল পর্যন্ত স্বাধীন ছিল যদিও কিছুকালের জন্য বৈকুণ্ঠপুর মোগলদের কাছে নামেমাত্র বশ্যতা স্বীকার করেছিল। উত্তরে হিমালয়, পূর্বে তিস্তা ও পশ্চিমে মহানন্দা নদীর বেষ্টনীর নিবিড় অরণ্যের মধ্যে বৈকুণ্ঠপুরের রাজধানী ছিল। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর দিল্লির শাসক এমনকি সুবা বাংলার শাসক মুর্শিদকুলি খাঁয়ের উত্তরবঙ্গ জয় করার কোনো আগ্রহ ছিল না। তার ফলে এই অঞ্চল বেশ নিরাপদে থেকে গিয়েছিল।

ত্রয়োদশ শতকে রায়কত ধর্মদেব প্রথমে জলপাইগুড়ি অঞ্চলে রাজধানী স্থাপন করেন। ১৮৬৯ সালের ১ জানুয়ারি আলিপুরদুয়ার, বক্সা এবং ময়নাগুড়ি মহকুমার সঙ্গে যোগ হল রংপুর জেলার অধীন জলপাইগুড়ি মহকুমা এবং এইভাবে তিস্তাপারের পূর্ব ও পশ্চিম দিক নিয়ে জলপাইগুড়ি জেলা গঠিত। পুরাতন বৈকুণ্ঠপুর, তেঁতুলিয়া, বোদা সংযুক্ত করে জলপাইগুড়ি জেলা গঠন করা হয়।

জলপাইগুড়ি পশ্চিমবঙ্গের উত্তরে অবস্থিত জেলা, মহকুমা ও শহর। জেলাটি ২৬°১৬´ হতে ২৭° উত্তর এবং ৮৮°২৫´ হতে ৮৯°৫৩´ পূর্বে অবস্থিত। জলপাইগুড়ির উত্তরে দার্জিলিং জেলা ও ভুটান রাজ্য, দক্ষিণে কোচবিহার জেলা ও বাংলাদেশের রংপুর জেলা, পশ্চিমে দার্জিলিং জেলা ও পূর্ব পাকিস্তানের অংশ বিশেষ এবং পূর্বে আসাম। জেলায় দুটি মহকুমা, সদর বা জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার। জলপাইগুড়ি (কোতোয়ালি) রাজগঞ্জ, ময়নাগুড়ি, নাগরাকাটা, ধূপগুড়ি, মাল ও মাতীয়ালী—এই সাতটি থানা নিয়ে সদর মহকুমা এবং আলিপুরদুয়ার, মাদারিহাট, ফালাকাটা, কালচিনি ও কুমার গ্রাম—এই পাঁচটি থানা নিয়ে আলিপুরদুয়ার মহকুমা গঠিত। জলপাইগুড়ি জেলার আয়তন ৬৩৩৪ বর্গ কিমি (২৪০৭ বর্গ মাইল)। ১৯৪৭ সালের দেশবিভাগের পূর্বে এই জেলার আয়তন ছিল ৭৯০৫.০৬ বর্গ মাইল (৩০৫০ বর্গ মাইল); কিন্তু দেশবিভাগের পর দক্ষিণের কয়েকটি থানা পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমানে বাংলাদেশ) সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় এর আয়তন কমে যায়।

জলপাইগুড়ি নামের উৎপত্তি সম্ভবত 'জলপাই' ফলের নাম হতে হয়েছে। এখানে স্থানকে স্থানীয় ভাষায় 'গুড়ি' বলা হয়। একসময়ে এই জেলার অধিকাংশ স্থান কোচবিহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে ভুটিয়ারা ডুয়ার্স অঞ্চলকে কোচবিহার হতে বিচ্ছিন্ন করে দেয় কিন্তু ১৮৬৫ সালে এই অঞ্চল ইংরেজদের দখলে আসে। ১৮৬৯ সালে সামান্য রদবদলের পর এই অঞ্চল জলপাইগুড়ি জেলা নামে অভিহিত হয়। জলপাইগুড়ি জেলার অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জনগণ এই জেলায় বাস করে এবং লেপ্চা, ভুটিয়া, নেপালি, টোটো, রাজবংশী, গারো, রাভা, মেচ্, ওরাঁও, মুণ্ডা, সাঁওতাল প্রভৃতি উপজাতি বাস করে। জেলার উল্লেখযোগ্য তীর্থস্থানের মধ্যে ময়নাগুড়ি থানার অন্তর্ভুক্ত জল্পেশ্বরের মন্দির এবং দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে মহাকালের মন্দিরই সমধিক প্রসিদ্ধ। অন্যান্য প্রসিদ্ধ স্থান সমূহের মধ্যে জলপাইগুড়ি শহর, আলিপুরদুয়ার শহরের ১৬ কিমি উত্তর-পূর্বে অবস্থিত মহাকালগুড়ির প্রাচীন গড়ের ধ্বংসাবশেষ, বক্সা সেনানিবাস, ধূপগুড়ি, ময়নাগুড়ি, মালবাজার, ময়নাগুড়ির মূর্তি, শিকারপুরের প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। জলপাইগুড়ি জেলার প্রধান জলপাইগুড়ি তিস্তা নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। ১৮৮৫ সালে জলপাইগুড়ি শহরে পৌরশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে জলপাইগুড়ি জেলার উপর ইতিহাসের প্রবল একটা ঝড় আছড়ে পড়েছিল। সপ্তদশ শতকে জলপাইগুড়ির বৈকুণ্ঠপুর জায়গীর মোগলদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। তদানীন্তন বৈকুণ্ঠপুরের জায়গীরদার ভুজঙ্গদেবের মৃত্যুর পর ঢাকার সুবাদার ইব্রাহিম খাঁ অতর্কিতভাবে বৈকুণ্ঠপুর আক্রমণ করেন। ইব্রাহিম খাঁর সঙ্গে বৈকুণ্ঠপুরের তুমুল যুদ্ধে ভুটানরাজ ও কোচরাজ যোগদান করেন। মোগল সৈন্যের কাছে বৈকুণ্ঠপুরের সৈন্যরা পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়। জলপাইগুড়ি রাজবংশের ইতিহাস কোচবিহারের পরে। অর্থাৎ মধ্যযুগ থেকে জলপাইগুড়ি রাজবংশের ইতিহাসের আরম্ভকাল। কোচবিহারের রাজবংশ যখন তাদের রাজত্বের সূত্রপাত করে, তখন বিশ্বসিংহ তাঁর ভাই শিষ্যসিংহকে বৈকুণ্ঠপুরের দুর্গ রক্ষা করার ভার দেন। তখন থেকেই জলপাইগুড়ি জেলার ইতিহাস শুরু। তারপর অষ্টাদশ শতক থেকে আরম্ভ করে উনবিংশ শতকের শেষ পর্যন্ত জলপাইগুড়ির শাসনব্যবস্থার উত্থান-পতন ঘটেছে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিরা যখন বৈকুণ্ঠপুরের উপর লোলুপ দৃষ্টি হেনেছিল তখন সেই অঞ্চল মূলত শক্তি সন্ন্যাসী সম্প্রদায়। যাঁরা সেই সময় ডাকাত বলে অভিহিত হতেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৭৮৯ সালে জন স্টুয়ার্টের নেতৃত্বে বরকন্দাজ পাঠিয়েছিল এই সমস্ত সন্ন্যাসীদের দমন করার জন্য। সন্ন্যাসী দমনের পর ইংরেজ রাজশক্তি বৈকুণ্ঠপুর সম্পর্কে উদাসীন থাকতে পারেনি। পরবর্তী বিশ বছর ধরে কোম্পানি এই অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য মনোনিবেশ করেন। অনেকে অনুমান করেন, যে সন্ন্যাসীদের স্বস্থানে ফিরিয়ে আনেন এবং কেটে ফেলেন। তাই সংশ্লিষ্ট স্থান সন্ন্যাসীকাটা নামে পরিচিত। বৈকুণ্ঠপুরের প্রথম রায়কত শিবুদের এখানে একটি দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন এবং সেই দুর্গ খননের সময়ে মাটির নীচে একজন ধ্যানমগ্ন সন্ন্যাসীকে দেখতে পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত জলপাইগুড়ির শাসনব্যবস্থার বারবার রদবদল হয় এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দেওয়ানী লাভ করার পর রাজস্ব আদায়ের জন্য দেবী সিংহকে নিযুক্ত করেন। তাঁর অত্যাচারে ও উৎপীড়নে বাংলার জমিদার ও প্রজাগোষ্ঠী যখন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে, তখন এই অঞ্চলে কয়েকবার ছোট ছোট প্রজা-বিদ্রোহের খবর পাওয়া যায়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তা প্রবল আকার ধারণ করে। জলপাইগুড়ির উল্লেখযোগ্য গ্রাম্য গান ও লোকসংগীতের বিষয় হল তিস্তাবুড়ী। বছরে একবার তিস্তাবুড়ীর পুজো ঘটা করে হয়। এখানকার উল্লেখযোগ্য মেলা হল জল্পেশ্বরের মেলা।

জলপাইগুড়ি জেলার উত্তর-পূর্ব সীমান্তে পানিকোচ জাতির সন্ধান মেলে। যদিও পানিকোচ নামের সঙ্গে কোচ জাতির সাদৃশ্যের কথা স্বভাবতই মনে আসে—তথাপি গারো জাতির সঙ্গে এদের মিল সুস্পষ্ট। এদের মূল দেবতা হলেন ঋষি। জলপাইগুড়ি জেলার বেশিরভাগ জায়গা এক সময় প্রাচীন কামতাপুর বা কোচবিহার জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। আর ডুয়ার্স অঞ্চল ছিল ভুটানের মধ্যে। ব্রিটিশ অধিকারের আগে ভুটিয়ারা ডুয়ার্স অঞ্চলকে কোচবিহার রাজ্য থেকে দখল করে নেয়। আর ভুটিয়াদের হাত থেকে ১৮৬৫ খ্রিঃ ইংরেজরা ডুয়ার্স এলাকা কেড়ে নেয়। ইংরেজরা ডুয়ার্স এলাকাকে পূর্ব ও পশ্চিম ডুয়ার্স এই দুভাগে ভাগ করে। পূর্ব ডুয়ার্স আসামের গোয়ালপাড়া জেলার সঙ্গে যুক্ত হয় এবং পশ্চিম ডুয়ার্সকে করা হয় স্বতন্ত্র জেলা। এই স্বতন্ত্র জেলাই হল জলপাইগুড়ি।

❑ গ্রন্থপঞ্জি : (বাংলা বই)

[গ্রন্থপঞ্জি রচনার ক্ষেত্রে কিছু লেখকের বইয়ের প্রকাশকের নামের সন্ধান পাওয়া যায়নি। বর্ণানুক্রমিক ভাবে নিম্নলিখিত গ্রন্থপঞ্জিটি সাজানো হল]

১। **অনিল গঙ্গোপাধ্যায় :** স্বাধীনতা সংগ্রামে আলিপুরদুয়ার। (জলপাইগুড়ি জেলা শতবর্ষ স্মারক গ্রন্থ)। জলপাইগুড়ি, ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ।

২। **অমলেন্দু সেনগুপ্ত :** উত্তাল চল্লিশ : অসমাপ্ত বিপ্লব। ১৯৮৯।

৩। **অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায় :** পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম নাম। কলিকাতা : জেনারেল পাবলিশার্স। ১৯৮০।

৪। **অরুণভূষণ মজুমদার :** উনবিংশ শতাব্দীর বৈকুণ্ঠপুর (প্রবন্ধ) জলপাইগুড়ি : অরুণভূষণ মজুমদার, ১৯৭৮ (জলপাইগুড়ি জেলা শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ)

৫। **অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় :** উত্তরবঙ্গের ভাষা প্রসঙ্গ। কলিকাতা। সাহিত্য বিহার। ১৯৯৮। ৬ টাকা।

৬। **অশোক গঙ্গোপাধ্যায় :** উত্তরবঙ্গ পরিচয়। কলিকাতা। গ্রন্থতীর্থ। ১৯৯৯। ২০৮ পৃ:। ৮০ টাকা। (আঞ্চলিক ইতিহাস)

৭। **অশোক মিত্র :** পশ্চিমবঙ্গের পূজা, পার্বণ ও মেলা। কলিকাতা। গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া প্রেস। ১৯৬৯। ৯ টাকা ৫০ পৃ:। ৩২০ পৃষ্ঠা।

৮। **উপেন্দ্রনাথ বর্মণ :** উত্তরবঙ্গের সেকাল ও আমার জীবন স্মৃতি। জলপাইগুড়ি। ১৩৯২ বঙ্গাব্দ।

৯। **উপেন্দ্রনাথ বর্মণ :** ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার জীবন চরিত। জলপাইগুড়ি। ১৩৯২ বঙ্গাব্দ (এই জীবনীমূলক গ্রন্থে জলপাইগুড়ি জেলার ইতিহাস জানা যায়)

১০। **উপেন্দ্রনাথ বর্মণ :** রাজবংশী ভাষার প্রবাদ, প্রবচন ও হেঁয়ালী। কলিকাতা। ১৩৮৫ বঙ্গাব্দ, রথযাত্রা।

১১। **উপেন্দ্রনাথ বর্মণ :** রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস (ভাষাখণ্ড) জলপাইগুড়ি। ১৩৬১ বঙ্গাব্দ।

১২। **কালিপদ বিশ্বাস :** যুক্ত বাংলার শেষ অধ্যায়। কলিকাতা। ১৯৬৬।

১৩। **খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত :** স্বাধীনতা সংগ্রামে জলপাইগুড়ি জেলা। জলপাইগুড়ি : জলপাইগুড়ি জেলা স্কুল শতবার্ষিকী স্মারক পত্রিকা। ১৯৭৬।

১৪। **গিরিজাশংকর রায় :** উত্তরবঙ্গের দেবদেবী ও পূজা পার্বণ। শিলিগুড়ি। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৮০।

১৫। **গিরিজাশংকর রায় :** প্রসঙ্গ উত্তরবঙ্গ : লোকসাহিত্য। আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ।

১৬। **গৌতম চট্টোপাধ্যায় :** স্বদেশী সংগ্রামে বাংলার ছাত্র-সমাজ। কলিকাতা : চারুপ্রকাশ প্রকাশনী। ১৯৮০।

১৭। **গৌতম চট্টোপাধ্যায় :** স্বদেশী সংগ্রামে বাংলার ছাত্র-সমাজ। কলিকাতা, মনীষা। ১৯৯০।

১৮। **চারুচন্দ্র সান্যাল স্মারক গ্রন্থ :** জলপাইগুড়ি। চারুচন্দ্র সান্যাল স্মরণ কমিটি। জানুয়ারি। ১৯৯২।

১৯। **জগদীশ মণ্ডল :** মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ। ১ম খণ্ড। কলিকাতা। ১৯৭৫।

২০। **তারাপদ সাঁতরা :** পশ্চিমবাংলার ধর্মীয় স্থাপত্য : মন্দির ও মসজিদ। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমি। কলিকাতা। ১৯৯৮।

২১। **দেবেশ রায় (সম্পাদিত) :** ধানের গায়ে রক্তের দাগ। জলপাইগুড়ি। ১৯৬৭

২২। **দেবেশ রায় :** তিস্তাপারের বৃত্তান্ত। কলিকাতা। দে'জ। ১৯৮৮।

২৩। **ধনঞ্জয় রায় :** রংপুরের আধিয়ার বিদ্রোহ ও তেভাগা আন্দোলন। কলিকাতা। রত্ন প্রকাশন। ১৯৮৬।

২৪। **ধর্মনারায়ণ সরকার :** উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস। রংপুর। বাংলাদেশ। ১৩৯৩ বঙ্গাব্দ।

২৫। **ধর্মনারায়ণ সরকার :** রায়সাহেব পঞ্চানন। বাংলাদেশ। ১৯৯১ বঙ্গাব্দ।

২৬। **নির্মলচন্দ্র চৌধুরী :** স্বাধীনতা সংগ্রামে রাজবংশী সম্প্রদায়। জলপাইগুড়ি। ১৩৮২ বঙ্গাব্দ।

২৭। **নির্মলেন্দু ভৌমিক :** প্রান্ত উত্তরবঙ্গের উপভাষা। কলিকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৫। (দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার জেলার উপভাষার বিরতিমূলক পরিচয়)।

২৮। **প্রণব রায় :** বাংলার মন্দির : স্থাপত্য ও ভাস্কর্য। কলিকাতা। পূর্বাদি প্রকাশন। ১৯৯৯।

২৯। **পবিত্র গুপ্ত :** উত্তরবঙ্গের টোটো উপজাতি ও অন্যান্য প্রবন্ধ। কলিকাতা। পুস্তক বিপণি। ১৯৮৭। ১৭০ পৃ:। ৩০ টাকা। লোকসাহিত্য।

৩০। **বদরউদ্দিন ওমর :** চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলাদেশের কৃষক। কলিকাতা। ১৩৮১ বঙ্গাব্দ।

৩১। **বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষকসভা কর্তৃক প্রকাশিত :** কৃষকের লড়াইয়ের কায়দা। কলিকাতা। ১৯৪৭।

৩২। **বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা কর্তৃক প্রকাশিত :** জমিদারী প্রথা ধ্বংস করো। কলিকাতা। ১৯৪৭ ।

৩৩। **বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা কর্তৃক প্রকাশিত :** ফসল ও জমির লড়াই। কলিকাতা। ১৯৪৭।

৩৪। **বিনয় ঘোষ :** পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি। কলিকাতা। প্রকাশভবন। ১৯৯২। (আঞ্চলিক ইতিহাস)।

৩৫। **বিশ্বনাথ দাস :** উত্তরবঙ্গের পুরাকীর্তি। কলিকাতা। নাথ পাবলিশার্স। ১৯৮৫। ১৩৬ পৃ:। ২৫ টাকা।

৩৬। **বিশ্বনাথ রায় :** পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমীক্ষা। কলিকাতা। মডার্নবুক। ১৯৮৮।

৩৭। **ভবরঞ্জন গাঙ্গুলী :** জলপাইগুড়ি জেলার সংবাদপত্রের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। জলপাইগুড়ি। ১৩৯২ বঙ্গাব্দে।

৩৮। **মধুপর্ণী :** (জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা))। বালুরঘাট, ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ।

৩৯। **মণিকুন্তলা সেন :** সেদিনের কথা। কলিকাতা। ১৯৮২।

৪০। **যদুগোপাল মুখোপাধ্যায় :** বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি। ২য় সংস্করণ। কলিকাতা। অ্যাকাডেমিক পাবলিশার্স। ১৯৮২।

৪১। **যোগীন্দ্রদেব রায়কত :** রায়কত বংশ ও তাহাদের রাজ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। সম্পাদনা : নির্মলচন্দ্র চৌধুরী। জলপাইগুড়ি। ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ।

৪২। **রঞ্জিত দেব :** উত্তরবঙ্গের চিঠি। কলিকাতা। ভারতী প্রকাশন। ১৯৭৫।

৪৩। **রণজিৎ দেব :** উত্তরবঙ্গের চিঠি। ১ম খণ্ড। কলিকাতা। ১৩৮২ বঙ্গাব্দ।

৪৪। **রমনীমোহন শর্মা :** রাজবংশী লোকসাহিত্য। দিনহাটা। ১৯৯৩।

৪৫। **রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় :** বাংলার ইতিহাস। কলিকাতা। দে'জ পাবলিশার্স। ১৯৮৭।

৪৬। **রামরঞ্জন দাস :** পশ্চিমবঙ্গের পুরাকীর্তি। কলিকাতা। ফার্মা কে এল এম। ১৯৮০।

৪৭। **রামরঞ্জন রায় :** পশ্চিমবঙ্গের পুরাকীর্তি। কলিকাতা। ফার্মা কে এল এম প্রাঃ লিমিটেড। ১৯৮০। ২০ টাকা। ২৭২ পৃ:। আঞ্চলিক ইতিহাস।

৪৮। **রিপুঞ্জয় দাস ও অন্যান্য :** মহারাজ বংশাবলী। হাজরাপাড়া কোচবিহার। ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ।

৪৯। **শচীন দাশগুপ্ত :** চা বাগান জাতীয়করণ চাই। সি.পি.আই। জলপাইগুড়ি। ১৯৪৭।

৫০। **শিবপদ ভৌমিক :** উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতি চর্চা। কলিকাতা। পুস্তক বিপণি। ১৯৯৮। ২৫ টাকা।

৫১। **শিবপ্রসাদ সমাদ্দার :** প্রসঙ্গ পশ্চিমবঙ্গীয়। কলিকাতা। জে এন চক্রবর্তী অ্যান্ড কোং। ১৯৮৫।

৫২। **শিবেন্দ্রনাথ মণ্ডল :** রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত। গৌরীপুর। আসাম। ১৯৮৪।

৫৩। **শিশির মজুমদার :** উত্তরবঙ্গের লোকনাট্য (১ম)। ২য় সং। কলিকাতা। মোম পাবলিশার্স। ২৮৮ পৃ:। ৩৫ টাকা। — লোকসাহিত্য।

৫৪। **শিশির মজুমদার :** উত্তরবাংলার লোকসমাজ লোকনাট্য নাটক কথা। কলিকাতা। মোম পাবলিশার্স। ১৯৯৮। প্রবন্ধ।

৫৫। **সমীর চক্রবর্তী :** উত্তরবঙ্গের আদিবাসী চা শ্রমিকের সমাজ ও সংস্কৃতি। কলিকাতা। মনীষা। ১৯৯৮। ১৫০ টাকা। (প্রবন্ধ)।

৫৬। **সত্যেন সেন :** গ্রাম বাংলার পথে পথে। কলিকাতা। ১৯৭১।

৫৭। **সুকুমার দাস :** উত্তরবঙ্গের ইতিহাস। কলিকাতা। কুমার সাহিত্য প্রকাশন। ১৯৮২। ২৫২ পৃ। ২২ সেমি। বোর্ড বাঁধাই। ২০০ টাকা।

৫৮। **সুখময় মুখোপাধ্যায় :** বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর : স্বাধীন সুলতানের আমল (১৩৩৮-১৫৩৮)। ২য় সং। কলিকাতা। ভারতী বুক স্টল। ১৯৬৬।

৫৯। **সুনীল দাস :** জলপাইগুড়ি জেলা শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ। জলপাইগুড়ি। ১৯৭০। সম্পাদক—চারুচন্দ্র সান্যাল।

৬০। **সুনীল সেন :** বাংলার কৃষক সংগ্রাম। কলিকাতা। চতুর্থ দুনিয়া প্রকাশনী। ১৯৭৫।

৬১। **সুমিত চক্রবর্তী (সম্পাদিত) :** তেভাগা সংগ্রাম : রজত জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ। কলিকাতা। ১৯৭৩।

৬২। **সুশীলকুমার ভট্টাচার্য :** উত্তরবঙ্গের লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি। কলিকাতা। ভারতী প্রকাশন। ১৯৭৫। ২৭৪ পৃ:। ১২ টাকা। প্রবন্ধ।

৬৩। **হিতেন নাগ :** উত্তরবাংলার ভাওয়াইয়া গান। কলিকাতা : প্রকাশভবন। ১৯৯৮। ৯৬ পৃ :। ৩০ টাকা। লোকসঙ্গীত।

পত্রপত্রিকা

(নিম্নলিখিত পত্রিকার উল্লেখিত সংখ্যাগুলিতে জলপাইগুড়ি সম্পর্কে আলোচনা আছে)।

আনন্দবাজার : ১৯ এপ্রিল, ১৯২২। ২৭ জুন, ১৯২২। ২৮ জুন, ১৯৩৯। ১৩ আগস্ট, ১৯৩৯। ২ ডিসেম্বর, ১৯৩৯। ৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪০। ৩, ৬, ৭, ১০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬। ২৩, ২৪ নভেম্বর, ১৯৪৬। ৮ জানুয়ারি, ১৯৪৭।

দেশবন্ধু : ৪ ফাল্গুন, ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ। ১৭ জ্যেষ্ঠ, ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ। ১ অগ্রহায়ণ, ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ। ১৫ পৌষ, ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ।

বঙ্গবাণী : ২৪ জানুয়ারি, ১৯৩০। ১৭ জুলাই, ১৯৩০। ২৪ জুলাই, ১৯৩০। ১৭ এপ্রিল, ১৯৩২। ২০ জুন, ১৯৩২। ১৫ নভেম্বর, ১৯৩২।

স্বাধীনতা : ৯ জানুয়ারি, ১৯৪৬। ৭, ১০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬। ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬। ১৪ অগাস্ট, ১৯৪৬। ২৮, ২৯ নভেম্বর, ১৯৪৬। ১৯, ২৫, ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৪৬। ১১ এপ্রিল, ১৯৪৭, ১, ২, ৪ মে, ১৯৪৭। ১৮, ২০ জুন, ১৯৪৭।

গ্রন্থপঞ্জি : ইংরেজি

(নিম্নলিখিত গ্রন্থপঞ্জিতে সরকারি প্রকাশনাও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে)।

Official Publications

1. **Government of UK**
   (a) Indian Statutory Commission (Simon Commission). Selections from Memoranda and Oral Evidence. 1929.
   (b) Indian Franchise Committee. Report of the Indian Franchise Committee. Vol. XVII. Pt. III. 1932.
   (c) N. Mansergh (ed.). The Transfer of Power. Vol. IX. London. 1970-74.
2. **Government of India**
   (a) Census of India. relevant volumes on Bengal.
   (b) Imperial Gazetteers of India. Vol. XIV.
   (c) Report on an Enquiry into conditions of Labour in Plantations in India (Labour Investigation Committee. Chairman : D. V. Rege. 1946
3. **Government of Bengal**
   Census Report of the District of Jalpaiguri 1891.
4. **F. O. Bell**
   Final Report on the Survey and Settlement operations in the District of Dinajpur 1934-40, Bengal Government Press. Alipur. 1941.
5. **Hartley, A. C**
   Final Report on the survey and settlement operations in the District of Rangpur 1931-38, Bengal Government Press. Alipur. 1940.
6. **Milligan, J. A.**
   Final Report on the Survey and Settlement operations in the Jalpaiguri District 1906-16, Bengal Secretarial Book Depot. Calcutta. 1919.
7. **Sunder, D. H. E**
   Survey and Settlement of the Western Doors in the Jalpaiguri District 1989-95.
8. **Grunning, J. F.**
   Eastern Bengal and Assam District Gazetteers : Jalpaiguri, Allahabad, 1911.
9. **Proceedings of Bengal**
   Legislative Council (Select years)
10. **Proceedings of Bengal Legislative Assembly (Select years)**
11. **Report of the Administration of Bengal,** Calcutta, annual (Select years).
12. **Report of the Land Revenue Administration of Presidency of Bengal,** Calcutta. annual (Select years).
13. **Report of the Land Revenue**
    Commission. Bengal 1938-40 (Chairman Sir Francis Floud). 6 Vols. Alipur. 1940.
14. **Report of the Labour Enquiry Commission, 1896.**
15. **Government of Assam**
    J. C. Arbuthnot. Report on the Conditions of Tea Garden Labour in the Doors of Bengal. in Madras and in Ceylon. Shillong. 1904.
16. **Census 1951**
    West Bengal : District Handbooks : Jalpaiguri by A Mitra. Calcutta. 1954.
17. **Durgadas Majumdar**
    West Bengal District Gazetteer. Kochbihar. Calcutta. 1977.
18. **Barun De,** (et al)
    West Bengal District Gazetteers. Jalpaiguri. Calcutta. 1981.
19. **Report on an Enquiry into the Living Condition of Plantation Workers in Jalpaiguri District** (Doors). West Bengal by S. K. Haldar. Alipore, 1951.

Books **:**

1. **Rafiuddin Ahmed :** The Bengal Muslims 1871-1906 : A Quest for Identity, Delhi, 1981.
2. **Amiya Kumar Bagchi :** Private Investment in India 1900-1939. Cambridge. Cambridge University Press, 1972.
3. **Dhires Bhattacharya :** Focus on West Bengal : Problems and prospects. Calcutta : Samrat Prakashan, 1972.
4. **Bengal Chamber of Commerce and West Bengal :** An analytical Study. New Delhi : Oxford University Press, 1971.
5. **Pradip Kumar Bose :** Classes in a rural Society : A Sociological study of some Bengal villages : New Delhi : Ajanta Publishers, 1984.
6. **G. L. Beckford :** Persistent Poverty : under development in Plantation Economics of the third world, 1972.
7. **Sharit Bhowmik :** Class formation in the plantation system. New Delhi. People Publishing House.

8. **Sanat Kumar Bose :** Capital and Labour in the Indian Tea Industry, Bombay, 1954.

9. **Rachael Van M Baumer (eds) :** Aspects of Bengali History and Society. New Delhi, 1976.

10. **A. N. Bose :** Calcutta and rural Bengal : Small sector Symbiosis. Calcutta Minerva Associates, 1978.

11. **Suniti Kumar Chatterjee :** Kirata—Jana—Kirti. Calcutta : The Asiatic Society, 1974.

12. **S. P. Chatterjee :** Bengal in maps : a geographical analysis of resource distribution in West Bengal and Eastern Pakisthan. Calcutta : Orient Longmans, 1949.

13. **Partha Chatterjee :** Bengal 1920-1947 : The L and Question,Calcutta : K. P. Bagchi, 1984.

14. **Gautam Chattopadhyay :** Bengal Freedom Struggle and Electoral Politics, New Delhi : ICHR, 1984.

15. **Basudev Chatterjee and others** (eds) **:** Dissent and Consensus : Social protest in Pre-industrial Societies, Calcutta, 1989.

16. **Adhir Chakrabarti** (eds). **:** Aspects of Socio—Economic Changes and Political Awakening in Bengal, Calcutta, 1989.

17. **Sukhdev Singh Chib :** Caste, Tribes and culture of India : North Eastern India, Vol. 8. Chandigarh : Punjab University Press, 1989.

18. **D. P. Choudhury** North East Frontier of India (1865-1914), Calcutta : The Asiatic Society.

19. **Adrienne Cooper :** Share cropping and Share-croppers struggles in Bengal 1930-1950, Calcutta, 1988.

20. **Peter Custers :** Women in the Tebhaga uprising rural poor women and revolutionary Leadership (1946-49) Calcutta, 1987.

21. **E.T. Dalton,** : Descriptive Ethnology of Bengal, 1872, Reprint, Calcutta, 1960.

22. **Biplab Dasgupta (eds) :** Urbanization, migration and rural change : a study of West Bengal. Calcutta ; A Mukherjee and Co. 1988.

23. **Ranjit Dasgupta :** Economy Society and Politics in Bengal : Jalpaiguri, 1869-1947. Delhi : Oxford University Press, 1992.

24. **Satyajit Dasgupta :** The Tebhaga Movement in Bengal 1946-47, Calcutta : Centre for the studies in Social Sciences, 1988. (Occasional paper No. 89).

25. **Barun De :** Nationalism as a Binding force : The Dialetics of the Historical Course of Nationalism. Calcutta : Centre for the Studies in social sciences, 1987 (occasional paper No. 97).

26. **A. R. Desai (ed.) :** Peasant Struggles in India, Delhi, 1979.

27. **Gayatri Devi and others :** A princess Remembers : The Memoirs of the Maharani of Jaipur, 1976, 5th edition, New Delhi, 1989.

28. **R. Dhar :** An input-output table for West Bengal and the Calcutta metropolitan district : First and Second interim reports. Newyork : Institute of Public Administration, 1962.

29. **Asok Kumar Dutta :** The Palaeo history of man and his culture. Delhi : A. K. Prakashan, 1982.

30. **Percival Griffiths :** The History of Tea Industry in India, London : Oxford University Press, 1967.

31. **R. A Grierson** : Linguistic Survey of India : Vol. 1, Part. I, Reprint. Delhi : Motilal Banarasidas, 1967.

32. **Amalendu Guha :** Planter Raj to Swaraj, New Delhi, 1977.

33. **Amit Kumar Gupta** (ed) : Myth and Reality : The Struggle for Freedom in India 1945-47, New Delhi, 1987.

34. **D. S. Ganguli :** Regional Economy (West Bengal).. Calcutta, Orient Longman, 1979.

35. **Hamilton :** An Account of the District of Rangpur, 1810. Extracts in Jalpaiguri, District Handbook.

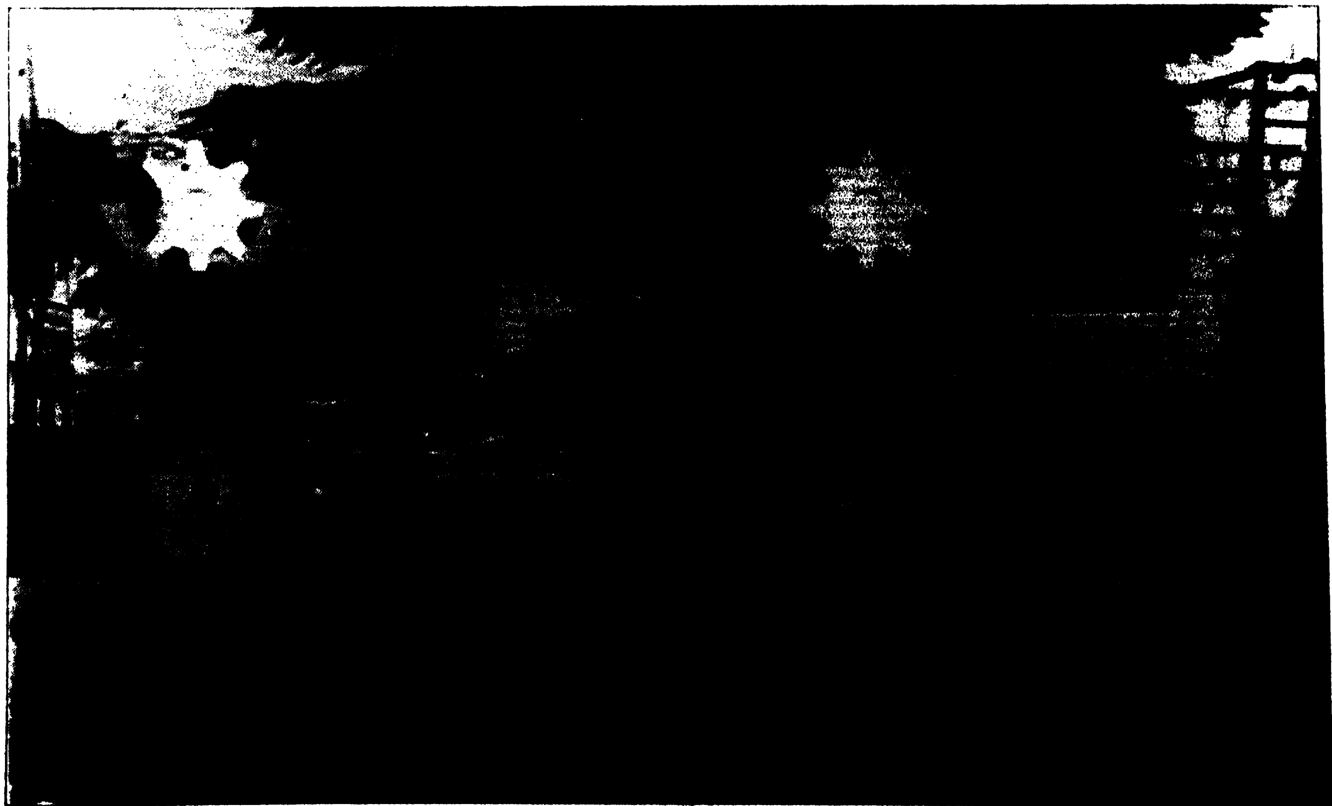
36. **H. H. Hunter :** Statistical Account of Bengal. (Thereafter SAB) Vol. X. Darjeeling, Jalpaiguri and State of KuchBihar, London : Oxford University Press, 1974.

37. **Indian Chamber of Commerce (Calcutta) :** West Bengal : a panorama, Calcutta : Indian Chamber of Commerce, 1964.

38. **George Kristaffel Lieten** : Continuity and change in rural Bengal. New Delhi : The Sage Publications,—1992.

39. **Franda Marcus :** West Bengal and the Federalizing Process in India. Princeton : New Jercy University Press, 1968.
40. **Class Morton :** From field to Factory : Community Structure and Industrialization in West Bengal. Philadelphia : Institute for the Study of Human issues, 1978.
41. **Santosh Kumar Mukherji** : Boundary Problem of New Bengal, Calcutta : Hindusthan Socialist Party, 1947.
42. **Ramendranarayan Nag :** Statistical elucidations for district Administration in West Bengal. Calcutta : Classic Press, 1969.
43. **Ratnalekha Ray :** Change in Bengal Agrarian Society 1750-1850, New Delhi, 1979.
44. **H. H. Risely :** The tribes and castes of Bengal, Ethnographic Glossary. Vol. I: 1891. Reprint, Calcutta, 1981.
45. **Charu Chandra Sanyal :** The Rajbansis of North Bengal (A Study of Hindu Social group). Calcutta : The Asiatic Society, 1965.
46. **Rebati Mohan Sarkar :** Regional Cults and rural traditions : an interacting pattern of Divinity and humanity in rural Bengal. New Delhi : Inter India Publications, 1985.
47. **Sumit Sarkar :** The Swadeshi Movement in Bengal 1903-1908, New Delhi, 1973.
48. **Tanika Sarkar :** Bengal', 1885-1947, New Delhi, 1983.
49. **Sunil Sen :** Agrarian Struggle in Bengal 1946-47, New Delhi; 1972.
50. **Sunil Sen :** The working women and popular Movements in Bengal : From the Gandhi era to the present day, Calcutta, 1985.
51. **Bhai Nahar Singh and Bhai Kispal Singh :** History of All India Gurkha League 1943-1949, New Delhi, 1987.

লেখক ❑ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক। প্রাবন্ধিক, সাংবাদিক ও কলাম লেখক।



জলপাইগুড়িতে রাণীনগর শিল্প বিকাশ কেন্দ্র ছবি : শৌভিক ঘোষ

